ভারতের সাধক

ভারতের সাধক

(১০ম খণ্ড)

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৪

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
সুপ্রকাশ সেন

শৈবাচার্য্য অপ্পর

ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতিময় জীবনে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধকদল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উভয় যুগেই দলে দলে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদের দিয়াছেন দিব্যলোকের আলোক-সঙ্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধারা। এই মহাত্মাদেরই অন্যতম শৈবাচার্য্য অপ্পর। কৃচ্ছ্র, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনন্য ইষ্টসেবা ও কঠোর যোগসাধনার সহিত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সমন্বিত হয় তাঁহার সাধনজীবনে। বহুজনের আলোক-দিশারী রূপে সর্ব্বত্র তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

অপ্পর আবির্ভূত হন আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দে। তামিল দেশের, বর্ত্তমান তামিল নাড়ুর, দক্ষিণ আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম। শিব-সাধনার ঐতিহ্যের ধারাটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত ছিল তাঁহাদের বংশে। অপ্পরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই এক ধারক ও বাহক। নৈষ্ঠিক শিবভক্ত বলিয়াও স্থানীয় অঞ্চলে তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল।

শৈশবেই অপ্পরের জীবনে নামিয়া আসে দৈবের নির্ম্মম আঘাত। অল্প দিনের ব্যবধানে জনক ও জননী শিশুপুত্রের মায়া কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। অপ্পরের বাল্যবিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই সংসারেই বাস করিতেন; এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন তাহার লালনপালনের ভার।

বালক কালেই অপ্পরের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদি অতশয় যত্নে যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন, তেমনি করেন তাহার লেখাপড়ার সুব্যবস্থা। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অপ্পরকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং অল্পকালের

মধ্যেই উচ্চতর পাঠসমূহ অনায়াসে তাহাকে আয়ত্ত করিতে দেখা যায়। শিক্ষক ও পড়ুয়ারা সবাই চমৎকৃত হন, ভ্রাতার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়া দিদিরও আনন্দের অবধি নাই। দিনের পর দিন তাহাকে তিনি উৎসাহিত করিতে থাকেন।

নিত্যকার পাঠ যেই সমাপ্ত হয় অমনি বালক অপ্পর স্নেহময়ী দিদির কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া বসেন, তাঁহার মুখ হইতে শোনেন প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধু মহাত্মাদের দিব্য জীবনের কত অলৌকিক কাহিনী।

ভক্তিসিদ্ধ শৈবগুরুর কাছে দিদি দীক্ষা নিয়াছেন। সংসারের কাজকর্ম্ম আর অপ্পরের দেখা-শুনার সময় ছাড়া দিন রাতের বাকী সময়টা তাঁহার কাটে শিবের আরাধনা ও জপ ধ্যানে। সকল কিছু অনুষ্ঠানের শেষে, শিব মন্দিরের গর্ভগৃহে বসিয়া এই বর্ষীয়সী পূজারিণী প্রতিদিন ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন সিদ্ধাচার্য্য মাণিক্য-বাচক-এর অপূর্ব্ব স্তোত্রমালা। শিব প্রশস্তির গম্ভীর ধ্বনিতে সারা মন্দির গম্‌গম্ করিয়া উঠে। মন্দির চত্বরে ক্রীড়ারত অপ্পর উচ্চকিত হইয়া উঠে. কি এক অজানা আকর্ষণে ছুটিয়া আসে পূজাবেদীর কাছে, দিদির ভাব-প্রদীপ্ত আননের দিকে চাহিয়া থাকে নির্নিমেষে। শিবভক্তির রসে রসায়িত দিদির সাধনজীবন এমনি করিয়া দিনের পরদিন প্রভাবিত করিতে থাকে বালক অপ্পরকে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ হইয়া যায়। এবার কোন উচ্চতর শাস্ত্র পাঠের কেন্দ্রে অপ্পরকে যাইতে হইবে। সারা দক্ষিণদেশে তখন কাঞ্চীর খুব সুখ্যাতি। এ নগরী শুধু পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রের রাজধানীই নয়, ইহা তখন সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। রাজা মহেন্দ্র ধর্ম্মের দিক দিয়া জৈনমতাবলম্বী, তাঁহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের বড় বড় জৈন পণ্ডিতেরা রাজধানীতে জড়ো হইয়াছেন। এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে জৈন শাস্ত্রবিদ্ ও তর্কশূরদের এক প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যালয়। রাজসভায় প্রায়ই শাস্ত্র বিচার ও তর্কদ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হয়—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব

ধর্ম্মের পণ্ডিতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তাই কাঞ্চী তখন পরিণত হইয়াছে সর্ব্বশাস্ত্রেরই পীঠস্থান রূপে।

চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও পড়ুয়াদের কাছে অপ্পর কাঞ্চীনগরের বিদ্যাবৈভবের কথা শুনিয়াছেন। নিজে তিনি উৎসাহী বিদ্যার্থী, তাছাড়া, সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্প্রতি তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁহার কিশোর মন চঞ্চল হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থ কাঞ্চীতে বসবাস করার জন্য। সেখানে গিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার অভিলাষ।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে একদিন কহিলেন, "দিদি, কাঞ্চীতে গিয়ে শিক্ষা লাভ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সেই ব্যবস্থাই তুমি আমার ক'রে দাও। বিদ্যার্থী হিসাবে এজন্য যা কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়, আমি তাতে একটুও পশ্চাদ্‌পদ হবো না। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, সেখানে থেকে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে, আমি দেশে ফিরবো।"

দিদি কহিলেন, "ওরে তুই কৃতী হবি, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবি তাই যে আমি চাই। আর সেই ভরসায়ই যে আমি এতকাল দিন গুনছি। কিন্তু ভাই, কাঞ্চীর বিদ্যাপীঠে তোর পড়াটা আমার যেন ভাল ঠেক্‌ছে না।"

"কেন বলতো?"—ক্ষুণ্ণ মনে প্রশ্ন করেন অপ্পর।

"শুনেছি, কাঞ্চীতে রাজা মহেন্দ্রের সম্প্রদায়, অর্থাৎ, জৈনেরাই বেশী প্রতিপত্তিশালী। জৈন শাস্ত্রবিদ্‌দের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ন্যায়-শাস্ত্রের কূটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের কচ্‌কচি। ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে গৌণ, আমাদের ইষ্ট বিগ্রহ শিব যেখানে রয়েছেন অবজ্ঞাত হয়ে।"

"এ তুমি কি বলছো দিদি। আমি নিজে যদি ঠিক থাকি, আমার নিজের ধ্যানধারণা যদি ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার অনিষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া, এযুগে প্রকৃত শাস্ত্রবিদ্ হতে হলে ঈশ্বরমুখী আর ঈশ্বরবিমুখী উভয় শাস্ত্রই পাঠ করতে হবে। কাঞ্চী ছাড়া কোথাও যে তার সুবিধে নেই।"

"আমি বলি কি, তুই বরং চিদম্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব-মন্দিরে রয়েছেন শৈবাগমের দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা, আর রয়েছেন সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষেরা।"

"কিন্তু দিদি, সেখানে গিয়ে তো আমায় একটিমাত্র সম্প্রদায়ের একপেশে বিদ্যাচর্চ্চা নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজ্যের দশ দিকের দশটি জানালা তো খুলবে না। দর্শন ও সাধনার বহুমুখী তত্ত্ব তো আমি আয়ত্ত করতে পারবো না। না—না, আমি কাঞ্চীতেই যাবো। তুমি এতে আপত্তি ক'রো না।"

ভ্রাতার সঙ্কল্পে দিদি আর বাধা দিলেন না. কয়েক দিনের মধ্যেই অপ্পর রওনা হইয়া গেলেন কাঞ্চী নগরে।

এখানকার প্রধান বিদ্যাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য। উত্তর-ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ জৈন দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। আর তাঁহাদের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে চলিতেছে শত শত বিদ্যার্থীর শাস্ত্র অধ্যয়ন। তরুণ ছাত্র অপ্পর এই বিদ্যাপীঠেই ভর্ত্তি হইলেন। বহুলখ্যাত পণ্ডিতদের চরণতলে বসিয়া শুরু হইল তাঁহার অধ্যয়ন-তপস্যা।

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ তাঁহার ধীশক্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অপ্পর নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। বিশেষ করিয়া জৈন শাস্ত্রে জন্মিল তাঁহার অসামান্য অধিকার। বিচার সভা ও তর্কদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই তরুণ পণ্ডিত অল্পকাল মধ্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

শাস্ত্র ও দর্শনতত্ত্বে পারঙ্গমতার জন্যই শুধু নয়, অসামান্য কাব্য-প্রতিভার অধিকারী রূপেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিলেন। প্রবীণ জৈন ধর্ম্মনেতা ও সাধকেরা তাই তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক বিরাট প্রতিশ্রুতি।

রাজা মহেন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টিও অচিরে পতিত হইল এই প্রতিভাবান্ স্নাতকের উপর। অবশেষে একদিন রাজগুরুর কাছে জৈনধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন অপ্পর।

রাজসভার পণ্ডিতেরা বুঝিয়া নিলেন, এই প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিতই সেই চিহ্নিত ব্যক্তি, যিনি উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধর্ম্ম-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অপ্পব কাঞ্চী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, দিদির স্নেহ সান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়া যান। কিন্তু আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অপ্পর এখন মজিয়া আছেন বিদ্যাচর্চ্চায় ন্যায়ের কূটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া জৈনধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়।

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর। বিদ্যার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে অপ্পরের মনে, জৈন পণ্ডিতদের প্রভাবে পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও হইয়াছে প্রায় তিরোহিত।

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, "কাঞ্চীতে গিয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে বাধা জন্মায়, তার মূল্য যে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস ?"

"ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো ? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি ?"

"আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতর বিদ্যার অভিমান জেগেছে। তাছাড়া, জৈন শুষ্ক তার্কিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী হয়েছিস্। সব চাইতে দুঃখের কথা, ঈশ্ববিমুখ হয়ে পড়েছিস্ তুই। আমাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈব সাধক। তাঁদের পথ থেকে তুই দূরে সরে গিয়েছিস্। এর ফল কি কখনো ভালো হতে পারে ?"

কয়েক দিন পরের কথা। হঠাৎ একদিন মারাত্মক শূলব্যথায় অপ্পর একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না। সঙ্কট ক্রমে চরমে উঠিল, মুমূর্ষু অপ্পরকে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ এসময়ে অপ্পরের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গুরুদেব তাঁহাদের গৃহে

আসিয়া উপস্থিত। সিদ্ধ শৈব সাধক বলিয়া এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত। যোগবিভূতির খ্যাতিও তাঁহার প্রচুর। তাই তাঁহার আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন। রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহাকে জানানো হইল।

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, "তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট অচিরেই কেটে যাবে, অপ্পর বেঁচে উঠবে। কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে। বংশানুক্রমে প্রভু শিবই হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। এই ইষ্টের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তো যতো বিপদের সৃষ্টি। তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিরাজ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ। অপ্পর আজ তাঁর কাছেই করুক আত্মসমর্পণ।

আশীর্ব্বাদ জানাইয়া মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপ্পরের জন্য দিদির এবার আর দুশ্চিন্তা নাই। বুঝিলেন, গুরুদেবের কথা কখনো মিথ্যা হইবার নয়, প্রভু শিবের কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার রক্ষা পাইবে।

অপ্পরকে কহিলেন, "শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তুই ইষ্টদেবকে ভুলে গিয়েছিস্। ইষ্টের চরণে অপরাধ করেই তো তোর এত কষ্ট, এত বিড়ম্বনা। সবাই আমরা তোকে ধরাধরি ক'রে শিব-মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে প্রভু শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, স্তবস্তুতি জানিয়ে তাঁকে প্রসন্ন কর্। দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাজ তো আজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে বলে গেলেন। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তাঁর কথা তো মিথ্যে হবার নয়।"

প্রচণ্ড শূলবেদনায় অপ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই দৈব কৃপার উপর নির্ভর করিতে তাঁহার আপত্তি হইল না।

রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থম্‌থমে ঘন অন্ধকার। মন্দিরের অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার্ত্ত অপ্পর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাম। হঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া

উঠিল। সেই সঙ্গে শোনা গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, "বৎস অপ্পর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছো তুমি, লাভ করেছো নবজন্ম। আশীর্ব্বাদ জানাই, নূতনতর ঈশ্বরীয় চেতনা জাগ্রত হোক তোমার সাধনসত্তায়, আর তোমার মাধ্যমে সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অপ্পর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র শূলবেদনা দূরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নূতন চেতনার জোয়ার। সুষুপ্তিময় রাত্রির শেষে এ যেন আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তাঁহার নবজাগরণ।

দিব্য আনন্দের রসে অপ্পর উচ্ছল উদ্বেল। লিঙ্গবিগ্রহের বেদীতলে ভাবাবেশে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্ত-করে নিবেদন করিলেন শিবমহিমার অপরূপ স্তবগাথা।

আবার শোনা যায় দিব্যপুরুষের বাণী, "বৎস অপ্পর, তোমার স্তবমালা আমায় প্রসন্ন করেছে। আজ থেকে শিবভক্তেরা জানবে তোমায় 'তিরুণাবক্করসু' নামে, ঈশ্বরের আশিসপূত বাক্-পতি ব'লে পরিচিত থাক্‌বে তুমি এ অঞ্চলের শৈব-সমাজে।"

যুক্তপাণি অপ্পর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, "প্রভু, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তোমার দাসরূপেই যেন এ জীবন অতিবাহিত করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ হয় চিরদিনের জন্য উৎসর্গীত। তোমার মহিমা ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত।

মন্দিরের স্বর্গীয় জ্যোতির ধারা অন্তর্হিত হইয়া গেল। দিব্য প্রেরণায় উদ্দীপিত অপ্পর কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের পাশে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুই নয়ন তাঁহার পুলকাশ্রুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তির হাসি। ভ্রাতা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন, স্বধর্ম্মের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন,

প্রভুর আশীর্ব্বাদে হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। চিত্ত তাঁহার তাই ইষ্টদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী দিদি অপ্পরের মুখ হইতে আনুপূর্ব্বিক শুনিলেন। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আর কিন্তু দেরী করা নয়, ভাই। আমাদের কুলগুরু, সিদ্ধ শৈবাচার্য্যের কাছ থেকে তুই দীক্ষা গ্রহণ কর্। যে কৃপা দেবাদিদেব শিব তোকে আজ করেছেন, অচিরে তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক। শিব সাধনায় তোর সিদ্ধি লাভ হোক্, তা-ই যে আমি চাই।"

গুরুর কাছে দীক্ষা নিবার পর অপ্পর শুরু করেন তাঁহার কঠোর সাধনা। ইষ্টদেব শিবের ধ্যান জপে নিরন্তর নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, দিন রাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, সে সম্বন্ধে কোন হুঁশ নাই। গুরুর নির্দ্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগূঢ় সাধনার এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শক্তিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

গুরু একদিন কৃপাভরে কহেন, "বৎস, অপ্পর, সাধনার এই দুরূহ ক্রমসমূহ যে ভাবে তুমি আয়ত্ত করছো, তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি স্মরণে রেখো, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তোমার সাধনসত্তায় মিলিত হয়েছে অসাধারণ শিবভক্তি ও দিব্য অনুভূতি। তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনের জন্য পূর্ব্ব হতেই প্রভু তোমায় চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, সিদ্ধ মহাত্মা মাণিক্যবাচক-এর সাধনপথ ও শিবভক্তি প্রচারের পথ তুমি অনুসরণ করো। তাঁর স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার সাধন-জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আদিষ্ট কর্ম্ম উদ্‌যাপন তোমার সহজতর হয়ে উঠ্‌বে।"

সিদ্ধ শিবযোগী মাণিক্যবাচক-এর পবিত্র জীবন, তাঁহার সাধনপন্থা আর স্তবগাথা দক্ষিণদেশের হাজার হাজার শৈব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে। দিব্য জীবনের দুয়ার তাঁহাদের সম্মুখে

করিয়াছে উন্মোচিত। গুরুর আদেশে অপ্পর তাই শুরু করিলেন মাণিক্যবাচক-এর শিক্ষা ও সাধনার অনুধ্যান।

মাদুরার সন্নিকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বংশে, আবির্ভূত হন মাণিক্যবাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় তাঁহার জীবনে। সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ্ ও পরমধার্ম্মিক পণ্ডিত রূপেও তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সমকালীন পাণ্ড্যরাজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম্মপ্রাণ। দূত পাঠাইয়া বাদাবুর হইতে তরুণ পণ্ডিতকে তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন মাণিক্যবাচক; অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, শুধু তাহাই নয়, কহিলেন, "পণ্ডিত, বয়সে তরুণ হলেও, প্রভু শিবজীর কৃপায় অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞান তুমি অর্জ্জন করেছো। বাদাবুর গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর জন্য তো তোমার জন্ম হয় নি। তোমার যোগ্য স্থান রাজধানীতে। এবার এখানে তুমি চলে এসো, তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করো দেশের ও দশের কল্যাণে। আমার রাজকার্য্যে তুমি সহায়তা করো। তোমায় আমি নিযুক্ত করছি এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদে।"

"মহারাজ, শাস্ত্রানুশীলন আমার উপজীব্য, সত্যের সন্ধানই আমার জীবনের ব্রত। রাজধানীতে থেকে, রাজকর্ম্মের ভীড়ে, আমার সে ব্রত উদ্‌যাপনে যে বাধার সৃষ্টি হবে।" সবিনয়ে উত্তর দেন মাণিক্যবাচক।

"না পণ্ডিত, এ কাজ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা হবে না। আমার রাজধানীতে দিনের পর দিন আসছেন কত প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ্, কত সিদ্ধ সাধক। তাঁদের সান্নিধ্য পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোমার মত কর্ম্মক্ষম, শুদ্ধাচারী ও জ্ঞানী সচিবের সাহায্য পেয়ে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তুমি এ কার্য্যভার গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীর হিতসাধন করো।"

পাণ্ড্যরাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরমধার্ম্মিক। প্রজাদের

সত্যকার কল্যাণ সাধনেও তিনি সদা তৎপর। সর্ব্বোপরি তরুণ পণ্ডিত মাণিক্যবাচক-কে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এই ভালবাসার টান এড়ানো সম্ভব হইল না, মন্ত্রিত্বের পদ মাণিক্যবাচক গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদিন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন শাস্ত্রচর্চ্চা, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে।

তত্ত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষার তৃষ্ণা চিরদিনই জাগিয়া রহিয়াছে তাঁহার অন্তর্জ্জীবনে; এক এক সময়ে এই তৃষ্ণা প্রবলতর হইয়া উঠে, ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার ফলে বহু জ্ঞানী শাস্ত্রবিদ্ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেছেন, তত্ত্ব আলোচনার পরম সুযোগও আসিতেছে। কিন্তু তৎ-এর সাক্ষাৎ তো জীবনে ঘটিতেছে না। শাস্ত্রানুশীলন ও সাধন-ভজনের লক্ষ্য—সেই 'তৎ', সেই পরমপুরুষ। তাঁহার দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি তো আজিও হয় নাই। এ জীবন তাই একেবারে ব্যর্থ, 'বন্ধ্যা'। প্রকৃত সমর্থ সদ্গুরুর কৃপা না পাইলে, ইষ্ট সাক্ষাৎ তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু কে তাঁহার এই সদ্গুরু? কোথায় কখন ঘটিবে তাঁহার কৃপাঘন আবির্ভাব? আজকাল এই চিন্তাই বেশীর ভাগ সময় মাণিক্যবাচককে ব্যাকুল করিয়া রাখে।

এ সময়ে পাণ্ড্যরাজ একদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, "ত্যাখো মন্ত্রী, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মতিগতি তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নূতন ক'রে সংগঠিত করা দরকার। এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ। কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে চলে যাও। উৎকৃষ্ট অশ্ব কিনে নিয়ে এসো।"

অর্থ ও লোকলস্কর নিয়া মাণিক্যবাচক চলিয়া গেলেন। কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্যরূপ। তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে পৌছানোর পর তাঁহার জীবনে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা। যে সদ্-

গুরুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়া দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে এখানে হঠাৎ তিনি হন আবির্ভূত।

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাঁহার কৃপায় তরুণ সাধক মাণিক্যবাচক অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যান। দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহার সাধনজীবন হয় কৃতকৃতার্থ।

মাণিক্যবাচক-কে কয়েকদিন নিজ সান্নিধ্যে রাখার পর গুরু মহারাজ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে কহিলেন, "বৎস, আমার ঈশ্বর-আদিষ্ট কাজ শেষ হয়েছে। আমি এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তোমার প্রতি আমার দুটি নির্দ্দেশ রইলো। এই স্থানটি বড় জাগ্রত, বড় পবিত্র। এস্থানে তুমি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করো। বহু শিবভক্ত এর আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এটা হবে তাঁদের প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে। আর একটি কথা। এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভু শিবজীর স্তবগাথা রচনায়। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার এই শিবস্তবমালা যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষকে প্রেরণা দেবে, মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে থাকবে।"

গুরুর নির্দ্দেশ পালন করিতে মাণিক্যবাচকের বিলম্ব হয় নাই। রাজার অশ্ব ক্রয়ের জন্য হাতে যে টাকা ছিল তাহাই তিনি নিয়োজিত করিলেন মন্দির নির্ম্মাণের কাজে। তারপর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব শেষ করিয়াই উপস্থিত হইলেন পাণ্ড্যরাজের সকাশে। অকপটে নিবেদন করিলেন তাঁহার অপরাধের কথা। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে আমি ব্যয় করেছি, আমি জানি আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন।"

পাণ্ড্যরাজ তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তৎক্ষণাৎ মাণিক্যবাচককে তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে কারাগারে। কহিলেন, সমস্ত ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আমি এই অপরাধের বিচার করবো।"

নির্দ্ধারিত দিনে, বিচার সভায় বন্দী মাণিক্যবাচক-কে নিয়া আসা হইল। পাণ্ড্যরাজের ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। ঘটনার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শুনিয়া প্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর কিছুটা সদয় হইয়াও উঠিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, "মাণিক্যবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুমি করেছো, তা অত্যন্ত গুরুতর। এজন্য সমুচিত দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড। কিন্তু সে দণ্ড আমি তোমায় দিচ্ছিনে। সরকারী তদন্তের ফলে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের বশে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে, রাজকোষের অর্থ দিয়ে শিব মন্দির তৈরী করেছিলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এ অর্থ তুমি নাও নি। আরও একটা কথা। তুমি মন্ত্রী পদে আসীন থাকার কালে আমার এ রাজ্যের কল্যাণে অনেক কিছু করেছো। তাছাড়া, শিবভক্ত সাধক বলে তোমায় আমরা এতকাল মর্য্যাদা দিয়ে আসছি। এসব কথা স্মরণে রেখে, আমি তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান দিচ্ছিনে। তুমি পদচ্যুত হয়েছো, কারাগারে এতদিন যাপন করেছো, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুটা হয়েছে। তবে রাজ-অর্থের অপব্যবহারের জন্য তোমার সমস্ত কিছু অর্জিত ধন-সম্পত্তি আমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করলাম। এবার তুমি মুক্ত। অতঃপর যেখানে তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে পারো।"

পাণ্ড্যরাজের আদেশ শুনিয়া মাণিক্যবাচক-এর আনন্দ আর ধরে না। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, এমনিতর মুক্তিই যে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামনা ক'রে এসেছি। আমার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে আপনি আমায় বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার থেকে আমার একমাত্র কাজ হবে দীনবেশে ইষ্টদেব শিবজীর স্তুতিগান করা আর এদেশের সাধন-পীঠে মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন করা।"

শিবভক্তি ও শিবমাহাত্ম্য প্রচারের এই ব্রতই মাণিক্যবাচক জীবনের শেষ দিন অবধি উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে অপরূপ

স্তবমালা দিনের পর দিন তিনি রচনা করিয়াছেন, দেশের ভক্তজন ও অধ্যাত্মরসের রসিকদের কাছে তাহা গণ্য হয় মণিমাণিক্যের মত মূল্যবান বলিয়া। জনসাধারণ তাই তাঁহাকে আখ্যা দেয়—মাণিক্য-বাচক, অর্থাৎ বাক্য তাঁহার মাণিকের মত দ্যুতিমান, মূল্যবান।

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদম্বরমে মাণিক্যবাচক তাঁহার জীবনলীলায় ছেদ টানিয়া দেন। জনশ্রুতি আছে, দিব্য ভাবাবেশে শিবের স্তুতিগান করিতে করিতে এই মহাত্মা চিদম্বরমের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ নটরাজের অভ্যন্তরে লীন হইয়া যান।

মাণিক্যবাচকের জীবন ছিল দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শিব-চৈতন্যময়। তাঁহার অমর স্তবগাথার গ্রন্থ 'তিরুবাচকম' উত্তরকালে কীর্তিত হয় ভক্তি প্রবাহের উৎস রূপে, উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিযাছে এই স্তবমালায়। সাধকজীবনের স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, যে দিব্য-চেতনার মধ্য দিয়া সাধক চরম পর্য্যায়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন, তিরুবাচকম-এ রহিয়াছে তাহারই অপরূপ ব্যঞ্জনা। আজো তামিল দেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই স্তবগাথা হইতে লাভ করে পরম পথের পাথেয়।[১]

সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপূত আদর্শ এখন হইতে হইয়া উঠে অপ্পরের সাধনজীবনের ধ্রুবতারা, তিরুবাচকম-এর স্তবগাথার প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ব হইয়া উঠেন, নিগূঢ় চৈতন্যময় জীবনের স্তর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাঁহার সম্মুখে। শুধু তাহাই নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অপ্পরের কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতে থাকে ইষ্টদেব শিবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক স্তোত্রমালা। অচিরে এই স্তোত্রসমূহ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

ইষ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অপ্পরকে ব্যাকুল করিয়া

১ কালচারাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া ভল্যু. ২,—দ্য শৈব সেইণ্টস্ঃ এস, এস, পিল্লেই

তোলে। গুরু মহারাজের নিকট নূতনতর সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য তিনি ছুটিয়া যান।

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগূঢ় ক্রম গুরু এবার তাঁহাকে শিক্ষা দেন। প্রসন্ন কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া বলেন, "বৎস, সাধনার এই ক্রমগুলো সমাপ্ত করো, আর এই সঙ্গে নিজের অহংবোধের মূলকে করো উৎপাটিত। ইষ্টদেব শিবজীব ভৃত্যরূপে নিজেকে সদাই গণ্য ক'রে চলবে। আশীর্ব্বাদ করছি, অচিরে হবে তোমার ইষ্টদর্শন। ইষ্টকৃপায় মোক্ষলাভও তোমার হবে।"

এখন হইতে সাধনার গভীরে অপ্পর নিমজ্জিত হইয়া যান। নিত্যকার সাধন-ভজন শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে স্বরচিত শিবস্তব তিনি গাহিয়া বেড়ান। সর্ব্বত্যাগী সাধকের পরনে একটি জীর্ণ বহির্ব্বাস, হস্তে একটি খুরপি। গ্রামে গ্রামান্তরে যেখানে যে শিবমন্দির আছে এই খুরপি দিয়া তাহার পরগাছা উৎপাটন আর ময়লা নিষ্কাশন করাই হয় তাঁহার নিত্যকার কর্ম্ম। প্রভু শিবের একান্ত দাস ও সেবকরূপে তামিল দেশের সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

শিব শরণাগতির এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত অপ্পরের জীবনে এবার সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব পরম কারুণিক শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন।

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস অপ্পর আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, যেমন তোমার অভিরুচি---বর মেগে নাও।"

ত্যাগব্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, "প্রভু, দাসরূপে সেবা ক'রে তোমার দুর্লভ সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরূপেই যেন চিরদিন আমি থেকে যাই। এই কৃপাই তুমি আমায় করো।"

ইষ্টদেব স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তথাস্তু।"

সিদ্ধ সাধক অপ্পরের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নূতন অধ্যায়। দৈন্যময়, ত্যাগব্রতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়া দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত শত নরনারী। গৃহপ্রাঙ্গণ

শিবভক্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে। কাঞ্চী, মাদুর চিদম্বরম প্রভৃতি নগরেও শৈব সাধক অপ্পরের খ্যাতি অচিরে ছড়াই পড়িতে থাকে।

কাঞ্চীর জৈন সাধক ও শাস্ত্রবিদেরা এবার চঞ্চল হইয়া উঠেন অপ্পর যে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের এক প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত তাঁহার উপর অনেক আশা-ভরসা করিয়া আছেন। রাজধর্ম্মের বিশি ধারক বাহকেরা। জৈনধর্ম্মের প্রচারে অপ্পর প্রাণমন ঢালিয়া দিবেন এই ধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবেন তাহা নয়, একেবারে বিপরীত বুদ্ধি নিয়া শৈব ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় তিনি ঘটাইতে বসিয়াছেন!

রাজপণ্ডিতেরা পাণ্ড্যরাজের কাছে গিয়া অভিযোগ তুলিলেন "মহারাজ, জৈন নগুসীব সংস্রব অপ্পর ত্যাগ করেছে, শুধু তাই নয় সনকারা বিদ্যাপীঠে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে যে উপকার সে পেয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে হয়েছে বিস্মৃত। জৈনধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে শুরু করেছে শৈবধর্ম্মের প্রচার। অবিলম্বে তার দণ্ডবিধান না করলে রাজকার ধর্ম্ম শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, আদেশ দেন, "জৈনধর্ম্মত্যাগী এই নবীন আচার্য্যকে সত্বর রাজসভায় উপস্থিত করো। বিচারে তার সমুচিত দণ্ড বিধান করা হবে।"

অপ্পরকে রাজার সন্নিধানে নিয়া আসা হইল। রাজ-পণ্ডিতদের অভিযোগের উত্তরে শান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আমি চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে রত রয়েছি। এজন্য বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ কোন পন্থারই শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ বাদ দিই নি। জৈন মত আমি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁর পরে প্রভু শিবজীর অপার করুণায় পরমতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে জীবন আমার হয়েছে কৃতকৃতার্থ। এতে আমার কোন অপরাধ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

পাণ্ড্যরাজ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তুমি কি জানো না, জৈনধর্ম্ম এখানকার রাজধর্ম্ম? সেই ধর্ম্ম একবার গ্রহণ ক'রে

তুমি তা ত্যাগ করেছো। এজন্য কঠোর শাস্তি তোমায় পেতে হবে। তাছাড়া, অপ্পর, তুমি রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেছো, রাজকোষের বহু অর্থ রাজপণ্ডিতদের বহু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তোমার জন্য।”

“মহারাজ যা বলছেন তা সত্যি। কিন্তু আমার দিক দিয়ে কিন্তু অধর্ম্মাচরণ আমি কিছু করি নি। ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য—পরম সত্য আবিষ্কার করা, আর সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকা। শৈবধর্ম্মের ছায়াতলে এসে, পরমপুরুষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আমি সত্যকেই লাভ করেছি। জীবন আমার ধন্য হয়েছে।”

“তবে কি তুমি বলতে চাও রাজকীয় জৈনধর্ম্মে সত্যবস্তু নেই? তা রয়েছে শুধু শৈবধর্ম্মেই।”—রাজা তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার মত হইয়াছেন।

সভায় উপস্থিত জৈন পণ্ডিতেরা উত্তেজিত স্বরে কোলাহল শুরু করিলেন, “মহারাজ, রাজধর্ম্মের অবমাননাকারী এই দুর্বৃত্তকে আপনি চরম দণ্ড দিন। নইলে এ রাজ্যের মহা অকল্যাণ হবে।”

পাণ্ড্যরাজ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্য্য অপ্পর। তুমি রাজধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, তার বিরুদ্ধে অপমানসূচক বাক্য ব'লে ঘোরতর অপরাধ করেছো। সুপণ্ডিত হয়েও একাজ তুমি করেছো, তাতে অপরাধের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের,—প্রাণদণ্ডের আদেশ আমি দিচ্ছি।”

ফৌজদারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অপ্পরকে বধ করা হইবে উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া। এই দণ্ডদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতূহলী জনতার ভীড় জমিয়া উঠে।

রাজার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয় বটে, কিন্তু সাধক অপ্পর বিস্ময়করভাবে প্রাণে বাঁচিয়া যান। দেখা যায়, পর্ব্বত শীর্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত তাঁহার দেহটি সানুদেশের এক আগাছার উপর পতিত হইয়া কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে।

সমবেত জনতা এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। উচ্চ কণ্ঠে

অপ্পরের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। অনেকে বলাবলি করিতে থাকে—'শিবের একান্ত ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ এই অপ্পর। স্বয়ং শিবই কৃপা ক'রে রক্ষা করেছেন ওর জীবন!'

রাজপুরুষেরা ছুটিয়া গিয়া রাজসকাশে এই ঘটনার কথা নিবেদন করিলেন। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি অপ্পরকে আবার পাহাড় চূড়া হইতে নিক্ষেপ করা হইবে?

পাণ্ড্যরাজ কহিলেন, "না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টা ক'রো না। হাজার হাজার উত্তেজিত লোকের সামনে একাজ করাবও প্রয়োজন নেই। বরং অপ্পরকে তোমরা গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। গলদেশে ভারী পাথর বেঁধে জলগর্ভে ফেলে দিয়ে এসো।"

আদেশ মত কাজ সমাধা করিয়া রাজপুরুষেরা কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল—এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সমুদ্র-গর্ভে তলাইয়া গিয়াও অপ্পর প্রাণ হারান নাই, ইষ্টদেব শিবের কৃপায় গলার বন্ধনী হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটি কখন খসিয়া গিয়াছে। তারপর তাঁহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।[১] সেখান হইতে ধীবরেরা তাঁহাকে উঠাইয়া নেয় এবং শুশ্রূষার ফলে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে।

সুস্থ হইয়া উঠিয়া অপ্পর ধীবরদের সব কথা খুলিয়া বলেন, তারপর ধীরপদে উপনীত হন রাজপ্রাসাদের দ্বারে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হয় নাই, তাই তাঁহার পিছনে সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা।

জনতার বিশ্বাস, সাধক অপ্পর শিবের অনুগৃহীত, তাই শিবের কৃপাতেই দুই-দুইবার তিনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাহাদের কয়েকজন মুখপাত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

১ তামিলদেশের তীরভূমির লোকদের বিশ্বাস, শিবের কৃপা অপ্পরের গলার প্রস্তরকে হাল্কা ভাসমান কাষ্ঠে পরিণত করে এবং তাঁহাকে বেলাভূমিতে ভাসাইয়া নিয়া আসে। অপ্পরের ভাসমান দেহটি সমুদ্রতটের যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আজিও বহু শৈবসাধক ও ভক্ত সেস্থানটিকে পুণ্যপীঠ বলিয়া গণ্য করেন।

অপ্পর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি সিদ্ধ পুরুষ—এ যুগের প্রহ্লাদ। আপনি এবার তাঁকে মুক্তি দিন, সমবেত জনগণের সন্তুষ্টি বিধান করুন।”

দুই দুইবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপ্পর অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাইয়াছেন। পাণ্ড্যরাজের মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়া আসিয়াছে। অপ্পরকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, “অপ্পর, আমি বুঝতে পারছি, কোন বিরাট শক্তি দ্বারা তুমি রক্ষিত। প্রকৃত ব্যাপারটি কি তুমি আমায় খুলে বলো।”

উদ্ধারকর্তা ইষ্টদেব শিবের কথা স্মরণ করিতেই সাধক অপ্পর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। নয়ন দুটি তাঁহার নিমীলিত, আননে দিব্য জ্যোতির আভা, কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। যুক্তকরে গাহিয়া উঠেন স্বরচিত শিবমহিমার স্তবগাথা :

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালা
গলায় পরেছেন আমার প্রভু দেবাদিদেব,
সৃষ্টি আর প্রলয়ের লহরী লীলায় -
কখনো মঙ্গলময় শিবরূপে, কখনো রুদ্ররূপে
নিজেকে করছেন তিনি বিলসিত।
এই আদি অন্তহীন বিভুকে
কি ক'রে করবো ধারণ
ক্ষুদ্র মানুষের এই অন্তর পটে ?
কি ক'রেই বা পাবো উদ্ধার
ভয়াল মৃত্যু আর বিনষ্টির হাত থেকে ?
মূর্খ আমরা, তাই অভিমানের প্রাচীর গ'ড়ে
ঠেকিয়ে রেখেছি শিবের ত্রিনয়নের জ্যোতি,
সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছি দূরে সরিয়ে।
আত্ম-অভিমানের সে প্রাচীর গুঁড়িয়ে দাও
এগিয়ে চলো দৈন্য আর একান্ত শরণের সাধনায়,
প্রভুর কিঙ্কর আর সেবক রূপে
দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে।

তবেই তো হবে প্রভুর করুণা সম্পাত,
তবেই তো প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাৎ।
কল্যাণ আর অমৃতের ধারা
তবেই তো পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে।
(তেবরম্)

এই দিব্য ভাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানো ইষ্টস্তোত্রের মধু-ঝঙ্কার পাণ্ড্যরাজকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অপ্পরের পদতলে তিনি লুটাইয়া পড়েন, ব্যাকুল কণ্ঠে মাগেন তাঁহার কৃপা ও আশ্রয়।

শৈবসাধক অপ্পরের কাছে রাজা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, ইহার ফলে সারা তামিলদেশে দেখা দেয় শৈব সাধনা ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। মাদুরা, কাঞ্চী ও চিদম্বরমের মন্দির ও ধর্ম্মসভাগুলিতে শিবভক্ত সন্ন্যাসী ও আচার্য্যদের প্রাধান্য এবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

রাজগুরু অপ্পরকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হয় নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। কিন্তু এ আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যুক্তকরে কহেন, "আমি শিবের দাস, শিব-কৃপার দীন ভিখারী। আমার জীবনের একমাত্র ব্রত স্বহস্তে ইষ্ট বিগ্রহের সেবা পূজা করা, আর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া তাঁর মাহাত্ম্যের কথা। শিবের দাসত্ব ক'রে শিবের কৃপা যেন মর্ত্ত্যধামে নামিয়ে আনতে পারি, এই আশীর্ব্বাদই আপনারা আমায় করুন।"

সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যিনি, রাজগুরুরূপে লোক-গুরুরূপে সর্ব্বত্র যিনি পূজ্য, এ কি অদ্ভুত দৈন্যময় আচরণ তাঁহার। এককালি জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড তাঁহার কোমরে জড়ানো, হাতে একটি ঝুড়ি আর খুরপি। এই বেশে অপ্পর দেশের নানা শৈব তীর্থ ও জনপদে ঘুরিয়া বেড়ান। সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মার্জ্জনী হস্তে শত শত ভক্ত। শিব মন্দিরের আগাছা ও ময়লা সযত্নে তাঁহারা পরিষ্কার করেন। ধৌত করেন আঙিনা ও পয়ঃপ্রণালীর যত কিছু পূতিগন্ধময় জঞ্জাল। এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মন্দির-অঙ্গনে গীত হইতে থাকে অপ্পরের ভক্তিরসাত্মক শিব-ভজন ও শিবস্তুতি। ত্যাগ

তিতিক্ষা ও নিরভিমানতার মূর্ত্ত বিগ্রহ মহাপুরুষ অপ্পর যে মন্দিরে যে সাধনপীঠে উপস্থিত হন, সহস্র লোকের ভীড় জমিয়া উঠে। তাঁহার প্রচারিত দাসমার্গীয় শৈব সাধনার উঠে জয় জয়কার।

এমনি এক পদযাত্রার কালে, চিদম্বরমের শৈবপীঠে অপ্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে শিবভক্তি-সিদ্ধ কিশোর সাধক 'জ্ঞানসম্বন্ধর'-এর। সম্বন্ধর নামে জনসাধারণের মধ্যে এই সাধক পরিচিত; উভয়ের এই সাক্ষাতের ফলে তামিলদেশের শৈব আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভক্ত সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় নূতনতর চেতনায়।

মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া অপ্পর সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছা ও ময়লা নিষ্কাশন করিতেছেন, শত শত অনুগামীর কণ্ঠে উদ্‌গীত হইতেছে শিব মহিমার স্তুতি গান। এমন সময়ে ভক্ত-প্রবর সম্বন্ধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। শিব-চেতনায় সদা আবিষ্ট, সিদ্ধ মহাত্মা অপ্পরকে দর্শন করা মাত্র ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপিত হন, ছুটিয়া গিয়া লুটাইয়া পড়েন তাঁহার চরণতলে। আকুল কণ্ঠ হইতে বার বার উচ্চারিত হইতে থাকে, অপ্পর—অপ্পর।[১]

ভূমিতল হইতে সম্বন্ধরকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া অপ্পর তাঁহাকে আবদ্ধ করেন নিবিড় আলিঙ্গনে। দুই প্রসিদ্ধ শিবভক্তের মিলনে মন্দির-চত্বরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া যায়।

বয়সে কিশোর হইলেও সম্বন্ধর ছিলেন এক ভক্তিসিদ্ধ সাধক; তিনি ছিলেন কৃপাসিদ্ধ। কথিত আছে, হরপার্ব্বতীর কৃপার ধারা বালক বয়সেই তাঁহার উপর বর্ষিত হয় এবং বালক বয়স হইতেই তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগবিভূতি। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার অলৌকিক সিদ্ধির প্রসিদ্ধি স্থানীয় শৈব ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

সম্বন্ধর তখন নিতান্ত বালক। পিতার সঙ্গে গ্রামের উপান্তে

১ তামিল শব্দ অপ্পর-এর অর্থ—পিতা। প্রথম জীবনে সাধক অপ্পর ভক্ত সমাজে পরিচিত ছিলেন তিরুণাবুক্করসু নামে। জনশ্রুতি আছে, চিদম্বরমে সাক্ষাতের কালে কিশোর সাধক সম্বন্ধর ভাবাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে অপ্পর বলিয়া ডাকিয়া উঠেন। উত্তরকালে ভক্ত সমাজে এই অপ্পর নামই প্রচলিত হয়।

শিব মন্দিরে সেদিন বেড়াইতে গিয়াছেন। স্নান-তর্পণ সমাপন করিয়া পূজায় বসিতে হইবে, পিতা তাই পবিত্র কুণ্ডের জলে দাঁড়াইয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর পুত্র রহিয়াছেন তীরে দণ্ডায়মান। হঠাৎ দেখা গেল, বালক পুত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দুই চোখ রক্তবর্ণ, দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, গদ্‌গদ স্বরে বার বার সে বলিতেছে, "ঐ যে বাবা, আর ঐ যে আমার মা। বাবা—মা, বাবা—মা।" বার বার ব্যগ্রভাবে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে শিব মন্দিরের চূড়ার দিকে!

পিতা তো মহা সন্ত্রস্ত। তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। পুত্র কি কোন কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে? অথবা বিষাক্ত কিছু খাইয়া আবোল-তাবোল বকিতেছে?

লক্ষ্য করিলেন, তাহার গালের দুই কস্ বাহিয়া দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িতেছে। "কোথায় কি খেয়েছিস্ ঠিক ক'রে বল। ওরে শিগ্‌গীর বল্।"—পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন।

পুত্র এবার কিছুটা স্থির হয়, বাহ্যজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। ক্ষীণ কণ্ঠে জানায়, এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কুণ্ডের তীরে সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখে—মন্দির শীর্ষে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে হরপার্ব্বতী হইয়াছেন আবির্ভূত। কৃপাময়ী মা পার্ব্বতী দুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাঁড় হাতে নিয়া নীচে নামিয়া আসেন, স্নেহভরে বালককে উহা পান করান। সেই দুগ্ধেরই চিহ্ন এখনো রহিয়াছে তাহার মুখে।

হরপার্ব্বতীর দিব্য মূর্ত্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়া যায়। কিন্তু যে অহেতুক কৃপার ধারা এই বালকের প্রতি বর্ষিত হয় তাহার ফলে অলৌকিক জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতির।

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু স্নানার্থী ও ভক্তের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হর-পার্ব্বতীর আশিস্-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি করিতে থাকে তাহার স্বরচিত অপরূপ শিবস্তুতি। চারিদিকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এই

কৃপাসিদ্ধ বালকের বিস্ময়কর কাহিনী। বালককালেই শিবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই ভক্তসমাজ এই বালকের নামকরণ করেন—'জ্ঞানসম্বন্ধর' অর্থাৎ, দিব্যজ্ঞানের সহিত যিনি রহিয়াছেন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত।

সম্বন্ধর যেমন অপ্পরকে পিতারূপে গ্রহণ করেন, তেমনি অপ্পরও তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই ভক্তিসিদ্ধ শৈবসাধক এক নিগূঢ় আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধর্ম্মের উজ্জীবনে একযোগে প্রচার কর্ম্ম শুরু করেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যুক্তভাবে এই দুই মহাত্মা পরিব্রাজন করিতেন, আর শত শত ভক্ত নরনারী করিত তাঁহাদের অনুসরণ।

ইষ্টদেব শিবকে সাধক অপ্পর আরাধনা করিতেন কিঙ্কররূপে, আর সম্বন্ধর-এর দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পিতারূপে। পৃথক দৃষ্টি-কোণ হইতে ইষ্ট-আরাধনায় উভয়ে রত থাকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও শরণাগতির দিক দিয়া তাঁহারা ছিলেন একই সাধনপথের সহযাত্রী। সিদ্ধ শৈবাচার্য্য হিসাবে অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর জীবনে যে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগ-বিভূতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে দেশের অগণিত শিবভক্ত নরনারীকে। অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর রচিত শিব-মহিমার শত শত স্তবগাথা আজও তামিলদেশের সাধকেরা পথে-প্রান্তরে মঠে-মন্দিরে গাহিয়া বেড়ান, ভক্তহৃদয়ে শিবভক্তির প্লাবন বহিয়া যায়।[১]

সে-বার ভক্তপ্রবর জ্ঞানসম্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অন্যত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন। মহাত্মা অপ্পর স্থির করিলেন, কিছুদিন তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগূঢ় সাধনায় থাকিবেন নিমজ্জিত। পরিব্রাজনের পথে পড়িল তিরুপ্পুগালুর-এর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির ও সাধনপীঠ। এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১ তেবরম্ গ্রন্থে অপ্পর-এর রচিত বহু দিব্যভাবের উদ্দীপক স্তবগাথা সংকলিত হইয়াছে; এই স্তবসমূহের সংখ্যা তিন শতাধিক।

অপ্পরের নব ধর্ম্মপ্রচার ও সিদ্ধপুরুষরূপে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা একদল বিরোধী লোকের সহ্য হয় নাই। তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য দুষ্টেরা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। তিরুপ্পুগালুর-এ অপ্পর যখন নিভৃতে বাস করিতেছেন, তখন তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

রাত্রিকালে কয়েকটি সুন্দরী ভ্রষ্টা নারীকে তাহারা পাঠাইয়া দেয় অপ্পরের কাছে, প্রচুর ধনরত্নের প্রলোভনও তাঁহাকে দেখানো হয়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক অপ্পরকে প্রলুব্ধ ও বশীভূত করা দূরের কথা, এই নারীরাই তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ে, চরণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষমা প্রার্থনা।

চক্রান্তকারীরাও অনুতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে অপ্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকালে তাহারা পরিচিত হইয়া উঠে।[১]

দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচার্য্যদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। ভক্তদের মতে, পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ঋষি ছিলেন শৈব সাধনার প্রধান ধারক ও বাহক। তামিল দেশীয় পুরাণে শিব ও মুরুগ-এর (সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়) সিদ্ধ সাধক অগস্ত্য সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিক যুগে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে, পাণ্ড্য রাজসভার আচার্য্য শৈব সাধক নক্কির-এর প্রভাব প্রতিপত্তির নানা তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী রাজা কন্নপ এক সিদ্ধ শিব-ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, কন্নপ এক সময়ে ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া ইষ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পরূপে অর্ঘ্য প্রদান করেন তাঁহার নিজের একটি চক্ষু। অপর চক্ষুটিও উৎপাটন করিতে যাইবেন এমন সময়ে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন তাঁহার সম্মুখে। প্রভুর বরে ভক্ত-প্রবর লাভ করেন পরম দিব্যলোক দর্শনের শক্তি।

---

১ কালচারাল্ হেরিটেজ—শৈব সেইন্ট্স্ : এস. এস. পিল্লেই

পঞ্চম শতকে তামিলদেশে আবির্ভূত হন প্রখ্যাত শৈবযোগী তিরুমূলার। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক যোগবিভূতির নানা কাহিনী দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। জনশ্রুতি আছে, পরকায় প্রবেশের শক্তি ছিল তিরুমূলার-এর। এক শুদ্ধসত্ত্ব রাখাল বালকের মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ সরল ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মহিমার স্তব-গাথা। তিরুমূলার-এর জীবন ও বাণী শিবতত্ত্ব ও শৈব ধ্যান-ধারণাকে দেশের দিক্‌বিদিকে বিস্তারিত করে।

পরবর্ত্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধনা ও ধর্ম্ম-আন্দোলন সুসম্বদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে চারিটি প্রধান শৈবাচার্য্যের মাধ্যমে। মাণিক্যবাচক, অপ্পর (তিরুণাবুক্করসু), জ্ঞানসম্বন্ধর, এবং সুন্দরমূর্ত্তি যথাক্রমে প্রচার করেন শিবসাধনার চারিটি পৃথক পৃথক পন্থা—জ্ঞান, চর্য্যা, ক্রিয়া ও যোগ। এই পন্থাগুলি সন্মার্গ, দাসমার্গ, সৎপুত্র মার্গ ও সহমার্গ নামেও শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছে।

সিদ্ধ শৈব সাধক আচার্য্যপ্রবর অপ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। তাঁহার মতে, 'দেবাদিদেব শিব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েব নিয়ন্তা, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই একমাত্র প্রভু। জীব তাঁহার নিত্যদাস। আত্মঅভিমান ত্যাগ করিয়া দাস রূপে তাঁহার সেবা করো, একান্ত শরণ নিয়া তাঁহার চরণে তনু মন প্রাণ করো উৎসর্গ, তবেই লাভ করবে বহু প্রার্থিত পরমা মুক্তি।'

অপ্পরের এই দাসমার্গীয় শৈবধর্ম্ম শুধু তামিলদেশেই নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দ্রুত প্রসার লাভ করে। পাণ্ড্যরাজ মহেন্দ্র ছিলেন তাঁহার অনুগত শিষ্য। কাঞ্চী মাদুরা চিদম্বরম প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের শাস্ত্রবিদ্‌পণ্ডিতেরাও মহাত্মা অপ্পরের শিব ভক্তির আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শহরে জনপদে যেখানেই যাওয়া যাইত, শত শত ভক্ত গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শুনা যাইত এই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপালীলার নানা অলৌকিক

কাহিনী। মন্দিরে মন্দিরে পথে-প্রান্তরে গীত হইত তাঁহার রসমধুর শিবগাথা।

সিদ্ধ জীবনের লীলা, পরিব্রাজন ও শিবমহিমার প্রচার এবার শেষ অধ্যায়ে আসিয়া পড়ে, মহাত্মা অপ্পর এবার উৎসুক হন ইষ্টদেব শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্য। প্রবীণ সিদ্ধপুরুষের স্তবগাথায় বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে "প্রভু, এবার তোমার কিঙ্করকে কৃপা ক'রে টেনে নাও তোমার জ্যোতির্লোকে, পরমা মুক্তির মহাসাগরে করো তাকে নিমজ্জিত।

ইষ্টদেব মহেশ্বর সেদিন আবির্ভূত হন। অপ্পরের নয়ন সমক্ষে, আর্ত্তি ও প্রার্থনার উত্তরে বলেন, -'তথাস্তু'।

৬৮০ খৃষ্টাব্দে একাশী বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় শৈবাচার্য্যের নরলীলায় ছেদ পড়িয়া যায়, চির ইপ্সিত শিবধামে ঘটে তাঁহার মহা উত্তরণ।

অদ্বৈত আচার্য্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রাক্‌কাল পূর্ব্ব-নবদ্বীপ তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের তখন মহাপ্রতাপ। বিদ্যাগর্ব্বী পণ্ডিতেরা আপন অহমিকা নিয়া মত্ত, ন্যায়ের কচ্‌কচি আর কুটতর্কের ভীড়ে ভক্ত বৈষ্ণবের দল কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে। প্রেমভক্তির কথা উত্থাপন করিলে, নৃত্য কীর্ত্তন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হইতে হয়। এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত।

অসাধারণ শাস্ত্রবেত্তা এই আচার্য্য। পাণ্ডিত্যের সাথে তাঁহার জীবন পাত্রে আসিয়া মিশিয়াছে প্রেমভক্তির অপরূপ সুধা—বহু বৎসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে তাঁহার জীবনে উপজিত হইয়াছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। সেদিনকার দিনে ভক্ত সাধক অদ্বৈত আচার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন বৈষ্ণবদের প্রবীণতম নেতা, তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ও ভরসাস্থল।

কখনো শান্তিপুরে, কখনো বা নবদ্বীপে নিয়মিতভাবে আচার্য্যের ধর্ম্মসভা বসে। গৌরকান্তি, শ্মশ্রুগুম্ফ-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাঁহার ক্ষুদ্র ভক্ত সভাটিতে বসিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতা ও ভাগবতের শ্লোক। দুই নয়ন তাঁহার ভক্তিরসে ছলছল হইয়া উঠে, ভক্ত শ্রোতাদের অন্তরে জাগে দিব্য শিহরণ।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ অদ্বৈত প্রভু তাঁহার সাধ্যমত প্রদান করেন। সারগর্ভ ব্যাখ্যা ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভক্তির শুচিশুভ্র কুসুম ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সারা দেশ যে এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি করেন, এসময়ে তাঁহার এই ক্ষীণকায়া ভক্তি স্রোতের ধারায় তো ঈশ্বরবিমুখ

মানুষের দল উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন্য চাই প্রেমভক্তির বেগবতী ভক্তিগঙ্গা-ধারা—আর চাই সেই ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার মত এক নব ভগীরথ।

হৃদয়ে দিনের পর দিন আর্ত্তি জাগে, কোথায় সে মহাশক্তিধর যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ? কবে ঘটিবে তাঁহার মহা আবির্ভাব? তিল তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য ভক্তিভরে দিনের পর দিন এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সারা ভুবনের মঙ্গলের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিক্ত করেন বিষ্ণুঘরের মৃত্তিকা।

জনকয়েক বৈষ্ণব ভক্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য্য সেদিন বসিয়া আছেন। পবিত্র ভাগবতের মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা চলিতেছে, এমন সময় এক ভক্ত সুসংবাদ জানাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বড় আশ্চর্য্যের কথা---জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে এসেছে এক পরম বৈষ্ণবরূপে। এ যেন এক নূতন মানুষ। পাণ্ডিত্যের অহমিকা কোথায় ভেসে গিয়েছে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। প্রভু! এ দিব্য উন্মত্ততার ছোঁয়াচও কম নয়। যে তাকে একবার দেখছে, তার আকুল ক্রন্দন শুনছে, সেই হয়ে পড়ছে অভিভূত ও ভাববিহ্বল। তরুণ অধ্যাপক নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকাবার শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে নবদ্বীপে।"

আচার্য্য বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, চোখ দুইটি উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "ভাই, তোমাদের কথা সত্য হোক, আশা ফলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আমি করছি।"

কিছুক্ষণ মৌনী থাকায় পর আবার তিনি স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তা হলে একটি গোপন কথা তোমাদের ভেঙে বলছি,—কাল শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম, গীতার একটি বিশেষ শ্লোকের নিহিতার্থ বুঝতে না পেরে সেদিন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তাই উপবাসী থেকে এই শ্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম। রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখলাম, তোমাদের ঐ নিমাই আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। ডেকে বলছে—আচার্য্য তুমি আর মনে দুঃখ ক'রো না,

ওঠো।” কি অদ্ভুত ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে গীতার শ্লোকের অর্থটিও উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।”

‘মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হলো এক অপূর্ব্ব পুলকস্রোত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে আগে আমি মাঝে মাঝে দেখেছি—তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই সে আসতো আমার গৃহে। সে অনেক দিন আগের কথা। যাক্, তোমাদের সংবাদ বড়ই শুভ। দেখা যাক্ শ্রীভগবান এই মহাবৈষ্ণবের ভেতর দিয়ে তাঁর কোন্ লীলানাট্যের সূত্রপাত করতে চাচ্ছেন।”

এ নাট্যলীলা অনুষ্ঠিত হইতে দেরী হয় নাই। অচিরে নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেন ভক্তি-প্রেমের এক রসময় বিগ্রহরূপে, ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণনামের ধারায় সারা দেশ তিনি প্লাবিত করেন, আর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্য্যকে করেন তিনি আত্মসাৎ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান পার্ষদরূপে, লীলানাট্যের অন্যতম সূত্রধাররূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে অদ্বৈত প্রভুর যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দেরই পরবর্ত্তী। চৈতন্য ভাগবত নিতাই ও অদ্বৈতকে অভিহিত করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের দুই বাহু রূপে। অদ্বৈতের প্রতি ভক্ত মানবের ঋণের কথা জানাইতে গিয়া ভক্তকবি বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন, “যার ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার।”

চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাপ্রভু—আর প্রভু হইতেছেন দুইটি—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। আর কোন চৈতন্যপার্ষদ এই প্রভুত্বের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য্য।

চৈতন্য-পার্ষদ অদ্বৈত ভক্তদের 'প্রভু', মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃষ্ণ-ভক্তিদাতা। তাছাড়া, আরও একটা বিশেষ মর্য্যাদা তাঁহার আছে। অদ্বৈত হইতেছেন সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তরঙ্গ শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে গয়াধামে যে মন্ত্র শ্রীচৈতন্য প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় এক পরম রূপান্তর। তাই মাধবেন্দ্র-শিষ্য এই আচার্যকে শ্রীচৈতন্য জ্ঞান করিতেন গুরুর মত। সুযোগ পাইলেই অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া সবাইর সম্মুখে দিতেন তাঁহাকে অসীম মর্য্যাদা। চৈতন্য চরণাশ্রিত বৃদ্ধ বৈষ্ণব চৈতন্যের এই ভক্তির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। কোন বাদ-প্রতিবাদে ফল হইত না। লৌকিক লীলায় মহাপ্রভু কোন সময়েই ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ও লৌকিক আচার-আচরণের মর্য্যাদা রক্ষায় ত্রুটি করিতেন না, তাই অদ্বৈতের প্রতি ভক্তি নিবেদনের বেলায়ও তাঁহাকে কখনো নিরস্ত করা যায় নাই।

শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতের পারস্পারিক সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর, বড় অন্তরঙ্গ। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের স্বরূপটি মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে--

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্য গোসাঞিকে প্রভু গুরু করি মানে।
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন।
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান।

সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের এই প্রবীণ প্রতিভাধর নেতা, মহাপ্রভুর অন্যতম এই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, অদ্বৈত আচার্য্যের জন্ম শ্রীহট্টে। বর্ত্তমানের সুনামগঞ্জ মহকুমা অঞ্চল তৎকালে ছিল লাউড় পরগণা নামে পরিচিত। এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত নবগ্রামে আনুমানিক ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন।[১]

---

১ অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে অদ্বৈত আচার্য্য ছিলেন বাহান্ন বৎসর বয়স্ক। চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে।

পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যরূপে তাঁহার তখন যথেষ্ট খ্যাতি। বংশের গৌরব ও ঐতিহ্যও কম নয়। স্বনামধন্য নৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ। পাঠান যুগের গৌড়ীয় হিন্দু রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়া নৃসিংহ নাড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধির দিক দিয়া তাঁহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানীতে তখন খুব কমই ছিল।

কুবের আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী লাভা দেবীর বড় দুঃখ, পর পর তাঁহাদের কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একটিও জীবিত রহে নাই। আর যে কোন পুত্রসন্তান জন্মিবে সে আশাও নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না? মৃত্যুর পর পুত্রসন্তানের পিণ্ডও পাওয়া যাইবে না? এই সব ভাবিয়া স্বামী স্ত্রী কাহারো মনে শান্তি নাই, সংসার-কর্ম্মেও দিন দিন বড় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই বৈরাগ্যপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন তাঁহারা লাউড ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন।

পতি-পত্নী উভয়ে এবার স্থির করিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিবেন, ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে পূজা, ব্রত প্রভৃতি উদ্‌যাপন করিবেন।

নূতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর লাভা দেবী সন্তান-সম্ভবা হন। কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠে। ইতিমধ্যে রাজসভার আহ্বানও আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত আনন্দিত মনে সস্ত্রীক আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

মাঘী সপ্তমীর পুণ্যতিথিতে এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা নাই। নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ।

বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপূর্ব্ব ভক্তিপরায়ণতা। সহজাত ধর্ম্ম-সংস্কার নিয়াই সে জন্ম নিয়াছে। নিবেদিত বস্তু ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে আহার করানো যায় না।

দেব পূজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন নারায়ণ শিলা অর্চ্চনা করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়া সেখানে সে বসিয়া থাকে, দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু।

কুবের তর্কপঞ্চানন লক্ষ্য করেন, ছেলে তাঁহার শ্রুতিধর। এই সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির। বুঝিলেন, বালক উত্তরকালে শাস্ত্রপারঙ্গম হইবে, বংশগত ঐতিহ্যের ধারাটিও সে বজায় রাখিতে পারিবে।

কমলাক্ষের বয়স তখন বারো বৎসর। অধ্যয়নের জন্য পিতা তাঁহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর এই কিশোর শিক্ষার্থী। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি এবং ষড়্দর্শনের পাঠ সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট্ট হইতে চলিয়া আসেন। এখন হইতে পুত্রের সহিত একত্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। নব্বই বৎসর বয়সে পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন মরদেহ ত্যাগ করিয়া যান এবং কিছুদিন পরে মাতা লাভা দেবীরও লোকান্তর ঘটে।

পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগ্যের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। স্থির করিলেন, অবিলম্বে গয়াধামে গিয়া জনক-জননীর উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণতি জানাইয়া বাহির হইবেন তীর্থ পর্য্যটনে।

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে তাঁহার তরুণ জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিমার্গীয় সাধনার মধ্য দিয়া পরম প্রাপ্তি তাঁহার ঘটিবে, এ সঙ্কল্পই এতকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য নিষ্ঠাভরে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া সাধন-ভজনে রত থাকিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াও নিয়াছেন।

গয়ার কার্য্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলেন, অন্তরে জাগরূক রহিল জীবনতরীর কাণ্ডারী সদ্‌গুরুর সন্ধান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তিনি একদল মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধর্ম্মসভায় আসিয়া উপস্থিত। নারদীয় সূত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেখানে চলিতেছে। এই ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্ত্বিক ভাববিকার।

দাক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্ন্যাসী, ভক্তিরসের পরম রসিক, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তখন এই মণ্ডলীতে উপস্থিত। নবাগত ভক্ত কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া পুরী মহারাজ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। অপার করুণা ঝরিয়া পড়িল এই তরুণ ভক্তের উপর। অদ্বৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিলন দৃশ্যের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।
তাহা দেখিয়া মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী
কহে ইঁহো ভক্তিবর্ম্মে উত্তমাধিকারী।
সামান্য জীবেতে না হয় শুদ্ধা প্রেমভক্তি।
চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তার স্থিতি।
শুদ্ধ প্রেমাসব ইঁহো করিয়াছে পান।
অন্তর্নিত্যানন্দ ইঁহার নাহি বাহ্যজ্ঞান।
ইঁহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ।
জগতে তারিতে বুঝোঁ হৈলা প্রকটন।

ভক্ত সাধুদের উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনি বারম্বার শ্রবণের পর কমলাক্ষ আচার্য্য সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ; দুই নয়নে তাঁহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। প্রসন্ন মনে ভাববিহ্বল তরুণ পণ্ডিতের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন।

কমলাক্ষ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন। মিনতি করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন পেলাম। সবাই জানে, আপনি ভক্তত্রাতা, এ যুগের ভক্তিকল্পবৃক্ষ।

আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধন্য করুন, আমায় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিন।”

পুরী মহারাজ সম্মতি দিলেন। কমলাক্ষ আচার্য্যের জীবনে দেখা দিল এবার সদ্‌গুরু কৃপার অরুণোদয়, জীবন তাঁহার নবরাগের বর্ণচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। দীক্ষা ও প্রেমভক্তিতত্ত্বের উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাঁহার নব রূপান্তর।

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজের সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার বিদায় গ্রহণের পালা। কমলাক্ষ স্বভাবতঃই মানবপ্রেমিক, লোকমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সহজাত। করুণ কণ্ঠে সদ্‌গুরুর কাছে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে আদর্শহীন, ধর্ম্মহীন। সর্ব্ব দিক দিয়ে তারা নীতিভ্রষ্ট। ভুবনমঙ্গল হরিনাম, কৃষ্ণনাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা ক'রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি ক'বে তারা উদ্ধার পাবে।”

পুরী মহারাজের আননে খেলিয়া যায় স্মিত হাসি। মধুর কণ্ঠে কহেন, “কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর আবির্ভাব চাই। তা নইলে তো চলবে না। তুমি মহাভক্ত। জীবের কল্যাণ সাধনের এষণা যেমন তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে ঐশী শক্তির প্রকাশ। শ্রীভগবান্‌কে ডাকবার, তাঁকে জাগ্রত করবার ভার তুমিই আজ থেকে নাও বৎস।”

সদ্‌গুরুর এ নির্দ্দেশ কমলাক্ষ আচার্য্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে গাঁথা হইয়া যায়। ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থ দর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থল তিনি দর্শন করেন আর হৃদয়ে তাঁহার অপার আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভক্তবর কখনো ভাবাবেশে শুরু করেন উদ্দণ্ড নর্ত্তন কীর্ত্তন,

কখনো বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, কোন হুঁস নাই।

সেদিন তিনি গিরিগোবর্দ্ধনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তরে বহিয়া চলিয়াছে দিব্য আনন্দের প্রবাহ। পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন।

সারাদিন পাগলের মত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; এবার রাত্রি সমাগত। চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত দেহে আচার্য্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছেন। অল্পকাল মধ্যে দুই চোখে নামিয়া আসিল গভীর নিদ্রা।

এ সময়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দর্শন করিলেন।—শিখিপুচ্ছধারী মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাঁহার ভুবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কহিতেছেন, "আচার্য্য, জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা। যথাসাধ্য ভক্তিতত্ত্বের প্রচার তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করো। আর এই সঙ্গে করো লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন। আর শোন, তোমায় আমি একটা নিগূঢ় সংবাদ দিচ্ছি। আমার এক দিব্যমূর্ত্তি দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে, যমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে। আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে —মদনমোহন। দ্বাপরে কুব্জা আমার এই মূর্ত্তির সেবা করেছে। আজো বিগ্রহ যমুনা তটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুমি এর উদ্ধার সাধন করো, সেবার প্রবর্ত্তন করো।"

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্য্যের আর ঘুম হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সোৎসাহে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শুনিয়া লোকজন জুটিতে দেরী হয় নাই। কোদাল শাবল নিয়া গ্রামবাসীরা দলে দলে দ্বাদশ আদিত্য তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল।

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় এক পরম মনোহর কৃষ্ণমূর্ত্তি। ললিত ত্রিভঙ্গঠামে উহা দাঁড়াইয়া

আছে। স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি হাতে পাইয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হন। অতঃপর একটি ভক্তিমান্ সদাচারী ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের সেবার ভার দিয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান।

প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই। অদ্বৈত আচার্য্যকে এবার তিনি এক নতুন খেলা দেখাইতে শুরু করিলেন।

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাণ্ডব। স্বপ্নলব্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আচার্য্য বৃন্দাবনে আসিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যায়।

ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই বিগ্রহকে তোলা হইয়াছে; তাই এটির দর্শনের জন্য সর্ব্বদাই জনতার ভীড় লাগিয়াই থাকে। একদল দুষ্টস্বভাব পাঠানের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা সমারোহ ও জনসংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই। একদিন দল বাঁধিয়া তাহারা মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে। এটির মর্য্যাদা হানি করা ও ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর।

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত করেন। পাঠানেরা কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তো সেখানে নাই। কে যেন তড়িৎ-বেগে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়া তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

নূতন পূজারী এতক্ষণ যমুনায় দাঁড়াইয়া স্নান-তর্পণে রত ছিলেন। পাঠানদের হামলার কথা শুনিয়া ত্রস্তব্যস্তে কুটিরে গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত বিগ্রহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা এটি অপবিত্র করিয়া এবং জল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। খেদের তাঁহার আর সীমা রহিল না, হায়-হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সংবাদ শুনিয়া আচার্য্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা। অস্নাত অভুক্ত অবস্থায়

চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্তু হারানো বিগ্রহের কোন সন্ধানই মিলিল না।

রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্য্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। স্বপ্ন-যোগে আবার মিলিল শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ। মধুর কণ্ঠে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে আচার্য্য, কেন শুধু শুধু তুমি খেদ করছো, আর এমন ক'রে ভেবে মরছো? আমায় তো পাঠানেরা ভেঙে ফেলে নি, অপসারিতও করে নি। আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই দুষ্টু ব্রজের গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল-বাগান আছে, তারই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি। ওখান থেকে আমায় তুলে নিয়ে এসো। আর শোন, এখন থেকে আমার এই দুষ্টু গোপাল-লীলার স্মৃতিই এখানে জাগরূক থাক্, আর আমার এ বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদ্‌লে দাও তুমি।"

আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনি পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়া যান। কিছুটা অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদন-গোপালরূপে ইঁহার সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

ঠাকুর কিন্তু শীঘ্রই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন। আবার একদিন কমলাক্ষের উপর স্বপ্নাদেশ হইল, "আচার্য্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, সেখানটা তেমন সুরক্ষিত নয়। ম্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশঙ্কা আছে। তুমি এক কাজ করো। মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী দু'একদিন মধ্যে এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো। তাহলে আমার সেবা-পূজার কোন বিঘ্ন আর হবে না।"

আচার্য্যকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর আরো কহিলেন, "বৎস, তুমি খেদ ক'রো না! এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তান্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকালের, তোমার মত মহাভক্তের মধ্য দিয়েই যে আমার লীলার পরিপুষ্টি। আরও শোন। আমার এক সুপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুঞ্জবনে সংগোপিত। শ্রীরাধার প্রিয় সখী

বিশাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল। এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও।”

পরদিনই মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদন-গোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হৃদয়েও পৌঁছিয়া গিয়াছে। আচার্য্যের কাছে আসিয়া দৈন্যভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। সাশ্রুনয়নে আচার্য্য প্রাণ-প্রিয় শ্রীবিগ্রহ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন শান্তিপুরে। অর্চ্চনার জন্য সঙ্গে আনিলেন নিকুঞ্জবনের সেই পবিত্র চিত্রপট।

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইয়া কমলাক্ষের আনন্দের অবধি রহিল না।

বৃন্দাবন হইতে আনীত কৃষ্ণের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাঁহার দিব্য ভাবাবেশ। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর প্রিয় শিষ্য কমলাক্ষকে ডাকিয়া সেদিন এই নিগূঢ় উপদেশটি তিনি দিলেন:

পুরী কহে বাছা তুহুঁ শুদ্ধ প্রেমবান।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নির্ম্মাণ।
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয়।
অতএব যুগল সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।

(অদ্বৈত প্রকাশ)

বলা বাহুল্য, অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার গুরুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই যুগল ভজন শুরু করিয়াছিলেন। প্রাক্ চৈতন্য যুগের তাঁহার অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি রাধার এই যুগল উপাসনা অত্যল্পকাল পরে প্রভু চৈতন্যের মণ্ডলীকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাই আচার্য্যের সাধনজীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শান্তিপুর ত্যাগ করার পূর্ব্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী আরো একটি কথা বলিয়া গেলেন। কহিলেন, “বৎস, এবার তুমি বিবাহ ক’রে

সংসারাশ্রমী হও। সংসারে থেকে, কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করো, জীবের কল্যাণ সাধন করো।”

সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া পুরী মহারাজ শান্তিপুর হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে শুরু হয় কমলাক্ষের আচার্য্য জীবন। নিজ গৃহে শান্তিপুরে তিনি এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসেন। প্রতিভাধর বিদ্যার্থীর দল এই সাধক ও শাস্ত্রবেত্তার কাছে আসিয়া শরণ নেয়। তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলীও এ সময়ে এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকালে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব সাধনার ক্ষীণ ধারাটি বহিয়া চলিতে থাকে। তাই পরবর্ত্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের নায়কেরা এই পূর্ব্বসূরীর কাছে কম ঋণী নন।

কমলাক্ষ আচার্য্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্যামাদাস। আচার্য্যের সহিত তত্ত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া নত-শিরে তিনি তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্যামদাস এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচার্য্য। এখন হইতে কমলাক্ষ পণ্ডিত এই নূতন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

অদ্বৈতের অপর শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ। বৈষ্ণব-দীক্ষা প্রাপ্তির পর ইহার নূতন নাম হয় কৃষ্ণদাস। বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণদাস অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য যবন-হরিদাস আচার্য্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তরুণ হরিদাসের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনে সেদিন প্রেমভক্তির ঢল নামিয়াছে। হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় শান্তিপুরে অদ্বৈতের ধর্ম্মসভায় একদিন তিনি আসিয়া উপস্থিত। আচার্য্য প্রভুর নাম এবং সাধন-ঐশ্বর্য্যের কথা তিনি শুনিয়াছেন, মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের পথপ্রদর্শক রূপে।

কৃষ্ণপ্রেমরসে বিহ্বল, হরিদাস অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে থাকেন।

আচার্য্যের হৃদয় গলিয়া যায়। কে এই গৌরতনু চারু-দর্শন তরুণ ভক্ত, দর্শনমাত্রে যে প্রাণমন কাড়িয়া নেয়? সিদ্ধ সাধকের অপূর্ব্ব লক্ষণসমূহ তাঁহার চোখে মুখে। সারা দেহে ভক্তি-রসের লাবণ্য টলমল করিতেছে।

আগ্রহাকুল কণ্ঠে আচার্য্য প্রশ্ন করেন, "বৎস, কি নাম তোমার? কোথা থেকে তুমি আস্‌ছো?"

পদতলে পতিত তরুণ ভক্ত উত্তর দেন, "প্রভু, আমি ম্লেচ্ছাধম। আপনার শরণ নিতে এসেছি। কৃষ্ণভক্তি কি ক'রে পাবো, কৃপা ক'রে সেই উপদেশ আমায় দিন।"

পরম স্নেহভরে আচার্য্য-প্রভু নবাগত ভক্তকে বুকে তুলিয়া নেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া শুরু হয় হরিদাসের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন। আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য ভক্তি-তত্ত্ব তিনি আহরণ করেন, কীর্ত্তিত হন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

ভক্ত হরিদাস আর্ত্তি আর দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ; তাই একদিন আচার্য্যের কাছে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আপনার কৃপায় শাস্ত্র পাঠ, সাধনা, এসব তো করলাম। কিন্তু আমার মত জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কাজ নয়। আপনার কৃপা শক্তি ছাড়া তো এ কাজ সম্পন্ন হবে না! সেই কৃপাশক্তিই আজ প্রয়োগ করুন, নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোন উপায় নেই।"

অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন—

কহে, শুন বৎস ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ বাণী।
কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি।
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়।
সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাধিক হয়।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ যেই সেই নরাধম। (অদ্বৈত প্রকাশ)

জীবোদ্ধারের যে উদার সর্ব্বজনীন আহ্বান পরবর্ত্তীকালে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে গৌরসুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অদ্বৈতের মুখে শোনা গেল তাহারই পূর্ব্বাভাস।

অদ্বৈতের কাছে যবন হরিদাসের বৈষ্ণবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ এবার তাই শান্তিপুর ত্যাগ করিবেন ঠিক করিয়াছেন।

আচার্য্য তাঁহাকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "হরিদাস, তুমি নামমন্ত্রের মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুমি একান্ত ভাবে গ্রহণ করো, দিগ্‌বিদিকে পরমপ্রভুব নাম ছড়িয়ে দাও। গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ এই নির্দ্দেশই আমায় দিয়েছিলেন। তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নির্দ্দিষ্ট কর্‌ছি—

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম।
নামব্রহ্ম প্রচারিযা জীবে কর ত্রাণ।
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়।
নামাভাসে জীব মাত্রের ত্রিতাপ না রয।
নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খণ্ডয়!
নাম-চিন্তামণি-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
ব্রহ্মাণ্ডে সদ্বস্তু নাঞি নামের সমান।
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন।
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায প্রেমধন।"

বৈষ্ণব সাধক হরিদাসকে আচার্য্য প্রভু সন্ন্যাস দিলেন। মস্তক মুণ্ডন করাইয়া কটিতে পরাইয়া দেওয়া হইল কৌপীন-ডোর, গলায় তুলসীর মালা। শক্তি-সঞ্চারিত নামের বীজ আচার্য্য এই মহাভক্তের কর্ণে দিলেন।

হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা। টলিতে টলিতে গিয়া গঙ্গার মৃত্তিকা-গোফায় বসিয়া পড়িলেন। এখন হইতে তাঁহার নিত্যকার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ নাম জপ। অদ্বৈত আচার্য্যের অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূপে যেন দেখা দিলেন নামব্রহ্মের চারণ

যবন হরিদাস। আচার্য্য তাঁহার নাম দিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ভক্তির মহিমা ছড়াইয়া গিয়াছেন দিক্‌বিদিকে।

গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর নির্দ্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। অচিরে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটিয়া গেল।

নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ী এক ধর্ম্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহার দুইটি যমজ কন্যা—সীতা ও শ্রীরূপা। এই দুই কন্যাকে তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে সম্প্রদান করিলেন।

শান্তিপুরের পণ্ডিতসমাজে প্রতিভাধর অধ্যাপক অদ্বৈতের তখন বিরাট প্রতিষ্ঠা। বহু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী, বিশেষ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার। শিক্ষার্থীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ভীড় করিতেছে। উচ্চস্তরের বিষ্ণুভক্ত সাধক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি প্রচুর। ভক্তিমার্গের সাধন যাঁহারা লাভ করিতে চান তাঁহাদের অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্য্যের গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের খ্যাতিও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইতেছে।

ভক্তপ্রবর হরিদাস সেদিন শিক্ষাগুরু অদ্বৈতের সঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাই, হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া উঠে নূতন ভাবাবেগ নূতন উদ্দীপনা।

শান্তিপুরের ব্রাহ্মণেরা যবন-ভক্ত হরিদাসের আগমনের কথা জানিলেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথা তাঁহারা লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের কাছে হরিদাসের এই প্রতিষ্ঠা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকিল। ম্লেচ্ছ সাধককে নিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিতে তাঁহারা রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক অদ্বৈতকে বলিয়া দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে তাঁহাকে একঘরে করা হইবে।

ইতিমধ্যে শান্তিপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। স্থানীয় একজন ধনী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সেদিন পূজা-উৎসব চলিতেছে।

গ্রামের গণ্যমান্য শতাধিক ব্যক্তি আসিয়া সেখানে জুটিয়াছেন, আহারাদির যোগাড় হইতেছে। এমন সময় নিকটস্থ বৃক্ষমূলে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। অপূর্ব্ব তাহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে সিদ্ধ সাধকের দিব্য দ্যুতি। সন্ন্যাসী শুধু বাক্‌সিদ্ধই নয়, পরম কৃপালুও বটে। কাঁদিয়া কাটিয়া যে যাহা ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাই মিলিতেছে। পদধূলি মাখিয়াই কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়া গেল। বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার ভীড়।

উৎসব গৃহের কর্ম্মকর্ত্তারা ছুটিয়া আসিলেন। গললবস্ত্র হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু আজ এখানে আহারাদির ব্যবস্থা হয়েছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ছে আপনিও দয়া ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন।"

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "কিন্তু বাবা আমি তো অ-নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করিনে! বিষ্ণুর প্রসাদ যদি থাকে তবেই আহারে বসতে পারি।"

"বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ শিলা রয়েছেন। তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে আপনাকে ভোজ্যদ্রব্য এনে দিচ্ছি। পাতা দেওয়া হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে এসে বসুন।"

সন্ন্যাসী তখনো ভাবাবেশে মত্ত। ধীরে ধীরে ভোজনস্থানে গিয়া বসিলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আহার্য্য পরিবেশন করা হইল।

কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া কহিলেন, "একি হরিদাস তুমি এখানে! আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দেখ্‌ছি, তোমায় নিয়ে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে গেছেন! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড। এ আবার তোমার কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ?"

অদ্বৈতের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া হরিদাস কহিলেন, "প্রভু আমার দোষ নেবেন না। কৃষ্ণকৃপায় এই সজ্জনেরা আমায় আজ কি এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন জানিনে। আগ্রহ ক'রে এঁদের পঙ্‌ক্তি ভোজনের ভেতর এনে বসিয়েছেন।"

আচার্য্যের চরণতলে পড়িয়া হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। দুই চোখ বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, আর ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন আচার্য্যের স্তবগান। এক অপূর্ব্ব ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা সবাই নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সেদিনকার এ ঘটনায় বিশেষ করিয়া মহাভাগবত হরিদাসের ব্যক্তিত্বের এই ইন্দ্রজাল দর্শনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। এই সঙ্গে অদ্বৈতের মহিমাও তাহারা কিছুটা উপলব্ধি করিলেন। যবন হরিদাসের অলৌকিক কাহিনী তাঁহারা শুনিয়াছেন, আজ তাঁহার কিছুটা প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন। আচার্য্য অদ্বৈত হইতেছেন এই শক্তিধর নবীন বৈষ্ণবেরই এক প্রধান পথিপ্রদশক। এই আচার্য্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করার জন্য যাঁহারা চেষ্টিত ছিলেন তাঁহারা এবার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া নিলেন

ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের মহিমা সাধারণ মানুষে কি করিয়া বুঝিবে? এ মহিমা বুঝিয়াছিলেন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈত। তাই নিজের গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর প্রথম ভোজ্যপাত্র তিনি দিয়াছিলেন ভক্তি-সিদ্ধ এই যবন ভক্তকেই।

আচার্য্যের এ আচরণে হরিদাস সেদিন চমকিয়া উঠেন। যুক্ত-করে নিবেদন করেন, "সে কি প্রভু? এ শ্রাদ্ধপাত্রে যে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এ আপনি আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন কেন?"

প্রেমাশ্রু-ছলছল নেত্রে অদ্বৈত উত্তর দিলেন, "হরিদাস, আমার দৃষ্টিতে তুমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব। জানতো? প্রকৃত বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা বিহার করেন গোলকপতি। তোমার মত মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়া যে বহু ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমান। আমি তো এতে অন্যায় কিছু করি নি?"

যবন-সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সেদিন এক বৈপ্লবিক সৎসাহস প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন

তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও সাধন-মাহাত্ম্যের দিকে চাহিয়াই তাঁহার এই কার্য্যকে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়।

অদ্বৈত আচার্য্যের এই ঔদার্য্য ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্ত্তী-কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অদ্বৈতের নবদ্বীপস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জাঁকিয়া উঠে। গীতা ভাগবত, স্মৃতি প্রভৃতি রোজ তিনি সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ করান, আর নিশাযোগে পরমভক্ত হরিদাসের সঙ্গে স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাবেশে করেন নামকীর্ত্তন।

সুপণ্ডিত বিষ্ণুভক্ত, অদ্বৈত আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তেরা আচার্য্যের ধর্ম্মসভায় প্রায়ই উপস্থিত হন, কৃষ্ণকথায় আনন্দে কাল কাটাইয়া গৃহে ফিরিয়া যান।

দেশের চারিদিকে তখন ধর্ম্মের নামে নানা অনাচার ও অধর্ম্মের তাণ্ডব চলিয়াছে। পাষণ্ডীদের অত্যাচারে সমাজজীবন জর্জ্জরিত। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদেরই প্রতি যেন তাহাদের আক্রোশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

এ অবস্থা আর যেন সহ্য করা যায় না। ভক্ত হরিদাস এক একদিন সাশ্রুনয়নে আচার্য্যকে কহেন, "প্রভু, ধরণীর ভার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? শ্রীভগবান্‌কে প্রাণের আকুতি জানাচ্ছি-- তিনি কবে আসবেন? কবে ক'রবেন জীবের উদ্ধার সাধন?"

আচার্য্য সান্ত্বনা দেন, "হরিদাস, তুমি উতলা হ'য়ো না, তোমার মত আমিও যে দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী আর গঙ্গাজলে কৃষ্ণের আরাধনা ক'রছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে। ভেবো না, তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন।"

শ্রীবাস, শুক্লাম্বর, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার সভায় বসেন, পাষণ্ডীদের অনাচারের কথা বর্ণনা করেন। পরমাশ্রয়,

সর্ব্বজীবের উদ্ধারকর্ত্তার আবির্ভাব কবে হইবে বলিয়া ভক্তেরা খেদ জানান।

শুদ্ধাচারী মহাতেজস্বী আচার্য্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন। ভক্তদের সম্মুখে নিজের আশা ও সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করিয়া বলেন--

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখহ হেথাঞি।

(চৈতন্য ভাগবত)

'অদ্বৈত সিংহে'র হুঙ্কার, আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় বসিয়া নামকীর্ত্তন ও আর্ত্তির ফল অচিরেই ফলিল। নিজ গৃহের ধর্ম্মসভায় বসিয়া আচার্য্য সেদিন আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় জনৈক ভক্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর, তার্কিক বিদ্যাগর্ব্বী বিশ্বম্ভর, গয়াধাম হইতে এক মহাবৈষ্ণবে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়াছেন। অলৌকিক ভাব-প্রবাহ উচ্ছলিত তাঁহার সর্ব্বসত্তায়, দুর্লভ সাত্ত্বিক প্রেমবিকার স্ফুরিত তাঁহার সর্ব্বদেহে। সবাই বলাবলি করিতেছে, তবে কি এই তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আসন্ন ঐশী লীলার মহাপ্রকাশ ঘটিতে যাইতেছে?

অদ্বৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ তাঁহার তখন ভাবাবেগে কণ্টকিত, নয়ন দুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল। প্রাণে জাগিয়া উঠিল পরম আশ্বাস—তবে কি কৃষ্ণ এতদিনে কৃপা করিলেন? নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের এই তরুণ পুত্রের মধ্য দিয়াই কি তাঁহার আত্মপ্রকাশ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন্ আধারে কেমন করিয়া প্রকটিত হইতে চলিয়াছে।

যাই হোক, আচার্য্য ধৈর্য্য ধরিবেন, অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। পরমতমের আবির্ভাব যদি হইয়াই থাকে, তবে তাঁহাকে যে আচার্য্যের কাছে আসিতেই হইবে। তাঁহার দীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ আরাধনা, তাঁহার

তুলসীগঙ্গাজলসহ আর্ত্তি তো বিফল হইবার নয়। আবির্ভূত পুরুষকে আপনা হইতেই যে অদ্বৈতের আঙিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে।

সেদিন প্রভাতে আচার্য্য আঙিনার তুলসীতলায় পূজা বন্দনাদি করিতেছেন। কখনো গোলকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র নতি, কখনো বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হইয়া ছাড়িতেছেন প্রবল হুঙ্কার!

এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয়া বিশ্বম্ভর সেখানে উপস্থিত। আচার্য্যকে দর্শনমাত্র তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্গ। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। দেহে সম্বিতের চিহ্নমাত্র রহিল না।

অদ্বৈত নির্নিমেষে এই মূর্চ্ছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। এ কি অপরূপ দিব্য লাবণ্যময় দেহ! একি বিস্ময়কর প্রেমবিকারের দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে! এই অদ্ভুত ভক্তি-আবেশ তো মানুষের মধ্যে দেখা যায় না! অদ্বৈত আর যে এই মোহন মূর্ত্তি নয়ন হইতে ফিরাইতে পারেন না।

ভক্তিসিদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল এক পরম বোধ, ইনিই যে সেই মহাবস্তু যাহার জন্য আজীবন তিনি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন—ইনিই যে তাঁহার প্রাণনাথ।

ভাববিমুগ্ধ আচার্য্য বিষ্ণু পূজার উপকরণাদি নিয়া বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছিত দেহের সম্মুখে আসন পাতিয়া বসেন। পরম ভক্তিভরে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া, বিষ্ণু-স্তোত্র গাহিয়া করেন তাঁহার বন্দনা।

সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আচার্য্যপ্রভুর নয়নাশ্রু অবিরাম ঝরিতেছে, আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বম্ভরের চরণ দুটি হইতেছে সিক্ত।

গদাধর তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত। সর্ব্বজনবরেণ্য প্রবীণ আচার্য্য অদ্বৈতের এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও তাঁহার হইল। আচার্য্যকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিলেন, "প্রভু, বিশ্বম্ভর আপনার কাছে বালকমাত্র। তাকে এভাবে পূজা অর্চ্চনা আপনি যেন আর করবেন না।"

ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা আচার্য্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, "গদাধর, এ বালক যে কে, তা অচিরেই বুঝবে। আর একটু অপেক্ষা তোমরা করো।"

ইতিমধ্যে বিশ্বম্ভরের বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট, অশ্রু-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

বিশ্বম্ভর ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন। অদ্বৈতের পদধূলি মাথায় নিয়া দৈন্যভরে কহেন—

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়।
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥

নির্নিমেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, হে কপটী, এ আবার তোমার কোন্ ছল? কিন্তু আর তো আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। যে পরম আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি, তা যে পরিগ্রহ করেছে তোমারই ভেতরে। আমার ধ্যানের ধন আজ ধরা দিয়েছে আমার সম্মুখে!

ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "না বিশ্বম্ভর, আর তুমি আমায় এড়াতে চেয়ো না। আমার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে- তুমিই হচ্ছো আমার শ্রেয় বস্তু। আর শোন, বৈষ্ণব জীবনের ধারা সারা দেশে স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভক্তেরা সবাই দিন কাটাচ্ছে চরম নৈরাশ্যে, মনোবেদনায় আর উৎকণ্ঠায়। তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, তোমায় নিয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হবার জন্য তারা ব্যাকুল। তুমি তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো।"

চিহ্নিত নেতা আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছেন। একবার তিনি তাঁহার নিজগণ চিনিয়া নিন, সুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই যে অদ্বৈত চাহিতেছেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই অদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য, কিছুকাল নবদ্বীপের বাহিরে থাকিয়া বিশ্বম্ভরকে পরীক্ষা করা। যদি তিনি সত্যই অদ্বৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া থাকেন, এই লীলা পরিকরকে তিনি নিজেই ডাকিয়া নিবেন।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভক্ত সমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন লীলা। শ্রীবাসের অঙ্গনে একের পর এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবেরা প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া জড়ো হইতেছে, মণ্ডলীর শক্তি দিন দিনই বাড়িতেছে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আগমনে এ শক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

মাধবেন্দ্র পুরীর পরম স্নেহভাজন নিত্যানন্দ। ভক্তি প্রেমরসের তিনি এক উৎসস্বরূপ। মাধবেন্দ্রেরই প্রচারিত কৃষ্ণ ভক্তিরসের অন্যতম ধারক ও বাহক এই প্রবীণ আচার্য্য। তাই নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত উভয়ে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোৎসব তেমন যেন জমিতেছে না।

সেদিন প্রভু শ্রীচৈতন্য দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে ডাকিয়া কহিলেন—

চলহ রামাই ! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনি আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন।

(চৈঃ ভাঃ)

প্রকাশের লগ্ন উপস্থিত। প্রভু গৌরসুন্দর এবার আর যেন রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে চান না। আবির্ভাবের পরম তত্ত্বটি নানাভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছেন—এসময়ে চিহ্নিত পার্ষদ অদ্বৈত আচার্য্যকে যে তাঁহার অবিলম্বে চাই।

রামাই পণ্ডিতকে প্রভু আরো কহিলেন, "ভাখো, তুমি গোপনে আচার্য্যকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা। এখানে এত দিন ধরে যা কিছু দেখেছো ও শুনেছো, আচার্য্যকে সব বলবে। আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য্য যেন পূজোর সব উপচার সংগ্রহ ক'রে আনে, সস্ত্রীক এখানে এসে আমার পূজো করে।"

রামাইকে দেখিয়াই আচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "কি হে রামাই, হঠাৎ তুমি এসময় শান্তিপুরে এলে কি মনে ক'রে, বলতো। আমায় ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে বুঝি।"

রামাই বুঝিলেন কোন কথাই এই শক্তিমান্ বৈষ্ণবের অগোচর নাই। মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে সব কিছুই তো আপনার জানা। আদেশ হয়েছে, এবার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রভুর সকাশে চলুন।"

বৃদ্ধ আচার্য্য বড় চতুর—মনোভাব তাঁহার বড় দুরবগাহ। প্রভুর দূতকে চাপিয়া ধরিলেন, "আচ্ছা রামাই, তোমরা সবাই এত হৈ-চৈ করছো, কিন্তু আমায় কি বোঝাতে পারো, কেন শ্রীভগবান মানবদেহে আবির্ভূত হবেন। কেনই বা তিনি বিশ্বের এত স্থান থাকতে নবদ্বীপের মাটিতে নেমে আসবেন? ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথ আমি বুঝি, তাই ব্যাখ্যা করি—তোমার অগ্রজ শ্রীবাস পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে সবই জানে। কিন্তু রামাই, তোমাদের এ কান্নাকাটি আর ভাবমত্ততা কেন, তা তো বুঝতে পারিনে।"

রামাই জানেন, আচার্য্য অদ্বৈত গৌরসুন্দরের নব আন্দোলনের এক বড় স্তম্ভ। প্রভু তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন—তাঁহার জন্য তিনি আজ প্রতীক্ষমান। তাছাড়া, গদাধরের কাছে তাঁহারা সবাই শুনিয়াছেন, আচার্য্য সেদিন নিজেই প্রভুকে আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার প্রাণপ্রভুরূপে। স্বগৃহে তুলসীমঞ্চের সামনে তাঁহাকে পূজা করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আজিকার এ কথা তো তাঁহার প্রাণের কথা নয়!

যাই হোক, ভক্ত রামাই ভাবিলেন—তিনি দূতমাত্র। প্রবীণ, মহাজ্ঞানী আচার্য্যের সহিত আঁটিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তিনি হুবহু আচার্য্যের সম্মুখে এ সময়ে আওড়াইয়া গেলেন।

যুক্তকরে কহিলেন, "আচার্য্য, প্রভু ব্যাকুল হয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনি পূজোর সজ্জা ও উপচার নিয়ে শিগ্‌গীর আসুন। আর আমরা সবাই প্রভু আর তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরের মিলন মধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখা গেল আচার্য্যের এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রেমভক্তির প্রচণ্ড আবেগে তাঁহার দেহখানি থরথর কাঁপিতেছে। মহাপণ্ডিত আচার্য্য বালকের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—"এসেছেন, এসেছেন! প্রভু আমার ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ধূলায় তিনি নেমে এসেছেন!"

কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হইলেন। রামাই এই সুযোগে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "আচার্য্যবর, প্রভু কিন্তু আপনাকে অবিলম্বেই তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।"

অদ্বৈত পণ্ডিত এবার তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "ছাখো রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, ব'লে মেনে নেব, যখন তিনি আমায় তাঁর আপন ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য দেখাবেন, আর আমার এই পক্ককেশাবৃত মস্তকের ওপর তাঁর চরণদুটি তুলে ধরবেন।"

সস্ত্রীক নবদ্বীপে পৌঁছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন না। নন্দন আচার্য্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

রামাই একলা শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "ছাখো ছাখো, নাড়া এখনো আমায় পরীক্ষা করতে চায়। আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন আচার্য্যের ঘরে সস্ত্রীক সে লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।"

অদ্বৈত ও অদ্বৈত-পত্নীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল।

প্রভু আজ ঐশ্বরীয় মহাভাবে প্রমত্ত। দিব্য রূপৈশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভাববিহ্বল অদ্বৈত নির্নিমেষ নয়নে এ দৃশ্য

দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছত্র। গদাধর পণ্ডিত তাঁহার তাম্বুল-করঙ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্যজন করিতেছেন, আর শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তগণ চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মুখে বিস্তারিত গৌরসুন্দরের সৌন্দর্য্যসুধার সমুদ্র। অদ্বৈত হতবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেছেন—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর।
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর।

শুধু তাহাই নয়, অদ্বৈত আচার্য্যের দৃষ্টি হইতে প্রভু যেন একটা পর্দ্দা অপসারিত করিয়া নিয়াছেন। অনাবৃত করিয়াছেন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দিব্যরূপ। এ রূপের জ্যোতিতে সকল কিছু হইয়া উঠিয়াছে উদ্ভাসিত। ভক্তকবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়—

কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর।

এ অলৌকিক দর্শনের ফলে পতি ও পত্নী উভয়ে আনন্দে আত্ম-হারা! পরম ভক্তিভরে, ষোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পূজা তাঁহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোদ্বেল আচার্য্যের মুখে বার বার উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিষ্ণুধ্যানের স্তবগাথা।

পূজা ও স্তব গানের শেষে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ সর্ব্বজনমান্য মহান্ আচার্য্যের শিরে তিনি অবলীলায় স্থাপন করিলেন নিজের চরণদ্বয়। ভক্ত-গোষ্ঠীর হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্বৈতের সঙ্কল্প ছিল, ঈশ্বর বলিয়া যাঁহাকে তিনি স্বীকার করিবেন, জীবনপ্রভুরূপে হৃদয় সিংহাসনে বসাইবেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য, নিজ শক্তিতে কাড়িয়া নিতে হইবে অদ্বৈতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। সে সঙ্কল্প আজ তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে।

আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। প্রভু ও তাঁহার স্বজনদের জ্যোতির্ম্ময় রূপ যে তিনি আজ দেখিয়াছেন। অদ্বৈতের শিরে পদ স্থাপন করিয়া প্রভু আদেশ দিলেন, "অদ্বৈত, এবার শান্ত হয়ে উঠে ব'সো, পঞ্চ উপচারে সস্ত্রীক আমার চরণ পূজা করো।"

এই আদেশের জন্যই যে আচার্য্য এতদিন অপেক্ষমান। প্রভু এমনি করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিবেন, তাঁহার জীবন-বেদীতে নিজেকে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই তো তিনি চান।

এবার সোৎসাহে উঠিয়া বসিয়া মালা, বস্ত্র, অলঙ্কারে প্রভুকে সাজাইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ষোড়শোপচারে প্রভুর পূজা সম্পন্ন করিলেন। আচার্য্যের দুই চোখে তখন বহিতেছে পুলকাশ্রুর ধারা।

প্রভু বিশ্বম্ভর আজ অপূর্ব্ব দিব্যভাবে উদ্দীপিত। গম্ভীরভাবে অদ্বৈতের পূজা আরতি তিনি গ্রহণ করিলেন, তারপর এই বর্ষীয়ান্ মহাভক্তের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন নিজের গলার প্রসাদী মালা।

এবার শোনা গেল আচার্য্যের প্রতি প্রভুর আর এক নূতন আদেশ, "ওরে নাড়া, পূজো আমার শেষ হয়েছে। এবার কীর্ত্তন হবে, তাতে তুই নৃত্য কর্।"

ভক্তগণ সোল্লাসে কীর্ত্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল এক অদ্ভুত দৃশ্য। মহাজ্ঞানী গম্ভীরস্বভাব, বৃদ্ধ আচার্য্য পরমানন্দে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজী বাহিয়া ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু। অদ্ভুত প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপনা বিস্মৃত হইয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, অদ্বৈত আচার্য্য—বহু ভক্তজন যাঁহার আশ্রিত, বহুজনের অধ্যাত্ম-জীবনের যিনি পথিপ্রদর্শক? পরশমণি প্রভুর যাদুস্পর্শে এই ভাবগম্ভীর জ্ঞানীপুরুষ আজ নৃত্যকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় অদ্ভুত, বড় নয়ন-মনোরম।

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য, এবার অকপটে বল, তোমার কি প্রার্থনা।

তুমি আমার কাছে বর চেয়ে নাও, যা চাইবে তা-ই আজ আমি তোমায় দেব।"

আচার্য্য যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন না। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ছাড়িতে রাজী নন। ভাবাবেশে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বার বারই কহিতেছেন, "না আচার্য্য তুমি বর প্রার্থনা করো। কি তোমার অন্তরের অভিলাষ, তা জানাও।"

অদ্বৈত আচার্য্য তবুও নিরুত্তর।

প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, "তবে শোন আচার্য্য, ঘরে ঘরে নামকীর্ত্তনের প্রচার এবার আমি শুরু করবো। অপূর্ব্ব ভক্তি সম্পদ চারদিকে বিলিয়ে দেবো।"

অদ্বৈত এবার মুখ খুলিলেন। করুণার্দ্র নয়নে কহিলেন, "প্রভু, যদি কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হয়েছো, যদি তোমার দেবদুর্লভ ভক্তি বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা আগে তাদেরই দাও যারা রয়েছে সবার পশ্চাতে—চিরবঞ্চিত হয়ে। শূদ্র আর স্ত্রীজাতির মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছড়িয়ে দাও।"

ভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহার এই প্রার্থনা পূরণে স্বীকৃত হইলেন, সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন হুঙ্কার।

প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে, ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে, আচার্য্যের দিন বড় আনন্দে কাটিতেছে। কিন্তু অন্তরে তাঁহার একটা কাঁটার খোঁচা থাকিয়াই যাইতেছে। বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব নেতা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ভক্তি করেন, সম্ভ্রম দেখান। এক একদিন আচার্য্যকে সবলে ভূতলে ফেলিয়া তাঁহার চরণতলে নিজের শির ঘর্ষণ করেন। অদ্বৈতের সারা অন্তর তখন এক অব্যক্ত কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চায়। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভু এমন করিয়া শুধু শুধু তাঁহাকে বিড়ম্বিত করেন? প্রভু তাঁহার প্রভুত্ব দেখাইতে থাকুন, আচার্য্যকে কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তো বুঝা যাইবে তাঁহার অন্তরঙ্গতা।

আচার্য্য ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সহিত

চাতুর্য্যপূর্ণ খেলাই তিনি খেলিবেন। অল্প কয়েকদিন পরে, হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া তিনি শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন।

আচার্য্যের পূর্ব্বেকার সে ভক্তিমধুর রূপ যেন আর নাই। এবার তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এক তীক্ষ্ণধী, বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শাস্ত্র-বিদ্‌রূপে। আর তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার মূলে আছে জ্ঞান বিচারের দিগ্‌দর্শন—

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া।
"জ্ঞান বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সর্ব্বশক্তি।
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন।
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম?
আদি বৃদ্ধ আমি পাড়লাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র।" (চৈঃ ভাঃ)

অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবেরা তো অবাক্! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির অন্যতম ধারক ও বাহক অদ্বৈতের মুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের কথা। আচার্য্য কি তবে জীবনাদর্শ বদলাইয়া ফেলিলেন?

শুধু মহাপ্রেমিক হরিদাসের চোখে আচার্য্য ধূলা দিতে পারেন নাই। হরিদাস বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গৌরসুন্দরের সহিত চতুরতার যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভুকে অবিলম্বে শান্তিপুরে টানিয়া না আনিয়া তিনি ছাড়িবেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক কোণে বসিয়া তাঁহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্ত্বব্যাখ্যা শুনেন, আর নীরবে মুচ্‌কি হাসি হাসেন।

অচিরেই অদ্বৈত আচার্য্যের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাৎ গৌরসুন্দর শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত।

আচার্য্য ও তাঁহার গৃহের সকলে ত্রস্তেব্যস্তে আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িল।

অদ্বৈত যুক্তকরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে নাড়া, আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল্—ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়।"

অদ্বৈত দেখিলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। ইহাই যে তিনি চাহেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবেন, দণ্ড দিবেন, আর তিনি সে দণ্ড সানন্দে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। এইজন্যই তো চতুর অভিনয় তাঁহাকে এ কয়দিন ধরিয়া করিতে হইয়াছে।

সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, সর্ব্বকালে সর্ব্ব সমাজে জ্ঞানই তো বড়। জ্ঞানহীন ভক্তি দিয়ে কোন্ কার্য্য সাধিত হবে?"

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? ওরে নাড়া, তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুই একথা উচ্চারণ কর্‌ছিস্।"

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ আচার্য্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাইলেন। তারপর প্রবল বেগে বর্ষিত হইতে লাগিল অজস্র কিল-চড়।

প্রহার জর্জ্জরিত আচার্য্যের মুখ দিয়া কিন্তু একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না। মৃতপ্রায় হইয়া তিনি ভূতলে শায়িত আছেন। আচার্য্য গৃহিণী এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দোহাই তোমার। বুড়ো বামুনকে একেবারে প্রাণে মেরো না। এবার ক্ষান্ত হও।"

ভক্তপ্রবর হরিদাস একপাশে দণ্ডায়মান। প্রভুর এই বিচিত্র কোপ-লীলা দর্শনে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীতি ও বিস্ময়। ঘন ঘন তিনি কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতেছেন।

হৈ-চৈ শুনিয়া আচার্য্যের আঙিনায় বহু লোকজন জড়ো হইয়াছে। সবাই মহা সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ আচার্য্যের এ কি দুর্গতি।

শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছেন।

অদ্বৈত আচার্য্যকে প্রভু এবার মুক্তি দিলেন। ক্রোধ তিনি সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দীপনা আজিকার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়া দিয়া গেল প্রভুর আত্মপরিচয়। 'মুঁই সেই, মুঁই সেই', বলিয়া বার বার তিনি তাঁহার ভগবত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কৃপাদণ্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা নাই। বৃদ্ধ বৈষ্ণবনেতা আঙিনায় দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন।

নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, "প্রভু নিজ হাতে আমায় দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুরালি তো দেখিয়েছ। তোমার এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাতেই যে আমি চেয়েছিলাম। এবার আমায় তোমার চরণাশ্রয় দান করো।"

প্রভু গৌরসুন্দর পরম প্রেমভরে অদ্বৈতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। উভয়ের কপাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। আচার্য্যের আঙিনায় সেদিন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়া উঠিল।

প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচার্য্যকে যে প্রহার ও লাঞ্ছনা করিয়াছেন সেজন্য খুব লজ্জিত। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে অদ্বৈতকে কহিলেন, "আচার্য্য, সবাই আজ জেনে রাখুক, তিলার্দ্ধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেবে, তার শত অপরাধ আমি মার্জ্জনা ক'রবো।"

প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বার বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, আর নয়নজলে তাঁহার বসন ভিজিয়া যাইতে থাকে।

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীলা ও ইষ্টগোষ্ঠী। নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার রঙ্গ ও হাস্য পরিহাস চলিতে থাকে। অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবীর আজ আনন্দের সীমা নাই। সোৎসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়া তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন করিতে বসেন।

গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া প্রভু তুলসীমঞ্চের সম্মুখে গিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। অপূর্ব্ব ভাবরসে তিনি উদ্বেল। সুগৌর সুঠাম দেহের রেখায় রেখায় ঝলকিয়া উঠিতেছে দিব্য লাবণ্যশ্রী। রসনায় উচ্চারিত হইতেছে ইষ্টনাম। ভক্ত ও পার্ষদেরা এ অপূর্ব্ব প্রেমঘন মূর্ত্তির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছেন।

ভাবাবিষ্ট প্রভু হঠাৎ এসময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অদ্বৈত এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। সবেগে তিনি গৌরসুন্দরের পদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন। পরমভক্ত হরিদাসও এ মহা সুযোগ হারাইবার পাত্র নহেন। অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরসুন্দরের পরমাশ্রয় তাঁহার জীবনে মিলিয়াছে —আজ দুই সংত্রাতাই তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পড়িয়া আছেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া হরিদাসও সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈতের চরণতলে পতিত হইলেন।

আচার্য্যের আঙিনায় সর্ব্বজন সমক্ষে সেদিন ফুটিয়া উঠিল এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। শায়িত ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভক্তদলের তিনি প্রতীক। তাঁহার শিরে চরণ স্থাপন করিয়া আছেন অদ্বৈত-প্রভু। সর্ব্বোপরি রহিয়াছেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। বৃন্দাবন দাস এই ত্রয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'ধর্ম্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে'।

ইহার পর আসিল ভোজন পর্ব্ব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সদাই বালাভাব। আনন্দের আবেশে বসিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া অন্ন ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ত্ব ভালোরূপেই জানেন। তাই তাঁহার সহিত কৃত্রিম কোন্দল করিতে, তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে, তাঁহার বড় আনন্দ।

আচার্য্য কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহা বিপদে পড়া গেছে এই নিত্যানন্দকে নিয়ে। সকলের জাতধর্ম্ম নাশ না ক'রে এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে এ মাতাল এসে জুটলো তা কে জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী ব'লে। জাতি কি, কোন্ ঘরে জন্ম তা বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে

যার-তার হাঁড়িতে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহা অনাছিষ্টি। হরিদাস, তোমরা সবাই আগে থাকতে সাবধান হও।”

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ ও হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। এ বালসুলভ কোন্দল দেখিয়া প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়া অস্থির হন।

কিছুক্ষণ বাদে লড়াই থামিয়া গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়কে পরম আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন।

এইভাবে আচার্য্যের ভবনে কয়েক দিন থাকিয়া প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাসের এবারকার আগমন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত করিল এক নূতনতর শক্তি।

বিশেষতঃ অদ্বৈত আচার্য্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাই আচার্য্য ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রভুর নব আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-স্তম্ভ রূপে। নবদ্বীপের লীলাক্ষেত্রে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন প্রভুর প্রধান সহায়করূপে এবার সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিল অদ্বৈত আচার্য্যের মর্য্যাদা, জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বশক্তি। তাই চৈতন্য-ভাগবত এই দুই প্রধান পার্ষদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, - ‘প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুইজনে।’

বৎসরখানেক পরের কথা। প্রভু গৌরসুন্দর ইতিমধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার লীলানাট্যের এক নূতনতর অঙ্ক।

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচার্য্যের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। শুধু প্রভুর এই নবরূপ ও জাবোদ্ধার লীলা দর্শনের আশাতেই যে তিনি বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাওয়ার আগে জননী ও ঘনিষ্ঠ ভক্তদের কাছে বিদায়

নিতে চান। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া নিজে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুকে দর্শনের জন্য সহস্র সহস্র দর্শনার্থী সেদিন আচার্য্য ভবনে ভীড় করিয়া দাঁড়ায়, নৃত্যকীর্ত্তনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। শান্তিপুর পরিণত হয় ভক্তি-প্রেমের আনন্দ হাটে।

গৌরসুন্দরের সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্য মূর্ত্তি দর্শনে অদ্বৈত আচার্য্য আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ভাবোদ্বেল হইয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মূর্চ্ছিত।

বহুক্ষণ পরে আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। প্রভু এবার ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈতের শিশুপুত্র অচ্যুত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগাড়ি গিয়া আপন মনে এতক্ষণ খেলা করিতেছিল। এবার এই জনসংঘট্ট ও দেবদুর্লভ মূর্ত্তি প্রভুকে দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধূলিধূসরিত শিশুকে গৌরসুন্দর কোলে তুলিয়া নিলেন, সস্নেহে কহিলেন, "অচ্যুত, বলতে পারো, তুমি আমার কে? জানতো, আচার্য্য আমার পিতা, কাজেই তুমি আর আমি হচ্ছি দুই ভাই।"

সবাইকে বিস্মিত করিয়া শিশু সেদিন উত্তর দিয়াছিল, "না-গো তা নয়। দৈবের বিধানে তুমি এসেছ জীবসখারূপে—তোমার জনক তো কখনো কেউ থাকতে পারে না— তুমি যে স্বপ্রকাশ।"

ভক্তদল ও দর্শনার্থীরা হতবাক্! অদ্বৈত আচার্য্যের এ অবোধ শিশু একি অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা বলিতেছে। অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া ইহার জন্ম, এ শিশু যে অনন্যসাধারণ!"

নবদ্বীপে প্রভুব যে ঈশ্বরীয় আবেশ যে ঐশ্বর্য্য ভক্তগণ দেখিয়াছিলেন, অদ্বৈত গৃহে তাহাই শেষবারের মত সকলে দেখিলেন। দিব্য উদ্দীপনাভরে বিষ্ণুখট্টার উপর প্রভু উঠিয়া বসিলেন। স্বমুখে বার বার 'মুই সেই, মুই সেই' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন নিজতত্ত্ব।

বিদায়ের পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে প্রভু তাঁহার অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই।
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্ত বশ স্বভাব আমার।
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব্ব অবতার।
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সতে সত্য জানাইয়া।

প্রতি বৎসরই ভক্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাভের জন্য নীলাচলে যান, আর তাঁহাদের এই পদযাত্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত আচার্য্য। এই অভিযাত্রায় শুধু ভক্ত বৈষ্ণবেরাই নয়, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরাও কেহ কেহ থাকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের আগ্রহের অন্ত নাই। যা কিছু আহার্য্য তিনি আগে পছন্দ করিতেন, যা কিছু এখনো ভালোবাসেন, সযত্নে তাহাই ভারে ভারে শুষ্ক করিয়া নিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন।

তখনকার দিনের যাত্রাপথ ছিল বড়ই বিপদসঙ্কুল। দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোষ্ঠী নীলাচলে পৌছিতেন, প্রভুর দিব্য মনোহর রূপ দর্শন করামাত্র তাঁহাদের পথ পর্য্যটনের সমস্ত কিছু শ্রান্তি এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইত।

প্রাণপ্রিয় বৈষ্ণবেরা তাঁহার দর্শনে আসিতেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রভুও ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যান। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতে থাকেন। প্রভুর গোষ্ঠী আর অদ্বৈতের গোষ্ঠীর মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া যায়, আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে।

প্রভুর পূজার্চ্চনার জন্য আচার্য্য নানা উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহারের উপায় কই? মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘটিয়া যায় আত্মবিস্মৃতি। প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস দুকূল ছাপাইয়া উঠে, বৃদ্ধ আচার্য্য আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার দিতে থাকেন, “এনেছি এনেছি, প্রভুকে আমি এনেছি।”

আচার্য্যের ব্যাকুল ক্রন্দনেই প্রভু আসিয়াছেন—এ বিশ্বাস রহিয়াছে সকল ভক্তেরই অন্তরে। তাই সমবেত কণ্ঠে প্রভু ও আচার্য্যের জয়রব ধ্বনিত হয়, দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠে।

প্রভুর ইঙ্গিতে জগন্নাথদেবের আজ্ঞামালা নিয়া সেবকেরা ছুটিয়া আসে। এই মালা ও চন্দন প্রথমে তিনি পরাইয়া দেন আচার্য্যবরের কণ্ঠে, তারপর অপর বৈষ্ণবেরা মালা প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন।

সেবার নীলাচলে পৌঁছিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের অভিলাষ হইল প্রভুকে একদিন ভোজন করাইবেন এবং স্বহস্তেই সব কিছু তিনি রাঁধিবেন।

নিমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীচৈতন্য মহা উল্লসিত—

প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়।
আচার্য্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন।
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়া খাইতে আমার তথি হয় মন।

ভক্তবৎসল প্রভুর এই মধুর কথা শুনিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? আচার্য্য আনন্দে আপনহারা হইয়া গেলেন।

আজ প্রভুর নিমন্ত্রণ। আচার্য্য ও আচার্য্যপত্নী প্রত্যূষ হইতেই কর্ম্ম-ব্যস্ত। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে আচার্য্য রন্ধনের অধিকারটি পত্নী সীতাদেবীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। প্রভুর কাছে যে এই অধিকারটি নিজেই তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভক্ত পরমোৎসাহে নানা উপাদেয় বস্তু রন্ধন করিতেছেন, আর পত্নী সীতাদেবী নিকটে বসিয়া সব কিছু জুটাইয়া দিতেছেন।

আচার্য্যের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন ইচ্ছা স্ফুরিত হইতেছে। প্রভু যখন ভিক্ষা গ্রহণে আসেন, প্রায়ই তাঁহার সহিত আসিয়া উপস্থিত হয় একদল সেবক ও ঘনিষ্ঠ ভক্ত। বড় আশা করিয়া বহু কষ্টে আচার্য্য আজ এত সব প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু

প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তো তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়ানো যাইবে না।

পত্নীকে ডাকিয়া আচার্য্য মনের কথাটি খুলিয়া বলিলেন, তারপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আহা, এমন কোন দৈব দুর্য্যোগ কি আজ হতে পারে না, যাতে প্রভু একলাটিই আমার কুটিরে এসে উপস্থিত হন। তা'হলে পরম পরিতোষ সহকারে তাঁকে ভোজন করানোর সুযোগ পাই!"

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। আচার্য্য সবে মাত্র রন্ধন শেষ করিয়াছেন, হঠাৎ আচম্বিতে আকাশে দেখা দিল মেঘের ঘনঘটা। অল্প সময়ের মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বৃষ্টি।

আচার্য্য প্রমাদ গণিলেন। একি ঘোর বিপদে আজ পড়া গেল। প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই মধ্যে একি দৈব দুর্য্যোগ! এ অসময়ে এমন ঝড় বাদলের তাণ্ডব শুরু হইবে তাহা কে জানে!

এমন সময় দেখা গেল আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। ঝড় জলে ভিজিয়া 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভু তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া আচার্য্য তাঁহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন। কিছুটা বিশ্রামের পর প্রভু আহারে বসিলেন।

বহু বিচিত্র আহার্য্য সম্ভার! আচার্য্য প্রাণপণে অজস্র খাবারের যোগাড় করিয়াছেন। পীড়াপীড়ি করিয়া প্রভুকে আকণ্ঠ ভোজন করানোর পর ভক্তের প্রাণে শান্তি আসিল।

এবার ভক্তিভরে আকাশের দিকে চাহিয়া অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার স্তুতি শুরু করিয়া দিলেন।

প্রভু মহা বিস্মিত। কহিলেন, "আচার্য্য, হঠাৎ ইন্দ্রদেবের ওপর তোমার এত ভক্তি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন বলতো?"

উত্তর হইল, "প্রভু, আজ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে একলাটি পেলাম, পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো।

প্রভু একথা মানিতে রাজী নন। ঝড়-শিলাবৃষ্টির সময় তো এ নয়। এ যে আচার্য্যেরই কাজ। তাঁহারই বৈষ্ণবীয় ভক্তির বলে এই অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘটিত হইয়াছে। অদ্বৈতের প্রশস্তি গাহিয়া কহিলেন—

কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বথা।
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ ?

আবেগকম্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়াছেন। বার বার কাঁদিয়া কহিতেছেন, "প্রভু, তুমি সেবকবৎসল, সেবকের মনোবাঞ্ছা তোমার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, আর সে বাঞ্ছা পূরণও তুমি করো। আমার যা কিছু শক্তি তা যে এই প্রত্যয়েরই উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকে আমায় বলে—অদ্বৈত সিংহ। কিন্তু তারা তো জানে না, সিংহের বল হচ্ছে তার প্রভুরই বল।"

ভক্তগোষ্ঠী নিয়া প্রভু বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কৃষ্ণকথা ও কীর্ত্তনে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে।

বহুজন পরিবৃত হইয়া সেদিন তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈত আচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

প্রভু সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "এই যে আচার্য্য। কোথা হতে তুমি আস্‌ছো। কোন্ কাজেই বা ব্যাপৃত ছিলে, বলতো ?"

"প্রভু, শ্রীমন্দিরেই এতক্ষণ বসেছিলাম। জগন্নাথ দর্শন সেরে এইমাত্র আসছি।"

"খুব ভাল কথা, আচার্য্য। কিন্তু বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর আর কি তুমি করেছো।"

"প্রভু, শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের পর তাঁকে রোজ প্রদক্ষিণ করি। আজও সেই কাজই ক'রে এলাম।"

উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিয়া প্রভু কহিলেন, "আচার্য্য, এবার তুমি সত্যই হেরে গেলে।"

অদ্বৈত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাঁহার পরাজয় হইবে, সে একটা বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় কিসের, তাহা তো বুঝা যাইতেছে না। কহিলেন, “প্রভু, আগে বল, হার-জিতের বিষয়টি কি। তবে তো আমি তা মেনে নেব।”

প্রভু ও ভক্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে। এবার সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিল—

প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার।
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা।
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত।
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখো জগন্নাথ মুখ বিনে॥

ইষ্ট দর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব যে ইহাই। আর এই দর্শনই চৈতন্যদেব প্রতিদিন করিয়া থাকেন—জগন্নাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাঁহার নয়নে থাকে চিরস্থির।

ভক্ত জনেরা সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া আছেন, কহারো মুখে কথা সরিতেছে না।

অদ্বৈত এবার যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, “প্রভু তোমার কাছে পরাজিত হয়েই যে রয়েছি—এ পরাজয় তো নূতন কিছু নয়। তবে এটা বুঝতে পারি, জগন্নাথ দর্শনের এই তত্ত্ব শুধু তোমার শ্রীমুখেই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।”

বৃদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, যে চৈতন্যতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত, তাহারই আলোর ধারা দিকে দিকে তিনি ছড়াইয়া দিতে চান। শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, “এসো আজ আমরা সবাই মিলে প্রভু শ্রীচৈতন্যের নামকীর্ত্তন শুরু ক'রে দিই। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভু

অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। তবে প্রভুর নামগানে, স্তুতিগানে, বাধা কোথায়?"

ভক্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট হয়ে, 'মুঁই কৃষ্ণদাস' ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন। তাঁর নাম কীর্ত্তনের উৎসাহ কাহারো কম নাই। কিন্তু প্রভু তাঁর নিজের স্তুতিগান শুনিয়া যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তবেই বিপদ।

অদ্বৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই ভয় কাটিয়া গেল। শুরু হইল উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনিয়াদের গানে নিজের এ আত্মস্তুতি শুনিতে প্রভু রাজী নন। ধীর পদক্ষেপে তিনি স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সেবক গোবিন্দের কাছে শোনা গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ নিজের শয্যায় শায়িত। আপন মনে একেবারে চুপচাপ পড়িয়া আছেন।

অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়া ভক্তেরা কুটিরে ঢুকিলেন।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা শ্রীবাস, তোমরা সব সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান্ ভক্ত থাকতে এ সব কি হচ্ছে, বলতো? কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছো কেন?"

শ্রীবাস উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমাদের স্বাতন্ত্র্যই বা কি, শক্তিই বা কোথায়? ঈশ্বর যা বলিয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ করেছি।"

প্রভু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমরা সবাই শাস্ত্রবিদ্, স্থিরবুদ্ধি। আচ্ছা বলতো, যে আত্মগোপন প্রয়াসী তাকে কি জনসমক্ষে ঠেলে বার ক'রে দিতে হয়? তা কি সঙ্গত?"

শ্রীবাস স্মিতহাস্যে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া হস্ত দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করার ভঙ্গী দেখাইলেন।

প্রভু কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে, সবটা প্রকাশ ক'রে বল।"

উত্তর হইল, "প্রভু হাত দিয়ে আমি সূর্য্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সত্যই কি ও বস্তু ঢাকা যায়? তোমার লুকানো ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি, কোন কিছু দিয়ে ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখা যায় না।"

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সেদিন চলে নাই। প্রভুর গৃহদ্বারে হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট জনসমুদ্র। গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিল, এবার তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে, 'প্রভু'কে দর্শনের জন্য। অচল জগন্নাথের পরে সচল জগন্নাথ দেখিয়া তাহারা ঘরে ফিরিবে। এই দর্শনার্থী জনতা সেদিন জানাইয়া দিয়া গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ—কোন গোপনতার আড়ালই তাঁহাকে জনচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিতে পারে না।

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্টা এমনি করিয়া সেদিন জয়যুক্ত হইয়া উঠে, উদঘাটিত করে প্রভুর লীলানাট্যের এক মহত্তর রূপ।

সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের স্মরণ নিয়াছেন। প্রভু তাঁহার দুই বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব ভক্তকে সম্মুখে রাখিয়া প্রথমে অদ্বৈতের খুব খানিকটা গুণগান করিলেন। তারপর কহিলেন, "ছাখো, প্রেমভক্তি যদি সত্যই পেতে চাও তবে তোমরা অদ্বৈতের শরণ নাও। তাঁর কৃপা না হলে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি উপজিত হবে না।"

নবাগত ভক্তদ্বয় তখনি সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈত আচার্য্যের চরণে পতিত হইলেন। প্রভু প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য, এ দুজনকে তুমি কৃপা করো। তুমি হচ্ছো ভক্তিধনের ভাণ্ডারী, তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে তো এদের অভীষ্ট লাভ হবে না।"

সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শক্তি আচার্য্যের সুবিদিত। বুঝিলেন, প্রভু চাহেন প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি এই দুই মহা-প্রতিভাধর ভক্তের হৃদয়ে স্ফুরিত হোক, আর তাহার সূচনা হোক

প্রবীণতম বৈষ্ণবনেতা, ভক্তি-শাস্ত্র পারঙ্গম অদ্বৈতের আশীর্ব্বাণী নিয়া।

আচার্য্য কহিলেন, "প্রভু, কৃষ্ণ ভক্তির ভাণ্ডারের অধিকারী হচ্ছো তুমি। আমি সে ধনের ভাণ্ডারী কিনা জানি না। যদি হয়েই থাকি, তবে ভাণ্ডারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের আজ্ঞায়। তুমি ইচ্ছাময়, যখন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে ভক্তদের কৃপা বিতরণ করো। আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই আশীর্ব্বাদই করছি—এদের দু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।"

সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য কহিলেন,—"আর তোমাদের কোন চিন্তা নেই। শক্তিধর আচার্য্যের কৃপা আজ তোমরা পেয়েছো—

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি॥

(চৈঃ ভাঃ)

আর একদিনের কথা। অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বসিয়া আছেন। ভাবাবেশে দেহ তাঁহার কম্পিত হইতেছে, আয়ত নয়ন দুইটি ঢুলুঢুলু। হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিত, আমায় বল দেখি, অদ্বৈতকে তুমি কেমনতর বৈষ্ণব বলে মনে করো?"

বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন। কি ইহার উত্তর দেওয়া যায়? ক্ষণকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃপূত হইল না। অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের গালে ঠাস্ করিয়া তখনি এক চড় বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর ভাবাবেশে কাটিয়া গেল। শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রভু শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে অদ্বৈতের স্বরূপ মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তদের হৃদয়ে অদ্বৈত-তত্ত্বটি চিরতরে সেদিন অঙ্কিত হইয়া গেল।

প্রতি বৎসরই আচার্য্য অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে উপস্থিত হন। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কর্ম্মক্ষেত্র গৌড়দেশে। সেখানে তিনি বিরাজিত থাকেন প্রভুর প্রবর্ত্তিত ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে।

সেবার আচার্য্যের এক ভক্ত তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। এই ভক্তটির নাম বাউলিয়া বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ দেনার জন্য তাঁহাকে বড় বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

বাউলিয়া বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাব তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। তিনি মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতো, এত সব ঐশ্বর্য্যশালী ভক্ত ও রাজরাজড়া থাকিতে আচার্য্যের এমন দুর্গতি চলিতে থাকিবে? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রের কানে একবার এ কথাটি তুলিতে পারিলেও ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়।

বাউলিয়া বিশ্বাস তাহাই করিলেন। প্রতাপরুদ্রকে আচার্য্যের অর্থকৃচ্ছ্রের কথা জানাইয়া তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়া বসিলেন।

কথাটি কি করিয়া যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সেবকদের আদেশ দিলেন, "ত্যাখো, বিশ্বাস যেন কখনো আমার কাছে না আসে, আমি তার মুখদর্শন করতে চাইনে। শুদ্ধসত্ত্ব অদ্বৈত আচার্য্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে চায়! জান্‌বে, আমার কাছে কোনদিন তার ক্ষমা নেই।"

প্রভুর এই দণ্ডাজ্ঞা নীলাচল ও গৌড়ে আলোড়ন তুলিল। ভক্ত সমাজের সম্মুখে ইহা দেখা দিল এক সতর্ক-সঙ্কেত রূপে। সকলেই বুঝিলেন—প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে গেলে বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ করা চলিবে না।

বাউলিয়া বিশ্বাসের এই দণ্ড অদ্বৈতের প্রাণে বড় বাজিল। প্রকৃত পক্ষে নিজের জন্য সে কোন সাহায্য চাহে নাই, চাহিয়াছে আচার্য্যেরই শুভার্থী হইয়া।

কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সহিত আচার্য্যের সাক্ষাৎ।

আচার্য্য সকৌতুকে কহিলেন, "প্রভু, বাউলিয়া বিশ্বাসের ওপর তোমার এমন কৃপা, অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও তাকাও না।"

প্রভু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আচার্য্য, তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল, তুমি তো নিশ্চিতরূপে আমার মতবাদ জানো। প্রকৃত বৈষ্ণব হবে ঈশ্বরচরণে নিবেদিতপ্রাণ, ঈশ্বর প্রেমে সদা-উন্মত্ত। বিষয়কূপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে সাহায্যের প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার ঋণ শোধের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন যাবে কেন, বলতো? যোগক্ষেম বহনের প্রতিশ্রুতিতে যিনি আবদ্ধ, তোমার ভার যে তিনিই নিয়ে বসে আছেন। তবুও বাউলিয়া বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিতা করলো? তাই তো আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি। অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছো, এ দণ্ড তাকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে করেই, সে তোমার ভক্ত ব'লে। বুঝেছি, ভক্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচলিত করেছে। আচ্ছা এবার আমি বিশ্বাসকে মার্জ্জনা ক'রলাম। আর যেন কখনো তার এমন কুমতি না হয়।"

ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত সেবার নীলাচল হইতে গৌড়ে গিয়াছেন। তাঁহার মাধ্যমে বৃদ্ধ অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের জন্য এক তরজা পাঠাইলেন।

প্রভুকে কহিও আমার
কোটি নমস্কার
এই নিবেদন তাঁর
চরণে আমার
—'বাউলকে কহিও লোকে
হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে
না বিকায় চাউল।

বাউলকে কহিও কাজে
নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা
কহিয়াছে বাউল।

নীলাচলে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় জগদানন্দ এই তরজাটি সেখানে আবৃত্তি করিলেন। বড় প্রহেলিকাময় আচার্য্যের এই তরজা। সকলেই চুপচাপ হইয়া বসিয়া আছেন। প্রভু স্মিতহাস্যে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "বেশ, তাঁহার যে আজ্ঞা।"

প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই ছিলেন। মনে তাঁহার বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আমরা কেউ এ হেঁয়ালীর মানে বুঝে উঠতে পারলুম না। আপনার কথাও বড় দুর্বোধ্য ঠেকছে। কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন।"

উত্তর হইল, "স্বরূপ, জানতো অদ্বৈত আচার্য্য আগম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন, দুই অনুষ্ঠানই তাঁর জানা আছে। আচার্য্য বোধহয় একটা কিছু ইঙ্গিত জানাতে চেয়েছেন। কিন্তু তোমাদের মত আমিও সবটা বুঝতে পারিনি।"

প্রভু আসল কথাটা চাপিয়া গেলেও স্বরূপ বুঝিলেন, আচার্য্য তাঁহার দেবতার বিসর্জ্জনের ইঙ্গিতই এই হেঁয়ালীর মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছেন। স্বরূপের অনুমান মিথ্যা হয় নাই, অদ্বৈতের এই তরজা শ্রবণের পর হইতে প্রভু হইয়া উঠেন আরো অন্তর্মুখীন। গম্ভীরার মধ্যে আপনাকে তিনি একেবারে গুটাইয়া নেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিল তুলসী আর অশ্রুজলে যে লীলা আচার্য্য ত্বরান্বিত করেন, আরব্ধ কার্য্যশেষে তাহারই উপর যবনিকা ক্ষেপণের কথাটি নিজেই তিনি ধ্বনিত করিয়া যান।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা সম্বরণের পরও দীর্ঘদিন অদ্বৈত আচার্য্য

মরদেহে অবস্থান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম স্তম্ভ-রূপে এই বৃদ্ধ আচার্য্যকে সসম্মানে বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়।

ভক্তজনচিত্তে আচার্য্যের সেই দিব্য রূপটিই এসময়ে ভাস্বর হইয়া উঠে, যে রূপটির ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রিয় সখা মুরারী গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করেন :

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য।
ততোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য।
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।··
তাঁর দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।

(চৈঃ মঙ্গল—লোচন)

শঙ্করদেব

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় নূতনতর ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয়। এই ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব—আরাধ্য পরম বস্তু শ্রীভগবান্ লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। জাতিবর্ণের পার্থক্য তাঁহার কাছে নাই। ভক্তি প্রেমের উপচার নিয়া, একান্ত শরণাগতি নিয়া, যে কোন শ্রেণীর সাধক তাঁহার আরাধনা করিতে পারে, পৌঁছিতে পারে তাঁহার দিব্যধামে। এই উদার সর্ব্বজনীন ভক্তি-ধর্ম্মের আলোকধারা অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সর্ব্ব স্তরে; আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়া উঠে নূতনতর মানবতা-বোধ।

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তৎশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, তেলেগু দেশে বল্লভাচার্য্য, গৌড় ও উড়িষ্যায় চৈতন্য-মহাপ্রভু এই যুগে উৎসারিত করেন উদার ভক্তিধর্ম্মের এক একটি বিপুল তরঙ্গ। আসামের বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবও ছিলেন ইঁহাদের মত ভক্তি-আন্দোলনের এক পথিকৃৎ।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদেবের উপাস্য। এই উপাস্যকে জন-মানসের সম্মুখে তিনি স্থাপিত করেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে। শ্রদ্ধাভক্তি, শরণাগতি ও নামধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হয় তাঁহার সাধনপূত জীবন ও বাণীর মাধ্যমে। তৎকালীন আসামের অনগ্রসর এবং বহুবিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে তিনি আনয়ন করেন ভক্তি-প্রেমের বিপুল জোয়ার। সর্ব্ব ভারতের ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজ্য আসামের আত্মিক যোগবন্ধনটিও গড়িয়া উঠে শঙ্করদেবের সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাহিত্যের মধ্য দিয়া।

শঙ্করের জন্মস্থানের নাম আলিপুখুরি। বর্ত্তমান আসামের নওগাঁ শহর হইতে ষোল মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে

প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতার নাম কুসুমবর, মাতা—সত্যসন্ধ্যা। পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ, সেবা-পূজার মধ্য দিয়া ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ তাঁহারা পোষণ করিতেন।

সন্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সত্যসন্ধ্যার অন্তিম-কাল উপস্থিত হয়, ইষ্টবিগ্রহ শঙ্করের নাম জপ করিতে করিতে তিনি তনু ত্যাগ করেন। তাই তাঁহার নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় শঙ্কর। গৌরকান্তি, অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই শিশু, দর্শনমাত্রেই লোকের মন কাড়িয়া নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের ভার সযত্নে গ্রহণ করেন তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী।

শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ধনী সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী। তাঁহাদের বলা হইত শিরোমণি ভূঁইয়া, অর্থাৎ ভূঁইয়াদের মধ্যে ধনে মানে ও কীর্ত্তিকলাপে তাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সৎ কায়স্থ গৌড়দেশে নিয়া আসেন। এই কায়স্থদেরই কয়েকটি উত্তর পুরুষ পরবর্ত্তীকালে আসামে আসিয়া বসবাস করেন। আসামের অন্যতম রাজা দুর্লভনারায়ণ গৌড়ের অধিপতি ধর্ম্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কয়েকটি পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অনুমতি

---

১ অনেকের মতে, শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু আসামের ঐতিহাসিক স্যর এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম-সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহার ধারণা আরো ৩০।৪০ বৎসর পরে শঙ্করদেব ভূমিষ্ঠ হন।

অনিরুদ্ধ ছাড়া কোন অসমীয়া জীবনীকারই শঙ্করের জন্ম-সাল লিপিবদ্ধ করেন নাই। অনিরুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্করের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ, ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, শঙ্করদেবের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছিল, অহোম রাজা চুহু-মুঙ্ (১৪৯৭-১৫৩৯) এবং কোচরাজ নরনারায়ণের রাজ্যকালে (১৫৪০-১৫৮৪); সেই জন্য মনে হয় হয়তো প্রচলিত ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে অনিরুদ্ধ কথিত ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দকে শঙ্করদেবের জন্ম-সাল ধরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।— উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩।

দেওয়া হয়। তদনুযায়ী গৌড়রাজ একদল সদাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন। নবাগত ঐ কায়স্থদের মধ্যে কেহ কেহ নওগাঁ জেলার মৈরাবাড়ী অঞ্চলে নিজেদের বাসভূমি গড়িয়া তোলেন। আসামের রাজারা ইঁহাদের কর্ম্মদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া কোন কোন মৌজার শাসনভার অর্পণ করেন এবং ভূঁইয়া উপাধিতে ভূষিত করেন।

শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ চণ্ডী ভূঁইয়া ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধব রাজধর প্রভৃতিও ছিলেন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী। নিজ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া শঙ্কর পয়ার ছন্দে তাঁহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিয়াছেন :

বরদয়া নামে গ্রাম শস্যে মৎস্যে অনুপাম
লোহিত্যর অতি অনুকূল।
সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাজধর
কায়স্থ কুল পদ্মফুল ॥
তানে পুত্র সূর্য্যবর মহা বড় দেশধর
দানী মানী পরম বিশিষ্ট।
যার যশ এভো জলৈ জয়ন্ত মাধবদলৈ
তুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ ॥
তানে পুত্র কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার
প্রসিদ্ধ কুসুম নাম যার।
তানে সুত শিশুমতি কৃষ্ণপায়ে করি নতি
বিরচিল শঙ্করে পয়ার ॥

(১২০০১—২)

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষরা প্রতিষ্ঠাবান্ ভূম্যধিকারী ছিলেন। অনেকের মতে, তাঁহারা ছিলেন প্রতাপশালী বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শঙ্করের পিতা কুসুমবরের সময়ে পরিবারের পূর্ব্ব ধন-মানের গৌরব হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি একজন সম্পন্ন জমিদার এবং সদাচারী ও ধার্ম্মিক বলিয়া নিজ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন।

মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যত্নে যেমন লালিত হইতে থাকে, তেমনি তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থাও গোড়া হইতে করা হয়। নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই শঙ্করের চালচলন ও কথাবার্ত্তায় ফুটিয়া উঠে নানা বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্ব জন্মের শুভ সংস্কার নিয়া সে জন্মিয়াছে। সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামান্য মেধা ও প্রতিভা। এক একদিন বালকের প্রশ্নে ও কথাবার্ত্তায় ঝলকিয়া উঠে তাহার প্রতিভার দীপ্তি, বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত লোকেরাও ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যান। কবিতা রচনার শক্তিও স্ফুরিত হইতে দেখা যায় এই কচি বয়সেই। যুক্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই কিন্তু এই সময়েই সে রচনা করে তাহার প্রসিদ্ধ কবিতা—'করতল কমল কমলদল নয়ন।' সকলেই সোৎসাহে বলাবলি করিতে থাকেন,—'এ বালক বাক্‌দেবীর অনুগৃহীত, আশিস্ প্রাপ্ত, উত্তরকালে অবশ্যই এ প্রসিদ্ধি লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে।'

বারো বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভর্ত্তি করা হয় পণ্ডিতবর মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে এই আচার্য্য পারঙ্গম। কিশোর ছাত্রও তেমনি বিস্ময়কর ধীশক্তির অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠে। আচার্য্য মহেন্দ্র কন্দলী নিজে ভক্তিমান্ তাই ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহ বেশী। তাঁহার এই ভক্তি প্রবণতার প্রভাব কিশোর ছাত্র শঙ্করের উপরও বেশ কিছুটা আসিয়া পড়ে। নবীন ছাত্রের পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করিয়া ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া প্রবীণ আচার্য্যের হৃদয় আনন্দে গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

কয়েক বৎসর পরে শঙ্কর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু করেন হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর দর্শনের তত্ত্বালোচনা।

ভক্তি ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। শিক্ষক মহেন্দ্র কন্দলীর সান্নিধ্য ও প্রভাবও তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তরুণ পণ্ডিত শঙ্করের জিজ্ঞাসু মন

কিন্তু শঙ্করের এই গার্হস্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, বিবাহের চার বৎসর পরে সূর্য্যবতী এক শিশুকন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতা কুসুমবরও প্রস্থান করেন পরলোকে।

পর পর এই দুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে, জীবনে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ।

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এই ইচ্ছাও এসময়ে তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নির্দ্দেশটিও স্মরণে আসিয়া যায়। 'সংসারের প্রধান কর্ত্তব্যগুলি সমাপন করার পর পরিব্রাজন বা তীর্থ দর্শন করবে' এই কথাটিই বিশেষভাবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তাই শঙ্করকে আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। অতঃপর কন্যা মনুব জন্য হরি নামক এক সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবককে পাত্ররূপে তিনি নির্ব্বাচন করিলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন। এবার আসে শঙ্করের বিদায়ের পালা। বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয় জয়ন্ত ও মাধব দলই-কে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পরিব্রাজনে যাচ্ছি। সারা ভারতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে। পথে বিপদের অন্ত নেই, আর কোন দিন দেশে ফিরে আসবো কিনা তাও জানিনে। আমার কন্যা আর আত্মীয়-স্বজনেরা রইলো, তোমরা সতর্কভাবে তাদের দেখাশুনা করবে। আমার জমিদারী ও বিত্তবিষয় রক্ষণের ভারও রইলো তোমাদের ওপর। তোমরা আমার বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন; প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি নিয়ে আমার কর্ত্তব্য কাজ তোমরা চালিয়ে যাবে। শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বহু অনুরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

অতঃপর প্রায় বারো বৎসর তিনি আসামের বাহিরে নানা তীর্থে ও সাধনপীঠে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার অনুচরদ্বয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব।

শঙ্কর তীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রটিয়া গেল। আচার্য্য মহেন্দ্র কন্দলী তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন, 'বৎস, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভারতের বৈষ্ণব তীর্থগুলো পরিক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের। তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায়ও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

শিক্ষাগুরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন। আরো পনের যোলজন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া গেল। এবার শুরু হইল তাঁহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থযাত্রা। শঙ্করের এই তীর্থদর্শনের বিস্তারিত তথ্য ও কাহিনী তাঁহার বিভিন্ন চরিতকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন।[১] যেসব বৈষ্ণবতীর্থগুলি এ-সময়ে তিনি পরিক্রমা করেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ. অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি।

সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহার পরিব্রাজনে রত থাকেন বারো বৎসর ব্যাপিয়া। এই দীর্ঘ বৎসরগুলি তিনি শুধু বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করেন নাই, যেখানে যে দেবমন্দির বা সাধনপীঠে গিয়াছেন সেখানকার সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের সহিত মিলিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া প্রেম-ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়া সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে তিনি বাস করিয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বান্বেষী মন তৃপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানে।

এই সময়েই শঙ্করের জীবনে ঘটে বহুবাঞ্ছিত গুরুর আবির্ভাব। দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরু তাঁহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভক্তির সাধন পথ। বিদায়কালে নির্দ্দেশ দেন, "বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করি, শুদ্ধাভক্তির পথ অনুসরণ ক'রে তুমি ইষ্টলাভ করো। ভক্তির যে

১ শঙ্করের চরিতকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামচরণ ঠাকুর ও তৎপুত্র দৈত্যারি ঠাকুর, ভূষণ দ্বিজ, রামানন্দ দ্বিজ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি।

শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে, অচিরে তা সফল হয়ে উঠুক, চৈতন্যময় হয়ে উঠুক।”

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। একথা নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, “বৎস, বিধি-নির্দ্দিষ্ট বহু কাজ তোমায় সংসারে থেকে করতে হবে। সংসার জীবনে থেকে, সংসারকে ভগবৎ-সংসারে পরিণত করার কাজে তুমি আত্মনিয়োগ করো, এই আমি চাই। সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে, পরম কারুণিক বিষ্ণু বা তাঁর অবতার কৃষ্ণই হচ্ছেন মানবের উপাস্য, মানবের ইষ্ট। এই পরমপ্রভুর একান্ত শরণ নিয়ে, সর্ব্বত্র নামধর্ম্মের প্রচার করো, নামযজ্ঞ উদ্‌যাপন করো। নামী আর নাম অভেদ, এই পরম জ্ঞান ছড়িয়ে দাও আসাম রাজ্যের সর্ব্বত্র। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর তাঁর জীবন ও বাণীর ভাষ্যগ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমার সহায় হবেন।”

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও উদীয়মান্ ধর্ম্মনেতা। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের তীর্থ পরিব্রাজন এবং সিদ্ধ সাধুসন্ত ও তাত্ত্বিকদের সাহচর্য্য ও কৃপা তাঁহাকে পরিণত করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে। বৈষ্ণবীয় সাধনার দৃঢ়ভূমি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের অমৃতলোকের সিংহদ্বার।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আদিষ্ট কর্ম্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরী করেন নাই। সংসারী জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্ম্মে উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষ্ণের সংসারে পরিণত করিতে হইবে। তাই দ্বিতীয়বার তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন। আলিপুখুরির বসবাস উঠাইয়া দিয়া, নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নূতন ভবন ও প্রচার কেন্দ্র। শুরু করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান। নবদীক্ষিত শিষ্যদের সহায়তায় বরদোয়াতে একটি সত্র বা মঠ নির্ম্মিত হইল এবং প্রবর্ত্তিত হইল একটি নাম-ঘর। এই নামঘরে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গ্রাম সন্নিহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীর্ত্তনে ও নাম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দিন হইত নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

আচার্য্য জীবনের এই প্রথম পর্য্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া উঠেন শঙ্করদেব নামে, তাঁহার প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম অভিহিত হয় 'একশরণ ধর্ম্ম' নামে।

তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্মের মূল কথা,—এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হইতেছেন বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই অদ্বিতীয় পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একান্ত শরণ, উৎসর্গ করিতে হইবে মানবজীবন। শঙ্করের একশরণ ধর্ম্মে অপর উপাস্য বা ইষ্টের স্থান নাই। নিজের শুদ্ধাভক্তি ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, এককেন্দ্রিক রাখার জন্য একশরণীয়া ভক্তেরা কখনো অপর ইষ্ট বিগ্রহ বা দেবীর উপাসনা করিবে না, অপর দেবমন্দিরে যাতায়াত করাও চলিবে না। অন্যথায় ভক্তিসাধনা তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, পথচ্যুত।

"একশরণ ধর্ম্মে ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের মধ্যে কোন চাওয়া-পাওয়ার স্থান নাই, সুখ সুবিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। ভক্ত ত্যাগতিতিক্ষা বরণ করিবেন আর ভগবান্ তাহার জন্য পুরস্কার বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য—ভক্ত সাধক ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা নিয়া দৃঢ়পদে, ধীরে ধীরে, অধ্যাত্ম-উজ্জীবনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেন, নূতনতর অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন প্রাণ সঁাপিয়া দিবেন পরম প্রভুর শ্রীচরণে[২]।"

নামকীর্ত্তন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, বরদোয়ার সত্র ও নামঘরে ভক্ত নরনারীর ভীড়ের অন্ত নাই। চারিদিকে তখন শঙ্করদেবের নূতন ভক্তিধর্ম্ম নিয়া চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু শঙ্করদেবের মনে উৎকণ্ঠার অবধি নাই। যে মহান্ ঐশ্বরীয় কর্ম্ম তিনি উদ্‌যাপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভাবালুতা কিছুদিন পরে স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে।

১ শঙ্করদেব : বৈষ্ণব সেইন্ট্ অব্ আসাম—বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

২ শঙ্করদেব (চৈতন্য টু বিবেকানন্দ : অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ)—বাণীকান্ত কাকতি

তাছাড়া, তাঁহার নূতন ধর্ম্মের বিরোধী শক্তিগুলিও কম সক্রিয় নয়। শঙ্কর জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে তাঁহার ভক্তি আন্দোলনে টানিয়া আনিতেছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পাণ্ডাদের প্রাধান্য খর্ব্ব করিতেছেন। ইহার ফলে অচিরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত। এ সম্পর্কে অবহিত না হইলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বিপদ অনিবার্য্য।

এজন্য দরকার তাঁহার এই নূতন ভক্তিধর্ম্মের একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই তাঁহার প্রচারিত উদার ও সর্ব্বজনীন ভক্তি আন্দোলন স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিবে। এজন্য ভাগবত পুরাণের সাহায্য তাঁহাকে নিতে হইবে। ভাগবতের আলোকে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা ও অমৃতময় বাণীর নূতন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিস্তারিত করিতে হইবে তাঁহার এই নবধর্ম্ম। কৃষ্ণভক্তিকে তিনি ছড়াইয়া দিবেন সমাজের সর্ব্বস্তরে, একশরণীয়া ভক্তিধর্ম্মকে জনমানসে করিবেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাছাড়া, এই মহান্ কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চাই একটা দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ সংগঠন। স্থির করিলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত হইবে একটি করিয়া সত্র বা মঠ, এবং প্রতি শহরে জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে নামঘর যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নির্ধন, শুদ্ধাচারী সাধক ও পাপাচারী পাষণ্ডীরা, সবাই মিলিতভাবে করিবে নামকীর্ত্তন, প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিবে পরম প্রভুর পুণ্যময় লীলাকথা।

প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বহুতর বিপদ ও বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু সব কিছুই তিনি অতিক্রম করেন আপন আত্মিক শক্তির বলে। ধর্ম্ম দেশ ও জাতির উজ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে তাঁহার জীবনের ঐশী নির্দ্দিষ্ট ব্রত।

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চলিয়াছে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও অবক্ষয়ের যুগ। সমগ্র আসাম বহুতর স্বাধীন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। দূর পূর্ব্বাঞ্চল চুটিয়াদের শাসনাধীন, দক্ষিণ-পূর্ব্বে রহিয়াছে কচরীদের অধিকার। ইহাদের আশেপাশের স্থান ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ভুঁইয়াদের কর্তৃত্বাধীন। দূর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল কামতা রাজ্যের শাসন। সে-সময়ে উহা কুচবিহার নামে পরিচিত। কোচ রাজারা সেখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অবশিষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজের অধিকারে। আসামের জনজীবন এইরূপ বহু প্রতিযোগী রাজশক্তির দ্বারা বহু-বিচ্ছিন্ন।

এসময়কার ধর্ম্মীয় জীবনে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব—তান্ত্রিক ধর্ম্মের। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রধানতঃ সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ এই ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। খণ্ডজাতীয় লোকেরা হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত প্রেত ও বৃক্ষপূজায়ই তাহারা বেশী বিশ্বাসী।

সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে তন্ত্রধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের প্রচলন রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই তন্ত্রধর্ম্ম এবং সাধনার মধ্যেও এসময়ে দেখা দিয়াছে নানা অনাচার। তন্ত্রের উচ্চতর নিগূঢ় সাধন সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত ধর্ম্মের নামে লিপ্ত আছেন পাপকর্ম্ম, ভোগলিপ্সা ও ব্যভিচারে।

এই প্রসঙ্গে আসামের তন্ত্রপীঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু দেখিয়া নেওয়া দরকার। পৌরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামরূপ রাজ্য, রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে—বর্ত্তমানে যাহা গৌহাটি নামে পরিচিত। প্রাচীনকাল হইতেই এখানে তন্ত্রধর্ম্মের প্রচলন ছিল। রাজারা ও উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন তন্ত্রমতেরই ধারক বাহক। নীলাচল বা কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার পীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানই উদ্বুদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, অমাত্য ও আচার্য্যদের। মহাভারত এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরাণশাস্ত্রে, বিশেষত কালিকা পুরাণে, কামরূপের তান্ত্রিকতার নানা কাহিনী পাওয়া যায়।[১]

---

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ এথিক্স্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন (২-১৩৩)

প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউএনথ্‌ সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা সমকালীন আসামের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা তথ্য পাই। কুমার ভাস্করবর্ম্মণ তখন কামরূপের রাজা। রাজা ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিয়া গিয়াছে ধর্ম্মীয় গণ্ডীর বাহিরে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে রণকুশল অহোমরা বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে; কামরূপের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় ছেদ পড়িয়া যায়।

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপত্তি। ইহারা জাতিতে শান্‌, উত্তর বর্ম্মা হইতে পাতকই গিরিপথ দিয়া ইহারা অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে। শান্‌ জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তর্ঁ্যা দ্য লাকুপ্‌রি বলেন, এই জাতি মঙ্গোল, নেগ্রিটো ও চীনেদের এক সংমিশ্রণ। যুদ্ধকুশল, দৃঢ়চেতা ও পরিশ্রমী বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। কিন্তু সুজলা সুফলা উপত্যকায় বাস করার পর কয়েক শতকের মধ্যে ইহারা শক্তিহীন ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠে। অহোম রাজারা এবং সাধারণ অহোমরা প্রাচীন কামরূপীয় জাতিগুলির সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং কালক্রমে তাহাদের জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়।

অহোম রাজারা খুব ইতিহাস-সচেতন, তাঁহাদের সময়কার লেখা বুরুন্‌জী-তে রাজশক্তির উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে। অহোম রাজাদের প্রায় সবাই তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী কামাখ্যার উৎসাহী ভক্ত ছিলেন। আসামের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে ইঁহাদের অবদান যথেষ্ট।

ষোড়শ শতকে, বৈষ্ণব আচার্য্য শঙ্করদেবের অভ্যুদয় কালে পশ্চিম আসামে রাজত্ব করিতেছিলেন কোচ রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮–১৫৮৪), আর পূর্ব্বাঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছিল অহোম রাজা চুহমুঙ-এর (হিন্দু নাম—স্বর্গনারায়ণ) অধিকারে।

নরনারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি চিলা রায়ের অসামান্য শৌর্য্য ও দক্ষতায় রাজ্যের প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়, আর নরনারায়ণ নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তন্ত্রধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে। মুসলমান আক্রমণ-কারীরা কামাখ্যা মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজা নরনারায়ণ এটি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন এবং সাড়ম্বরে এই ইষ্টদেবী বিগ্রহের করেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আসামের তান্ত্রিকদের আচার আচরণে এসময়ে নানা দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করে, শক্তি সাধনা ও শক্তি আরাধনার মধ্যে দেখা দেয় পাপের পঙ্কিলতা। সমকালীন এই অবক্ষয়ের চিত্রটি ঐতিহাসিক গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট : "এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অন্যতম প্রথা ছিল জীবহত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকা ; ইহাতে মানুষ-বলিও বাদ দেওয়া হইত না। কালিকা পুরাণে বলা হইয়াছে, সেই মানুষকেই বলিরূপে উৎসর্গ করা যায়, যার দেহে কোন খুঁত নাই। এ ছাড়া ঐ বলিযোগ্য মানুষটিকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়া শিরশ্ছেদ করা হইবে, কিভাবে রুধির রাখিতে হইবে, এসব অনেক কিছু খুঁটিনাটি তথ্যও ঐ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

"কামাখ্যা দেবীর নূতন মন্দিরের যেদিন উদ্বোধন করা হয়, সেই উৎসব দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বলিদান। এ উৎসবে অন্যূন একশত চল্লিশটি মানুষের মস্তক খড়্গাঘাতে ছেদন করা হয় এবং এই রক্তাপ্লুত মস্তকগুলি তাম্রপত্রে সজ্জিত করিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয় দেবীর চরণে। হাফৎ ইক্লিম-এর বর্ণনা অনুসারে, এই সময়ে কামরূপে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহারা স্বেচ্ছায় দেবীর বলিরূপে নিজেদের নিবেদন করিত—ইহারা অভিহিত হইত 'ভোগী' নামে। যেদিন তাহারা ঘোষণা করিত, দেবী তাঁহাদের আহ্বান জানাইয়াছেন এবং বলিরূপে উৎসর্গীত হইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত, সেই দিন হইতে তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোন বাধা দেওয়া হইত না। সে অঞ্চলের যে কোন রূপসী নারীর দেহ তাহারা নির্ব্বিবাদে সম্ভোগ করিতে পারিত। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে কাঠগড়ায়

ফেলিয়া করা হইত তাহাদের মুণ্ডচ্ছেদ এই সময়কার একদল তান্ত্রিকের কাছে নানারূপ ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোন কোন ভবিষ্যৎবক্তা ও তান্ত্রিক অভিচারকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহ ছেদন করিয়া ভ্রূণ বাহির করিতেন এবং রহস্যজনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিত। এইসব তান্ত্রিকেরা চক্রে বসিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো যেসব জঘন্য কুক্রিয়া করিত তাহা প্রকাশযোগ্য নয়।[১]

অধঃপতিত ও তান্ত্রিকদের মণ্ডলীগুলি পর পর বহু অসমীয়া রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয়। এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হৃতগৌরব ও পতনশীল, এবং এই রাজবংশগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য সমাজ হইতে। ইহাদের ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকেরা সমকালীন আসামের জনজীবনে সৃষ্টি করিয়াছিল রহস্যময় বিভীষিকা ও নৈরাশ্যের।[২]

শঙ্করদেবের প্রচারিত উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং সুস্থ নীতিধর্ম্মভিত্তিক সামাজিক জীবন গঠনের আহ্বান এসময়ে আগত হয় দেবতার আশীর্ব্বাদ রূপে। নিপীড়িত, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, মানুষের সম্মুখে একশরণ ধর্ম্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহামন্ত্র।

ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে স্থাপন করিতে হইবে, জনমানসে ব্যাপকভাবে ইহার তত্ত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, এজন্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি সহজবোধ্য ও সুললিত অসমীয়া অনুবাদ। শঙ্করদেব নিজে প্রতিভাধর সাহিত্যিক, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিধর্ম্মের আকর এবং প্রকরণ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড ইতিপূর্ব্বে তিনি পাঠ করিয়াছেন। তাই তাঁহার পক্ষে একটি অসমীয়া ভাগবত রচনা করা খুব কঠিন কাজ নয়।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পাঁচশত

---

১ হিস্টরী অব আসাম: স্যর এডওয়ার্ড গেইট।

২ ই·আর ই: আসাম—অ্যাণ্ডারসন।

বৎসর পূর্ব্বে, বিশেষত তন্মধ্যে আসাম রাজ্যে, ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। শঙ্করদেব বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাঁহার সকল কিছু সমস্যার চমৎকার সমাধান হইয়া গেল।

বরদোয়ার সত্রে সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া শঙ্করদেব বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পুরীধাম হইতে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া শঙ্করদেবের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ যুক্তকরে সবিনয়ে কহিলেন, "আমার নাম জগদীশ মিশ্র, নিবাস মিথিলার ত্রিহুতে। আপনার দর্শনের জন্যই আমি এতটা দূরের পথ এসেছি।"

শঙ্করদেব সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। মধুর কণ্ঠে কহেন, "আপনার আগমনে আমরা সবাই পরম আনন্দিত। আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি। কিন্তু কি কারণে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, দয়া ক'রে তা প্রকাশ করুন।"

"তবে শুনুন। অন্তরে আমার সঙ্কল্প ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, প্রভু জগন্নাথদেবের সম্মুখে ব'সে গোটা ভাগবত আমি পাঠ ক'রে শোনাবো। সে পবিত্র কাজ শুরুও করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ—'ওহে মিশ্র, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। কিন্তু আরো বেশী প্রসন্ন হবো একটি কাজ করলে। অচিরে তুমি আসামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার পরম ভক্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে বসে পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ করো।' এই আদেশ পাবার পর আর আমি দেরী করি নি। গ্রন্থের পেটিকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

একি অদ্ভুত কৃপালীলা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের! অন্তর্য্যামী শঙ্করদেবের অন্তরের কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব করেন নাই।

অশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্করদেব ভক্ত মিশ্রজীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। পরদিন হইতে শুরু হইল প্রভুর আদিষ্ট ভাগবত পাঠ।

কথিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ মিশ্র বৎসর খানেকের বেশী জীবিত থাকেন নাই। মনে হয় যেন প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন করাই ছিল এই পরম ভক্তের জীবনের প্রধান ও পবিত্রতম কাজ। সে কাজ সমাপ্ত হইবার অল্পকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পড়িয়া গেল।[১]

সাধক শঙ্করদেব এবার দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড এবার তিনি ভাষ্যসহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলেন। তারপর শুরু করিলেন অসমীয়া ভাষায় এবং সুললিত কাব্যছন্দে তাঁহার মহান্ গ্রন্থের রচনা। তাঁহার এই অসমীয়া ভাগবত একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়া ভক্তের প্রাণে কৃষ্ণরস সিঞ্চন করিয়াছে, তাহাদের জীবনে ভক্তিধর্ম্মের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি ইহা গণ্য হইয়াছে অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উৎসরূপে। রাজ্যের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান হইয়াছে সুদূরপ্রসারী।

অসমীয়া বৈষ্ণব শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রতিবেশী, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রায় সমকালীনও বটে। উত্তর-জীবনে শঙ্করদেব একবার তাঁহার বহু ভক্তশিষ্যসহ তীর্থ দর্শনের কালে প্রভু চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়ীয় মতবাদ দ্বারা তেমন বেশী প্রভাবিত হয় নাই।

নিজের ধর্ম্মমত প্রচারে এবং অসমীয়া ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তি ও একান্ত শরণাগতির উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী ; দাস্য-ভক্তিভাবের দিকেই তাঁহার প্রধান প্রবণতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত তিনি মাধুর্য্যরসের তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেন নাই।

ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে— রসিকশেখর কৃষ্ণ কেলি করিতে করিতে হঠাৎ কোন এক গোপীকে নিয়া অন্তর্দ্ধান হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই গোপীকে চিহ্নিত করিয়াছেন রাধা বলিয়া।

[১] শঙ্করদেব : বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

শঙ্করদেব কিন্তু ইঁহাকে রাধা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণের আরাধিকা কোন গোপীর কথাই তিনি বলিয়াছেন।

কৃষ্ণকে গোপীরা বনাঞ্চলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সেস্থলে কিন্তু তাঁহাদের মুখ দিয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কথা বাহির করেন নাই, বরং চমৎকার রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শুদ্ধাভক্তি ও দাস্য ভাব। গোপীরা বলিতেছেন:

আকে পাইলে পাতকিয়ো সংসার নিস্তার।
শুদ্ধ হঞুঁ বুলি ব্রহ্মা হরো শিরে ধরে॥
আইস ঘসো এহি ধূলি আমিয়ো মাথাত।
হুয়া শুদ্ধ মাধবক দেখিবো সাক্ষাত।
জগত দুর্লভ কৃষ্ণ পদরেণু মাখি।
হেনোবা পবিত্র হুয়া কৃষ্ণমুখ দেখি॥

—এসো আমরা কৃষ্ণের সেই পদধূলি মাথায় মাখি, যার মহিমায় সংসারের পাতকীরা সংসার থেকে পায় নিস্তার, যা মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হন ব্রহ্মা আর হর, এ ধূলি মাথায় নিলে আমরা হবো পরিশুদ্ধ, সাক্ষাৎ মাধবের পাবো দর্শন।

দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের তুলিকায় গোপীরা চিহ্নিত হইয়াছেন দাস্যভক্তির সংবাহিকা রূপে, মধুর রসের দ্যোতনা তাঁহাদের মধ্যে নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিবাদের আরো পার্থক্য আছে। গৌড়ীয়েরা জপ ও কীর্তন করেন 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া বৈষ্ণবেরা স্মরণ ও মনন করেন চারি নাম।

"সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে। বাংলার বৈষ্ণবধর্মে রূপের ও রসের উপাসনা। ইহাতে নিরাকার ব্রহ্মের স্থান নাই। কিন্তু শঙ্করদেব তাঁহার ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

প্রণত তারণ নারায়ণ নিরাকার
কৃষ্ণের চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

রাসলীলা শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ কথামৃত কর্ণ ভরিয়া পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাভ হইবে—

"মোক্ষজেবে পাইবা পাপ করিয়া নির্ঘাল
কৃষ্ণকথামৃত কর কর্ণভরি পান[১]।"

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই মতবাদ সদাই অতিশয় সতর্কভাবে পরিহার করিয়া চলেন।

শুদ্ধাভক্তির ব্যাখ্যাতা শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবতের স্থানে স্থানে কিন্তু গোপীদের প্রেম-মধুর ভাবটিও অতি মনোরম ভাষায় এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য-সুষমা ও প্রেমরসের অপূর্ব্ব সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে। শঙ্করদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের সঙ্গীত অতি মনোরম:

পরম মোহন বংশী যাও চুম্বি তোলৈ নাদ
বঢ়াবয় সম্যকে সুরতি।
মহা মহা সার্ব্বভৌম রাজাবো সুখক লাগি
যাক দেখি না যাই আউর মতি॥
লোকর সমস্ত শোক দুঃখ-ভয় বিনাশয়
দরশন মাত্র কতে যাক।
জগতের মনোনিত হেনয় অধরামৃত
দিয়া আমি জীয়ায়ো আমাক॥

(ভাগবত—১১৯-২৮)

শঙ্করদেব ভক্তির কথা, সাধনার কথা বলিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই। ভক্তিধর্ম্মের যে নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-সাহিত্য ও উপদেশের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নাই।

১ অসমীয়া ভাগবত ও শঙ্করদেব, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩;—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

"জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ—ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কেননা, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। তাই স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অভেদ; কিন্তু জীবাংশে মায়া বর্ত্তমান এবং ঈশ্বর মায়াতীত। এই নিমিত্ত ভেদজ্ঞানও বর্ত্তমান। এ বিষয়ে তিনি ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়া শ্রীশঙ্করদেবের মতকে 'ভেদাভেদ'-বাদও বলা যায়। ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করদেবের আদর্শ স্পষ্টতর গীতোক্ত 'পুরুষোত্তম'। ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে স্বতন্ত্র নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষোত্তমই অনন্ত নামরূপী ভগবান্। নাম-ধর্ম্মের ইহাই এক বিশেষত্ব[১]।"

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে শঙ্করদেব বরদোয়ার বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রতিবেশী কচরী-রাজ ও তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ প্রজারা বার বার এ অঞ্চলে হামলা করিতে থাকে। এই উপদ্রব ও অশান্তি এড়ানোর জন্য শঙ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত করেন। তারপর স্থায়ীভাবে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বসবাস করিতে থাকেন ধুয়াহাটাতে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মজুলি দ্বীপের এই স্থানটি যেমনি শান্তিপূর্ণ ও মনোরম, তেমনি শস্য-শ্যামল। এই স্থানে বসিয়া আপন উদার ভক্তিধর্ম্ম তিনি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন।

ভাগবত পুরাণ শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাভরে তিনি বলিয়াছেন

পুরাণ সূর্য্য মহা ভাগবত
বেদান্তরো ইতো পরমতত্ত্ব'

এই পরমতত্ত্বকে অধিগত করিতে হইবে শরণাগতি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সহায়ে। বৈষ্ণব সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্তির সহায়ক এই শ্রদ্ধাভক্তির গুণ-কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

১ শ্রীশঙ্করদেব ও নামধর্ম্ম; উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫;—সত্যেন্দ্র শর্ম্মা রায়।

প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে ভজন করে
ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে,
একবারে মিটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন।
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভক্তি,
দেহাত্মক বুদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত,
হৃদয়ে তাঁর স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে
প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের মাধুর্য্য-মূর্ত্তি।
ত্রয়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীবনে,
ক্ষুধার্ত্ত অভাগার কাছে
এক-এক মুষ্টি অন্ন, হয়ে উঠে পরমান্ন।
প্রতি গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্টি
হে রাজন্, প্রেম-ভক্তির পেলে শুধু একটি কণা,
জীবনের পরম ক্ষুধার হয় চিরনিবৃত্তি।

(নিমি নব সিদ্ধ সম্বাদ)

শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাহিনীর বিন্যাস, তত্ত্বের ব্যাখ্যান, কবিত্ব ও পদ-মাধুর্য্যের লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। বহু প্রতিভাধর অসমীয়া পণ্ডিত ও ছাত্র ভাগবত পুরাণে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

শঙ্করের জীবনীকার ভূষণ দ্বিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কণ্ঠভূষণ নামে এক অসমীয়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কিছুদিনের জন্য বারাণসীতে গিয়াছেন। আশ্রয় নিয়াছেন তিনি ব্রহ্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদান্তীর চতুষ্পাঠীতে। একদিন শাস্ত্রতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ টানিয়া আনিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, ছাত্রদের অনেকেই ভাগবতের এই শ্লোকটির মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিতেছে না, চুপ করিয়া তাহারা বসিয়া আছে। এমন সময়ে অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কণ্ঠভূষণ, উঠিয়া দাঁড়ান, শ্লোক কয়টির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন।

ব্রহ্মানন্দজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, ভাগবত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছো তা প্রশংসনীয়। বলতো, কোথায় তুমি এসব শিখলে ?"

কণ্ঠভূষণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু বৈষ্ণব আচার্য্য শঙ্করদেবের রচিত অসমীয়া ভাগবত আমরা পাঠ করতে অভ্যস্ত। তাই এই শ্লোক কয়টির তত্ত্ব আমার অজানা নয়।"

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব আখ্যান ও উপকথা নিয়া শঙ্করদেব অসমীয়া ভক্তদের জন্য ছোট বড় বহুতর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আসামের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এগুলি পরম সম্পদরূপে গণ্য।

শঙ্করদেবের কীর্ত্তন তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমনি পরিচয় দেয় অসামান্য কাব্য প্রতিভার। এই সুললিত কীর্ত্তনে প্রেমভক্তি লীলার নানা অনুভূতি—মিলন বিরহ, আনন্দ দুঃখ, রোষ ও ক্ষমা প্রভৃতির অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, শঙ্করদেবের কীর্ত্তন সকল বয়সের শ্রোতাদেরই আনন্দ দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। শিশুরা কীর্ত্তনে বর্ণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকৃষ্ট হয়, যুবজনেরা মুগ্ধ হয় কবিত্বের মধুর রসে, আর প্রবীণেরা তৃপ্তি লাভ করেন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যানে।

একটি মনোরম কাব্যকাহিনীর বর্ণনায় বৈষয়িক সম্পদের তুচ্ছতা ও আনন্দের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব বলিতেছেন—

তিন লোকে রয়েছে কত ধন সম্পদ,
রয়েছে দিব্য রূপলাবণ্যবতী কত নারী—
রাজ অট্টালিকা আর রাজকোষের রত্ন,
কিন্তু এত কিছু প্রাপ্তির পরেও কি
নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা ?
গয় আর পৃথুর মত রাজার ধনতৃষা
হয় কি কখনো বিদূরিত ?

সপ্তদ্বীপ পদানত করেছেন অবলীলায়,
কিন্তু বাসনা জয়ে তাঁরা হয়েছেন ব্যর্থ।
ইন্দ্রিয়কে যে করে বশীভূত
হৃদয়ে যার নেই তৃষ্ণা আর আর্ত্তি,
দিব্য আনন্দের সেই যে শুধু অধিকারী।
লোভ আর আসক্তি যদি না হয় সংযত
তিন ভুবনের সম্পদেও আসবেনা তো সন্তুষ্টি।
(বালী ছলন—শঙ্করদেব)

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগীত বা ভজন-সঙ্গীত। এই বরগীতগুলিতে ছড়ানো রহিয়াছে আত্মিক অনুভূতি, পরমার্থ তত্ত্ব ও ভক্তহৃদয়ের আর্ত্তি।

প্রথম জীবনের একটি বরগীত-এ শঙ্করদেবের শরণাগতির মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আমরা পাই। এই ভজনগীতটি তিনি রচনা করেন হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে বসিয়া। তিনি গাহিয়াছেন—

মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীরাম-চরণে,
দেখছো না কি—অন্ত আসছে এগিয়ে ?
আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষীণ
জীবনদীপ অচিরে হবে নির্ব্বাণ,
কাল-ভুজঙ্গ এগিয়ে আসে ঐ প্রতিদিন,
—মৃত্যু নিয়ে আসে সর্ব্ব বিনষ্টি।
এই ভঙ্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত,
তাই মন মোর ভেদ করে মায়াজাল,
শরণ নাও শ্রীরাম-চরণে।
হে দুর্ভাগা মন, তুমি যে অন্ধ,
বিষয়-ধাঁধায় মরছো তুমি ঘুরে ঘুরে।
জেগে ওঠো তামসিক সুপ্তি থেকে,
জেগে ওঠো, ভজ এবার শ্রীগোবিন্দ।
হে মন, শঙ্কর বলছে দৃঢ়স্বরে,
রাম চরণ বিনা নাই কো তোমার গতি।

আর একটি বরগীত-এ পরমপ্রভুর কাছে ভক্ত শঙ্করদেব জানাইতেছেন তাঁহার হৃদয়ের আকুতি, মাগিতেছেন পরমাশ্রয় :

হে প্রভু নারায়ণ,
চরণে তোমার এই প্রার্থনা আজ মোর,
বিষয়-বিলাস-পাশ থেকে দাও মুক্তি।
নাসিকা মোর সুগন্ধের জন্য লুব্ধ,
শ্রবণ মাগে সুমধুর নারীকণ্ঠ,
নয়নদ্বয় হয়েছে অধীর
দেহের রূপ আর স্পর্শসুখের লাগি,
তবে কি ক'রে ক'রবো তোমার ভজন ?
কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান--
এই সব মহাশত্রু করেছে আমায় বেষ্টন।
শঙ্কর কহে আকুল স্বরে,
হে প্রভু, হে আমার গোপাল,
তোমার এই দীন দাসকে
কে বাঁচাবে এই শত্রুদলের হাত থেকে ?

অংকিয় নাট এবং ভাওনা আসামের ধর্ম্ম সংস্কৃতিময় জীবনে শঙ্করদেবের আর দুইটি বড় অবদান। সঙ্গীতময় নাট্য অভিনয়, ধর্ম্মীয় কাহিনীর রূপায়ণ ও সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় এই অভিনয় জনচিত্ত জয় করিয়াছে এবং শত শত বৎসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবাহিত করিয়াছে ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মহলে, দূর-দূরান্তের জনপদে ও শহরে, এই অংকিয় নাট আর ভাওনা কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণকাহিনীর অমৃত স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে,- শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মকে করিয়াছে সর্ব্বজন-বোধ্য, সর্ব্বজনপ্রিয়।

শঙ্করদেবের প্রধান ভক্ত মাধবদেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "ইতিপূর্ব্বে প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হতো শুধু স্বর্গের সীমানার ভেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন শক্তিবলে ভেঙে দিলেন

সেই তটিনীর তটভূমি, তাইতো তার অমিয়-ধারা আজ মর্ত্তের দিকে দিকে হচ্ছে বিস্তারিত।"

ধূয়াহাটাতে শঙ্করদের তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, অসমীয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে উভয়ের এই সাক্ষাৎ স্মরণীয় হইয়া আছে।

লখিমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ বয়সেই শাক্ত শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন, তান্ত্রিক আচার্য্যদের আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও অর্জ্জন করেন দক্ষতা।

মাধবদেবের জননী একসময়ে খুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন, চিকিৎসা নানা রূপই করা হয়, কিন্তু রোগিনীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না। মাধবদেব অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়া উঠিলে, দেবী-বিগ্রহের প্রীত্যর্থে একটি ছাগশিশু বলিরূপে প্রদান করিবেন।

জননী কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। এবার প্রতিশ্রুত বলিদান সম্পন্ন করিতে হইবে। মাধবদেবের ভগ্নিপতির নাম গয়াপানি, তিনি শঙ্করদেবের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। পারিবারিক অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্নিপতির উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহাকে কহিলেন, "ভাই, তুমি খোঁজখবর করে, বলিদানের উপযোগী নিখুঁত একটি ছাগশিশু আমায় এনে দাও। দেবীর কাছে যে মানৎ করেছি তাড়াতাড়ি তা আমায় রক্ষা করতে হবে।"

গয়াপানি শ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, "তুমি দেখছি, মহাশক্তি জগজ্জননীকে ছাগশিশুর কচি মুণ্ডু খাইয়েই সন্তুষ্ট করতে চাও। পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে, এসব কি করছো, বলতো ?"

মাধবদেব তো মহা ক্রুদ্ধ। কহিলেন, "শাক্তধর্ম্ম আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। এর মর্ম্ম তুমি বুঝবে কি ? তোমার গুরু শঙ্করদেবই যে তোমার মাথাটি গুলিয়ে দিয়েছে। ছাখো, আমাদের দেবী যেমন জাগ্রত, তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানও তেমনি সদ্য ফলপ্রদ। তোমাদের

বৈষ্ণবেরা যত লাফালাফি করুক আর যত নেচে গেয়েই বেড়াক, দেবতার আসন তাতে টলে না।”

গয়াপানি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। ধর্ম্মের প্রাণবস্তু কি তা জানলে না, ভগবান্ জীবের প্রেম চান—না ছাগলের রক্ত চান, তা বুঝতে চাইলে না। অনেকবার তো বলেছি, চলো আমাদের গুরু শঙ্করদেবের কাছে, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি তা জানতে পারবে।”

অনেকদিনই মাধবদেব ভগ্নিপতির মুখে একথা শুনিয়াছেন। আজ তাঁহার জেদ চাপিয়া গেল। কহিলেন, “বেশ, চলো তোমার গুরুর কাছে। শাক্তধর্ম্ম বড় না বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়, তার বিচার আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে এসেছি। আজ আমি তাঁকে যাচাই ক'রে দেখবো, আহ্বান করবো তর্কবিচারে।”

অতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে। আত্মপ্রত্যয়ের সুরে মাধবদেব কহেন, “আচার্য্য, আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, আমি শুনেছি। নূতন ভক্তিধর্ম্ম আপনি আসামে প্রচার করেছেন এবং জাতিভেদ ও অধিকারীভেদ না মেনে নির্ব্বিচারে দিয়ে চলেছেন নামমন্ত্র। কিন্তু এতো শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র ও পার্ব্বত্য জাতি, সবাইকে এক ক'রে দিলে তো এই সুপ্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচানো যাবে না। সারা দেশ তলিয়ে যাবে রসাতলে। আপনি আমার সঙ্গে বিচারসভায় বসুন। যদি আমি পরাস্ত হই, শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো। আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে।”

“ধর্ম্ম রসাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হচ্ছে বলেই তো আমার এই উদার সর্ব্বজনীন ভক্তিধর্ম্মের প্রচার আমি প্রাণপণ প্রয়াসে করছি।” সহাস্যে উত্তর দেন শঙ্করদেব।

“যাই হোক, স্থানীয় বিদ্বান্‌মণ্ডলীকে ডাকুন। তাঁদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হোক আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ। দেখা যাক, কার মতবাদ জয়ী হয়।”

শঙ্করদেব এই দ্বন্দ্বের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন সমাগত শাস্ত্রবিদ্ ও সুধীজনের সম্মুখে শুরু হইল তত্ত্ব বিচার।

শঙ্করদেব সর্ব্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাছাড়া, নূতন ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া আসামের শাক্ত ও তান্ত্রিকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইবে, এজন্য শাক্ত শাস্ত্র তিনি অভিনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন। সর্ব্বোপরি ভারতের ভক্তি-আন্দোলনগুলির নিহিত তত্ত্ব তাঁহার অধিগত।

বিচার সভায় প্রথমে তিনি শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের যুক্তি-তর্কগুলি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপব প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার নব ভক্তিবাদ। হিন্দু শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে ভক্তিবাদের সমর্থক অজস্র শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

সুগৌর কান্তি, সমুন্নত বপু, পরম প্রশান্ত, ভক্তি-আন্দোলনের এই বর্ষীয়ান্ নেতার ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে তাহা কে জানে! বিচার বিতর্কে দক্ষ এবং আপন পাণ্ডিত্যে চির-আস্থাবান্ মাধবদেব সব কিছুর খেই হারাইয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে শঙ্করদেব দিব্য আবেশে উদ্দীপিত হইয়া আবৃত্তি করিলেন, ভাগবতের সেই মহান্ ভক্তি-রসাত্মক শ্লোকটি, যাহার মর্ম্মকথা :—

তরুর মূলে সিঞ্চন ক'রো স্নিগ্ধ সলিল,
তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশক্তি
তরুর যত শাখা আর পত্র পল্লব।
জঠরে প্রদান কর ভোজ্য বস্তু—
সারা শরীর ও ইন্দ্রিয় তোমার হবে প্রাণবন্ত।
তেমনি প্রভু অচ্যুতের চরণে ঢালো ভক্তিরস,
সর্ব্ব দেবদেবী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট।

আবেগকম্পিত স্বরে, করজোড়ে মাধবদেব কহিলেন, "আচার্য্য আপনার মাহাত্ম্য আপনার ভক্তিধর্ম্মের মাহাত্ম্য আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি আপনার সাধনোজ্জ্বল

তত্ত্ব ব্যাখ্যানে! আজ থেকে আপনার চরণে আমি শরণ নিলাম। এখন থেকে সারা আসাম রাজ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করা হবে আমার জীবনের প্রধান ব্রত।"

প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন প্রতিভাধর পণ্ডিতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাঁহার 'একশরণ' মণ্ডলীতে।

শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কন্যার সঙ্গে। গুরুর আশ্রয় লাভের পর মাধবদেব সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, গার্হস্থ্য আশ্রমে তিনি আর প্রবেশ করিবেন না, বৈষ্ণবীয় সাধনায় এ জীবন উৎসর্গ করিবেন, একান্তভাবে গুরুর ভক্তি-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ।

নবীন শিষ্য মাধবদেবকে গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করানোর জন্য শঙ্করদেব ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মাধবদেবকে রাজী করানো যায় নাই। ত্যাগ-তিতিক্ষাময় বৈরাগীর জীবনই তিনি নিজের জন্য চিরতরে বাছিয়া নেন।

উত্তরকালে বহু বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই বৈরাগ্যপূত, ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ করেন। এই বৈরাগী সাধকেরা সত্রসমূহের পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কেওয়ালিয়া (চিরকুমার) বৈষ্ণব সাধক রূপে ইঁহারা পরিচিত হইয়া উঠেন।

মাধবদেবের আগমনে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেক বেশী শক্তিশালী হয় এবং মাধব গণ্য হন তাঁহার প্রধান শিষ্যরূপে। উত্তর-কালে অসমীয়া বৈষ্ণবদের এক প্রখ্যাত নেতা বলিয়া মাধবদেব কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরেও মাধবদেব তাঁহার অসামান্য সংগঠন শক্তি নিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জীবন সাধন করেন, নিজস্ব সাধন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভক্তি-আন্দোলনের স্রোতকে আরও বেগবতী করিয়া তোলেন।

অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্করদেবকে লিপ্ত হইতে

হয়। অহোমরাজ চুহুমুঙ-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঙ্করদেবের ডাক পড়িল। সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন।

রাজা কহিলেন, "শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস করছেন, ভালো কথা। কিন্তু আপনি নাকি নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের অছিলায় নানা অনাচার করে চলেছেন। হিন্দু ধর্ম্মবিরোধী ও বেদ-বিরোধী পাপ কার্য্যে আপনি লিপ্ত আছেন। রাজসভার পণ্ডিতেরা আর তান্ত্রিক মোহান্তেরা এই অভিযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে।"

শঙ্করদেব প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আমি হিন্দুধর্ম্মের ক্ষতিসাধন করছি, এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। বরং হিন্দু-ধর্ম্মকে বাঁচানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ধর্ম্মের দীপ জ্বালানোর জন্যই আমি উৎসর্গ করেছি আমার এই জীবন।"

"বেশ তো, তা হলে আপনি সভায় উপস্থিত অভিযোক্তাদের সঙ্গে বিচারে বসুন। শাস্ত্রীয় যুক্তি তথ্য দিয়ে আপনার নূতন ভক্তি ধর্ম্মের যৌক্তি কথা ও কল্যাণকারিতা প্রমাণ করুন।"

অহোম রাজ সনাতন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সব সময়ে পরিবৃত থাকেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক রূপে নিজেকে তিনি জাহির করিতে চান। তাছাড়া, রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এসময়ে কেবলি তাহাকে উস্কানি দিতেছেন শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে, কারণ শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য মানিয়া চলে না। শূদ্র ও অন্ত্যজদের দেয় সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অধিকার।

শঙ্করদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে না। তবুও ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া তিনি আপন ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুরু হইল ধর্ম্ম-বিচার সভা।

সর্ব্ব দর্শন ও সর্ব্ব ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। সারা ভারতের পণ্ডিত এবং সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার অজানা নয়। তাছাড়া, নিজের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট কর্ম্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্জীবন আনয়ন

করিতেও তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। সাধনার উৎকৃষ্ট, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া শঙ্করদেব অনন্যসাধারণ। তাই তাঁহার সহিত কূপমণ্ডুক ও রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? অল্পকাল মধ্যেই শঙ্করদেব তাঁহার প্রতিপক্ষকে সেদিন পরাস্ত করিলেন।

শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কুচক্রী ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল না। অহোমরাজও তাঁহার উপর পূর্ব্ববৎ রহিলেন বিদ্বিষ্ট।

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া যায়। অহোমরাজ তখন ধূয়াহাটা অঞ্চলে হাতী ধরার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী হাতীর খেদা বা অবরোধ-বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত গ্রামের লোকদেরও সহযোগিতা করিতে হয়। গ্রামবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড দিয়া খেদার অংশবিশেষ গড়িয়া তোলে। হাতীর দল যখন উগ্রমূর্ত্তি হইয়া খেদার বেষ্টনী ভেদ করিতে চায়, তখন প্রত্যেক গ্রামীণ দলকে তাহার প্রতিরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতী পলায়ন করে রাজ সরকার তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন।

সেবারকার খেদা অভিযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আসিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার লোকজনদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দিয়াই বুনো হাতীর দল কঠোর বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পলাইয়া যায়। শঙ্করদেবের বিরোধী দুষ্টচক্র এবার সক্রিয় হইয়া উঠে এবং চরম দণ্ড বিধানের জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিতে থাকে।

অহোমরাজ এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও পুরোহিতেরা এ যাবৎ নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুগামী বৈষ্ণবদের উপর করিয়াছেন। শঙ্করদেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন। কিন্তু এবারকার পরিস্থিতি তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, রাজার এই বিরোধিতার মুখে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। বরং রাজার অত্যাচারের ফলে তাঁহার এই নূতন গড়িয়া উঠা ভক্তি-আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট।

ভক্তদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, অবিলম্বে সদলবলে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ জেলায়। ঐ অঞ্চল তখন কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা চিলা রায়ের শাসনাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা সেখানে উন্নততর, এখানকার মত দুষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে ততটা সক্রিয় নয়।

একদল অনুগামীসহ শঙ্করদেব গোপনে ধূয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাতা শ্রীমান্ হরি। উভয়ে রাজরক্ষীদের হাতে বন্দী হইলেন। মাধবদেব সন্ন্যাসী বলিয়া অহোমরাজ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হরিকে দেওয়া হইল মৃত্যুদণ্ড। এই ঘটনায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

কামরূপ জেলায়, বরপেটার নিকটে পটবৌসি গ্রামে শঙ্করদেব এবার তাঁহার নূতন নিবাস স্থাপন করেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের জন্য একটি সত্র এবং নামঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হইতে এই স্থানটি হয় শঙ্করদেবের প্রধান সাধনপীঠ ও প্রচার কেন্দ্র।

কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের খ্যাতি কামরূপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহার চিহ্নিত অনুগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, হরিদেব এবং অনন্ত কণ্ডলী ইঁহাদের অন্যতম। এই তিনজন ভক্ত সাধকই জাতিতে ব্রাহ্মণ। শঙ্করদেবের সাধন ঐশ্বর্য্য, ব্যক্তিত্ব ও উদার ধর্ম্ম ইঁহাদের উদ্বুদ্ধ করে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণে। উত্তরকালে ইঁহারা অসমীয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তম্ভ রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন।

বরপেটা অঞ্চলে থাকাকালে, প্রবীণ আচার্য্য শঙ্করদেব আর একবার ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন শতাধিক ভক্ত শিষ্য। এই সময়কার ভ্রমণকালে শঙ্করদেব পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১] ভারতের অন্যান্য তীর্থ

১ শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মতে, শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎ ঘটে স্বল্পকালের জন্য, এ সময়ে আলাপ-আলোচনা বা মতবিরোধের কোন সুযোগ তিনি পান নাই।

ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত তিনি মিলিত হন। ইহার ফলে, একদিক দিয়া অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম যেমন নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সহিত, মানসলোকের সহিত, আসামের নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের যোগসূত্র রচিত হয়, নূতন ঐক্যবন্ধন গড়িয়া উঠে।

আসামে ফিরিয়া আসার পর শঙ্করদেব তাঁহার ভক্তি-আন্দোলনে সঞ্চারিত করেন নূতন উৎসাহ নূতন প্রেরণা। সর্ব্ব জাতি ও বর্ণের মধ্যে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামরূপের শাক্ত আচার্য্য ও পুরোহিতদের চঞ্চল করিয়া তোলে। কোচরাজ নরনারায়ণের কাছে সবাই মিলিয়া উপস্থিত হন।

করজোড়ে তাঁহারা কহেন, "মহারাজ, আপনি এদেশের অধিপতি, ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্ত্তমান থাকতে এসব কি হচ্ছে, বলুন তো। দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ধর্ম্ম যাচ্ছে রসাতলে।"

"কি ব্যাপার, আপনারা সব খুলে বলুন।"

"মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কায়স্থ হয়েও সে আচার্য্য হয়ে বসেছে। জাতিবর্ণের পার্থক্য সে মানে না, প্রাচীন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। ম্লেচ্ছের মত তার আচার-আচরণ। উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করার অছিলায় বেদ-বহির্ভূত এক নূতন ধর্ম্ম সে প্রচার করছে। নিম্ন বর্ণের মানুষ, অর্দ্ধসভ্য পাহাড়ী, এরা সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এর প্রতিবিধান আপনাকে করতেই হবে।"

নরনারায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি। কহিলেন, "বেশ, আমি শঙ্করদেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যও আমি শুনবো। আপনারা সভায় উপস্থিত থেকে যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে তাঁর মতবাদ করবেন খণ্ডন।"

শঙ্করদেব তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়া রাজা নরনারায়ণের সভায় উপনীত হন। শাক্ত আচার্য্যেরাও সবাই সদলবলে উপস্থিত।

অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্করদেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, "মহারাজ, আমার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করে বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। বেদে বিষ্ণু উপাসনার কথা রয়েছে। স্মৃতি ও পুরাণে আছে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য। তাছাড়া, বিশেষ ক'রে ভাগবত পুরাণের ভিত্তিতে আমার বৈষ্ণবীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণদাস্য আর সদাচার হচ্ছে এই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা। একে বেদ বহির্ভূত বলা হচ্ছে সত্যের অপলাপ।"

শাক্ত আচার্য্যদের মধ্যেও প্রতিভাধর পণ্ডিতেরা রহিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্র সাধনার তত্ত্ব তাঁহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন।

শঙ্করদেব তখন ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ অজস্র ধারায় নির্গত হইতেছে তাঁহার কণ্ঠ হইতে, ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাঁহার বদনমণ্ডল। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের দিকে সভাজনেরা বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া নির্নিমেষে তাকাইয়া আছে।

শাক্ত পণ্ডিতেরা এবার নিস্তেজ হইয়া পড়েন। নিঃশব্দে নত শিরে গ্রহণ করেন নিজ নিজ আসন।

রাজা নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি কৃপা ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন। আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার নব বৈষ্ণবধর্ম্ম তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে। আপনার এই ধর্ম্ম আসামের জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করুক। নূতনতর ধর্ম্মীয় উজ্জীবন এদেশে দেখা দিক্—তা-ই আমি কাম্য বলে মনে করি।"

রাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি চিলা রায় শঙ্করদেবের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উভয়ে তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হন নাই। রাজাকে বুঝাইয়া বলেন, "মহারাজ, আপনার ধৃতি হচ্ছে রাজসিকতা। দিনচর্য্যা অনুরূপ। যে ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই

আপনি আপাততঃ অনুসরণ করুন। আমার প্রচারিত ধর্ম্মে নিবৃত্তি মার্গই বড় কথা, সে মানসিকতা, ত্যাগ তিতিক্ষা আর নীতিনিষ্ঠা আমি আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তবে, একথা জানবেন, আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোন সমস্যায় আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো।"

শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্ববৎ রত রহিলেন ভক্তি-উপাসনা ও নামধর্ম্মের প্রচারে।

রাজা নরনারায়ণ ও চিলা রায় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্য রাজধানী কুচবিহারে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন।

ভক্তিমান্ চিলা রায় কুচবিহার নগরের অনতিদূরে ভেলাডাঙায় শঙ্করদেবের জন্য একটি সত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার আশা ছিল, এই সত্রকে উপলক্ষ করিয়া কোচ রাজপরিবারের সহিত শঙ্করদেবের যোগাযোগ আরো নিবিড় হইয়া উঠিবে, মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও কৃপালাভে তাঁহারা ধন্য হইবেন—এ আশা তাঁহার অনেকাংশে সফল হইয়াছিল।

শঙ্করদেবের ভক্তি-আন্দোলনের পুণ্যধারা ক্রমে বিস্তারিত হয় সারা আসামের দিক্‌বিদিকে। মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যেরা একদিকে যেমন ছিলেন ভক্তিসিদ্ধ, অপরদিকে তেমনি ছিলেন সংগঠন-নিপুণ ও প্রচারকুশল। আসামের জনজীবনে ইঁহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের সর্ব্বত্র সত্র আর নাম-ঘরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত হইয়াছে সহস্র সহস্র মানুষের নিত্যপাঠ্য মহাপবিত্র গ্রন্থ। অগণিত ভক্ত নরনারী তাঁহার কীর্ত্তন, বরগীত, অংকিয়-নাট আর ভাওয়ানা'র রসমাধুর্য্যে হইতেছে অভিসিঞ্চিত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু নয়, অন্ত্যজ শূদ্র ও অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য নরনারীও শঙ্করদেবের প্রসাদে মত্ত হইয়াছে কৃষ্ণনাম রসে। নামধর্ম্মের জয়গানে আজ তাহারা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ঐশ্বরীয় ব্রত উদ্‌যাপনের পালা এবার সমাপ্তির পথে। শঙ্করদেব কিছুদিনের জন্য ভেলাডাঙার সত্রে বাস করিতেছেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের এক চিহ্নিত দিনে চিরবিদায়ের লগ্নটি সমাগত হয়। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম শিষ্য, চির-ব্রহ্মচারী মহাবৈষ্ণব মাধবদেবকে সেদিন প্রদান করেন তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতৃত্বের আসন[১]। তারপর কৃষ্ণরসে রসায়িত সিদ্ধ মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যধামে।

১ শঙ্করদেবের পুত্র ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধক এবং সম্প্রদায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা, তাই মণ্ডলীর নেতার আসন অনেকে তাঁহাকেই দিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব এ দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মনোনীত করেন ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবদেবকে।

গোস্বামী রঘুনাথ দাস

নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পরিকর ও লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথদাস। দৈন্যময় বৈষ্ণবীয় ভজন আর ব্রজরসের নিগূঢ় সাধনার অপূর্ব্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার জীবনে। মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে বিরাট ভক্তিসাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন তাহার অন্যতম ধারক ও বাহক।

সংসার-জীবনে তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীয় একমাত্র পুত্র। পিতা ও পিতৃব্যের অফুরন্ত স্নেহ, প্রাসাদের রাজসিক বিত্ত বিভব ও ভোগৈশ্বর্য্য, রূপসী তরুণী ভার্য্যার প্রেম, কোন কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উন্মাদের মত তিনি বাহির হইয়াছেন সর্ব্বময়ের সন্ধানে। পরম সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়া হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ।

শ্রীচৈতন্যের কৃপা আর তাঁহার 'দ্বিতীয় স্বরূপ' স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় রঘুনাথের সাধনজীবন অচিরে ধন্য হইয়া উঠে ও ব্রজরসের পরমতত্ত্বের সন্ধান তিনি অবগত হন। উত্তরকালে তাঁহারই মাধ্যমে বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধক মহলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার তত্ত্ব ও ব্রজরসের মহিমা প্রচারিত হয়। রঘুনাথের পরমভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের ভিতর দিয়া এই রসের মাহাত্ম্যই বিস্তারিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় ভক্ত-সমাজে।

কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যটি পরিস্ফুট :

চৈতন্যের লীলা রত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল ইহা ভেটে॥

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞ্রির মত রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥

(চৈ, চ, মধ্য ২)

অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হন রঘুনাথদাস। তিনি শুধু সপ্তগ্রামের পৈতৃক জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, এই জমিদারী পরিচালনার ভারও পিতা ও পিতৃব্য শেষের দিকে তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু রঘুনাথের জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কার রাজসিক কর্ম্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, জীবনে তাঁহার ঘটায় বিস্ময়কর রূপান্তর।

আনুমানিক ১৫০১ খৃষ্টাব্দে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবর্দ্ধনদাস মজুমদার। জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাসের কোন সন্তান ছিল না, রঘুনাথকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে অপার স্নেহে তিনি পালন করিতে থাকেন। সপ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা চাঁদপুরে ছিল মজুমদারের পৈতৃক নিবাস।

সপ্তগ্রামের এই সুবিখ্যাত জমিদারবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থাগম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধুনী গঙ্গা তাঁহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক ত্রিধারায় পুনর্বিমুক্ত হইয়া স্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছে, সেই "মুক্ত" ত্রিবেণীর সন্নিকটে এই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সপ্তপুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই তপঃক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দুরাজত্ব কালে এইস্থানে সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র ছিল। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহা ক্রমে একটি বাণিজ্যবহুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কবি কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে --

সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥

"মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা তখন পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লইয়া একটি মুলুক বা খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। পাঠানেরা যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে তাঁহাদের অন্ততঃ দুই শতাব্দ লাগিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যেও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিলিব্যবস্থা লইয়া সর্ব্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে "বুলবাদ-খানা" বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান সুলতানগণ স্বাধিকারভুক্ত দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বার্ষিক মোক্তা রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপন্ন লোককে ইজারা দিতেন। যাহারা এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, তাহাদিগকে সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হইত। মোগল আমলে এই সকল মুলুক লইয়া এক একটি সরকার গঠিত হয়, মজুমদারেরা জমিদার হন। এখন একটা পরগণার আংশিক অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে এক বা ততোধিক পরগণা অন্তর্ভুক্ত থাকিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বার্ষিক বারলক্ষ টাকা মোক্তা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজারা লইয়াছিলেন দুই জন মৌলিক কায়স্থ—দুই ভ্রাতা, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস। পাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ণ ঔপনিবেশিক, স্বজাতিরক্ষক সাহসী বীর এবং প্রবল পরাক্রান্ত শাসকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহারাই গুরু পুরোহিত রূপে এবং আত্মীয়-কুটুম্বরূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাঁহাদের পিতৃপুরুষের কোন বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের কোন বিশেষ গুণ, সম্মান বা প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজানুগৃহীত

পাঠান আমীরের কবল হইতে তাঁহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত লইতে পারিতেন না। বন্দোবস্ত লইলেও তাঁহাদের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল। এই ভ্রাতৃদ্বয় "বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ" অর্থাৎ তাঁহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে বারলক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া আট লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। ইহা ত শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় শুল্ক হইতে তাহাদের আয় আরও ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় হইত। সুতরাং তাহাদের মোট বার্ষিক আয় ১০।১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহা দেখিয়া কত জনের নেত্র পীড়া জন্মিত। বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদতুল্য বসতি বাটী ছিল।

"ধনৈশ্বর্য্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সৎকার্য্যের গৌরবও তাঁহাদের কম ছিল না। "গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা" বলিয়া প্রবাদ-বাক্য এই যশ কীর্ত্তন করিত।' কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন।—

> "মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
> সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
> নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
> অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
> (চৈ, চৈ, মধ্য, ১৬শ)

নদীয়া অঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি অথবা সাময়িক বৃত্তি পাইয়া জীবনধারণ করিতেন। বিপুল তাঁহাদের বিভব, ধর্ম্মে তাঁহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভরা তাঁহাদের যশ, রাম-লক্ষ্মণের মত তাঁহারা অভিন্ন হৃদয়—অভাব তাঁহাদের কিছুরই ছিল না। কেবলমাত্র বহুকাল পর্য্যন্ত উভয়ে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যদাস অপুত্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ছিল একটি

মাত্র সন্তান—রঘুনাথ[১]।" এই রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ দুই ভ্রাতার নয়নের মণি।

অতুল ঐশ্বর্য্য আর স্নেহমমতার পরিবেশে রঘুনাথ লালিত হন। পিতা ও পিতৃব্যের অভিলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের উপযুক্ত পুত্র। বংশের রাজসিক ধারা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ভূম্যধিকারের পরিচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেমনি সুনাম অর্জ্জন করিবেন দানশীলতা ও পুণ্যকর্ম্মে। কিন্তু এ অভিলাষ তাঁহাদের পূর্ণ হয় নাই। জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া রঘুনাথ জন্মিয়াছিলেন, তাই ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখা যায় তাঁহার জীবনে।

তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। নবদ্বীপ ছিল সেকালের অক্সফোর্ড, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পড়ুয়ারা এখানে পড়িতে আসিত, নব্যন্যায় ও অন্যান্য দর্শন আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রেও বর্ত্তমান ছিল শাস্ত্রপাঠের আদর্শ পীঠ।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন। তাই দুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। গৃহে বসিয়া বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ করা তাঁহাদের মত ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণ্যদাস তাহা করেন নাই। চিরাচরিত ভারতীয় প্রথামত ছাত্রেরা অধ্যাপকের আবাসে থাকিয়াই পাঠ সমাপন করে, তাঁহার সাহচর্য্য ও তত্ত্বাবধানে জীবন গড়িয়া তোলে। এই প্রথাই তিনি অনুসরণ করিলেন ; বালক রঘুনাথকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল কুলপুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে। এখানে থাকিয়াই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্রের মতই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছদে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলরাম আচার্য্য শুধু শাস্ত্রবিদ্ই

---

১ সপ্ত গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

ছিলেন না, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। গ্রামে কোন সাধুসন্ত উপস্থিত হইলে তাঁহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবস্থা। এই পরিবেশে থাকিয়া বালক রঘুনাথ সাধুসেবা ও সদাচারের দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

বলরাম আচার্য যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম, বালক বিদ্যার্থী রঘুনাথও তেমনি অসাধারণ মেধা প্রতিভার অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে রঘুনাথ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

উত্তরকালে ভক্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমালা রচনা করেন, তাহার মূলে রহিয়াছে বালককালের শিক্ষার এই উৎকর্ষ এবং সাফল্য।

নামমূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর সে-বার বেনাপোল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। বলরাম আচার্য্য সাদরে তাঁহাকে জানান অভ্যর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে পর্ণকুটির তৈরী করা হয় এই ভক্ত অতিথির জন্য। সেই কুটিরে বাস করিয়া হরিদাস তাঁহার নিত্যকার জপ ও নামকীর্ত্তন সমাধা করিতেন আর বলরাম আচার্য্যের গৃহে গিয়া করিতেন ভিক্ষা নির্ব্বাহ।

বালক রঘুনাথের কৌতূহলের অন্ত নাই। সুযোগ ও অবসর পাইলেই তিনি ঘুর্‌ঘুর্ করেন হরিদাসের পর্ণকুটিরের আশেপাশে। হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে যুক্তকরে তিনি সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান, ধন্য হন তাঁহার আশীর্বাদ ও স্নেহস্পর্শে। দিনের পর দিন এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের ভজননিষ্ঠা ও দৈন্যময় সাধনা দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হন, দিব্য ভাবাবেশের ছবিটি কোমল হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়।

শুধু বলরাম আচার্য্যই নন, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও ছিলেন ভক্তি-সিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের অতি অনুগত। ফলে বালক রঘুনাথও এই মহাপুরুষের দ্বারা এসময়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হইয়া পড়েন।

হরিদাস ঠাকুরের কৃপাকর সম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে ভক্তি-সাধনার দুয়ার উন্মোচিত এ তথ্যটি রঘুনাথের শিষ্য কৃষ্ণদাস

কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। রঘুনাথের শ্রীমুখ হইতেই তাঁহার বালক কালের এই মানস বিবর্ত্তনের ইতিহাস কৃষ্ণদাস শ্রবণ করেন এবং চরিতামৃতে তাহা লিখিয়া যান :

হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে॥

অতঃপর হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে অন্যত্র চলিয়া যান, এবং ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্যক্রমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন।

প্রভু কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার দিব্য জীবনের নবতম অধ্যায়। সপ্তগ্রামের বহু লোকই তাঁহার এই অভ্যুদয়ের সংবাদ রাখেন। বিশেষ করিয়া জমিদার এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরণ্যদাস ও তাঁহার ভ্রাতা গোবর্দ্ধনদাস প্রভুর নবদ্বীপ লীলা ও সন্ন্যাস গ্রহণের সকল সংবাদ অবগত আছেন।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এই মজুমদারদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহাদের সভা ছিল রাজসভার মত, এবং এই সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে আসিতেন।

হিরণ্যদাসদের সহিত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রভুর মাতামহ লীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর। এই সুবাদে প্রভু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসকে 'আজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাজেই প্রভুর ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার ও সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

প্রভু কাটোয়া হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিলেন। ভক্তি-প্রেমের রসঘন বিগ্রহ, দেবদুর্লভ মূর্ত্তি, এই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য শান্তিপুরে ভীড় জমিয়া যায়, নানাদিক হইতে ভক্ত নরনারী সেখানে ছুটিয়া আসিতে থাকে। সপ্তগ্রাম হইতেও বহু লোক শান্তিপুরের দিকে রওনা হয়। এ সময়ে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়া রঘুনাথও তাহাদের সঙ্গী হন।

অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন।[১] প্রেমঘন, দিব্যমধুর মূর্ত্তি। একবার দর্শন করিলে নয়ন ফিরাইয়া নেওয়া যায় না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে প্রভু টলমল করিতেছেন। কখনো হইতেছেন সংজ্ঞাহীন। সারা দেহে তাঁহার ফুটিয়া উঠিতেছে অশ্রুকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার।

প্রভুকে ঘিরিয়া প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভক্তদের নৃত্য ও কীর্ত্তন। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত। মর্ত্যলোকে যেন এক দিব্য আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসের সহিত অদ্বৈত আচার্য্যের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। তাই বালক রঘুনাথের প্রতি স্নেহ-সমাদরের ক্রটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণধূলি ও পবিত্র প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত করিলেন।

রঘুনাথ শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন প্রভু শ্রীচৈতন্যকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রভুর অলোক-সামান্য রূপ, প্রেমার্ত্তি, দিব্য ভাবাবেশ, আর ভক্তদের আনন্দোচ্ছ্বাস, সবকিছু মিলাইয়া যে অপরূপ ভাবমূর্ত্তিটি তাঁহার মানসপটে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে তাহার রং দিনের পর দিন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে। প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাঁধা পড়িয়া যায় এক অজ্ঞাত প্রেমের বন্ধনে।

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; রঘুনাথ পদার্পণ করিয়াছেন সতের বৎসরে। এই তরুণ বয়সে লোকে সাধারণতঃ আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পার্থিব ভোগ সুখের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রঘুনাথের বেলায় দেখা যায় তাহার বিপরীত। হৃদয়ে তাঁহার সদাই বহিতেছে বৈরাগ্যের হাওয়া—সংসারে মন একদণ্ডও টিকিয়া থাকিতে চায় না।

---

১ বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতাদের মধ্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথমে প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রাপ্ত হন।

লোকমুখে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী নিয়া যে লীলা তিনি করিতেছেন, প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়াছেন, সে সংবাদও রঘুনাথ পাইতেছেন। এসব শুনিয়া মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার অভিলাষ হইয়াছে, তুর্নিবার। এ সময়ে বার বারই চেষ্টা করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্তু বার বারই তাঁহার অভিসন্ধি ফাঁস হইয়া যায়, ধরা পড়িয়া যান।

রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তোমরা ওর ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করো, কোন ফাঁকে যেন না পালায়।"

এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেরী হইল না ; কয়েকজন সঙ্গী ও পাইক নিযুক্ত হইল এই কাজে। তাহাদের উপর নির্দ্দেশ রহিল, রঘুনাথ সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও না যান, সেদিকে তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

পিতা ও পিতৃব্য ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ সাত্ত্বিক প্রকৃতির যুবক, ত্যাগ বৈরাগ্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা। এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন বড় প্রশ্ন, কোন্ উপায়ে তাঁহাকে সংসারে ধরিয়া রাখা যায়? পিতা ভাবিলেন, কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিয়া সাধন ভজন শুরু করিলে, পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে রত হইলে, হয়তো গৃহত্যাগের ঝোঁক কমিয়া যাইবে। ধীরে ধীরে সংসার জীবনে সে আকৃষ্ট হইবে।

যদুনন্দন আচার্য্য গোবর্দ্ধনদাসদের কুলগুরু। ইনি অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, সুপণ্ডিত ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া সুনামও যথেষ্ট। তাঁহাকে আনাইয়া রঘুনাথকে মন্ত্র-দীক্ষা দেওয়া হইল।

গুরুর নির্দ্দেশমত বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধন ভজন করিয়া চলিলেন, কিন্তু মন তাঁহার শান্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীব্রতা দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে।

অভিভাবকেরা এবার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যাক্। রূপসী তরুণী পত্নীর আকর্ষণে যদি বা সংসারের দিকে মন কিছুটা ফিরিয়া আসে।

সুলক্ষণা পরমা সুন্দরী পাত্রী মিলিতে দেরী হয় নাই। এক শুভলগ্নে জাঁকজমক সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু বিবাহিত জীবনেও রঘুনাথের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, বৈরাগ্য দিন দিনই চলিল বৃদ্ধির পথে।

এই সময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের বিস্তারিত সংবাদ পৌঁছে সপ্তগ্রামে। প্রভু নীলাচল হইতে সম্প্রতি গৌড়-রামকেলীতে আসিয়া রাজমন্ত্রী সনাতন ও রূপকে কৃপা করেন। তারপর বৃন্দাবনে গমনের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাত্রায় তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিবেন। হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছে সেখানে, দিনরাত বহিতেছে কীর্ত্তন-নর্ত্তনের আনন্দ স্রোত।

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও পিতাকে খুলিয়া বলিলেন তাঁহার মনের কথা। প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এবার বহু সলাপরামর্শ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। এবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় কয়েকদিন কাটাইয়া আসিয়া যদি সে কিছুটা শান্ত হয়, মন্দ কি? সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই মিলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবে সপ্তগ্রামে।

অভিভাবকদের অনুমতি নিয়া, প্রচুর ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদলবলে উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে।

কিন্তু এই দর্শন ও সান্নিধ্য তো ভক্ত রঘুনাথকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। প্রভুর দিব্যমূর্ত্তি, আর তাঁহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই

নবীন সাধককে আরো যেন উত্তাল করিয়া তুলিয়াছে। চরণতলে লুটাইয়া সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ কহিলেন, "প্রভু, মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছি, আপনি ছাড়া এ জগতে আর আমার কোন আশ্রয় নেই। বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে পশুর জীবন আমি যাপন করছি। কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।"

অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন কিছুই অজানা নয়। রঘুনাথ যে তাঁহার চিহ্নিত পরিকর, তাঁহার দিব্যলীলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কিন্তু সব কিছুরই একটা ক্রম আছে, নির্দ্ধারিত লগ্ন আছে। রঘুনাথকে এখনো যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে নিজের প্রস্তুতি।

তাঁহাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া প্রভু প্রশান্ত স্বরে কহিলেন :

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

(চৈ, চ, মধ্য, ১৬৭)

নিভৃতে বসিয়া প্রভু আরো কহিলেন, "বৎস রঘুনাথ, তুমি মনে দুঃখ ক'রো না। বৃন্দাবনধাম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের কাছে ফিরে আসবো। তখন তুমি কোন ছলে আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে। কোন ছলে, কি ক'রে যাবে, যথাসময়ে কৃষ্ণ তোমায় তা বলে দেবেন। কৃষ্ণ কৃপা রয়েছে যার ওপর তাকে কে ঠেকাবে?"

রঘুনাথ শুদ্ধসত্ত্ব আধার, প্রেমভক্তির আলোকে হৃদয় কন্দর তাঁহার আলোকিত। তাই প্রভুর এই ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরী হইল না। প্রভু কহিয়াছেন, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে হইবে, বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা করিতে হইবে। আর এই সঙ্গে অটুট

রাখিতে হইবে প্রেমভক্তির নিষ্ঠা। তবেই জীবনে তাঁহার নামিয়া আসিবে কৃষ্ণ-কৃপার অমৃতধারা। প্রভুর শ্রীমুখের কথা কি করিয়া রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন ?

অন্তরের আর্ত্তি এবার অনেকটা প্রশমিত হইল। স্থির করিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে রত থাকিবেন, আর অপেক্ষা করিবেন সেই পরম লগ্নের জন্য যখন প্রভু তাঁহাকে করিবেন বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার, ঠাঁই দিবেন তাঁহার চরণকমলে।

শান্তিপুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, প্রভুর সস্নেহ আশ্বাস-বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন এই সুযোগে তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম পরিচালনায় নিয়োজিত করিলেন। সুবিস্তৃত মুলুকের রাজস্ব সংগ্রহ, সুলতানের প্রাপ্য অর্থ জমা দেওয়া, অবাধ্য প্রজার শাসন প্রভৃতি অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ মজুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক ; শিক্ষা দীক্ষা. মেধা প্রতিভা তাঁহার যথেষ্ট। এবার বিষয়কর্ম্মে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া সাংসারিক দায়িত্ব সে বুঝিয়া নিক্, ইহাই পিতা ও পিতৃব্যের পরম কাম্য।

রঘুনাথের এই কার্য্যভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল এক কঠিন সঙ্কট। এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপস্থিত না থাকিলে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের রাজস্ব ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইত, সমূলে তাঁহারা ধ্বংস হইতেন।

গৌড়-অধিপতি হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর সপ্তগ্রামের মোক্তাদার হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়া নেন। তাঁহার লোভ ছিল অত্যধিক, নিষ্পেষণের চাপে প্রজাদের অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজস্ব আদায় পুরাপুরিভাবে হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়া নিয়া সুলতানের খাতে রাজস্ব আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বলিয়া বৎসরের পর বৎসর এই ধরণের প্রশ্রয় নিতে তিনি সাহসী হইতেন। শেষটায়

সুলতান বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনকে নিযুক্ত করেন তাঁহার স্থানে।

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সহিতই রাজস্ব আদায়ের কাজ করিতেন। তাঁহার আমলে প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমত হইত। সুলতানকে তাঁহার পাওনা বারো লক্ষ টাকা মিটাইয়া দিয়াও আটলক্ষ টাকা মজুমদারেরা নিজের ঘরে তুলিতে পারিতেন। পূর্ব্বতন মোক্তাদার, আমীর, ইহা লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ষার আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলেন, হিরণ্যদাস কয়েক লক্ষ টাকা বেশী আদায় করিতেছে, কিন্তু অন্যায়ভাবে সরকারী কোষাগারকে করিতেছে বঞ্চিত। এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল।

সুলতান হুসেন শাহ তখন রাজস্বের আদায় বৃদ্ধি করিয়া রাজ-সিংহাসনকে সুদৃঢ় করিতে ব্যগ্র। আমীরের উস্কানীতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে পাঠাইলেন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়া গৌড়ে নিবার জন্য।

হিরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন। সেনাদল আসিতেছে খবর পাইয়া ভ্রাতাসহ তিনি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিয়া থাকা যাক্, তারপর সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত হইলে আত্মপ্রকাশ করা যাইবে।

এদিকে মজুমদার ভ্রাতাদের দেখা না পাইয়া উজীর তাঁহাদের প্রতিনিধি রঘুনাথকেই গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌড়ে নিয়া গিয়া নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে।

কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে রঘুনাথকে হাজির করা হয়। আর ভৎ'সনা ও ভীতি প্রদর্শন চলিতে থাকে দিনের পর দিন।

রঘুনাথকে সুলতান চরম দণ্ড দিতেছেন না দুটি কারণে। প্রথমত, মজুমদারেরা দক্ষ লোক। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বারা রাজস্ব বাড়ানো যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারা জাতিতে কায়স্থ, চাতুর্য্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া বা অপর কোন

কূট চাল চালিয়া রাজস্বের আদায় ব্যবস্থা ইহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে।

রঘুনাথ বুঝিলেন, কৌশল অবলম্বন না করিলে এই নির্য্যাতনের হাত এড়ানো যাইবে না। স্থির করিলেন, মিষ্টি কথায় সুলতানের হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করিবেন একটা আপোষ মীমাংসার জন্য।

করজোড়ে, সবিনয়ে সেদিন সুলতানকে নিবেদন করিলেন, "আমার বাবা ও জ্যেঠা আপনার ভাই। আর আমি হচ্ছি আপনার পুত্রের মত। আমাদের ভেতর বিরোধ বা মনোমালিন্য থাকবে কেন? তাছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক। জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব সব কিছু আপনার আয়ত্তে। আপনার মত মহান্ ব্যক্তি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তবে কার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াবো?"

এই বিনয়নম্র বচন, আর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি, হুসেন শাহের মন গলাইয়া দিল। মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ছাখো বেটা, তোমার জ্যাঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই। আট লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর রাজস্ব থেকে একলা সে ভোগ করে। তা থেকে আমায় কিছু দেওয়া কি তার উচিত নয়? তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তাকে একথা বুঝিয়ে বলো। আমি তোমাদের সবাইকে মার্জ্জনা করলাম।"

রঘুনাথ সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন, পিতৃব্যকে এ প্রস্তাবে তিনি রাজী করাইবেন। মুক্তি পাইয়া সপ্তগ্রামে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় এবং সুলতানের মনান্তর অতঃপর অতি সহজে মিটিয়া যায়।

এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রীচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরো কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম রঘুনাথ অনাসক্ত হইয়া করিয়াছেন। আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছে এই অনাসক্তির মধ্য দিয়া। শুধু তাহাই নয়, জমিদারী পরিচালনার ভার এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না থাকিলে

সুলতানের সহিত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইত না। ফলে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারকে হইতে হইত সর্ব্বস্বান্ত।

কিছুদিনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নির্ধন সবাইকে নির্ব্বিচারে বিলাইতেছেন প্রেমধন। তাঁহার উদ্দণ্ড কীর্ত্তন-নর্ত্তনে আর আনন্দ-রঙ্গে ভক্ত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। রাঘব পণ্ডিতের ভবন হইয়াছে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র।

পানিহাটি সপ্তগ্রাম মুলুকেরই অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, খুব বেশী দূরেও নয়। রঘুনাথ স্থির করিলেন, একবার নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আসিবেন।

"কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয়া ভাবাবেশে আকুল করিতে হয়, 'অক্রোধ পরমানন্দ' নিত্যানন্দ তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার মূর্ত্তিতে কি দিব্য ভাব ছিল, মুখের কথায় কি মধু ছিল, কীর্ত্তনে কি মদিরা ছিল, হাস্যরসে কি চটুলতা ছিল যে, যখনই কেহ তাঁহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত, তখনই সে কেমন ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের লোক নাচিয়া উঠিত, সব ফেলিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ছুটিত, আর দেশময় লোকারণ্য হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ঘনান্দোলিত হইয়া সে অঞ্চলে বিজয়ী সেনাপতির মত এই অপরূপ অবধূতের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিত। চৈতন্য-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত লীলা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে লীলার বৈদ্যুতিক শক্তিতে তিনমাস কাল সে স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্মৃতের মত ছিলেন।"[১]

নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেশেতে॥

১ সপ্তগোস্বামী, বাতুল রঘুনাথ

তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহারো না স্ফুরে॥
(চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫ম)

রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে কীর্ত্তন-নর্ত্তনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্বগণ পরিবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ। আয়ত নয়ন দুটি দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। সদানন্দময় এই মুক্ত পুরুষের দিকে ভক্তেরা নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। এসময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তেরা রঘুনাথকে চিনিতেন। তাহারা তাঁহার পরিচয় জানাইয়া দিলেন, "প্রভু, ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস মজুমদার, সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র।"

নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকিতে শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের কথা, তাঁহার প্রেমার্ত্তির কথা শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাঁহাকে কাছে টানিয়া নেন, নিজের চরণ দুটি স্থাপন করেন তাঁহার মস্তকে। কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন, "ওহে চোরা, তবে দেখছি এতদিন পরে তোমার দেখা পেলাম। ভালই হল, এবার তুমি আমার ভক্তদের দধি চিড়া খাইয়ে তৃপ্ত করো।"

কৌতুকী নিত্যানন্দের 'চোরা' কথার নিহিতার্থ, রঘুনাথ তাঁর প্রকৃত স্বরূপটি চমৎকাররূপে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তি-প্রেমের সাধনা ও আর্ত্তির ফলে অন্তর তাঁহার রহিয়াছে কৃষ্ণময়, কিন্তু বাহ্যজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফেরা করিতেছেন।

এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সেদিন সবার সমক্ষে জানাইলেন তাঁহার সোৎসাহ সাধুবাদ। শুধু তাহাই নয়, সহস্র সহস্র ভক্ত বৈষ্ণবকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার বিরল সুযোগও এসময়ে তাঁহাকে তিনি দান করিলেন।

অর্থের এমনতর সদ্ব্যবহারই যে রঘুনাথ চাহেন। তাই পরম উৎসাহে তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন দধি চিড়ার এই মহোৎসবে। লোকজন ও অর্থের তাঁহার অভাব নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সকল

কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্ব্বত প্রমাণ চিড়ার স্তূপ আর শত শত ভাণ্ডের দধি, ক্ষীর, গুড় যেমন দেখা গেল, তেমনি আসিয়া জুটিল সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সেদিন পানিহাটিতে সম্পন্ন হয়, তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সারা গৌড়দেশের দিকে দিকে।

কথিত আছে, সেদিনকার মহোৎসবে, নিত্যানন্দের আকর্ষণে ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্য সূক্ষ্মদেহে পুলিন-ভোজনে আবির্ভূত হন, পঙ্‌ক্তির মধ্যে বসিয়া ভক্তপ্রদত্ত চিড়া দধি সানন্দে গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবেরা অনেকেই বলিতে থাকেন, রঘুনাথ মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তাঁহাকে কৃতার্থ করার জন্যই ঘটিয়াছে কৃপালু প্রভুর আবির্ভাব।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহেও সেদিন রাত্রিতে বৈষ্ণব সেবার সময়ে ঘটে এমনি এক অলৌকিক কাণ্ড। নিত্যানন্দের পাশে রাখা হইয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজন-আসন। এই আসনে সশরীরে প্রভু আবির্ভূত হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পণ্ডিত উভয়ে এই লীলাদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

রাঘব দুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত্নে আনিয়া দিলেন। স্নেহভারে আশিস্ জানাইয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এসে ভোজন ক'রে গেলেন আজ এখানে। এই নাও তাঁর পবিত্র প্রসাদ, জীবন তোমার ধন্য হোক্, সর্ব্ববন্ধন থেকে মুক্ত হও তুমি।"

পরের দিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া নিত্যানন্দ ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সজল নয়নে, যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু আমি বিষয়ী—জীবাধম। বামন হয়ে চাঁদ ধরার অভিলাষ জেগেছে মনে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কিন্তু ভব-বন্ধন আমার যে এখনো টুট্‌ছে না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়।"

নিত্যানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ, আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি। শ্রীচৈতন্যের চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে সেবার অধিকার তুমি লাভ করবে।"

শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদের এই আশীর্ব্বাণী রঘুনাথের সাধন-জীবনে উত্তরকালে সফল হইয়া উঠিয়াছিল।

পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দর্শন ও মহোৎসবে ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গ লাভের পর রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষ্ণা চরমে উঠে। প্রভু চৈতন্যের সন্নিধানে কবে যাইবেন, কি করিয়া যাইবেন, ইহাই হয় তাঁহার ধ্যান জ্ঞান।

সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করিলেন না। বহির্ব্বাটিতে, দুর্গামণ্ডপের এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কান্না, পত্নীর আর্ত্তি, আর অভিভাবকদের তিরস্কার কোন কিছুতেই ফল হইল না।

পিতা ও পিতৃব্য এবার তাঁহার পাহারার ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করিলেন। যখন যেখানে তিনি যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাতা বা প্রচ্ছন্ন রক্ষী সতর্কভাবে ঘিরিয়া থাকে। এই ব্যূহ ভেদ করিয়া নীলাচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন।

প্রভু চৈতন্যের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আসিল,—কৃষ্ণ তাঁহার অবরোধ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অচিরে সুযোগ একটা উপস্থিত হইবেই। খিন্ন হৃদয়ে এই আশা নিয়াই তিনি দিন গুণিতে থাকেন।

এসময়ে একদিন অযাচিতভাবে আসিয়া যায় তাঁহার পলায়নের সুযোগ। কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্য হঠাৎ শেষ রাত্রে রঘুনাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "বাবা রঘুনাথ, আমি এক মহা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি আপনার সেবক। কি আমার করতে হবে, আদেশ দিন। আমি যথাসাধ্য তা করবো।" ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন রঘুনাথ।

"আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, তা জানো। যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি এই বিগ্রহের পূজো ক'রে সে আজ ক'দিন হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমি নিজে অশক্ত। কি ক'রে ঠাকুরের সেবা পূজা নির্ব্বাহ হবে ভেবে পাচ্ছিনে। পূজারী ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তুমি যদি নিজে বলে দাও, তাহলে তোমার কথা ঠেলতে সে সাহস করবে না। তুমি এখনই একবার চল, আমায় মুক্ত করো এ বিপদ থেকে।"

রঘুনাথ তখনই রওনা হইলেন তাঁহার সঙ্গে। কুলগুরুর সঙ্গে যাইতেছেন তাঁহারই জরুরী কাজে; তাই রক্ষীরা কেউ আব তাঁহাকে বাধা দিল না।

প্রাসাদের বাহিরে কিছুটা রাস্তা গিয়া রঘুনাথ আচার্য্যকে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপনি সোজা আপনার বাড়ীতে চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ওখানে যাচ্ছি!"

আচার্য্য ভাবিলেন, এ অতি উত্তম কথা। রঘুনাথের জন্য তিনি নিজ গৃহেই অপেক্ষা করিবেন।

পলায়নের এই পরম সুযোগ রঘুনাথ ছাড়িলেন না। পূজারী ব্রাহ্মণকে যদুনন্দন আচার্য্যের কাছে পাঠাইয়া দিয়া ধাবিত হইলেন নীলাচলের দিকে। রাজপথ পরিহার করিলেন, কারণ রক্ষীরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হয়তো ধরিয়া ফেলিবে। দ্রুতপদে চলা শুরু করিলেন বনপথ দিয়া।

উষার আলোক তখনো ফুটিয়া উঠে নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া রঘুনাথ পথ চলিতেছেন, কাঁটা ও কাঁকরের আঘাতে পদতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত। কোনদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মাদের মত উর্দ্ধশ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়া চলিয়াছেন। মুখে নিরন্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ-পঙ্কজে।

পদব্রজে নীলাচল যাত্রা তখনকার দিনে ছিল অতি দুরূহ। পথে সাপ বাঘের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দস্যুদের উপদ্রব। এসব কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম করিলেন বারো দিনে। এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, আর বাকী নয়দিন কাটিয়াছে অনাহারে। এই অবস্থায়, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া তিনি পৌঁছিলেন। তারপর সরাসরি পতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে।

প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। চরণে পতিত, অস্থিচর্ম্মসার, অচেতন-প্রায় নবাগত ভক্তকে চিনিতে পারিয়া প্রভুর পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত চমকিয়া উঠিলেন। এ কি! এ-যে সপ্তগ্রামের ক্রোড়পতি জমিদারের তনয় রঘুনাথ—বিষয়-বিরাগী ভক্ত রঘুনাথ!

প্রভু তখন ভাবাবেশে রহিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত ভূতলে শায়িত রঘুনাথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, ব্যস্তভাবে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের অধরে ফুটিয়া উঠে, প্রসন্ন মধুর হাসি। মুমুক্ষু রঘুনাথকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া তিনি আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ বিভোর হন স্বর্গীয় আনন্দে, পথশ্রম আর অনাহার অনিদ্রার সব কিছু কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যান, প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাণের আকুতি, মাগেন পরমাশ্রয়।

আশ্বাস ও অভয় দিয়া প্রভু রঘুনাথকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। সকলকে নির্দ্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য।

প্রেমপূর্ণ স্বরে প্রভু এবার কহেন, "রঘুনাথ, ছাখো, কৃষ্ণের কি অপার কৃপা। এবার তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কূপ থেকে। প্রেমভক্তির আনন্দলোকে এবার তোমার যাত্রা শুরু হ'লো।"

সজল নয়নে, বাষ্পাকুল কণ্ঠে রঘুনাথ উত্তর দেন, "প্রভু, আমি কৃষ্ণ জানিনে, কৃষ্ণকৃপা কি তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চিতরূপে জেনেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, তোমার কৃপাই আমায় আজ উদ্ধার করলো।"

কৃপাময় প্রভু তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া কহিলেন,

"এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥

"স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ : যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনই, গুরুগম্ভীর ভাবময় রসজ্ঞ ভক্ত। প্রভু নিজেই বলিতেন, নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব ও ব্রজের লীলারস রহস্য তাঁহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার বিষয় তিনি বুঝিয়াছিলেন। ঐরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গূঢ়তত্ত্ব অনুশীলনের অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর। এজন্য প্রভু তাঁহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়া সেই মর্ম্মী ভক্তের করে সমর্পণ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয় ভক্তটিকে যথোচিত আদর যত্ন বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা সুযোগ তাঁহার নাই; এজন্য রঘুনাথের একান্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাঁহাকে পুত্রবৎ ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজপুত্রকে ধনীর গৃহে পোষ্যপুত্র করিয়া দিবার মত রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বরূপকে দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, তিনি 'স্বরূপের রঘুনাথ' নামে সকলের নিকট পরিচিত হইলেন[১]।"

গৌড় হইতে আসিবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। পথশ্রম, অর্দ্ধাশন ও অনিদ্রায় শরীর প্রায় বিধ্বস্ত। তদুপরি কয়েক দিন তাঁহাকে জ্বরে ভুগিতে হইয়াছে এবং এজন্য লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে।

লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বস্তু ভোজনের জন্য স্বাভাবিক একটা ইচ্ছা জন্মে। রঘুনাথের বেলায়ও তাহা দেখা দিল। সুস্বাদু ভোজ্য বস্তুর জন্য তিনি উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে বলিয়া দিয়াছেন, কয়েকদিন

---

১ রঘুনাথদাস গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

রঘুনাথকে যেন তাঁহার পাতের প্রসাদই দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য. সে প্রসাদ বৈরাগী সন্ন্যাসীদেরই উপযোগী। অথচ সদ্য রোগমুক্ত রঘুনাথের জিহ্বার লালসা যাইতেছে না। অগত্যা সেদিন তিনি মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা রুচিকর চব্যচোষ্য ভোগ দেন, তারপব মনে মনেই তাহা গ্রহণ করিয়া হন পরিতৃপ্ত।

এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়া প্রভু স্বরূপকে কহিলেন, "স্বরূপ. আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই, অজীর্ণ হয়েছে। রঘুনাথ আমায় কাল অতিরিক্ত ভোজন করিয়েছে[১]।"

দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনাথদাস নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রভুকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করানোর সামর্থ্য তাঁহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ ভোজন তো কাহারো চক্ষে পড়ে নাই? স্বরূপ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বুঝিলেন, ইহা প্রভুর মানস ভোজন, আর ইহা সম্ভব হইয়াছে ভক্ত রঘুনাথের মানস-নিবেদনের ফলেই।

রঘুনাথও উপলব্ধি করিলেন, অন্তর্য্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভক্তদের ভাবনা চিন্তার ক্ষীণতম বুদ্‌বুদ্‌টিও ধরা পড়িয়া যায়। তাই তাঁহার বৈরাগ্য সাধনা সম্পূর্ণ করিতে হইবে পরম নিষ্ঠাভরে, আর সারা দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায়।

কয়েকদিন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিল। এবার তিনি ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য। তাঁহার সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে স্বরূপ দামোদরের উপর। তাই স্বরূপকে সেদিন একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েকটি দিন গত হ'লো। কই, প্রভু তো আমায় সাধন ভজন সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না? আমার হয়ে আপনি তাঁকে একটু বলুন।"

স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘুনাথের ব্যাকুলতার কথা উঠাইলেন তখনি সর্ব্ব সাক্ষাতে প্রভু দিলেন তাঁহার নির্দ্দেশ :

১ ভক্তমাল গ্রন্থে অন্তর্য্যামী প্রভুর এই মনোরম আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইঁহ তাহা জানে॥
গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ॥[১]

(চৈ, চৈ, অন্ত্য-৬)

সাধারণভাবে প্রভু নবীন ভক্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিগূঢ় ব্রজরস তত্ত্ব। শিক্ষা দেওয়ার ভার রহিল স্বরূপ দামোদরের উপর। সেইজন্যই তো তিনি স্বরূপের হাতে রঘুনাথকে একান্তভাবে সঁপিয়া দিয়াছেন।

এদিকে রঘুনাথের পলায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের অন্ধকার। রঘুনাথের তরুণী পত্নী অবিরত ক্রন্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন। জননী হইয়াছেন উন্মাদিনীর মত, তাঁহার বুক ফাটা হাহাকার শুনিয়া অশ্রুজল রোধ করা যায় না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন একমাত্র পুত্রের অদর্শনে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুঝিয়া নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণে। আর তাঁহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম হইতে ফিরাইয়া আনা যাইবে না।

কিন্তু রঘুনাথের মাতাকে শান্ত করা যায় কই? কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, "যেমন ক'রে হোক্ তোমরা আমার নয়নের মণি রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো। দরকার হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো। এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী, আছে কী করতে?"

গোবর্দ্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানা ভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা করেও রঘুনাথকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে বিধিলিপি। আরো কহিলেন :

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ীর বাঁধনে তারে রাখিব কি মতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
(চৈ, চৈ, অন্ত্য-৬)

শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রতি বৎসর গৌড় হইতে যাহারা নীলাচলে প্রভুর দর্শনে যাইতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন এই শিবানন্দ। যাত্রীদলের পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁহার উপর।

গোবর্দ্ধন মজুমদার রঘুনাথ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন শিবানন্দের কাছে। জানিলেন, নীলাচলে থাকিয়া কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন সে যাপন করিতেছে। সে বৈরাগ্য সে দৈন্যদশা দেখিলে অশ্রুরোধ করা কঠিন হয়।

গোবর্দ্ধনের অন্তর বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের মত বিলাস বৈভবে যে এযাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া সে সহ্য করিবে। অবিলম্বে রঘুনাথের জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য তিনি নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন চারিশত মুদ্রা ও বহুতর সুস্বাদু খাদ্য।

পাচক ও ভৃত্য নীলাচলে পৌঁছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু মুদ্রাগুলি কি করিবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এগুলি সঞ্চিত রাখিবেন নিজের কাছে। এই অর্থ দিয়া প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো যাইবে।

ভক্তাধীন প্রভু রঘুনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রতি মাসে দুই তিন দিন করিয়া রঘুনাথের কুটিরে তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নানা সুস্বাদু ভোজ্য তৈরী হয়, প্রভু ও তাঁহার সঙ্গী

বৈষ্ণবেরা তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহণ করেন। ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকৃতার্থ।

প্রায় দুই বৎসর এভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর হঠাৎ রঘুনাথের মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। প্রভু তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন আর এই উপলক্ষে রঘুনাথ পাইতেছেন কত আনন্দ, কত তৃপ্তি। কিন্তু এই সঙ্গে কি তাঁহার অহমিকা কিছুটা মিশ্রিত নাই ? 'প্রভু আমার কুটিরে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, ভক্তদের মধ্যে আমি বিশেষ একটা মর্য্যাদা এর ভেতর দিয়ে পাচ্ছি' এই ধরণের প্রচ্ছন্ন অভিমান হয়তো রহিয়াছে। তাছাড়া, প্রভু কি সত্যই এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন ?

ভাবিলেন, 'প্রভু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈন্যের আদর্শই তিনি তাঁহার অনুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে ধরছেন। চরম বৈরাগ্যের আধার না হলে কোন সাধকই পরম প্রেমরস বা ব্রজরস সহজে ধারণ করতে পারে না। অনুগামী বৈরাগী সন্ন্যাসীদের প্রতি এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। সেই বৈরাগ্যমূর্ত্তি প্রভুকে আমি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। আমার পিতা ও পিতৃব্য বিষয়ী, ধনী জমিদার। তাঁদের প্রেরিত অর্থে যে আহার্য্য প্রস্তুত হয়, তা ভোজনে প্রভুর তো সত্যকার আনন্দ হবার কথা নয়। তাই তো। ভ্রান্তবুদ্ধি হয়ে আমি এ কি কবছি ?'

অতঃপর রঘুনাথ প্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর হঠাৎ একদিন প্রভু প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা স্বরূপ, রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ডাক্‌ছে না। ব্যাপার কি ?"

স্বরূপ নিবেদন করেন, "প্রভু, রঘুনাথ ভেবে দেখেছে, বিষয়ীর অন্ন আপনাকে নিবেদন করাটা ঠিক নয়। আপনি ভক্তাধীন, ভক্তের ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন, তা ঠিক। কিন্তু রঘুনাথের মন আজকাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে না।"

একথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত। কহিলেন, "রঘুনাথ ঠিকই

বুঝেছে। বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধা পড়ে। রঘুনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যকার পথ চিনে নিতে ভুল করেনি।”

আহার বিহারে সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র সাধন, এইদিকে রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি পতিত হইল। কারণ, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে নিজে এই পন্থার অনুরাগী। তাছাড়া, রঘুনাথ আরও ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত্র, বিলাস-বহুল জীবনে বহুতর অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে—ভোগেচ্ছার সূক্ষ্ম অঙ্কুর হয়তো এখনো রহিয়াছে উদগ্র। এ অঙ্কুরকে নির্ম্মমভাবে বিনাস না করিলে শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গড়িয়া উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, কায়মনোবাক্যে সত্যকার বৈরাগ্যকে তিনি বরণ করিয়া নিবেন, ভোগলিপ্সা ও আত্ম-অভিমানের কাঁটাকে সমূলে করিবেন উৎপাটিত।

শ্রীচৈতন্যের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দ্দেশ ছিল, ভক্ত রঘুনাথ তাঁহাব ভজনপূজন ও সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া প্রভুর দর্শনে আসিলে প্রভুর প্রসাদান্ন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। কিছুদিন ইহা ভোজন করিয়াই বঘুনাথের দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ শুরু হইল তাঁহার আত্মসমীক্ষণ, ‘তাই তো, বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আমি পা বাড়িয়েছি। কিন্তু আর পাঁচজন বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর মত যত্রতত্র ভিক্ষা ক’রে তো উদবপূর্ত্তি করছিনে? বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছি। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, আহার ঠিকমত জুটছে, নিরুদ্বেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। এ তো ঠিক নয়। বৈরাগী জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে বরণ ক’রে নিতে হবে।’

দশদণ্ড রাত্রি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্নাথদেবের মন্দিবে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেন। তারপর আসিয়া দাঁড়াইতেন মন্দির প্রাঙ্গণে, সিংহদ্বারের কাছে। কাঙাল বৈষ্ণব বলিয়া দর্শনার্থীরা দয়া করিয়া কেহ যদি কোন খাদ্য ভিক্ষাস্বরূপ দিত, তাহা দিয়া কোনমতে করিতেন ক্ষুন্নিবৃত্তি।

এই অযাচক-বৃত্তিই তো নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সাধুর আচরণীয় ধর্ম্ম। এখন হইতে এভাবেই শরীর ধারণের উপযোগী আহার্য্য গভীর রাত্রে

রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন। তারপর সারারাত কাটাইতেন জপ ধ্যান ও ভজনে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘুনাথের মনঃপূত হইল না। প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাহিরে অযাচক বৃত্তির ভান আছে বটে, কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রহিয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের সূক্ষ্ম ইচ্ছা। মুখে কিছু না বলিলেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তুক দাতা সম্পর্কে কত কিছুই না ভাবিতে থাকে! কখনো ভাবে—এই যে আমার পরিচিত ভিক্ষাদাতা এগিয়ে আসছেন, কাল ইনি আমায় দিয়েছেন, আজো হয়তো দিয়ে যাবেন। কখনো বা কাহারো সম্পর্কে হয় বিপরীত মনোভাব—এই দাতাটি তেমন সুবিধের লোক নন, বোধহয় এর কাছে আজো কিছু পাওয়া যাবে না। রঘুনাথ কহিলেন, 'না—এই কপট অযাচক বৃত্তি আর নয়। বরং সত্রে গিয়ে কাঙালীদের মত মেগে খাবো।'

প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রায়ই মত্ত থাকেন মহাভাবে। কখনো ইষ্টগোষ্ঠী করেন, কখনো বা ভক্তদের ভীড়ের মধ্যে থাকেন ব্যতিব্যস্ত। কয়েক দিন রঘুনাথের সংবাদ রাখেন নাই। সেদিন ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন, "রঘুনাথ কেমন আছে? আর কি করেই বা আজকাল তার ভিক্ষা নির্ব্বাহ হচ্ছে, বলতো?"

জানানো হইল, রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচকভাবে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। এখন তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। সত্রে গিয়া কাঙালীদের সাথে বসিয়া ভোজন করেন।

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "তা বেশ করেছে। সত্রে মেগে খাওয়াই তো ভালো। মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্যাবৃত্তিরই মত। দাতার চোখে পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দাঁড়িয়ে থাকা—এ বড় জঘন্য!"

ভাববিলাসী বৈষ্ণবেরা প্রভুর কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরতা সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও তিনি হইতে পারেন?

গৌড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোড়পতির পুত্র, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুত্র রঘুনাথ—তাঁহাকে শেষটায় তিনি কাঙালীদের সহিত পঙ্ক্তিভোজনে টানিয়া নামাইলেন !

অতঃপর সর্ব্বত্যাগী বৈষ্ণব-সাধক রঘুনাথ আসিয়া দাঁড়ান কৃচ্ছ্র-সাধনের শেষ ধাপে। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করার কালে প্রভু কতদিন বলিয়াছেন—

জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

সত্রে কাঙালীর সারিতে বসিয়া খাইতে হয় বটে, কিন্তু ভোজন মিলে প্রচুর এবং নিশ্চিতভাবে। উদরপূর্ত্তি করার পর সারাদিন রঘুনাথ ভজনানন্দে কাটাইয়া দেন। কিন্তু সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে বাহির হইয়াছে, চরম বৈরাগ্য ও দৈন্যের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে, একমাত্র কৃষ্ণকৃপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে সত্রের নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তো সমীচীন নয়। সত্রে গিয়া চাহিয়া খাওয়া—আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তিনি অবলম্বন করিবেন। এমন বস্তু সংগ্রহ করিবেন যাহা কাহারো কাছে চাহিতে হয় না ; যাহার জন্য কাহারো কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। শুধু তাহাই নয়, যে বস্তু খাইলে অপর কোন জীবকে বঞ্চিত করা হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন।

রঘুনাথের এই বৈরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত ভক্তকবি কবিরাজ গোস্বামীর অমর লেখনীতে বিধৃত রহিয়াছে চিরকালের ত্যাগতিতিক্ষা-ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য :

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥

ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়।
লূন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়।

(চৈ, চৈ, অন্ত্য ৬)

এ যেন বৈরাগ্যের এক অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নির দহনে তপস্বী রঘুনাথ নিজেকে নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে চান, কৃষ্ণকৃপার মহারস ধারণের সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে চান।

মন্দিরের কাছে পসারীরা মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় করে। প্রতিদিন সবটা বিক্রীত হয় না। ঐ বাসি প্রসাদে দুর্গন্ধ হইলে সিংহদ্বারের পাশে দাঁড়ানো গাভীদের সম্মুখে তাহা ঢালিয়া দেওয়া হয়। গাভীরা কতকটা খায়, কতকটা দুর্গন্ধের জন্য ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। রঘুনাথ এই বাসি পচা অন্নকণা কুড়াইয়া আনেন। বার বার জলে ধৌত করার ফলে কোন কোন অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। এগুলি সংগ্রহ করিয়া নুন সহযোগে রঘুনাথ তাহা ভোজন করেন।

যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক রঘুনাথ, তেমনি কৃপালু ও কল্যাণকামী তাঁহার সাধন পথের দিক্‌দিশারী স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনার এই শেষ পর্য্যায়টি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। একদিন রঘুনাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "রঘুনাথ, এমন অমৃতময় প্রসাদান্ন রোজ তুমি ভক্ষণ করো, আর আমাদের দাও না। একি অদ্ভুত প্রকৃতি তোমার !" তারপর ঐ বাসি ভাতের প্রসাদান্ন পরম আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে। রঘুনাথের কৃচ্ছ্রব্রতের সাফল্যে জানাইলেন অন্তরের অজস্র সাধুবাদ।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্য দৃষ্টির কাছে রঘুনাথের তপশ্চর্য্যার কোন কিছুই অজানা নাই। তবুও ত্যাগী ভক্তের মহিমা বাড়ানোর জন্য ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে কহিলেন, "স্বরূপ, তোমার রঘুনাথের সমাচার বল। দিনচর্য্যা তার কিভাবে চলছে ?"

স্বরূপ করজোড়ে রঘুনাথের কৃচ্ছ্রের কথা সবিস্তার বিবৃত করেন। প্রভুর আয়ত নয়ন দুটি তখন পুলকাশ্রুতে ছলছল। স্বরূপকে নিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া যান রঘুনাথের কুটিরে।

রঘুনাথ তখন ভোজনে বসিবেন। বাসি প্রসাদান্ন জলে মাজিয়া নিয়া, নুন মাখাইয়া পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, এ তোমার কি রকমের স্বার্থবুদ্ধি? এমন মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ কর্‌ছো, আর আমাদের ডাক্‌ছো না!"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদানা প্রভু মুখে পুরিয়া দিলেন। আবার হাত বাড়াইয়া নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তাঁহার হাতটি খপ্‌ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, "না—না প্রভু, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। আমার পাপের মাত্রা আর তুমি বাড়ায়ো না প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও।"

ভক্তেরা তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সবাই পরমানন্দে দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ।

ভক্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়া বার বার প্রভু তাঁহার এই দৈন্যময় সাধনার প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে সেদিন স্বরূপের রঘুনাথ, স্বরূপের মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সেদিন প্রতিভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষ্ণবীয় সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে।

রঘুনাথের কঠোর তপস্যা দেখিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্যের আনন্দের সীমা নাই। সেদিন রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রভু তাঁহার দুইটি পরম প্রিয় বস্তু দান করিলেন।

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক ভক্ত সন্ন্যাসী বৃন্দাবনে গিয়া একটি গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্যকে এই দুইটি পবিত্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং এখন হইতে এই দুইটি প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবর্দ্ধন শিলাটির দিকে দৃষ্টি পড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন লীলা স্ফুরিত হইয়া উঠিত। আর পরম প্রেমভরে গুঞ্জামালা গলায় পরিয়া শিলাখণ্ডটিকে সেবা করিতেন কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় এই শিলাখণ্ড করিতেন মস্তকে ধারণ।

এই পবিত্র বস্তুদু'টি রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ,

এই শিলা কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ। সাত্ত্বিকভাবে, নিষ্ঠাভরে, তুমি জল ও তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এঁর সেবা পূজা করো, অচিরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবে তুমি।"

তরুণ সাধক রঘুনাথের প্রতি প্রভুর এই কৃপা দেখিয়া লীলাচলের ভক্তেরা বিস্মিত হইয়া যান, ভজননিষ্ঠ রঘুনাথকে সবাই জানাইতে থাকেন সাধুবাদ।

পবিত্র শিলা বিগ্রহ তো পাওয়া গেল, কিন্তু ইহার পূজার জন্য সামান্য কিছু উপচার উপকরণ যে চাই। আসন, বস্ত্রখণ্ড ও দু'এক পয়সার খাজা সন্দেশও তো যোগাড় করিতে হইবে। কিন্তু কাঙাল রঘুনাথের কাছে তো একটি কানাকড়িও নাই। তবে উপায়?

এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন স্বরূপ দামোদর। প্রভুর সেবক গোবিন্দকে বলিয়া এই উপচারগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তারপর প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, "রঘুনাথ, গোবর্দ্ধন-শিলা আর গুঞ্জামালা দান ক'রে প্রভু তোমায় কোন্ বিশেষ ইঙ্গিত দিলেন তা কি বুঝতে পেরেছো?"

রঘুনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিক্ষাগুরুর দিকে চাহিয়া আছেন। স্বরূপ দামোদর উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃষ্ণ ভজন সফল করাব জন্য তোমায় যেতে হবে গোবর্দ্ধন-শৈলে। আর গুঞ্জামালা অর্পণের মূল কথা হ'লো, এখন হতে তোমার স্থান হ'লো রাধারাণীর চরণে।"

রঘুনাথের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেন, "প্রভু কেন আমার ওপর এত নির্দ্দয়? কেন আমায় বৃন্দাবনে গিরি গোবর্দ্ধনে পাঠাচ্ছেন? আমি যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ধ্রুবতারা। বৃন্দাবনের ঘনীভূত রূপ যে আমি প্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ প্রভুর মধ্যেই যে আমি দেখেছি, আর তাঁর এই তত্ত্বই যে এতদিন অনুধ্যান ক'রে আসছি।"

"না—রঘুনাথ, তোমার ভয় নেই। এখনি প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে যেতে বলছেন না। যাবে তুমি পরবর্ত্তীকালে, তোমার তপস্যার

শেষ পর্য্যায়ে। এখন পরমানন্দে প্রভুর সাহচর্য্য তুমি করো, ব্রজরস সাধনার যে সব অত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রভুকে কেন্দ্র ক'রে দিনের পর দিন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ করো, তোমার ভজনময় জীবনকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোল।"

বিস্ময়কর ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমনি ছিল অসামান্য ভজননিষ্ঠা। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি অতিবাহিত করিতেন ভজন পূজন, রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা, আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষীভূত লীলা দর্শনে। প্রেমভক্তির মহাসমুদ্র প্রভু শ্রীচৈতন্য। সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দিনের পর দিন নৃত্য করিতেছে অগণিত ভাবতরঙ্গ, এই তরঙ্গভঙ্গ প্রভুকে উত্তাল করিয়া তুলিতেছে। কখনো মিলনের আনন্দে হাসিতেছেন, গাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনো বা বিরহের শোকে হইতেছেন মুহ্যমান। এই ভাবতরঙ্গের মোহন লীলা যেমন অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ প্রভৃতির হৃদয়কে নাচাইতেছে,—তেমনি উদ্বুদ্ধ করিতেছে রঘুনাথ প্রভৃতি ভজননিষ্ঠ নবীন ভক্তদের।

প্রভুর এসময়কার অলৌকিক প্রেমলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা রঘুনাথ। স্বরূপ ছিলেন প্রভুর সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী ও তাঁহার মহাভাবের সূত্রকার, আর এই পরম নিগূঢ় সূত্রের বৃত্তিকার হইলেন রঘুনাথ।

দিনের বেলায় প্রভুর সান্নিধ্যে থাকিয়া রঘুনাথ তাঁহার অপার অনন্ত ভাবশাবল্য প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর রাত্রিতে প্রভু গম্ভীরা-গর্ভে বসিয়া মহাভাবের যে লীলানাট্য উদ্‌ঘাটিত করিতেন, তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না বটে, কিন্তু এই লীলানাট্যের মর্ম্মকথা রঘুনাথ দিনের পর দিন শুনিতেন তাঁহার শিক্ষাগুরু স্বরূপ দামোদরের মুখে। ভজননিষ্ঠা আর ইষ্টকৃপার ফলে ভক্ত রঘুনাথের অন্তর্জ্জীবন প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাধুর্য্যের রসে রসায়িত হইয়া উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের পরমোদয় দেখা দেয় তাঁহার সাধন-সত্তায়।

ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ নীলাচলে প্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেন,

প্রভুর কৃপা আর স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় এসময়ে তাঁহার জীবন-তপস্যা সফল হইয়া উঠে। ইহার পর আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের পালা। নীলাচলের লীলানাট্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া প্রভু হন অন্তর্দ্ধান। প্রভু-সর্ব্বস্ব স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মর্ত্যধাম।

পর পর দুইটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ উন্মত্তের মত হইয়া উঠেন। কয়েকদিনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালাটি ঝুলিতে পুরিয়া রওনা হন তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে। মনে মনে স্থির করেন, সেখানে গিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ দুই প্রবীণ পার্ষদ সনাতন ও রূপের চরণে দণ্ডবৎ করিবেন, তারপর এই মরদেহ ত্যাগ করিবেন ভৃগুপাত করিয়া। পুণ্যগিরি গোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এবার তিনি ছেদ টানিয়া দিবেন বিরহখিন্ন অকিঞ্চিৎকর জীবনে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় অন্ত্যলীলা দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাই সেখানকার গোস্বামীরা ও ভক্তেরা অধীর হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

সনাতন ও রূপ তাঁহাকে বহুতর প্রবোধ দিলেন, কহিলেন, "রঘুনাথ, আমরা দুই ভাই প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আছি। তুমি হচ্ছো আমাদের আর এক ভাই। এসো তিন ভাইয়ে মিলে বৃন্দাবনে প্রভুর আদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করি। তাছাড়া, তুমি ভৃগুপাত ক'রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীলা গম্ভীরালীলার কথা আমরা কার মুখ থেকে শুনবো? প্রভুর অন্ত্যলীলায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই পরম লীলাতত্ত্ব স্বরূপ দামোদর তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ ক'রে স্বরূপ তোমায় নিজের কাছে রেখে বিশেষভাবে প্রভুর লীলাতত্ত্ব বুঝিয়েছেন। তুমি নিজেও সেই লীলা দর্শন করেছো, তার মাধুর্য্যে অবগাহন করেছো। সেই পুণ্যকথা ও পুণ্যতত্ত্বই তো তোমার মুখে আমরা শুনতে চাই।"

সনাতন ও রূপের স্নেহের বন্ধনে রঘুনাথ বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে থাকিয়া ব্রজরস-সাধন করিতে হইবে এই ইঙ্গিত প্রভু শ্রীচৈতন্য বহু পূর্ব্বে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ তাই এবার কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া শুরু করেন প্রভু-নির্দ্দিষ্ট সাধনা, এই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হইতে থাকে তাঁহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্যা।

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর নিগূঢ় প্রেমলীলার কথা আলোচনা করিতেন, তাঁহার মুখে এই লীলার মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব শ্রবণ করিতেন। এবার বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি লাভ করিলেন মহাপ্রেমিক সাধক রূপগোস্বামীর স্নেহময় সান্নিধ্য। প্রভুর মাধুর্য্যরস উদ্‌ঘাটনে রূপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' মাধুর্য্যময় সাধনা ও নিগূঢ় প্রেমরহস্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সমুজ্জ্বল। শ্রীরূপ যেমন তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিতেন, রঘুনাথও তেমনি বর্ণনা করিতেন মহাভাবময় জীবনের বহু রোমাঞ্চকর দৃশ্য। তাই উভয়ের মধ্যে এসময়ে গড়িয়া উঠে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্বন্ধ। প্রেমভক্তিসিদ্ধ রূপ গোস্বামী মধুর রসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে পারদর্শী। এখন হইতে রঘুনাথের সাধন জীবনে তিনি গ্রহণ করেন স্বরূপের স্থান।

শ্রীচৈতন্যের লীলা কাহিনী শোনার জন্য, স্বরূপ ও রামানন্দের প্রেমতত্ত্ব শোনার জন্য, বৃন্দাবনের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর ভক্তেরাই রঘুনাথের কুটিরে আসিতেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একান্ত অনুগত। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভূতি। শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও তাঁহার মর্য্যাদা ছিল অপরিসীম। ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, মাধুর্য্য রসের সাধনায় ব্রতী হন। কৃষ্ণদাস প্রায় সময়েই রঘুনাথের সান্নিধ্যে থাকিতেন, সুযোগ পাইলেই তাঁহার সেবা যত্নে নিজেকে করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

---

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রকৃত দীক্ষাগুরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত প্রমাণ নাই। কেহ বলেন তাঁহার গুরু ভট্ট গোস্বামী, কেহ বলেন রূপ গোস্বামী।

রঘুনাথের সঙ্কল্প, গোবর্দ্ধনে গিয়া কঠোর তপস্যায় তিনি ব্রতী হইবেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে কাটাইয়া দিবেন অবশিষ্ট জীবন। রূপ গোস্বামী এবার আর তাঁহাকে বাধা দিলেন না। শুধু কহিলেন, "গোবর্দ্ধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্তু, সদাই তুমি থাকো ভাবোন্মত্ত, বাহ্য-জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তো দেহ থাকবে না। কৃষ্ণদাস তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা করবে।"

রূপ গোস্বামীর কথা অমান্য করার উপায় নাই। কৃষ্ণদাসকে তাই সঙ্গে নিতে হইল। অতঃপর পদব্রজে কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে উপনীত হইলেন গোবর্দ্ধনে। এই গোবর্দ্ধনেই রঘুনাথের সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতের মহামূল্যবান তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানুভূতির বলে রচনা করেন অমর গ্রন্থ—চৈতন্যচরিতামৃত।

গোবর্দ্ধনের পাদদেশে রহিয়াছে গৌড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার উপবেশন ঘাট। এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রভুর উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবৎ জানাইয়া রঘুনাথ আশ্রয় নেন এক বৃক্ষতলে। এখানেই শুরু তাঁহার নূতনতর তপস্যা।

সনাতন গোস্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধন ভজন করিতেছেন। তিনি তখন অতিশয় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না থাকিলে চলাফেরা বড় একটা করেন না। পরম স্নেহভাজন রঘুনাথের আগমনের কথা শুনিয়া সনাতন ছুটিয়া আসিলেন। দুই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল।

তবে কৃষ্ণদাসের লেখা অনুযায়ী এবং ভক্তিরত্নাকরের মতে, রঘুনাথই তাঁহার গুরু: শ্রীমৎ দাসগোস্বামী—রসিকমোহন।

দীক্ষাগুরু না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাগুরু বা "সারগুরু যে রঘুনাথ তাহাতে বিতর্কের অবকাশ নাই: চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা—রাধাগোবিন্দ নাথ।

সনাতন উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ এস্থানে তপস্যা করবে বলে এসেছো, তা ভালই। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তোমায় এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে দেব না। তোমার জীবন মহাপ্রভুর আশিস্‌পূত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে তাঁরই মাধুর্য্য লীলার স্তবগান, লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে।"

"আমি কাঙাল বৈষ্ণব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো যথেষ্ট, প্রভু।" করজোড়ে নিবেদন করেন রঘুনাথ।

"না রঘুনাথ তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুমি ভজনময় জীবন যাপন করো। এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অভাব নেই। বৃক্ষতলে রাত্রিকালে বাস করা সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, তোমার এখন বয়স হয়েছে, কুটিরের আশ্রয় নেওয়াই দরকার।"

সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া ভক্ত গ্রামবাসীরা দলে দলে সেখানে সমবেত হইতে থাকে। সনাতনের আদেশে তখনি সবাই মিলিয়া পর্ণকুটির বাঁধিয়া ফেলে, রঘুনাথ ও তাঁহার সেবক কৃষ্ণদাস যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সনাতনের কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা নবাগত সাধক রঘুনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে থাকে।

যেস্থানে ভজন কুটিরটি তৈরী করা হয় তাহার নাম অরিট গ্রাম। জনশ্রুতি আছে, অরিস্ট নামে এক অসুর বৃষের রূপ ধরিয়া ব্রজমণ্ডলে দৌরাত্ম্য শুরু করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এই স্থানটিতে তাহাকে বধ করেন। অসুর বধের পর্ব্ব তো শেষ হইল, কিন্তু এসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকে তিনি কহিলেন, "বৃষরূপী অসুর তুমি বধ করেছো, এর ফলে হয়েছো মহাপাপের ভাগী। সর্ব্বতীর্থের জলে স্নান না করলে তো তোমার এ পাপ মোচন হবে না।"

চাতুর্য্য ও পরাক্রমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয়। তখনি সহাস্যে তিনি পদাঘাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত করিলেন সর্ব্বতীর্থের পুণ্যময়

সলিল ধারা। তাহার ফলেই সৃষ্ট হয় এই অঞ্চলে পবিত্র শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড।

গিরি গোবর্দ্ধনের পাদদেশেই রহিয়াছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। প্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহার গোবর্দ্ধন পরিক্রমার কালে, ভাবাবেশে মত্ত থাকা অবস্থায়, এই কুণ্ড দুইটি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে মজিয়া গিয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছে নীচু ধানের ক্ষেত রূপে। প্রভুর আবিষ্কৃত পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান রঘুনাথ তাঁহার ধ্যানবলে নির্ণয় করিলেন। কিন্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তো কাজ হইবে না, গভীর করিয়া এ দুটিকে খনন করা দরকার। সারা ভারতের ভক্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করা দরকার।

রঘুনাথ নিজে কাঙাল বৈষ্ণব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় পাইবেন? তাই খেদের তাঁহার পরিসীমা রহিল না।

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইষ্টদেবের কাছে, সজল নয়নে রঘুনাথ নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি, "হে প্রভু, করুণাসিন্ধু, পরম পবিত্র কুণ্ড দুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব ক'রে তোল। লক্ষ লক্ষ ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের এই আর্ত্তি বিফলে যায় নাই। ভক্তবৎসল প্রভু অচিরে ইহার ব্যবস্থা করিলেন।

সেদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে বিশ্রাম করিতেছেন, অন্তরে বার বার উঠিতেছে চিন্তার তরঙ্গ— 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা আজো সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ যে তাঁর বড় সাধের কাজ!'

এমন সময়ে এক পশ্চিমদেশীয় ধনী বৈষ্ণবভক্ত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানায়। করজোড়ে নিবেদন করে, "বাবাজী, আপনিই কি গোস্বামী রঘুনাথদাস?"

"হ্যাঁ বৎস, আমিই গোস্বামীদের দাস—রঘুনাথ। কোথা থেকে তুমি আসছো। কি প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধ্যমত আমি তা করতে চেষ্টা করবো।" শান্ত স্বরে উত্তর দেন রঘুনাথ।

"প্রভু, আপনার কাছে একটা জরুরী কাজে আমি এসেছি। এখন সোজা আসছি বদরিনারায়ণ থেকে। প্রভু নারায়ণজীর কাছে পূজার মানৎ ছিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে, সাড়ম্বরে তাঁর পূজো দেবো ব'লে বদরিনাথে পৌঁছালাম। সেই রাত্রেই প্রভুজী স্বপ্নে দিলেন, প্রত্যাদেশ—এখানকার পূজোয় বেশী অর্থ ব্যয় করার তোমার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পূজো সম্পন্ন করো, তারপর সোজা চলে যাও ব্রজমণ্ডলের অরিট গ্রামে। সেখানে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথদাস চিন্তিত হয়ে পড়েছে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন কাজের জন্য। ব্যয়সাপেক্ষ এ কাজটি তুমি ক'রে দাও। রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করো। এই জন্যেই আপনার কাছে আমি এসেছি।"

রঘুনাথের নয়ন দুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন। নিজেই সব কিছুর ব্যবস্থা তাই করিয়াছেন।

অচিরে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে খনন করিয়া পরিণত করা হয় স্নিগ্ধ সরোবরে। এই জলপূর্ণ পবিত্র কুণ্ডদ্বয়ের মহিমার কথা এসময়ে ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী এখানে আসিয়া পুণ্যস্নান সম্পন্ন করিতে থাকে। এখন হইতে রঘুনাথ অভিহিত হইতে থাকেন রাধাকুণ্ডের দাস গোস্বামী নামে।

রঘুনাথের পর্ণকুটিরটি ছিল রাধাকুণ্ডের অতি নিকটে। অতঃপর তাঁহার তপঃপ্রভাবে এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে নির্ম্মিত হয় বহুতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন কুটির। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়া ভজন সাধন করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া আরো বহু বৈষ্ণব সাধক এখানে ভজন কুটির স্থাপন করেন এবং রাধাকুণ্ড ক্রমে পরিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনে।

নীলাচলের মত রাধাকুণ্ডে থাকিতেও রঘুনাথ তাঁহার কৃচ্ছ্রব্রত

ও ভজননিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসিতে দেন নাই। পাষাণের রেখার মত স্থির অবিচল ছিল তাঁহার এই দৈন্য-বৈরাগ্যময় সাধনার ক্রম। কখনো কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় হওয়ার উপায় ছিল না। সদাসঙ্গী ও ভক্তশিষ্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার এই দিনচর্য্যার বর্ণনা দিয়াছেন :

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥
রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে॥

(চৈ, চৈ, আদি, ১০ম)

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ও যুগল লীলার মানস পূজা ছিল রঘুনাথের প্রেম সাধনার মূল উপজীব্য। রসরাজ কৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি, মহাভাবময়ী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্জ্বল থাকিতেন তাঁহার সাধন সত্তায়। রাধাকৃষ্ণের এই মিলিত মাধুর্য্যমূর্ত্তি তিনি দর্শন করিতেন ইষ্টদেব প্রভু-শ্রীচৈতন্যের মধ্যে।

'অন্তরঙ্গ সেবা' বা সখী বা মঞ্জরী রূপে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবায় রঘুনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম। এই সাধনার বিভিন্ন স্তরে যে দুরবগাহ ভাবময়তা ও প্রেমোন্মাদনা তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিত, ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে তাহা ছিল পরম বিস্ময়কর।

"রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তি, অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ বা বিরহদশায় তাঁহার সখীগণ যেভাবে তাঁহার প্রতি সমদুঃখিনী হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথ ও অন্তর্দ্দশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে, তাঁহার আত্মবিস্মৃত ভাবের উত্তর হইতে উহা বুঝা যাইত। এই অবস্থার কথাই ভক্তমালে আছে—

আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥

"রূপগোস্বামী ললিত মাধব নাটক রচনা করিয়া রঘুনাথকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলম্ভ লীলা অতি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রঘুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। এই জন্য তাঁহার সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে "দানকেলি-কৌমুদী" নামক ভাণিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার করে অর্পণ করেন। প্রতিষেধক ঔষধের মত উহাতে পূর্ব্ব উপদ্রবের নাশ হইল, পুস্তক পাইয়া রঘুনাথ সুস্থ ও সুখী হইলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থারম্ভ ও উপসংহারের আশীর্ব্বচনে এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন।

"একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলে, তাঁহার তপঃপ্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাঁহারা যেন স্থির হইতে পারেন না। একজনের জন্য সমগ্র দেশ উন্নত হয়, ধন্য হয়, পুণ্যময় হয়। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে সকলের প্রাণে এক নূতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ সনাতন যত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন; গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও ভূগর্ভ গোস্বামী তাঁহার নিকটেই ভজন-কুটিরে থাকিতেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা যে যখন শ্রীধামে আসিতেন, রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন।[১]"

রঘুনাথের অকৃত্রিম ভজননিষ্ঠা ও প্রেমসাধনার সিদ্ধি তাঁহাকে সারা ব্রজমণ্ডলে বরণীয় করিয়া তোলে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলার এক মরমী ব্যাখ্যাতা রূপেও তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন্যতম অবদান তাঁহার রসমধুর

১ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

স্তবাবলীর উল্লেখ করিতে হয়[১]। অন্তরঙ্গ সেবনের মধ্য দিয়া যখন তাঁহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়া উঠিত, অন্তর-পুরুষ তখন দুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেন। সুললিত এবং ভাবময় স্তবরাশি নির্গত হইত এই ভজনসিদ্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠে হইতে। এই স্তবাবলী প্রমাণিত করে যে তিনি দিব্যলীলা দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন এক প্রতিভাধর কবি ও শাস্ত্রবিদ্ সাধক। আজো ইহা অগণিত ভক্তের সাধনপথের পরম পাথেয় হইয়া আছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ রঘুনাথ রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহা বৈষ্ণব সমাজের সব্বত্র সমাদৃত।[২]

ভজন সিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধি রঘুনাথ লাভ করিয়াছেন, অন্তরঙ্গ সেবার কালে ব্রজের মাধুর্য্য-লীলা দর্শনে হইতেছেন আপ্তকাম। কিন্তু তবুও দৈন্যময় সাধনার পথে তাঁহার সতর্কতাব বিরাম নাই। অশন বসনে, আচার ব্যবহারে বৈরাগ্য সাধনার সেই পাষাণের রেখা ঠিক তেমনি রহিয়াছে অবিচল।

নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। রঘুনাথের কল্যাণ কামনা নিয়া এই মাতৃস্বরূপা সাধিকা কিছুদিন রাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। এসময়ে তাঁহার কাছে নৈষ্ঠিক বৈরাগী রঘুনাথ নিজের সম্পর্কে যে আর্ত্তি প্রকাশ করেন তাহার তুলনা বিরল। বহু বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়, পরম শ্রদ্ধেয়, এই সিদ্ধ বৈষ্ণব সজল নয়নে বলিতেছেন :

বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাঁসো লাজ ভয়।
কি গুণে চৈতন্য পদ দিবেন অভয়॥

১ শ্রীমৎ দাস গোস্বামী : রসিকমোহন। এই গ্রন্থে রঘুনাথের সংস্কৃত স্তবের সুললিত অনুবাদ দেওয়া আছে।

২ অপর গ্রন্থগুলির নাম—শ্রীনাম চরিত, মুক্তাচরিত এবং দানকেলি-চিন্তামণি। স্বরূপ ও দামোদরের প্রখ্যাত কড়চার বৃত্তিকার রূপেও রঘুনাথ ভক্তসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাছাড়া, পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত তিনটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

একদিন না করিনু চরণ সেবন।
তথাপি চরণ মাঁগো হেন দীনজন॥
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥

(প্রে, বি, ১৬শ বিলাস)

এই আর্ত্তি ও দৈন্য এখনো কেন রহিয়াছে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের ? ব্রজরস সাধনার উত্তম অধিকারী মাত্রেই তাঁহার ঐ উক্তি হইতে বুঝিয়া নিবেন, বৈরাগ্যের নিষ্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ নিজের অহমিকাকে দিনের পরদিন অবলুপ্ত করিয়া দিতেছেন, আর কৃষ্ণ-অনুরাগের ভাণ্ডটিকে করিতেছেন প্রশস্ততর।

নীলাচলে থাকিতেই রঘুনাথের কৃচ্ছ্র চরমে উঠে। সাধন জীবন তাঁহার অব্যাহত রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া নামমাত্র আহার্য্য সারাদিনের পর গ্রহণ করিতেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রকট হইবার পর অন্ন তিনি একেবারে ত্যাগ করেন, সামান্য ফল ও দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন।

বৃন্দাবনে আগমনের পর আহার আরও হ্রাস পায়। দুই একটি ব্রজফল এসময়ে খাইতেন, আর দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতেন অল্প পরিমাণ ঘোল।

রাধাকুণ্ডের তপস্যামর জীবনে তো আহার্য্য সম্বন্ধে কোন হুঁসই তাঁহার থাকিত না। সারা দিন ও রাতের বেশী সময়ই থাকিতেন ভজনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্ণদাস এবং অপর একটি ব্রজবাসী ভক্ত সুযোগ মত পাতার দোনা করিয়া তাঁহার মুখে কিছুটা ঘোল ঢালিয়া দিতেন। এই ধরণের কৃচ্ছ্র চলিতে থাকে প্রায় বিশ বৎসর ব্যাপিয়া।

অতঃপর বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামীদের মধ্যমণি সনাতন তনু ত্যাগ করেন। অগ্রজ প্রতিম এই মহাবৈষ্ণবের তিরোধানে রঘুনাথ শোকে হন মুহ্যমান। তারপর আসে আর এক দুর্দ্দৈব। রূপ গোস্বামীও ভক্ত বৈষ্ণবদের মায়া কাটাইয়া মরধাম হইতে অন্তর্হিত হন। গুরু-স্থানীয় এই সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথা শুনিয়া রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের

জন্য অন্নজল ত্যাগ করেন। এসময়ে তাঁহার দেহটি বাঁচাইয়া রাখা হয় কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ভক্তদের এক বড় সমস্যা।

বিস্ময়ের কথা এই শোকজর্জ্জর অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতনু, মহাসাধকের নিয়মিত ভজন পূজন ও অন্তরঙ্গ সেবায় কিছুমাত্র ব্যত্যয় দেখা যায় নাই।

অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥
যদ্যপিও শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাপয়॥
নিয়ম-নির্ব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে॥

(ভ, র, ষষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ)

প্রেমঘন মূর্ত্তি রঘুনাথ গোস্বামীর চরণতলে এসময়ে অনেক সাধকই আসিয়া উপবেশন করিতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রঘুনাথগত-প্রাণ ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তিনি সিদ্ধ মহাত্মা রঘুনাথের সাহচর্য্য করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে দিনের পর দিন শুনিয়াছেন গম্ভীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধায়িত মহাপ্রভুর প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা।

আজিও কল্পনা করা যায়ঃ ভজন কুটিরের এক প্রান্তে ঘৃতের প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি জ্বলিতেছে সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব রঘুনাথের যুগলভজনময় জীবনের স্নিগ্ধমধুর দীপশিখা—যে শিখা শত শত বৎসর ব্যাপিয়া অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে বিছাইয়া দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জ্বল রসের স্নিগ্ধ প্রলেপ—মানুষকে উর্দ্ধায়িত করিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিকে, অপ্রাকৃত ব্রজধামের দিকে। আর সেই দীপ শিখারই মৃদু আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন ব্রজরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা। তাঁহার প্রাণ-প্রিয় মহান্ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন তিনি গোস্বামী রঘুনাথের দিব্য প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত হইয়া।

আরও কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়। গোস্বামী রঘুনাথ এবার আসিয়া দাঁড়ান তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। বয়স তখন তাঁহার প্রায় চুরানব্বই বৎসর। আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশীর পরম লগ্নটি সেদিন আসিয়া যায়। ১৫১৪ শকের[১] চিহ্নিত ক্ষণটিতে আপ্তকাম মহাসাধক রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়।

রাধাকুণ্ডের ভজনকুটিরের কম্পমান দীপশিখাটি সেদিন নিভিয়া যায়; আবার বুঝি নূতন করিয়া দিব্যরূপে জ্বলিয়া উঠে রাধামাধবের অপ্রাকৃত মহাধামে।

১ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত—অচ্যুতচরণ চৌধুরী। দ্রঃ রঘুনাথ গোস্বামীর মৃত্যু সাল সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলার উপায় নাই। চৌধুরী মহাশয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই সালের কথা লিখিয়াছেন।

সাধু নাগমহাশয়

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই পার্ষদ, বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়, সম্বন্ধে কবিবর গিরিশ ঘোষ দুইটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এ উপমার মধ্য দিয়া এই দুই মহাপুরুষের সাধনসত্তাব প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে। গিরিশ বলিয়াছেন, "নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যতই তিনি কষে বাঁধেন, ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়িতে কুলোয় না। শেষটায় নরেন এত বড় হ'লো যে মায়া তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো। নাগমশাইকেও মহামায়া বাঁধতে গেলেন। কিন্তু যতই তিনি বাঁধেন, নাগমশাই ততই সরু হয়ে যান। ক্রমে এমন সরু হন যে মহামায়ার জাল গলিয়ে অবলীলায় বেরিয়ে পড়েন।"

অধ্যাত্মক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা, রামকৃষ্ণ-প্রতিভূ স্বামীজী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত। তাঁহার জীবন তথ্য অনেকেরই অবিদিত নয়। কিন্তু ভক্তপ্রবর দুর্গাচরণ নাগ আজীবন ছিলেন আত্মগোপন প্রয়াসী, তাই তাঁহার পুণ্যজীবনের কথা জানিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় নাই। মহামায়ার মায়ার জাল এড়াইবার সাথে সাথে নাগমশাই আশে-পাশেব মানুষের দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। দৈন্যময় ভক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ। অপূর্ব্ব ভক্তিবলে নিজেকে যেমন করিয়া তোলেন রামকৃষ্ণময়, তেমনি সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিতে থাকেন রামকৃষ্ণসত্তার পুণ্যময় প্রকাশ। বিবাহিত জীবনের ত্যাগে ও সংযমে, গার্হস্থ্য জীবনের পুণ্যময়তায় তাঁহার জীবন হইয়া ওঠে দিব্য মহিমায় ভরপুর। স্বামী বিবেকানন্দকে তাই একদিন ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে শুনা গিয়াছিল, "পৃথিবীর এত দেশ দেখে এলাম, কিন্তু নাগমশাইর মত মহাপুরুষ একজনও চোখে পড়লো না।"

পূর্ব্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছেই দেওভোগ গ্রাম। এই গ্রামে,

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট দুর্গাচরণ ভূমিষ্ঠ হন। পিতা দীনদয়ালের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। কলিকাতায় কুমারটুলীর পালচৌধুরীদের গদিতে থাকিয়া সামান্য কাজ করেন। পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেশে বাস করিয়া পুত্র দুর্গাচরণ ও কন্যা সারদাকে কোনমতে মানুষ করিতে থাকেন।

দুর্গাচরণের বয়স তখন আট বৎসর। রোগজীর্ণ দেহ নিয়া জননী হঠাৎ একদিন লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। বালক পুত্র ও কন্যার লালন পালনের সমস্ত কিছু ভার পড়ে পিসীমা ভগবতী দেবীর উপর। পিসীমারই স্নেহ যত্নকে অবলম্বন করিয়া দুর্গাচরণের প্রথম জীবন গড়িয়া উঠে।

পিতা দীনদয়াল ছিলেন বড় ধর্ম্মভীরু ও নির্লোভ। সামান্য কর্ম্মচারী হইলেও পালচৌধুরীরা তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন, ঘরের লোকের মত ভাবিয়া বিশ্বাসও কম করিতেন না।

দীনদয়ালের ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোভহীনতার নানা কাহিনী রহিয়াছে। সে-বার পালচৌধুরীদের এক নৌকা-ভর্ত্তি নূনের চালান নারায়ণগঞ্জে যাইতেছে। দূর নৌকাপথে বিপদ যথেষ্ট, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী না হইলে চলে না। তাই দীনদয়ালকেই এ কাজের ভার দেওয়া হইল।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়া নৌকা চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া উঠে। কাছে দুই চারিটি বসতি দেখিয়া নৌকা এক জায়গায় নোঙর করা হয় এবং দীনদয়াল সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে থাকেন। অতি প্রত্যূষে নীচে নামিয়া তিনি শৌচে গিয়াছেন, মাটি হাতড়াইতে গিয়া হঠাৎ কি একটা শক্ত ভারি বস্তু আঙুলে ঠেকিল। খুঁড়িয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা ঘড়া, সোনার মোহরে উহা পূর্ণ।

দীনদয়াল ত্রস্তেব্যস্তে নৌকায় ছুটিয়া আসিলেন। মাঝিদের কহিলেন, "ওরে, শিগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দে, এখানে যেন বিপদের আভাষ পাচ্ছি।" তৎক্ষণাৎ নৌকা ভাসানো হইল, আর মোহরের ঘড়া হইতে দূরে আসিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পরে এ কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, "কবে কোন ব্রাহ্মণ এ ঘড়ায় মোহর পুঁতে রেখেছে কি না কে জানে? শেষটায় কি ব্রহ্মস্ব

অপহরণের পাপ মাথায় নেবো ? পাছে নিজেরই অজ্ঞাতে মনে লোভ আসে, এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয়, তাই ছুটে পালিয়ে এলাম।”

এমনি সততা ও ধর্ম্মপরায়ণতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন নাগমশায়ের পিতা।

নারায়ণগঞ্জের বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীব বেশী পড়ানো হয় না। এ পড়া বালক দুর্গাচরণের শেষ হইল। এবার সমস্যা—কোথায় তিনি পড়িবেন ? কাছাকাছি স্কুল কোথাও নাই। বালক পিতাকে ধরিয়া বসিল, কলিকাতায় সে পড়িতে যাইবে। কিন্তু দীনদয়াল রাজী হন না। তাঁহার যে আয় তাহাতে নিজের খরচ চালাইয়া পুত্রকে পড়ানো সম্ভব নয়।

দুর্গাচরণ কিন্তু হটিবার পাত্র নন, লেখাপড়ার ঝোঁক তখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। স্থির করিলেন, দশ মাইল দূরে ঢাকায় গিয়া পড়িবেন। কাজটি বালকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়। যাতায়াতে দুইবেলা প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পিসীমার নয়নাশ্রু, সঙ্গীসাথীদের বারণ, কোন কিছুই সেদিন তাহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি পড়াশুনা শুরু করিয়া দিলেন।

শীতাতপ, ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যায়, দৃঢ়চিত্ত বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই, হাঁটিয়া একাকী নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যোগ দিতে থাকে। এই অধ্যয়নস্পৃহা ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া একটি শিক্ষকের বড় দয়া হয়। দুর্গাচরণকে ডাকিয়া বলেন, “বাছা, কষ্ট ক'রে দূর পথে যাতায়াত না ক'রে তুমি আমার বাসায়ই এসে থাকো। যা হয় কষ্ট ক'রে আমার চলে যাবে।”

এ প্রস্তাবে বালক কিন্তু রাজী হয় নাই। নিত্যকার পথশ্রান্তিকে গুরুত্ব না দিয়া অবলীলায় কহিল, “রোজ এই কয় মাইল হাঁটতে আমার তেমন কষ্ট হয় না। আপনি সেজন্য ভাব্‌বেন না।”

দুর্গাচরণ ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। পিসীমা তাহার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাতৃহীন দুর্গাচরণের লালন পালনের ভার তাঁহারই উপর। এবার তাহাকে সংসার

জীবনে ব্রতী করিতে পারিলে তবে তাঁহার স্বস্তি। উদ্যোগী হইয়া তিনি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এগারো বৎসর বয়স্কা কন্যা প্রসন্নকুমারীকে বধূ রূপে ঘরে আনা হইল।

বিবাহের কয়েকমাস পরের কথা। নাগমশাই কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন। এখানে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিনি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা ঘটনার আবর্তে পড়িয়া এই ডাক্তারী পড়া তাঁহাকে ছাড়িতে হয়।

অতঃপর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিহারীলাল ভাতুড়ীর অধীনে থাকিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা কবিতে থাকেন।

বিবাহের পর নাগমশাইকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। ইহার পর দুই তিনবার তিনি বাড়ী গিয়াছেন, কিন্তু এযাবৎ স্ত্রীর সাথে আলাপ পরিচয় কিছু হয় নাই। সংসার জীবনের উপর, দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর, এক সহজাত বীতরাগ নিয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছেন। নববধূর সান্নিধ্যে আসিলেই নাগমশাই বড ভীত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ রাত্রি ঘনাইয়া আসিলেই তাঁহার মনে আসে এক আতঙ্ক। স্ত্রীর সহিত কি করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন, ইহাই হইয়া উঠে বড় সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গে এক ফন্দী বাহির করিয়া বাড়ীর সংলগ্ন এক উঁচু গাছে তর্ তর্ করিয়া তিনি চড়িয়া বসেন। জানাইয়া দেন, এখানেই রাত কাটাইবেন।

পিসীমাকে এবার আগাইয়া আসিতে হয়। চীৎকার ও অনুনয় বিনয়ের পর অবশেষে তাঁহাকে বলিতে হয়, "আচ্ছা, তোকে বৌর কাছে থাকতে হবে না, আমার ঘরেই তুই শুয়ে থাক্‌বি, এবার নেমে আয়।"

নিজের মনকে পিসীমা প্রবোধ দেন, 'দুর্গাচরণের এ ছেলেমানুষী বেশীদিন আর থাকবে না, কিছুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হবেই।'

নাগমশাইর এ সমস্যা কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে হঠাৎ সরল হইয়া যায়। কলিকাতায় একদিন সংবাদ আসে, নববধূ আর ইহজগতে নাই, আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া সে পরলোক গমন করিয়াছে।

নাগমশাই হাঁফ ছাড়িলেন। যাক্ সংসার বন্ধন হইতে এবার তবে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

হাতে ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। তরুণ ডাক্তার নাগমশাই পরম উৎসাহে গরীব দুঃখীদের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান। ভিজিটের কথা দূরে থাকুক, প্রায়ই নিজব্যয়ে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন। দরিদ্রের সেবা ও পরোপকারের নেশা তখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

ডাক্তারিতে এ সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম হইতেছে না। দুঃস্থ ও অসহায় পাড়াপড়শীর দল একান্তভাবে তাঁহারই আশ্রয় নিতে থাকে। ডাক্তারের উপর বিশ্বাস তাহাদের অপরিসীম। নূতন হইলে কি হয়, ধীর মস্তিষ্কে বিবেচনার সহিত যে ঔষধ তিনি দেন অচিরে কার্য্যকরী হইয়া উঠে। ডাঃ ভাদুড়ীকেও এ সময়ে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র নাগমশাইর ঔষধ নির্ব্বাচন ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের অজস্র প্রশংসা করিতে শুনা যাইত।

নাগমশাইর ব্যবহারিক জীবনে এ সময়ে চলিতে থাকে চিকিৎসার মাধ্যমে এই সেবাধর্ম্ম, আর তাঁহার অন্তর্জ্জীবনে শুরু হয় অধ্যাত্ম-সাধনার তীব্র ব্যাকুলতা।

হাটখোলার দত্ত বংশের সুরেশ তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু। বাসার অতি নিকটেই সে থাকে। জীবনাদর্শের দিক দিয়া সুরেশ তখন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। অথচ নাগমশাই রক্ষণশীল, হিন্দু দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁহার অচল অটল। দুই বন্ধুতে যখনি দেখা হয়, তখনি শুরু হয় নানা বিচার বিতর্ক। সুরেশের নিন্দা সমালোচনার উত্তরে এক একদিন নাগমশাই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, "দ্যাখো, তুমি যতই যা বল, আমাদের বেদপুরাণ তন্ত্রমন্ত্র এসব মিথ্যে নয়। তোমার ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলে, আসলে তা হচ্ছে সাধনার চরম কথা—কিন্তু সাধন ভজনের ভেতর দিয়ে না গেলে মহামায়ার কৃপা না পেলে, সে জ্ঞান কি ক'রে হবে? ব্রহ্মজ্ঞান কি মুখের কথা? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে?"

নাগমশাইর অন্তরে এ সময়ে আসিয়াছে এক তীব্র ব্যাকুলতা। ঈশ্বরীয় কথা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কথায় এখন প্রায়ই তিনি মত্ত হইয়া উঠেন। শাস্ত্র পাঠের উৎসাহও এ সঙ্গে তাঁহাকে পাইয়া বসে। শাস্ত্র গ্রন্থ-সমূহের বঙ্গানুবাদ আনাইয়া পরম উৎসাহে তিনি সেগুলি আয়ত্ত করিতে থাকেন।

কিন্তু প্রাণের আর্ত্তি যায় কই? শাস্ত্রপাঠে ও ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা শ্রবণে তো প্রকৃত শান্তি মিলে নাই। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলেই নাগমশাই রোজ কাশীমিত্রের শ্মশান ঘটে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করেন। চিতার আগুনে শবদেহ জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মিলাইয়া যায়—নাগমশাই উদাসনেত্রে সেদিকে চাহিয়া থাকেন, নশ্বর জীবনের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া বেদনায় হন মুহ্যমান। এ অনিত্য সংসারে নিত্য ও শাশ্বত বস্তুর সন্ধান তিনি কোথায় পাইবেন? কে তাঁহাকে কৃপা করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে গণ্ড বাহিয়া কেবলি ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

কাশীমিত্রের ঘাটে সেদিন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সাথে নাগমশাইর পরিচয় ঘটে। এই সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশে অমাবস্যার নিশীথে তিনি শ্মশানে বসিয়া জপ-ধ্যান শুরু করিয়া দেন।

পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া দীনদয়াল বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন স্থির করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহাকে সংসার বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, নতুবা সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে ঘোরার বাতিক বন্ধ হইবে না। দেশে পত্র লিখিয়া কন্যা ও জামাতার সাহায্যে দুর্গাচরণের বিবাহের কথাও তিনি পাকা করিয়া ফেলিলেন।

পুত্র কিন্তু একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। কিছুতেই তিনি আর বিবাহ করিবেন না। মিনতি করিয়া কহিলেন, বিবাহিত জীবনের উপর তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই, ধর্ম্মপথের তাহা এক বড় অন্তরায়। তাছাড়া, নূতন বধূ আসিয়া পিতার যে পরিচর্য্যা করিবে, দুর্গাচরণ তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সেবা-যত্নে তাঁহাকে রাখিবেন।

দীনদয়াল বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। কন্যাপক্ষকে তিনি কথা দিয়াছেন, শেষকালে তাহাকে এভাবে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে? তাছাড়া,

দুর্গাচরণ যে তাঁহার একমাত্র পুত্র। সে বিবাহ না করিলে বংশ রক্ষাও যে হইবে না।

প্রচণ্ড বাদানুবাদের পরও দুর্গাচরণের মত পরিবর্ত্তিত হইল না। পিতা এবার মনোদুঃখে ঘরে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এ করুণ দৃশ্যটি দুর্গাচরণের চোখে সেদিন পড়িল, অন্তরে উঠিল প্রবল আলোড়ন। এ সংসারে পিতার মত আপনার জন তাঁহার আর কেউ নাই। অপার স্নেহ মমতায় পুত্রকে তিনি এতকাল ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। এই পিতার সন্তোষ বিধানই যে তাঁহার সব চাইতে বড় ধর্ম্ম।

মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্গাচবণ সিদ্ধান্ত স্থিব কবিয়া ফেলিলেন, পিতাকে কহিলেন, তিনি বিবাহ কবিবেন।

পাত্রী তাঁহার গ্রামেরই। শুভদিনে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল।

রোগীব চিকিৎসা, জপতপ ও ভগবৎ প্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়া কলিকাতায় নাগমশাইর দিন কাটিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল, দেশে তাঁহার পিসীমা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এই পিসীমা তাঁহার মাতৃস্থানীয়, মাতার মৃত্যুর পর হইতে ইহারই আদর যত্নে তিনি মানুষ হইয়াছেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাত্র ব্যগ্রভাবে দেওভোগে ছুটিয়া গেলেন।

পিসীমার মৃত্যু এবাবে দুর্গাচরণের জীবনে আনিয়া দেয় এক চরম নির্ব্বেদের অবস্থা। দিনের পব দিন তিনি ভাবিতে থাকেন, এ নশ্বর জীবনেব মূল্য কি? এই স্নেহ মায়া-মমতাই বা কতক্ষণ স্থায়ী? ভঙ্গুর জীবনের উপর এবার আসিয়া গেল তাঁহার এক প্রবল বিতৃষ্ণা। মৃত্যুর ওপারে যে আলোক, যে অমৃত চির-বর্ত্তমান, তাঁহারই জন্য অন্তরে জাগিয়া উঠিল পবম আকাঙ্ক্ষা।

পিতার সেবার জন্য, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, নাগমশাইকে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যেভাবে চলিলে পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি কই? ডাক্তারের

বেশভূষায় কোন আড়ম্বর নাই, রোগীদের জন্য বসিবার একটি ঘরও নাই। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি তাঁহার আজকাল হইয়াছে, দূর-দূরান্ত হইতে তাই রোগীবাড়ীর আহ্বান আসে। নিতান্ত সাধারণ বেশে ঔষধের ব্যাগটি হাতে নিয়া পদব্রজেই নাগমশাই রোগী দেখিতে বাহির হইয়া পড়েন।

দীনদয়ালের ইচ্ছা, ডাক্তার পুত্রের বেশভূষাটা ভাল হোক, ইহার ফলে উপার্জ্জন বাড়িবে। একদিন নিজেই তাঁহার জন্য দামী জামা-কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া আনিলেন। পুত্রকে কিন্তু এগুলি পরানো গেল না। তিনি বরং বলিয়া দিলেন, "পোষাক পরিচ্ছদের জন্য অপব্যয় না করে এ টাকা গরীব দুঃখীর সেবায় লাগালে সত্যিকার ভালো কাজ হোত।"

আসলে জনসেবা হিসাবে যে ডাক্তারী ব্যবসায় শুরু করিয়াছে, আর্থিক উন্নতি তাহার কাছে আশা করা বৃথা। রোগী দেখিবার সময় নাগমশাই লক্ষ্য করেন, রোগীর গায়ে আবশ্যকীয় গরম জামাকাপড় কিছু নাই, শীতে সে কাঁপিতেছে। অমনি নিজের ভাগলপুরী খেসটি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন।

তিনি যে জানেন, শুধু ঔষধে রোগ সারে না, উপযুক্ত পথ্যাদি দরকার। তাই গরীব রোগীর পথ্যের ব্যবস্থাও সেবাব্রতী ডাক্তারকে মাঝে মাঝে করিতে হয়।

সে-বার এক সঙ্কটাপন্ন রোগীকে দেখানোর জন্য দুর্গাচরণকে কল্ দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, রোগীকে ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। অমনি মনে পড়িয়া যায়, তাঁহার নিজের গৃহে তক্তাপোষ রহিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া রোগীর বাড়ীতে ঐ তক্তাপোষ স্থানান্তরিত করেন, তারপর শুরু হয় তাঁহার চিকিৎসা। ডাক্তারকে ইতিমধ্যে সবাই চিনিয়া নিয়াছে। চতুর লোকেরা চিনিয়াছে আরো বেশী, অনেক সময়ই তাহারা চিকিৎসা করানোর পর পারিশ্রমিক দেয় না। দুর্গাচরণেরও অভ্যাস নয় ভিজিটের জন্য পীড়াপীড়ি করা। ফলে আর্থিক দিক দিয়া তাঁহাকে হইতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। চিকিৎসক হিসাবে যেখানে তাঁহার আয়

হওয়া উচিত তিন চারিশত টাকা সেখানে ঘরে আসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা।

একদল চতুর লোক ডাক্তার দুর্গাচরণ নাগের সহৃদয়তা এবং পরোপকার বৃত্তির খোঁজ রাখে। রোগীর কল হইতে ফিরিবার সময় ইহারা তাঁহার বাড়ীতে অপেক্ষা করে। দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিয়া, নানা কাঁদুনি গাহিয়া নাগমশাইর নিকট হইতে ইহারা টাকাকড়ি ধার নেয়। বলা বাহুল্য, এ টাকা তাহাদের পরিশোধ আর কখনো করিতে দেখা যায় না।

পুত্রের চিকিৎসা ব্যবসায়ের এ ধরণ দেখিয়া দীনদয়াল বড় হতাশ হন। বুঝিয়া নেন, সাংসারিক উন্নতি তাঁহার কোনদিনই হইবে না, আর পিতার বৈষয়িক কাজেও সে কখনো আসিবে না।

চিকিৎসক হিসাবে নাগমশাইর আজকাল নামডাক হইয়াছে। তাই পালবাবুরা তাঁহাকেই নিজেদের গৃহ চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। সে-বার তাঁহাদের গৃহের একটি সঙ্কটাপন্ন কলেরা রোগীর চিকিৎসায় নাগমশাইর ডাক পড়ে। ধীরতা, সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত তিনি এ রোগীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। পাল-বাবুরা ভীত হইয়া প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ভাদুড়ীকেও কল্ দেন। রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন নির্ভুল বলিয়া ডাঃ ভাদুড়ী মত প্রকাশ করেন, আর দুর্গাচরণের উপরই এ চিকিৎসার ভার দিয়া তিনি চলিয়া যান।

এই রোগী সারিয়া উঠিল পালবাবুরা দুর্গাচরণের এই চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বড সন্তুষ্ট হইলেন। এবার ডাক্তারকে ভিজিট ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করা দরকার। একটি রূপার কৌটায় প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভিজিট বাবদ রাখিয়া নাগমশাইয়ের সম্মুখে ধরা হইল। কিন্তু এ অর্থ তিনি কোনমতেই নিতে রাজী নন। সরলভাবে কহিলেন, "ওষুধের দাম ও আমার ভিজিট বিশ টাকার বেশী কখনো হতে পারে না, আপনারা এত টাকা আমায় কেন দিচ্ছেন ?"

অগত্যা ঐ বিশ টাকাই তাঁহাকে দেওয়া হইল। বাকীটা কর্ম্মচারী দীনদয়ালের নামে পূজার সাহায্যবাবদ তাঁহারা খরচ লিখিয়া রাখিলেন।

ঘটনাটি শুনিয়া দীনদয়াল তো ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা ! পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুই নির্ব্বোধ, তাই নিজের প্রাপ্য টাকাটাও বুঝে নিতে পারিসনে। ও টাকা কেন এমন ক'রে ফেরত দিলি ?"

নাগমশাই দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনি চিরকাল আমায় শিখিয়েছেন ধর্ম্মপথে থাকতে। এখন আবার উল্টো বলছেন কেন ? আমার ন্যায্য পাওনা থেকে বেশী নিয়ে কি অধর্ম্ম ক'রবো ? যাক, আপনি যেন বাকী টাকাটা স্পর্শ করবেন না।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু এভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় তোর আর কতদিন চলবে শুনি ?"

"না চলে, নাই চলবে। তাই বলে মিথ্যাচার আমি করতে পারবো না। ভগবান্ হচ্ছেন সত্যস্বরূপ। এ মিথ্যাচারে তাঁকে হারাতে হবে। প্রাণ থাকতে তা পারবো না।"

বৈরাগী পুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দীনদয়াল হতবাক্ হইয়া যান।

ইহার পর শ্বশুর ও পতির সেবা-যত্নের জন্য দুর্গাচরণের পত্নী কলিকাতায় আসেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবার মধ্য দিয়া শ্বশুরকে তিনি সুখী করিলেন, কিন্তু স্বামীর মন কোনমতেই আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। চিকিৎসা, পরোপকার ও নিজের ধ্যানজপের শেষে যেটুকু সময় দুর্গাচরণ পান, সেটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভগবৎ প্রসঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন। আর নববধূর সহিত তাঁহার ব্যবধানটি থাকে আগেরই মত। দাম্পত্য জীবনে কোন চাঞ্চল্য কোন তরঙ্গভিঘাতই দৃষ্টিগোচর হয় না।

নাগমশাইর জীবনে এবার দুর্ব্বার বেগে আসিতে থাকে ত্যাগ বৈরাগ্য আর মুমুক্ষার আকাঙ্ক্ষা। কেবলই ভাবিতে থাকেন, 'পরোপকার ও সেবাব্রত তো কতই করিলেন। কিন্তু কই, জীবনে পরম শান্তি তো মিলিল না ? ঈশ্বর দর্শন তো আজ অবধি হইল না ? এই ক্ষণস্থায়ী সংসার জীবনে ও দাম্পত্য সুখে তাহার কি প্রয়োজন ? মুক্তির পথ কোথায় ? কোথায়ই বা মুক্তিদাতা দীক্ষা-গুরু ?'

দীক্ষা গ্রহণের জন্য নাগমশাইর হৃদয়ে আসিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা

ও আর্ত্তি। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে রোজ তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া থাকেন। ঘাটে ঘাটে সদাই দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসী ও মহাত্মাদের আনাগোনা। নাগমশাইর মনে আশা জাগে—হয়তো কোন এক শুভলগ্নে ইঁহাদের কাহারো কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িবে, প্রার্থিত দীক্ষা পাইয়া তিনি ধন্য হইবেন।

কুমারটুলি ঘাটে সেদিন তিনি বিষাদখিন্ন হৃদয়ে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, একটি নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহাদের কুলগুরু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি নিয়া নাগমশাই তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর হইল, "বাবা, তোমার কাছেই যে ছুটে এলাম। মহামায়ার প্রত্যাদেশ পেয়েছি, তোমায় দীক্ষা দিতে হবে। তাইতো কোন সংবাদ না দিয়েই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম।"

নাগমশাইর দুই চোখ তখন পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার আকুতি জগজ্জননীর কানে পৌঁছিয়াছে। তাই তিনি কৌল সাধক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সানন্দে তিনি এই কুলগুরুর কাছে সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মন্ত্র প্রাপ্তির পর একান্ত নিষ্ঠায় তিনি শুরু করেন সাধন ভজন। এক একদিন জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। একবার গঙ্গাতীরে ধ্যানতন্ময় অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জোয়ারের জল তাঁহাকে ভাসাইয়া নিয়া যায়, সম্বিৎ পাইবার পর অতি কষ্টে সাঁতরাইয়া তিনি তীরে উপনীত হন।

স্ত্রীকে নাগমশাই প্রায়ই বুঝান, "ওগো, একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখবে, কায়িক সম্বন্ধ বা মায়ার সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। ভগবান্‌কে ভালোবাসার ভেতরেই রয়েছে নরজন্মের সার্থকতা, এতেই পাওয়া যায় প্রকৃত মুক্তি। আমার এ হাড়মাসের খাঁচাটার আকর্ষণে নিজেকে জড়িও না। মা জগজ্জননীকে ডাকো, তাঁর শরণাপন্ন হও, ইহকাল পরকাল দুইয়েরই কল্যাণ হবে।"

পিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই নাগমশাই তাঁহাকে অবসর নেওয়াইয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সেবার জন্য পত্নীকেও সঙ্গে যাইতে হইল। দীনদয়ালের কুতের কাজ দেখাশুনার ভার নাগমশাই নিজেই গ্রহণ করিলেন।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখন কলিকাতায় ছড়াইতেছে; নাগমশাই একদিন বন্ধু সুরেশের সহিত ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন।

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। চারিদিকে সেদিন যেন অগ্নিবর্ষণ শুরু হইয়াছে। বেলা দুইটায় উভয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে এক শ্মশ্রুধারী সাধক তখন দণ্ডায়মান। নাগমশাই সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন, এখানে একটি সাধু থাকেন শুনেছি। তিনি কোথায়?"

উত্তর হইল, "তিনি তো এখানে নেই। আজ চন্দননগরে চলে গিয়েছেন। তোমরা বরং আর একদিন এসো।"

পথশ্রমে অবসন্নপ্রায় দুই বন্ধুর মুখে তখন কথা সরিতেছে না। হতাশ হইয়া উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দ্বারের আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া কে একজন গোপনে তাঁহাদের ডাকিতেছেন। নাগমশাইর দৃঢ় ধারণা হইল, ইনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যগ্রভাবে তিনি ও সুরেশ কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

পরে উভয়ে জানিলেন, যে শ্মশ্রুধারী সাধকটি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার নাম প্রতাপ হাজরা। দীর্ঘদিন ঠাকুরের কক্ষের পাশে বাস করিয়াও তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নয়, সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের তরুণ দর্শনার্থীদের তিনি বিভ্রান্ত করিতেন, তাহাদের মনে ধোঁকা লাগাইয়া দিতেন।

সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু সেদিন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত নাগমশাইকে চিনিতে একটুও ভুল করে নাই। তাঁহার গোপন হাতছানিটি এক অযাচিত কৃপার মতই নাগমশাইর জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ঠাকুরের দর্শন পাইয়া নাগমশাইর আনন্দের অবধি রহিল না। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কক্ষের একপাশে গিয়া বসিলেন।

ঠাকুর সস্নেহে নাগমশাই ও সুরেশের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "সংসারে থাকবে ঠিক যেন পাঁকাল মাছের মত।"

বিদায়ের সময় স্নেহভরে নাগমশাইকে কহিলেন, "আর একদিন এসো।"

যাইতে যাইতে নাগমশাই ভাবিতে থাকেন, কই, ঠাকুর তো কৃপা করিয়া একবারও চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না। অথচ এই চরণের জন্য যে তাঁহার লোভের অন্ত নাই।

পরের দিন নাগমশাই আসা মাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো তুমি না ডাক্তার? একবার দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে।"

নাগমশাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া উত্তর দিলেন, "কই, পায়ে তো কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।"

"ওগো, আরো একটু ভাল ক'রে দেখনা কি হয়েছে।"

মুহূর্তমধ্যে নাগমশাইর অন্তরে চিন্তার রশ্মি খেলিয়া গেল। এতো অন্তর্যামী ঠাকুরের ছল ছাড়া আর কিছু নয়। ভক্তের মনের ক্ষোভটি এক মুহূর্তে তিনি জানিয়া নিয়াছেন। তাই কৃপা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। চরণ স্পর্শের অধিকার এভাবে দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন।

ঠাকুরের করুণার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নাগমশাই বলিতেন, "তাঁর কাছে কোন কিছু চাইবার দরকার হোত না। মনের ভাব বুঝে তৎক্ষণাৎ তিনি তা পূরণ করতেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন কল্পতরু। যে যা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে, তাই সে তখনি লাভ করেছে।"

কিছুদিন পরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন নিজের দেহটির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া নাগমশাইকে কহিলেন, "হ্যাঁগা, তোমার একে কি বোধ হয়?"

পরম ভক্ত যুক্তকরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি—আপনিই সেই।"

কথা কয়টি শোনামাত্র দিব্য ভাবে ঠাকুর উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, ভাবাবিষ্ট হইয়া নাগমশাইর বক্ষে তিনি চরণ স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অনুভূতি। নাগমশাই দেখেন, সমস্ত বিশ্বচরাচর হইয়া উঠিয়াছে চিন্ময়, স্বর্গীয় জ্যোতি সেখানে ওতপ্রোত।[১]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে নাগমশাই একদিন বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ (উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্দ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তিনি অদ্বৈতভাবে ভাবিত ও উদ্দীপিত। অস্ফুট স্বরে কেবলি বলিতেছেন, "চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমশাইর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে কহিলেন, "এই ছাখো, এরই রয়েছে ঠিক ঠিক দীনতা, এতটুকুও ভান এতে নেই।"

ঠাকুরের কথা মানিয়া নিয়া নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "তা আপনি যখন বলছেন, তা হবে।"

নাগমশাই ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে আলাপ শুরু হইল। নাগমশাই শুদ্ধাভক্তি পথের পথিক, কহিলেন, "সকলি তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে, আমরা নিমিত্ত মাত্র ছাড়া আর কি বলুন।"

নরেন্দ্রনাথ তাহা মানিবেন না। উত্তরে কহিলেন, "মশাই, তিনি, তাঁর এসব বুঝিনে। সবই আমি—আমিই পরমাত্মা—আনন্দময় জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিমান্। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই ভেতরে ডুব্‌ছে ভাস্‌ছে।"

"মশাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো দূরের কথা, আপনার কি সাধ্য যে একটা চুলও সোজা করেন? তাঁর ইচ্ছে না হলে গাছের পাতাটাও নড়ে চড়ে না।"

---

১ সাধু নাগমশাই: শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নরেন্দ্রনাথ সেই অদ্বৈত ভাবেরই অনুসরণে বলিয়া চলিয়াছেন, "আমি ইচ্ছে করলে চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হয়—আমারই ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে।"

তক্তাপোষটির উপরে বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন। এবার সস্নেহ হাসি হাসিয়া নাগমশাইকে বলিলেন, "কি জানো, নরেন হচ্ছে খাপ্‌খোলা তরোয়াল—ওর ওকথা শোভা পায় বটে। তা নরেন এমন বলতে পারে।"

নাগমশাইর কাছে ঠাকুরের কথা চরম কথা। ইহার পর আর আলোচনা, তর্ক বা বিচার আর চলে না। নরেন্দ্রনাথের চরণে শির ঠেকাইয়া তিনি নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান লীলা-পার্ষদ, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার বা তর্ক করার অবকাশ নাই।

একবার জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, সত্যকার কোন মুক্তপুরুষ নাগমশাই দেখিয়াছেন কিনা? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দেন, "হ্যাঁ! সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছি, আর দর্শন করেছি তাঁর সর্ব্বপ্রধান পার্ষদ—শিবাবতার স্বামীজীকে!"

নাগমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসিবার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছে। সেদিন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন—ঈশ্বরীয় কথায় তিনি রত। এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন, "ত্থাখো, ডাক্তার উকীল মোক্তার দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্ম্মলাভ হওয়া বড় কঠিন।"

প্রসঙ্গক্রমে আরো কহিলেন, "এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, তা'হলে কি ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?"

কথাকয়টি নাগমশাইর প্রাণে বড় বাজিল। সত্যই তো! তিনি নিজের অভিজ্ঞতায়ও আজকাল দেখিতেছেন, ধ্যান-ধারণার সময় রোগীদের মূর্ত্তি আসিয়া মনের কোণে ভীড় জমায়, সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন, যে বৃত্তি বা ব্যবহারিক কর্ম্ম ঈশ্বর

লাভের বিঘ্নস্বরূপ তাহা দিয়া তাঁহার কাজ নাই। আজ হইতেই এসব ত্যাগ করিবেন।

গৃহে ফিরিবার পর সেইদিনই ডাক্তারির বই, যন্ত্রপাতি ও ঔষধ ইত্যাদি সব কিছু গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন।

কাজকর্ম্মের দিক হইতে মুক্ত হইয়া এবার আরো দৃঢ় এক নিষ্ঠা নিয়া তিনি সাধন ভজন করিয়া যাইতে থাকেন। বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বড় তীব্র হইযা উঠে। মনে মনে স্থির করেন, এ সংসারে আর থাকা নয়, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন।

ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি সংসার ত্যাগের অনুমতি নিতেই গিয়াছেন। কক্ষমধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "তা সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন থাকলেই হয়। গৃহস্থাশ্রম কেমন জানো? এ যেন কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করা।"

এবার নাগমশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওগো, তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাক্‌বে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম্ম শিখবে।"

ঠাকুরের এ আদেশ মুহূর্ত্তমধ্যে নাগমশাইর মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইল।

বৈরাগ্যের আগুন সেদিন তাঁহার সর্ব্ব সত্তায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অন্তর্জ্বালায় তিনি সদা অস্থির, কিন্তু উপায় তো কিছু নাই। ঠাকুরের এ আদেশ যে অলঙ্ঘনীয়!

ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা এখন হইতে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়, নাগমশাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। সংসার জীবনের কোন কাজকর্ম্ম আর তাঁহার দ্বারা হইবার নয়।

এই সময়ে নাগমশাইকে কিছুদিনের জন্য একবার স্বগ্রাম দেওভোগে আসিতে হয়। পত্নী স্বামীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন, ঈশ্বরের জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, সংসারের কোন বন্ধনই আর তাঁহাকে বাঁধিতে সক্ষম নয়। নাগমশাই নিজেও স্পষ্টভাবে

বলিয়া দিলেন, রামকৃষ্ণ-চরণে যে মন-প্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছেন, সংসারের কোন কাজেই আর তাহা আসিবে না।

সেদিন তিনি চুপচাপ বারান্দায় বসিয়া আছেন। গৃহের পাশের জমিটাতে জন্মিয়াছে একটি সতেজ লাউগাছ। প্রতিবেশীদের একটি গরু এই গাছটার দিকে বার বার ঝুঁকিতেছে, কিন্তু দড়িটা খাটো করিয়া বাঁধা, তাই উহার নাগাল পাইতেছে না। এই দৃশ্যটি দেখিয়া নাগমশাইর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি গরুর খুঁটাটি উপড়াইয়া দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "খাও মা, খাও, এগিয়ে গিয়ে খাও।"

বৃদ্ধ পিতা দীনদয়াল নিকটেই ছিলেন। পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "নিজে তো কিছু উপার্জ্জন করিসনে, তার ওপর আবার রয়েছে এসব অনিষ্ট করার ঝোঁক্। ডাক্তারিটা তো ছেড়ে দিয়ে বস্‌লি, এবার খাবি কি ক'রে, বল্‌তো ?

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, "ভগবান্ যা হোক একভাবে চালিয়ে নেবেনই। আপনি এসব এ বয়সে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে যেন মাথা ঘামাবেন না।'

"ওরে, চলবে যে কিভাবে, তাতো বুঝতেই পারছি। এবার স্তাংটো থাক্‌বি আর ব্যাঙ্ ধরে খাবি।"

অতঃপর দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। নাগমশাই পিতার কথার কোন জবাব দিলেন না, মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের পরিহিত বস্ত্রটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইলেন। গৃহের অঙ্গনের এক কোণে একটি ব্যাঙ পড়িয়া ছিল। এটিকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পিতাকে কহিলেন, "আপনার যাতে সত্য রক্ষা হয়, এজন্য দুটো আজ্ঞাই আমি পালন করলাম। এবার মিনতি করে বলছি, আপনি সংসারের চিন্তা আর করবেন না। বয়স হয়েছে, এবার থেকে বসে বসে কেবল ভগবানের নাম করুন।"

পুত্রের এই অদ্ভুত আচরণে দীনদয়াল বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া তিনি বুঝিয়া নেন, 'ভগবান্ ভগবান্' করিয়া পুত্র এবার একেবারে পাগল হইয়াই গিয়াছে। শঙ্কিত কণ্ঠে

পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহেন, "ভাখো, তোমরা ওর সঙ্গে এখন থেকে বুঝে-সুঝে চ'লো। ওর বিরুদ্ধাচরণ কখনো ক'রো না।"

কলিকাতায় ফিরিবার পর নাগমশাই সেদিন ব্যস্তসমস্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপান্তে বসিয়া সখেদে কহিলেন, "তাঁর ওপর নির্ভর হ'লো কই? এখনো তো নিজের চেষ্টা রয়েই গিয়েছে?"

ঠাকুর নিজের দেহটি দেখাইয়া কহিলেন, "ভয় নেই, এখানকার টান থাকলে সব ঠিক্ ঠিক্ হয়ে যাবে।"

আরেক দিন ঠাকুর তাঁহার এই বৈরাগ্যবান্ ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ভাখো, তুমি গৃহেই থেকো। যেনতেন ক'রে মোটা ভাত কাপড়ে চলে যাবে।"

ঘরসংসারের উপর, বিষয় আশয়ের উপর, নাগমশাইর রহিয়াছে সহজাত বিতৃষ্ণা। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু, গৃহে থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়ই বা কি ক'রে?"

"ওগো, আমি বল্‌ছি, সত্য সত্যই বল্‌ছি, ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে আবাক্ হবে।"

"কি ক'রে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে।"

"তোমায় কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হতে হবে না। কেবল সাধুসঙ্গ করবে।"

"ঠাকুর, আমি যে হাঁদা লোক, সত্যিকারের সাধু চিনবো কি ক'রে?"

"তোমায় সাধু খুঁজতে হবে না। যথার্থ সাধুরা নিজে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এজন্য ভেবো না।"

পিতা দীনদয়ালের রোজগার ছিল মহাজন পালচৌধুরীদের কুঠের কাজে। তিনি অবসর নিয়া গ্রামে যাইবার পর নাগমশাই কিছুদিন একাজ দেখাশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, একাজ চালানোর মত মনোবৃত্তি

মোটেই নাই। ভাগ্যক্রমে রণজিৎ নামে একটি তরুণ কর্ম্মী পাওয়া যায়। নাগমশাইর কাজ সুষ্ঠুভাবে সে-ই চালাইয়া নিতে থাকে।

এবার মনে মনে ঠিক করিলেন, ঐ কাজ রণজিৎকেই ছাড়িয়া দিবেন। যদি সে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু দেয় ভাল, নতুবা ইহা নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন না।

মনিব পালচৌধুরীর মধ্যস্থতায় স্থির হইল, কুতের কাজ হইতে যে আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেকটা নাগমশাই পাইবেন। ইহার ফলে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের কোন অসুবিধা হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এ নূতন বন্দোবস্তের কথা উঠিল। নাগমশাইর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।"

আহার বিহারের দিক দিয়া নাগমশাই ছিলেন, কৃচ্ছ্রব্রতী। সারা দিনের শেষে দুই গ্রাস আহার্য্য মুখে পুরিয়া তিনি উঠিয়া পড়িতেন। কেহ এ সম্পর্কে অনুযোগ দিলে কহিতেন, "যতদিন দেহ আছে কিছু টেক্স দিতেই হবে, তাই দিচ্ছি। বেশী খেলে বা ভালো কিছু খেলে জিহ্বার যে সুখেচ্ছা হবে।"

এই সদা সতর্ক সাধক নিজের ত্রুটি বিচ্যুতিকে কোনদিন এতটুকুও ক্ষমা করেন নাই। কোনক্রমে কাহারো উপরে হয়তো নাগমশাই রুষ্ট হইয়াছেন, মুখ দিয়া হঠাৎ অশ্রদ্ধাসূচক কথা বাহির হইয়াছে। আর রক্ষা নাই। নিজ দেহকে তিনি নিষ্ঠুর ভাবে শাসন না করিয়া ছাড়িবেন না। সে-বার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দাত্মক ভাষা অতর্কিতে তিনি ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ইহার শাস্তি স্বরূপ তখনি একখণ্ড পাথর তুলিয়া নিয়া নিজ মস্তকে প্রহার করিতে থাকেন। ফলে মস্তক ফাটিয়া গিয়া এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে নাগমশাই নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দিলেন, "বেশ হয়েছে, যে যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি তো তার দরকার।"

নাগমশাইর আর এক অভ্যাস, দেহ-মনকে বশ রাখার জন্য মাঝে

মাঝে তিনি নিরম্বু উপবাস করিতেন। সে-বার কয়েকদিন উপবাসের পর তিনি সবেমাত্র রান্নার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধু সুরেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কোন কারণে এই বন্ধুটির প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। তখনি অস্ফুটস্বরে নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হায়, এখনো আমার মনের ময়লা কাটলো না, অন্যায় মনোবৃত্তি দূর হ'লো না।" প্রায়শ্চিত্ত সাধনে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় নাই। ভাতের হাঁড়িটি অবলীলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেদিনও তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল।

গিরিশ ঘোষকে তাই নাগমশাই সম্পর্কে বলিতে শুনা যাইত, "অহং শালাকে *ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে* নাগমশাই তার মাথা ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছেন, তার আর মাথা তোল্‌বার যো আছে কোথায় ?"

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মরদেহের লীলা এবার আসিয়াছে শেষ পর্য্যায়ে। কাশীপুরে গোপালবাবুর বাগানবাড়ীতে দুশ্চিকিৎস্য ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যা-শায়ী হইয়া আছেন। ভক্তপ্রবর নাগমশাই বুঝিয়াছেন, ঠাকুরের লীলাসম্বরণের দিনটি আসন্ন। কিন্তু তাঁহার মন যে এ দুর্দ্দৈবকে স্বীকার করিয়া নিতে চায় না। একান্ত নিষ্ঠায় নিজের সব কিছু তিনি ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। সেই প্রাণপ্রভু ঠাকুর এবার যদি অপ্রকট হন, তবে ভক্ত নাগমশাইর জীবন ধারণে কি লাভ ? তাছাড়া, এই রোগযন্ত্রণা ভোগের দৃশ্যও যে তাঁহার পক্ষে দুঃসহ !

নাগমশাই বলিয়াছেন, "ঠাকুরের রোগের যাতনা দেখা দূরের কথা, স্মরণ করতেও হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যেত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ শরীরে এ রোগ রেখে দিলেন, আমরাও কোনমতে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব করতে পারলাম না। তাই তাঁর কাছে না গিয়ে নীরবে ঘরের ভেতরই বসে রইলাম। শুধু মাঝে মাঝে তাঁকে গিয়ে দর্শন ক'রে আস্‌তাম।"

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ সেদিন নাগমশাই ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে

উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরের ক্যান্সারের ঘায়ে তখন তীব্র বেদনা। ভক্ত নাগমশাইকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁগো, তুমি এসেছো? এসো, আরো এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে বসো। তোমার শান্ত শীতল দেহ স্পর্শ করলে আমার জ্বালা যন্ত্রণা কম্‌বে।"

কথা কয়টি বলিয়াই ঠাকুর এই পরম ভক্তকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, ভাবাবেশে বহুক্ষণ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন।

আর একদিনের কথা। রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর নাগমশাইকে সংবাদ দিয়া নিকটে ডাকাইয়া আনিয়াছেন। নাগমশাই কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তুমি এসেছো? এই ছাখোনা, ডাক্তার কবিরাজেরা তো সব হার মেনে গিয়েছে। তুমি কি কিছু ঝাড় ফুঁক জানো? জানো তো ছাখো দিকি যদি কিছু উপকার করতে পারো।"

মুহূর্তমধ্যে মহাভক্ত নাগমশাইর চোখ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরের এ তীব্র যন্ত্রণা, এ দুঃসাধ্য ক্যান্সার দূরীভূত করা তো তাঁহার পক্ষে অসাধ্য নয়। ঠাকুরেরই জীবন-জ্যোতির আলো যে প্রতিফলিত তাঁহার সাধনসত্তায়, তাঁহারই শক্তিতে তিনি শক্তিমান্!

ভাবাবিষ্ট নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, জানি, আপনার কৃপায় সব আমি জানি। এখনি আমি এ রোগ সারিয়ে দিচ্ছি।"

উপস্থিত ভক্ত শিষ্যেরা সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন। নাগমশাই শয্যার পাশে আগাইয়া আসিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, যে সঙ্কল্প ভক্ত হৃদয়কে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে তাহা অমোঘ! তাই তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া একাজ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওগো, জানি, তা তুমি পারো, এ রোগ তুমি সারাতে পারো।"

লীলা সম্বরণের কয়েক দিন আগের কথা। অন্যান্য ভক্তের সহিত নাগমশাইও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর নিম্নস্বরে কহিতেছেন, "এ সময় কি আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে; আমলকী চিবুতে পারলে ভালো হতো।"

এসময়ে আমলকী জন্মে না। ভক্তরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। একজন বলিয়া বসিলেন, 'এ সময়ে এ ফল আর কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে?"

ভক্ত নাগমশাইর মনে চিন্তা খেলিয়া গেল—ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া আমলকীর কথা যখন বাহির হইয়াছে, এ বস্তু অবশ্য কোথাও না কোথাও মিলিবে।

নিঃশব্দে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল গ্রামে গ্রামে বনে বাদাড়ে আমলকীর জন্য অবিরাম অন্বেষণ। আহার নিদ্রা ভুলিয়া এই কাজেই তিনি দিনরাত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

তিন দিনের দিন পরিশ্রম তাঁহার সফল হইল, আমলকী সংগ্রহ করিয়া তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর বালকের মত আনন্দমুখর হইয়া উঠিলেন, "আহা, এ অসময়ে এমন চমৎকার আমলকী! তুমি কোথা থেকে যোগাড় করলে গো!"

এই তিনটি দিন নাগমশাইর খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নাই। তাড়াতাড়ি নীচতলায় নিয়া গিয়া তাঁহাকে ভোজনে বসানো হইল। সেদিন ছিল একাদশীর উপবাস, নাগমশাই তাই আহার্য্য স্পর্শ করিতে রাজী নন। অবশেষে ঠাকুর ঐ অন্নব্যঞ্জন মুখে ঠেকাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলে, তবে নাগমশাই উহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিলেন। বিষাদখিন্ন নাগমশাই এবার কলিকাতার বাস উঠাইয়া চলিয়া গেলেন স্বগ্রাম দেওভোগে। অন্য কোথাও বাস করার প্রস্তাব কেহ দিলে, দৃঢ়স্বরে কহিতেন, "ঠাকুর, আমায় গৃহে থাকতে বলে গিয়েছেন। তাঁর বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার কই?"

এই গৃহাশ্রমে অবস্থান করিলেও মাঝে মাঝে তাঁহার গুরুধাম কলিকাতায়ও তিনি আসিতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সহিত পরমানন্দে কিছুদিন কাটাইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন স্বস্থানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হইবার পর নাগমশাই ভাবিলেন, দেওভোগের প্রান্তে একটা কুটীর বাঁধিয়া তিনি নিভৃতে বাস করিবেন। কিন্তু ইহার প্রয়োজন হইল না। পত্নী কোনদিনই তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অন্তরায় হন নাই। স্বামীর মনোভাব টের পাইয়া আগে হইতেই তিনি আশ্বাস দিলেন, "ছাখো, নিজের দেহ-সুখের জন্য কোন দিনই আমি তোমায় বিরক্ত করিনি, ভবিষ্যতেও কখনো করবো না। তবে এ পৃথক বাসের দরকার কি ?"

সাধ্বী জীবনসঙ্গিনীর এ কথায় তিনি আশ্বস্ত হন, গৃহে থাকিয়া গৃহস্থ-সন্ন্যাসীরূপেই দীর্ঘ দিন করেন অতিবাহিত।

নাগমশাইর স্ত্রী স্বামীর পুণ্যময় জীবন ও তাঁহার দেহ-সংযম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তাঁর শরীরে কি মনে কোন রকম মানবীয় বিকার বা পরিবর্ত্তন কখনো দেখা যায়নি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে জৈবভাবের মাথায় লাথি মেরে তিনি চলে গিয়েছেন। আগুনের ভেতর তিনি বাস করেছেন বটে, কিন্তু এক দিনের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয়নি।"

পিতা দীনদয়াল পুত্রের এই তীব্র বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিতৃষ্ণা কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। একবার খুব তিরস্কার করার পর নাগমশাই উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন, "আমার আবার খাওয়া পরার জন্য চিন্তা কি ? গাছে পাতা রয়েছে প্রচুর, তাই খেয়ে দিন কাটাবো। আর আমি জীবনে কোনদিন স্ত্রীসঙ্গ করিনি, মাতৃগর্ভ থেকে যেমন পড়েছিলাম, এখনো তেমনি আছি—কাপড়-চোপড় পরবার আমার দরকার নেই।"

কামিনী ও কাঞ্চন উভয় বস্তুতেই এই রামকৃষ্ণময় ভক্তের ছিল সমান বিতৃষ্ণা।

সে-বার নারায়ণগঞ্জে পালবাবুদের এক আত্মীয় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়, ক্রমে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। ইহারা নাগমশাইর চিকিৎসানৈপুণ্যের কথা জানিতেন। তাঁহাকে ডাকা হইল এবং তাঁহার ঔষধে রোগী বাঁচিয়া উঠিল। পালদের কর্ত্তাবাবুর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। স্বয়ং দেওভোগে আসিয়া নাগমশাইকে বহু

সাধুবাদ করিলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ তিনশত টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য চিকিৎসককে এ টাকা গ্রহণে সম্মত করায়? অবশেষে বেশী পীড়াপীড়ি করা হইতে থাকিলে নাগমশাই ক্রন্দন শুরু করিলেন। কহিলেন, "হায় ঠাকুর! কেন তুমি আমায় চিকিৎসকের এ হীন বৃত্তি শিখিয়েছিলে, তাতেই তো অর্থের প্রলোভন নিয়ে এরা বার বার চেপে ধরছে, আর আমার এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।

তাঁহার এ অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়া বৃদ্ধ পালমহাশয় সেদিন বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কখনো মানুষ নও!"

কলিকাতার চিকিৎসক জীবনেও নাগমশাই সে-বার এক কাণ্ড করিয়া বসেন। পালচৌধুরীদের এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ফরিদপুরের ভোজেশ্বরে যাইতে হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। গদির বাবুরা এসময়ে তাঁহাকে একটি নূতন কম্বল ও পাথেয় বাবদ আটটি টাকা দিয়া দেন।

স্টীমার তীরে ভিড়িতেছে। নাগমশাই টিকিট কিনিতে যাইবেন, এমন সময় এক ভিখারিণী কয়েকটি শিশু সন্তান সহ সম্মুখে উপস্থিত। দুঃখিনীর কান্না ও কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, হাতের সব কয়টি টাকা ও কম্বলটি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "মা, এই নিয়ে তুমি শিশু সন্তানগুলোকে বাঁচাও, নিজের প্রাণ রক্ষা করো।"

প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া ভিখারিণী চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে স্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ স্টেশনে বিশ্রাম করার পর নাগমশাই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখান হইতে হাঁটিয়াই কলিকাতায় যাইবেন। পথ দীর্ঘ—হাতে রহিয়াছে মাত্র সাত আনা পয়সা। তা হোক্, তবুও তো ভিখারিণী আর তার ছেলেমেয়ের কয়েকদিন বাঁচার ব্যবস্থা করা গেল।

এই পদযাত্রার কাহিনী বড় বিচিত্র। পথে যেদিন দেবস্থান পড়ে

ও প্রসাদ মিলে, সেদিন খাওয়া হয়। বড় নদী নালা সম্মুখে পড়িলে খেয়ানৌকা যোগে তিনি পার হন, আর সেগুলি অপরিসর হইলে সাঁতরাইয়াই পার হন। এমনি কষ্টের মধ্য দিয়া উনত্রিশ দিন পরে নাগমশাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রোগীদর্শনের পর এমন পদযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়তো খুব কম চিকিৎসকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে।

সদ্‌গুরুর আদেশে নাগমশাই সারা জীবন গৃহেই অতিবাহিত করিয়া যান, আর আপন ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধনার বলে এই গৃহপরিবেশকে তিনি করিয়া তোলেন পরম পুণ্যময়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এক মহনীয় রূপ ফুটিয়া উঠে এই শক্তিধর গৃহী মহাপুরুষের জীবনে।

নাগমশাইর সাধন নিষ্ঠার খ্যাতি এ সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে মাঝে মাঝে তাঁহার গৃহে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিয়া জুটিত। এই সব অতিথিদের সেবা পরিচর্য্যার সুযোগ পাইলে সাধু নাগমশাইর উৎসাহের সীমা থাকিত না। তাঁহার দৃষ্টিতে এই অভ্যাগতেরা ছিলেন নারায়ণ স্বরূপ।

ইঁহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কহিতেন, "জান্‌বে, এ সকলই ঠাকুরের লীলা। ঠাকুর লীলা-শরীরে এক ছিলেন, এবার তিনিই আবার নানা মূর্ত্তিতে আমায় কৃপা করতে আসছেন অতিথি রূপে।"

নাগমশাই এক পুরাতন শূলব্যথাতে ভুগিতেন। সেদিন বড় তীব্র ব্যথা শুরু হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়াও পড়িতেছেন। এসময়ে হঠাৎ সাত-আটজন ভক্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অথচ ঘরে একমুষ্টি চা'ল নাই, এতগুলি লোকের খাবার কি করিয়া যোগাড় হইবে? অগত্যা এই অসুস্থ শরীর নিয়াই নাগমশাইকে বাজারে যাইতে হইল। তিনি নিজে না গেলে দোকান হইতে চাল-ডাল ধারে পাইবার কোন উপায় নাই।

জিনিষপত্র ক্রয়ের পর নাগমশাই বোঝাটি মাথায় তুলিয়া নিলেন। অপরকে দিয়া কখনো তিনি নিজের মোট বহনের কাজ

করেন না, ইহা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু গৃহে অতিথি নারায়ণ উপস্থিত। সেবায় বড় বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। তাই অসুস্থ শরীরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি মোট বহন করিয়া চলিলেন।

শূল বেদনায় শরীর বড় দুর্ব্বল। বার বার মাথার বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অভ্যাগতদের কাছে যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, "হায়, হায়! আপনাদের চরণে অপরাধী হলাম। সেবার কাজে দেরী হয়ে গেল।"

শুধু নাগমশাইর নয়, এ ধরণের সেবানিষ্ঠা তাঁহার স্ত্রীর মধ্যেও দেখা যাইত। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ হয়তো অতিথিদের আগমন হইয়াছে! অমনি এই সেবাব্রতী মহিলা একটি ডালা হাতে করিয়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আতপ চা'ল ধার করিতে ছুটিলেন। কেহ ইহাতে আপত্তি উঠাইলে নাগমশাই প্রবোধ দিতেন, "ছ্যাখো, এ সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া। এর ভেতর দিয়ে আমাদের দুজনেরই পরীক্ষা হচ্ছে।"

তখন ঘোর বর্ষাকাল। সারা দিন রাত ব্যাপিয়া অঝোরে বৃষ্টি ঝরিতেছে। রাত্রিতে নাগমশাইর গৃহে দুইটি অতিথি দর্শন দিলেন। খাওয়া-দাওয়া তো একপ্রকার মিটিয়া গেল, এবার গোল বাধিল শয়নের ব্যবস্থা নিয়া। চারখানি ঘরের তিনখানিই অব্যবহার্য্য, চাল দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। শুধু একটি মাত্র ঘর বাসোপযোগী, বর্ত্তমানে সেইটিই নাগমশাইর শয়নগৃহ।

ভক্তপ্রবর পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ছ্যাখো, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য! এই দুর্য্যোগের রাতেও অতিথি সেবার সুযোগ আমরা পেয়ে গিয়েছি। অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না? এসো, আজ আমরা ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

পতি পত্নী এই ভাবেই সারা রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ভৃত্য বা ঘরামী নিযুক্ত করা নাগমশাই কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। কেহ তাঁহার দৈনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট করিবে, ইহা ছিল তাঁহার কাছে অসহ্য। সেবার একটি ঘরের চাল একেবারে

নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সংস্কার না করিলে আর চলে না। নাগমশাই সেদিন কোথাও বাহিরে গিয়াছেন, পত্নী এ সুযোগে এক ঘরামীকে ডাকিয়া আনিলেন। চালের সংস্কার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় নাগমশাই গৃহে ফিরিলেন। ঘরামীকে চালের উপরে কর্ম্মরত দেখিয়াই তো তাঁহার চক্ষুস্থির! সকাতরে কহিতে থাকেন, চাল থেকে নেমে এসো বাবা। দয়া ক'রে নেমে এসো।

পারিশ্রমিকের আশায় ঘরামী কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা সে ত্যাগ করিবে কেন?

অবশেষে নাগমশাইর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায় ঠাকুর, কেন তুমি আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বলে গিয়েছো? আমার দুঃখের জন্য একজন মানুষ খাটবে, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? ধিক্ আমার এই সংসারে!"

ভাবাচ্যাকা খাইয়া ঘরামীকে এবার নামিতে হইল। নাগমশাই ব্যস্তভাবে তাহার সেবা পরিচর্য্যায় রত হইলেন। সযতনে তাহাকে তামাকু সেবন করানো হইল, নিজহাতে পাখার হাওয়া দিয়া তাহার শ্রম অপনোদন করিলেন। অতঃপর মজুরির টাকাটি নিয়া তবে সে বেচারা সেদিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে!

সেবাব্রতী, নিরীহ পরম শান্ত ভক্ত বলিয়া সবাই নাগমশাইকে জানে। আবার এই নাগমশাইরই ব্যক্তিসত্তায় এক একদিন ফুটিয়া উঠিত অকুতোভয় তেজোদৃপ্ত যোদ্ধার রূপ। আদর্শ ও ইষ্ট সম্পর্কে যেখানে ঘটে মতের সংঘাত, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁহার অনমনীয় দৃঢ়তা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত একমুহূর্ত্তে তিনি জ্বলিয়া উঠেন।

সেদিন কি এক কাজে নাগমশাই তাঁহার শ্বশুর গৃহে গিয়াছেন। তখন সেখানে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। ভদ্রলোকটি কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুরু করিয়া দিলেন। গুরুনিন্দা শুনিবামাত্র নাগমশাইর ক্রোধের সীমা রহিল না। উত্তেজিত কণ্ঠে

কহিলেন, "এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দে চলবে না মশাই, আপনি এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।"

ভদ্রলোকটি বড় দাম্ভিক। এ কথা কানে না তুলিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গালাগালি শুরু করিয়া দিলেন।

এবার নাগমশাইর আর ধৈর্য্য রহিল না। হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বেরোও শালা এখান থেকে!" সঙ্গে সঙ্গে চলিল ভদ্রলোকটির পৃষ্ঠে জুতা-প্রহার।

নিন্দুকটি এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। অনেকের সম্মুখে এভাবে অপমানিত হইয়া ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। শাসাইয়া গেলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু, আর কি ক'রেই বা তুমি এ গ্রামে থাকো!"

বাড়ী ফিরিয়া আসার পর নাগমশাই দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হায়, ঠাকুর! কেন তুমি এসব লোককে আমার সামনে নিয়ে আসো, আর বসে বসে তোমার নিন্দে আমায় শুনতে হয়। তোমার আজ্ঞায় সংসার-আশ্রমে থাকতে গিয়ে একি দুর্দ্দৈব আমায় ভুগতে হচ্ছে!"

ভক্তের এ আর্ত্তি ব্যর্থ হয় নাই। কয়েকদিন পরে সেই নিন্দুক ব্যক্তিটি নতশিরে নাগমশাইয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অনু-শোচনায় হৃদয় তাঁহার দগ্ধ হইতেছে, সজল নয়নে বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটির কথা গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কানে গিয়াছিল। নাগমশাই সে-বার কলিকাতায় আসিলে গিরিশবাবু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো জুতো কোনদিন পরেন না, তা হ'লে লোকটিকে মারবার সময় জুতো পেলেন কোথায়?"

নাগমশাই সহজ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কেন? তার জুতো দিয়েই যে সেদিন তাকে মারলাম!"

দেওভোগের আশেপাশে জলাভূমিতে বুনো হাঁস ও নানা জাতীয়

পাখী বাস করে। নারায়ণগঞ্জের পাটকলের সাহেবেরা মাঝে মাঝে এগুলি শিকার করিতে আসে।

সেবার দুটি সাহেব এজন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অহিংসাব্রতী নাগমশাইর অন্তর বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। শিকারীদের সম্মুখে তিনি ছুটিয়া গেলেন, করজোড়ে মিনতি জানাইলেন, "আপনারা নিরস্ত হোন। শুধু শুধু এ নিরীহ প্রাণীগুলোকে হত্যা করবেন না।"

রুক্ষ আকৃতি ও মলিন বেশভূষা দেখিয়া নাগমশাইকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ মনে করা কঠিন। তাছাড়া, তাঁহার কথার অর্থও বিদেশীরা বুঝিতে পারিতেছে না। অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আবার তাহারা বন্দুকে গুলি ভরিল।

এবার নাগমশাইর পক্ষে আর ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব নয়। তর্জ্জনী তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "না, এরকম অধর্ম্ম এখানে আপনারা করতে পারবেন না।"

সাহেবরা তাঁহাকে আমল দিতে চাহে না, একটা পাগলের কথায় এ আমোদ তাহারা ছাড়িয়া যাইবে কেন? শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার তাহারা বন্দুক তুলিল। নাগমশাই মুহূর্ত্ত মধ্যে সিংহবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বভাবতঃই তিনি ধীর স্থির, ক্ষীণ কলেবর। কিন্তু এ সময়ে তাঁহার দেহে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইল প্রচণ্ড শক্তি। অবলীলায় সাহেব দুইটিকে পরাস্ত করিয়া বন্দুক ছিনাইয়া নিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

শিকারী ইংরেজ দুইটির পক্ষে এ ধরণের অপমান হজম করা শক্ত। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা স্থির করিল নাগমশাইকে চিরদিনের মত শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়িবে, অবিলম্বে তাহার নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিবে।

ইতিমধ্যে ঐ পাটকলেরই এক কর্ম্মচারীর হাত দিয়া নাগমশাই বন্দুক দুইটি পাঠাইয়া দেন। নাগমশাই একজন অসামান্য সাধু— অহিংসাকে তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, এসব কথা শোনার পর সাহেবরা নরম হইয়া পড়ে, তাঁহার প্রতি কি জানি কেন তাহাদের

বড় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। বলা বাহুল্য, অতঃপর এ ব্যাপার আর বেশীদূর গড়ায় নাই।

সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে নাগমশাই তাঁহার পরম প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিতেন। প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যাইত চারিদিকে হাত জোড় করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। একবার এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "প্রায় সময় আপনি এমন হাত জোড় ক'রে থাকেন কেন, বলুন তো?"

ভক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, "কি করবো বলুন, ভূতে ভূতে যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।"

নাগমশাইর পত্নী বড় পতিপ্রাণা। এই পতিই ছিলেন তাঁহার ধ্যেয়, ইষ্ট, এবং তাঁহার ছবিটির পূজা প্রতিদিন সম্পন্ন না করিয়া এই ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা জল গ্রহণ করিতেন না। একবার মহাষ্টমী পূজার দিন তাঁহার ইচ্ছা হয়, নাগমশাইর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন।

নাগমশাই ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় পত্নী স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিয়া প্রণাম করিলেন।

নাগমশাই শান্ত স্বরে শুধু বলিয়া উঠিলেন, "যাকে আমি পূজা করি, তার সেবা পূজা নেওয়া কি ঠিক?"

অর্থাৎ, জগন্মাতার প্রকাশ রূপেই যে তিনি স্ত্রীকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাঁহার পূজা তাই কি করিয়া নিবেন?

একবার একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নাগমশাইর পত্নী গৃহকর্ম্মে রত, স্বামীর এবং গৃহের অভ্যাগতদের সেবা ও যত্নের জন্য তিনি সদা তৎপর। নবাগত ভক্তটির অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। ভাবিলেন, এ আবার কেমন সাধু? সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া যে চলিতেছে, তাঁহার আবার ভার্য্যা নিয়া বাস করা কেন?

এই চিন্তার তরঙ্গ অন্তর্য্যামী নাগমশাইর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তখনি

তিনি উত্তরে কহিলেন, "কেন, কেন? এতে দোষ কোথায়? মা অন্নপূর্ণা যে স্বয়ং এ গৃহে বাস ক'রে আমাদের অন্নের যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন।"

ভদ্রলোক তো অবাক্! নাগমশাইর পত্নী সম্বন্ধে প্রশ্নটি আলোড়িত হইয়াছে তাঁহার মনে, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলেন নাই। অথচ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ তাঁহার অন্তস্তলের চিন্তাকে টানিয়া বাহির করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার উত্তর দিয়া দিলেন। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তিনি নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রাণী মাত্রেরই উপর নাগমশাইর ঈশ্বর ভাব, আর নারী মাত্রকেই তিনি দেখেন জগজ্জননীর প্রতীকরূপে। পত্নীকে তিনি চিরকাল যে এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত।

সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন—ইহা তাঁহার জীবনে ছিল এক উপলব্ধ পরম সত্য। তাই দেখা যাইত, মশা মাছি গায়ে বসিলে তিনি সেগুলি তাড়াইতে পারিতেন না। গৃহ-অঙ্গনস্থিত কোন গাছের পাতা কেহ ছিঁড়িলে তাঁহার বুকে বাজিত সুতীব্র ব্যথা। সকাতরে বলিয়া উঠিতেন, "আহা, আহা, এমন ক'রে ছিঁড়ো না। জানো, এদেরও ব্যথা বেদনা বোধ রয়েছে আমাদেরই মত।"

সেবার এক ভক্তের চোখে পড়িল—নাগমশাইর পূজামণ্ডপের বেড়াটিতে অজস্র উইপোকা বাসা বাঁধিতেছে। শেষে কি সারা ঘর নষ্ট হইবে? তখনি তিনি একটা বাঁশ দিয়া এই বেড়াটির উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। উই-এর বাসা ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু উই পোকাও এ সময়ে নিরাশ্রয় হইয়া ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য নাগমশাইর কাছে দুঃসহ। অশ্রুসজল চোখে বিলাপ করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এ কি অনর্থ আপনি করলেন? এতকাল এরা এই বেড়ার ভেতরে ঘর-দোর তৈরী ক'রে বসবাস করছিলো, এবার সে আশ্রয়টুকুও রইলো না। বড অন্যায় করেছেন, বড় অধর্ম্ম করেছেন।"

ভক্তটি নির্ব্বাক ও অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এবার উই পোকাগুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাগমশাই করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "আপনারা আবার বাসা তৈরী করুন, আর কোন ভয় নেই।"

মানুষের ভাষা বুঝুক আর না বুঝুক ভক্তের হৃদয়-আকুতি বুঝিতে বল্মীকদের ভুল হয় নাই। ক্ষণপরেই আবার সদলবলে আসিয়া তাহারা মণ্ডপের এই বেড়াটি অধিকার করে। বলা বাহুল্য, অচিরে উই-এর আক্রমণে ঘরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

নাগমশাইর বাড়ীর পাশেই রহিয়াছে এক পুষ্করিণী। সেদিন একটি জেলে সেখান হইতে এক চুপাড় মাছ ধরিয়া নিয়া নাগমশাইর বাড়ীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। সদ্য ধরা হইয়াছে তাই অধিকাংশই তখনো জ্যান্ত।

এগুলির দিকে তাকাইতেই নাগমশাইর হৃদয় গলিয়া গেল। তখনি ঐ এক চুপড়ি মাছ তিনি কিনিয়া ফেলিলেন। তারপর যে পুকুর হইতে এগুলি ধরা হইয়াছিল তাহারই গর্ভে দিলেন বিসর্জ্জন।

ধীবর তো নাগমশাইর কাণ্ড দেখিয়া অবাক! মৎস্য বিক্রয়ের জন্য অতঃপর এবাড়ীতে আর কোনদিন সে আসে নাই।

সে-বার কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ শুরু হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা কেবলি চলিয়াছে বৃদ্ধির দিকে। আতঙ্কে বহু লোক শহর ছাড়িয়া এ সময়ে পলাইতে থাকে। পালবাবুরাও কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার ভার রাখিয়া গেলেন নাগমশাইর উপর।

কয়েক দিনের মধ্যেই গদির একটি মুহুরি প্লেগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা সেবাপরিচর্য্যার। সহজে রোগীকে কেহ স্পর্শ করিতে চায় না। নাগমশাই নিজেই প্রাণপণে লোকটির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই বড় খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এবার সে নাগমশাইকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে অবিলম্বে যেন গঙ্গাতীরে নিয়া যাওয়া হয়, সেখানেই সে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চায়।

কিন্তু গঙ্গাতীরে তাঁহাকে অপসারণ করা সহজ নয়, প্লেগ রোগীর ঘরের কাছেও কেহ যে ঘেঁষিতে চাহে না। এ অবস্থায় তাঁহার দেহ বহন করিবে কে ?

কোন লোক পাওয়া যাইতেছে না, অগত্যা নাগমশাইকে একলাই এই প্লেগ রোগীকে বহন করিয়া নিতে হইল। গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নাগমশাইর কোলে শুইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বহু কষ্টে লোক যোগাড় করিয়া, মৃত ব্যক্তির সৎকার শেষে, নাগমশাই ঘরে ফিরিয়া আসেন।

নাগমশাইর সঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের বড় সম্প্রীতি ছিল। রামকৃষ্ণ-নিষ্ঠ এই দুই ভক্তবীরের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিত।

সেদিন সাধু নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পরম সমাদরে তখনি তাঁহাকে দোতালার বৈঠকখানায় নিয়া যাওয়া হইল। আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশের মজলিশে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

নাগমশাই শয্যা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে শয়ন করা দূরের কথা উপবেশনও করেন না। ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের দিকে আর গেলেন না, নিতান্ত দীনভাবে মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

তিনি যে এক উচ্চ স্তরের সাধুপুরুষ ইহা অনেকেরই জানা আছে। সবাই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ফরাসে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, পীড়াপীড়িও শুরু হইল।

গিরিশ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে এই সমাদরের বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। কহিলেন, "থাক্ থাক্, ওঁকে আপনারা আর বিরক্ত ক'রবেন না। উনি যেখানে যে ভাবে বসে সুখী হন, সেই ভাবেই বসুন।"

গিরিশ এবার অনুরোধ জানাইলেন, "নাগমশাই, আজ বড় সৌভাগ্য, আপনার মত লোক দয়া ক'রে এসেছেন। এবার ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, সে অমৃত বাণী পান ক'রে আমরা কৃতার্থ হই।"

নাগমশাই দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি। করজোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, "আমি মূর্খ দুরাচার, তাঁকে চিনতে পারলাম কই? আপনারা কৃপা করুন যাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে সত্যকার ভক্তি জন্মে, জীবন সফল হয়।"

উপস্থিত সবাই এই পরম ভক্তের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। দৈন্য ও আত্মবিলুপ্তির এই মূর্ত্ত বিগ্রহের সান্নিধ্যে বসিয়া নিজেদের অহংবোধও যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ সৃষ্টি এই ভক্তবীরের সম্মুখে বসিয়া গিরিশের দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন, "তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? যাঁর কৃপাগুণে মানুষের এমন অবস্থা হয়, তাকে কি ভগবান্ না ব'লে থাকা যায়!"

আর একদিনের কথা। নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। এ সময়ে নিরঞ্জনানন্দ নাগমশাইকে কহিলেন, "মশাই, ঠাকুর বলতেন, 'নিজেকে দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়'—আপনি দিনরাত অমন ক'রে আপনাকে দীনহীন মনে ক'রেন কেন?"

নাগমশাই হাত জোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "সে কি কথা! নিজের চোখে নিরন্তর দেখ্‌ছি, আমি অতি হীন, অতি অধম, কি ক'রে আমি নিজেকে শিব মনে ক'রবো। আপনি ও কথা বল্‌তে পারেন। আপনারা ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু আমার ও রকম ভক্তি হ'লো কই? আপনাদের কৃপা হ'লে, ঠাকুরের কৃপা হ'লে আমি যে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবো।"

কি অপূর্ব্ব আর্ত্তি ও দৈন্য এই মহাভক্তের বাক্যে আর বচন ভঙ্গীতে! নিরভিমানতার কি অপরূপ প্রকাশ তাঁহার ব্যক্তিসত্তায়! উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে বেশ কিছুকাল বসিয়া রহিলেন, বাদ-বিতর্কের ভাষা কাহারও মুখে যোগাইল না।

এই দিনকার ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে কহিতেন, "ঠিক ঠিক দীনতা হ'লে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হ'লে, মানুষের নাগমশাইর মত অবস্থা হয়। এ সব মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয়।"

সে-বার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মা সারদামণিকে তিনি দর্শন করিতে যান। পরম ভক্তের এই মাতৃ-মিলনের মধুর দৃশ্যটি নাগমশাইর চরিতাকার শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

—"কুমারটুলির বাসায় গিয়া দেখিলাম, নাগমশায় মায়ের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুন পেড়ে কাপড় কিনিয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় মা মা করিতেছেন। কুমারটুলি হইতে আহিরীটোলায় আমরা একখানি চল্‌তি নৌকায় উঠিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌঁছিলাম। ঘাটে পৌঁছিয়াই নাগমশাই বাতাহত কদলী পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। জয় মা, জয় মা—বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমশাইকে দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে উঠিবামাত্র তিনি নাগমশায়কে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন।

"প্রায় আধঘণ্টা পরে তাহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসেন। তখনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল।' স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'আহা! আজ নাগমশায়ের উপর মা কি কৃপাই করিয়াছেন!' নাগ-মহাশয়ের সন্দেশ মা নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর পান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা বিদায় লইলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় আলোড়ন তুলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভক্ত শরৎচন্দ্র নাগমশাইর কাছে যাতায়াত করেন শুনিয়া স্বামীজী তাহাকে ডাকাইলেন, কহিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতা, মধুকর ত্বং খলু কৃতী।" অর্থাৎ আমরা তত্ত্ব অন্বেষণের পেছনে ঘুরে মরছি, কিন্তু মধুকর তুমিই হচ্ছো প্রকৃত

কৃতী—তুমিই পান করেছ মধুরস। স্বামীজীর এই মধুকর হইতেছেন রামকৃষ্ণরসে রসায়িত প্রাণ ভক্তপ্রবর নাগমশাই।

সে-বার নাগমশাই বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম! কোন মতেই তাঁহাকে ঠেকানো সম্ভব হইল না।

স্বামীজীর শরীর তখন বড় অসুস্থ। নাগমশাই তাই তাঁহার জন্য বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রেমভরে কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন, আপনি হচ্ছেন মোহরের বাক্স। ঠাকুরের কথা তো মিথ্যে হতে পারে না। সত্যিই তো মোহরের বাক্স। একবার দেহের দিকে দৃষ্টি দিন, আপনার এ দেহের রক্ষায় দেশের কল্যাণ হবে, জগতের কল্যাণ হবে।"

নব-প্রবর্ত্তিত মঠ মিশন প্রভৃতি সংগঠনকর্ম্ম শুরু করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, প্রবীণ ভক্তের কাছে স্বামীজী তাহা যাচাই করিয়া নিতে চান। নাগমশাইকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন।

উত্তর হইল, "ঠাকুরের ইচ্ছায় এসব কাজ হচ্ছে। এতে মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা, নাগমশাই বেলুড় মঠে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার পূত চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকিয়া মঠের সন্ন্যাসীরা প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাইবে।

নাগমশাই জানাইলেন, "কি করি, কেমন ক'রে ঠাকুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? তিনি যে আমায় গৃহেই থাকতে বলে গিয়েছেন।"

স্বামীজী সমবেত সন্ন্যাসীদের কহিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে বুঝতে পারা যায়। কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয় সংযমে, ইনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

স্বামীজীকে একথাও একবার বলিতে শুনা গিয়াছিল, "পৃথিবীর এত দেশ ঘুরে এলাম, কোথাও নাগমশাইর মত মহাপুরুষ চোখে পড়লো না।"

পূর্ব্ববঙ্গে সফরে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ নাগমশাইর

এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ও দেশে গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই। যে দেশ নাগমশাইর চন্দ্রালোকে আলোকিত, সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলবো।"

ভক্তটি বলিয়া উঠেন, "কিন্তু স্বামীজী, তিনি তো অতি গুপ্তভাবে ছিলেন, সাধারণের কাছে তেমন কিছু বলেন নি!"

"ওরে, মুখে নাই বা কিছু বললেন। নাগমশাইর মত মহা-পুরুষদের চিন্তা তরঙ্গে দেশের চিন্তাস্রোতের গতি ফিরে যায়।"

ত্যাগ বৈরাগ্য আর শুচিতায় ভরা ছিল সাধু নাগমশাইর জীবন। নিঃশব্দে নিভৃতে তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। আত্মগোপনপ্রয়াসী এই গৃহীসন্ন্যাসী তাই কোনদিনই নিজের চতুষ্পার্শে ভক্ত ও শিষ্যের ভীড় রাখিতে চান নাই।

কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে—মধুলোভী ভ্রমরকে ঠেকানো যায় কই? তাই সাধু নাগমশাইর পদপ্রান্তে ধীরে ধীরে সমবেত হইতে থাকে একদল পুণ্যলোভী, মুক্তিকামী ভক্ত। সংখ্যা তাঁহাদের বেশী নয়, কিন্তু আন্তরিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দিক দিয়া তাঁহাদের তুলনা বিরল। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "নাগমশাই তাঁর সাধক ভক্তদের ওপর স্নেহময়ী জননীর মত সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।"

সাধু নাগমশাইর ভক্ত-প্রীতির নানা কাহিনী ছড়ানো রহিয়াছে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতার 'মাষ্টার অ্যাজ আই স' হিম্ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে:

সেবার ঢাকাস্থিত একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। তখন বর্ষাকাল। বিশেষ করিয়া সেদিন দেখা দেয় ঘোর দুর্য্যোগ।

সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিয়া দেখেন, ঘাটে একটি নৌকাও নাই। সারাদিন অশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাত্যা বিক্ষোভও কম নাই। মাঝিরা ভয়ে নৌকা নিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে। ভক্তটি বড় বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার দুর্য্যোগময় রাত্রিতে

নৌকা ছাড়া দেওভোগ গ্রামে কি করিয়া যাইবেন ? চারিদিক জলে জলাময় হইয়া গিয়াছে। তবে উপায় ?

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে দেরী হইল না। সাধু নাগমশাইকে স্মরণ করিয়া এই ভক্তটি জলে ঝাঁপ দিলেন। সাঁতরাইয়া সারা পথ অতিক্রম করিয়া যখন নাগমশাইয়ের গৃহে পৌঁছিলেন তাঁহার দেহ তখন ক্লান্তিতে অসাড়। এত রাত্রে এ ভাবে ভক্তটিকে আসিতে দেখিয়া নাগমশাই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। বিচলিত হইয়া কহিলেন, "এই অন্ধকারে, বর্ষার এই দুর্য্যোগে কি এমন ক'রে আসতে আছে ? তাছাড়া, এই বন্যার সময় কত সাপ বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কেন একাজ আপনি করেছেন ?"

ভক্তটি সজলনয়নে উত্তর দেন, "আপনাকে আজ একটিবার দর্শন করার বড় তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল। তাই এ কাজ না ক'রে আমার উপায় ছিল না।"

রাত্রি যথেষ্ট হইয়াছে। এবার ভক্ত অতিথির জন্য কিছু রন্ধন করা প্রয়োজন। গৃহকর্ত্রী জানাইলেন, ঘরে একটুকরো শুক্‌নো কাঠও নেই, কি ক'রে ভাত রাঁধবো ?"

এ দুর্য্যোগময় রাতে কোথায় যাইবেন ? কেই-বা জ্বালানি কাঠ দিবার জন্য দুয়ার খুলিবে ? অগত্যা নাগমশাই কুঠার দিয়া একটি ঘরের খুঁটি কাটিতে শুরু করিলেন।

ভক্তটি ছুটিয়া গিয়া নাগমশাইকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। নাগমশাইর পত্নী তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে উত্তর হইল, "যারা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে সাপের মুখে সাঁতার কেটে আমায় দেখতে আসেন, তাদের জন্য আমি কি সামান্য একটা ঘরের মায়া ছাড়তে পারিনে! প্রাণ দিয়েও যদি আমি এদের উপকার করতে পারি, তবে আমার এ দেহ সার্থক হয়।"

বলা বাহুল্য, কাঠের এই খুঁটি কাটিয়া সেদিনকার অতিথি সেবার কাজে লাগানো হয়, ঘরটিও অল্পকাল মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়ে।

প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্য নাগমশাইকে মাঝে মাঝে অলৌকিক শক্তিও প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে।

এক নতুন ভক্ত কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। নাগমশাইর সঙ্গে সবে পরিচয় হইয়াছে। আর এ পরিচয় তাঁহার হৃদয়ে জ্বালিয়া দিয়াছে মুমুক্ষার আগুন। দিনরাত কেবলি সে ভাবিতে থাকে কবে আবার নাগমশাইর দর্শন পাইবে, মহাপুরুষের শ্রীমুখের অমৃতবাণী শুনিয়া প্রাণ তৃপ্ত করিবে।

অবশেষে একদিন আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। এমন মহাপুরুষকে পাইয়াও সে তাঁহার চরণতলে চিরতরে আশ্রয় নিতে পারে নাই—বরং পাইয়া তাঁহাকে হারাইয়াছে। তবে এ ছার প্রাণ রাখিয়া আর লাভ কি? ভক্তটি স্থির করিল, ছাদ হইতে পড়িয়া সে আত্মহত্যা করিবে।

ছাদের আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া যেই সে ঝাঁপ দিতে যাইবে, অমনি শুনিল, কে যেন স্পষ্ট স্বরে তাহাকে বলিতেছে, "অযথা ভেবো না, শান্ত হও। আগামী কালই নাগমশাইর সাথে তোমার দেখা হবে।"

এ কাহার দৈববাণী? যুবক ভক্তের সর্ব্বদেহে জাগিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব শিহরণ। মনের বিক্ষোভ ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া গেল।

পরদিন ভোরবেলায় নাগমশাইর দর্শন ঠিকই পাওয়া গেল। ছাত্রাবাসের দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া ভক্তটিকে তিনি ডাকিতেছিলেন। হাতে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী, সবেমাত্র দেশ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

শান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ কহিলেন, "আপনি কি সব করতে যাচ্ছেন ভেবে ভেবে মন বড় খারাপ হ'লো। তাই তো হঠাৎ ক'লকাতায় চলে আসতে হয়েছে। ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের রাজ্যে এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই। জেনে রাখবেন আত্মনাশ এক মহাপাপ"

ভক্তটির মুখ দিয়া একটি কথাও সরিতেছে না, এই অন্তর্য্যামী সাধকের সম্মুখে তিনি চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছেন।

নাগমশাই আবার তাঁহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "এতদিন ছিলেন খালে বিলে, এবার এসে পড়লেন সমুদ্রে।" অর্থাৎ,

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা-সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে, অমৃত সাগরে ভাসিয়া বেড়ানোর সৌভাগ্য তাহার। তবে আবার কিসের ভয়?

আশ্রয়ার্থী বহু ভক্তের জীবন নাগমশাইর পবিত্র স্পর্শে দিনের পর দিন রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কৃপাঘন দিব্য দৃষ্টি বহু আর্ত্তের আধি-ব্যাধি দূর করিয়াছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আত্ম-গোপনপ্রয়াসী মহাপুরুষ তাঁহার অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া ঘটাইয়াছেন নীরবে, প্রচ্ছন্নভাবে।

সিদ্ধপুরুষ নাগমশাইর অলৌকিক লীলার প্রকাশ একবার কিন্তু প্রকটরূপেই দেখা গিয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল দেওভোগ গ্রামে। পিতৃসেবার তীব্র আবেগ সেদিন মহাপুরুষের মনের ইচ্ছাটিকে উদগ্র করিয়া তোলে, এক বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দৃশ্য বহুজন সমক্ষে সেদিন উন্মোচিত হয়।

নাগমশাই তখন বাস করেন কলিকাতায়, আর বৃদ্ধ পিতা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে দেওভোগে। সে-বার আসিয়াছে পুণ্যময় অর্দ্ধোদয় যোগ। লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নানের জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছে। এই পবিত্র যোগের কয়েকদিন আগে নাগমশাই স্বগ্রামে গিয়া উপস্থিত। শুনিয়াছেন পিতার শরীর বড় অসুস্থ।

বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু এসময়ে পুত্রকে গ্রামে আসিতে দেখিয়া বড় রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "ছাখ্, এই অর্দ্ধোদয় যোগে কত লোকে টাকা-কড়ি ব্যয় ক'রে আর সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ক'লকাতায় যাচ্ছে গঙ্গা-স্নান করতে। আর তুই এ সময়ে গঙ্গাতীর ত্যাগ ক'রে এলি? তোর ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্ম আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনো তো তিন-চার দিন বাকী আছে। আমায় একবার ক'লকাতার গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবি? শেষ কালের পুণ্য করতে দিবি?"

পুত্র ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যদি কারো সত্যিকার ভক্তি থাকে, ভাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন—তাকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না।"

গঙ্গাস্নানের দিন দেওভোগে এক অপূর্ব্ব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল।

নাগমশাইর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠিক অৰ্দ্ধোদয় যোগের সময় অঙ্গনের অগ্নিকোণে দেখা গেল এক উচ্ছলিত জল-প্রবাহ। ভূগর্ভ ভেদ করিয়া কলকল শব্দে উহা উপরে উঠিতেছে, সারা প্রাঙ্গণ ভাসাইয়া ফেলিতেছে। কৌতূহলী জনতার মধ্যে তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল।

নাগমশাই গৃহ মধ্যে কি এক কাজে ব্যাপৃত, কলরব শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। ভক্ত হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল তীব্র ভাবোন্মাদনা, "মা! পতিত পাবনী মা-ভাগীরথী!" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া সাষ্টাঙ্গে এ জলধারার সম্মুখে তিনি প্রণত হইলেন। পুণ্যতোয়া গঙ্গার জয়-ধ্বনিতে সেদিন নাগমশাইর অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠে। দলে দলে পুণ্যার্থী নরনারীরা এই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হয়। এই পবিত্র জলস্পর্শে কাহারো কাহারো দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এ সময়ে নিরাময় হয়। শত শত লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত এই উৎসধারা ঘণ্টাখানেক পরে থামিয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অলৌকিক ঘটনাটির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সে আর এমন কি কথা? অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় সব কিছু সম্ভব হয়। এঁদের ইচ্ছা অমোঘ, এ ইচ্ছাশক্তিতে জীব উদ্ধার পেয়ে যায়।"

অপ্রাকৃত দর্শন, অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন, ইত্যাদির দিকে ভক্তেরা যাহাতে বেশী না ঝুঁকে ইহাই নাগমশাই চাহিতেন। এজন্য তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধনার মূল তত্ত্বটির দিকেই প্রধানতঃ ভক্তদের চিন্তাধারাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিতেন। বলিতেন, "গাছের তলায় জেগে বসে থাকার মত, সাধনার দ্বারা আপনাকে সদাই জাগ্রত রাখতে হয়। কিন্তু ফল রয়েছে তাঁর হাতে। তিনি নিজে কৃপা ক'রে ফল দিলে তবে জীব তার অধিকারী হয়, নতুবা নয়। দেখা যায়—কেউ বা ঘুমিয়ে আছে, ভগবান্ দয়া ক'রে হয়তো তার মুখে ফল ফেলে দিলেন, তাকে আর কোন কিছু সাধন ভজন করতে হয় না। এসব সাধক কৃপাসিদ্ধ হন। ভগবান্ যতদিন না কৃপা করেন, ততদিন কেউ তাঁর স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হয় না। তিনি

কল্পতরু—যে যা চায়, নিশ্চয় তাকে তা দান করেন। কিন্তু যাতে জীবকে বার বার জন্ম মৃত্যুর পথে যেতে হয় এমন বাসনা কখনো করা জীবের উচিত নয়।

"ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তবেই জীব সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবৎ কৃপায় মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসনা ত্যাগ করা যায়, তা থেকে জীবের কল্যাণ সাধনা আসবেই। কিন্তু যিনি ভগবান, ভক্ত ও ভগবৎ প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন তাঁর ত্রিতাপ জ্বালা অন্তে দূর হয়ে যায়।"

সাধু নাগমশাইর এ সব কথার পশ্চাতে ছিল তাঁহার জীবনের সূক্ষ্মতর দিব্য অনুভূতি, আর তাঁহার উপলব্ধ সত্য। মা জগজ্জননীর অসীম কৃপা ছিল এই মহাসাধকের উপর, মাতৃসাধনার সিদ্ধি তাঁহার হইয়াছিল করতলগত।

এক ভক্ত সে-বার নাগমশাইর পত্নীর কাছে বসিয়া মহাপুরুষের সাধন জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে নাগমশাইর পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ওঁর সাধন ভজনের কথা কি ব'লছো! উনি ইচ্ছে ক'রে যে দেবদেবীকে ডাকেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ ওঁকে দর্শন দেন। উনি নিজেই যে একথা কতদিন আমায় বলেছেন।"

নাগমশাই দেবদেবীর উপর বড় ভক্তিমান্। হৃদয়ে একবার ভাবাবেগ উপস্থিত হইলেই মা-মা বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন। দেব-দেবীর সাথে ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় অস্ফুট স্বরে কথাবার্ত্তাও তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়। ভক্ত শরৎচন্দ্র তাই একদিন মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন, তবে কি নাগমশাই শুধু দেবতাসিদ্ধ! তিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন! এই ভাবনার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা তিনি দিয়াছেন —"আমি এরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তাঁহার পূর্ণ ভাবাবেশ —বলিলেন, 'মা কি আমার এই খড়ে মাটিতে আবদ্ধ! তিনি যে

অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী। মা যে আমার মহাবিদ্যা স্বরূপিণী!' বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতা ঠাকুরাণীকে আমি একথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি তো তাঁর এ অবস্থা আজ নূতন দেখ্‌লে। এক এক দিন দুই তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না। এক এক দিন আমার মনে হয়, তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝিবা চলিয়া গেলেন।"

সাধনা ও সিদ্ধির পথ বাহিয়া মহাসাধকের মরজীবন এবার ধীরে ধীরে শেষ অঙ্কের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

১৩০৬ সালের শীত ঋতু। মহাসাধক নাগমশাই তাহার শেষ শয্যায় শায়িত। জীর্ণ দেহের প্রাকার টুটিবার এবার আর বেশী দেরী নাই। নিকটে উপবিষ্ট ভক্তটিকে একদিন ডাকিয়া কহিলেন, একবার পঞ্জিকাটা দেখুন দেখি। সামনে যাত্রার ভাল দিন কবে।

পঞ্জিকা দেখিয়া বলা হইল, "আজ্ঞে ১৩ই পৌষ ১০টার পর যাত্রার বেশ দিন রয়েছে।"

"আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে ঐ দিনই মহাযাত্রা করবো।"

সেবক ভক্তটি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নাগমশাইর সাধ্বী পত্নী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আর কেন কাঁদ্‌ছো বাবা! উনি কিছুতেই এ শরীর আর রাখবেন না। ওঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দেহত্যাগ করুন। দেখে আমরা আনন্দিত হবো।"

নির্দ্দিষ্ট দিন ও লগ্নটি আসিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বীরভক্ত চিরতরে মরদেহ ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় একবার কিছুটা নড়িয়া উঠে। অস্ফুট স্বরে শেষ বাণীটি উচ্চারিত হয় 'কৃপা, কৃপা—নিজগুণে কৃপা!'

পরমহংস দয়ালদাস-বাবা

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কথা। এই সময়ে শুধু পাঞ্জাবেই নয়, সারা উত্তর ভারতে প্রচারিত ছিল ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। পাতিয়ালা জেলার বসেরা গ্রামের আশ্রমটি ছিল তাঁহার নিভৃত সাধনকেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিতে অল্প সংখ্যক অন্তরঙ্গ মুমুক্ষু শিষ্য নিয়া তিনি বাস করিতেন, সাধন-পথের দিতেন দিক্‌দর্শন। আবার মাঝে মাঝে মণ্ডলীসহ বাহির হইতেন তীর্থ পরিক্রমায়। যে গ্রামে, যে শহরে এই সদানন্দময় মুক্ত পুরুষ আবির্ভূত হইতেন, দেখা দিত বিরাট জনসংঘট্ট, সাধু-সন্ত ও ভক্ত গৃহস্থেরা দলে দলে ভীড় করিত তাঁহার চরণতলে। পুণ্যলোভী দাতা ও শেঠেরা সোৎসাহে ভাণ্ডারা লাগাইত তাঁহার ছাউনিতে। তীর্থ পরিক্রমার শেষে আবার নিজ গ্রামের আশ্রমটিতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরদাস-বাবা রত হইতেন নিভৃত সাধনায়।

বসেরার মঠ প্রাঙ্গণে সেদিন তিনি শিষ্য পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্ত জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসজী নানা তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে চলিতেছে মৃদু মধুর হাস্য পরিহাস।

এমন সময়ে একটি বালক সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বয়স তাহার প্রায় বারো বৎসর। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত, তীক্ষ্ণ নাসা, বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ দুটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পরনে রহিয়াছে গৈরিক বহির্ব্বাস। নগ্নপদ দুইটিতে জমিয়াছে প্রচুর পথের ধূলা। দেখিলেই মনে হয়, বহু দূরের পথ অতিক্রম করিয়া সে আসিয়াছে।

আগন্তুক বালক প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঠাকুরদাস-বাবার নয়ন দুটি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। স্মিত হাস্যে বলিয়া

উঠেন, "আরে, এ দেখ্‌ছি আমাদের ছোটেলালজী! তারপর, কি মনে ক'রে? তোমার বাড়ীর সবাইর কুশল তো?"

মঠের ভক্ত ও সেবকেরা এতক্ষণে বুঝিয়া নিয়াছেন, এই বালক পরমহংস-বাবার পূর্ব্ব পরিচিত। কিন্তু এত অল্প বয়সে গৈরিক নিয়া সে সাধু হইয়াছে? সবাই বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন।

বালক করজোড়ে উত্তর দেয়, "বাবা, আমি এসেছি আপনারই কাছে। আপনার কাছে আশ্রয় নিতে। আমি সাধু হবো। সাধু হয়ে ভগবান্ লাভ ক'রবো, এজন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

"তা ছোটেলালজী, তুমি তো দেখ্‌ছি আগে থেকেই গৈরিক প'রে ফেলেছো, সাধু তো তুমি ব'নেই গেছো।"

বালক বড় সপ্রতিভ। শান্তস্বরে, স্পষ্ট ভাষায় সে উত্তর দেয়, "না—মহারাজ। এটা আমার লোক দেখানো বেশ। আমার মাতাজী বললেন,—'আমাদের কপিয়াল গাঁও থেকে বসেরা যে অনেক দূর, ক'দিনের পথ পায়ে হেঁটে যাবি, সে ক'দিন তোকে খেতে দেবে কে? তবে কি অনাহারে মরবি?'

"আমি বল্‌লাম, তোমার কোন ভয় নেই, একটা গৈরিক কাপড় জড়িয়ে আমি চলে যাবো, ভালো গৃহস্থেরা দু টুক্‌রো শুক্‌নো রুটি আমায় দেবেই। তাই আমার এ বেশ।"

"হো-হো-হো"—অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়েন ঠাকুরদাস-বাবা। বলেন, "তুমি চতুর ছেলে, মাথায় ভাল ফন্দী এঁটেছিলে। কিন্তু ছোটেলালজী ভগবান্ লাভ করবে বলে তো পথে বেরিয়েছো। ভগবান্ কিন্তু বড় চতুর; ধরতে গেলেই পালিয়ে যান, হাতের মুঠো যত শক্তই ক'রো, ফস্‌কে যান। তাঁর সাথে এঁটে উঠতে পারবে কি?"—কৌতুকের সুর ফুটিয়া উঠে ঠাকুরদাস-বাবার কথা কয়টিতে।

"মহারাজ, সবার কাছে শুনি, আপনার মতো মহাত্মারা সেই ভগবান্‌কে বশে রাখার কৌশলটি জানেন। আমি সে কৌশল আপনার কাছেই শিখে নেবো। প্রাণপাত ক'রে তা শিখ্‌বো।

এবার গম্ভীর হইয়া উঠেন ঠাকুরদাস-বাবা। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন

করেন, "উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা, ছোটেলালজী। কিন্তু তোমার বাবা মায়ের সম্মতি এতে আছে তো? সব আমায় খুলে বলো।"

"মহারাজ, মাপ ক'রবেন, এতক্ষণ কথায় কথায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার বাবা আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছেন। এই যে সেটি।"

পরমহংসজীর নির্দ্দেশে একজন সেবক চিঠিটি সেখানে পাঠ করিলেন। মর্ম্ম এইরূপ:

বাবা মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। অতঃপর সমাচার এই, অনেকদিন যাবৎ আপনার দর্শন না পাইয়া আমরা মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটেলালকে আপনি জানেন। বয়সে সে বালক, কিন্তু আর সে এখন গৃহে থাকিতে চায় না, সাধু হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রামে বহু সাধু-সন্তের সমাগম হয়। ছোটেলাল তাঁহাদের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাঁহাদের ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে, চাপাটি তৈরী করিয়া দেয়, নানাভাবে তাঁহাদের সেবা করে। আপনার সেবার সুযোগ পাইয়াও সেবার সে অনুগৃহীত হইয়াছে। সাধু-সঙ্গ ও সাধু সেবার ফলে ভগবান্ প্রাপ্তির অভিলাষ তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। স্থির করিয়াছে, সংসার সে ত্যাগ করিবে, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবে।

আমাদের আরো কয়েকটি জোয়ান ছেলে আছে। তাহারা আমার ক্ষেতের কাজ করে, বিষয়-কর্ম্মে সাহায্য করে। আমি এবং ছোটেলালের মা তাই পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, একটি পুত্রকে প্রভু শিবজীর সেবায় নিয়োগ করিব, সন্ন্যাসী হইতে দিব। ছোটেলাল এই অল্প বয়সে ভগবানের জন্য পাগল। দিনরাত সাধুর পিছনে ঘোরে আর গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়া ধ্যান-ভজন করে। আমার ছেলেদের মধ্যে সেই-ই সাধু হওয়ার যোগ্য। তাই আমরা তাহাকে এজন্য অনুমতি দিতেছি। তাছাড়া, সাধু যদি হইতেই হয় সে আপনার মত কৃপালু মহাত্মার মঠে থাকিয়াই সাধুর জীবনযাপন করুক। তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব।

আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, একটি ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া মুক্তি লাভ করিলে তাহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হয়, পৃথিবী পুণ্যবতী হয়। আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন হয়। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—শ্রীচরণাশ্রিত...

ঠাকুরদাস-বাবা প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "তথাস্তু। যাও বেটা, আর বিলম্ব না ক'রে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো, আর এ বেশ ত্যাগ ক'রে মঠের গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করো আমার হাত থেকে।"

তারপর প্রবীণ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া আদেশ দিলেন, "আজ অতি শুভ দিন। পুণ্যলগ্নও সমাগত। তোমরা ছোটেলালের জন্য বিরজাহোমের সব ব্যবস্থা করো। আজই আমি তাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেবো।"

জনৈক সেবক আর কালবিলম্ব না করিয়া ছোটেলালকে নিয়া মঠের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

প্রবীণ শিষ্যদের মধ্যে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন, তাইতো, এত তাড়াহুড়া করিয়া গুরু মহারাজ তো কখনো কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই! তাছাড়া, এত অল্প বয়স্ক বালকের সরাসরি সন্ন্যাস-দীক্ষা? গুরুজী তো ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তুতির উপর সদাই গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু কই, এ ক্ষেত্রে তো তাহার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলিতেছেন না?

অন্তর্য্যামী পরমহংসজী প্রবীণ শিষ্যদের মনোভাব মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "ছোটেলাল, আজ এই মঠে আত্মসমর্পণ করতে আস্‌বে—এ আমি জানতাম। তাই প্রাঙ্গণে বসে তার প্রতীক্ষা করছিলাম। দু'বছর আগে আমি একটা সাধু জমায়েৎ নিয়ে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। ছোটেলাল আমার সেবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। তখনি দেখলাম, ওর মস্তকের চারদিকে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতির বেষ্টনী। বুঝলাম, শিগ্‌গীরই মুমুক্ষার আগুন জ্বলে উঠবে ওর জীবনে, চিরতরে গৃহ ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবে সন্ন্যাস জীবন।"

জনৈক শিষ্য মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন, "কিন্তু গুরু মহারাজ, সাধারণ

ভাবে আমরা দেখে আস্‌ছি, আগে সাধকের ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়া হয়। এর বেলায় দেখছি ভিন্নরূপ ব্যবস্থা।”

পরমহংসজী উত্তর দিলেন, “বেটা, সমর্থ গুরু শিষ্যের জন্য ব্যবস্থা-পত্র দেয় তার বিগত তিন জন্মের সুকৃতি বিচার ক’রে। তাছাড়া, এ জন্মের তীব্র বৈরাগ্য, তীব্র মুমুক্ষার কথাও তো বিবেচনা ক’রে দেখতে হবে। জ্ঞান তো, শ্রুতি বলেছেন, যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রব্রজেৎ, অর্থাৎ যেদিনই সাধকের সত্যকার তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হবে, সেইদিনই গুরু তাঁকে দেবেন সন্ন্যাস। এতে তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষের প্রশ্ন ওঠে না। তবে সর্ব্বদা মনে রাখবে, এই মুমুক্ষার তীব্রতা যাচাই করার অধিকারী হচ্ছেন সমর্থ গুরু।”

সেইদিনই বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া ছোটেলাল সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার কাছে। নব নামকরণ হয় —দয়ালদাস। উত্তরকালে দয়ালদাস পরিণত হন এক সার্থকনামা সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। তাঁহার যোগবিভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞানের খ্যাতি বিস্তারিত হয় দিগ্‌বিদিকে। সমকালীন ভারতের বহু উচ্চকোটির সাধক, মনীষী শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্ম প্রচারক তাঁহার পরমাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন।

দয়ালদাসের আশ্রম জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত হয় কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতেই তাহাকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত, নিয়মিত ধ্যান-জপের পর শুরু হইত বৃদ্ধ গুরু মহারাজের শাস্ত্র অধ্যাপনা ও বেদান্তের ব্যাখ্যান। ইহার শেষে দয়ালদাসকে লাগিতে হইত আশ্রমের কাজে। দূরের কূপ হইতে বৃহৎ ভাণ্ডে জল টানিয়া আনা, গরু-মহিষের সেবা আর পরিচর্য্যা করা ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। আশ্রমবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য যাহারা রসুই করিত ও বাসন মাজিত তাহাদের কাজেও দয়ালদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিতে

হইত। দিনে রাতে অবসর বা বিশ্রামের সুযোগ খুব কমই ছিল। এত দৌড়-ঝাঁপ ও খাটুনীর পর আহার মিলিত কয়েক টুক্‌রা শুষ্ক রুটি আর এক হাতা সিদ্ধ সব্‌জি।

রাত্রে নিদ্রার সময়ও গুরুজীর শ্যেন দৃষ্টির কবল হইতে নিস্তার ছিল না। দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রার পরই একটি মোটা লাঠি হাতে নিয়া তিনি চীৎকার শুরু করিতেন, "ওরে তোদের ভোজন ও নিদ্রায় যদি এতই অনুরাগ, তবে শুধু শুধু ঘরের আরাম ছেড়ে এখানে কেন এসেছিস্‌। উঠে পড়্‌ তামস নিদ্রা ছেড়ে।"

শিষ্যেরা উঠিয়া জপ-ধ্যানে বসিয়া গেলে, তবেই ঠাকুরদাস-বাবা শান্ত হইতেন। নিজের কুঠরীতে গিয়া হইতেন ধ্যানস্থ। প্রাতঃকালে বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যান শুরু হইত আশ্রমের প্রাঙ্গণে। এই শাস্ত্রচর্চ্চার মণ্ডলীতে, বয়সে ছোট হইলেও দয়ালদাস ছিলেন অনন্য সাধারণ। বিধিদত্ত প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, তাই যে কোন জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। গুরুমহারাজ তাই দিনের পর দিন তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন অধ্যাত্মশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার জন্য।

তরুণ জীবনের এই কঠোর দিনচর্য্যা সম্বন্ধে উত্তরকালে দয়ালদাস বাবা কহিতেন, "আমার গুরু সত্যই কৃপালু ছিলেন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ আমায় করাতেন বটে, কিন্তু দেখতাম আড়ালে গিয়েই গোপনে মুছে ফেলতেন নিজের চোখের জল। বুঝতাম, কঠোর হয়ে তিনি শাসন করতেন আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, কিন্তু হৃদয় তাঁর ব্যথাতুর হয়ে উঠ্‌তো। আমরা যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলাম তাঁর। ঐ জওয়ান বয়সে গুরুজী যদি কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যাস না করাতেন, তবে কি দেহবুদ্ধি যেতো? ত্যাগ বৈরাগ্য কোনদিনই আসতো? চিত্তের মল কি দূরীভূত হতো? অভীষ্ট কি আর সিদ্ধ হতো? ভাগ্যগুণে এমন দয়াল গুরুর দাস হয়েছিলাম বলেই তো আজ আমি তোমাদের দয়ালদাস-বাবা।"

তরুণ শিষ্য এই কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হইবার পর গুরু মহারাজ কহিলেন, "দয়ালদাস, এবার তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি

আয়ত্ত করতে হবে। বেটা, ব্রহ্মসাধন একটা মস্ত বড় লড়াই—এজন্য চাই মজবুত দেহ, আর সুসংযত ও কেন্দ্রীভূত মন। পর পর্য্যায়ে রাজযোগ সাধনার ভেতর দিয়ে তোমায় যেতে হবে। বেটা, যা পারো তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই শরীর আজকাল জীর্ণ হয়ে এসেছে। এটাকে আর বেশী দিন আমি ধরে রাখবো না।"

একাদিক্রমে পনের বৎসর এ আশ্রমে দয়ালদাস বাস করেন। সিদ্ধ গুরুজীর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া গোপনে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন তাঁহার যোগসাধনা। এই সময়ে উচ্চতর যোগবিভূতির নানা প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার সাধনজীবনে।

কিন্তু গুরু ঠাকুরদাস-বাবা তাঁহার সতর্ক প্রহরা দিয়া শিষ্যকে সদাই ঘিরিয়া রাখিতেন, তাঁহার যোগশক্তিকে করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। উচ্চতর অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিলেই শিষ্যকে গুরু কহিতেন, "দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় তোমার নানা দর্শনাদি ঘট্‌ছে, কিন্তু এ নিয়ে কখনো মত্ত হয়ে উঠো না, প্রতিষ্ঠার দিকে কখনো পা বাড়িয়ো না। সদাই স্মরণ রাখবে, প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা। বৎস, একমনে দৃঢ় পদক্ষেপে আত্মজ্ঞানের সাধনায় এগিয়ে যাও। পরাজ্ঞান যেদিন তোমার সাধনসত্তায় ফুটে উঠবে, এই মানবজীবন হয়ে উঠবে সার্থক।"

বৃদ্ধ গুরু মহারাজ ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়েন মরজীবনের প্রান্তসীমায়। বিদায় ক্ষণের প্রাক্কালে শোকাকুল শিষ্য ও সেবকেরা সবাই তাঁহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়ান। স্থিতধী মহাপুরুষ একে একে সবাইকে জানান তাঁহার অন্তরের আশীর্ব্বাদ আর বিদায় সম্ভাষণ।

প্রিয় শিষ্য দয়ালদাসের দিকে তাকাইয়া গুরু কহিলেন, "বেটা দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় অভীষ্ট তোমার অচিরেই পূর্ণ হবে। আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হবে তোমার সাধনসত্তায়। তোমার প্রথম দর্শনের দিনেই আমি জেনেছিলাম, তুমি লোকগুরু হবে। লোক মঙ্গলের জন্ত

জীবন ধারণ করবে। তাই তোমার তপস্যাময় জীবনকে এত সতর্কতা দিয়ে আমি ঘিরে রেখেছিলাম।"

শোকার্ত্ত দয়ালদাস ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবা আশ্বাস জানাইয়া কহিলেন, "বৎস, শেষ বিদায়ের আগে জানাই তোমায় আমার আশীর্ব্বাদ। ঋদ্ধি সিদ্ধি চিরদিন থাকুক তোমার করায়ত্ত। অন্নহীনে অন্নদান আর মুমুক্ষুকে মুক্তিদান, হোক তোমার জীবন ব্রত।"

একটু থামিয়া গুরু মহারাজ আবার বলিলেন, "কলিকালে মানুষ অন্নগত প্রাণ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। ধীর স্থির হয়ে বসে যোগাভ্যাস করার সময় তাদের নেই। তাদের মধ্যে বেদান্তের পরমতত্ত্ব তুমি প্রচার করো, নিত্যানিত্য বস্তু-বিচারের কথা নূতন ক'রে জাগিয়ে তোল।

গুরু মহারাজের মহাপ্রয়াণ শেলের মত দয়ালদাসের বুকে বাজিল। শেষ কৃত্যের পর কয়েকটা দিন চলিয়া গেল শোকার্ত্ত অবস্থায়। তার পর দয়ালদাস আহ্বান করিলেন আশ্রমের শিষ্য সেবক এবং বাহিরের ভক্ত গৃহস্থদের। কহিলেন, "গুরু মহারাজের দেহান্তের পর একটা বড় কাজ বাকী রয়ে গিয়েছে। তাঁর স্মৃতিপূজার জন্য এবার আমাদের একটা বৃহৎ ভাণ্ডারা অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। তাতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এ অঞ্চলের গরীব দুঃখী মানুষ আর সাধু সন্তদের।"

প্রবীণ শিষ্যেরা চমকিয়া উঠেন। কহেন, "দয়ালদাস, তোমার প্রস্তাব অবশ্যই অতিশয় সাধু। কিন্তু ভাই, বড় রকমের ভাণ্ডারা দেবার সাধ্য আমাদের কই? তুমি তো জানোই, আশ্রমে সঞ্চিত কোন অর্থ নেই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আশেপাশের গৃহস্থ লোকেরা কেউ তেমন ধনবান্ নয় যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে। দূর-দূরান্তের ভক্তেরা কে কি সাহায্য দেবে বুঝতে পারছিনে। এ অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী কাজ করাই কি ভালো নয়? ছোটখাটো একটা ভাণ্ডারা দিয়েই কাজ শেষ করা যাক্, কি বলো?"

দয়ালদাস উত্তরে প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলেন, "গুরুজী তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা মোটেই হারাইনি, কোনদিন

হারাবোও না। তাঁর ভাণ্ডারা বিরাটভাবেই করতে হবে, অর্থ ও দ্রব্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আপনারা এই পবিত্র কাজে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হোন।”

বয়সে নবীন হইলেও দয়ালদাসের প্রতি সতীর্থেরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। অবশেষে তাঁহার সিদ্ধান্তই সবাই মানিয়া নেন। সোৎসাহে এবার কাজকর্ম্ম শুরু হইয়া যায়।

বিভিন্ন মঠ মণ্ডলী আখড়ায় এবং হাটে বাজারে ঘোষিত হয় পরমহংস ঠাকুরদাস বাবার ভাণ্ডারার কথা। কোথা দিয়া কি ঘটিয়া যায়, দূর দূরান্ত হইতে উপস্থিত হইতে থাকেন শেঠ, সওদাগর ও ধনী গৃহস্থ ভক্তেরা। অকাতরে সবাই বাবার কাজে অর্থ দান করেন। সংগৃহীত হয় বিপুল পরিমাণ ঘৃত, চিনি, আটা, সুজি ইত্যাদি। অল্প সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র বসেরা গ্রামের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক রাজকীয় ভাণ্ডারা, দশ বারো হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও সাধুসন্ন্যাসী সেদিন সেখানে ভোজন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন। পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

সঙ্কল্প-করা কাজ শেষ হইয়াছে। দয়ালদাস এবার সতীর্থ ও আশ্রম-ভক্তদের জানাইয়া দেন, আশ্রমে আর তিনি অবস্থান করিবেন না, শেষ পর্য্যায়ের তপস্যার জন্য আত্মগোপন করিবেন হিমালয়ে।

তরুণ সাধক দয়ালদাসজীর জনপ্রিয়তা অসাধারণ, সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন, বার বার অনুরোধ জানাইতে থাকেন বসেরায় থাকার জন্য। কেহ কেহ বলিয়া উঠেন, “গুরুজী গত হয়েছেন, এখন তাঁর আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ ক’রে তাঁর পুণ্যস্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা—এটাই তো আপনার প্রধান কর্ত্তব্য।”

উত্তরে দয়ালদাস বলেন, “আমার গুরু মহারাজ বিষয়ী মোহান্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী শিবকল্প মহাত্মা। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর শিষ্যদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো নিভৃত তপস্যার পথে আমি বেরিয়ে পড়ছি। আপনারা প্রার্থনা করুন, গুরুর যে আশীর্ব্বাদ আমি পেয়েছি তা যেন সফল হয়ে ওঠে আমার জীবনে।”

সাতাশ বৎসর বয়সে এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দয়ালদাস বহির্গত হন, আসন গ্রহণ করেন হিমালয়ের এক সিদ্ধপীঠে। এখানে প্রায় দশ বৎসর তাঁহার অতিবাহিত হয় চরম কৃচ্ছ্রব্রত আর আত্মিক সাধনায়। তারপর গুরুকৃপায় হন তিনি সিদ্ধকাম। আত্মজ্ঞানী মহাসাধকরূপে, ঋদ্ধি-সিদ্ধির অধিকারী শক্তিধর মহাপুরুষরূপে, অচিরে সন্ন্যাসী সমাজে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাসের অন্তরে চিরজাগরূক রহিয়াছে তাঁহার কৃপালু গুরু-মহারাজের আদেশ। তিনি বলিয়াছেন, বুভুক্ষুকে অন্ন দাও, আর মুমুক্ষুকে দাও মুক্তির আলো। এই আদেশই চিরদিন করিবেন তিনি শিরোধার্য্য। আর এই আদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিতে হইলে, কোন মঠ-মন্দির বা স্থায়ী সাধনকেন্দ্রে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন হইতে ত্যাগব্রতী সাধুদের মণ্ডলী নিয়া তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন করিবেন, জনতার মাঝে থাকিয়াই সাধন করিবেন গুরু-উপদিষ্ট পরম কল্যাণ।

অতঃপর অল্পকাল মধ্যে সন্ন্যাসী দয়ালদাসের ঋদ্ধি-সিদ্ধির খ্যাতি সাধু সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। হরিদ্বারের বিশিষ্ট মোহান্ত ও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে পরমহংস ও সিদ্ধাবধূত আখ্যায় ভূষিত করেন।

কি কুম্ভমেলায়, কি হিমালয়ের গহন তীর্থে, কি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-নর্ম্মদা-কাবেরীর পবিত্র কূলে, যেখানেই তিনি সাধু জমায়েৎ নিয়া উপস্থিত হন, দলে দলে ভক্ত নরনারী, রাজা উজীর শেঠ, লুটায় তাঁহার চরণতলে। তাঁহার বৈরাগ্যময় মূর্ত্তি, জ্ঞান প্রোজ্জ্বল নয়নদ্বয় একবার যে দর্শন করে, অমৃতময় স্নেহবচন একবার যে শ্রবণ করে, মোহিত হইয়া যায়,—এক অমোঘ, অনির্দ্দেশ্য আকর্ষণের বশে করে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। যেখানেই দয়ালদাস-বাবার অধিষ্ঠান হয়, বহিয়া যায় ভাণ্ডারার স্রোত আর ধর্ম্ম উপদেশ। শাস্ত্রালাপ ও ভজন কীর্ত্তনে চারিদিক মুখর হইয়া উঠে, জনজীবনে জাগিয়া উঠে বিপুল আধ্যাত্মিক উজ্জীবন।

গঙ্গা-যমুনা নর্ম্মদার তীরে তীরে, সারা ভারতের তীর্থে তীর্থে

যেখানেই পরমহংস দয়ালদাস-বাবা উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে দেখা যায় এক বিরাট সাধু জমায়েৎ, গৃহস্থ ভক্তেরাও সমবেত হয় দলে দলে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে ঘিরিয়া ভগবৎ আনন্দের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

গুরু ঠাকুরদাসজীর আশীর্ব্বাদ এ সময় হইতে পরিপূর্ণরূপে দয়ালদাস-বাবার আচার্য্য জীবনে রূপায়িত হইয়া ওঠে। ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এক মহিমময় বিগ্রহরূপে দেশের দিকে দিকে তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাস-বাবার অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপজী লিখিয়াছেন,[১]—তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কার্য্যেও তিনি তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকট কোন দীন দুঃখী গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন না করাইয়া যাইতে দিতেন না। কৌপীন কমণ্ডলু মাত্র সম্বল লইয়া অবধূত দয়ালদাস আগন্তুক অভুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকল তাঁহার বৈরাগ্য ও বদান্যতায় বিমুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র সেবার জন্য আটা, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল। তিনিও দুইহাতে দান করিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান সেইখানেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পরিচিত অপরিচিত বোধ নাই, সাধু অসাধু, গৃহস্থ সন্ন্যাসী বিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র দেখা নাই, স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্য নাই, যে অভুক্ত সে-ই ভোজন করিবে, যেখানে স্বামী দয়ালদাস সেইখানেই মা অন্নপূর্ণার এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান।

"স্বামী দয়ালদাস এক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতেছেন। শত শত সহস্র সহস্র সাধু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হইত। স্বামীজীর সঙ্গে বৈরাগী, বৈষ্ণব, রামাইৎ, উদাসী, সন্ন্যাসী, পরমহংস, অবধূত সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধু ও যতিগণ

---

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপ

প্রেমের তারে একত্রিত হইয়া একসূত্রে মণি, মুক্তা, প্রবাল আদি গ্রথিত মালার ন্যায় সুশোভিত থাকিতেন। তিনি সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এইজন্য কেহই তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না।

"তিনি সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর নেতা হইয়াও কখন আপনাকে প্রধান মনে করিতেন না। মোহান্তদিগের মত তাঁহার স্বতন্ত্র গদি বা আসন থাকিত না। তিনি তৃণাসন ও বালুকাসন বড় ভালবাসিতেন। কেহ তাঁহার স্তুতিবাদ করিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন ও ভক্তিসহ ভগবানের স্তুতি করিতে বলিতেন। রাজা, উজীর, শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, স্ত্রী-পুরুষ যে তাঁহার একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই তাঁহার সেবা না করিয়া, তাঁহার অশেষ প্রশংসা না করিয়া, থাকিতে পারে নাই।"

সে-বার দয়ালদাস-বাবা একটি বিরাট জমায়েতের প্রধান রূপে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাইতেছেন। বিহারের পথে আসিবার সময় তিনি মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে শহরের বহু নরনারী জড়ো হইল তাঁহার মণ্ডলীর সম্মুখে। শেঠ ও মহাজনেরাও ভক্তিভরে আগাইয়া আসিলেন সাধুদের সেবার জন্য।

পৌষ মাস তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। বিহারের প্রচণ্ড শীতে দয়ালদাসজী ও তাঁহার সাধু শিষ্যেরা নদীর চড়ায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে পরমানন্দে ধুনি জ্বালাইয়াছেন, আসন পাতিয়া বসিয়াছেন।

একজন গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, এই দুঃসহ শীতের রাত্রে ঘরের ভেতরে থেকেই আমরা কাঁপতে থাকি। প্রচণ্ড হিমের মধ্যে আপনাদের নিদ্রা হয় কি ক'রে?"

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, "নিদ্রা না হলেই বা অসুবিধা কি? সাধুদের একমাত্র কাজ ভগবৎ ভজন। শীতের দাপটে রাত্রে যেদিন নিদ্রা না হয়, আমরা ধ্যান জপ ও ভজন শুরু ক'রে দিই। এ নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।" অতঃপর তিনি সোৎসাহে বেদান্তের তত্ত্ব আলোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন।

সেদিন শীতের রাত্রে হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া যায়। দলের

কয়েকটি সাধু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে থাকেন, "তাই তো! ধুনির কাঠ সংগ্রহের কি উপায় হবে? শুকনো কাঠ পাওয়া তো অসম্ভব!"

দয়ালদাস-বাবা হাসিয়া কহিলেন, "ছাখো, সাধুদের বোঝা বইবেন ভগবান্। তোমরা এজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমাদের ভোজনের জন্য, পুরী মালপোয়া তৈরীর জন্য, ধনী শেঠেরা এগিয়ে এসেছেন। কত আটা, ঘি, চিনি জড়ো করেছেন। তেমনি ভগবদ্ ভক্ত দরিদ্র লোকেরাও তোমাদেব সেবার জন্য রয়েছে উৎকণ্ঠিত। একটু সবুর করো, একজন কাঠুরে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। যত খুসী ধুনি জ্বালাও, আর সারা রাত ধ্যানজপ করো।"

সত্যিই তাই। ঝড় বাদল কিছুক্ষণ হয় থামিয়া গিয়াছে। এই অবসরে এক ব্যক্তি মাথায় একটি বৃহৎ কাঠের বোঝা নিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বোঝা নামাইয়া যুক্তকরে সে নিবেদন করে, "বাবা, আমি অতি দরিদ্র, ছা-পোষা লোক। বন থেকে কাঠ কেটে আনি, তা বিক্রি ক'রে কোনমতে দিন গুজরান হয়। ঘরে কিছু শুকনো কাঠ ছিল, আপনাদের সেবার জন্য নিয়ে এলাম।"

বাবার নির্দ্দেশে এই কাঠওলাকে পরিতোষ সহকারে পুরী মালপোয়া ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

আর একদিনের কথা। গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবার ধুনির সম্মুখে শহরের একদল ভক্ত দর্শনার্থী যুক্তকরে বসিয়া আছে। বাবার মুখে বেদান্তের বৈরাগ্য অভ্যাস ও নিত্যানিত্য বিচার সম্পর্কে উপদেশ শুনিতেছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক হিন্দুস্থানী ভক্ত এই কয়দিনেই বাবার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লোকটি শুদ্ধসত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণ, সাধনার এক উত্তম আধার। তাই তাহার উপর পড়িয়াছে দয়ালদাসজীর বিশেষ কৃপা। কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ায় এই ভক্তটি হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিদায় গ্রহণের জন্য বাবার অনুমতি সে প্রার্থনা করে।

বাবা তন্ময় হইয়া এসময়ে একটি তত্ত্ব উপদেশ দিতেছিলেন। ভক্তটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আরে, তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রসুই করার জন্য ব্যস্ত হয়েছো। ভগবৎ কথা শুনছো এখানে, তাই

ভগবান্‌ই তোমার সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। ঘরে ফিরেই দেখবে, ভোজনের সব তৈরী।"

ভক্তটির ঘরে দ্বিতীয় কেহ নাই, নিজের আহার্য্য রোজ নিজ হাতেই তাহাকে প্রস্তুত করিতে হয়। যাই হোক বাবার এই কথায় সে নিরস্ত হয়। ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্ববৎ শ্রবণ করিতে থাকে।

মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ভক্তটি দেখে, হঠাৎ একজন আত্মীয় তাহার গৃহে অতিথি হইয়াছে, এবং গৃহস্বামীর দেরী দেখিয়া নিজেই রুটি সব্‌জি তৈরী করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

অল্প কয়েকদিন যাবৎ দয়ালদাস-বাবা মুঙ্গেরে এই নদীর ঘাটে অবস্থান করিতেছেন। ইহারই মধ্যে এই অঞ্চলের চারিদিকে তাঁহার যোগবিভূতির খ্যাতি, কৃপালীলার নানা কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাধু জমায়েতের তিনিই হইতেছেন মধ্যমণি, তাই সাধু সন্ন্যাসী ও মুমুক্ষু গৃহস্থেরা সবাই জড়ো হইতেছে তাঁহার ছাউনিতে। সংসারের তাপে ক্লিষ্ট, আর্ত্ত ভক্তেরাও আসিতেছে তাহাদের নানা সমস্যা নিয়া।

শহরের এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেদিন বাবার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এক পরমাত্মীয় দূরদেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। চিঠি আসিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। ভদ্রলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর স্বরে কহেন, "বাবা, এ সঙ্কটে ডাক্তার কব্‌রেজদের কিছু করবার নেই। আপনার মত যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাত্মারাই শুধু এমন মৃতকল্প রোগীকে বাঁচাতে পারেন। আপনার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি। যা হয় আপনি করুন।"

দয়ালদাসজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, তুমি শান্ত হও—কেঁদো না। কেঁদে কোন ফল হবে না। তোমার আত্মীয়টি আর বেঁচে নেই, ঘণ্টাখানেক আগে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে।"

ভদ্রলোকটি এই শোক সংবাদের আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। পরমহংস দয়ালদাসজী স্নেহপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, "বেটা, দুঃখের আঘাত, মৃত্যুর আঘাত, সব মানুষের জীবনে আসবেই আসবে। তোমার এই দেহ, তোমার প্রিয়তম নিকট আত্মীয়দের দেহ—এ সবই অনিত্য, প্রপঞ্চ। যা অনিত্য তার ধ্বংস তো

এক সময়ে হবেই, এজন্য আমাদের আগে থেকেই তৈরী থাকা উচিত এ সংসারে সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। কেবল ভগবান্‌ই নিত্য। তাই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে সে সম্বন্ধে কখনো ছেদ পড়ে না। বৈরাগ্য অবলম্বন করো, চিত্তের মল অপসারণ করো। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে, সৎ-চিৎ আনন্দময় পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তা হলে আর বিচ্ছেদের দুঃখ শোক ভোগ করতে হবে না।" এইভাবে শোকমগ্ন ভক্তটিকে প্রবোধিত করিয়া বাবা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে অবস্থান করার কালেই দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভ করেন তরুণ সাধনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উত্তরকালে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে সমগ্র ভারতে তিনি প্রখ্যাত হন, এ দেশের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তারূপে লাভ করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁহার 'ধর্ম্ম-প্রচারক' পত্রিকা, ব্যাপক ধর্ম্মান্দোলন, অসামান্য বাগ্মিতা, অগণিত হরিসভার স্থাপনা এবং কাশীর ধর্ম্মকেন্দ্র যোগেশ্বরী মঠ সারা দেশে যোগায় বিপুল আত্মিক প্রেরণা। কাশীর স্বামী আনন্দপ্রকাশ, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পরমহংস বালানন্দ স্বামী, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির সহযোগিতায় সনাতন ধর্ম্মের উজ্জীবনের জন্য কৃষ্ণানন্দ যে অবদান রাখিয়া যান, আজো তাহার স্মৃতি দেশের জনমনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

গঙ্গার ঘাটে ধুনি জ্বালাইয়া দয়ালদাস-বাবা সেদিন ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কিছু সংখ্যক ভক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন বাবার ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে সাধু জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণপ্রসন্নের বয়স তখন মাত্র বিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই ভগবৎ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এযাবৎ কত সাধু মণ্ডলীতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কত মহাত্মার শরণ নিতে গিয়াছেন প্রাণের উৎকণ্ঠা নিয়া, কিন্তু বহুবাঞ্ছিত গুরুর সন্ধান আজো তাঁহার মিলে নাই। দীর্ঘ বপু, নিমীলিত নয়ন, ধ্যাননিবিষ্ট দয়ালদাস-বাবার দিকে চোখ পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অন্তরাত্মা

হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'ওরে, এই মহাত্মাই যে তোর পরমাশ্রয়, ইঁহারই চরণে কর্ আত্মসমর্পণ।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বিহ্বলভাবে নীরবে ধুনির পাশে বসিয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই দয়ালদাস-বাবা চক্ষু উন্মীলন করিলেন। গৌরকান্তি উজ্জ্বল নয়ন তরুণ দর্শনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্নের দিকে করিলেন প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার আয়ত নয়ন দুইটিতে, ভক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন চিরতরে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গের আলোচনা চলিল, তারপর দর্শনার্থীরা উঠিয়া গেলে কৃষ্ণপ্রসন্ন মহাত্মার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর্ত্ত স্বরে কহিলেন, "বাবা, ঈশ্বর প্রাপ্তির সঙ্কল্প নিয়ে পাগলের মত আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমায় আশ্রয় দিন, সন্ন্যাসের দীক্ষা দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য।"

অন্তর্য্যামী দয়ালদাস-বাবা জানিতেন, মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন এই গঙ্গার ঘাটেই করিবেন তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। এই নবীন সাধকের প্রতীক্ষায়ই যে এ কয়টি দিন তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছেন।

বাবার সম্মতি পাওয়া গেল। কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার কৃপায় গ্রহণ করিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস, নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

ইহার অব্যবহিত পরেই, দয়ালদাস-বাবা ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া, তাঁহার সাধুমণ্ডলী নিয়া, রওনা দিলেন মহাতীর্থ গঙ্গাসাগরের দিকে।

গঙ্গাসাগর দর্শনের পর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের নানা তীর্থ ও পীঠস্থানে দয়ালদাসজী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সব সময়েই তাঁহার মণ্ডলীর সঙ্গে আসিয়া জুটে নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী, গড়িয়া উঠে এক বৃহৎ জমায়েৎ। এই জমায়েৎ নিয়াই পরমানন্দে তিনি সর্ব্বত্র গতায়াত করেন। যেখানেই যান গৃহস্থ জনসাধারণকে দান করেন বেদান্তের উপদেশ—দান ধ্যান, ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

একবার জমায়েৎ নিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দয়ালদাসজী উপস্থিত হন কপিয়াল গ্রামে, তাঁহার জন্মভূমিতে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর সন্ন্যাসীদের একবার পূর্ব্বাশ্রমের জন্মভূমি ও পিতামাতাকে দর্শন করিয়া আসিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই কপিয়াল গ্রামে সেদিন তাঁহার আগমন। এ সময়ে সঙ্গে রহিয়াছে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী। এই সাধু জমায়েতের আগমনে সারা গ্রামে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। ধনী বণিক এবং সাধারণ গৃহস্থেরা সবাই মিলিয়া এই সাধুদের সেবায় তৎপর হইয়া উঠেন।

নিজের পূর্ব্বাশ্রমের গৃহে উপনীত হইলেন দয়ালদাস। বৃদ্ধ পিতা ইতিপূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননীও এখন বৃদ্ধা, চলৎ-শক্তি রহিত। দয়ালদাস ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম নিবেদন করেন, প্রকাশ করেন আত্মপরিচয়।

এতদিনের পরে পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধা জননীর তাই আনন্দের অবধি নাই। "মেরে ছোটেলাল, মেরে ছোটেলাল" বলিয়া পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে ছোট বালক জ্ঞানে তিনি কত আদর করিতেছেন, কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

জননীর গৃহের প্রাঙ্গণে সেদিন এক বড় সভার আয়োজন হয়। গ্রামেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, শীর্ষস্থানীয় সমাজ নেতারা, সবাই আন্তরিক অভিনন্দন জানান তাঁহাদের গ্রামের পরম গৌরব পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে।

সমাজের মুখপাত্রেরা এই সভায় দয়ালদাস মহারাজকে বলেন, "আমাদের শাস্ত্র মহাপুরুষদের উদ্দেশ ক'রে বলেছেন :

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরেব্রহ্মণি যস্যচেতঃ।

"আপনার সিদ্ধি সমুজ্জ্বল জীবনও তাই আপনার বংশকে পবিত্র করেছে, আমার জননীকে কৃতার্থা করেছে, আর বসুন্ধরাকে করেছে

পুণ্যবতী। আমরাও আপনার স্বজন ও বান্ধব হিসেবে হয়েছি এই পুণ্যের ভাগী।"

দয়ালদাস-বাবাও এই উপলক্ষে সমবেত জনতার কাছে নিবেদন করেন, "আপনারা আজ আমার সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করলেন, তার মূলে রয়েছেন আমার জনক ও জননী। এঁদের পুণ্যফলেই বহুবাঞ্ছিত সন্ন্যাস জীবন আমি লাভ করতে পেরেছি, আর পেয়েছি সমর্থ গুরুর আশ্রয়। জীবন আমার কৃতার্থ হয়েছে। আজ যাঁরা আমায় স্নেহ ভালবাসা জানাতে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য—আপনারা সংসারে রয়েছেন। এখানে মাত্র দুটো লেন-দেনের দিকে সতত দৃষ্টি রাখুন। সদাই নিতে হবে ভগবানের নাম, আর অন্নহীনকে করতে হবে অন্নদান। সতত স্মরণ রাখুন, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই পাওয়া যায় সত্যকার ভোগসুখ, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই আসে ভগবানে অনুরাগ। সংসারের সব বস্তুই অসার, অনিত্য। তা হারিয়ে গেলেই আমরা দুঃখ শোকে অধীর হয়ে উঠি। একমাত্র সারবস্তু ও নিত্যবস্তু, যা কখনো হারায় না, তা হচ্ছেন ভগবান্। এই ভগবানে অনুরাগ এলে তা কখনো নষ্ট হয় না। আর এই ভগবান্‌কে লাভ করলে সেই সম্ভোগ হয়ে থাকে অক্ষয়, অব্যয়। ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেম বলেই তো আজ আমি চরম ও পরম সম্ভোগ খুঁজে পেয়েছি। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, এই বোধ নিয়ে জীবন হয়েছে মধুময়। আপনারা তাই নিত্যকার জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের বোধকেই জাগ্রত ক'রে তুলুন।"

মাতৃভূমি ও মাতার দর্শন সমাপনান্তে দয়ালদাস-বাবা জমায়েৎ সহ আবার বাহির হইয়া পড়েন তাঁহার চিরাচরিত পরিব্রাজনে।

১২৮৬ সালের কথা। হরিদ্বারে সে-বার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলী মেলা প্রাঙ্গণে এক বিরাট সত্র খুলিয়া বসিয়াছে। সাধু মহাত্মা, ভক্ত দর্শনার্থী ও অন্ন-প্রার্থী দীন দুঃখীর ভীড়ে সারা অঞ্চলটি গমগম করি

শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীও এসময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য, মেলায় সমাগত সাধু মহাত্মাদের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ।

গুরু মহারাজের ছাউনিতে আসিয়া, রাজসূয়ের মত দান যজ্ঞের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তো কৃষ্ণানন্দের চক্ষু স্থির। প্রায় এক সহস্র সন্ন্যাসী অবধূত ও পরমহংস সেখানে অবস্থান করিতেছেন। একদিকে অবিরাম চলিয়াছে শাস্ত্রালাপ ও ধ্যান ভজন, আর একদিকে সাধু সন্ন্যাসী ও কাঙালীদের ভোজন পর্ব্ব—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে চারিদিক সরগরম।

কৃষ্ণানন্দ বিস্মিত হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, এই রাজসূয় যজ্ঞের ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি ভাবে? গুরুদেব দয়ালদাস-বাবা তো একটি মুদ্রাও স্পর্শ করেন না, যাচ্‌ঞা করেন না কোন কিছুই। অযাচক ও অনিকেত সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি। তবে কাহারা বহন করিতেছে এই বিপুল ব্যয়ভার? অবশ্য, একথা ঠিক, কল্পতরুর মূলে যিনি সদাই বাস করেন, তাঁহার আর কোন কিছুর অভাব কি? তবে এই অভাব কিভাবে কোন্ অলৌকিক পন্থায় মোচন হইতেছে, সেই প্রশ্নটিই বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে তাঁহার মনে।

করজোড়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। এই বিরাট যজ্ঞের ব্যবস্থা কিভাবে চলছে, কে করছে, বলুন তো?"

দয়ালদাসজী সহাস্যে উত্তর দেন, "দেখো বেটা,—ভজন কর্‌না মেরা কাম, ভোজন দেনা মালিক্‌কা কাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তার সৃষ্ট জীবকে, আশ্রিতকে ভুলে থাকতে পারেন? এমনকি যে নাস্তিক, যে ভগবান্ বিরোধী, তার আহারও যোগাচ্ছেন ভগবান্। কাজেই এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু তো নেই।"

গুরু মহারাজ মুখে যাহাই বলুন না কেন, কৃষ্ণানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিয়াছেন—এসবই তাঁহার নিজেরই ঋদ্ধি-সিদ্ধির ফলশ্রুতি।

দয়ালদাসজী সেদিন কহিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ, যদি পরমাত্মার

কৃপা চাও, অরূপের রূপ দর্শন করতে চাও, সর্ব্বদা মনকে অন্তবৃত্তিশীল করো, ডুবে যাও ধ্যান সমাধির গভীরে।"

আর একদিন কৃষ্ণানন্দকে গুরুজী নিকটে ডাকিলেন, স্নেহভরে নানা সাধন-উপদেশ দানের পর কহিলেন, "বেটা, গঙ্গার ওপারে, পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছেন এক প্রাচীন আত্মজ্ঞানী মহাত্মা। তোমার সঙ্গে আমার এক চেলাকে দিচ্ছি, সে তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। এই মহাত্মার আশীর্ব্বাদ অমোঘ। তুমি আজই তাঁকে প্রণাম নিবেদন ক'রে এসো।"

শিবকল্প মহাপুরুষ নিভৃত গুহায় স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি জানাইলেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ। কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাচ্চা, মানুষেরা ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলেই বস্তু দেখা যায়। আমি বলবো—এটা তাদের ভ্রম। আসল কথাটা কি জানো? যখন আমরা মাতৃগর্ভে থাকি, তখন দুই চোখ মুদিত থাকে, আসল বস্তুর দর্শন তখনই মিলে। জন্ম হবার পর যখন আমরা চোখ মেলে চাই, তখন দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ায় যত অবস্তু, অর্থাৎ, মায়াময় অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চ। মাতৃগর্ভে যে বস্তুকে, যে অরূপকে, যে পরম সত্যকে দেখছিলাম, তা তখন হয় অন্তর্হিত। ভাগ্যগুণে সদ্‌গুরু তোমার মিলেছে, তাঁর কাছ থেকে মায়াবন্ধন কাটবার কৌশল শিখেছো, এবার তাই প্রয়োগ করো তোমার জীবনে। চক্ষু মুদিত করো আর অন্তরের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হও। সেখানেই মিলবে পরম ধন, হবে আত্মসাক্ষাৎকার।"

মহাত্মা নয়ন নিমীলিত করিলেন, মগ্ন হইলেন গভীর ধ্যানে। নীরবে এই শিব স্বরূপ মহাসাধকের চরণে প্রণাম জানাইয়া কৃষ্ণানন্দ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দেহ মন প্রাণ তাঁহার দিব্য অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, অন্তরে জাগিয়াছে পরম প্রশান্তি। মেলার ছাউনিতে ফিরিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুজীর কাছে বিবৃত করেন মহাত্মার উপদেশ বাণীর কথা এবং তাঁহার নিজের আত্মিক উপলব্ধির কথা।

কুম্ভমেলায় ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সাধু-সন্তেরা যেমন আসিয়া জুটিয়াছেন, তেমনি ভীড় জমাইয়াছে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ নরনারী। সবাই পুণ্যস্নান সমাপন করে, আর দলে দলে উপস্থিত হয় উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মাদের তাঁবু ও ছাউনিতে। সেদিন একদল ভক্ত গৃহস্থ দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে আসিয়া হাজির। বাবার শ্রীমুখের দুই চারিটি কথা না শুনিয়া তাহারা সেখান হইতে উঠিবে না।

বৈরাগ্য ও নিত্যানিত্য বস্তু বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান সোপান—এ কথাটি নানাভাবে নানা সময়ে দয়ালদাসজী তাঁহার ভক্ত দর্শনার্থীদের এ যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ঐসব উপদেশ ও বাণী সঙ্কলন করিয়া শিষ্যেরা 'বিচার-সাগর' নামক একটি হিন্দি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে উল্লেখিত দুই চারিটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, "আজকাল একটা কথা শুনা যায়,—জনকের মত যোগ ভোগ দুই-ই করো। এসব শূন্য গর্ভ বচনে কোন ফলোদয় হয় না। জনক হওয়া মানে দেহাত্মবোধ শূন্য হওয়া। সে যে কঠোর-সাধন সাপেক্ষ। একটি কথা তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, দেহ সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের জন্ম, মরণ, ভোগ, রোগ প্রভৃতি দুঃখের কারণ। দেহ সংযোগ থেকেই বার বার উৎপত্তি হচ্ছে তার বাসনা এবং এই দেহ সম্বন্ধ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি মমত্ব বুদ্ধি। ফলে চারদিকের মায়ার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে। এই দেহের প্রতি অনাস্থাভাব জাগিয়ে তোল, তা হলে দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পদার্থের উপরই স্বাভাবিকভাবে বিরাগ এসে পড়বে, বন্ধন খসে পড়তে থাকবে। বিচারশীল হও, আর ধ্যান মননের অভ্যাস দ্বারা মনকে ক'রে তোল অন্তর্ম্মুখীন। তার ফলে, এই দেহটি সম্বন্ধে মনে হবে—এটি ইহজীবনের এক অস্থায়ী আবাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই চিন্তা জাগলে দেহের প্রতি মমত্ব হ্রাস পায়, সঙ্গে সঙ্গে এই দেহ সংশ্লিষ্ট বিত্তবিভব, স্ত্রী ও বিলাস উপকরণের বাসনাও শিথিল হয়ে পড়ে।

"আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা।

ব্রহ্মচারী জীবনে বিষয় সংস্রব থেকে মানুষ দূরে থাকতো, সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হতো। তারপর গার্হস্থ্য জীবনের জন্য ছিল দান, যজ্ঞ ও দম বা ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যবস্থা। এ সবের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ভোগাসক্তি কমে আসতো, হতো বৈরাগ্যের উদয়। তারপর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি হ'লে সংসার ছেড়ে দিয়ে আরণ্যক জীবন তারা যাপন করতো, তারপর কেউ কেউ গ্রহণ করতো সন্ন্যাস। আজকাল মানুষের জীবনে এই চতুরাশ্রমের প্রস্তুতি দেখা যায় না। যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য অবধি সবাই ভোগসুখে মত্ত থাকে। তার ফলে ভোগ সামর্থ্য চলে গেলেও ভোগাসক্তি দূর হয় না।

"যুগের হাওয়া যত উল্টেই যাক, ঋষি ঋণ, দেব ঋণ আর পিতৃ ঋণ শোধ না ক'রে কিন্তু কারুর মুক্তির সম্ভাবনা নেই। গুরু সেবা, শাস্ত্রাভ্যাস, আত্মসংযম ও বীর্য্যধারণ ক'রে ঋষিদের সন্তুষ্ট করতে হবে। দেবতাদের প্রসন্ন করতে হবে দান, ব্রত ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা। আর ভোগাসক্তি বর্জ্জন ক'রে, ধর্ম্মধৃত জীবন যাপন ক'রে, সুপুত্র উৎপাদন ক'রে শোধ দিতে হবে পিতৃপুরুষের ঋণ।"

অতঃপর দয়ালদাসজী সমবেত সাধু-সন্ত এবং গৃহস্থ ভক্ত সবাইকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সৎ-চিৎ আনন্দময় আত্মা থেকে আমরা সবাই জন্মেছি, আত্মাতে বিধৃত রয়েছে আমাদের এই জীবন। আবার সেই আত্মাতেই আমরা সবাই ফিরে যাবো, লীন হয়ে যাবো। এই আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু। শ্রুতির কথা সদাই করবে স্মরণ মনন অনুধান—'তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরম্ যদয়মাত্মা।'—আত্মা পুত্র থেকে প্রিয়, ধন থেকেও প্রিয়, অপর সমস্ত প্রিয় বস্তু থেকেও প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এই আত্মার সাক্ষাৎকারই তোমাদের জীবনের পরম কাম্য হয়ে উঠুক, এই আশীর্ব্বাদ আমি সবাইকে করছি।"

সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীরা মহাত্মার এই স্নেহপূর্ণ ভাষণে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বার বার উঠিতে থাকে জয়ধ্বনি—'জয় বাবা দয়ালদাস মহারাজ কি জয়!'

হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় আসিয়া শিষ্যপ্রবর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী পরমানন্দে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন সাধনপথের বহুতর নিগূঢ় নির্দ্দেশ। মুঙ্গের হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন দুইটি সাধু এবং অন্নদা নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। শহরের একটি ভিন্ন আস্তানায় তাঁহারা তিনজন অবস্থান করিতেছেন। সেদিন মেলা-ক্ষেত্রে সাধুদের ছাউনিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অন্নদাবাবু ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে কোথায় তিনি তলাইয়া গেলেন। দুই দিন ঘোর দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আশ্রয় ও আহার জুটিতেছে কিনা, তাছাড়া তিনি বাঁচিয়াই আছেন কিনা, তাহাই বা কে বলিবে? অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণানন্দ ভাবিলেন, গুরু মহারাজ অন্তর্য্যামী, তাঁহার কাছেই এ বিপদের কথা বলিবেন, বন্ধুটির সন্ধান জানিয়া নিবেন।

কিন্তু দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভের পর কৃষ্ণানন্দ এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বহুতর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সেখানে চলিতেছে। তিনি ভাবিলেন,—'আমাব কি ভ্রান্ত বুদ্ধি, গুরু মহারাজের কাছে এসে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো, জীবন সমস্যার সমাধান জেনে নেব, তা নয়, কে কোথায় হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছি।' এবার তাই শান্ত মনে ধর্ম্মালাপে নিবিষ্ট হইলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ কৃষ্ণানন্দের মনে পড়িল অতীতের একটি ঘটনা। সে-বার গুরুদেব মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, তাঁহার একমাত্র পুত্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন না। গুরুদেবের প্রাণ গলিয়া গেল, আর্ত্ত ভদ্রলোকটিকে হারানো পুত্রের সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই পিতা পুত্রের মিলন ঘটিল।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের মনে চিন্তার ঝলক খেলিয়া যায়, 'অচেনা এক

দর্শনার্থীকে কৃপালু গুরুজী তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। আর আমি তাঁর প্রিয় শিষ্য—আমার অন্তরের দুঃখ কি তিনি বুঝবেন না? গুরুজী অন্তর্যামী এবং মহা শক্তিধর মহাত্মা। অন্নদাবাবুর জন্য আমি যে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছি, তা নিশ্চয়ই তিনি উপলব্ধি করছেন। একটা কিছু তিনি করবেনই।'

এমন সময়ে দয়ালদাস-বাবা হঠাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "বেটা, তুমি কোন্ পথ দিয়ে আমার ছাউনিতে এসেছো? এবার ফিরবেই বা কোন্ পথে?"

"বাবা, কনখলের পথ ঘুরে সাধুদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমি এসেছি। সেই পথেই বাসায় ফিরবো বলে ভাবছি।"—নিবেদন করেন কৃষ্ণানন্দ।

"না বেটা, তুমি ও পথ দিয়ে যেয়ো না। সামনের নৌসেতু পার হয়ে ভীমগড়া দিয়ে চলে যাও।"

"বাবা, ও পথটা আমি চিনিনে। তাই ভাবছি—"

"না-না, বেটা ঐ পথেই তুমি অবশ্য যাবে। পথ না চিনলে কি আসে যায়? একটু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নিও।"

গুরু মহারাজের এই আদেশ কৃষ্ণানন্দ শিরোধার্য্য করিলেন, ভীমগড়ার পথ ঘুরিয়াই চলিলেন নিজ বাসস্থানের দিকে। কিছুটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, বন্ধু অন্নদা উদ্‌ভ্রান্তের মত পথের পাশে বসিয়া আছেন। শরীর তাঁহার অসুস্থ ছিল, তারপর লোকের ভীড়ের চাপে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। এই দুইদিন অবর্ণনীয় কষ্টে তাঁহার কাটিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে দেখা মাত্র ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরেন, সন্তর্পণে তাঁহাকে বাসায় নিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এবার বুঝিলেন, বিপন্ন অন্নদাকে উদ্ধার করার জন্যই অন্তর্যামী গুরুদেব ভীমগড়ার পথ সম্পর্কে এত জেদ করিতেছিলেন।

দয়ালদাস-বাবার আশ্রয় নিবার পর হইতে অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেও কৃষ্ণানন্দ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। বাবাও এই নবীন তপস্বীকে সদ্‌গুরু মহিমা উপলব্ধি করানোর জন্য মাঝে মাঝে প্রয়োগ করিতেন নিজের অলৌকিক শক্তি।

কুম্ভমেলা তখন ভাঙিয়া গিয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীরা সবাই দলে দলে হরিদ্বার ত্যাগ করিতেছেন। তখনকার দিনে হরিদ্বার অবধি ট্রেন হয় নাই। গরু ঘোড়া বা উটের গাড়ী নিয়া সাহারাণপুরে গিয়া যাত্রীরা ট্রেন ধরিত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সহযাত্রীরা যান-বাহন কেন্দ্রে আসিয়া দেখিলেন, সব গাড়ীই ভাড়া হইয়া গিয়াছে। একখানিও অবশিষ্ট নাই। অথচ সেইদিনই রওনা না হইলে কোন কোন সহযাত্রীকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। এ সময়ে পদব্রজে সাহারাণপুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। সঙ্গীরা সবাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন।

অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণানন্দ স্মরণ করিলেন গুরু মহারাজকে। ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, জীবনের যেকোন সমস্যার জন্যই যে শ্রীগুরুর কৃপার উপর তিনি নির্ভর করিয়া আছেন। অচিরে দয়ালদাস-বাবার প্রেমঘন মূর্ত্তিটি তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল, দুশ্চিন্তার মেঘ এক নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল। সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়া তিনি কহিলেন, "আপনারা সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর ভাববেন না। অচিরে এ বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো।"

সহযাত্রীরা তাঁহার কথা শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে এক অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণানন্দকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায়ই বা যাবেন, বলুন তো?"

উত্তর হইল "মুঙ্গের থেকে এসেছি, যেতে চাই সাহারাণপুরে। কিন্তু কোন গাড়ী আমরা যোগাড় করতে পারিনি।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। বিকেল চারটায় আমি গাড়ী নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য।"

যথা সময়ে ভদ্রলোকটি একটি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়া সেখানে উপস্থিত হন, কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের অতি যত্ন সহকারে তাহাতে তুলিয়া দিয়া রওনা করেন সাহারাণপুরের পথে।

কোথা হইতে কেন এই অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আবির্ভূত

হইলেন, কেনই বা গ্রীষ্মের গরমে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহা রহস্যময়।

কৃষ্ণানন্দ কিন্তু উপলব্ধি করিলেন, কৃপালু গুরু মহারাজের অদৃশ্য হস্তটি সঞ্চালিত হইয়াছে এই আগন্তুকের মধ্য দিয়া, নির্ভরশীল শিষ্যকে তিনিই আজিকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া সে-বার কৃষ্ণানন্দ বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতেছেন। বাড় নামক স্টেশনে তাঁহাকে গাড়ী বদলাইতে হইবে। এ কয়দিন দীর্ঘ রেলপথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীর বড় ক্লান্ত। ইতিমধ্যে কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলেন, ট্রেনটি ধীরে ধীরে একটি স্টেশন ত্যাগ করিতেছে। সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এটি বাড় স্টেশন এবং ত্রিহুত অঞ্চলে যাইতে হইলে এখানেই গাড়ী বদল করিতে হয়।

কৃষ্ণানন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বরে নির্গত হইল, "হায় গুরুদেব, একি বিপদে আমি পড়লাম। বদল না করতে পারলে অনেক ঘুরে আবার এ পথে আমায় ফিরতে হবে, অনেক কিছু জরুরী কাজ হয়ে যাবে বানচাল।"

কি আশ্চর্য্য। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল এঞ্জিনের একটা ভয়ঙ্কর শব্দ, এবং গাড়ীটিও ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। তখন অবধি কিন্তু উহা প্ল্যাটফরমের সীমানা ত্যাগ করে নাই। এই সুযোগে কৃষ্ণানন্দ মালপত্র নিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গার্ড ও ড্রাইভারদের মধ্যে ততক্ষণে ছুটাছুটি শুরু হইয়া গিয়াছে। কয়েক মিনিট পরে এঞ্জিন ঠিক করিয়া নিয়া গাড়ীটি আবার ধাবিত হয় গন্তব্য পথে। কৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, গাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে তাঁহার গুরু মহারাজেরই করুণা লীলা। শিষ্যের ক্লেশ নিবারণের জন্যই যোগবিভূতি আজ এই সময়ে তিনি প্রকটিত করিলেন। তাছাড়া, এই ঘটনার মধ্য দিয়া শিষ্যের হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দিলেন তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্যের স্বরূপটি।

কয়েক বৎসর পরের কথা। পরমহংস দয়ালদাস-বাবা সে-বার তাঁহার মণ্ডলী নিয়া পদব্রজে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ তিরুপতিতে চলিয়াছেন বালাজী বিগ্রহ দর্শনের জন্য। তাঁহার ঋদ্ধি সিদ্ধির প্রসিদ্ধি ইতিমধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাই অপর সম্প্রদায়ের বহু সাধুও তাঁহার সঙ্গ নিয়াছেন। ফলে পরমহংসজী একটি বড় জমায়েৎ নিয়াই পথ চলিতেছেন।

সেদিন কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা দিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। লোকালয় এদিকে খুব বেশী নাই। দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীদের ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার গ্রামের লোকেরা সজ্জন, সাধুদের জন্য তাঁহারা ভাণ্ডারা দিয়াছে। তোমরা সবাই আজ ভাল ক'রে ভোজন সেরে নাও। আগামী কাল অন্ন মিলবে না।"

ঠিক তাহাই ঘটিল। পরদিন গহন অরণ্য পথে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ মিলিল না। সারা দিনের পথ চলার পর সাধুরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও সবাই কাতর। তাঁহাদের মলিন মুখ দেখিয়া দয়ালদাসজী তাঁহার ধ্যানাসনে গিয়া বসিলেন। ব্রহ্মলীন গুরুদেব ঠাকুরদাস মহারাজকে মনে মনে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "বাবা, এতবড় একটা সাধু জমায়েৎ আমার সঙ্গে আজ চলছে, অথচ আহার্য্য সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা নেই। এরা সবাই যে আমার উপরই নির্ভর ক'রে আছে। তুমি কৃপা ক'রে এর একটা বিহিত করো।"

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাসজীর মাননপটে ভাসিয়া উঠিল একটি বিরাট বৃক্ষ, উহার শাখায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে সুস্বাদু ফল।

আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি সেবক শিষ্যদের বলিলেন, "তোমরা আশেপাশে শিগ্‌গীর একটু তল্লাসী চালাও তো। আজ বৃক্ষই হবেন আমাদের ভোজন দাতা। ছাখো কোথাও কোন বৃক্ষে সুপক্ক ফল রয়েছে কিনা।"

খোঁজাখুঁজি তখনই শুরু হইয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ দূরে সন্ধান মিলিল একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষের, সত্যই অজস্র সংখ্যক পাকা ফল উহাতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীরা ঐসব আম্র ভোজন করিয়াই সেদিন ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিলেন।

সাধুরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, এই আম্র ফলিয়াছে নিতান্ত অসময়ে। তাছাড়া, এই বিরাট বনে একটি ছাড়া আর কোন আম্রবৃক্ষ বর্ত্তমান নাই। সকলেই বুঝিয়া নিলেন, ইহা পরমহংস দয়ালদাসজীর যোগবিভূতিরই এক নিদর্শন।

পরমহংস দয়ালদাস-বাবা তাঁহার জমায়েৎ নিয়া কয়েকটি তীর্থ ঘুরিয়াছেন। এবার রওনা হইয়াছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে। পদব্রজে সবাই চলিয়াছেন। একটি দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করার পর সূর্য্য অস্তমিত হইল। নিকটে কোথাও গৃহস্থদের গ্রাম নাই যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাইবে। পথে কেবলি পড়িতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আর কণ্টক ও প্রস্তরময় দুর্গম পথ। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময় রাত্রি, তদুপরে আকাশ ব্যাপিয়া শুরু হইয়াছে মেঘের ঘনঘটা। জমায়েতের সাধুরা অতি কষ্টে দুর্গম পথ দিয়া চলিয়াছেন, কাঁটা ও প্রস্তরের ঘায়ে অনেকেরই পা হইয়াছে ক্ষত বিক্ষত। অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় পথের নিশানা বার বার ভুল হইতেছে; সাধুরা মাঝে মাঝে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরও বিপদে পড়িতেছেন। এই ঘোর বিপদে সবাই দয়ালদাস-বাবার কাছে মিনতি জানাইতে থাকেন, "বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকেও একি সঙ্কটে আজ আমরা পড়েছি! একেই দেহ পথ-শ্রমে অবসন্ন। তার ওপর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে শোনা যাচ্ছে মেঘের গর্জ্জন। আপনি আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন।"

"তোমরা সাধু, সব কিছু ভার পরমাত্মায় ন্যস্ত করেছো। তোমরা বিপদের মুখে এমন অধীর হবে কেন? পরমাত্মাকে ডাকো, কৃপা তিনি অবশ্যই করবেন।"—নির্ব্বিকার চিত্তে প্রশান্ত কণ্ঠে দয়ালদাসজী কথা কয়টি বলিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল বিপদভঞ্জন পরম প্রভুর কৃপা-সঙ্কেত।

"অকস্মাৎ সাধুগণ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল, এবং প্রায় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল, যেন একজন স্থুল কলেবর উলঙ্গ পুরুষ হস্তে প্রদীপ্ত মশাল লইয়া নাচিতে নাচিতে মণ্ডলীর অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, আর একজন কৃষ্ণবর্ণা

বিবসনা নারী তাঁহারই তালে তালে নাচিতে নাচিতে তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। সাধুগণ আলো দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন; ঐ আলোকের ছটায় পথ দেখিয়া মশালধারীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ এই আলোকের ছটায় সাধুগণ অক্লেশে গমন করিলেন। তাহার পর অকস্মাৎ আলোটি নিবিয়া গেল। যিনি কৃপা করিয়া আলো দেখাইতেছিলেন, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। দিগম্বরী নারীও কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

"সাধুগণ দেখিলেন, তাঁহারা একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তথায় থাকিবার আশ্রয় পাইলেন, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

"নির্ব্বিঘ্নে সাধুগণ গ্রামে পৌঁছিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ,—আলো ধরিয়া আসিল কে ?

"স্বামীজী বলিলেন, 'তোমরা কি চিনিতে পার নাই? সাধুগণ কাতর হইয়া ডাকিলে যিনি অভয় দান করিয়া থাকেন, ভক্ত ডাকিলে যিনি ভক্তের দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না, এ যে সেই হরপার্ব্বতী। সাধুদিগের হৃদয় ভক্তের সখার অতুল কৃপার পরিচয় পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইল[১]।"

পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল পরমহংস দয়ালদাসজীর গুরু-স্থল এবং জন্মস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবে বহু পাঞ্জাবী সাধক তাঁহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মণ্ডলীতে আসিয়া আশ্রয় নিত, সন্ন্যাস দীক্ষা নিত তাঁহার নিকট হইতে।

মণ্ডলী সঙ্গে নিয়া দয়ালদাস মহারাজ সেবার কিছুদিনের জন্য লাহোরে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তর চলিতেছে। নবাগত সন্ন্যাসী কহিলেন, "বাবা, আমরা শুনেছি, আপনি অপনার গুরুর কাছে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, আবার বেদান্তের আত্মতত্ত্বও হয়েছে পরিজ্ঞাত। আজকাল তো আপনি বেদান্ততত্ত্বের শিক্ষাই বেশী দিয়ে থাকেন। সাধন পথের

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : শ্রীমৎ আনন্দ স্বরূপ

আমরা নূতন পথিক। কৃপা ক'রে আমাদের বলুন, কোন্ পথ আমরা অনুসরণ করবো।"

বাবা উত্তরে কহিলেন, "আমার ওপর আমার গুরুর কৃপা ছিল অপরিমেয়। তিনি সর্ব্ব সাধনায় পারঙ্গম ছিলেন, সর্ব্ব দর্শনে ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। বালক কালে যোগসাধনা ও যোগসিদ্ধির উপর আমার প্রবণতা দেখে, সেই পথেই আমায় করেছিলেন তিনি সিদ্ধকাম। তারপর বেদান্তের আত্মজ্ঞানের পরম পথটি আমায় তিনি প্রদর্শন করেন, তাঁর কৃপায় জীবন আমার ধন্য হয়। আমি নিজে সাধনার সব পথ অনুসরণ করেছি, অনেক কৃচ্ছ্র, অনেক তপস্যা করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, আজকের দিনের মানুষের পক্ষে যোগ সাধনার পথ বড় কঠিন। বরং সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে থেকে তারা চিত্তের মল অপসারণ করুক নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার করে আত্মাকে উপলব্ধি করুক। তাই হবে তাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল সাধনা। এই জন্যই সর্ব্ব সাধারণের কাছে বেদান্তের উপদেশই আমি দিই।"

নবীন সন্ন্যাসীদের অনুরোধে বাবা বেদান্তের কয়েকটি মূলতত্ত্ব এ সময়ে বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু বেটা, তোমরা গৃহস্থ নও, সন্ন্যাসী। মোক্ষের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছো। একটা কথা মনে রেখো। শুধু বেদান্ত শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার ত্বরান্বিত হবে না। এজন্য চাই নিত্য অভ্যাস, নিত্য নিদিধ্যাসন। জানতো, বিবেক চূড়ামণি বলেছেন,

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্॥

—বেদান্ত শ্রবণ অপেক্ষা মনে মনে বেদান্তসিদ্ধান্তের চিন্তন করার ফল শতগুণ বেশী, তা অপেক্ষা লক্ষগুণ ফলপ্রদ হচ্ছে আত্মায় নিদিধ্যাসন অভ্যাস করা, পরমাত্মায় প্রলীন হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাওয়ার ফল হচ্ছে অনন্তগুণ।

"অপোরোক্ষানুভূতি-তেও রয়েছে সেই একই কথা।—প্রতিনিয়ত নিদিধ্যাসনের অভ্যাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না।

"হাঁ, বেটা, তোমার কন্যা হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, পূর্ব্ব জন্মে সে ছিল যোগভ্রষ্টা সাধিকা। এ জন্মের গোড়াতেই তার পূর্ব্ব স্মৃতির কিছুটা উদয় হয়েছে, পূর্ব্বের যোগসিদ্ধির অনুভূতিও স্ফুরিত হবার অবকাশ খুঁজছে। তোমার কন্যা উন্মাদ নয়, সে ভুগছে যোগজ ব্যাধিতে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আজ থেকে সে ভাল হয়ে উঠবে, খুঁজে পাবে সে নিজ সাধনার ভিত্তিভূমি।"

আর্ত্ত জাঠ ভক্তটির হৃদয় হইতে পাষাণ ভার নামিয়া যায়। করজোড়ে সে নিবেদন করে, "মহারাজ, আপনার অসীম কৃপার কথা এতদিন লোক মুখে শুনে এসেছি, এবার তা নিজে অনুভব ক'রে ধন্য হলাম। মহারাজ আর একটু কৃপা এ অধমকে করুন। আপনার চরণামৃত আমায় দিন, গোছীগাঁও-এ ফিরে গিয়ে আমার কন্যাকে তা পান করাবো।"

"বেটা, তার কোন আবশ্যক নেই। তবে একটা কাজ তুমি করবে। তোমার গৃহে একটি ছোট শিবমন্দির তৈরী ক'রে দাও, তোমার কন্যা শিব বিগ্রহের পূজো ও জপধ্যান নিয়ে থাকুক। আমি আবার আশীর্ব্বাদ করছি। তাঁর পূর্ব্ব জন্মের সাধনা এবার সার্থক হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে এগিয়ে যাক্।"

ভক্ত জাঠটি আনন্দে বাবার এই নির্দ্দেশ মানিয়া নেয়। তারপর বহু কাকুতি মিনতির পরে দয়ালদাস মহারাজের চরণামৃত সে সংগ্রহ করে, রওনা হয় স্বগ্রামের দিকে।

"অন্নদানে বাবা দয়ালদাসের ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে তিনি শুধু একবার সেই সমস্ত স্বয়ং দর্শন করিতেন ও সদ্গুরুর কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক সাধুদিগকে পরিবেশন করিবার অনুমতি দিতেন। জানা নাই শুনা নাই, অনাহূত, রবাহূত কত লোকই যে ভোজন করিতে বসিত তাহার সীমা নাই। কিন্তু কখনও কোন দিনও স্বামী দয়ালদাসের ভাণ্ডারে অন্নের ন্যূনতা হয় নাই। একবার হৃষীকেশে সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অন্ন প্রস্তুত ছিল, তদতিরিক্ত অন্যূন আট শত সাধু উপস্থিত হইলেও সেই অন্নেই সকলের পরিপূর্ত্তি হইয়াছিল, বরং কিছু অন্ন উদ্বৃত্তও ছিল।

"তিনি যে তীর্থে বা যেখানে যাইতেন, তাঁহার নাম শুনিলেই দোকানদারগণ তাঁহার মণ্ডলীর জন্য যত দ্রব্য আবশ্যক হইত সমস্তই সরবরাহ করিত। মূল্য কে দিবে, দোকানদার তাহা কখনও জিজ্ঞাসা করিত না। কোন চিঠা নাই, পত্র নাই, স্বামী দয়ালদাসের নাম শুনিলেই দোকানদার দ্রব্য দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিন হাজার, চার হাজার টাকার সামগ্রী দিল, তবু দোকানদার টাকার তাগিদ করিত না। তাহারা জানিত, স্বামীজী সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কেহ না কেহ সেই টাকা পরিশোধ করিবেই করিবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিত। তজ্জন্য স্বামীজীকে বা দোকানদারকে কোন চিন্তাই করিতে হইত না।

"১২৯৭ সালের হরিদ্বার কুম্ভমেলার শেষে যখন স্বামীজীর মণ্ডলীর স্থানান্তরে যাওয়া স্থির হইল, তখন মণ্ডলীর একজন সাধু আসিয়া বলিলেন যে, দোকানদার প্রায় সাত-আট হাজার টাকার সামগ্রী যোগাইয়াছে, ভক্তগণ প্রায়ই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও আটশত টাকা তাহার বাকী আছে।

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন,—তজ্জন্য তুমি উদ্বেগ করিও না, এ ঋণ পরিশোধ করিয়া তুমি দুইশত উদ্বৃত্ত দেখিতে পাইবে। সাধু নীরব রহিলেন।

অন্তর্য্যামী সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? তাহার পরিদিন কোথা হইতে একজন ধনাঢ্য ভক্ত আসিয়া স্বামীজীর চরণে এক হাজার টাকা ভেট দিয়া প্রণাম করিলেন, সকল লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। দোকানদারের আটশত টাকা পরিশোধ হইয়া সাধুদের জন্য দুইশত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল।[১]"

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রথা নাই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। সেবকেরা জানাইলেন, "বাবা, এই উদ্বৃত্ত দুইশত টাকা নিয়ে কি করা হবে, আপনি নির্দ্দেশ দিন।"

ভিন্ন মণ্ডলীর কয়েকটি প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী দূর দেশ হইতে মেলায় আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে।

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ।

দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কাছে ডাকাইলেন, শিষ্যদের আদেশ দিলেন, "উদ্বৃত্ত টাকা সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই সাধুদের ট্রেনভাড়া ও-থেকে দিয়ে দাও। তারপরে যে কটি টাকা বাঁচবে, তা দিয়ে ওদের দু'একটি শাস্ত্রগ্রন্থ আর বহির্ব্বাস কিনে দাও· সব ল্যাঠা চুকে যাক্।"

রাজপুতানা আলোয়ারের প্রসিদ্ধ মোহান্ত বাবা ভগবান্দাসজী এক সময়ে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সে-বার কুরুক্ষেত্রে এক এক বিরাট ধর্ম্মমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। দয়ালদাসজীও সেখানে তাঁহার মণ্ডলী ও আশ্রিত সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত।

সাধু, দর্শনার্থী ভক্ত ও কাঙালীদের ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। রোজ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অন্নদান করা হইতেছে। এই সময়ে ভাণ্ডারার সব ভার ছিল বাবা ভগবান্দাসজীর উপর। মেলা শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল, ধনী শেঠ ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে এবং দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা সবটা তখনও শোধ করা যায় নাই। দুই হাজার টাকার উপর দেনা রহিয়া গিয়াছে। অথচ দুই একদিনের মধ্যে তাঁবু ভাঙিয়া দেওয়া হইবে।

ভগবান্দাসজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাই দয়ালদাসজীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "মহারাজ, আমাদের সবাইকে তো এবার এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দোকান বাকীর টাকার তো কোন ব্যবস্থা নেই। কি উপায় হবে?"

"টাকাটা এখানে ব্যয় করা হয়েছে কেন? সাধুদের জন্যই তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমি তো আমার বেটা বেটীর বিয়ের জৌলুষে খরচ করিনি? তুমি এতো দুশ্চিন্তায় পড়েছো কেন? সদ্গুরু সব সময়েই এ সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, প্রতিদিন তা প্রত্যক্ষও ক'রছো। তবে এই চিত্তচাঞ্চল্য কেন?"

দুই দিন পরেই দেখা গেল, এক সিন্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। দয়ালদাস-বাবা এখনো মেলা-ক্ষেত্রে রহিয়াছেন শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই শেঠ দুই হাজার টাকার একটা পুঁটুলী বাবা মহারাজের চরণতলে রাখিয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ দয়ালদাস-বাবা ভাণ্ডারার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ভগবান্‌দাস-জীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "এই নাও বেটা, সদ্‌গুরু কৃপা ক'রে এই টাকা আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা এখনি পরিশোধ ক'রে দাও। তারপর আমিও মণ্ডলী নিয়ে অন্যত্র রওনা হই।"

এই কুম্ভমেলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ সাধক, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় লিখেন :

"এই মহামেলায় রাজা রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্ন্যাসী সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়া বোধ হইল। আখড়াধারী মোহান্ত-গণের সাজসজ্জা প্রধান প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক জাঁক-জমকের। হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী, ভেরী প্রভৃতির তুমুল ব্যাপার, এবং প্রত্যেক আখড়ার সহস্র সহস্র সাধু, গৃহস্থ অভ্যাগতের অবিরত অন্নদান দর্শনে আমাদের হৃদয় উৎসাহ ও উল্লাসযুক্ত হইল। নাগা, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, উর্দ্ধবাহু, নখী, ঠারেশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, শরশয্যী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, অন্তঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভূখড় কুখড়, উখড়, ঘরবড়া, স্বর্ভঙ্গী, দশনামীসন্ন্যাসী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, অবধূত, ব্রহ্মচারী হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধারী, কাণফাটা যোগী আদি কত শ্রেণীর কত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী যে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল। চক্ষু সফল ও মানবজন্ম পবিত্র হইল।

"এই মহা মহর্ষি মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তির ফোয়ারা ছুটিতেছে দেখিতে পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলাখেলা আর

ভাল লাগে না, জীবের বৃথা মান অভিমান যেন কোথায় পলায়ন করে।

"এবারে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া আর একটি অলভ্য লাভ হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের সুযোগ্য দীক্ষাগুরু শ্রীমদবধূত দয়ালদাস স্বামীজী মহারাজের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি সমস্ত জনতার প্রান্তবর্ত্তী নির্ম্মল সৈকতভূমিতে, তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে আসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শত শত পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটিরে আসন করিয়া বাস করিতে-ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং গম্ভীর প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। বহুদিনের পর তিনি তাঁহার দিগ্দেশ বিখ্যাত সুযোগ্য শিষ্য কুমার পরিব্রাজককে (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং বহু শাস্ত্রবেত্তা অন্যান্য সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন।

"স্বামীজীর মণ্ডলীতে আমরা কয়েকদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম। যখনই যাই, তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, ত্যাগী, সংযোগী, স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। তাঁহার মহত্ব, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার সদয় ভাব দর্শন করিয়া শত শত শির তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে যিনি কাহারও বাটিতে গমন করেন না, তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহ অন্যূন চারি সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, দুঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তুক, অভ্যাগত, পুরী মালপোয়া মোহনভোগ অন্নব্যাঞ্জনাদি তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেছে। দুই বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত। কিছু বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতেছে। তাঁহার জ্ঞানগম্ভীর ও প্রেমপূর্ণ বাণী যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ মন খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ধন্য তাঁহার তপঃশক্তি, ধন্য তাঁহার ভগবদ্ভক্তি।

যখনই যাই তখনই দেখি তাঁহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, না হয় ভগবদ্‌ভজন, সংকীর্ত্তন না হয় সদ্বার্ত্তালাপ হইতেছে। মুহূর্ত্তমাত্র তথায় সময় অপব্যয়িত হয় না।”

১৩০০ সালের ভাদ্র মাস। দয়ালদাস মহারাজ এই সময়ে কয়েকদিনের জন্য বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছে প্রায় তিনশত সাধুর এক বিরাট দল। অসি ঘাটের নিকটে এক আম্রকুঞ্জে তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের জন্য ভীড় করিয়াছে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী। কেহ তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া অর্থ দিতেছে, কেহ দিতেছে বস্ত্র, ফলমূল ও মিষ্ট দ্রব্যাদি। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ এই সব ভেটদ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীনদুঃখীদের মধ্যে।

এই সঙ্গে সমাগত সাধু সজ্জন ও গৃহস্থদের দিতেছেন তিনি শাস্ত্রের উপদেশ। বার বার কহিতেছেন, “দুঃখের চিরনিবৃত্তি যদি চাও, সত্যকার আনন্দ যদি লাভ করতে চাও, তবে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করো, ভোগসুখকে দাও দূরে সরিয়ে। সদাই স্মরণে রাখো ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’—এই পরম তত্ত্ব। তুমি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নও। বাসনা আর মায়া মমতার ফলে চিত্তে তোমার মল জমে গিয়েছে। ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধনা ক’রে, নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার ক’রে এই মলকে দূরীভূত করো, পরম চৈতন্যময় আত্মসূর্য্য ভাস্বর হয়ে উঠবেন তোমার সাধনসত্তায়।”

ভক্ত দর্শনার্থীরা বিস্মিত হইয়া দেখে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে শুধু তাঁহার অনুগামী শিষ্যেরাই নয়, অপর সম্প্রদায়ের সাধুরাও পরম আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের এই সব সাধু সন্ন্যাসীরা দয়ালদাসজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার দিব্য সঙ্গ লাভের জন্য তাঁহারা এত ব্যাকুল। দয়ালদাসজীও এই সাধুদের ভালবাসেন নিজের মণ্ডলীর শিষ্য ভক্তদের মত।

দয়ালদাস-বাবার স্বনামধন্য বাঙালী শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্থায়ী বাসস্থান বারাণসীতেই। আরাধ্য গুরুদেবের আগমনে তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। প্রতিদিনই অসিঘাটের বাগানে গিয়া তিনি গুরুদেবের চরণ দর্শন করেন, তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের তত্ত্বালোচনা শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী মন্দিরের তখন খুব সুনাম। বহু ভক্ত ও সাধনার্থী সেখানে যাতায়াত করে, সাধক ও ধর্ম্মবক্তা কৃষ্ণানন্দের উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্ম-জীবন গঠন করিতে প্রয়াসী হয়। নিজের মণ্ডলীসহ দয়ালদাসজী একদিন যোগেশ্বরী মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, কৃষ্ণানন্দের অনুরোধে সমাগত ভক্ত নরনারীকে দান করেন সাধন-উপদেশ।

সেদিন বারাণসীর কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত দয়ালদাস-বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইঁহাদের একজন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ আপনি কোন্ স্বামী ?"

প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য—দয়ালদাসজী দশনামী সন্ন্যাসী স্বামীদের কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তাহা জানিয়া নেওয়া।

দয়ালদাস-বাবা সহাস্যে উত্তর দেন, "আমি শুধু স্বামী নই, আমি—দাস স্বামী।

"এ কি কথা আপনি বলছেন, মহারাজ ? সন্ন্যাসী তো কখনো 'দাস হন না। সবাই তাঁহাদের জানে 'স্বামী' ব'লে।"

"পণ্ডিতজী, তবে শুনে রাখুন, সন্ন্যাসী মাত্রেই যেমন স্বামী, তেমনি তাঁরা দাসও বটেন।"

"এ বড় অদ্ভুত কথা। এর তাৎপর্য্য তো আমরা বুঝতে পারছিনে, মহারাজ।"

"অদ্ভুত নয় পণ্ডিতজী, এটা যে পরম সত্য কথা।"

"একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন কি ?"

"তবে শুনুন। নিজ নিজ শিষ্যের কাছে প্রত্যেক সন্নাসী হচ্ছেন—স্বামী, আর নিজ নিজ গুরুর কাছে তাঁরা—দাস।"

"তাই তো, এ দিকটা তো আমরা তেমন ভেবে দেখিনি।"

"তাছাড়া, পণ্ডিতজী, ভেবে দেখেছেন কি, শুধু সন্ন্যাসীদেরই

কেন স্বামী আখ্যা দেওয়া হবে? আরো অনেকেরই তো স্বামীত্ব রয়েছে; যেমন ধরুন—ভূস্বামী, গৃহস্বামী। আসল কথাটা কি জানেন, সন্ন্যাসীদের লোকে স্বামী বলে ডাকে বটে, কিন্তু যাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁরা জানেন যে তাঁরা—দাস, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যিনি মানব-জীবনে সম্ভব ক'রে তোলেন সেই গুরুদেবের তিনি একান্ত দাস।"

দয়ালদাস-বাবার এই মন্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যাগত পণ্ডিতজী কিছুটা ভড়্‌কাইয়া গিয়াছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনার কথায় সব ধারণা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, দয়া ক'রে বলুন তো আপনি কোন্ মঠের সন্ন্যাসী?"

উত্তর হইল, "গগন মঠের।"

"গগন মঠ? এর নাম তো কখনো শুনি নি?" পণ্ডিতজীর চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

"বেশ তো, আপনি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনেছেন, বলুন তো।"

"বড় বড় খ্যাতনামা মঠের নাম কে না জানে? এই ধরুন—শৃঙ্গেরি মঠ, জ্যোতিঃমঠ, সারদা মঠ, গোবর্দ্ধন মঠ।"

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার স্বর এবার গম্ভীর হইয়া উঠে—"বলতে পারেন, এসব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে? না—নূতন কোন সাধকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত?"

"মহারাজ, এসব মঠ তো প্রতিষ্ঠা করেছেন আচার্য্য শঙ্কর।"

"উত্তম কথা কথা, পণ্ডিতজী। কিন্তু, বলুন তো আচার্য্য শঙ্কর আর তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন?"

প্রশ্নকারী পণ্ডিত এবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইলেন। আর তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছে না।

দয়ালদাস মহারাজ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "নিত্য ও শাশ্বত পরম বস্তু পাবার জন্য যাঁরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবেন, পিতা মাতার পরিচয় নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন, তাঁদের কি আবার সন্ন্যাস-আশ্রমের পরিচয় বহন ক'রে বেড়াতে হবে? নূতনতর কৌলীন্য

ঘোষণা করতে হবে ? স্মরণ রাখবেন, যেখানেই সম্প্রদায়ের পরিচয় সম্প্রদায়ের গণ্ডী, বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই জেগে ওঠে অভিমান। আর সে অভিমান হয় অখণ্ড পরমবোধের পরিপন্থী।”

নীরবে নতমস্তকে বসিয়া পণ্ডিতজী এতক্ষণ দয়ালদাস-বাবার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন। এবার মৃদুস্বরে কহিলেন, “কিন্তু মহারাজ, আচার্য্য শঙ্করের মঠমালাকেই যে আজকের দিনের সাধু সন্ন্যাসীরা গ্রহণ ক’রে নিয়েছেন—”

“তাঁরা ভালোই করেছেন, তাতে মঠমণ্ডলীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মোহান্ত ও সাধু সন্ন্যাসীর দল। এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অভিমানও কম বেড়ে ওঠে নি। একথাটি সদাই স্মরণ রাখবেন, আচার্য্য শঙ্কর বা তাঁর গুরুপরম্পরার কেউ-ই কোন মঠের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। সেই জন্যেই আমি বলেছি—আমি গগন মঠের সন্ন্যাসী। অনাদি অনন্ত যে মহাকাশে ব্রহ্মলীলা আর সৃষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, সেই মহাকাশই আমার মঠ—আমার পরমাশ্রয়।”

পণ্ডিতজী এবার তাঁহার আসন ত্যাগ করেন, ভাবাবেশে লুটাইয়া পড়েন পরমহংস দয়ালদাসজীর চরণ তলে। আর্ত্তকণ্ঠে কহেন, “মহারাজ, আপনার বিচার পদ্ধতি, আর আপনার উদার সার্ব্বভৌম বাণী, আজ আমার ভেতর জাগিয়ে তুলেছে নূতনতর চেতনা। সন্ন্যাস জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য আজ বুঝতে পেরেছি। আমি অবোধ, অজ্ঞান, আপনি আমায় কৃপা করুন, চরণাশ্রয় আমায় দিন।”

পরিব্রাজনের পথে দয়ালদাসজী সে-বার সদলে গয়া হইতে রাজগীর অভিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রার প্রাক্কালে গয়ার ভক্তেরা কহিলেন, “মহারাজ, রাজগীরের পথ বড় জনবিরল, পথে সমৃদ্ধ কোন গ্রাম নেই। আপনি তিনশত লোকের জমায়েৎ নিয়ে চলেছেন, ভোজনের দ্রব্য তো পথে মিলবে না। বরং আমরা এখান থেকেই প্রচুর আটা, ঘিউ, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।”

দয়ালদাস-বাবা গম্ভীর স্বরে বলিয়া দিলেন, "না। কোন খাদ্যবস্তু এই জমায়েতের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই।"

মণ্ডলীর দুইজন প্রবীণ সাধু কহিলেন, "বাবা, তিনশত মূর্ত্তি আপনার জমায়েতে রয়েছে। জনহীন রাস্তায় এত লোককে আমরা কি ভোজন ক'রতে দেবো? সবার কত কষ্ট হবে। এরা যখন দিতেই চাচ্ছেন, কিছুটা খাদ্য সঙ্গে নিয়ে নেওয়া মন্দ কি?"

দয়ালদাস মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যদি গৃহস্থদের মত সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বহন ক'রেই আমরা পথ চলি, তা হলে গৃহ ছেড়েছি কেন বলতে পারো?"

"বাবা. অনাহারে এতগুলো লোকের কষ্ট হবে, এ ভেবেই আমরা কথাটি বলেছিলুম।'

"তোমাদের ভয় ভাবনার কোন কারণ নেই। সদ্‌গুরু সব সময়েই তাঁর কৃপাদৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন এই জমায়েতের ওপর। একথাটি কখনো ভুলো না।"

শিষ্য ও সেবকেরা দয়ালদাস-বাবার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রওনা হইলেন পদযাত্রায়।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড পথচারীদের উপর অগ্নি বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সাধুরা সবাই পথশ্রমে কাতর। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। এমন সময়ে পথিপার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বটবৃক্ষতলে জমায়েৎ আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাস-বাবার সম্মুখে উপস্থিত হন এক ভক্ত শেঠ। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া শেঠজী কহেন, "বাবা, আজ দুদিন হয়, তাঁবু খাটিয়ে, লোকজন নিয়ে আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি। স্বপ্নে প্রত্যাদেশে পেয়েছি, আপনি এক বিরাট সাধু জমায়েৎ নিয়ে এই পথে যাচ্ছেন, আপনার সেবার জন্য আমি যেন তৈরী থাকি।"

মহাত্মা দয়ালদাস-বাবার দুই চোখে তখন দুষ্টুমির হাসি। শিষ্য সন্ন্যাসীদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "ত্যাখো, গৃহস্থের মত ভূতের বোঝা বয়ে আনো নি বলেই, এই সজ্জন গৃহস্থ তোমাদের সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।"

জমায়েতের এক প্রবীণ সাধু দয়ালদাসজীর দিকে তাকাইয়া সহাস্যে মন্তব্য করিলেন, "মহারাজ ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলে গিয়েছেন,—তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। আপনার বেলায় সব সময়েই এটা প্রভু প্রয়োগ করছেন, আর চাইছেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে।"

শেঠজীর লোকরা ভোজ্য বস্তু সব তৈরী করিয়াই রাখিয়াছে। সাধুরা বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলেই, তাঁহাদের সম্মুখে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জড়ো করা হইল গরম লুচি, হালুয়া ও মালপোয়া। সবাইকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ শেঠজী বিদায় গ্রহণ করেন, পরমহংস দয়ালদাসজীর জমায়েৎ আবার চলিতে থাকে রাজগীরের পথে।

১৩৩০ সালের প্রয়াগ কুম্ভমেলা। প্রতিবারে মত এবারও এই ধর্ম্মমহামেলায় দেখা যায় দয়ালদাস মহারাজের বিপুল প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা। শুধু তাঁহার নিজস্ব মণ্ডলীর সাধু ও গৃহস্থেরাই তাঁহার সত্রে ভীড় করে নাই, অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও আশ্রয় নিয়াছেন এই উদার, সদানন্দময়, আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে। দয়ালদাসজীর পরম আনন্দ অন্নদানে আর বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যানে। তাই তাঁহার তাঁবুটিকে কেন্দ্র করিয়া মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুরা গড়িয়া তুলিয়াছে এক বিরাট জমায়েৎ। ভক্ত দর্শনার্থী ও কৌতূহলী তীর্থযাত্রীরাও বাবার দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য আসিতেছে দলে দলে।

ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় এ সময়কার আনন্দময় পরিবেশটির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন স্বামী রামানন্দ ভারতী। পূর্ব্বাশ্রমে ইনি পরিচিত ছিলেন রামকুমার বিদ্যারত্ন নামে; ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক রূপে ইনি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন। ভারতী মহারাজ লিখিয়াছেন:

"আমরা কোন মণ্ডলীর অন্তর্গত না হইলেও পরমহংস পরিব্রাজক বাবা দয়ালদাস স্বামীর মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিতাম। বাবা

দয়ালদাসের অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাবা দয়ালদাসের উদারতা, প্রেম, দীনের প্রতি দয়া, শিষ্য বাৎসল্য উপমার যোগ্য। বাবা দয়ালদাস একজন যাযাবর সন্ন্যাসী। তাঁহার মঠ নাই, মন্দির নাই, বাসস্থানের কিছুই ঠিক নাই, তিনি যেখানে যান, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভক্ত শিষ্য আছেন। এই কুম্ভমেলা বসিবার অন্যূন একমাস পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন,—তোমরা মেলায় যাইয়া সত্র খুলিয়া দাও, যে সব সাধুরা পূর্ব্বে যাইবেন, তাঁহাদের ভিক্ষার যেন কোন কষ্ট না হয়।

"তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাত্মা দয়ালদাস স্বামীর শিষ্যেরা আসিয়া মেলাক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকের রেতীর পরপারে অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। সাধুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটির সকল নির্ম্মিত হইল এবং সদাব্রত কার্য্য আরম্ভ হইল। বাবা দয়ালদাস যেখানে ছাউনি করিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সিন্ধের নানকসাহী সাতবেলা মঠের ও স্বামী কেশবানন্দের ছাউনি হইয়াছিল। স্বামী দয়ালদাসের মণ্ডলীতে একটি পট্টাবাস ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বাস করিতেন না। সেই পট্টাবাসে অপরাপর সাধু বাস করিতেন, এবং ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষিত হইত ; তিনি সামান্য কুটিরে অপরাপর সাধুর ন্যায় বাস করিতেন, সমস্ত দিন প্রায় বালুর মধ্যেই বসিয়া থাকিতেন ও অপরাপর সাধুদিগের ও ভিক্ষার্থী কাঙ্গালিদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। কখন কখন দেখিয়াছি পাঁচ সাত শত সাধু, এবং পাঁচ সাত শত কাঙ্গালি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মহাত্মা দয়ালদাস তাঁহাদের এক পার্শ্বে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। কখনো তিনি বালুর মধ্যে বসিয়া আছেন, ধনী মানী গণ্যমান্য শত শত লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কি সুন্দর দৃশ্য!

"বাবা দয়ালদাসের ভাণ্ডার অফুরন্ত—চারিদিক হইতে আহারীয় দ্রব্য আসিয়া তাঁহার ভাণ্ডারে পুঁজি হইতেছে, আর সাধু দরিদ্র-দিগকে বিতরিত হইতেছে। কোন বিচার নাই—যে চাহিতেছে, সেই পাইতেছে। পাতা লইয়া বসিলেই হইল। অবারিত দ্বার।

"কোন এক সময়ে বাবা দয়ালদাসকে একজন সাধু বলিয়াছিলেন,

'আপনি আপামর সাধারণকে অন্ন বিতরণ করেন কেন? সাধু ভোজনে বিশেষ ফল আছে, সাধুদিগকেই অন্ন বিতরণ করুন।'

"উত্তরে বাবা বলিলেন, 'সকলেরই একটা মর্য্যাদা আছে, রাজা আসিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে; পণ্ডিত আসিলে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। আহারটা ক্ষুধার মর্য্যাদা দান মাত্র। সাধু ভোজনে কেবল সাধু ভোজনের ফল হয়, কাঙ্গালি ভোজন করাইলে শিব ভোজনের ফল; কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রহীন।' বাবার এই উত্তর শুনিয়া সাধুটি অবাক হইয়া গেলেন।"

কুম্ভস্থানের মিছিল চলা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন মণ্ডলী ও আখড়ার মোহান্তেরা, কেহ হাতীর উপরে কিংখাবে মোড়ানো হাওদায় কৌপীনবস্ত হইয়া সমাসীন। কেহ বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ঘোড়ায় চাপিয়া চলিয়াছেন। আর আগে পিছে চলিয়াছেন রূপার আশাশোটা হস্তে শত শত অনুগামী সন্ন্যাসী। পতাকা ধ্বজা, ত্রিশূল ও সন্ন্যাস দণ্ডের ছড়াছড়ি চতুর্দ্দিকে। গঙ্গার তটভূমি আর আকাশ বাতাস লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত গৃহস্থের আনন্দোল্লাস এবং জয়ধ্বনিতে তখন ভরপুর।

জমায়েতের এক তরুণ সন্ন্যাসী দয়ালদাসজীকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, স্নানের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে, ঐ দেখুন, গজবাজী সহ সাড়ম্বরে মোহান্তেরা সবাই এগিয়ে আসছেন। আপনার মণ্ডলী চল্‌বে কখন?"

পরমহংস দয়ালদাসজী ভারতখ্যাত এক প্রকাণ্ড সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অধিপতি। কিন্তু চাল চলনে ব্যবহারে কোন আড়ম্বর তাঁহার নাই, নিরভিমানতার মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। সন্ন্যাসীটির প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে কহিলেন, "বেটা, আমি হচ্ছি সাধুদের দাস। অতি গরীব আমি, নিজের বলতে একটা কানাকড়িও নেই। আমার আবার ধুমধাম কি? মিছিলে যোগ দেবার সামর্থ্যই বা কই? মূলবান জিনিষপত্র, গজবাজী, রূপোর হাওদা আমার কিছুই নেই। কি ঐশ্বর্য্য দেখাবো আমি সবাইকে, বলতো?"

"সে কি মহারাজ! যাঁর জমায়েতে হাজার হাজার লোক রোজ

অন্ন পাচ্ছে, তাঁকে গরীব বলবো কি ক'রে।" বিস্মিত হইয়া উত্তর দেন যুবক সন্ন্যাসী।

সহাস্যে দয়ালদাস বলেন, "বেটা, সব সময়ে মনে রাখবে, লোকে অন্ন পাচ্ছে অন্নপূর্ণা মায়ীর দরবারে, আমার দরবারে নয়।"

দর্শনার্থী শেঠ ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা বাবার চরণে ভেট দেয় তোড়া তোড়া টাকা, গাঁট গাঁট লুই, শাল, কম্বল, বস্ত্র, টুপী প্রভৃতি। আর সেই মুহূর্ত্তেই দয়ালদাসজী ঐসব ভেটের দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীন দরিদ্রদের মধ্যে।

জনৈক সরল হৃদয় গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, দেশের নানা অঞ্চল থেকে ভারে ভারে এত সব দ্রব্য কেন আসছে, কেন এখানে অপনার চরণতলে স্তূপীকৃত হচ্ছে, এর কারণ কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এ কি আপনার ইন্দ্রজাল না যোগবিভূতির খেলা?"

দয়ালদাসজী উত্তরে হাসিয়া বলেন, "বেটা, এ রহস্য তুমি ভেদ করতে পারছো না? আচ্ছা আমি তোমায় গোপন কথাটি ভেঙে বল্‌ছি। এ সব বস্তু আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কৃপাময়ী অন্নপূর্ণাজী। জানতো বেটা—

দেৎ কো দেৎ হ্যায় জাঁহা তাঁহা সে আন্।
অন্ দেৎ মাঁঙৎ ফিরে সাহেব ন স্থনে কান্॥

—যে মানুষ নিজে কোন বস্তু ভোগ না ক'রে অপরকে দান করেন, ভগবান্ যে কোন স্থান থেকে এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দেন সে সব বস্তু। আর যে মানুষ কখনো দান করে না, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়ালেও তার আবেদন কখনো পৌঁছে না ভগবানের কানে।

শুধু এদেশের বিভিন্ন কুম্ভমেলা ক্ষেত্রেই দয়ালদাস-বাবার মহিমা প্রচারিত ছিল না, ভারতের সর্ব্ব অঞ্চলে, সর্ব্ব তীর্থ ও সাধনপীঠে ছিল এই সিদ্ধ মহাত্মার জয় জয়কার। তাছাড়া, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত প্রতিভাধর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি দিক্‌পাল। সাধন-ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা ও সংগঠন-

শক্তিতেও অনেকে ছিলেন অতুলনীয়। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ষড়্দর্শনবেত্তা স্বামী আনন্দ প্রকাশ, মণ্ডলীশ্বর জগদীশানন্দ স্বামী, অবধূত সুন্দরদাসজী, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দিগম্বরাবধূত মুক্তানন্দ, পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ, সাধু চৈতন্যদেবজী, শ্রীমৎ ব্রহ্ম-প্রকাশজী, পরমহংস রামেশ্বরানন্দ স্বামী, মৌনী মহারাজ, শঙ্করানন্দ স্বামী, মোহান্ত রামস্বরূপজী, স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দ, স্বামী বালানন্দ (কাশী), স্বামী সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি।[১]

দয়ালদাস-বাবার গৃহস্থ শিষ্য ভক্তদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। ভারতের সর্ব্ব তীর্থে, শহরে ও জনপদে কয়েক শত সাধুর জমায়েৎ নিয়া তিনি পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আর এই সময়ে শক্তিধর মহাপুরুষ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এবং ধনী দরিদ্রের কোন তারতম্য না করিয়া আর্ত্ত ও মুমুক্ষু গৃহস্থদের করিতেন কৃপা বিতরণ। নাভার বৃদ্ধ মহারাজ ধর্ম্মপ্রাণ হীরাসিংজী দয়ালদাসজীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা-পূজা করিতেন। পাতিয়ালার তৎকালীন মহারাজা দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন। পরমহংস দয়ালদাসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মহারাজা তাঁহার কৃপাভাজন হন, লাভ করেন একটি পুত্ররত্ন। পাতিয়ালার প্রভাবশালী মন্ত্রী সর্দ্দার গুরুমুখ সিংজীও দয়ালদাসজীর অন্যতম অনুগৃহীত ভক্ত। বাবার বৃহৎ জমায়েতের সেবায় সর্দ্দারজী চিরদিন অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে চাতুর্ম্মাস্য কালে কয়েক শত সন্ন্যাসীসহ তিনি দয়ালদাসজীকে আহ্বান করিতেন, তাঁহার মণ্ডলীর সেবা-পরিচর্য্যা করিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

দয়ালদাসজীর সত্রে ও জমায়েতে রাজা, রাজমন্ত্রী, শেঠ বণিকেরা যেমন অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন, তেমনি হাজার হাজার দরিদ্র ভক্তও প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিত তাঁহার ভাণ্ডারা ও দীন দুঃখীর সেবা-কর্ম্মে। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল ভক্তই এই উদার মহাপুরুষের মণ্ডলীসূত্রে বিধৃত থাকিত নানা রঙের নানা ঔজ্জ্বল্যের রত্নখণ্ডের মত।

১ দ বেঙ্গলী, ক্যালকাটা—১৩. ৪. ০৭

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সার্থকনামা শিষ্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সে-বার প্রয়াগ কুম্ভমেলায় দয়ালদাস-বাবার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্য তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাত্মা দয়ালদাস পঞ্জাব সাধু সম্প্রদায়ের এক প্রধান ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ বক্তা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় দয়ালদাসেরই মন্ত্রশিষ্য। এই আশ্রমে আমরা স্নানাহার করিলাম। দয়ালদাসের আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহা অতি অদ্ভুত। আজানুলম্বিত হস্ত, সুদীর্ঘ কায়, গৈরিকধারী দয়ালদাস-বাবাকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা দয়ালদাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায়, যে কয়দিন কুম্ভমেলায় থাকিব, আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু কিছু উপদেশ শুনিলাম। সদ্‌গুরু বাণীতে সে সমস্ত উপদেশ আছে, সে সমস্ত অতিশয় দুর্লভ। সেই সমস্তের যদি বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়, তবে তাহা দেশের একটি বিশেষ সম্পত্তি হইবে[১]।

"দয়ালদাস মহারাজের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘমাসের আরম্ভ হইতেই কিছুই আহার করেন নাই, যেদিন তাঁহাকে দেখিলাম সেদিন ২৪শে মাঘ। তিনি অতি বিনম্রভাবে আমাদিগকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথা দয়ালদাসের সদাব্রত। দয়ালদাসের সদাব্রত কুম্ভমেলার একটি বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে দুঃখী দরিদ্রের অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে রাখে? দয়ালদাসের আশ্রমদ্বার একমাসকাল তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্ত্তৃপক্ষের সাধু-সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল-ভোজন। কিন্তু দয়ালদাসের সাধু কাঙ্গাল সকলই সমান। একদিন একজন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু-ভোজন অপেক্ষাও কাঙ্গাল-ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার কারণ কি?

১ দয়ালদাস-বাবার উপদেশ সংগ্রহ হিন্দি ভাষায় বিচার প্রকাশ নামে সঙ্কলিত হয়। এই পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ কাশী যোগাশ্রম হইতে শ্রীকামাখ্যা নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

"দয়ালদাস উত্তর করিলেন, 'সকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধু বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মানমর্য্যাদা ধর তবে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদিগকে ভোজনের ফল হয়, তবে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত কাঙ্গালিদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়।' মহাত্মা দয়ালদাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক!

"দয়ালদাসের কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বার মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যখন যেখানে থাকেন, সেইখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাঁহার অতিথি। কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর তাঁহার নির্ভর নাই। শিলাবৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে টাকা ছুটিয়া আসে, একজন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিলেন, এক শিষ্য কুড়াইয়া নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া ফেলিলেন। অর্থাপাদরজোপমা—এ কথা ইঁহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থব্যয় করে। ইঁহাদের ব্যবহার দেখিলে ঘোর সংসারাসক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন হইয়া যায়।

"মহাত্মা দয়ালদাস বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদের কীর্ত্তন তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের কাছে সেকথা তিনি বলিয়াছিলেন। দয়ালদাস দয়ার সাগর, ভক্ত প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কর্ম্মী বা কর্ম্মহীন সন্ন্যাসী নহেন।"

এই কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের সমাগম যেমন হয়, তেমনি মঠমণ্ডলী আখড়ার মোহান্ত ও শেঠেরাও সদাব্রতের জন্য ব্যয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীর মাধ্যমেও কম টাকা এসময়ে ব্যয়িত হয় নাই।

এক কৌতূহলী দর্শনার্থী সেদিন দয়ালদাসজীর তাঁবুতে আসিয়া

তাঁহার এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই মেলার সদাব্রত ও দানসত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল, তার স্থায়ী ফল বা গঠনমূলক কাজ কি হ'লো? দেশের কি কল্যাণ সাধিত হ'লো?"

শিষ্যটি উত্তর দিলেন, "দেখুন, সমাজতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই। তবে, এতে যে দেশের কল্যাণ হচ্ছে, তা বিশ্বাস করি। কল্যাণ শব্দটির এক মোটামুটি অর্থ আমরা বুঝি—যাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, তাকেই বলি সত্যকার কল্যাণ। সে কল্যাণ কিছুটা সাধিত হয় অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা, গঠনমূলক কাজ দ্বারা। আবার অর্থকে ধূলি মুষ্টির মত জলে ফেলে দিয়েও এ কল্যাণ সাধন করা যায়।"

"সেটা কি রকম?"—প্রশ্ন করেন দর্শনার্থী।

"এই ধরুন, সেদিনকার মেলাক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা। আমাদের শত শত লোকের চোখের সামনে এটি ঘটলো। এক ধনী শেঠ দয়ালদাস-বাবাকে প্রণাম ক'রে এক বস্তা টাকা তাঁর সামনে রেখে দিলো। মিনতি ক'রে বললো, 'বাবা, এ টাকাটা আপনি সাধু বা দীন দুঃখীর ভাণ্ডারায় লাগিয়ে দিন, আমায় কৃতার্থ করুন।' বাবা উত্তর দিলেন, 'তা কি ক'রে হয়, বেটা? এখানে তো আজ আর টাকা নেওয়া যাবে না। আগে যারা দিয়ে গিয়েছে, তাদের টাকা সবটা খরচ না হলে তোমার টাকা খরচ করি কি ক'রে? তুমি বরং অন্য কোথাও যাও।' লোকটি কত কাকুতি মিনতি করলেন। কিন্তু বাবা পূর্ব্ববৎ তাঁহার সিদ্ধান্তে রইলেন অটল। ভেবে দেখুন, এ ঘটনাদি যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন, টাকাকড়ি সম্পর্কে অনাসক্তি তাদের কত বেড়ে গেল, প্রাণে জেগে উঠ্‌লো ত্যাগ বৈরাগ্যের হাওয়া। একে কি সত্যকার কল্যাণ বলে না?"

প্রশ্নকারী ভক্ত দর্শনার্থীর অন্তরে কথা কয়টি আলোড়ন তুলিয়া দিল। নীরবে সেস্থান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার শেষে মণ্ডলীর তিনশত সাধু সমভিব্যাহারে দয়ালদাসজী কানপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। এবার এখানকার ভক্তদের

সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিবেন।

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার আহ্বানে বাবার শিষ্য, ধর্ম্মবক্তা কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও তখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাঁবুতে আসিয়া ভক্তি-ভরে দয়ালদাস-বাবাকে তিনি প্রণাম জানাইলেন। প্রিয় শিষ্যকে আশিস্ জানাইয়া বাবা কহিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ, ভালই হয়েছে তুমি ঠিক এসময়ে কানপুরে উপস্থিত হয়েছ। এর পর এ অঞ্চলে আমার আর আসা হবে না, এ মরদেহে থাকাও হবে না। এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।"

"সে কি বাবা, এসব কি অলক্ষুণে কথা আপনি আমায় বলছেন?" কৃষ্ণানন্দের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

দয়ালদাস-বাবা এবার মৃদু স্বরে বলেন, "হাঁ বেটা, এবার শরীর আমি ছেড়ে দেবো। অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এটা।"

কৃষ্ণানন্দ আর্ত্ত স্বরে কহেন, "বাবা, আপনাকে পেয়ে অবধি সংসারের সব কিছু ভুলে আছি, আর দিন কাটাচ্ছি দিব্য আনন্দে। আপনি দেহ ছাড়লে যে আমরা সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বো।"

স্মিতহাস্যে দয়ালদাসজী বলেন, "বেটা, নিরাশ্রয় কেন হবে? আমার এ শরীরের সান্নিধ্য তো বড় কথা নয়। আমার আত্মা, আমার শাশ্বত পরম সত্তাই হচ্ছে আসল বস্তু। তাঁর সঙ্গে তোমাদের অনেকের যোগ সাধিত হয়েছে। সেই নিত্য, অখণ্ড পরম বোধটিকে মনের ভেতর ধরে রাখো, বৈরাগ্যময় তপস্যা চালিয়ে যাও। আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সিদ্ধকাম হবে।"

কয়েক মাস পরে চাতুর্ম্মাস্য আসিয়া পড়ে। পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী সর্দ্দার গুরুমুখ সিং দয়ালদাসজীর পরম ভক্ত। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা চাতুর্ম্মাস্যের কয়েকটি মাস বাবা মহারাজ তাঁহার কাছে অবস্থান করুন, সেবার সুযোগ দিয়া তাঁহাকে ধন্য করুন।

এ সাদর আমন্ত্রণ দয়ালদাসজী গ্রহণ করেন, প্রায় এক শত সঙ্গী

সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত হন পাতিয়ালায়। সর্দ্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্যান বাটিকায় নির্দ্দিষ্ট হয় তাঁহার মণ্ডলীর বাসস্থান।

এ সময়ে হঠাৎ এক মারাত্মক পীড়ায় দয়ালদাস-বাবা আক্রান্ত হন। সেবক গুরুমুখ সিংজী এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। পাতিয়ালার মহারাজের নির্দ্দেশে চিকিৎসার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হয়। শিষ্য ও সেবকেরা প্রাণপণে করিতে থাকেন বাবার সেবা শুশ্রূষা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা যত্নই বিফল হয়। রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

একদিন সেবকদের ডাকিয়া বাবা কহিলেন, "মাধোলাল এসেছে ? আহা, বেটা, বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তাঁকে ডেকে আনো।"

সেবকেরা এ উহার মুখের দিকে চায়। কাহার কথা বলিতেছেন দয়ালদাসজী ? তাঁহারা প্রশ্ন করে, "কে এই মাধোলাল, বাবা ?"

বাবা উত্তর দেন, রোহতক জেলায় গুরুদ্বার গাঁও-এ তার বাড়ী। আমার পুরোনো শিষ্য। আমার সঙ্গে যে তার বড় জরুরী দরকার। সে এসেছে কি ?"

"না—বাবা, এমন কোন লোক তো আসেনি।"

"তা হলে আমিই যাবো তার কাছে। হ্যাঁ আজই যাবো, বড় জরুরী।"

সেবকেরা ভাবিলেন বাবা রোগের প্রকোপে ভুল বকিতেছেন। একথা নিয়া আর তাঁহারা আলোচনা করিলেন না।

দেহ ত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীয় সাধু সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের নিকট ডাকিলেন। আদেশ মত উদ্যানের মধ্যস্থলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া যাওয়া হইল।

প্রসন্নমধুর দৃষ্টি বুলাইয়া মহাপুরুষ সবাইকে জানাইলেন অন্তরের আশীর্ব্বাদ। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন "আমার শরীর এবার চলে যাচ্ছে। তাতে তোমরা শোক ক'রো না। আমার ভেতর যে নিত্য বস্তু, শাশ্বত বস্তু রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে চলো, তবেই এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি।"

একটু থামিয়া আবার ভক্তদের কহিলেন, "আত্মার কথাই

চিরজীবন বলে আস্‌ছি, এই দেহ পড়ে যাবার সময়েও সেই কথাই বল্‌বো। আত্মা ব্যাপক, অনাদি ও অনন্ত। জন্ম মৃত্যু বলে কিছু তো নেই, অনিত্য ও সসীম বস্তুতেই এই জন্ম মৃত্যুর কথা প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রের জল আর তার তরঙ্গে কোন ভেদ নেই, সব রয়েছে অখণ্ড অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত। সারা জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মময়, জগৎ অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে এই ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণ।

"আসলে দ্বৈতভাবের ফলেই মরণকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি, ভয় পাই। কিন্তু তোমাতে দ্বৈত নেই। তুমি—অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রুতি ও গুরুবাক্য স্মরণে রেখে অদ্বৈত ব্রহ্মের চৈতন্যময় প্রকাশ অনুভব ক'রো, অজ্ঞানজনিত জগৎ প্রপঞ্চ স্বতঃই বিলীন হয়ে যাবে। এই দেহের জন্য কেউ শোক ক'রো না। আর এই দেহভস্মের ওপর কোন স্মৃতিসৌধও কেউ যেন তৈরী ক'রো না।"

কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, লীলাবৈচিত্র্যময় সিদ্ধজীবনের উপর নামিয়া আসিল চিরবিরতির যবনিকা। ১৩০১ সনের ১৭ই ভাদ্র, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি এই দিনটি তাঁহার সহস্র সহস্র ভক্তের স্মৃতিতে চিরচিহ্নিত হইয়া রহল।

পাতিয়ালার প্রধান প্রধান সর্দ্দার, অগণিত সাধু সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ বাবা মহারাজের শবদেহের অনুগমন করেন। বাদ্য ভাণ্ড সহ, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও ধ্বজ পতাকাদি সহ, চলিতে থাকে সমারোহপূর্ণ এক বিরাট মিছিল। সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধার্ঘ্য সমর্পণের পর দয়ালদাস মহারাজের মরদেহ সমাহিত হয় নদীগর্ভে।

ঠিক এই সময়েই পরমহংস দয়ালদাস-বাবার এক অলৌকিক লীলা অনুষ্ঠিত হয় রোহতক জেলার ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রাম গুরুদ্বার-এ। মাধোলাল বেদী দয়ালদাসজীর এক পুরাতন শিষ্য, এই গ্রামেই তাঁহার বাস। দয়ালদাসজীর কাছে বহুদিন আগে দীক্ষা নিয়া এ যাবৎ নিভৃতে তিনি আপন সাধনা চালাইয়া যাইতেছেন। এবার সাধনার এমন এক স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যে গুরু মহারাজের সাক্ষাৎ

দর্শন ও সাধন-উপদেশ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য কয়েকদিন যাবৎ কাতরভাবে গুরুজীকে তিনি স্মরণ করিতেছেন। লোকমুখে শুনিয়াছেন, চাতুর্ম্মাস্যের জন্য দয়ালদাস-বাবা পাতিয়ালায় অবস্থান করিতেছেন। আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, দুই এক দিনের জন্য পাতিয়ালায় যাইবেন, গুরুমহারাজের দর্শনের পর মাগিয়া নিবেন তাঁহার প্রার্থিত সাধন বস্তু। কিন্তু সংসারের নানা জটিল জালে জড়াইয়া থাকায় গ্রাম ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

হঠাৎ মাধোলাল দেখিলেন, গুরুজী দয়ালদাস-বাবা গ্রামের বড় রাস্তাটি ধরিয়া তাঁহারই বাড়ীর দিক দ্রুত পদে আসিতেছেন। একি কাণ্ড! হঠাৎ গুরুমহারাজ এখানে? তাছাড়া, একলাই আসিয়াছেন, সাঙ্গোপাঙ্গ নাই। এ বড় বিস্ময়ের কথা।

গুরুজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাধোলাল দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেন। প্রশ্ন করেন, "একি মহারাজ, আপনি একলা এত-দূরের পথ হেঁটে আস্‌ছেন। আপনার মণ্ডলী কোথায়? দু' একশ' সাধু সন্ন্যাসী সঙ্গে না নিয়ে তো আপনি পথ চলেন না?"

গুরুজী হাসিয়া বলেন, "বেটা মাধোলাল, তোমার ব্যাপারটা যে জরুরী। এ ক'দিন কাতর হয়ে আমায় কত ডেকেছো। তাই আমি একলাটিই তোমার কাছে এলাম। মণ্ডলী? হাঁ, তা পরে আসছে।"

অতঃপর কৃপালু দয়ালদাসজী শিষ্য মাধোলালের ভজনকুটিরে গিয়া বসিলেন, নিভৃতে তাঁহাকে দান করিলেন সেই নিগূঢ় সাধনক্রিয়া যাহার জন্য প্রিয় শিষ্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

এবার প্রসন্নমধুর হাসি হাসিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, "বেটা আমার জরুরী কাজ শেষ হয়েছে, তোমার সন্তোষ বিধানও করতে পেরেছি। এবার আমি পাতিয়ালায় ফিরে যাই। সবাই যে শোকার্ত্ত হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছে। হাঁ, বেটা, তুমি এখানকার কাজের ঝামেলা মিটিয়ে দুই দিন পরে পাতিয়ালায় চলে এসো।"

গুরুর আদেশ মাধোলাল শিরোধার্য্য করিয়া নেন। কাজকর্ম্ম গুছাইয়া রাখিয়া দুই দিন পরে গুরুমহারাজের দর্শনের জন্য তিনি পাতিয়ালায় আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু একি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড।

শিষ্য সেবকেরা সবাই সর্দ্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্যানে শোকার্ত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, বাবা দুই দিন পূর্ব্বে ছেদ টানিয়া দিয়াছেন তাঁহার মরলীলায়। ঠিক যে সময়ে গুরুদ্বার গাঁও-এ মাধোলালের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন, সেই সময়েই বাদ্যভাণ্ড ও মিছিল নিয়া পাতিয়ালায় লক্ষাধিক লোক অনুগমন করিতেছিল তাঁহার শবদেহের।

"এ কি দৈবী মায়া! এ কি অলৌকিক রহস্য! বাবা, মহারাজের এ কি অত্যাশ্চর্য্য কৃপা লীলা!"—কথা কয়টি বার বার মাধোলাল বলিতেছে, আর কপোল বহিয়া ঝরিতেছে শোকের অশ্রুধারা।

স্বামী শিবানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন হয় নরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গুরুর বিরহে ও শোকে ভক্ত শিষ্যেরা রহিয়াছেন মুহ্যমান। এমনি সময়ে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসু একদিন তাঁহার গৃহে বরানগর মঠের তরুণ গুরুভাইদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা, সবাই মিলিয়া ঠাকুরের পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবেন।

বলরামের গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর স্মৃতিবিজড়িত। ভক্তদের নিয়া কত আনন্দই না তিনি এখানে করিয়াছেন! তাঁহার কীর্ত্তন-নর্ত্তন, ভাবাবেশ ও সমাধি দর্শন করিয়া সবাই হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। তাই বরানগর হইতে নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সোৎসাহে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভজন কীর্ত্তন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের শেষে ঠাকুরের স্মৃতিচারণ চলিতেছে। এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে নরেন কহিলেন, "আমাদের ঠাকুরই ছিলেন একমাত্র কামজিৎ পুরুষ। বিবাহিত জীবনে এমন কামজিৎ জগতে আর কেউ হয়েছেন বলে শোনা যায় নি।"

একথায় কিন্তু মৃদু একটু প্রতিবাদ উঠিল। তরুণ সাধক তারক সবিনয়ে কহিলেন, "তা কেন? ঠাকুর কৃপাবলে আরও কামজিৎ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই ধরুন, আমার ভেতরেই তিনি এমন শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন যার বলে বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রেও আমি কাম জয় ক'রতে পেরেছি।"

"তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ!" বিস্ময় ও সম্ভ্রম জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন নরেন্দ্রনাথ—উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত এই 'মহাপুরুষ' আখ্যাই তারককে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে চিরচিহ্নিত করিয়া দেয়, মহাপুরুষ মহারাজ নামে তিনি মণ্ডলীতে পরিচিত হইয়া উঠেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নব নামকরণ হয় শিবানন্দ স্বামী।

সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর দিক্‌দিশারী ছিলেন স্বামী শিবানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নূতনতর ধর্ম্ম-আন্দোলনে এবং মঠ মিশনের সংগঠন ও পরিচালনায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভ্রাতা, বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মহাধর্ম্ম বা মহাসঙ্ঘের গঠন প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব-বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক—তিনেরই অঙ্গাঙ্গী প্রয়োজন আছে। তিনটির মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধর্ম্মের বা মহাসঙ্ঘের কোন কার্য্য চলিতেই পারে না; একের অবর্ত্তমানে অপরের সার্থকতাও থাকে না—ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল।"

ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যে নব তরঙ্গ উৎসারিত করিয়া যান, মহাপুরুষ শিবানন্দ সেই তরঙ্গে সঞ্চারিত করেন তাঁহার সাধন শক্তি—কীর্ত্তিত হন তাঁহাদেরই এক উত্তরসাধকরূপে।

গুরুভাই তারক যে একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ ধারণাটি পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছিল। এ সম্পর্কিত এক অলৌকিক ঘটনারও তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে, মারাত্মক ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যাশায়ী। গুরুর সেবা পরিচর্য্যায় তরুণ ভক্ত শিষ্যেরা সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, আর অলক্ষ্যে গুরু-কৃপায় তাঁহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যময় সান্নিধ্য ও স্পর্শে হৃদয়ে তাঁহাদের জ্বলিতেছে মুমুক্ষার আগুন। এই আগুন এক সময়ে আরো তীব্র হইয়া উঠে।

নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করেন বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের তপস্যাপূত ভূমিতে গিয়া কয়েকটা দিন ধ্যানাবিষ্ট থাকিবেন, প্রতীক্ষা করিবেন মুক্তির আলোক সঙ্কেতের।

এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক ও কালিপ্রসাদও উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তিন গুরুভ্রাতা এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হন, শুরু করেন তাঁহাদের তপস্যা।

এ সময়কার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখতে পান, একটি শক্তি তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারক-নাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।"

নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ এ সময়ে বলেন, "ওরে কোথাও কিছু নেই, এবার সব এখানে। আর যেখানেই যাওনা কেন, কিছুই পাবে না। এখানকার সব দুয়ার খোলা।"

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত এই মহা-ইঙ্গিতটি তারক তাঁহার দীর্ঘ তপস্যাময় জীবনে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই। এই দিব্যোজ্জ্বল ইঙ্গিতটিতে সযতনে তিনি রাখিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়সম্পুটে, ইহা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার সাধনপথের পরম পাথেয়। জীবন তাঁহার হইয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণময়, লাভ করিয়াছিলেন তিনি বহুবাঞ্ছিত অধ্যাত্মসম্পদ।

তারকের পিতা রামকানাই ঘোষাল ছিলেন এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক আচার্য্যের শিষ্য। নিজেও তিনি বহুতর তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন।

বারাসতের এক বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন রামকানাই। আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি যেমন ছিল, তেমনি সদ্ব্যয়ও ছিল প্রচুর।

ধনজনে পরিপূর্ণ সংসার। কিন্তু রামকানাই ও তাঁহার পত্নী বামা-সুন্দরীর অন্তরে সুখ নাই। এ যাবৎ তাঁহাদের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। এজন্য পূজা ব্রত অনেক কিছুই করা হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই।

অবশেষে উভয়ে বাবা তারকেশ্বরের পূজা দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বামাসুন্দরী অতিশয় সাধ্বী, শ্রদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী। বাবা তারকেশ্বর এ সময়ে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন। প্রত্যাদেশ হয়—'ওগো, মনে খেদ ক'রো না। এ বৎসরের মধ্যেই এক পুত্ররত্ন তুমি লাভ করবে।"

প্রত্যাদেশের ফল ফলিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণা একাদশীর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইল এক নয়নাভিরাম পুত্র।

সুন্দর সুঠামতনু শিশুকে পাইয়া ঘোষাল দম্পতির আনন্দের অবধি নাই। ধন জনে পূর্ণ প্রাচুর্য্যের সংসার এবার আরো আনন্দময় হইয়া উঠে।

কিন্তু মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘদিন এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুত্রের নবম বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। বালক তারকের জীবনে জননীর এই বিয়োগ ব্যথা এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। দিন দিন সে উদাসীন হইয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যাইত, সহপাঠী ও সঙ্গীদের সহিত থাকিয়াও সে যেন তাহার জীবনের চতুর্দ্দিকে এক গণ্ডী রচনা করিয়া চলিয়াছে। আপন উদাস মনোবৃত্তি নিয়া সে যেন সবার মধ্যে থাকিয়াও নিঃসঙ্গ। মাতার মৃত্যুর পর এক ভগিনীর মৃত্যু ঘটে। তারপর আসে আর এক শোচনীয় দুর্দ্দৈব। অপর এক ভগিনী বিধবা হন। এ সময়ে পিতার আর্থিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে থাকে।

তারকনাথ যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন তখন তাঁহার হৃদয় নানা-ভাবে বিপর্য্যস্ত। অবশেষে তিনি পিতৃগৃহের পরিবেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ থাকিবার পর পর গ্রহণ করেন রেলওয়ের চাকুরী। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে

উপার্জ্জন করিবেন, আর তীর্থদর্শন ও ভগবৎ-চিন্তায় কাল কাটাইবেন, ইহাই তখন তাঁহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা।

এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলিতেন, "সেই সময় সমাধি জিনিষটা যে কি তা নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হ্‌ত। সমগ্র জগৎ সংসার ভুলে কি ক'রে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকা যায়—এই আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রাণে সর্ব্বক্ষণ জ্বলত। শিবের ধ্যানমূর্ত্তি, বুদ্ধের ধ্যানমূর্ত্তি -এসব খুব ভাল লাগত। মোট কথা সমাধিলাভ করবার জন্য প্রাণ খুব ছট্‌ফট্ করত এবং যাতে সমাধি লাভ করতে পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। মাসের পর মাস গিয়েছে, রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্ব্বক্ষণ ঐ এক চিন্তা—কি করলে সমাধি লাভ হয়।"

তারকনাথের পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য বার বার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। কিন্তু পুত্র একেবারে সংসার বিমুখ। অবশেষে তারককে পড়িতে হইল এক কঠিন পরীক্ষায়। পিতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছে। কিন্তু পাত্র পক্ষের সর্ত্ত অনুযায়ী তারককে বিবাহ করিতে হইবে বরের ভগিনীকে। মাতৃহীনা কনিষ্ঠা ভগিনীর কল্যাণে তারকনাথ কি এ প্রস্তাবে রাজী হইবেন না?"

তারকের ইচ্ছা ছিল বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না। তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর রত হইবেন সাধন ভজনে।

অসহায়া ভগিনীর দিকে তাকাইয়া এই ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। বাধ্য হইয়া বিবাহে তিনি মত দিলেন।

বারাসতের নিকটে মহেশ্বরপুর গ্রাম। এই গ্রামের পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, নিত্যকালী দেবী, তারকের বধূরূপে ঘোষাল গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তারকনাথ একটি নূতন কর্ম্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

তখনকার দিনে আদর্শবাদী তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের খুব প্রতিপত্তি। তারকনাথ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় মাঝে মাঝে যোগদান করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের অদম্য পিপাসা

সেখানে মিটিতেছে কই? সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তখন তাঁহার জীবন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক একদিন গভীর রাতে উঠিয়া কাঁদিতেন, আর প্রার্থনা করিতেন, "হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দাও, আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও। কি করলে এই জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, কৃপা ক'রে তাই শিখিয়ে আমায় দাও।"

১৮৮০ সালের মধ্যভাগ। একদিন কয়েকটি ভক্ত নিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ঘরে বাহিরে দর্শনার্থী জনতার ভীড়। এইদিন তারকনাথও সকলের সাথে ঠাকুরকে দর্শন করিলেন।

আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে পরমহংসদেব হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া কি যেন তিনি বলিতে চান। কখনো অস্ফুট কখনো বা আধ-আধ কথা। খানিক বাদে মন নিম্নভূমিতে অবতরণ করিল। তখনও সেই পরম অনুভূতির রেশ টানিয়া সমাধির প্রসঙ্গে ঠাকুর নানা তত্ত্বকথা কহিতেছেন।

একি দেবদুর্লভ ভাবাবেশ! একি আনন্দঘন রূপ! তারকনাথের হৃদয়ে এ দিনের স্মৃতি চিরতরে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

এই সঙ্গে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন, এই সমাধিবান্ মহাপুরুষই তাঁহার সংত্রাতা, ইঁহার কৃপালাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু।

সেদিনকার এই দর্শন তারকের জীবনে আনিয়া দেয় ঈশ্বরপ্রাপ্তির তীব্র ব্যাকুলতা। আবার কবে এই দিব্য পুরুষের সন্নিধানে যাইবেন, তাহাই হয় তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান।

ইহার পর এক বন্ধুর সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। তারকের মনে কি ভাব জাগিল কে জানে? বালকের মত ঠাকুরের কোলে মাথা ঠেকাইয়া বার বার তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। ঠাকুর যেন এক করুণাঘন পরমাশ্রয়। মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ ও মাধুর্য্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে তাঁহার দিব্য মূর্ত্তি হইতে।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। ভবতারিণীর মন্দিরে কাঁসর শঙ্খ ঘণ্টা অবিরত বাজিয়া চলিয়াছে। আর ঠাকুর বসিয়া আছেন ভাবাবিষ্ট

অবস্থায়। আরতি থামিলে তারককে প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি সাকার মান—না নিরাকার?"

"আমার ভাল লাগে নিরাকার।" নিজের প্রবণতা ও ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তাধারাকে মিলাইয়াই একথাটি তিনি বলিলেন।

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা গেল, "শক্তি মান্‌তে হয়।"

ইহার পর পরমহংসদেব ভাবোন্মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজে ও কেশবচন্দ্রের সভায় ঘোরাফেরা করিয়া তারক নিরাকার ঈশ্বরের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তাই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ভাবিলেন, কালী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিবেন কিনা।

কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় এই দ্বিধা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। বুঝিলেন যিনি বিভু, ভূমা—প্রস্তর মূর্ত্তিতে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবা কেন? সাকার নিরাকার, খণ্ড ও অখণ্ড, দুই-ই যে তিনি।

মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন, "আবার এসো।"

দিব্যভাবে সদা আবিষ্ট এই মহাপুরুষের প্রেম-মধুর মূর্ত্তির আকর্ষণ যে অমোঘ! পরদিনই সন্ধ্যায় তারক আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ করিলেন। সযত্নে তাঁহাকে দেবীর প্রসাদ খাওয়াইয়া বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়া দিলেন।

কোন ভক্তই দক্ষিণেশ্বরে সেদিন উপস্থিত নাই। ঠাকুরের নিবিড় সান্নিধ্য ও দিব্য স্পর্শ লাভের পর তারকনাথের হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ বহিতেছে। শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিতেছে না। মধ্যরাত্রিতে দেখিলেন, ভাবোন্মত্ত ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া পায়চারী করিতেছেন, আর উচ্চারণ করিতেছেন কি সব দুর্ব্বোধ্য বাণী।

ইহার পর বারান্দায় আসিয়া তারককে ডাকিতে লাগিলেন, "ওগো ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটু রামনাম শোনাও তো!"

শশব্যস্তে উঠিয়া তারক ঠাকুরকে বহুক্ষণ রামনাম শুনাইয়া শান্ত করিলেন। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-আবেগের মধ্য দিয়া তারকের সেই রাতটি অতিবাহিত হইল।

বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর কহিলেন, "আবার এসো—একলা।"

একলাই তারকনাথ আবার একদিন ছুটিয়া আসিলেন। এই দিনকার অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন—"তিনি হঠাৎ তাঁহার পা আমার বুকে দিলেন। সে দিব্য স্পর্শে আমায় বাহ্যিক সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা জানিনে, কিন্তু পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন, 'মা, নেমে এস, নেমে এস।' ঐরকম অবস্থায় অপরের বেলায়ও তাঁকে এরকম করতে দেখেছি।"

তারক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু এতদিন ঠাকুর তাঁহার কোন পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেন কতদিনের পরমাত্মীয়কে আবার কাছে পাইয়াছেন, এই রকম ভাব। এইবার হঠাৎ তারকের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর শুনিয়া তিনি মহাখুসী। বলিলেন, "বটে। তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর নেবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাবাকে যে খুব জানি। তিনি রাণী রাসমণির বাড়ীর মোক্তার। ভারি সাধক লোক। এখানে এসে গঙ্গাস্নান ক'রে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে আসতেন। তখন মনে হত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব! যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ—বুকটা যেন সর্ব্বদা লাল হয়েই থাকত। মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত; সে পেছনে বসে নানা দেহতত্ত্ব ও শ্যামা বিষয়ক গান গাইত, আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন—অবিরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ লাল হয়ে যেত—তাঁর সামনে আসতে লোকের ভয় হত।

"আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ—অসহ্য জ্বালা সর্ব্বাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বল্লাম, 'হ্যাগো, তুমি তো মাকে ডাক, আমিও মাকে ডাকি—একটু ধ্যানও হয়। কিন্তু আমার যে এত গা জ্বালা করে, এর মানে কি বলতে পার? ভাখো, আমার এমনি গাত্রদাহ যে

লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনও কখনও বড় অসহ্য হয়।' তখন তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য। এই কবচ ধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাঁকে একবার আসতে বলিস্ তো?" [১]

তারকের পিতা লোকের কাছে শুনিলেন, পুত্র দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, এ সংবাদে তিনি বেশ আনন্দিতই হইলেন।

তারক ক্রমে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে মনের গোপন কথা, দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথা খুলিয়া বলেন। সেদিন কহিলেন, "দেখুন, বিয়ে ক'রে ফেলেছি বাধ্য হয়ে। ঘরে স্ত্রী রয়েছে। মনে ভয় হয়, আমার সংযমের বাঁধ যদি ভেঙে যায়, ঈশ্বর দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, যা নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি, তা ব্যর্থ না হয়ে যায়।"

আশ্রিত শিষ্যকে ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি রে? আমি আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাক্‌বে তাকে দেখাশুনা করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য্য ধর্। মা সব ঠিক ক'রে দেবেন।"

এ সম্পর্কে উত্তরকালে স্বামী শিবানন্দ কথা প্রসঙ্গে মঠের ভক্তদের বলিয়াছেন, "ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়াত করতুম তখন আবার মাঝে মাঝে বাড়ীও দেখতে হত। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল কিনা আগে। আমার কিন্তু আদৌ ভাল লাগত না: কোনরকমে নাক কান বুজে ভগবানের নাম ক'রে রাতটা কাটিয়ে দিতুম। স্ত্রী অনেক কান্নাকাটি করত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে, আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালুম। ঠাকুর সব শুনে, আমায় একটা ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং বল্‌লেন—'ভয় কি? আমি তো রয়েছি। আমায় খুব স্মরণ করবি, আর এই ক্রিয়া করবি, তোর কিছুই হবে না। যা, স্ত্রীর সঙ্গে এক

[১] মহাপুরুষ শিবানন্দ: স্বামী অপূর্ব্বানন্দ

ঘরে থাকলেও তোর কোন ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর বৈরাগ্য এতে আরও তীব্র হবে।" ১

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্ব্বাদ ফলপ্রসূ হয় সাধক তারকনাথের জীবনে। স্ত্রী তাঁহার পরমা ভক্তিমতী। সাত্ত্বিক ও শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। স্বামী তারকনাথের কাছে তাঁহার সাধনা ও সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনিয়া, তাঁহার মন আরো পরিবর্ত্তিত হয়। স্বামীর সাধন জীবনের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা তিনি করিতে থাকেন।

তারকনাথের সাধ্বী পত্নী বেশীদিন বাঁচিয়া থাকেন নাই। অল্পকালের ব্যবধানে, রোগে ভুগিয়া, ইহধাম তিনি ত্যাগ করেন। তারকের সংসার বন্ধন এবার ছিন্ন হইয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিয়া, একনিষ্ঠভাবে নিজের সঙ্কল্প সাধনে তিনি ব্রতী হইয়া পড়েন।

ধনী সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবক তারক। ঠাকুর প্রথমেই তাহার অভিমানের কাঁটা উৎপাটন করিতে শুরু করেন। সাধনায় ব্রতী হইতে হইলে অনেক কিছু ভাঙচুর আগে করিয়া নিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আগেই এদিকে মনোযোগ দিলেন, মাঝে মাঝে তারককে পাঠাইতে লাগিলেন ভিক্ষা সংগ্রহে। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে ভিক্ষা নিয়া তারক যখন ফিরিতেন, ঠাকুরের আনন্দের অবধি থাকিত না। দিন ও রাত্রির সর্ব্ব কর্ম্মে, শয়নে ভোজনে ঠাকুরের সতর্ক প্রহরা তরুণ সাধককে রক্ষা কবচের মত ঘিরিয়া থাকিত।

গুরু শিষ্যের এ সময়কার মধুর সম্বন্ধটির স্বরূপ স্বামী শিবানন্দের মুখে উত্তরকালে শোনা যাইত—"আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব ছিল তাতে ঐশ্বর্য্যের ভাব একটুও ছিল না। আমরা আমাদের কথা বলছি—ঠাকুরকে সেভাবে দেখিনি। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন। কেউ অবতার, কেউ ভগবান, এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন। ওতে আপন বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়।···কি ভাগ্যবান্ আমরা—পান

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

সেজে তামাক সেজে খাইয়েছি, তাঁর সেবা করেছি—আদর ভালবাসা কত পেয়েছি।”

এমনি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া সুদক্ষ কাণ্ডারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আশ্রিতদের অধ্যাত্ম-জীবনের পরপারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তখন ভক্ত তারকনাথের অন্তর-সত্তায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইয়া দিতেছে। মুমুক্ষু জীবনের চারিপাশের আকর্ষণ ও বন্ধন যেন কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে অপস্রিয়মান। ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শনের একি পরম বিস্ময়কর ফলশ্রুতি! তারকের অন্তর্জ্জীবনের তুষারাবরণ যেন অধ্যাত্ম-সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে আজ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

ঠাকুরের সহজ ভালবাসা ও কল্যাণেচ্ছার প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই ভালবাসার শক্তি কাজ করিত প্রচ্ছন্নভাবে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে শিবানন্দ স্বামী বলিয়াছেন :

“ঠাকুরের কাছে হয়তো দু এক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব দিন তেমন কথাবার্ত্তাও হত না, কিন্তু ফল বহুদিন পর্য্যন্ত থাকতো। কেমন যেন একটা নেশার মত হয়ে যেত—সর্ব্বক্ষণই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম······তাঁর কৃপা-কটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। তিনি স্পর্শমাত্রেই ভগবৎ-দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন।”

সুদক্ষ অধ্যাত্ম-শিল্পী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ; নিজ ভক্তদের রূপান্তর তিনি সাধন করিয়াছেন অসামান্য ধৈর্য্য ও সতর্কতা নিয়া। দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া এই সাধকদের জীবন অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়াছে। তারপর ঠাকুর তাঁহার দিব্য করস্পর্শে থরে থরে ইহাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কুসুমরাজি।

তারকের মনে পড়ে, দুই তিনবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি তাঁহাকে মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে নিয়া যান, তারকের জিহ্বায় নিজের আঙুল দিয়া কি যেন এক মন্ত্র লিখিয়া দেন। অদ্ভুত

তাহার প্রতিক্রিয়া। তারকনাথের চেতনার কেন্দ্রটি যেন এক মুহূর্তে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। পার্থিব জগতের অস্তিত্ব তখন তাঁহার চৈতন্য হইতে বিলুপ্ত। জড় সমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ইহার পরও তিনি আরও দুইবার চৈতন্য-বিলুপ্তির এই অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর প্রিয় শিষ্যের প্রস্তুতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন। তারপর উপযুক্ত সময়ে ঢালিয়া দিতেন কৃপাবারি।

তরুণ সাধক তারকের মন কয়েকদিন যাবৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনের পিপাসা হইয়াছে দুনিবার। একদিন তিনি নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বকুল তলায় বসিয়া খুব কাঁদিতেছেন। এদিকে ঠাকুর নিজের কক্ষে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথায় ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি তারকের জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। "তারক কই গো, তারক কই গো?" বলিয়া সবার কাছে খোঁজ নিতেছেন। তারকনাথ উপস্থিত হইলে পরম কারুণিক ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বোস্ বোস্, ছাখ্ ভগবানের কাছে খুব কাঁদবি, প্রাণভরে কাঁদবি। কাঁদলে তার ভারী দয়া হয়।" ভক্ত জীবনে তখন তীব্র আকুতি, ক্রন্দন ও পরিশুদ্ধির পালা চলিতেছে—অন্তর্য্যামী ঠাকুর এ সংবাদটি জানিতেন।

আর একদিনের কথা। নিভৃতে পঞ্চবটিতে বসিয়া তারকনাথ ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান খুব গাঢ় হইয়াছে, সদ্গুরুর অন্তর্লোকেও পৌঁছিয়াছে তাঁহার আকর্ষণ। পরমহংসদেব ত্বরিৎ-পদে এ সময়ে ধ্যানাবিষ্ট তারকনাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হুহু ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভেতর গুর্ গুর্ ক'রে উঠল, আর এমন কাঁপুনি যে, থামে না। ঠাকুর আর একজনকে ডেকে বললেন, 'ওরে এ কান্না কি অমনি হয়? ওর একটা ভাব এসেছে, ওকে নিয়ে আয়।' আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া ঠাকুর অতঃপর তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরম ত্যাগী সাধক, অপাপবিদ্ধ মহান্ পুরুষ। তাঁহারই জীবনাদর্শে তারকনাথ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া

নিতেছিলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া, জীবনের পশ্চাৎপটখানি একেবারে মুছিয়া দিয়া, ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়া বসিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

কিছুদিন রোগভোগের পর পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এবার তারকের সংসার জীবনের এক বড় বন্ধন খসিয়া গেল। স্থির করিলেন, গৃহে গিয়া পিতার নিকট গ্রহণ করিবেন শেষ বিদায়। তারপর সদ্গুরুর চরণতলে বসিয়া শুরু করিবেন ঈশ্বর লাভের কঠোর তপস্যা।

শক্তি-সাধক রামকানাই ঘোষাল সেদিন পুত্রের সমক্ষে শক্তিমানের মতই আচরণ করিলেন। তারককে আশীর্ব্বাদ করিয়া সজল চক্ষে বলিলেন, "আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি। সংসার এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। বাবা, প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভগবান্ লাভ হোক।" সংসার ত্যাগের প্রাক্কালে পিতার নিকট হইতে এমন আশীর্ব্বাদ কোন্ সন্তানের ভাগ্যে মিলে?

দক্ষিণেশ্বরে ও রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তারকনাথ কিছুদিন একান্তে সাধন ভজন করেন। অতঃপর কাঁকুড়গাছির বাগানের নির্জ্জন পরিবেশে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন। এই অঞ্চল তখন জঙ্গলে পূর্ণ—সাপ, ব্যাঙ ও মশার রাজত্ব সেখানে। শিবানন্দ তখনকার জীবনসম্বন্ধে বলিতেন, "বেশ থাকতাম খুব নিরিবিলিতে। ...একটি আমগাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে সেইখানেই পড়ে থাকতাম। ধ্যান, জপ, বিশ্রাম সবই ওখানে। সাপগুলি ধুনির আগুন দেখে আস্তে আস্তে আবার চলে যেত। আমি এক একবার শুধু দেখতাম—তা আমার দিকে আসতো না। দিনে একবার ভিক্ষায় বের হতাম, যা জুটতো তাই খাওয়া যেত—বেশ লাগত।"

কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছ্রব্রতের ফলে তারকের দেহ তখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন দুটি সদা অন্তর্ম্মুখীন, অন্তরের অন্তস্তলে কোন্ পরশমণি যেন তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সারে ভুগিতেছেন। এই সময়ে রোগশয্যায়

থাকাকালীনই তিনি শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার কৃপার ধারা শেষবারের মত ঢালিয়া দিয়া যান। ত্যাগব্রতী রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূচনা দেখা দেয়, আর শেষ শয্যায় শায়িত গুরুকে কেন্দ্র করিয়া গুরুভাইদের মধ্যে রচিত হয় এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র।

চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরে আনয়ন করিলে ভক্ত তারক ও তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিনরাত পালা করিয়া গুরুর সেবা, আর অবসর সময়ে তীব্র সাধন-ভজন, ইহাই ছিল তখন তরুণ সাধকদের নিত্যকার কাজ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসময়ে একটা সহজ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ত্যাগী শিষ্যদের দান করেন প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাস। বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি ?—এখানেই সব রয়েছে। এই ছোক্‌রাদের খাওয়ালেই সব হবে।"

তাঁহার ইঙ্গিতে গেরুয়া বস্ত্র ও মালাচন্দন তখনি আনা হইল এবং তাঁহার প্রিয় একাদশটি ত্যাগী ভক্তকে নিজ হস্তে তিনি এসব দান করিলেন।

ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রদত্ত মালাচন্দন ও গেরুয়া বসন তারকের সন্ন্যাসকামী জীবনের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরে অমৃতময় জীবনের এক নূতনতর ইঙ্গিত।

কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে, ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে শোক আর নৈরাশ্যের ছায়া। এসময়ে তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আগাইয়া আসেন তাঁহার অসামান্য নেতৃত্ব শক্তি নিয়া। বরানগর মঠে তাঁহারই উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে ত্যাগী ভক্তেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ঠাকুরের আদর্শ ও বাণী প্রচারে তাহারা উদ্বুদ্ধ হয়। ঠাকুরের প্রদত্ত পরোক্ষ সন্ন্যাসব্রতকে নরেন্দ্রনাথ এইবার দিলেন আনুষ্ঠানিক রূপ। নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি ঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস নিলেন। তারকের নব নামকরণ হইল স্বামী শিবানন্দ।

বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম-প্রস্তুতি এবার গড়িয়া উঠিতে থাকে। চরম দারিদ্র্য, সামাজিক লাঞ্ছনা ও মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তরুণ সাধকেরা নিজেদের আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন।

সঙ্গীদের সাথে তারকও এ সময়ে ধ্যানানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। অন্তরে তাঁহার সদাই জাগিতেছে নির্গুণ রূপাতীতের ধ্যানাকাঙ্ক্ষা। এইবার বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরালে থাকিয়া শিবানন্দের অধ্যাত্ম-স্রোতকে বদলাইয়া দিলেন। ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। সারতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া কহিলেন, "ওরে, গুরুই সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।"

নির্গুণ ধ্যানের পরিবর্তে শিবানন্দ মত্ত হইলেন শ্রীগুরুর ধ্যানে, গুরুকে গ্রহণ করিলেন ইষ্টদেব রূপে।

পরবর্তী কালে তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার পরতে পরতে স্ফুরিত হয় এই সদ্‌গুরু-ভাবনা, জীবন তাঁহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে।

বরানগরের মঠ-জীবনে শিবানন্দের কঠোর তপস্যা ছিল গুরু-ভ্রাতাদের শ্রদ্ধার বস্তু। রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন। তাঁহার ত্যাগসর্ব্বস্ব জীবন উত্তরকালে উদ্বুদ্ধ করে হাজার হাজার ভক্ত নরনারীকে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও মঠ-জীবনের উজ্জীবনেও তাহা বিস্তার করে পর্য্যাপ্ত প্রভাব।

বরানগরের তরুণ সাধকদের মধ্যে তখন তপস্যার বান ডাকিয়াছে। ঈশ্বর দর্শনের আকুলতা হইয়া উঠিয়াছে দুর্নিবার। জপ ধ্যানেই বেশী সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়।

একদিন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পণ করিয়া বসিয়াছেন, জপ-সাধন ভঙ্গ করিয়া কোনমতেই তিনি আহারে বসিবেন না। এদিকে গুরু ভ্রাতারাও তাঁহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতে রাজী নন। অবশেষে ত্রিগুণাতীতানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "তারকদা যদি আমায় স্পর্শ ক'রে থাকেন, তা'হলে তা জপের সমান কাজ করবে। সেই অবসরে আমি দুটি খেয়ে নেব।"

তারকনাথকে তখন বাধ্য হইয়া এ কাজ করিতে হয়। এ ঘটনাটি

হইতে বুঝা যায়, ধ্যানী তারকনাথ গুরুভাইদের দৃষ্টিতে এ সময়ে কতটা আস্থা ও সম্ভ্রমের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারকের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিটি গড়িয়া দিয়াছিলেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে এই ভিত্তিকে তারক দৃঢ় করিয়া তোলেন নিজের একনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় তপস্যা দ্বারা।

বিশেষ করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে তপস্যার ধুনি তারক ও তাঁহার ত্যাগী গুরুভাইরা প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহা আনিয়া দেয় পরমা সিদ্ধি। এ সম্পর্কে মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

"যদিও তারকনাথ এবং অপর সকলে পরমহংস মশায়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে। তাঁহাদের প্রকৃত সাধক জীবন কাশীপুর বাগান হইতেই শুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে কয়েকটি অন্তরঙ্গ যুবকবৃন্দ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কঠোর তপস্যা পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান্ হইয়াছিল। ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া জপ ধ্যান, কখনও বা কীর্ত্তন করা, কখনও বা সৎচর্চ্চা, সৎপ্রসঙ্গ করা, কখনও বা হলঘরটিতে বসিয়া জপ করা, ধ্যান করা ইত্যাদি। দিবারাত্রি তাঁহারা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, কঠোর দুরূহ তপস্যা অর্থাৎ প্রাণস্পর্শী তপস্যা এই সময় হইতেই চলিতে লাগিল।"

ইহার পর শুরু হয় বরানগর মঠে এই ত্যাগব্রতী তরুণ তাপসদের সাধনা। একদিকে চরম দারিদ্র্য এবং কৃচ্ছ্রব্রত, আর একদিকে ভগবৎ-দর্শনের জন্য প্রাণপাত তপস্যা—এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তারক প্রভৃতি সাধকদের অন্তর্লোক ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় চেতনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে।

এ সময়ে কয়েকমাস এমন আকাশবৃত্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন, যাহার তুলনা সচরাচর মিলে না। পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শেষে আসিয়া ঠেকিয়াছে একটিতে। কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিয়া

সবাই মঠে বাস করিতেন এবং ধ্যানভজন করিতেন। কাহারো বাহিরে যাইবার দরকার হইলে, একটি বস্ত্রই ছিল সম্বল।

সকলেই তাঁহারা মোটামুটি সচ্ছল ঘরের ছেলে। কিন্তু বৈরাগ্যময় জীবন অবলম্বন করার ফলে আহার্য্য জুটিত শুধু নুনভাত। একদিন কিছুই জুটিল না, অগত্যা সবাই কীর্ত্তন-আনন্দে কাটাইয়া দিলেন।

"বরানগর মঠ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের দিন ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ কাহারও কোন বস্তু গ্রহণ করিত না। সাধনা আর তপস্যা, একমাত্র মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্যার বিঘ্ন হয়, এইজন্য সাধ্যমত কেহ কাহারও কোন দান গ্রহণ করিত না। একদিকে আহারের কষ্ট, অপর দিকে কঠোর তপস্যা, এইরূপ কঠোর তপস্যা করায় হৃদয়ে সিংহবিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদক্ষেপে বোধ হইত যেন মেদিনীকে কম্পিত করিয়া এই কয়টি যুবক জগতে বিচরণ করিবে। তাহারা জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্তু বা জগতের আকর্ষণী শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল। কি করিলে ব্রহ্মলাভ হয়, জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি বিকাশ করা যায়— এইটাই তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা যাইল যে, এই কয়টি যুবক গম্ভীর নিস্তব্ধ পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎকে বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল। বরানগর মঠে ইহাদের জীবনের প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জাগ্রত ছিল, প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে পরে তাহা দেখাইয়াছেন।"

স্বামী শিবানন্দের পুণ্যস্মৃতি অনুধ্যান করিতে গিয়া মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :

তারকদা সকালে রামতনু বোসের গলির বাড়ীতে আসিলেন। গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মতন একটা নেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উড়ি খুড়ি চুল, আর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি।

আমি বল্লুম, 'তারকদা, চল তোমায় নাইয়ে দি।' সেই সময় দিল্লী থেকে একজন গা মাজবার গোঁজ বা বগলী, যাকে খিস্‌সে বলে—সেইটে এনেছিল। আমি তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে

নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদার গা ঘস্‌তে লাগলুম। গা ঘসতে ঘসতে কাদাটে কাদাটে জল বেরুতে লাগল। এইরূপ অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা, মুখ ঘসার পর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো।

আমি বললুম 'তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন?' তারকদা বললেন, 'সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটা ডুব দিয়ে আসি। গাও ঘসিনি, গাও পুঁছিনি। যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। সেইজন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে।'

তারপর তিনি বললেন, 'ওহে একটু গুল দাও দিকিনি? দাঁতটা মাজি। অনেকদিন দাঁত মাজতে ভুলে গেছি।'

আমি তখন একটু গুল গুঁড়িয়ে এনে দিলুম। তখন তারকদার জোয়ান বয়স, রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গা ঘসে দেবার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে হল, কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছ্‌ল। তারপর কাপড়-চোপড় রোদে শুকুতে দিলুম।

তারকদা ঘরের ভিতর গিয়ে একটু শুলেন। দেখি না, পায়ের গোড়ালীগুলো একেবারে ফেটে গেছে। আমি নারকেল তেল এনে সেই ফাটাগুলোর ভিতর দিতে লাগলুম। তারকদা একটু হেসে বললেন, 'ওহে, তুমি একদিন দিয়ে আর কি করবে? আমায় সর্ব্বদাই এ রকম অবস্থায় থাকতে হয়। পা-টা ফেটে গেছে এতে আর কি ক্ষতি হয়েছে? যাহা হোক, তারকদা আহারাদি ক'রে চলে গেলেন। এই সময়ে তিনি সাধন-ভজনে বিভোর থাক্‌তেন, দেহের দিকে কিছুই মন ছিল না।

বরানগর মঠবাড়ীটা আসলে ছিল একটা জঙ্গলাকীর্ণ, অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাগান বাড়ী। তারক প্রভৃতি তরুণ রামকৃষ্ণ-ভক্তেরা এখানে বাস করার সময় যে সব কাণ্ড করিতেন, মহেন্দ্রনাথ তাহার চিত্র দিয়াছেন:

"মঠবাড়ীর আশে পাশে অনেক পোড়ো জমি ছিল। কেলোমালী একটা উড়ে মালী। সে কিছু ক্ষেত করেছিল। সেই ক্ষেতে বড় বড় পাঁড় শসা হ'ত। মধুর বালকস্বভাব তারকদা এক একদিন চটে উঠতেন—'ছুরতেরি ছাই। এমন ছুধ্‌ চেটে খাওয়া আর খাওয়া

যায় না।' এই বলে তিনি হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেলো মালীর ক্ষেতে যেতেন এবং দু-চারটা পাঁড় শসা তুলে আনতেন।

কেলো মালী সেই সময় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকত, সুমুখে আসত না। তার পরদিন, কেলোমালী এসে ন্যাকামি করে কান্না শুরু করত। সে বলত, আমি গরীব মানুষ, আমার শসা নিলেন? আমি এখন কি করব।' সেটা কিন্তু মৌখিক ছিল। তারকদা কখনও কখনও দু-চারখানি রুটি দিতেন। কখনও বা কোন ভক্ত এলে তাঁকে বলে কেলো মালীকে একটা টাকা বা একখানা কাপড় দেওয়াতেন। এই শসা তুলবার সময় কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন। সে একটা হাসি তামাসা আমোদের জিনিস ছিল।

দু'চারটা শসা এনে তারকদার কি আহ্লাদ। কি হাসি। যেন কত দিগ্বিজয় হ'ল। তিনি ঘাড় নেড়ে নেড়ে মুখ নেড়ে নেড়ে, ডান হাতের তর্জ্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাসি তামাসা করতেন, তাতে সকলেই বড় আনন্দিত হ'তেন। সে চিত্র এখনও আমার সুমুখে রয়েছে। যা হোক সেই কেলো মালীর শসা একটু নুন ঝাল দিয়ে তরকারী হত।"

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহব্যথা এক একদিন শিষ্যদের মুহ্যমান করিয়া ফেলে। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলের মধ্য দিয়া করেন তাঁহারা স্মৃতি তর্পণ। বিরহের মধ্য দিয়াই ভাবময় রামকৃষ্ণ-সত্তায় চলে তাঁহাদের আত্মিক অবগাহন। প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ তারকনাথের এমনি এক বিরহখিন্ন দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়: "আমি বরানগর মঠে গেলুম। মেঘলা করেছে। ঝিম ঝিম বৃষ্টি হচ্ছিল। বড় ম্যালেরিয়া হওয়ায় সকলেই বাইরে পালিয়েছে। শশী মহারাজ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-আরতির উদ্যোগ করিতেছেন। বড় ঘরটাতে তারকদা ও শরৎ মহারাজ আছেন। তারকদা দক্ষিণদিকের দেওয়ালেতে পিছন করে বাঁ দিকের হাতে মাথা রেখে বেঁকে শুয়ে আছেন। শরৎ মহারাজ একটু দূরে আধশোয়া হয়ে, হাতে মাথা রেখে, শুয়ে রয়েছেন। আমি কাছে গিয়ে বসলুম।

বৃষ্টির জল পড়ায় বাগানের আম পাতা থেকে টোপ টোপ জল

গড়াচ্ছে, বাড়ী নিস্তব্ধ। দু'জনের মুখ ভাবে বিভোর ও বিষাদে পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। খানিকক্ষণ পরে তারকদা বললেন, 'শরৎ, বাঁয়াটা পাড়ো তো, ঠেকা দাও তো।' তারকদা উঠে বসে গাইতে লাগলেন—

হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথ পড়ল, সহি! মালতী মালা;
নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস,
সুখ গেল প্রিয় সাথে, দুঃখ মোহি পাশ।"

তারকদা প্রাণের আবেগে এ বিরহগীত এমন সুন্দর গাইতে লাগলেন যে আমার পর্য্যন্ত মন দ্রব হয়ে গেল। আর তারকদার ও শরৎ মহারাজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল—'নয়ন জলে বয়ান ভাসে।'

হৃদয় বিদারক বিরহ যে কি জিনিস এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যে অতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহা যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সঙ্গীত প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে নাদ ব্রহ্ম—যা হৃদয় হতে উদ্ভূত হয়ে কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ হয়েছিল। সেই গাওয়া ও শুনায় আমরা তিনজনেই স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অন্তরে যেন বিরহভাবের তরঙ্গ চলতে লাগল। পক্ষান্তরে ইহা তারকদা ও শরৎ মহারাজের সাধক জীবনের অন্যতম রূপ; কারণ তাঁহাদের প্রাণও তখন ভগবান্ লাভের জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। এইজন্য নিজেদের হৃদ্‌গতভাবে তাঁরা নিজেরাই সুর করে ভজন গাইছিলেন।

শেষ সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বললাম, 'বরাহনগর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে আছে?'

শরৎ মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন সেটা খুব মনে আছে, প্রাণে বড্ড ধাক্কা লেগেছিল।'

কয়েক মাসের মধ্যেই বরানগরের চরম দারিদ্র্য বরণের পালা

শেষ হইল। গৃহী ভক্তেরা এই ত্যাগী সাধকদের মঠে কিছু কিছু সাহায্য দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের পূজা ভোগ ও সন্ন্যাসী আশ্রমিকদের অশন বসনের কিছুটা সুরাহা হইল।

তারকনাথ ছিলেন স্বভাবতঃই ধ্যানী, গুরুর দেওয়া সাধন নির্দ্দেশের মধ্য দিয়া নিজের তপস্যা তিনি চালাইয়া যাইতে থাকেন পরম নিষ্ঠাভরে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "প্রথম হইতেই একটা ভাব তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হইত। একদিকে যেমন তিনি নির্লিপ্ত ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, কোন বস্তুতে যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা ছিল না, অপরদিকে তাঁহার অতিশয় উদার ভাব ছিল অর্থাৎ কোন গণ্ডী বা সীমার ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না। এই সময় তাঁর মুখে প্রায় এই কথাটা থাকিত—'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'। এত বিধি নিয়ম পূজা—এসব তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁর ধাতস্থ এসব নয়। 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ভাবটাই তাঁর খুব প্রবল ছিল। অপর যা' কিছু তিনি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁর প্রাণের জিনিস নয়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা আরও প্রবলভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল,—যদিও তিনি কোন বিশেষ ভাবের বিরোধী বা পক্ষপাতী ছিলেন না। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবটি-ভবিষ্যতে তাঁর ভিতর ভালবাসা উদ্ভূত করিয়াছিল। এই ভালবাসা হইতেছে আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ নিজের আত্মাকে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে দর্শন করা।"

অতঃপর স্বামী শিবানন্দের জীবনে শুরু হয় পরিব্রাজনের পালা। ভারতের বহু তীর্থ তিনি পরিভ্রমণ করেন, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে তপস্যা করার জন্য মঠ হইতে কয়েকবার নিষ্ক্রান্ত হন।

এসময়কার তিতিক্ষাময় জীবনের নানা কাহিনী তিনি উত্তরকালে ভক্তদের কাছে বর্ণনা করিতেন :

"এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাকৃতো না। সেই এক কাপড়ই অর্দ্ধেক পরে আর অর্দ্ধেক গাঁতি মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়তো কোন

কুয়োতে স্নান ক'রে, কৌপীন প'রে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে নিতাম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র বৈরাগ্য। শারীরিক আরামের কথা মনেই হোত না। কঠোরতাতেই আনন্দ।"

নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক জীবনের নানা দুঃখ ও দুর্দ্দশায় সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁহার ভরসা স্থল, অন্তরালে থাকিয়া তিনিই তাঁহাকে সতত দিয়েছেন আশা আশ্বাস ও আশ্রয়। শিবানন্দ মহারাজ কহিতেন, "এসময়ে ঠাকুরই সর্ব্বদা সঙ্গে থেকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কখনও অভুক্তও রাখেননি। অবশ্য এমন দিন গিয়েছে যে খুব সামান্যই আহার জুটেছে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। বিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। দুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি। তখনও খাওয়া হয়নি। নিকটে কোন লোকালয় ছিল না। এমন সময় পাশের বেলগাছ থেকে একটা পাকা বেল ধুপ্ ক'রে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল। তখন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে সেদিন কাটিয়ে দিলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিলেন। রামকৃষ্ণ শিষ্য-মণ্ডলীতে আনন্দের বান ডাকিল, এবং সারা ভারতেও অপূর্ব্ব প্রাণ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ মঠ তখন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই দৃষ্টিতে এক পরম গৌরবের বস্তু। এই মঠের উৎস-মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অন্যান্য গুরু ভাইদের মত শিবানন্দও এ সময়ে বিবেকানন্দের এই কর্ম্মযজ্ঞের পাশে আসিয়া দাঁড়ান।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ধ্যানী শিবানন্দ মহারাজ এবার আবির্ভূত হন কর্ম্মযোগীরূপে। বেদান্ত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারকল্পে শিবানন্দ এই সময়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। এই সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রতিভাত হইতেন বেদান্তেরই এক জীবন্ত ভাষ্যরূপে। শিবানন্দের বেদান্ত প্রচার সে সময়ে মাদ্রাজ ও কলম্বোতে চাঞ্চল্যের

সৃষ্টি করে। তাঁহার কলম্বো কেন্দ্রের ছাত্রী হরিপ্রিয়া (মিসেস পিকেট) তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইয়া পরবর্ত্তীকালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজী-ল্যাণ্ডে বেদান্তের প্রচারে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বারাণসীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন শিবানন্দের অন্যতম অবদান। তিরোধানের কিছু পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের জন্য ভীঙ্গার রাজার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হন। এই টাকা দিয়া বারাণসীতে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তিনি করেন এবং শিবানন্দকেই দেন ইহার দায়িত্বভার।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। শিবানন্দ মহারাজ উপলব্ধি করিলেন, শুধু মৌখিক ভাষণ-দানে তো বেদান্তের তত্ত্ব মানুষের জীবনে প্রতি-ফলিত হইবে না, ভজন-সাধন ও পূর্ণ বেদান্তের অনুকূল জীবনের আদর্শ দেখাইতে হইবে। তবেই সম্ভব হইবে বেদান্তের প্রকৃত বিস্তার সাধন।

অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার বলে একাজ তিনি সম্ভব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিজের ও সহকর্ম্মীদের এই সময়কার তপস্যা ও বৈরাগ্যের আদর্শ কাশীধামে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোড়ার দিকে চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে শিবানন্দকে কাটাইতে হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিটি সদা বিরাজিত থাকিত অটল মহিমায়। নিত্যকার ধূলি ঝঞ্ঝার ঊর্দ্ধে, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায়, সর্ব্ব সময়ে তিনি অবস্থান করিতেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :

"কাশীতে যখন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, তখন কাশীবাসী অনেকেই আপত্তি তুললেন—'অদ্বৈত আশ্রম বল্ছেন আবার এখানে পূজা হোম ইত্যাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত মতের বিরোধী ভাব।' এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার আপত্তি তুলতে লাগলেন। আমি এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। শেষে জিজ্ঞাসুদের বুঝিয়ে দিলুম যে, নীরস অদ্বৈতবাদ—সেভাব এখানে নয়। এখানে হচ্ছে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত অদ্বৈতভাব। এখানে রসে বশে সারেমাতে বস্তু থাকবে। অধিকারী হিসাবে অদ্বৈতজ্ঞানও থাকবে, ভক্তি পূজা পাঠ ইত্যাদিও থাকবে। একঘেয়ে অদ্বৈতবাদ হ'লে প্রাণটা বড় শুষ্ক হয়ে যায়। ভক্তি প্রাণকে সরস রাখ্‌বার একটা উপায়। আর কর্ম্মও নিতান্ত আবশ্যক—এও এক বড় সাধনা।"

সহজ ভাষায়, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে এমন করিয়া তিনি এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিলেন যে, কাহারো মনে কোন প্রশ্ন রহিল না, বিরূপ ভাব রহিল না। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের বহুকথিত মূল তাত্ত্বিক সূত্রটি—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—সকলের মনে গ্রথিত হইয়া গেল।

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব অর্থাভাব। বাড়ী ভাড়াও অনেক বাকী পড়িয়া গিয়াছে। শিবানন্দ মহারাজ বহু কষ্টে একদিন একশত টাকা যোগাড় করিয়াছেন এবং বাড়ীওয়ালাকে দিবার জন্য তাহা রাখিয়া দিয়াছেন একটি ভাঙ্গা ক্যাসবাক্সে।

আশ্রমের একটি নবাগত যুবক কর্ম্মীর উপর এই সময়ে বাজারের ভার ছিল। লোভে পড়িয়া সে ঐ টাকাটা আত্মসাৎ করিয়া বসে এবং আশ্রম হইতে পলায়ন করে। সব টাকা নিয়া গিয়াও সে কিন্তু ক্যাসবাক্সে একটি পয়সা রাখিয়া যায়। কোনমতে তাহা দিয়াই সেদিন বাতাসা কিনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্ভব হইল।

বহু কষ্টে যোগাড় করা টাকাগুলি তো উধাও হইয়া গেল। এখন বাড়ীভাড়ার টাকা আসিবে কোথা হইতে। এত টাকা আবার কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে বাড়ীওয়ালাটি অতি দুর্দ্দান্ত লোক, বাগে পাইলে সহজে কাহাকেও সে ছাড়ে না। আশ্রমিকেরা প্রমাদ গণিলেন।

বাড়ীওয়ালা শিবানন্দ মহারাজকে ডাকাইয়া নেয় এবং টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাকে নিজের গদীতে আটকাইয়া রাখে। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আপাততঃ মিটমাট হইল, এবং মহাপুরুষজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

বিস্ময়ের বিষয়, যে যুবকটির জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহার উপর

শিবানন্দ স্বামীর এতটুকু কষ্টভাব নাই। প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলিলেন, "ছেলেটির অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার ধর্ম্মবুদ্ধি কিছুটা ছিল—তাই তো একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল। আর তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া গেল। কাজ তো আটকায় নি!"

শিবানন্দ মহারাজের সেদিনকার এই ক্ষমাসুন্দর রূপ সেদিন মঠের কর্ম্মী ও ভক্তদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক মহিমা ও অপূর্ব্ব মহাপ্রাণতা ছিল বলিয়াই, শুধু বারাণসীর যুবক মহলেই নয়, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহলেও তাঁহার আত্মিক প্রভাব সে সময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিবিড় ধ্যান-তন্ময়তার মধ্য দিয়া তখন মহাপুরুষজীর দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত হইত। যে অতীন্দ্রিয় আনন্দ-আস্বাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনে সম্ভব করিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই নিবিড়ভাবে, নিরন্তর ধারায়, তিনি উপলব্ধি করিতে চাহেন। তাই কোনদিন ইষ্টদর্শন না হইলে, দিব্য অনুভূতির রসে অন্তর অভিষিক্ত না হইলে, দুঃখের তাঁহার সীমা থাকিত না। বালকের মত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া খেদোক্তি করিতেন, "চন্দ্র, দিনটা আজ বৃথায় গেল। আজ তাঁর দর্শন পেলাম না—তাঁর জন্য একটু চোখের জলও বেরুল না।"

ধ্যানী সাধকের অন্তরাত্মায় মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে সর্ব্বপ্লাবী ঈশ্বরীয় চেতনা। কঠোরতপা, ধ্যান-গম্ভীর সাধক উদ্বেল হৃদয়ে বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়ান, আর ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলেন—

তুমি পূর্ণ পরাৎপর ;
তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ! কার সাধ্য
ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই কত
তুমি বাক্য মনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত
তোমারে দেখিতে চায়॥

শিবানন্দের কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, নয়ন দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত। রামকৃষ্ণময় সাধকপ্রবরের এই রসাপ্লুত, প্রেমমধুর মূর্ত্তি যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে চিরতরে।

বারাণসীর আশ্রমে শিবানন্দ মহারাজ সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা-পূত জীবনের এটি এক সুবর্ণময় যুগ। দিনের পর দিন তখন অদ্বৈত আশ্রমে চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ চলিয়াছে। কোন দিন ব্রহ্মচারীদের হয়তো আহার জোটে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় পাশের বাড়ীর বাগান হইতে তাহারা দুই চারিটা পেয়ারা পাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে। এই ত্যাগ তিতিক্ষাময় দিনগুলিতে কিন্তু শিবানন্দ মহারাজের কঠোর তপস্যা বহিয়া চলিয়াছে অবিরাম ধারায়। সংঘাতময় বাস্তব জীবনের বহু উর্দ্ধে, এক অবিচল ধ্যানতন্ময়তায় তিনি আবিষ্ট হইয়া আছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া হাসিয়া বলিতেন, "তারকদা, তোমার ধ্যান কি টাকার যোগাড় করতে পারবে? আশ্রমের জন্য শিগ্‌গীর টাকা সংগ্রহে লেগে পড়ো।" কিন্তু একথা শুনিবার মত মানুষটি তখন যেন হারাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর ক্রমাগত কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের ফলে শিবানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। অতঃপর তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্ব অপর একজনের উপর ন্যস্ত করিয়া বেলুড়ে চলিয়া আসেন।

সে বার ডায়মণ্ড-হারবারের একটি বাগ্দী ছেলে দীক্ষা নিবার জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে ঐ ছেলেটিও পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া গেল। ভোজন শেষে এক রক্ষণশীল ভক্ত জাত বিচারের কথা উঠাইয়া মঠ সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে থাকেন।

জাত বিচারের এই কথা শিবানন্দ মহারাজের কানে গেল। শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দ্যাখো, এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান্

লাভ, সাধন-ভজন—এই হল এখনকার মূল উদ্দেশ্য। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা ও সাধন ভজন করা, এইটাই হচ্ছে দেখবার জিনিস। বামুন কি কায়েত, কি বাগ্দী, একথার কোন আবশ্যক নেই; কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোন কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন-ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। যে ঠাকুরকে মান্‌বে, সাধন-ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে। জাতাজাতির কথাটা এখানে যেন না হয়।"

সে-বার শীতকালে বড়দিনের সময় বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিশেষ ভোগ দেওয়া হইতেছে। বহু ভক্ত ও অভ্যাগত প্রসাদ পাইবার জন্য আসিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত শিবানন্দের এ সময়কার একটি আচরণ সম্পর্কে লিখিতেছেন:

"দুপুরবেলায় উঠানে সকলে খাইতে বসিয়াছেন, দালান আর উঠানের মাঝখানে যে জমিটা সেখানে সকলে জুতা ছাড়িয়া রাখিয়াছেন। তখনও প্রায় শতাবধি লোক দাঁড়াইয়া আছেন, বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, ঐ জায়গাটার জুতাগুলি সরাইলে ভক্তেরা বসিতে পারেন। সকলেই এই কথা বেশ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন; কেহই উঠিয়া নিজের নিজের জুতা সরাইলেন না—মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন। তারকদা স্বভাব সুলভ বালকভাবে কহিতে লাগিলেন 'ঠিক তো, ঠিক। জুতাগুলি সরালে এদেরও জায়গা হয়।' এই কথা বলিয়া, কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া সেই জুতাগুলি দুইবাহু ও বক্ষের মাঝে ধরিয়া, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। জুতা উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'কি করেন মহাপুরুষ, কি করেন? আমার জুতায় হাত দিবেন না, তিনি বলিলেন, 'ওহে! বস, বস—খাও। এই সামান্যর জন্য এত চঞ্চল হবার দরকার নেই, এটা এখনি ক'রে নিচ্ছি।' এইরূপ তিন চারিবার করিতেই জায়গাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। পরে নিজে একটা ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁট দিলেন। তারপর সকলকে নিজ নিজ আসন আনিয়া বসিতে বলিলেন।

যাঁহারা আহারের জন্য উঠানের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, 'হাঁ, সত্যকার মহাপুরুষ বটে! কোন মান, অভিমান নাই।' এই উপাখ্যানটিতে তাঁহার একটি বিশেষ মনোভাবের চিত্র পাওয়া যায়। যিনি উপস্থিত সকলের গুরু বা গুরুস্থানীয়, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সকলের জুতা দুই বাহু ও বুকের মাঝে রাখিয়া সরাইলেন—কোনই সঙ্কোচ করিলেন না। তিনি আদেশ করিলে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি জুতা সরাইত। কিন্তু তিনি এত বিনয়ী ও অভিমানশূন্য লোক ছিলেন যে, এসব বিষয়ে কোন প্রাধান্য বা ইতর বিশেষ ভাব তাঁর একেবারেই মনে আসিত না।[১]

কয়েক বৎসর পরের কথা। শিবানন্দজী আবার বারাণসীতে আসিয়াছেন। এসময়ে প্রায়ই থাকেন তিনি ধ্যানমগ্ন, বাস করেন অপার্থিব আনন্দ রাজ্যে। অদ্বৈত আশ্রমের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার একটি ফটো তুলিবেন। বহু অনুরোধের পর তাঁহাকে সম্মত করানো গেল। আসনে উপবেশন করার পর যুক্তকরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন, সম্মুখে রাখা হইল একটি কমণ্ডলু। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাপুরুষজী ধ্যানতন্ময় হইয়া পড়িলেন। দৃষ্টি ভ্রূনিবদ্ধ, একেবারে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। ছবি তোলার ব্যাপারটি মহাপুরুষের কাছে তখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ এই সঙ্কটের অবসান করিলেন। ধ্যানাবিষ্ট শিবানন্দজীর গায়ে ধাক্কা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "মহাপুরুষজী, প্রকৃতিস্থ হয়ে বসুন, আপনার ফটো তুলবে যে!"

বার বার ডাকাডাকির পর মহাপুরুষজীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিদ্রোত্থিতের মত বলিতে লাগিলেন, "অ্যাঁ·· অ্যাঁ কি বলছো?" কোনক্রমে তাড়াতাড়ি করিয়া সেদিনকার ফটো তোলা পর্ব্ব শেষ করা হইল।

শিবানন্দ মহারাজের এই সময়কার জীবন আত্মসমর্পণের সাফল্যে

১ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান: মহেন্দ্রনাথ দত্ত

মহিমোজ্জ্বল—গুরুকৃপার দিব্য রসধারায় তাহা অমৃতময়। তাঁহার সমকালীন এক চিঠিতে ইহার আভাষ মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন, ...'তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ। আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার কৃপালাভ। সেও তাঁহারই নিজগুণে! আমার এমন কোন গুণ ছিল না, যদ্দ্বরা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এই মাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

অন্যত্র আবার লিখিতেছেন—"আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস এই মাত্র জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তাঁকে স্মরণ করান তখন স্মরণ করি। যখন পাঠ করান তখন পুস্তকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহারও সহিত ধর্ম্মকথা আলাপ করি—এই আমার কাজ। ভরসা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে আমার কিছুই নাই এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও নাই তাঁহার কৃপায়। আমি এখন প্রভু যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব। নিজের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই; প্রভু যেরূপ করাইবেন, তাহাই করিব।"

দীর্ঘ অধ্যাত্ম প্রস্তুতির পর শিবানন্দকে সদ্‌গুরু কর্ম্মবৃত্তের মধ্যে টানিয়া আনেন। জীবনের চল্লিশ বৎসর কটিয়াছে কঠোর প্রব্রজ্যা ও তপশ্চর্য্যায়। এবার তিনি মঠের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই মঠ যে ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই তৈরী! আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রাণকেন্দ্ররূপে এ যে তাঁহারই সুমহান্ সৃষ্টি! প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া ঠাকুর স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছেন, এই মঠ ও মিশনকে স্থাপন করিয়াছেন নূতন অধ্যাত্ম ভাবধারার উৎস রূপে। এই ধৃতিটি শিবানন্দের হৃদয়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

বড়লাট-পত্নী লেডি মিণ্টো সেবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া উঠেন, "স্বামী বিবেকানন্দই তো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন; তাই না?" শিবানন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, "না—তা কেন? প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই সঙ্ঘ আমরা

কেউ সৃষ্টি করিনি! ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর সকলকে শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি করে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালনা করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। সেই হল মঠের গোড়াপত্তন।”

জীবন-প্রভুর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এইবার তিনি নিষ্ঠা সহকারে আঁকড়িয়া ধরিলেন। জপ ধ্যান ও প্রব্রজ্যার শেষে তাঁহার জীবনে শুরু হইল কর্ম্মযোগের নবতম অধ্যায়।

পূর্ব্বের পরিব্রাজক জীবন ও তপস্যার কথা কেহ উল্লেখ করিলে তিনি কহিতেন, “এক সময় এ সব খুব করা গেছে। এখন তো ঠাকুর আমাদের কর্ম্মবৃত্তে টেনে এনেছেন। তাঁর যুগধর্ম্ম প্রচারের জন্য এইরূপই প্রয়োজন হয়েছে। তাই এখন এই বুড়ো বয়সে আমাদের দ্বারাও ঠাকুব তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম যে, তপস্যা ক’রেই জীবন কাটিয়ে দেব···করেছিলামও তাই। কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায়?”

ভক্তজনের জন্য বাবুরাম মহারাজের ছিল প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা—মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হৃদয়যোগ তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর দেখা গেল, বহিরাগত ভক্তের দল ক্রমে ক্রমে মঠের সহিত যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। বাবুরাম মহারাজ নাই, আর কে তাহাদের দরদভরা দৃষ্টি নিয়া দেখিবে? কে আদর-যত্ন করিবে? সাধন-নির্দ্দেশই বা এত উৎসাহ করিয়া কে দিবে? অনেকে মঠে আসা বন্ধও করিয়াছিলেন।

এক রাত্রিতে কিছুসংখ্যক যুবক ভক্ত বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। আরতির পর তাঁহারা নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শিবানন্দজী আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা তোমরা আজকাল আর আগের মত মঠে আসছো না কেন? আগে যেমন মঠে আসতে এখনও তেমনি এসো। জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি।”

এই ধ্যান-গম্ভীর মহাপুরুষের অন্তর্লোকে এমনতর প্রেমের ফল্গু

বহিতেছে একথা জানিয়া যুবক ভক্তদল বিস্মিত হইলেন। ইহার পর হইতে বহু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধক শিবানন্দের স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইতে থাকে। বহুতর প্রাণ-শিখা তাঁহার অধ্যাত্ম-জ্যোতিতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, রামকৃষ্ণ মণ্ডলী ও বেলুড় মঠ তাঁহার প্রভু রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় সৃষ্ট। মনে প্রাণে সদাই তিনি আশা করিতেন, এই মণ্ডলী ও মঠ হইবে অধ্যাত্ম-শক্তির এক বিরাট উৎস। তাই নিষ্ঠাভরে নিজের আত্মিক সাধনা ও কর্ম্মসাধনাকে এই মঠের সহিত একান্তভাবে তিনি যুক্ত করিয়া দিলেন। নিজে যেমন সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় সদা বিভোর থাকিতেন তেমনি মঠের কর্ম্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিস্তারিত করিতেন সেই চিন্তা ও সাধনার ধারা।

অধ্যাত্ম-আলোচনা প্রসঙ্গে যে কোন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ও ভক্তের চেতনাকে তিনি অবলীলায় উর্দ্ধতর স্তরে নিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও সাধন তত্ত্বের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কোন গৃহস্থ ভক্ত একবার বলিতেছিলেন, "মহারাজ, জীবনে কত পাপ করেছি। আপনি মহাপুরুষ। আমায় কৃপা করুন।"

শিবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা? তুমি কি ঠাকুরের কথা শোননি? ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, পাপ—তুলোর পাহাড়। পাহাড় প্রমাণ তুলো যেমন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই অচিরে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ভগবানের কৃপাকণা লাভে পাহাড়-প্রমাণ পাপও ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কোন ভয় নেই। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম করো। আর কিছু করতে হবে না!"

রাঁচীর ভক্তগণ একবার শিবানন্দ মহারাজকে তাঁহাদের উৎসবে নিয়া গিয়েছেন। এটি ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মতিথি উৎসব। শিবানন্দজী ইষ্টদেবের পূজায় উপবিষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া ঠাকুরের চরণে পুষ্পবিল্বদল দিয়া তখন পূজাকক্ষের বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার দেহ ভাবাবেশ ও দিব্য অনুভূতিতে থর থর

করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন দুটি রক্তবর্ণ। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়েন।

শিবানন্দজী প্রশ্ন করিলেন, "কি চাই?" মহিলা ভক্তটি করজোড়ে কহিলেন, "মুক্তি।"

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "আচ্ছা তা হবে। আমি ঠাকুরকে বলব।" প্রত্যয় ও করুণার দীপ্তিতে তাঁহার আননখানি তখন সমুজ্জ্বল।

এই সময়ে এক উপদেশ-প্রার্থী ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিতেছিলেন, "ঠাকুরের নামই তো শুন্‌ছি, তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য তো আমাদের হল না, মহারাজ!"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "সে কি কথা? যাঁরা ভগবানের পুত্রকে দেখেছে, তারা যে ভগবান্‌কেও দেখেছে! আমি আর আমার পিতা যে একই।" এই তেজোদৃপ্ত বাণী শুনিয়া সকলে নির্নিমেষে সম্ভ্রমভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বহুদিন আগের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, রাখাল, তারক প্রভৃতিকে বলিতেছিলেন, "ছাখ্, কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।"

তারক বলিয়া উঠিলেন, "আমি কিন্তু ওসব পারবো না।"

ঠাকুর তখন উত্তর দিয়াছিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে। তুই এখন অত ভাবিস্ কেন?"

সেই ঐশী ইচ্ছা এইবার বুঝি রূপায়িত হইতে থাকে। এতদিন শিবানন্দ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। মুমুক্ষু ভক্তেরা কত কাঁদাকাটি করিয়াছে, প্রবীণ গুরুভ্রাতারা বার বার অনুরোধ উপরোধ করিয়াছেন, তিনি সে সব কানে তোলেন নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা পরিভ্রমণের কালে, দীক্ষাদান সম্পর্কে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়, সম্মত হন মুমুক্ষুদের সাহায্য দানে।

ঢাকা শহর ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক ভক্ত স্বামী শিবানন্দের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান দীক্ষার জন্য। শিবানন্দজীর মন এবার নরম হয় এবং কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান

তাঁহার নির্দ্দেশের জন্য। এ নির্দ্দেশ তিনি লাভ করেন, এবং মঠ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আদেশপ্রার্থী হইয়া তিনি এক পত্র লিখেন।

ব্রহ্মানন্দজী উল্লাসত হইয়া উত্তর দেন, "খুব দিন, প্রাণ খুলে দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাঁদের জীবন তো ধন্য হয়ে যাবে।"

শিবানন্দ মহারাজ এই সময়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ঢাকাতে আমি প্রায় দেড়মাস ছিলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার নাম পাইয়াছে। সে সময় ঠাকুরের প্রেবণায় আমাব ভিতরে একটি ভাব আসিয়াছিল।"

মঠের নবীন ব্রহ্মচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া শিবানন্দজী উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন,[১] "খুব ডেকে যাও, খুব তার নাম ক'রে যাও। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পড়ে থাক —যখন যা দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। পবিত্র হৃদয়ে ভগবান্ শীঘ্র প্রকটিত হন, কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার চেষ্টা করো। এখন তো তোমাদের ছাত্র জীবন। ছাত্র জীবন বড়ই পবিত্র। ঠাকুর পবিত্রহৃদয় ও বিষয়-বাসনাহীন ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। যার মনে বিষয়ের দাগ লাগেনি তার শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য হবে। আব দরকার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেমন বললাম, সবল প্রাণে সব বিশ্বাস ক'রে নিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে সাধনায় লেগে যাও। দেখবে তাঁর দয়া হবে—খুব আনন্দ পাবে। আসল কথা কাজ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন—'খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো নেশা হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে—পরিশ্রম ক'রে ঘুঁটতে হবে, সিদ্ধি খেতে হবে—তবেই নেশা হবে।' তেমনি ভগবানের নাম করো, তাঁর ধ্যান করো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো—আন্তরিক ভাবে, তবেই আনন্দ পাবে।"

সে-বার একটি মহিলা ভক্ত মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করেন,

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন

বাবা, আমাদের কি ক'রে উদ্ধার হবে? কি ক'রে এ মায়া থেকে মুক্ত হব? আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।"

তিনি এ কথার উত্তরে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "গ্যাখো, আসল কথাটা কি জানো, এ সংসার যে অনিত্য, এ বোধ তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ছাড়া এ-মায়া-জাল কাটাবার অন্য কোন উপায় তো নেই মা! শ্রীভগবান্ নিজেই গীতাতে বলেছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত ক'রে রেখেছে, তা বাস্তবিকই দুস্তরা, এ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু যারা অনন্য মনে আমায় ভজনা করে, তারা এই দৈবী মায়া অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।'

"অনন্য মনে তাঁকে ডাকা ছাড়া আর তো জীবনে কোন উপায় নেই। তোমরা সংসারে রয়েছ, নানা কাজকর্ম্ম আছে। তোমাদের তো সাধনভজন করবার মত সময় নেই। তোমরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক আর কাঁদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা করো, 'প্রভু দয়া করো, দয়া করো।' কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। তখন তিনি সহস্র সূর্য্যপ্রভায় প্রতিভাত হবেন। তখন দেখবে যে তিনি অন্তরেই রয়েছেন। খুব কাঁদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার করবে। একমাত্র ভগবান্ই সত্য, আর সংসার, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ সবই অনিত্য। এইরকম বিচার আর প্রার্থনা করতে করতে তবে তাঁর দয়া হবে; সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের দিকে যাবে।"

সাধারণভাবে মঠের ভক্ত সাধকেরা শিবানন্দ স্বামীর ধ্যান-পরায়ণ, গম্ভীর রূপটির সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবীন ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে গিয়া হাসি-তামাশাও তিনি কম করিতেন না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন:

"হাসি-তামাশার ভিতরেও একটা বিশেষত্ব দেখতুম, যদিও তিনি নানা রকম রঙ্গভঙ্গী ক'রে নিজে হাস্‌চেন বা অপরকে হাসাচ্ছেন, কিন্তু তা হলেও তাঁর মনটা আর একদিকে রয়েছে। মুখে তিনি এক বলছেন—মন কিন্তু আর এক দিকে। উনি সেটা এমনভাবে বলছেন যে তাতেও আর একটা বড় উচ্চভাব রয়েছে। আবার এই রঙ্গভঙ্গী করবার মুহূর্ত্তেক পরেই তিনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন পুরুষ হইয়া যাইতেন; তখন আর পূর্ব্বের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাউনি নাই, মুখের আর সে ভাবও নাই! সহসা এক গম্ভীর ধ্যাননিমগ্ন ব্যক্তির বিকাশ পাইল এবং যাহারা পূর্ব্বে তারকদার চাপল্যের কথা শুনিয়া হাস্য-কৌতুক করিতেছিল তাহারাও তারকদার এই আশ্চর্য্য ভাব পরিবর্ত্তনে স্তম্ভিত ও সংযত হইয়া যাইল।

"আজীবন কাল আমি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগৎ হইতে সব সময় যেন পৃথক বা বিচ্যুত রহিয়াছেন। এইটিই তাঁহার স্বাভাবিক ভাব ছিল। এই জন্যই বোধহয় জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাঁহাকে যতটা উচিত ততটা শ্রদ্ধা করে নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে যখন এই ভাবটি ঘনীভূত হইয়া বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল তখন তাঁহাকে সকলেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল। যাহা হউক তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কোন ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ধ্যানী ভাবটি তাঁহার প্রিয় ছিল—এই মাত্র। এইজন্য তিনি তাণ্ডবনৃত্যে বা অন্য প্রকার ভাবেতে ততটা মিশিতেন না, দূর হইতে সমস্ত দেখিতেন। তিনি ধ্যানী ছিলেন—কীর্ত্তনী ছিলেন না।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিতেছে কত ভক্ত, কত মুমুক্ষু। ইহাদের দেখিয়া শিবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই। এক সুশিক্ষিত মুসলমান ভক্ত ঠাকুরের নাম নিয়া সাধনা করেন, কৃপাও কিছু পাইয়াছেন। সপরিবারে শিবানন্দ মহারাজের

কাছে আসিয়া, সেদিন তিনি উপস্থিত। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিবানন্দ হর্ষভরে একদিন বলিয়াছিলেন :

'ভক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন, আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে এসেছেন। তাঁর কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম ক'রে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল ভাবে ভজনা করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপর ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা, তাঁর ইষ্টদেবই রামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি। বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম ক'রে বললেন—আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল 'ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা!' তোমায় কে বুঝবে বল? সেই শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের কথা মনে হল—

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥

'—হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাতো আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপই হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।' বাস্তবিক ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ কথাই বলতে হয়। তাঁকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরও অনেক মুসলমান ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাড্‌ডাপায়। খুব মানী লোক, গভর্নমেণ্ট খান খানবাহাদুর খেতাব দিয়েছে। ওঁরা সুফী সম্প্রদায়ের, কিন্তু ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি। ওখানে ঠাকুরের একটি ছোট আশ্রম আছে। ঐ খান বাহাদুর এবং স্থানীয় কালেক্টর—তিনিও মুসলমান—প্রভৃতি পাঁচজনে চেষ্টা ক'রে এ আশ্রমটি করেছিলেন।

আমরা তিন চারদিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে কি বিকেলে, সেই খান বাহাদুর ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে বসে আছেন খুব দীনহীন ভাবে, আর একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ধারণা যে, তাঁদের পয়গম্বর মহম্মদই এবার রামকৃষ্ণ-রূপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন। এমনি ক'রে কত ভাবে যে ঠাকুর কত লোককে কৃপা করেছেন, তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত সাধন-ভজন ও জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে শিবানন্দ মহারাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "ঠাকুরের কথাতেই তো আছে সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড়মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু সারাটি মন পড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ীর দিকে। তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই সেবাযত্ন করবে; কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানবে যে, তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান্। তিনি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। তা বলে স্ত্রীপুত্রদের অবহেলা করবে না। তাদের ভগবানের প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাশক্তি সেবা করবে। তাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ করবে।

"সংসারে থাকবে; কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে। আর ঠাকুর বলতেন—'বিচার করা খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাতে ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।' খুব বেশী সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান পেতে দিও না। সাধারণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো ক'রে নিয়েছ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে—কামকাঞ্চন ও মানযশের দিকে। সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লীন করতে হবে। জীবনে মানুষের সব

চাইতে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ভগবান্ লাভ। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মনে সর্বক্ষণ ধরে রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌঁছতে পারো তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।"

তরুণ সাধকদের পক্ষে মনকে শান্ত করিয়া গুটাইয়া আনা, ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া একটা বড় সমস্যা। এ সম্পর্কে তাঁহাদের উৎসাহ দিয়া বলিতেন, "এজন্য মোটেই ভেবো না। অশান্ত মনকেও ক্রমে শান্ত করে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করা যেতে পারে। ধ্যান জপ করতে আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান শুরু করো না। প্রথমটায় ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে। ঠাকুর হলেন জীবন্ত সমাধিস্বরূপ, তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ক'রে তাঁকে চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে। বলবে—'প্রভু, আমার মন স্থির ক'রে দাও।' এই ভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে ঠাকুরের সমাধির কথা ভাব্‌বে। তাঁর যে ছবি দেখছো, এ ছবি খুব উচ্চ সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও। মন হল তোমার, তুমি মন হতে স্বতন্ত্র আত্মস্বরূপ। ধীরভাবে দ্রষ্টার মত বসে মনের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে যাবে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন আপনা হতেই শান্ত হয়ে পড়বে। তখন মনকে ধরে এনে ধ্যানে লাগাবে। যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধরে নিয়ে আসবে। এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে। কিছু দিন ঠিক যেমন ক'রে বল্লুম তেমনি ক'রে যাও দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে। তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য নিয়মিতভাবে এটি ক'রে যেতে হবে।"

"ভগবান্ লাভের ব্যাকুলতা একদিনে আসে না এবং তাঁর কৃপা ছাড়াও হয় না। সেজন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়—আর কেঁদে কেঁদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়—'প্রভু, দয়া করো, আমি সাধারণ মানুষ। তুমি দয়া ক'রে দর্শন না দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার

দর্শন পাই! কৃপা করো প্রভু। এই দুর্বলকে কৃপা করো'—এভাবে নিত্য প্রার্থনা করবে। যত তাঁর জন্য কাঁদবে তত মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। তোমরা সাধু হয়েছ, তার নাম ক'রে ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ—তাঁর উপর তো তোমাদের দাবী আছে। ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে তাঁর উপর জোর করবে। দয়া করবেন বলেই তো তিনি তোমাদের মা বাপের কোল থেকে টেনে এনেছেন এবং তাঁর আশ্রয়ে তাঁর সঙ্ঘে স্থান দিয়েছেন।

"পড়ে থাক, বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাকো তাঁর দুয়ারে। পওহারী বাবা যেমন স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'গুরুকে দুয়ারমে কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো।' স্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার বলেছিলেন। কুকুর যেমন কখনও প্রভুর বাড়ী ত্যাগ করে না, তাকে খেতে দাও আর নাই দাও, মারো আর যাই করো, সে যেমন কখনও প্রভুর বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না, তেমনি আমাদেরও প্রভুর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে, তাঁর শরণাগত হয়ে, পড়ে থাকতে হবে। ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে হোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তেতো খেয়ে হোক, যো-সো ক'রে যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে তার হয়ে যাবে।

"তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে রয়েছ, তাঁর সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ, তোমাদের আর ভাবনা কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বাপ যে ছেলের হাত ধরেছেন, সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না।' তেমনি যতদিন এ সঙ্ঘে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে—ততদিন কোন ভয় নেই, তিনি ঠিক তোমাদের উদ্ধার করবেন—নিশ্চয় জেনো।"

ভগবৎ-দর্শন ও পরম শান্তি লাভ সম্বন্ধে এক তরুণ মুমুক্ষু প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উত্তরে শিবানন্দজী প্রশান্ত স্বরে বলিলেন:

"ছাখো বাবা, শান্তি লাভ করা অত সোজা কথা নয়। এ রাস্তা খুবই কঠিন—খুব কণ্টকাকীর্ণ—

'ক্ষুরস্য-ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥'

—ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ্ণ ও দুরতিক্রমণীয়, তত্ত্বদর্শীরা সেই আত্মসাক্ষাৎকারের পথকে সেইরূপ দুর্গম ব'লে থাকেন। এসব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কথা। এ বড় দুর্গম পথ। বাইরে থেকে যত সোজা বলে মনে হয়, ততটা সোজা নয়—অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে যদি তাঁকে চাওয়া যায়—তবে তাঁর কৃপা হয়, এও সত্যি। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো, তাঁকেই কত কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল। তবে তো মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সবই লোকশিক্ষার জন্য করেছেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। "ভগবানের উপর অনুরাগ না এলে কিছুই হবে না। আন্তরিক টান চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান্ লাভ হয়—সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর টান। এই তিনটান এক হলে যতটা ব্যাকুলতা জন্মায়, সেই পরিমাণ ব্যাকুলতা যদি কারু প্রাণে আসে তবেই তার ভগবান্ ও শান্তি লাভ হয়।"

এক ব্রহ্মচারী সেদিন তাঁহার কাছে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর তো বলেছেন, সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখতে নেই, কিন্তু আমাদের তো নানা কাজকর্মে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্যন্ত বলতে হয়। এসব অবস্থার ভেতর আমাদের কিভাবে থাকতে হবে?"

মহাপুরুষ কিছুটা মৌন থাকিয়া বলেন, "ছাখো. বাবা, বাড়ীতে যখন ছিলে তখন মা বোন ছিল তো? মা, বোনদের সঙ্গে যেমন সরল প্রাণে মেলামেশা করতে, ঠিক সেই রকম মন নিয়ে এখানে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথাবার্ত্তা বলবে। মনে মনে ভাববে যে তারা তোমার মা, বোন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি ভক্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা না বলাই ভাল—বিশেষ ক'রে আলাদাভাবে। পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। তোমরা সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে। নারী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশ ব'লে জ্ঞান করবে। এই হল সাধনা।"

"কিন্তু তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো কি ক'রব মহারাজ?"

মহাপুরুষজী তদুত্তরে একটু দৃঢ়স্বরে বল্লেন,—"যেখানে সেখানে মেয়েমানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তারা সাধু হবার তো উপযুক্ত নয়ই এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত হয়নি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে স্ত্রীলোকের কোন সংস্রব নেই এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে জীবন যাপন ক'রে মনের ঐ সকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস ক'রে তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে।"

জপের কার্য্যকারিতার উপর শিবানন্দ মহারাজ সব সময়েই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "প্রীতির সঙ্গে বার বার নাম করাই জপ। তাই করবে, করতে করতে আনন্দ পাবে। জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই— সব সময় চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলতে পারে। আসল জিনিস হল—প্রেম। যত প্রেমভরে তাঁর নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে। তিনি যে অন্তর্য্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে—সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রত্যক্ষ করবে। বালক যেমন মা-বাপের কাছে আব্দার ক'রে কাঁদে, ঠিক তেমনি ক'রে তাঁর কাছে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয় পাবে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, পতিত পাবন, কলিকল্মষহারী, পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল ও প্রেমময়। খুব তাঁর নাম ক'রে যাও। সব সময় তো যতটা পার জপ করবেই; কিন্তু বিশেষ ক'রে সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম ক'রে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, একই স্থানে বসে জপধ্যান করা খুব দরকার। তাই করো।"

এ সম্পর্কে আর একদিন আরো বিশদ করিয়া কহিলেন, "জপ তিন রকমে করা যেতে পারে। মালাতে হাতের করে বা মনে মনে। মনে মনে জপ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন, 'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, মন জপে তো বলিহারি যাই।' মনে মনে জপ করার অভ্যাস করলে চলতে ফিরতে, খেতে শুতে সব সময়ই জপ

করা যেতে পারে। কিছুকাল ঐভাবে মানস জপের অভ্যাস করলে তখন এমনি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে একটা আনন্দের ধারা বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্যা রেখে জপ করা ভাল; এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত দুবার ক'রে আসনে-বসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করবে, আর এক একবারে হাজারের যেন কম না হয়—তার বেশী যত পারা যায় ততই ভাল। সংখ্যা করেও রাখা চলে বা মালায়ও রাখা যায়।

"ঠাকুর বলতেন, 'নাম নামী অভেদ' ইষ্টমন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্ত্তিও চিন্তা করবেন। এই ভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে পারে। ভগবান্ অন্তর্য্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ঠিক ঠিক আন্তরিকভাবে একবারও যদি ভগবানের নাম নেওয়া যায়, তাতে উড়ো-উড়ো মন নিয়ে লক্ষ জপের চাইতেও বেশী ফল হবে। চাই ইষ্ট চিন্তার তীব্রতা, চাই ব্যাকুলতা আর চাই আন্তরিকতা। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে শীঘ্রই হয়ে যাবে। এসব একদিনে হয় না—রোক ক'রে লেগে পড়ে থাকতে হয়, ক্রমে সব হয়।"

১৯৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় সতের বৎসর স্বামী শিবানন্দ বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও মিশনের দায়িত্ব-পূর্ণ পরিচালনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিপূর্ব্বে বার বার তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—তপস্যায় নিমগ্ন না থাকিয়া তিনি যেন মঠ ও মিশনের কল্যাণকর্ম্মে আগাইয়া আসেন। কিন্তু ধ্যানী সাধক শিবানন্দকে তখন এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী হইতে দেখা যায় নাই। কাশী অদ্বৈত আশ্রমের সংগঠনে, মিশনের বিভিন্ন ত্রাণ কর্ম্মে, রামকৃষ্ণ বাণীর প্রচারে মাঝে মাঝে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, ঠিকই, কিন্তু একটানা ভাবে মঠ ও মিশনের পরিচালনাকে কিছুটা এড়াইয়া গিয়াছেন। এবার তাঁহার পূর্ব্বতন মানসিকতায় পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ মহারাজের জীবনীকার স্বামী অপূর্ব্বানন্দ লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষজীর জীবনের যেন একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল ; যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল অনেক সময়েই প্রব্রজ্যা ও নির্জনবাসে কাটাইয়াছিলেন—কোন প্রকার গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, এইবার তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশে ঠাকুরের কাজে ষোল-আনা আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন হইতে দীর্ঘ সতের বৎসর কাল তিনি তীর্থভ্রমণ বা নির্জনবাস ভুলিয়া গিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর দ্বারে বেলুড় মঠে পড়িয়া রহিলেন, ঠাকুরের কার্য্য উপলক্ষ ছাড়া তিনি আর কোথাও যান নাই। অনেক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজী শিবানন্দকে একদিন সপ্রেমে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—'তারকদা, আপনাকে তপস্যায় যেতে দেব না।' কিন্তু শিবানন্দের মনের অবস্থা এমনই ছিল যে, তিনি স্বামীজীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।" এবার মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটিল কর্ম্মযোগের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাস। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর মুকুটমণি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। প্রিয় গুরুভ্রাতার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় শিবানন্দ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। ধ্যানাসনে বসিয়া মুমূর্ষু ব্রহ্মানন্দের রোগমুক্তির জন্য ঠাকুরের নিকট এই সময়ে তিনি প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। রাত্রিতে তিনি তিনবার বিদেহী রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। আর প্রতিবারই প্রার্থনার উত্তরে দেখা যায় ঠাকুরের মৌন ও গম্ভীর মুখ, প্রতিবারই তিনি প্রার্থনায় কোন সাড়া না দিয়া অন্তর্দ্ধান হন। বুঝা গেল, ব্রহ্মানন্দ আর মরদেহে থাকিবেন না। প্রভাতে উঠিয়া শিবানন্দ সেবক-ব্রহ্মচারীকে এ কথাটি হতাশ প্রাণে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ইহার পরই নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।[১]

স্বামী শিবানন্দ এইবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন। অভিমানশূন্য মহাপুরুষ মঠ ও মিশনের ভার নিতে

---

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী : অপূর্ব্বানন্দ

গিয়া ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তো তাঁর (ব্রহ্মানন্দ মহারাজের) চাকর। তাঁর পাদুকা মাথায় ক'রে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করেছিলেন, আমিও তেমনই মহারাজের পাদুকা মাথায় ক'রে তাঁর কাজ চালাচ্ছি—তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি।"

এই সেবক-বুদ্ধি নিয়াই রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতা, মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শিবানন্দ স্বামী তাঁহার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ বার বৎসর কাল বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

শিবানন্দজীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল সঙ্ঘের ভাবী কর্ম্মীদের সাধনপথের মূল্যবান পাথেয়।

'মিশনের কর্ম্ম বড়—না ধ্যানজপ বড়', এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, "ধ্যান জপের প্রাধান্য অতীতে ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজের কথা বলছো? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর সত্যকার আদর্শ অনুযায়ী কাজ তো কখনও করা যেতে পারে না। ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ওয়ারসিপ—কর্ম্ম ও উপাসনা, এক সঙ্গে চালাতে হবে।"

তাছাড়া, বার বার তরুণ কর্ম্মীদের মর্ম্মে এই কথাটিও তিনি প্রবেশ করাইয়া দিতেন, "সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আনুগত্য।"

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্ম-পরিধি এ সময়ে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে বহু নূতন নূতন স্থানে বিস্তারিত হইতেছে মঠ ও কর্ম্মকেন্দ্র। তাই এই অধ্যাত্মগোষ্ঠীর সংহতির উপর শিবানন্দ এত গুরুত্ব দিতেন।

ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দের এই সময়কার মূর্ত্তিটি ছিল পরম প্রেমময়, পরম কারুণিক। আশ্রিতের সামান্য একটু প্রার্থনায়, আর্ত্তের দৈন্য-ময় সংবেদনে হৃদয় তাঁহার ভাবাবেগে আকুল হইয়া উঠিত, গলিয়া ঝরিয়া পড়িত। কেহ কেহ ভাবিতেন, এই কোমলকান্ত মহাপুরুষ কি মঠ ও মিশন পরিচালনার ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করিতে পারিবেন? দৃঢ়

মুষ্টিতে হাল ধরিতে পারিবেন? মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মনেও এই চিন্তাটি দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন: "সেই সময় তাঁর কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন স্নেহপূর্ণ, এমন নম্র, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সকলের কাছেই নম্র, সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই ঋজু। কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো।

"মহাপুরুষ শিবানন্দের এইরূপ ঋজু ভাব দেখিয়া প্রথমটা আমি একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে হইল, তিনি এইরূপ হইয়া যাইলে মিশনের সমস্ত কাজকর্ম্ম কি করিয়া করিবেন। কারণ, সাধারণের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি তেজী ও দাপট করিতে পারে, সেই বড় কর্ম্মী হয়। এইজন্য, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং এইজন্যই আমি মহাপুরুষ শিবানন্দের এই অতীব ঋজু ভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। দু' তিনদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুরুষ শিবানন্দ একটা নূতন পথ বাহির করিলেন—নম্রভাব, ঋজুভাব, এবং ভালবাসা দিয়াও প্রভূত কার্য্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ভাব একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ যেন এক নূতন ভাবের মানুষ হইলেন।

"পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর তিনি যে অসীম ভালবাসা ও শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। ইহাকেই বলে অহৈতুকী ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—প্রতিদানের কোনই প্রত্যাশা নাই। মোট কথা, এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় হইতে একটা ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণের উৎস উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহা অযাচিতভাবে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।"

কিছুদিন পরে শিবানন্দ স্বামী এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জের মঠে গিয়া অবস্থান করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তখন এখানে উপস্থিত। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লিখিয়াছেন:

"মুঠিগঞ্জের মঠে দেখিলাম—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মানী, কি সামান্য লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে সকলেই সমান ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এমন একটা লোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এইসব পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসার পাত্র। কোনও প্রকার সামাজিক ব্যবধান বোধ বা অন্য কোন প্রকার পার্থক্যের ভাবও সেই সময়টা কাহারও মনে ছিল না, কোনও প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উঁচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল না; কিন্তু সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে যাঁহার পরিধি ও উন্নতত্বের কিছুই পরিমাণ করা যায় না। অথচ তিনি পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতন। 'অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্"—অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও তিনি বড়। আমি দিনের পর দিন তাঁহাকে দেখিতাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতাম, 'এখন হইতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত শক্তি বিকাশ করিবেন এবং ঋজুতা ও মিষ্ট ভাষা দিয়া তাহা জগৎকে বিতরণ করিয়া যাইবেন।' এই সময়টাকেই তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তির বহির্বিকাশের কাল বলা যাইতে পারে।

"···দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের ভিতর হইতে এক প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা উঠিতেছে—তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চর্ম্ম দগ্ধ করে না। সেই অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ স্নিগ্ধ, স্থির ও মাধুর্য্যপূর্ণ। ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণ জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল।"

মহাপুরুষ শিবানন্দের কৃপাভাণ্ডার এবার যেন সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রকৃত সাত্ত্বিক আধার নিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের ভাব নিয়া, যাহারা আসেন, ধন্য হন তাঁহার দীক্ষার দাক্ষিণ্যে। সে-বার সুদূর সিন্ধুপ্রদেশ হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে

স্বপ্নে তিনি এক মন্ত্র লাভ করেন। ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া শিবানন্দ স্বামীর নিকট পত্র লিখেন, তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া প্রার্থনা করেন দীক্ষা ও সাধন নির্দ্দেশ।

কিছুদিন পরে মহাপুরুষের সম্মতি পাইয়া ভক্তটি বেলুড়ে চলিয়া আসেন। এবার মনোবাসনা তাঁহার পূর্ণ হয়, ধন্য হন স্বামী শিবানন্দের কৃপা লাভে।

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুরুষজীর নির্দ্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন। ভক্তটি ঠাকুরঘর হতে এসে খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, তাঁর চরণতলে উপবেশন করে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন—"আপনার দয়ায় আমি শান্তিলাভ করেছি। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আপনার মুখ থেকে সেই স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রই পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখে-ছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমায় যিনি কৃপা করেছিলেন তিনি আপনিই।"

এই সিন্ধী ভক্তটির দীক্ষাদানের পর এক অপূর্ব্ব দিব্য ভাবে শিবানন্দ মহারাজ আবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ব্রহ্মচারী এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন, "আহা, লোকটি খুবই ভক্তিমান্! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে; তা না হলে অত ভক্তি হয় না। কার কেমন আধার, দীক্ষা দেবার সময় বেশ বুঝতে পারা যায়। যাদের আধার খুব ভালো তারা মন্ত্র পাওয়া মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে—অশ্রু, পুলক, কম্পন এইসব হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোনা মাত্রই সর্ব্বাঙ্গে কম্পন ও একটু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। আর কী প্রেমাশ্রু! দু চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন

দিয়ে খুবই আনন্দ হয়—মন্ত্র দেওয়া সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্‌পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়া মাত্র উহা যেন সযত্নে আঁকড়ে ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথা। আহা! তিনি কতভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। দেশ-বিদেশের কত লোক যে তাঁর কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধন্য প্রভু!"

সেবক ভক্তটি সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো এতটা উদ্দীপনা হয় না। যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি কোন কল্যাণ হবে না?"

"তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। সিদ্ধগুরুর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্যের মনকে তৈরী ক'রে নিতে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ; বিশেষ ক'রে সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞগুরুর ভেতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। ঠাকুর বলতেন—সদ্‌গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। আর গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, শিষ্য মুক্ত হয় না।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এক ভক্ত সেদিন মঠে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আধার প্রস্তুত হলেই তুমি দীক্ষা পাবে।" কিন্তু তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় আর ইহা সম্ভব হয় নাই। সকাতরে ভক্তটি আরও কহিলেন, "ঠাকুরের কাছে আমি খুবই কাতর প্রার্থনা করছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজ তিনদিন হল স্বপ্নে মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্রও দিয়েছিলেন; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর স্মরণ করতে পারিনি। খুব চেষ্টা করেছি—কিন্তু কিছুতেই হল না। সেই থেকে মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভক্ত মাত্রেই স্বামী শিবানন্দের অতি আপন জন। তাঁহাদের জন্য শিবানন্দের কৃপার দুয়ার সদা উন্মুক্ত। এই ব্যাকুল ভক্তটিকে নানা কথায় তিনি শান্ত করিতে লাগিলেন।

"ভক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাস বাণীতে শান্ত না হয়ে মন্ত্র দেবার জন্য তাঁরই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। অগত্যা কতকটা যেন রাজী হয়ে, ভক্তটিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে, তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। (তখনও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির নির্ম্মিত হয়নি। মহারাজ মঠে যে ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ছিল এবং নিত্য পূজা হত।) প্রায় আধঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তটিকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। খানিক পরে মহাপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে রইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন—'আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। স্বপ্নে মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই আমায় বলে দিলেন। এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে। তিনি আপনার ভিতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেয়েছি। এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ জীবনে ইষ্ট দর্শন হয়।'

"মহাপুরুষজী কহিলেন, যে মন্ত্র পেয়েছেন নিয়মিতভাবে জপ করে যান। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন—প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মে মন যাতে লীন হয়, তাই ক'রে দাও।' তিনি তাই করবেন—নিশ্চয় জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা এবং জীবের সর্ব্বস্ব। সংসারে যাদের আমার আমার বলে লোক কাঁদছে তারা সব দু'দিনের, চিরস্থায়ী একমাত্র তিনিই। আপনি একমনে খুব নাম-জপ ক'রে যান; দেখবেন ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে

করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ স্থায়ী হলে তাও একরকমের ধ্যান। ধ্যানের বহুপ্রকার আছে। খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন; আর ভাববেন যে, তাঁর শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে আপনার হৃদয় কন্দর আলোকিত হয়ে গেছে। এইরকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব্ব আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে। ক্রমে ক্রমে মূর্ত্তিও লয় হয়ে যাবে এবং কেবল চৈতন্যময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে। এও এক-প্রকারের ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে—পরে পরে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন।

আসল কথা হল আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকা। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে। আপনার কখন কি প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাঁকে কিভাবে ডাকতে হবে, সেসব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন, ঠাকুরের কথায় পড়েছেন তো? তিনি বলতেন—'কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে সাধন-ভজন করা। তিনি সদাই কৃপা করবার জন্য বসে আছেন—যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকেন, তেমনি। একটু ক'রে দেখুন—তবেই তাঁর কত কৃপা তা অনুভব করতে পারবেন[১]।"

কথা প্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সেদিন পাশ্চাত্য দেশের ধন-ঐশ্বর্য্য, জীবনযাত্রার উচ্চমান ও ঐহিক সুখের কথা উঠিল। শিবানন্দ মহারাজ কহিলেন,—"ওসব সুখ তো ক্ষণিক সুখ। ওতে আছে কি? ওরা ভগবৎ-আনন্দের আস্বাদ কখনও পায়নি বলে ঐ ক্ষণিক আনন্দে মত্ত হয়ে আছে। বাবা, সে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই। তা স্বর্গেই থাক, আর যেখানেই থাক—বিদ্বান্‌ই হও, আর যাই হও;

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন।

কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই। এ ভগবানের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদও বলেছে—

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি…'

"আসল সুখ রয়েছে সেই ভূমা বস্তুতে। তাই জানতে হবে। বিজ্ঞান সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারেনি। বিজ্ঞান নাড়াচাড়া করছে জড় বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে করতে ভোগস্পৃহা দিন দিনই বাড়তে থাকে। তাতে তৃপ্তি কোথায়? তাতে শান্তি কোথায়? ভোগের ভেতরই তো অশান্তির বীজ।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥'

"পরে জীবনে শান্তিলাভ প্রসঙ্গে বললেন—"অনাত্ম বস্তুতে শান্তি নেই। আত্মজ্ঞান লাভেই প্রকৃত শান্তি। আর সেই শান্তির সন্ধানও করতে হবে ভিতরে। শান্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম সব ভেতরে। সাধন-ভজন করো, ভগবান্‌কে ডাক। বাবা, শান্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয়।"

সে-বার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু এক ভক্ত শিবানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুর কি নিজে দীক্ষা দিতেন?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, দিতেন—তবে খুব কম। তা-ছাড়া, তাঁর দীক্ষা তো সাধারণ দীক্ষার মত কান-ফোঁকা দীক্ষা নয়। তিনি কাউকে স্পর্শ করে চৈতন্য করে দিতেন, বা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা কারো মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন। তিনি হলেন জগদ্‌গুরু। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। 'জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে, আর মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে।' তিনি ভক্তদের অন্তরে ঐশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত ক'রে দিতেন, আর অধিকারভেদে সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন করাতেন। একঘেয়েমি তাঁর ছিল না। যে যে মার্গেই সাধনা করুন না কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন।"

মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্পর্কে, আর্তের রোগ-

মুক্তি ঘটানো সম্পর্কে এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিবানন্দ স্বামী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "শারীরিক ব্যাধি দূর করা স্পর্শমাত্র—এ আর কি বেশী অলৌকিক ? এসব তো সহজ ব্যাপার। ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন—স্পর্শমাত্র মানুষকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি একমুহূর্ত্তে ক্ষীণ ক'রে দিয়ে মানুষের সমগ্র মনের গতি ভগবৎ-মুখী ক'রে দেওয়া—এ হল সব চেয়ে বড় সিদ্ধাই।……উঃ। কি কাণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি! সে সব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন, মনের আড়বাঁক সব ইচ্ছামাত্র সোজা ক'রে দিতেন। তাঁর স্পর্শমাত্র মনের সব ব্যাধি আবাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর! বাহির থেকে দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত, কিন্তু তাঁর দেহ আশ্রয় ক'রে লীলা করতেন সর্ব-শক্তিমান্ ভগবান্।"

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠিলেই মহাপুরুষের সর্ব্ব সত্তায় দিব্য আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিত, ঠাকুরের লীলাকথায়, মাহাত্ম্য প্রচারে, এই সদা অন্তর্লীন সাধক মুখর হইয়া উঠিতেন। কহিতেন, "যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে তার মুক্তি অনিবার্য্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প তোমরা শোননি ? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা ক'রে বলেছিল—'বাবা, আমায় কৃপা করলে না ? আমার গতি কি হবে ?' তখন ঠাকুর বলেছিলেন 'ভয় নেই, তোর হবে ; মৃত্যু সময় আমায় দেখতে পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলে উঠল—'এই যে বাবা এসেছ—বাবা এসেছ—!' এই বলতে বলতে মারা গেল।

"ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের।

বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য্য রকমের। তার তো খুবই কঠিন অসুখ; সকলেই মহা চিন্তিত। দেহত্যাগের দু'তিন দিন আগে থেকেই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আসতে দিতেন না। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদের কেবল দেখতে চাইতেন। আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ করার একদিন আগেই ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরামবাবুর স্ত্রী শোকে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবুর স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে। পরে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাতে একখানি দিব্য রথ। ক্রমে ঐ রথ বলরাম মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর ঐ রথ থেকে নেমে এসে বলরামবাবু যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ঢুকলেন। খানিক পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন। তখন সেই রথ ঊর্দ্ধে উঠে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বলরামবাবুর প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল। এমন সব কত অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে; ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে যাচ্ছে। ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে নিশ্চয়।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণতলে ভেট স্বরূপ কিছু টাকা রাখিয়া ছিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, "টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তো কোন দরকার নেই—আমরা বাবা সাধু মানুষ; টাকা দিয়ে কি করবো? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া করে 'দো রোটি' দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন—

'প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটি এক লঙ্গেটী তেরে পাস্ মৈ পায়া।

ভকতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাওয়া ॥
প্রভু মৈ গোলাম তেরা ॥'

—তা তিনি দয়া ক'রে দো রোটি তো দিচ্ছেনই, আর কি হবে টাকা-কড়িতে? নিয়ে যাও বাবা ঐ টাকা। তোমরা গৃহস্থ; তোমাদেরই টাকার দরকার।"

ভক্তটি কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বার বার পীড়া-পীড়ি করাতে শিবানন্দজী সেবককে নির্দ্দেশ দিলেন, ঐ টাকা যেন ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়া দেওয়া হয়।

মঠের নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা একে একে শিবানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিতেছেন। প্রাণে তাঁহার অপার আনন্দ, নয়ন দু'টি দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল। প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ছাখো বাবা, নামরূপ এ সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য—দুদিনের; এসব কিছুই নয়। নাম রূপের পারে যেতে হবে; সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে। আত্মবস্তু লাভ করতে হবে। সন্ন্যাসের অর্থ তো তাই। বিরজা-হোম করে শিখাসূত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পরা ও সন্ন্যাসী হওয়া তো সহজ। সে তো প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করো। যাও বাবা, এখন খুব ধ্যান লাগাও। আত্মবস্তু অনুভব করো। তবেই ঠাকুরের সঙ্ঘে আসা, সন্ন্যাস নেওয়া, এ সব সার্থক হবে। আমাব কথা শুনতে চাও তো এই।"

সাধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি, একথার উত্তরে একদিন তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "সাধু উঠবে খুব সকালে। রাত তিন চারটার পর আর ঘুমুবে না। সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার পর আর কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল সকাল স্নান করবে। স্নান ক'রে ধ্যান ধারণাদি করবে। স্নান ক'রেই খাবে না। স্নান ক'রে ধ্যানভজন না ক'রে খাওয়া, সে তো অন্যান্য লোকেরা করে, সাধু তা করবে না। সাধুর চেহারা কথাবার্ত্তা সবই অন্যরূপ হবে, সরল সুন্দর দেবোপম। সাধুর টাকা কেন থাকবে?

সাধু একদম নির্ভরশীল হবে—ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। ত্যাগের পথে যারা থাকবে তাদের পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয়। সাধু রাত্রে বেশী খাবে না। ঠাকুর বলতেন—রাত্রের খাওয়া হবে জলখাবার মত। সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচর্চ্চা করবে। সাধুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সাধু মিষ্টভাষী, ধীরস্থির হবে, ভদ্র ব্যবহার করবে। সাধু সর্ব্বদাই কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাৎ থাকবে। কামিনীকাঞ্চনের কোন সংসর্গ রাখবে না।"

এক নবীন সন্ন্যাসী শিবানন্দজীকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেন,[১] "মহারাজ, সন্ন্যাসজীবনে কি কি নিয়ম পালন ক'রে চলতে হবে? পরমহংস উপনিষদে এবং নারায়ণ উপনিষদে সন্ন্যাসীর পক্ষে যে সব নিয়মের বিধি আছে সে সব তো আমাদের এই কাজকর্ম্মের ভিতর অনেক সময় মেনে চলা সম্ভবপর নয়।" উত্তরে শিবানন্দ মহারাজ বলেন, "হ্যাঁ, সন্ন্যাসীর পক্ষে অনেক সব নিয়ম আছে, কিন্তু সে সব নিয়ম তোমাদের মানতে হবে না। ও তোমাদের জন্য নয়। তোমরা হলে কর্মযোগী সন্ন্যাসী। তোমাদের জন্য স্বামীজী নূতন আদেশ রেখে গেছেন। তোমাদের সাধনভজন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে অনাসক্ত হয়ে সাধনভজনের অনুকূল কর্ম্ম। কাজেই তোমাদের পক্ষে ঐ সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা সম্ভবপর নয়। সেসব নিয়ম হল কেবল জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীদের জন্য—যাঁরা কোন কাজকর্ম্ম করেন না, কেবল জ্ঞান বিচার করেন, তাঁদের জন্য। তবে কি জানো বাবা, মূল জিনিস ক'টা ঠিক রাখতে পারলে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যায়।

"মূল জিনিসটি কি, মহারাজ?"

"মূল জিনিস হ'ল খালি বাহ্যিক ত্যাগ নয়, কামকাঞ্চনাসক্তিও ত্যাগ করতে হবে। ঐ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি, ঐ সমস্ত এষণার মূলেই হল কাম ও কাঞ্চন এই দুটো

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

জিনিস। কামকাঞ্চন ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে—এই হ'ল সন্ন্যাসীর একমাত্র বিশেষ ক'রে মানবার জিনিস। ঠিক ঠিক শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে তাঁর কাছে। তিনি তো ভগবান্, তিনিই কৃপা ক'রে সব জানিয়ে দেবেন, সব বুঝিয়ে দেবেন।

"কিন্তু মহারাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহরক্ষার জন্যে কিছু কিছু এষণা তো রাখতেই হবে?"

"হ্যাঁ, সে ঠিক। তা শাস্ত্রেও তেমন বিধি রয়েছে—। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই রয়েছে, 'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ কুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি'—'ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হয়ে পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হয়ে, অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন ক'রে থাকেন।' শরীর ধারণমাত্রের জন্য যতটা দরকার ততটুকু মাত্র এষণা রাখতে হবে। ভিক্ষাদিও প্রয়োজন মত অতি সামান্য করবে। কিন্তু চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় খেতে হবে বা আরামে থাকতে হবে, তেমন কথা কোথাও নেই। আর শরীর ধারণের উদ্দেশ্যও হবে তাঁকে প্রাণভরে ডাকা এবং তাঁর সেবাদি কাজ করা, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।"

মঠের সাধনরত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা আন্তরিকভাবে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত; তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইতে গিয়া ভাবাবেগে তিনিও উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। কহিতেন:

"তোমরা সর্ব্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবন-সর্ব্বস্ব করেছ; তোমাদের উপর আশীর্বাদ থাকবে না তো কার উপর থাকবে? কিন্তু তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপাবাতাস তো বইছেই; তুই পাল তুলে দে না।' ঐ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা। ঐকান্তিক অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই—বিশেষ ক'রে সৎ কাজের জন্য, সাধন ভজনের জন্য। আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে হবে। উদ্যম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া, কিছুই হবার জো নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি

আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা সাধু হয়েছ, বাপ মা, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছে কেন? না, ভগবান্ লাভ করবে বলে। আর পূর্ব্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ; বিশেষ ক'রে আমাদের কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকার সুযোগও ঠাকুর ক'রে দিয়েছেন। এত সব সুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মনে খুব জোর আনবে। তাঁর পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভব সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ; একটু জোরে ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এসব তো মহামায়ার বিভীষিকা। এ সব দেখিয়ে তিনি সাধকদের পরীক্ষা করেন, ওসবে এখন সাধকের মন বিচলিত না হয়; সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন মহামায়া প্রসন্না হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড়নি? স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া মারের রূপে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন।"

মঠের এক দক্ষিণ-দেশীয় সন্ন্যাসী তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া শিবানন্দজীকে বলেন, "মহারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছে, শ্রীভগবান্‌কে আমি সর্ব্বভূতে দর্শন করবো। কিন্তু কবে এ আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ হবে, কৃপা ক'রে তা বলুন।"

ভাবের ঘরে কোন ফাঁকী মহাপুরুষ সহ্য করিতে পারিতেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কহিলেন. "বাবা, আগে ভগবান্‌কে নিজ হৃদয়ে দর্শন করতে হবে। অন্তরে তাঁর দর্শন না হলে বাইরে সর্ব্বভূতে তাঁকে দেখা কি ক'রে সম্ভব? আত্মানুভূতিতে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র তাঁর দর্শন হয়; তাই সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই অবস্থা লাভ হয়।"

সন্ন্যাসীটি করজোড়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ। সত্যকথা,

সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেম, নির্বিকার চিত্তে সব দুঃখ সহ্য করা, এসব নৈতিক গুণের পূর্ণতা নিয়ে সে অবস্থায় কি পৌছানো যায় না?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়। একথা ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করলেই যে ভগবদ্দর্শন হবে না। নিরন্তর তাঁর ধ্যান করতে করতে তিনি কৃপা ক'রে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন। চাই তাঁর ধ্যান—সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়; যো সো ক'রে একবার ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদা ক'রে নৈতিক চরিত্র গঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্‌বৃত্তি তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার ভয় নেই। আসল কথা কি জান বাবা? কৃপা, কৃপা। তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেই মানুষ তাঁর দর্শন পেতে পারে। ভজনসাধন এসব মনকে ভগবন্মুখী করার উপায় মাত্র।"

অতঃপর কিছুক্ষণ ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন যে, কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা? এই পাল তুলে দেওয়াই হল পুরুষকার—সাধনভজন। ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করার মত ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রতে হবে—ভজনসাধন দ্বারা। বাকী তাঁর কৃপা। নিরন্তর তাঁর স্মরণ মনন তাঁর ধ্যান করতে করতে মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়; আর ঐ শুদ্ধ মনে স্বতই ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়, ভগবৎকৃপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, সাধু হয়েছ, সব ছেড়ে ছুড়ে তাঁর আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান্ লাভ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের তো তাঁকে নিয়েই সব সময় থাকতে হবে। ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে জাগরণে, সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্‌কে নিয়েই বিলাস করবে। তাঁর বিষয় স্মরণ, তাঁর বিষয় পাঠ,

আলোচনা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাবে, আর তাঁর আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে। ভগবান্ অন্তর্য্যামী। যেখানে আন্তরিক ব্যাকুলতা, সেখানে তাঁর কৃপাও হয়। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই।"

সন্ন্যাসীর জীবন ত্যাগ তিতিক্ষাময়, দেহবুদ্ধি বিনষ্ট করাই তাঁহার সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই তত্ত্বটি শিবানন্দ মঠের উপদেশ প্রার্থী সন্ন্যাসীদের মনে গ্রথিত করিয়া দিতেন। একদিন পরম স্নেহভরে কহিতেছিলেন, "বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর। আর তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। তোরা তাঁরই আশায় এসেছিস তা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিস, সেও মহা সৌভাগ্যের কথা। তোদের উপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে তা ভেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর ক'দিন। এর পরে তোদের দেখেই লোকে শিখবে। ত্যাগই হল সন্ন্যাস জীবনের ভূষণ। যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয়।

"খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন; তাছাড়া, খালি বিরজাহো-করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস ত্যাগ করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে পারবিনি। সঞ্চয় করতে নেই; এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে নেই। ঠিক সাঁকোর জলের মত একধার দিয়ে আসবে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর আসবে না, তখন ময়লা জমতে শুরু করবে। আর কখনও কোন জিনিস চাইতে নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক। যখন যা দরকার মা সব দেবেন। এই দেখ না, এখন এত জিনিসপত্র খাবারদাবার কাপড়চোপড় সব আসছে যে সামলানো দায়। একদিন গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখানা কাপড়ই সকলে মিলে পরতাম। আর এখন নিত্য নূতন গরদ পরলেও ফুরোয় না। তবে কি জানিস, তাঁর দয়ায় মনটা তখনও যা ছিল এখনও তাই। পরনের কাপড় ছিল না ব'লে মনে কোন দুঃখ ছিল না; কোন

অভাব বোধ হত না। তিনি কৃপা ক'রে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন। এই দেখ্ না, তোরা তো এখন আমায় দু হাত গদির উপর শুইয়ে রেখেছিস্, কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা—যখন শীতকালে কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম। তাতে যা আনন্দ তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

"দেখ্, আমার সেবা করছিস এ খুবই ভাল। ঠাকুরের মহা কৃপা তোর উপর যে, তাঁর একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও করা চাই। নিয়মিত জপধ্যান, ভজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের উপর মানুষবুদ্ধি এলেই মারা যাবি—বেশ মনে রাখবি। ভগবদ্‌বুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র সাধনা। ভগবানের নাম, তাঁর ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে সেই শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমরা তো ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি ; তবু তিনি আমাদের কত উগ্র সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান্, তিনি যে এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম ? ক্রমে সাধনভজনের দ্বারা সে জ্ঞান পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয়নি। তবে কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কৃপা করেনও।"

শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রক্তের চাপ মাঝে মাঝে খুব বৃদ্ধি পায়। অথচ দীক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু ভক্ত নরনারীর আনাগোনা লাগিয়াই আছে। সেদিন শরীরটা খুবই অবসন্ন। ডাক্তারেরা কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। একজন দর্শনার্থী আসিলে সেবকটি সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবানন্দজী বলিলেন—"আমি রামকৃষ্ণের চেলা। তাঁর অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও যখনই কেউ এসেছে, তার জন্য কত ভাবনা, কত আলাপ। আর আমি চুপ ক'রে বসে থাকব ? শরীর খারাপ তা কি হবে ? তোমরা

এসে শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাও—তোমরাই বা কি ভাববে? ভাববে—'রামকৃষ্ণের চেলা এই রকম।'

রামকৃষ্ণ-চেতনা ছিল মহাপুরুষ শিবানন্দজীর সাধন জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য, এই চেতনার পূর্ণতাকেই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন আপন অভীষ্টরূপে। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে। তাহা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন ও তাঁহার কৃপা। যিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ রামকৃষ্ণ-ধৃত এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:

"এই একটিমাত্র ঘটনা দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এক গৌরবময় স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ সেই যুগটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে উহার স্মৃতি চিরদেদীপ্যমান্ থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মসঙ্ঘের গুরুপারম্পর্য্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধিযুগ বলাও বোধ করি অন্যায় নয়। প্রাচীন অল্পপরিধিযুক্ত কিন্তু অগাধ-স্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবর্ত্তী—বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তার লাভ করিতেছে। মহাপুরুষজী যেন প্রাচীনকে তাঁহার ভিতর বহুভাবে দেখিবার সুযোগ দিয়া গেলেন আর আগামীকেও ভগবদ্‌বিধানে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন।"

গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজী শিবানন্দ মহারাজের এ সময়কার কৃপা-লীলা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, "শেষ বয়সে শারীরিক নানা অসুস্থতা হেতু তাঁহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যেরূপ অবিচলিতভাবে সে সকল সহ্য করিতেন, তাহাতে মনে হইত যেন তাঁহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না। সেই অবস্থাতেও বহুদূর দূর স্থানের অনেক লোক তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য আসিত।

তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপা করিতেন। পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, অফুরন্ত কৃপা ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেন। মানুষে এতটা সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই যেন তাঁহার ভিতর রাখিয়া বহু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে। তাঁহার উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ।"

এই কৃপার শক্তি মহাপুরুষ শিবানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার কৃপালু সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে। ঠাকুর তাঁহার সকল শক্তির উৎস,—এই পরম সত্যটি নিজের দীর্ঘ জীবনে এক মুহূর্তের তরেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই দেখি মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যাকে তিনি লিখিতেছেন,—

"ঠাকুরের কৃপায় আমাদের আধারানুযায়ী উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর স্পর্শে, তাঁর ইচ্ছায় আমার নিজেরই—তাঁর জীবৎকালে তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল—তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও আমি বেঁচে আছি।"

শিবানন্দস্বামী সে-বার দেওঘরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন তাঁহাকে বৈদ্যনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে নেওয়া হয়। মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডারা তাঁহাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়া গেলেন। তারপর তাঁহাদের ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তবে একথাও জানানো হইল, দর্শন ও পূজার জন্য শিবানন্দ মহারাজকে সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। এদিকে মন্দিরে ঢুকিয়া লিঙ্গ বিগ্রহকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। নির্দ্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তবুও তাঁহার কোন হুঁস নাই। অবশেষে নানা চেষ্টার পর তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং

সবাই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহার পর তিনি আনন্দ সহকারে বার বার বলিয়াছিলেন, "বাবার কৃপায় আজ খুব দর্শন হল।"

এই সময়ে একদিন রাত্রিতে শিবানন্দ মহারাজ প্রবল হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হন। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম। এই সঙ্কট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হন এবং দেহবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সারা রাত্রি কাটাইয়া দেন।

পরের দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা! অল্পক্ষণ পরেই মনটা একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে চলে গেল। তখন দেখি কোন যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই—স্থির প্রশান্তি। বাইরের ঝড়ঝাপটা সেখানে স্পর্শ করতে পারছে না।"

এক সেবক এই সময়ে প্রশ্ন করেন, "ওটা কি ব্যাপার, মহারাজ!" মহাপুরুষ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওই তো আত্মা?"

শিবানন্দজীর শরীর একে অসুস্থ, তদুপরি নিদ্রা নাই। সেবক ব্রহ্মচারীটি বলেন, "মহারাজ একটু ঘুমুবেন না?"

ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ উত্তর দেন, "আমার আবার ঘুম কি রে?" সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিতে থাকেন—'ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগ যাগে জেগে আছি। এবার যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি। এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, ভাল ভাবার কাছে ভাব শিখেছি। যে দেশে রজনী নেই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।'

নিদ্রার প্রসঙ্গে আর একদিন বলিলেন, "চণ্ডীতে আছে যে, মা-ই সেই নিদ্রারূপিণী—'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপে পণ সংস্থিতা।' তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আধারভূতা জগতস্তমেকা।' সেই মা-ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। আমার হৃদয় কন্দর আলোকিত ক'রে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাঁকে দর্শন করলেই যে সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, ঘুমের আর দরকারই বোধ হয় না। যখনি একটু

শ্রান্তি বোধ করি, তখনি মাকে দেখে নিই। ব্যস্, আনন্দম্। সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।"

মহানিশায় জপ ধ্যান করা স্বামী শিবানন্দ খুব পছন্দ করিতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়া সেবক ব্রহ্মচারিটিকে কহিতে লাগিলেন, "ছাখ্, জপ করবি গভীর রাতে। মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। এত আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছা হবে না। এই তো আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ করবি—বুঝলি? সময় বৃথা যেতে দিস্নি বাবা। তাঁর নামে ডুবে যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না। যতটুকু করবি তন্ময় হয়ে করবি; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো ঠাকুর গাইতেন— 'ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' যে কোন কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন—প্রাণ, আন্তরিকতা; তিনি সময় দেবেন না। আর ধ্যান জপ নিত্য নিয়মিত-ভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে যায়। নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা চাই। গীতাতে ভগবান্ বলেছেন — 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে নিত্য ডেকে যা; দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্তা খুলে দেবেন। সেই ব্রহ্মময়ী মা প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' সেই তিনিই প্রসন্না হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য; কিন্তু নিচ্ছে কে? তাঁর কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন—ভক্তি মুক্তি সব।

"বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান্ লাভ করবি বলে। ঐ তো জীবনের উদ্দেশ্য। আসলে যেন ভুল না হয়ে যায়। খুব খেটে জপ ধ্যান স্মরণ-মনন ক'রে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নে; তখন খালি আনন্দম্—খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। আমাদের শরীরই বা আর কদিন? এই তো বৃদ্ধ শরীর। এখন চলে

গেলেই হল—তখন সব অন্ধকার দেখবি। কিন্তু জপ ধ্যান ক'রে যদি ইষ্ট দর্শন ক'রে নিতে পারিস্ তো তখন দেখবি যে, গুরু ইষ্ট একই এবং গুরু তোর হৃদয় মন্দিরেই চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থূল দেহনাশে গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাই তো আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

স্বামী শিবানন্দের শেষ জীবনের ভাবময় প্রেমঘন মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ-দর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখনীতে অপরূপ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিতে দেখি :

—এই সময় তিনি একটি ভালবাসার মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সকলের জন্যই তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং তাঁহাদের কল্যাণের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিতেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ' তাঁর অতি আপনার জন—তাঁর নিজস্ব।

—কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক দুঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন করিতেন, যেন একটি ছোট-খাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইতেন। তিনি প্রকাশ্য কর্ম্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্ম্মী। সাধারণতঃ, কর্ম্মী বলিতে বুঝায় যিনি বহুপ্রকার চাঞ্চল্যকর কার্য্য করিতেছেন ; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হইয়া তাঁর ভালবাসা ও হৃদ্‌গত শক্তি দিয়া অপরের নিজস্ব ভাবটি—অপরের নিজস্ব কর্ম্মের ভাবটি, জাগ্রত করিয়া দিতেন। তিনি স্থির হইয়াও চঞ্চল ছিলেন ; একস্থানে থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন ; বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াও চিন্তা করিতেন।

—ভালবাসা ছাড়া তাঁহার আর একটি শক্তি—যাহার বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—উদ্ভূত হইয়াছিল গুণাতীত জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। তর্ক, যুক্তি, বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা মানুষ যতটা উঁচুতে উঠিতে পারে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বহু উর্দ্ধে উঠিতেন। তাঁহার সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই সত্য হইত যে সেখানে বিচারবুদ্ধি চলে না। তিনি জগৎকে ও সৃষ্টিকে অন্য এক স্তর হইতে,

অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগৎকে কারণ অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপ দেখিতেন না। তিনি কারণ অতীত হইতে জগৎকে দেখিতেন।

—মহাপুরুষ শিবানন্দ আনন্দময় লোকে তাঁহার মনকে সর্ব্বদাই তুলিয়া রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে যাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকিবেন যে তিনি অধিকাংশ সময় এই 'আনন্দময় লোকেই' বিচরণ করিতেন। বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা হইল জীবন্মুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ। মহাপুরুষ শিবানন্দ এই আনন্দময় লোকে অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগৎকে আনন্দময় দেখিতেন। এইজন্য জীর্ণ দেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও তিনি সর্ব্বত্র 'আনন্দ' বা 'ব্রহ্ম' দেখিতেন।

—যে আনন্দ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বা ব্যক্ত করি সে আনন্দ দেহজ; কিন্তু মহাপুরুষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দের। সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের অংশটুকু প্রকাশ করা হয়। চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনের বৃত্তি, চঞ্চল ভাব স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদূর্দ্ধে উঠিলে সৎ বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। সৎ অব্যক্ত ও স্বয়ং। এই দুই অবস্থার বিষয় কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না—কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অল্পবিস্তর প্রকাশ করিতে পারেন। এইজন্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ জগৎকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন; কিন্তু স্বয়ং তদূর্দ্ধ অবস্থায় চলিয়া যাইতেন। সে অবস্থা প্রকাশ করিবার নয়। 'সৎ, চিৎ, আনন্দের' এক অংশ তিনি জনসমাজের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর দুই অংশ তিনি নিজেই হইয়া যাইতেন; কারণ সেই অবস্থা বাক্য মনের অতীত—অবাঙ্ মনসোগোচরম্।"

মঠের এক ব্রহ্মচারী অনবধানতা বশতঃ সেদিন শিবানন্দজীর একটি নির্দ্দেশ পালন করে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া বার বার সে ক্ষমা চাহিতে থাকে।

মহাপুরুষ ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বুঝেছ। এখানকার কথা শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। এখান থেকে এখন যে সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে। এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।" মনের দুয়ার তখন আল্‌গা ছিল, তাই তাদাত্ম্য বোধের স্বীকৃতি হঠাৎ একদিন শোনা গেল সিদ্ধকাম মহাপুরুষের মুখে।

স্বল্পবাক্, গম্ভীর পুরুষ, শিবানন্দজীর মধ্যে এই সময়ে এক এক দিন যেন মধুর স্বভাব বালকের মুখরতা আসিয়া হাজির হইত। স্বীয় আনন্দময় অনুভূতির কথা আর যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সে-বার তিনি কাশীধামে আসিয়াছেন। সকালবেলায় আশ্রমের সন্ন্যাসীরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। এমন সময় একজনকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, "ছাখ্, কাল রাতে একটা ভারী মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাজুটধারী ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে! আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি—কী সকরুণ চাউনি! তাঁকে দেখবামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় ক'রে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম·· আর খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মূর্ত্তিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, আর তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্য বদন, আমার হাত ধরে ইসারা করে বল্লেন, 'তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।' ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নীচের দিকে আসতে লাগলো এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগলো। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।"

এই দর্শনের পর হইতেই শিবানন্দ স্বামীর মন সর্ব্বক্ষণ এক অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-ভূমিতে অবস্থিত থাকিত। আহার নিদ্রায় দেখা যাইত বিস্ময়কর নির্লিপ্তি। ডাক্তারেরা এটিকে বায়ুরোগ বলিয়া ধরিয়া নেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাও করিতে থাকেন।

মঠের এক সন্ন্যাসীর মনে কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি গোপনে মহাপুরুষকে বলেন, "মহারাজ, ডাক্তারেরা বলছেন, এটা বায়ুরোগ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বোধহয় এটা যোগজ। কাশীতে আপনার কি কোন দর্শনাদি হয়েছিল? কাশী হতে আসার পর থেকেই এর সুত্রপাত দেখছি।"

শিবানন্দ স্বীকার করিলেন, "হ্যাঁ, কাশীতে এক শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময় যোগীমূর্ত্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে।"

ভক্ত ও দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা এ সময়ে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিন মঠের এক সন্ন্যাসীকে শিবানন্দ বলিতে থাকেন, "ভ্যাখ্, স্বয়ং ঠাকুরই প্রেরণা দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এই শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমায় দেখে এত লোক আসবে কেন? আমি তাঁর নাম স্মরণ মনন করি, অন্য কিছু জানিনে। যারা এখানে আসে আমি সকলকে তাঁরই পায়ে সঁপে দিই। বলি, 'এই নাও ঠাকুর, তোমার জিনিষ তুমি নাও।' লোকে যেমন নানা ফুল দিয়ে তাঁর চরণ পূজা করে, আমিও তেমনই নানা রকম মানুষ অঞ্জলি ক'রে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। তা সকলকে তিনি গ্রহণ করছেন, স্পষ্টই দেখতে পাই।"

এক একদিন দিব্য উদ্দীপনা ভাব। আশীর্ব্বাদ প্রার্থীদের বলিতেন, "ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, আশীর্ব্বাদ তো সর্ব্বদাই বয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে। এমনি বলছি যে তা নয়—ঠিক্।"

আবার এক একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিতেন, "যে আসবে, কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।"

কোন কোন দিন মহাপুরুষের সর্ব্ব সত্তায় মহাভাবের মাতামাতি আরম্ভ হইয়া যাইত। আনন্দে তিনি তখন গর্গর মাতোয়ারা। ভাবের উপশম ঘটিলে ভক্তসেবকদের ডাকিয়া বলিতেন, "শরীরে যেন একটা ডাকাত ঢুকেছিল। কালী কীর্ত্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে বাপ, শরীরটা যেন তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে। এ রকম ভাব ঠাকুরের হত। আমি তো তাঁরই সন্তান। কুছ নহী তো থোড়া থোড়া তো আছে?"

শরীরে হাঁপানী ও রক্তচাপের যন্ত্রণা খুব চাপিয়া বসিয়াছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। মাঝে মাঝে সিদ্ধ সাধক দ্রষ্টা স্বরূপে বলিতে থাকেন, "আজকাল একটা ভারী মজা দেখছি। এটাকে অবলম্বন ক'রে দুটো ব্যাপার চলছে—একটা শরীরের আর একটা আত্মার। শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আত্মার দিক থেকে নির্ম্মল আনন্দ—বেশ আনন্দ হয় দেখে, আর ভেবে।"

কিছুদিন যাবৎ শিবানন্দজীর অধ্যাত্মজীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রে পরম অনুভূতির একটা বিশেষ অবস্থা। দর্শনার্থী ভক্ত, মঠের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী যে কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহাকেই ভক্তিভরে করজোড়ে তিনি প্রণাম নিবেদন করেন। কেহ বিস্মিত হন, কেহ বা ভয়ে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন।

একদিন গভীর রাতে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীটিকে করজোড়ে প্রণাম জানাইলেন। এই সেবকটি তাঁহারই দীক্ষিত শিষ্য। ভীত স্বরে তিনি বলিয়া উঠেন, "মহারাজ, এভাবে প্রণাম ক'রে আমায় আর পাপের ভাগী করবেন না।"

শিবানন্দ মহারাজ শান্ত স্বরে কহেন, "আসল ব্যাপারটা কি জানিস্, যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখতে পাই; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম করি। কোন লোক সামনে এলেই প্রথমটা তার ভেতরকার যা সত্তা সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবির্ভূত হন। লোকজন তখন ছায়ার মত অস্পষ্ট, আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও জীবন্ত দেখায়। তাই তো প্রণাম করি। প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় রূপ অন্তর্দ্ধান হয়। তখন লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও পারি।"

উচ্চতর দিব্য অনুভূতিসমূহ তখন তরঙ্গায়িত হইতেছে শিবানন্দের সাধনসত্তায়। একদিন আপন মনে সেবকদের কহিতে লাগিলেন, "কৃপা—কৃপা—কৃপা। তিনি কৃপা ক'রে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে

কি ক'রে তাঁকে বুঝবে? দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত—খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি করছেন। কিন্তু তারই ভেতরে যে এত কাণ্ড তা কি ক'রে লোকে বুঝবে বল, তাঁর বিশাল শক্তির খেলা যত দিন যাবে ততই লোক দেখতে পাবে। ধর্ম্মজগতে একটা মহা ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুর কৃপা ক'রে কত যে দেখিয়ে দিচ্ছেন তা আর কাকে বলব? কাকেই বা বলি, আর কেই বা ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন। তার বিষয়ে কত কথা যে প্রাণের ভিতর (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) গজ্‌গজ্‌ করছে, কাউকে তো তা বলবার জো নেই। কেউ ওসব বুঝতে পারবে না। তোমাদেরও বলতে পারিনে। এমনকি তোমরাও ওসব বুঝতে পারবে না। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যতদিন ছিলেন, তাঁর কাছে প্রাণ খুলে ওসব কথা বলতুম, বলে প্রাণটা খোলসা হ'ত। তিনিও আনন্দ পেতেন, আমারও আনন্দ হ'ত। সে-সব অতি গুহ্য কথা। তাঁর সঙ্গে নিরিবিলিতে কত সব কথা হয়েছে। তিনিও অনেক সময় নিজের অনেক কথা বলতেন। এখন তো আর তা হবার জো নেই। এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথা প্রাণের ভেতরই রয়ে যাচ্ছে, বলবার লোকই পাইনে। সবই যে তাঁর ইচ্ছা। তবে আন্তরিক প্রার্থনা করছি, জগতের কল্যাণ হোক্, তোমাদের কল্যাণ হোক্, তোমরা সব শান্তিতে থাক।"

স্বামী শিবানন্দের শরীর এখন প্রায় পতনোন্মুখ, অন্তর্লোকে নিরন্তর চলিয়াছে মা-ব্রহ্মময়ীর কৃপা আস্বাদন। সেদিন নিজের সম্বন্ধে সেবক শিষ্যদের বলিতে থাকেন, 'কামনা-বাসনা থাকলে চির শান্তিলাভ করা অসম্ভব; আর সেই কামনা-বাসনা ভগবৎকৃপা ছাড়া সমূলে বিনষ্ট হওয়াও সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা ক'রে আমার সব কামনা-বাসনা একেবারে মুছে দিয়েছেন; কোন বাসনা নেই। এই শরীরটা কেবল তাঁর ইচ্ছায়, তাঁরই কাজের জন্য রয়েছে; আমি হচ্ছি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিন্তু কোন বাসনা নেই, বুঝলি

আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ।'—এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। তখন তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে; তিনি যেন এক নূতন লোক। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন মনেই বলতে লাগলেন—'মা আমায় কৃপা ক'রে সব দিয়েছেন। তাঁর ভাণ্ডার খালি ক'রে আমায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তাঁর কৃপায় সব লাভ হয়েছে—যং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ। তবু যে তিনি এ শরীরটা কেন রেখেছেন তিনিই জানেন।

" . গভীর রাত। মহাপুরুষজী তাঁর নিজের খাটে বসে আছেন—ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে আপন ভাবে এক একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বেড়াল ঘরের মেঝের উপর মিউ মিউ ক'রে ডেকে উঠলো। তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বেড়ালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তিনি যে বেড়ালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নি। সেজন্য সে একটু সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বল্লেন—"ছাখ্, ঠাকুর আমায় এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি 'চিন্ময়', ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সর্বপ্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা- কেবল নামের ভেদমাত্র; কিন্তু মূলে সব একই। বেশ পরিষ্কার দেখছি, চেষ্টা ক'রেও সে ভাবটা সামলাতে পারছি না। সবই চৈতন্যময়। এই বেড়ালের ভেতরও সেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বলজ্বল করছে। এইভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপুর ক'রে রেখেছেন। লোকজন আসে যায়; কথাবার্ত্তা বলতে হয় বলি; সাধারণ কাজকর্ম্ম আহারাদি করতে হয় করি। যেন অভ্যাসবশতঃ ক'রে যাই। কিন্তু এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্ব্বত্রই সেই চৈতন্যের খেলা। নামরূপ এসব তো অতি নিম্ন স্তরের ব্যাপার। নাম-রূপের ওপরে মন গেলেই, বাস্। তখন সবই চৈতন্যময়, আনন্দময়। এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই জানে।' আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঐটুকু বলেই

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধ প্রাণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল[১]।”

শিবানন্দজী রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়া সেবকগণ অতিশয় বিব্রত, দিবারাত্র তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। নিজ দেহের নশ্বরতার কথা মহাপুরুষ যেমন বলিতেন আবার তেমনি উদ্দীপনা ভরে বলতেন, “এই শরীরের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি! এতটা করি কেন, জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়। এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান্-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবান্‌কে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁর সেবা করেছে। এই শরীরটাকে তিনি যুগধর্ম্ম প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন—তাই এত।”

তাঁহার শরীর খারাপ বলিয়া ভক্ত শিষ্যদের ঠেকানোর উপায় নাই। কারণ, ডাক্তারেরা নিষেধ করিলেও তিনি মানিতে চাহেন না। বিদায় লগ্নে সিদ্ধকাম শিবানন্দ যেন সদাব্রত খুলিয়া বসিয়াছেন।

এ সময়ে সর্ব্ব অস্তিত্বে তিনি ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ পাইতেছেন। মাঝে মাঝে তাই বলিয়া উঠেন, “ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন, সর্ব্বদা শ্বাসে শ্বাসেই তাঁর দর্শন পাচ্ছি।”

কোন ভক্ত বা আগন্তুক মঠে আসিয়া প্রসাদ না পাইয়া চলিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীদের আর রক্ষা নাই। ভাণ্ডারীকে ভয়ে ভয়ে সদা সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার গঙ্গায় তাহার ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাহার সব কিছুই ডবল দামে বেলুড়-মঠকে কিনিয়া রাখিতে হইবে—বড় দুঃস্থ সে, তাঁহার দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া একদিন সে শিবানন্দজীকে জানাইয়া দিয়াছে।

উৎসবের কুলী মজুর, পাড়ার বাগ্দী, সাঁওতাল ভৃত্য, দারোয়ান সকলেরই ‘বাবার’ কাছেই দরকার। বারান্দায় দাঁড়াইয়া ‘বাবা’ তাঁহাদের খোঁজখবর নেন, প্রয়োজন বোধে নোট-টাকা ছুঁড়িয়া ফেলেন, দরাজ মনে আদেশ দেন, ‘ভাণ্ডারসে লে যাও।’

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন

ঠাকুর শব্দ উচ্চারণেই হয় দিব্যভাবের উদ্দীপন। পূজারীকে দেখিলেই ঠাকুরের কালের আনন্দস্মৃতি উদ্বেল হইয়া উঠে। মা হংসেশ্বরীর মূর্ত্তিটি দেখিলেই হন আনন্দে মাতোয়ারা!

গায়ক হয়তো তাঁহার সম্মুখে মায়ের নাম গাহিতেছেন, আর শিবানন্দ মহারাজ মুহূর্ত্তে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন। আনন্দবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গায়ককে বলিতেছেন, "যা যা—পালা পালা। এঃ হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে। এ যেন শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'একটুতেই দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে'—তাই হয়েছে।"

এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাঁহার সাধন-সত্তায় লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে ভাব-জলধির বিচিত্র তরঙ্গমালা। কখনো মায়ের কথা, কখনো ঠাকুরের কথা নিয়া নানাভাবে চলিতেছে মধুর আস্বাদন।

দিব্য অনুভূতির শিখরদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া স্বামী শিবানন্দ এবার বিরাজিত 'ভাবমুখে'। মা ব্রহ্মময়ীর অঙ্কে বসিয়া আছেন—মায়ের বালকটি। সেদিন এক স্নেহভাজন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তুই কি পড়ছিস্ আজকাল?"

"আজ্ঞে, মাণ্ডুক্যকারিকা পড়ছি," সবিনয়ে উত্তর দেন নবীন সাধক।

"দূর শালা! ওতে কি আমার মায়ের নাম আছে?" পরমানন্দে বলিয়া বসেন শিবানন্দ মহারাজ।

সর্ব্ব বন্ধনহীন, শুদ্ধম অপাপ বিদ্ধম এই কুসুমপেলব বৃদ্ধ শিশুর আননে সদা স্ফুরিত রহিয়াছে দিব্য জ্যোতির আভা। জগৎপ্রপঞ্চে ওতপ্রোত পরম সত্তার মধ্যে নিজেকে যেন নিরন্তর তিনি বিস্তারিত করিয়া দিতেছেন।

অপূর্ব্ব তাঁহার এসময়কার শিশু-লীলা। বিছানায় বসিয়া মহাপুরুষ কখনো শালিক ময়নাকে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছেন। কখনো বা খেল্‌নার ডমরু শব্দে দিতেছেন দূরে তাড়াইয়া।

হঠাৎ একদিন আব্‌দার ধরিলেন, রিস্ট্‌ওয়াচ একটি এখনি তাঁহার

চাই। তখনি তাহা আসিয়া গেল। দুই একবার হাতে বাঁধিবার পর আর উহার কোন প্রয়োজন রহিল না।

১৯৩২ সালের কথা। কোন কোন দিন দেখা যাইত এই সিদ্ধ মহাপুরুষ বালকবৎ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। "বিছানার উপর কথামৃত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটি খঞ্জনী, লাঠি, ছবির বই—ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন—যেন পাঁচ বছরের একটি বালক। আর ইচ্ছানুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া করছেন। হয়তো একটু খঞ্জনী বাজালেন, ঠাকুরমার ঝুলি একটু পড়লেন, আবার কখনো বা হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ আচরণ করতেন তার একটু আভাস পাওয়া যায়—তাঁর একদিনকার কথা থেকে। জনৈক সেবককে কথায় কথায় বলেছিলেন—'ছাখ্, মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে ছুটে যেতে চায়; তাই এসব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করি। মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।"

মঠের প্রবীণ সাধকেরা বুঝিলেন, নির্গুণ পথের অভিযাত্রী, নির্ব্বানোন্মুখ এই মহা সাধককে আর বেশীদিন ধরিয়া রাখার উপায় নাই।

শেষটি বিদায়ের দিন আসিয়া পড়িতেছে। আজকাল শিবানন্দ মহারাজ মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেহী গুরুভ্রাতাদের দর্শন লাভ করেন। একদিন ভক্তদের বলিলেন, "কাল খুব ধ্যান হয়েছিল। এইসব রাজ্য ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল ঊর্দ্ধলোকে। স্বামীজীকে দেখলাম। একটা জ্যোতির সূতোর মত ঝুলছে, সেটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বামীজী নীচে এসেছিলেন। মহারাজকেও দেখেছি, তিনিও রয়েছেন। বেশ আনন্দে ছিলাম।"

আর একদিন জানাইলেন, "এই মাত্র স্বামীজী ও মহারাজ এসেছিলেন। আর বললেন, 'চল তারকদা'। তোরা কেউ দেখতে পেলিনে? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।"

মারাত্মক সন্ন্যাস রোগে শিবানন্দ স্বামী আক্রান্ত হইয়াছেন। মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা, গৃহস্থ ভক্তেরা, সেবার কোন ত্রুটি হইতে দিতেছেন না। স্যর নীলরতন প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা প্রাণপণ চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। স্যর নীলরতন সেদিন পরম শ্রদ্ধাভরে মন্তব্য করিলেন, "যে ক'রেই হোক এঁকে আপনারা আটকে রাখুন। বলুন তো এমন মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?"

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন এলাহাবাদ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন স্বামী শিবানন্দকে দর্শনের জন্য। তিন দিন পরে, বিদায় নিতে গিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দজী নীরবে বাম হাতটি তাঁহার মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে উত্তরকালে বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, "যেদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্য্যন্ত আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌বে, সে পর্য্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাবো।"

১৯৩৪ সালের ২০শে এপ্রিল রোগের সঙ্কট ঘনাইয়া আসে, ডাক্তারেরা বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। মঠবাড়ী ও মঠপ্রাঙ্গণে শোকাকুল নরনারী ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। সাধুরা স্বামী শিবানন্দের শয্যা ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, নিরন্তর শুনাইতেছেন সদ্‌গুরুর পবিত্র নাম। মহাপুরুষের সারা দেহে তখন দেখা দিতেছে পুলক রোমাঞ্চ। দিব্য আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাঁহার মুখে চোখে।

"শেষ মুহূর্ত্ত যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন তাঁহার অঙ্গে পুলক আরো ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ স্মিত প্রশান্ত। অপরাহ্ণ ৫টা ৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুরুষজীর বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব আনন্দ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সঙ্গে সাঙ্গ মাথার চুল এবং সর্ব্ব শরীরে লোম কদম্বফুলের মতন খাড়া হইয়া উঠিল এবং

একটু পরেই মুখ দিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল। সেই পুলকিত অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল[১]।”

বেলুড় গঙ্গাতীরে শত শত শোকাকুল নরনারীর সম্মুখে সেদিন ভস্মীভূত হয় মহাসাধক শিবানন্দ স্বামীর মরদেহ, আর এই সঙ্গে নির্ব্বাপিত হয় রামকৃষ্ণ দেউলের একটি সুপবিত্র আলোকবিস্তারী দীপশিখা।

শৈবাচার্য্য অপ্পর

ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতিময় জীবনে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধকদল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উভয় যুগেই দলে দলে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদের দিয়াছেন দিব্যলোকের আলোক-সঙ্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধারা। এই মহাত্মাদেরই অন্যতম শৈবাচার্য্য অপ্পর। কৃচ্ছ্র, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনন্য ইষ্টসেবা ও কঠোর যোগসাধনার সহিত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সমন্বিত হয় তাঁহার সাধনজীবনে। বহুজনের আলোক-দিশারী রূপে সর্ব্বত্র তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

অপ্পর আবির্ভূত হন আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দে। তামিল দেশের, বর্ত্তমান তামিল নাড়ুর, দক্ষিণ আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম। শিব-সাধনার ঐতিহ্যের ধারাটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত ছিল তাঁহাদের বংশে। অপ্পরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই এক ধারক ও বাহক। নৈষ্ঠিক শিবভক্ত বলিয়াও স্থানীয় অঞ্চলে তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল।

শৈশবেই অপ্পরের জীবনে নামিয়া আসে দৈবের নির্ম্মম আঘাত। অল্প দিনের ব্যবধানে জনক ও জননী শিশুপুত্রের মায়া কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। অপ্পরের বাল্যবিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই সংসারেই বাস করিতেন; এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন তাহার লালনপালনের ভার।

বালক কালেই অপ্পরের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদি অতশয় যত্নে যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন, তেমনি করেন তাহার লেখাপড়ার সুব্যবস্থা। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অপ্পরকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং অল্পকালের

ধর্ম্মের পণ্ডিতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তাই কাঞ্চী তখন পরিণত হইয়াছে সর্ব্বশাস্ত্রেরই পীঠস্থান রূপে।

চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও পড়ুয়াদের কাছে অপ্পর কাঞ্চীনগরের বিদ্যাবৈভবের কথা শুনিয়াছেন। নিজে তিনি উৎসাহী বিদ্যার্থী, তাছাড়া, সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্প্রতি তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁহার কিশোর মন চঞ্চল হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থ কাঞ্চীতে বসবাস করার জন্য। সেখানে গিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার অভিলাষ।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে একদিন কহিলেন, "দিদি, কাঞ্চীতে গিয়ে শিক্ষা লাভ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সেই ব্যবস্থাই তুমি আমার ক'রে দাও। বিদ্যার্থী হিসাবে এজন্য যা কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়, আমি তাতে একটুও পশ্চাদ্‌পদ হবো না। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, সেখানে থেকে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে, আমি দেশে ফিরবো।"

দিদি কহিলেন, 'ওরে তুই কৃতী হবি, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবি তাই যে আমি চাই। আর সেই ভরসায়ই যে আমি এতকাল দিন গুনছি। কিন্তু ভাই, কাঞ্চীর বিদ্যাপীঠে তোর পড়াটা আমার যেন ভাল ঠেক্‌ছে না।"

"কেন বলতো ?"—ক্ষুণ্ণ মনে প্রশ্ন করেন অপ্পর।

"শুনেছি, কাঞ্চীতে রাজা মহেন্দ্রের সম্প্রদায়, অর্থাৎ, জৈনেরাই বেশী প্রতিপত্তিশালী। জৈন শাস্ত্রবিদ্‌দের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ন্যায়-শাস্ত্রের কূটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের কচ্‌কচি। ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে গৌণ, আমাদের ইষ্ট বিগ্রহ শিব যেখানে রয়েছেন অবজ্ঞাত হয়ে।"

"এ তুমি কি বলছো দিদি। আমি নিজে যদি ঠিক থাকি, আমার নিজের ধ্যানধারণা যদি ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার অনিষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া, এযুগে প্রকৃত শাস্ত্রবিদ্ হতে হলে ঈশ্বরমুখী আর ঈশ্বরবিমুখী উভয় শাস্ত্রই পাঠ করতে হবে। কাঞ্চী ছাড়া কোথাও যে তার সুবিধে নেই।"

"আমি বলি কি, তুই বরং চিদম্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব-মন্দিরে রয়েছেন শৈবাগমের দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা, আর রয়েছেন সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষেরা।"

"কিন্তু দিদি, সেখানে গিয়ে তো আমায় একটিমাত্র সম্প্রদায়ের একপেশে বিদ্যাচর্চ্চা নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজ্যের দশ দিকের দশটি জানালা তো খুলবে না। দর্শন ও সাধনার বহুমুখী তত্ত্ব তো আমি আয়ত্ত করতে পারবো না। না—না, আমি কাঞ্চীতেই যাবো। তুমি এতে আপত্তি ক'রো না।"

ভ্রাতার সঙ্কল্পে দিদি আর বাধা দিলেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই অপ্পর রওনা হইয়া গেলেন কাঞ্চী নগরে।

এখানকার প্রধান বিদ্যাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য। উত্তর-ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ জৈন দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। আর তাঁহাদের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে চলিতেছে শত শত বিদ্যার্থীর শাস্ত্র অধ্যয়ন। তরুণ ছাত্র অপ্পর এই বিদ্যাপীঠেই ভর্ত্তি হইলেন। বহুলখ্যাত পণ্ডিতদের চরণতলে বসিয়া শুরু হইল তাঁহার অধ্যয়ন-তপস্যা।

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ তাঁহার ধীশক্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অপ্পর নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। বিশেষ করিয়া জৈন শাস্ত্রে জন্মিল তাঁহার অসামান্য অধিকার। বিচার সভা ও তর্কদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই তরুণ পণ্ডিত অল্পকাল মধ্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

শাস্ত্র ও দর্শনতত্ত্বে পারঙ্গমতার জন্যই শুধু নয়, অসামান্য কাব্য-প্রতিভার অধিকারী-রূপেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিলেন। প্রবীণ জৈন ধর্ম্মনেতা ও সাধকেরা তাই তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক বিরাট প্রতিশ্রুতি।

রাজা মহেন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টিও অচিরে পতিত হইল এই প্রতিভাবান্ স্নাতকের উপর। অবশেষে একদিন রাজগুরুর কাছে জৈনধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন অপ্পর।

রাজসভার পণ্ডিতেরা বুঝিয়া নিলেন, এই প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিতই সেই চিহ্নিত ব্যক্তি, যিনি উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধর্ম্ম-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অপ্পর কাঞ্চী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, দিদির স্নেহ সান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়া যান। কিন্তু আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অপ্পর এখন মজিয়া আছেন বিদ্যাচর্চ্চায় ন্যায়ের কূটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া জৈনধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়।

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর। বিদ্যার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে অপ্পরের মনে, জৈন পণ্ডিতদের প্রভাবে পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও হইয়াছে প্রায় তিরোহিত।

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, "কাঞ্চীতে গিয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে বাধা জন্মায়, তার মূল্য যে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস?"

"ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি?"

"আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতর বিদ্যার অভিমান জেগেছে। তাছাড়া, জৈন শুষ্ক তার্কিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী হয়েছিস্। সব চাইতে দুঃখের কথা, ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়েছিস্ তুই। আমাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈব সাধক। তাঁদের পথ থেকে তুই দূরে সরে গিয়েছিস্। এর ফল কি কখনো ভালো হতে পারে?"

কয়েক দিন পরের কথা। হঠাৎ একদিন মারাত্মক শূলব্যথায় অপ্পর একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না। সঙ্কট ক্রমে চরমে উঠিল, মুমূর্ষু অপ্পরকে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ এসময়ে অপ্পরের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গুরুদেব তাঁহাদের গৃহে

আসিয়া উপস্থিত। সিদ্ধ শৈব সাধক বলিয়া এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত। যোগবিভূতির খ্যাতিও তাঁহার প্রচুর। তাই তাঁহার আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন। রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহাকে জানানো হইল।

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, "তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট অচিরেই কেটে যাবে, অপ্পর বেঁচে উঠবে। কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে। বংশানুক্রমে প্রভু শিবই হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। এই ইষ্টের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তো যতো বিপদের সৃষ্টি। তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিরাজ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ। অপ্পর আজ তাঁর কাছেই করুক আত্মসমর্পণ।

আশীর্ব্বাদ জানাইয়া মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপ্পরের জন্য দিদির এবার আর দুশ্চিন্তা নাই। বুঝিলেন, গুরুদেবের কথা কখনো মিথ্যা হইবার নয়, প্রভু শিবের কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার রক্ষা পাইবে।

অপ্পরকে কহিলেন, "শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তুই ইষ্টদেবকে ভুলে গিয়েছিস্। ইষ্টের চরণে অপরাধ করেই তো তোর এত কষ্ট, এত বিড়ম্বনা। সবাই আমরা তোকে ধরাধরি ক'রে শিব-মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে প্রভু শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, স্তবস্তুতি জানিয়ে তাঁকে প্রসন্ন কর্। দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাজ তো আজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে বলে গেলেন। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তাঁর কথা তো মিথ্যে হবার নয়।"

প্রচণ্ড শূলবেদনায় অপ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই দৈব কৃপার উপর নির্ভর করিতে তাঁহার আপত্তি হইল না।

রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থম্‌থমে ঘন অন্ধকার। মন্দিরের অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার্ত্ত অপ্পর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাম। হঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া

উঠিল। সেই সঙ্গে শোনা গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, "বৎস অপ্পর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছো তুমি, লাভ করেছো নবজন্ম। আশীর্ব্বাদ জানাই, নূতনতর ঈশ্বরীয় চেতনা জাগ্রত হোক তোমার সাধনসত্তায়, আর তোমার মাধ্যমে সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অপ্পর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র শূলবেদনা দূরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নূতন চেতনার জোয়ার। সুষুপ্তিময় রাত্রির শেষে এ যেন আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তাঁহার নবজাগরণ।

দিব্য আনন্দের রসে অপ্পর উচ্ছল উদ্বেল। লিঙ্গবিগ্রহের বেদীতলে ভাবাবেশে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্ত-করে নিবেদন করিলেন শিবমহিমার অপরূপ স্তবগাথা।

আবার শোনা যায় দিব্যপুরুষের বাণী, "বৎস অপ্পর, তোমার স্তবমালা আমায় প্রসন্ন করেছে। আজ থেকে শিবভক্তেরা জানবে তোমায় 'তিরুণাবক্করসু' নামে, ঈশ্বরের আশিসপূত বাক্-পতি ব'লে পরিচিত থাক্‌বে তুমি এ অঞ্চলের শৈব-সমাজে।"

যুক্তপাণি অপ্পর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, "প্রভু, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তোমার দাসরূপেই যেন এ জীবন অতিবাহিত করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ হয় চিরদিনের জন্য উৎসর্গীত। তোমার মহিমা ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত।

মন্দিরের স্বর্গীয় জ্যোতির ধারা অন্তর্হিত হইয়া গেল। দিব্য প্রেরণায় উদ্দীপিত অপ্পর কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের পাশে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুই নয়ন তাঁহার পুলকাশ্রুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তির হাসি। ভ্রাতা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন, স্বধর্ম্মের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন,

প্রভুর আশীর্ব্বাদে হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। চিত্ত তাঁহার তাই ইষ্টদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী দিদি অপ্পরের মুখ হইতে আনুপূর্ব্বিক শুনিলেন। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আর কিন্তু দেরী করা নয়, ভাই। আমাদের কুলগুরু, সিদ্ধ শৈবাচার্য্যের কাছ থেকে তুই দীক্ষা গ্রহণ কর্। যে কৃপা দেবাদিদেব শিব তোকে আজ করেছেন, অচিরে তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক। শিব সাধনায় তোর সিদ্ধি লাভ হোক্, তা-ই যে আমি চাই।"

গুরুর কাছে দীক্ষা নিবার পর অপ্পর শুরু করেন তাঁহার কঠোর সাধনা। ইষ্টদেব শিবের ধ্যান জপে নিরন্তর নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, দিন রাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, সে সম্বন্ধে কোন হুঁশ নাই। গুরুর নির্দ্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগূঢ় সাধনার এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শক্তিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

গুরু একদিন কৃপাভরে কহেন, "বৎস, অপ্পর, সাধনার এই দুরূহ ক্রমসমূহ যে ভাবে তুমি আয়ত্ত করছো, তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি স্মরণে রেখো, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তোমার সাধনসত্তায় মিলিত হয়েছে অসাধারণ শিবভক্তি ও দিব্য অনুভূতি। তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনের জন্য পূর্ব্ব হতেই প্রভু তোমায় চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, সিদ্ধ মহাত্মা মাণিক্যবাচক-এর সাধনপথ ও শিবভক্তি প্রচারের পথ তুমি অনুসরণ করো। তাঁর স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার সাধন-জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আদিষ্ট কর্ম্ম উদ্‌যাপন তোমার সহজতর হয়ে উঠ্‌বে।"

সিদ্ধ শিবযোগী মাণিক্যবাচক-এর পবিত্র জীবন, তাঁহার সাধনপন্থা আর স্তবগাথা দক্ষিণদেশের হাজার হাজার শৈব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে। দিব্য জীবনের দুয়ার তাঁহাদের সম্মুখে

করিয়াছে উন্মোচিত। গুরুর আদেশে অপ্পর তাই শুরু করিলেন মাণিক্যবাচক-এর শিক্ষা ও সাধনার অনুধ্যান।

মাদুরার সন্নিকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বংশে, আবির্ভূত হন মাণিক্যবাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় তাঁহার জীবনে। সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ্ ও পরমধার্ম্মিক পণ্ডিত রূপেও তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সমকালীন পাণ্ড্যরাজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম্মপ্রাণ। দূত পাঠাইয়া বাদাবুর হইতে তরুণ পণ্ডিতকে তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন মাণিক্যবাচক : অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, শুধু তাহাই নয়, কহিলেন "পণ্ডিত, বয়সে তরুণ হলেও, প্রভু শিবজীর কৃপায় অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞান তুমি অর্জ্জন করেছো। বাদাবুর গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর জন্য তো তোমার জন্ম হয় নি। তোমার যোগ্য স্থান রাজধানীতে। এবার এখানে তুমি চলে এসো, তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করো দেশের ও দশের কল্যাণে। আমার রাজকার্য্যে তুমি সহায়তা করো। তোমায় আমি নিযুক্ত করছি এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদে।"

"মহারাজ, শাস্ত্রানুশীলন আমার উপজীব্য, সত্যের সন্ধানই আমার জীবনের ব্রত। রাজধানীতে থেকে, রাজকর্ম্মের ভীড়ে, আমার সে ব্রত উদযাপনে যে বাধার সৃষ্টি হবে।" সবিনয়ে উত্তর দেন মাণিক্যবাচক।

"না পণ্ডিত, এ কাজ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা হবে না। আমার রাজধানীতে দিনের পর দিন আসছেন কত প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ্, কত সিদ্ধ সাধক। তাঁদের সান্নিধ্য পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোমার মত কর্ম্মক্ষম, শুদ্ধাচারী ও জ্ঞানী সচিবের সাহায্য পেয়ে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তুমি এ কার্য্যভার গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীর হিতসাধন করো।"

পাণ্ড্যরাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরমধার্ম্মিক। প্রজাদের

সত্যকার কল্যাণ সাধনেও তিনি সদা তৎপর। সর্ব্বোপরি তরুণ পণ্ডিত মাণিক্যবাচক-কে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এই ভালবাসার টান এড়ানো সম্ভব হইল না, মন্ত্রিত্বের পদ মাণিক্যবাচক গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদিন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন শাস্ত্রচর্চ্চা, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে।

তত্ত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষার তৃষ্ণা চিরদিনই জাগিয়া রহিয়াছে তাঁহার অন্তর্জীবনে; এক এক সময়ে এই তৃষ্ণা প্রবলতর হইয়া উঠে, ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার ফলে বহু জ্ঞানী শাস্ত্রবিদ্ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেছেন, তত্ত্ব আলোচনার পরম সুযোগও আসিতেছে। কিন্তু তৎ-এর সাক্ষাৎ তো জীবনে ঘটিতেছে না। শাস্ত্রানুশীলন ও সাধন-ভজনের লক্ষ্য—সেই 'তৎ', সেই পরমপুরুষ। তাঁহার দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি তো আজিও হয় নাই। এ জীবন তাই একেবারে ব্যর্থ, 'বন্ধ্যা'। প্রকৃত সমর্থ সদ্‌গুরুর কৃপা না পাইলে, ইষ্ট সাক্ষাৎ তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু কে তাঁহার এই সদ্‌গুরু? কোথায় কখন ঘটিবে তাঁহার কৃপাঘন আবির্ভাব? আজকাল এই চিন্তাই বেশীর ভাগ সময় মাণিক্যবাচককে ব্যাকুল করিয়া রাখে।

এ সময়ে পাণ্ড্যরাজ একদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, "ছাখো মন্ত্রী, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মতিগতি তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নূতন ক'রে সংগঠিত করা দরকার। এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ। কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে চলে যাও। উৎকৃষ্ট অশ্ব কিনে নিয়ে এসো।"

অর্থ ও লোকলস্কর নিয়া মাণিক্যবাচক চলিয়া গেলেন। কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্যরূপ। তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে পৌঁছানোর পর তাঁহার জীবনে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা। যে সদ্-

গুরুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়া দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে এখানে হঠাৎ তিনি হন আবির্ভূত।

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাঁহার কৃপায় তরুণ সাধক মাণিক্যবাচক অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যান। দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহার সাধনজীবন হয় কৃতকৃতার্থ।

মাণিক্যবাচক-কে কয়েকদিন নিজ সান্নিধ্যে রাখার পর গুরু মহারাজ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে কহিলেন, "বৎস, আমার ঈশ্বর-আদিষ্ট কাজ শেষ হয়েছে। আমি এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তোমার প্রতি আমার দুটি নির্দ্দেশ রইলো। এই স্থানটি বড় জাগ্রত, বড় পবিত্র। এস্থানে তুমি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করো। বহু শিবভক্ত এর আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এটা হবে তাঁদের প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে। আর একটি কথা। এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভু শিবজীর স্তবগাথা রচনায়। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার এই শিবস্তবমালা যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষকে প্রেরণা দেবে, মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে থাকবে।"

গুরুর নির্দ্দেশ পালন করিতে মাণিক্যবাচকের বিলম্ব হয় নাই। রাজার অশ্ব ক্রয়ের জন্য হাতে যে টাকা ছিল তাহাই তিনি নিয়োজিত করিলেন মন্দির নির্ম্মাণের কাজে। তারপর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব শেষ করিয়াই উপস্থিত হইলেন পাণ্ড্যরাজের সকাশে। অকপটে নিবেদন করিলেন তাঁহার অপরাধের কথা। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে আমি ব্যয় করেছি, আমি জানি আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন।"

পাণ্ড্যরাজ তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তৎক্ষণাৎ মাণিক্যবাচককে তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে কারাগারে। কহিলেন, সমস্ত ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আমি এই অপরাধের বিচার করবো।"

নির্দ্ধারিত দিনে, বিচার সভায় বন্দী মাণিক্যবাচক-কে নিয়া আসা হইল। পাণ্ড্যরাজের ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। ঘটনার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শুনিয়া প্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর কিছুটা সদয় হইয়াও উঠিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, "মাণিক্যবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুমি করেছো, তা অত্যন্ত গুরুতর। এজন্য সমুচিত দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড। কিন্তু সে দণ্ড আমি তোমায় দিচ্ছিনে। সরকারী তদন্তের ফলে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের বশে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে, রাজকোষের অর্থ দিয়ে শিব মন্দির তৈরী করেছিলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এ অর্থ তুমি নাও নি। আরও একটা কথা। তুমি মন্ত্রী পদে আসীন থাকার কালে আমার এ রাজ্যের কল্যাণে অনেক কিছু করেছো। তাছাড়া, শিবভক্ত সাধক বলে তোমায় আমরা এতকাল মর্য্যাদা দিয়ে আসছি। এসব কথা স্মরণে রেখে, আমি তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান দিচ্ছিনে তুমি পদচ্যুত হয়েছো, কারাগারে এতদিন যাপন করেছো, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুটা হয়েছে। তবে রাজ-অর্থের অপব্যবহারের জন্য তোমার সমস্ত কিছু অর্জিত ধন-সম্পত্তি আমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করলাম। এবার তুমি মুক্ত। অতঃপর যেখানে তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে পারো।"

পাণ্ড্যরাজের আদেশ শুনিয়া মাণিক্যবাচক-এর আনন্দ আর ধরে না। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, এমনিতর মুক্তিই যে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামনা ক'রে এসেছি। আমার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে আপনি আমায় বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার থেকে আমার একমাত্র কাজ হবে দীনবেশে ইষ্টদেব শিবজীর স্তুতিগান করা আর এদেশের সাধন-পীঠে মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন করা।"

শিবভক্তি ও শিবমাহাত্ম্য প্রচারের এই ব্রতই মাণিক্যবাচক জীবনের শেষ দিন অবধি উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে অপরূপ

স্তবমালা দিনের পর দিন তিনি রচনা করিয়াছেন, দেশের ভক্তজন ও অধ্যাত্মরসের রসিকদের কাছে তাহা গণ্য হয় মণিমাণিক্যের মত মূল্যবান বলিয়া। জনসাধারণ তাই তাঁহাকে আখ্যা দেয়—মাণিক্য-বাচক, অর্থাৎ বাক্য তাঁহার মাণিকের মত দ্যুতিমান, মূল্যবান।

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদম্বরমে মাণিক্যবাচক তাঁহার জীবনলীলায় ছেদ টানিয়া দেন। জনশ্রুতি আছে, দিব্য ভাবাবেশে শিবের স্তুতিগান করিতে করিতে এই মহাত্মা চিদম্বরমের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ নটরাজের অভ্যন্তরে লীন হইয়া যান।

মাণিক্যবাচকের জীবন ছিল দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শিব-চৈতন্যময়। তাঁহার অমর স্তবগাথার গ্রন্থ 'তিরুবাচকম' উত্তরকালে কীর্ত্তিত হয় ভক্তি প্রবাহের উৎস রূপে, উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এই স্তবমালায়। সাধকজীবনের স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, যে দিব্য-চেতনার মধ্য দিয়া সাধক চরম পর্য্যায়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন, তিরুবাচকম-এ রহিয়াছে তাহারই অপরূপ ব্যঞ্জনা। আজো তামিল দেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই স্তবগাথা হইতে লাভ করে পরম পথের পাথেয়।[১]

সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপূত আদর্শ এখন হইতে হইয়া উঠে অপ্পরের সাধনজীবনের ধ্রুবতারা. তিরুবাচকম-এর স্তবগাথার প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন, নিগূঢ় চৈতন্যময় জীবনের স্তর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাঁহার সম্মুখে। শুধু তাহাই নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অপ্পরের কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতে থাকে ইষ্টদেব শিবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক স্তোত্রমালা। অচিরে এই স্তোত্রসমূহ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

ইষ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অপ্পরকে ব্যাকুল করিয়া

১ কালচারাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া ভল্যু. ২,—দ্য শৈব সেইণ্টস্ঃ এস, এস, পিল্লেই

তোলে। গুরু মহারাজের নিকট নূতনতর সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য তিনি ছুটিয়া যান।

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগূঢ় ক্রম গুরু এবার তাঁহাকে শিক্ষা দেন। প্রসন্ন কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া বলেন, "বৎস, সাধনার এই ক্রমগুলো সমাপ্ত করো, আর এই সঙ্গে নিজের অহংবোধের মূলকে করো উৎপাটিত। ইষ্টদেব শিবজীর ভৃত্যরূপে নিজেকে সদাই গণ্য ক'রে চলবে। আশীর্ব্বাদ করছি, অচিরে হবে তোমার ইষ্টদর্শন। ইষ্টকৃপায় মোক্ষলাভও তোমার হবে।"

এখন হইতে সাধনার গভীরে অপ্পর নিমজ্জিত হইয়া যান। নিত্যকার সাধন-ভজন শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে স্বরচিত শিবস্তব তিনি গাহিয়া বেড়ান। সর্ব্বত্যাগী সাধকের পরনে একটি জীর্ণ বহির্ব্বাস, হস্তে একটি খুরপি—গ্রামে গ্রামান্তরে যেখানে যে শিবমন্দির আছে এই খুরপি দিয়া তাহার পরগাছা উৎপাটন আর ময়লা নিষ্কাশন করাই হয় তাঁহার নিত্যকার কর্ম্ম। প্রভু শিবের একান্ত দাস ও সেবকরূপে তামিল দেশের সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

শিব শরণাগতির এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত অপ্পরের জীবনে এবার সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব পরম কারুণিক শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন।

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস অপ্পর আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, যেমন তোমার অভিরুচি--বর মেগে নাও।"

ত্যাগব্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, "প্রভু, দাসরূপে সেবা ক'রে তোমার দুর্লভ সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরূপেই যেন চিরদিন আমি থেকে যাই। এই কৃপাই তুমি আমায় করো।"

ইষ্টদেব স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তথাস্তু।"

সিদ্ধ সাধক অপ্পরের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নূতন অধ্যায়। দৈন্যময়, ত্যাগব্রতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়া দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত শত নরনারী। গৃহপ্রাঙ্গণ

শিবভক্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে। কাঞ্চী, মাদুরা, চিদম্বরম প্রভৃতি নগরেও শৈব সাধক অপ্পরের খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

কাঞ্চীর জৈন সাধক ও শাস্ত্রবিদেরা এবার চঞ্চল হইয়া উঠেন। অপ্পর যে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের এক প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত। তাঁহার উপর অনেক আশা-ভরসা করিয়া আছেন। রাজধর্ম্মের বিশিষ্ট ধারক বাহকেরা। জৈনধর্ম্মের প্রচারে অপ্পর প্রাণমন ঢালিয়া দিবেন, এই ধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহা নয়, একেবারে বিপরীত বুদ্ধি নিয়া শৈব ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় তিনি ঘটাইতে বসিয়াছেন।

রাজপাণ্ডিতেরা পাণ্ড্যরাজের কাছে গিয়া অভিযোগ তুলিলেন, "মহারাজ, জৈন মণ্ডলীর সংস্রব অপ্পর ত্যাগ করেছে, শুধু তাই নয়, সরকারী বিদ্যাপীঠে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে যে উপকার সে পেয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে হয়েছে বিস্মৃত। জৈনধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে শুরু করেছে শৈবধর্ম্মের প্রচার। অবিলম্বে তার দণ্ডবিধান না করলে রাজকীয় ধর্ম্ম শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, আদেশ দেন, "জৈনধর্ম্মত্যাগী এই নবীন আচার্য্যকে সত্বর রাজসভায় উপস্থিত করো। বিচারে তার সমুচিত দণ্ড বিধান করা হবে।"

অপ্পরকে রাজার সন্নিধানে নিয়া আসা হইল। রাজ-পণ্ডিতদের অভিযোগের উত্তরে শান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আমি চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে রত রয়েছি। এজন্য বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ কোন পন্থারই শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ বাদ দিই নি। জৈন মত আমি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁর পরে প্রভু শিবজীর অপার করুণায় পরমতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে জীবন আমার হয়েছে কৃতকৃতার্থ। এতে আমার কোন অপরাধ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

পাণ্ড্যরাজ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তুমি কি জানো না, জৈনধর্ম্ম এখানকার রাজধর্ম্ম? সেই ধর্ম্ম একবার গ্রহণ ক'রে

তুমি তা ত্যাগ করেছো। এজন্য কঠোর শাস্তি তোমায় পেতে হবে। তাছাড়া, অপ্পর, তুমি রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেছো, রাজ-কোষের বহু অর্থ রাজপণ্ডিতদের বহু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তোমার জন্য।”

“মহারাজ যা বলছেন তা সত্যি। কিন্তু আমার দিক দিয়ে কিন্তু অধর্ম্মাচরণ আমি কিছু করি নি। ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য—পরম সত্য আবিষ্কার করা, আর সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকা। শৈবধর্ম্মের ছায়াতলে এসে, পরমপুরুষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আমি সত্যকেই লাভ করেছি। জীবন আমার ধন্য হয়েছে।”

“তবে কি তুমি বলতে চাও রাজকীয় জৈনধর্ম্মে সত্যবস্তু নেই? তা রয়েছে শুধু শৈবধর্ম্মেই।”—রাজা তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার মত হইয়াছেন।

সভায় উপস্থিত জৈন পণ্ডিতেরা উত্তেজিত স্বরে কোলাহল শুরু করিলেন, “মহারাজ, রাজধর্ম্মের অবমাননাকারী এই দুর্বৃত্তকে আপনি চরম দণ্ড দিন। নইলে এ রাজ্যের মহা অকল্যাণ হবে।”

পাণ্ড্যরাজ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, “আচার্য্য অপ্পর! তুমি রাজধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, তার বিরুদ্ধে অপমানসূচক বাক্য ব'লে ঘোরতর অপরাধ করেছো। সুপণ্ডিত হয়েও একাজ তুমি করেছো, তাতে অপরাধের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের,—প্রাণ-দণ্ডের আদেশ আমি দিচ্ছি।”

ফৌজদারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অপ্পরকে বধ করা হইবে উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া। এই দণ্ডদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতূহলী জনতার ভীড় জমিয়া উঠে।

রাজার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয় বটে, কিন্তু সাধক অপ্পর বিস্ময়করভাবে প্রাণে বাঁচিয়া যান। দেখা যায়, পর্ব্বত শীর্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত তাঁহার দেহটি সানুদেশের এক আগাছার উপর পতিত হইয়া কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে।

সমবেত জনতা এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। উচ্চ কণ্ঠে

অপ্পরের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। অনেকে বলাবলি করিতে থাকে—'শিবের একান্ত ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ এই অপ্পর। স্বয়ং শিবই কৃপা ক'রে রক্ষা করেছেন ওর জীবন।'

রাজপুরুষেরা ছুটিয়া গিয়া রাজসকাশে এই ঘটনার কথা নিবেদন করিলেন। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি অপ্পরকে আবার পাহাড় চূড়া হইতে নিক্ষেপ করা হইবে?

পাণ্ড্যরাজ কহিলেন, "না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টা ক'রো না। হাজার হাজার উত্তেজিত লোকের সামনে একাজ করারও প্রয়োজন নেই। বরং অপ্পরকে তোমরা গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। গলদেশে ভারী পাথর বেঁধে জলগর্ভে ফেলে দিয়ে এসো।"

আদেশ মত কাজ সমাধা করিয়া রাজপুরুষেরা কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল—এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সমুদ্র-গর্ভে তলাইয়া গিয়াও অপ্পর প্রাণ হারান নাই, ইষ্টদেব শিবের কৃপায় গলার বন্ধনী হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটি কখন খসিয়া গিয়াছে। তারপর তাঁহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।[১] সেখান হইতে ধীবরেরা তাঁহাকে উঠাইয়া নেয় এবং শুশ্রূষার ফলে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে।

সুস্থ হইয়া উঠিয়া অপ্পর ধীবরদের সব কথা খুলিয়া বলেন, তারপর ধীরপদে উপনীত হন রাজপ্রাসাদের দ্বারে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হয় নাই, তাই তাঁহার পিছনে সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা।

জনতার বিশ্বাস, সাধক অপ্পর শিবের অনুগৃহীত, তাই শিবের কৃপাতেই দুই-দুইবার তিনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাহাদের কয়েকজন মুখপাত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

---

১ তামিলদেশের তীরভূমির লোকদের বিশ্বাস, শিবের কৃপা অপ্পরের গলার প্রস্তরকে হাল্কা ভাসমান কাঠে পরিণত করে এবং তাঁহাকে বেলাভূমিতে ভাসাইয়া নিয়া আসে। অপ্পরের ভাসমান দেহটি সমুদ্রতটের যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আজিও বহু শৈবসাধক ও ভক্ত সেস্থানটিকে পুণ্যপীঠ বলিয়া গণ্য করেন।

অপ্পর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি সিদ্ধ পুরুষ —এ যুগের প্রহ্লাদ। আপনি এবার তাঁকে মুক্তি দিন, সমবেত জনগণের সন্তুষ্টি বিধান করুন।"

দুই দুইবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপ্পর অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাইয়াছেন। পাণ্ড্যরাজের মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়া আসিয়াছে। অপ্পরকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "অপ্পর, আমি বুঝতে পারছি, কোন বিরাট শক্তি দ্বারা তুমি রক্ষিত। প্রকৃত ব্যাপারটি কি তুমি আমায় খুলে বলো।"

উদ্ধারকর্ত্তা ইষ্টদেব শিবের কথা স্মরণ করিতেই সাধক অপ্পর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। নয়ন দুটি তাঁহার নিমীলিত, আননে দিব্য জ্যোতির আভা, কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। যুক্তকরে গাহিয়া উঠেন স্বরচিত শিবমহিমার স্তবগাথা :

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালা
গলায় পরেছেন আমার প্রভু দেবাদিদেব,
সৃষ্টি আর প্রলয়ের লহরী লীলায়--
কখনো মঙ্গলময় শিবরূপে, কখনো রুদ্ররূপে
নিজেকে করছেন তিনি বিলসিত।
এই আদি অন্তহীন বিভুকে
কি ক'রে করবো ধারণ
ক্ষুদ্র মানুষের এই অন্তর পটে ?
কি ক'রেই বা পাবো উদ্ধার
ভয়াল মৃত্যু আর বিনষ্টির হাত থেকে ?
মূর্খ আমরা, তাই অভিমানের প্রাচীর গ'ড়ে
ঠেকিয়ে রেখেছি শিবের ত্রিনয়নের জ্যোতি,
সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছি দূরে সরিয়ে।
আত্ম-অভিমানের সে প্রাচীর গুঁড়িয়ে দাও
এগিয়ে চলো দৈন্য আর একান্ত শরণের সাধনায়,
প্রভুর কিঙ্কর আর সেবক রূপে
দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে।

তবেই তো হবে প্রভুর করুণা সম্পাত,
তবেই তো প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাৎ।
কল্যাণ আর অমৃতের ধারা
তবেই তো পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে।

(তেবরম্)

এই দিব্য ভাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানো ইষ্টস্তুতির মধু-ঝঙ্কার পাণ্ড্যরাজকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অপ্পরের পদতলে তিনি লুটাইয়া পড়েন, ব্যাকুল কণ্ঠে মাগেন তাঁহার কৃপা ও আশ্রয়।

শৈবসাধক অপ্পরের কাছে রাজা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, ইহার ফলে সারা তামিলদেশে দেখা দেয় শৈব সাধনা ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। মাদুরা, কাঞ্চী ও চিদম্বরমের মন্দির ও ধর্ম্মসভাগুলিতে শিবভক্ত সন্ন্যাসী ও আচার্য্যদের প্রাধান্য এবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

রাজগুরু অপ্পরকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হয় নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। কিন্তু এ আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যুক্তকরে কহেন, "আমি শিবের দাস, শিব-কৃপার দীন ভিখারী। আমার জীবনের একমাত্র ব্রত স্বহস্তে ইষ্ট বিগ্রহের সেবা পূজা করা, আর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া তাঁর মাহাত্ম্যের কথা। শিবের দাসত্ব ক'রে শিবের কৃপা যেন মর্ত্ত্যধামে নামিয়ে আনতে পারি, এই আশীর্ব্বাদই আপনারা আমায় করুন।"

সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যিনি, রাজগুরুরূপে লোক-গুরুরূপে সর্ব্বত্র যিনি পূজ্য, এ কি অদ্ভুত দৈন্যময় আচরণ তাঁহার। একফালি জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড তাঁহার কোমরে জড়ানো, হাতে একটি ঝুড়ি আর খুরপি। এই বেশে অপ্পর দেশের নানা শৈব তীর্থ ও জনপদে ঘুরিয়া বেড়ান। সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মার্জ্জনী হস্তে শত শত ভক্ত। শিব মন্দিরের আগাছা ও ময়লা সযত্নে তাঁহারা পরিষ্কার করেন। ধৌত করেন আঙিনা ও পয়ঃপ্রণালীর যত কিছু পূতিগন্ধময় জঞ্জাল। এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মন্দির-অঙ্গনে গীত হইতে থাকে অপ্পরের ভক্তিরসাত্মক শিব-ভজন ও শিবস্তোত্র। ত্যাগ

তিতিক্ষা ও নিরভিমানতার মূর্ত্ত বিগ্রহ মহাপুরুষ অপ্পর যে মন্দিরে যে সাধনপীঠে উপস্থিত হন, সহস্র লোকের ভীড় জমিয়া উঠে। তাঁহার প্রচারিত দাসমার্গীয় শৈব সাধনার উঠে জয় জয়কার।

এমনি এক পদযাত্রার কালে, চিদম্বরমের শৈবপীঠে অপ্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে শিবভক্তি-সিদ্ধ কিশোর সাধক 'জ্ঞানসম্বন্ধর'-এর। সম্বন্ধর নামে জনসাধারণের মধ্যে এই সাধক পরিচিত; উভয়ের এই সাক্ষাতের ফলে তামিলদেশের শৈব আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভক্ত সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় নূতনতর চেতনায়।

মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া অপ্পর সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছা ও ময়লা নিষ্কাশন করিতেছেন, শত শত অনুগামীর কণ্ঠে উদ্‌গীত হইতেছে শিব মহিমার স্তুতি গান। এমন সময়ে ভক্ত-প্রবর সম্বন্ধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। শিব-চেতনায় সদা আবিষ্ট, সিদ্ধ মহাত্মা অপ্পরকে দর্শন করা মাত্র ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপিত হন, ছুটিয়া গিয়া লুটাইয়া পড়েন তাঁহার চরণতলে। আকুল কণ্ঠ হইতে বার বার উচ্চারিত হইতে থাকে, অপ্পর—অপ্পর।[১]

ভূমিতল হইতে সম্বন্ধরকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া অপ্পর তাঁহাকে আবদ্ধ করেন নিবিড় আলিঙ্গনে। দুই প্রসিদ্ধ শিবভক্তের মিলনে মন্দির-চত্বরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া যায়।

বয়সে কিশোর হইলেও সম্বন্ধর ছিলেন এক ভক্তিসিদ্ধ সাধক। তিনি ছিলেন কৃপাসিদ্ধ। কথিত আছে, হরপার্ব্বতীর কৃপার ধারা বালক বয়সেই তাঁহার উপর বর্ষিত হয় এবং বালক বয়স হইতেই তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগবিভূতি। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার অলৌকিক সিদ্ধির প্রসিদ্ধি স্থানীয় শৈব ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

সম্বন্ধর তখন নিতান্ত বালক। পিতার সঙ্গে গ্রামের উপান্তে

১ তামিল শব্দ অপ্পর-এর অর্থ—পিতা। প্রথম জীবনে সাধক অপ্পর ভক্ত সমাজে পরিচিত ছিলেন তিরুণাবুক্করসু নামে জনশ্রুতি আছে, চিদম্বরমে সাক্ষাতের কালে কিশোর সাধক সম্বন্ধর ভাবাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে অপ্পর বলিয়া ডাকিয়া উঠেন। উত্তরকালে ভক্ত সমাজে এই অপ্পর নামই প্রচলিত হয়।

শিব মন্দিরে সেদিন বেড়াইতে গিয়াছেন। স্নান-তর্পণ সমাপন করিয়া পূজায় বসিতে হইবে, পিতা তাই পবিত্র কুণ্ডের জলে দাঁড়াইয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর পুত্র রহিয়াছেন তীরে দণ্ডায়মান। হঠাৎ দেখা গেল, বালক পুত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দুই চোখ রক্তবর্ণ, দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, গদ্‌গদ স্বরে বার বার সে বলিতেছে, "ঐ যে বাবা, আর ঐ যে আমার মা। বাবা—মা, বাবা—মা।" বার বার ব্যগ্রভাবে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে শিব মন্দিরের চূড়ার দিকে!

পিতা তো মহা সন্ত্রস্ত। তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। পুত্র কি কোন কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে? অথবা বিষাক্ত কিছু খাইয়া আবোল-তাবোল বকিতেছে?

লক্ষ্য করিলেন, তাহার গালের দুই কস্‌ বাহিয়া দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িতেছে। "কোথায় কি খেয়েছিস্‌ ঠিক ক'রে বল্‌। ওরে শিগ্‌গীর বল্‌।"—পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন।

পুত্র এবার কিছুটা স্থির হয়, বাহ্যজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। ধীর কণ্ঠে জানায়, এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কুণ্ডের তীরে সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখে—মন্দির শীর্ষে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে হরপার্ব্বতী হইয়াছেন আবির্ভূত। কৃপাময়ী মা পার্ব্বতী দুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাঁড় হাতে নিয়া নীচে নামিয়া আসেন, স্নেহভরে বালককে উহা পান করান। সেই দুগ্ধেরই চিহ্ন এখনো রহিয়াছে তাহার মুখে।

হরপার্ব্বতীর দিব্য মূর্ত্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়া যায়। কিন্তু যে অহেতুক কৃপার ধারা এই বালকের প্রতি বর্ষিত হয় তাহার ফলে অলৌকিক জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতির।

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু স্নানার্থী ও ভক্তের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হর-পার্ব্বতীর আশিস্‌-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি করিতে থাকে তাহার স্বরচিত অপরূপ শিবস্তুতি। চারিদিকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এই

কৃপাসিদ্ধ বালকের বিস্ময়কর কাহিনী। বালককালেই শিবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই ভক্তসমাজ এই বালকের নামকরণ করেন—'জ্ঞানসম্বন্ধর' অর্থাৎ, দিব্যজ্ঞানের সহিত যিনি রহিয়াছেন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত।

সম্বন্ধর যেমন অপ্পরকে পিতারূপে গ্রহণ করেন, তেমনি অপ্পরও তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই ভক্তিসিদ্ধ শৈবসাধক এক নিগূঢ় আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধর্ম্মের উজ্জীবনে একযোগে প্রচার কর্ম্ম শুরু করেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যুক্তভাবে এই দুই মহাত্মা পরিব্রাজন করিতেন, আর শত শত ভক্ত নরনারী করিত তাঁহাদের অনুসরণ।

ইষ্টদেব শিবকে সাধক অপ্পর আরাধনা করিতেন কিঙ্কররূপে, আর সম্বন্ধর-এর দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পিতারূপে। পৃথক দৃষ্টি-কোণ হইতে ইষ্ট-আরাধনায় উভয়ে রত থাকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও শরণাগতির দিক দিয়া তাঁহারা ছিলেন একই সাধনপথের সহযাত্রী। সিদ্ধ শৈবাচার্য্য হিসাবে অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর জীবনে যে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগ-বিভূতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে দেশের অগণিত শিবভক্ত নরনারীকে। অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর রচিত শিব-মহিমার শত শত স্তবগাথা আজও তামিলদেশের সাধকেরা পথে-প্রান্তরে মঠে-মন্দিরে গাহিয়া বেড়ান, ভক্তহৃদয়ে শিবভক্তির প্লাবন বহিয়া যায়।[১]

সে-বার ভক্তপ্রবর জ্ঞানসম্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অন্যত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন। মহাত্মা অপ্পর স্থির করিলেন, কিছুদিন তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগূঢ় সাধনায় থাকিবেন নিমজ্জিত। পরিব্রাজনের পথে পড়িল তিরুপ্পুগালুর-এর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির ও সাধনপীঠ। এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১ তেবরম্ গ্রন্থে অপ্পর-এর রচিত বহু দিব্যভাবের উদ্দীপক স্তবগাথা সংকলিত হইয়াছে। এই স্তবসমূহের সংখ্যা তিন শতাধিক।

অপ্পরের নব ধর্ম্মপ্রচার ও সিদ্ধপুরুষরূপে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা একদল বিরোধী লোকের সহ্য হয় নাই। তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য দুষ্টেরা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। তিরুপ্পুগালুর-এ অপ্পর যখন নিভৃতে বাস করিতেছিলেন, তখন তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

রাত্রিকালে কয়েকটি সুন্দরী ভ্রষ্টা নারীকে তাহারা পাঠাইয়া দেয় অপ্পরের কাছে, প্রচুর ধনরত্নের প্রলোভনও তাঁহাকে দেখানো হয়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক অপ্পরকে প্রলুব্ধ ও বশীভূত করা দূরের কথা, এই নারীরাই তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ে, চরণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষমা প্রার্থনা।

চক্রান্তকারীরাও অনুতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে অপ্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকালে তাহারা পরিচিত হইয়া উঠে।[১]

দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচার্য্যদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। ভক্তদের মতে, পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ঋষি ছিলেন শৈব সাধনার প্রধান ধারক ও বাহক। তামিল দেশীয় পুরাণে শিব ও মুরুগ-এর (সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়) সিদ্ধ সাধক অগস্ত্য সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিক যুগে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে, পাণ্ড্য রাজসভার আচার্য্য শৈব সাধক নক্কির-এর প্রভাব প্রতিপত্তির নানা তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী রাজা কন্নপ এক সিদ্ধ শিব-ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, কন্নপ এক সময়ে ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া ইষ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পরূপে অর্ঘ্য প্রদান করেন তাঁহার নিজের একটি চক্ষু। অপর চক্ষুটিও উৎপাটন করিতে যাইবেন এমন সময়ে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন তাঁহার সম্মুখে। প্রভুর বরে ভক্ত-প্রবর লাভ করেন পরম দিব্যালোক দর্শনের শক্তি।

১ কালচারাল্ হেরিটেজ—শৈব সেইন্ট্স্ : এম. এস. পিল্লেই

পঞ্চম শতকে তামিলদেশে আবির্ভূত হন প্রখ্যাত শৈবযোগী তিরুমূলার। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক যোগবিভূতির নানা কাহিনী দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। জনশ্রুতি আছে, পরকায় প্রবেশের শক্তি ছিল তিরুমূলার-এর। এক শুদ্ধসত্ত্ব রাখাল বালকের মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ সরল ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মহিমার স্তব-গাথা। তিরুমূলার-এর জীবন ও বাণী শিবতত্ত্ব ও শৈব ধ্যান-ধারণাকে দেশের দিক্‌বিদিকে বিস্তারিত করে।

পরবর্ত্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধনা ও ধর্ম্ম-আন্দোলন সুসম্বদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে চারিটি প্রধান শৈবাচার্য্যের মাধ্যমে। মাণিক্যবাচক, অপ্পর (তিরুণাবুক্করসু), জ্ঞানসম্বন্ধর, এবং সুন্দরমূর্ত্তি যথাক্রমে প্রচার করেন শিবসাধনার চারিটি পৃথক পৃথক পন্থা—জ্ঞান, চর্য্যা, ক্রিয়া ও যোগ। এই পন্থাগুলি সন্মার্গ, দাসমার্গ, সৎপুত্র মার্গ ও সহমার্গ নামেও শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছে।

সিদ্ধ শৈব সাধক আচার্য্যপ্রবর অপ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। তাঁহার মতে, 'দেবাদিদেব শিব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই একমাত্র প্রভু। জীব তাঁহার নিত্যদাস। আত্মঅভিমান ত্যাগ করিয়া দাস রূপে তাঁহার সেবা করো, একান্ত শরণ নিয়া তাঁহার চরণে তনু মন প্রাণ করো উৎসর্গ, তবেই লাভ করবে বহু প্রার্থিত পরমা মুক্তি।'

অপ্পরের এই দাসমার্গীয় শৈবধর্ম্ম শুধু তামিলদেশেই নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দ্রুত প্রসার লাভ করে। পাণ্ড্যরাজ মহেন্দ্র ছিলেন তাঁহার অনুগত শিষ্য। কাঞ্চী মাদুরা চিদম্বরম প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাও মহাত্মা অপ্পরের শিব ভক্তির আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শহরে জনপদে যেখানেই যাওয়া যাইত, শত শত ভক্ত গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শুনা যাইত এই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপালীলার নানা অলৌকিক

কাহিনী। মন্দিরে মন্দিরে পথে-প্রান্তরে গীত হইত তাঁহার রসমধুর শিবগাথা।

সিদ্ধ জীবনের লীলা, পরিব্রাজন ও শিবমহিমার প্রচার এবার শেষ অধ্যায়ে আসিয়া পড়ে, মহাত্মা অপ্পর এবার উৎসুক হন ইষ্টদেব শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্য। প্রবীণ সিদ্ধপুরুষের স্তবগাথায় বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে "প্রভু, এবার তোমার কিঙ্করকে কৃপা ক'রে টেনে নাও তোমার জ্যোতির্লোকে, পরমা মুক্তির মহাসাগরে করো তাকে নিমজ্জিত।

ইষ্টদেব মহেশ্বর সেদিন আবির্ভূত হন। অপ্পরের নয়ন সমক্ষে, আর্ত্তি ও প্রার্থনার উত্তরে বলেন,--'তথাস্তু'।

৬৮০ খৃষ্টাব্দে একাশী বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় শৈবাচার্য্যের মরলীলায় ছেদ পড়িয়া যায়, চির ইপ্সিত শিবধামে ঘটে তাঁহার মহা উত্তরণ।

অদ্বৈত আচার্য্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রাক্‌কাল পূর্ব্ব-নবদ্বীপ তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের তখন মহাপ্রতাপ। বিদ্যাগর্ব্বী পণ্ডিতেরা আপন অহমিকা নিয়া মত্ত, ন্যায়ের কচ্‌কচি আর কূটতর্কের ভীড়ে ভক্ত বৈষ্ণবের দল কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে। প্রেমভক্তির কথা উত্থাপন করিলে, নৃত্য কীর্ত্তন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হইতে হয়। এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত।

অসাধারণ শাস্ত্রবেত্তা এই আচার্য্য। পাণ্ডিত্যের সাথে তাঁহার জীবন পাত্রে আসিয়া মিশিয়াছে প্রেমভক্তির অপরূপ সুধা—বহু বৎসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে তাঁহার জীবনে উপজিত হইয়াছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। সেদিনকার দিনে ভক্ত সাধক অদ্বৈত আচার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন বৈষ্ণবদের প্রবীণতম নেতা, তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ও ভরসাস্থল।

কখনো শান্তিপুরে, কখনো বা নবদ্বীপে নিয়মিতভাবে আচার্য্যের ধর্ম্মসভা বসে। গৌরকান্তি, শ্মশ্রুগুম্ফ-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাঁহার ক্ষুদ্র ভক্ত সভাটিতে বসিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতা ও ভাগবতের শ্লোক। দুই নয়ন তাঁহার ভক্তিরসে ছলছল হইয়া উঠে, ভক্ত শ্রোতাদের অন্তরে জাগে দিব্য শিহরণ।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ অদ্বৈত প্রভু তাঁহার সাধ্যমত প্রদান করেন। সারগর্ভ ব্যাখ্যা ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভক্তির শুচিশুভ্র কুসুম ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সারা দেশ যে এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি করেন, এসময়ে তাঁহার এই ক্ষীণকায়া ভক্তি স্রোতের ধারায় তো ঈশ্বরবিমুখ

মানুষের দল উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন্য চাই প্রেমভক্তির বেগবতী ভক্তিগঙ্গা-ধারা—আর চাই সেই ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার মত এক নব ভগীরথ।

হৃদয়ে দিনের পর দিন আর্ত্তি জাগে, কোথায় সে মহাশক্তিধর যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ? কবে ঘটিবে তাঁহার মহা আবির্ভাব? তিল তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য ভক্তিভরে দিনের পর দিন এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সারা ভুবনের মঙ্গলের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিক্ত করেন বিষ্ণুঘরের মৃত্তিকা।

জনকয়েক বৈষ্ণব ভক্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য্য সেদিন বসিয়া আছেন। পবিত্র ভাগবতের মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা চলিতেছে, এমন সময় এক ভক্ত সুসংবাদ জানাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বড় আশ্চর্য্যের কথা—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে এসেছে এক পরম বৈষ্ণবরূপে। এ যেন এক নূতন মানুষ! পাণ্ডিত্যের অহমিকা কোথায় ভেসে গিয়েছে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। প্রভু! এ দিব্য উন্মত্ততার ছোয়াচও কম নয়। যে তাকে একবার দেখছে, তার ব্যাকুল ক্রন্দন শুনছে, সেই হয়ে পড়ছে অভিভূত ও ভাববিহ্বল। তরুণ অধ্যাপক নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকাবার শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে নবদ্বীপে।"

আচার্য্য বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, চোখ দুইটি উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "ভাই, তোমাদের কথা সত্য হোক, আশা ফলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আমি করছি।"

কিছুক্ষণ মৌনী থাকার পর আবার তিনি স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তা হলে একটি গোপন কথা তোমাদের ভেঙে বলছি,—কাল শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম, গীতার একটি বিশেষ শ্লোকের নিহিতার্থ বুঝতে না পেরে সেদিন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তাই উপবাসী থেকে এই শ্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম। রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখলাম, তোমাদের ঐ নিমাই আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। ডেকে বলছে—আচার্য্য তুমি আর মনে দুঃখ ক'রো না,

ওঠো।” কি অদ্ভুত ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে গীতার শ্লোকের অর্থটিও উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।”

“মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হলো এক অপূর্ব্ব পুলকস্রোত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে আগে আমি মাঝে মাঝে দেখেছি—তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই সে আসতো আমার গৃহে। সে অনেক দিন আগের কথা। যাক্, তোমাদের সংবাদ বড়ই শুভ। দেখা যাক্ শ্রীভগবান এই মহাবৈষ্ণবের ভেতর দিয়ে তাঁর কোন্ লীলানাট্যের সূত্রপাত করতে চাচ্ছেন।”

এ নাট্যলীলা অনুষ্ঠিত হইতে দেরী হয় নাই। অচিরে নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেন ভক্তি-প্রেমের এক রসময় বিগ্রহরূপে, ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণনামের ধারায় সারা দেশ তিনি প্লাবিত করেন, আর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্য্যকে করেন তিনি আত্মসাৎ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান পার্ষদরূপে, লীলানাট্যের অন্যতম সূত্রধাররূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে অদ্বৈত প্রভুর যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দেরই পরবর্ত্তী। চৈতন্য ভাগবত নিতাই ও অদ্বৈতকে অভিহিত করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের দুই বাহু রূপে। অদ্বৈতের প্রতি ভক্ত মানবের ঋণের কথা জানাইতে গিয়া ভক্তকবি বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন, “যার ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার।”

চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাপ্রভু—আর প্রভু হইতেছেন দুইটি—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। আর কোন চৈতন্যপার্ষদ এই প্রভুত্বের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য্য।

চৈতন্য-পার্ষদ অদ্বৈত ভক্তদের 'প্রভু', মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃষ্ণ-ভক্তিদাতা। তাছাড়া, আরও একটা বিশেষ মর্য্যাদা তাঁহার আছে। অদ্বৈত হইতেছেন সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তরঙ্গ শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে গয়াধামে যে মন্ত্র শ্রীচৈতন্য প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় এক পরম রূপান্তর। তাই মাধবেন্দ্র-শিষ্য এই আচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য জ্ঞান করিতেন গুরুর মত। সুযোগ পাইলেই অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া সবাইকে সম্মুখে দিতেন তাঁহাকে অসীম মর্য্যাদা। চৈতন্য চরণাশ্রিত বৃদ্ধ বৈষ্ণব চৈতন্যের এই ভক্তির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। কোন বাদ-প্রতিবাদে ফল হইত না। লৌকিক লীলায় মহাপ্রভু কোন সময়েই ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ও লৌকিক আচার-আচারণের মর্য্যাদা রক্ষণে ত্রুটি করিতেন না, তাই অদ্বৈতের প্রতি ভক্তি নিবেদনের বেলায়ও তাঁহাকে কখনো নিরস্ত করা যায় নাই।

শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতের পারস্পরিক সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর, বড় অন্তরঙ্গ। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের স্বরূপটি মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

> মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে।
> আচার্য্য গোসাঞিকে প্রভু গুরু করি মানে।
> লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ।
> স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন।
> চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান।
> আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান।

সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের এই প্রবীণ প্রতিভাধর নেতা, মহাপ্রভুর অন্যতম এই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, অদ্বৈত আচার্য্যের হয় শ্রীহট্টে। বর্ত্তমানের সুনামগঞ্জ মহকুমা অঞ্চল তৎকালে ছিল লাউড় পরগণা নামে পরিচিত। এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত নবগ্রামে আনুমানিক ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন।[১]

১ অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে, অদ্বৈত আচার্য্য ছিলেন বাহান্ন বৎসর বয়স্ক। চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে।

পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যরূপে তাঁহার তখন যথেষ্ট খ্যাতি। বংশের গৌরব ও ঐতিহ্যও কম নয়। স্বনামধন্য নৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ। পাঠান যুগের গৌড়ীয় হিন্দু রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়া নৃসিংহ নাড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধির দিক দিয়া তাঁহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানীতে তখন খুব কমই ছিল।

কুবের আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী লাভা দেবীর বড় দুঃখ, পর পর তাঁহাদের কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একটিও জীবিত রহে নাই। আর যে কোন পুত্রসন্তান জন্মিবে সে আশাও নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না? মৃত্যুর পর পুত্রসন্তানের পিণ্ডও পাওয়া যাইবে না? এই সব ভাবিয়া স্বামী স্ত্রী কাহারো মনে শান্তি নাই, সংসার-কর্ম্মেও দিন দিন বড় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই বৈরাগ্যপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন তাঁহারা লাউড ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন।

পতি-পত্নী উভয়ে এবার স্থির করিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিবেন, ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে পূজা, ব্রত প্রভৃতি উদ্‌যাপন করিবেন।

নূতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর লাভা দেবী সন্তান-সম্ভবা হন। কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠে। ইতিমধ্যে রাজসভার আহ্বানও আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত আনন্দিত মনে সস্ত্রীক আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

মাঘী সপ্তমীর পুণ্যতিথিতে এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা নাই। নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ।

বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপূর্ব্ব ভক্তিপরায়ণতা। সহজাত ধর্ম্ম-সংস্কার নিয়াই সে জন্ম নিয়াছে। নিবেদিত বস্তু ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে আহার করানো যায় না।

দেব পূজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন নারায়ণ শিলা অর্চ্চনা করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়া সেখানে সে বসিয়া থাকে, দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু।

কুবের তর্কপঞ্চানন লক্ষ্য করেন, ছেলে তাঁহার শ্রুতিধর। এই সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির। বুঝিলেন, বালক উত্তরকালে শাস্ত্রপারঙ্গম হইবে, বংশগত ঐতিহ্যের ধারাটিও সে বজায় রাখিতে পারিবে।

কমলাক্ষের বয়স তখন বারো বৎসর। অধ্যয়নের জন্য পিতা তাঁহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর এই কিশোর শিক্ষার্থী। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি এবং ষড়দর্শনের পাঠ সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট্ট হইতে চলিয়া আসেন। এখন হইতে পুত্রের সহিত একত্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন নব্বই বৎসর বয়সে পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন মরদেহ ত্যাগ করিয়া যান এবং কিছুদিন পরে মাতা লাভা দেবীরও লোকান্তর ঘটে।

পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগ্যের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। স্থির করিলেন, অবিলম্বে গয়াধামে গিয়া জনক-জননীর উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণতি জানাইয়া বাহির হইবেন তীর্থ পর্য্যটনে।

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে তাঁহার তরুণ জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিমার্গীয় সাধনার মধ্য দিয়া পরম প্রাপ্তি তাঁহার ঘটিবে, এ সঙ্কল্পই এতকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য নিষ্ঠাভরে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া সাধন-ভজনে রত থাকিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াও নিয়াছেন।

গয়ার কার্য্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলেন, অন্তরে জাগরূক রহিল জীবনতরীর কাণ্ডারী সদ্‌গুরুর সন্ধান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তিনি একদল মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধর্ম্মসভায় আসিয়া উপস্থিত। নারদীয় সূত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেখানে চলিতেছে। এই ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্ত্বিক ভাববিকার।

দাক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্ন্যাসী, ভক্তিরসের পরম রসিক, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তখন এই মণ্ডলীতে উপস্থিত। নবাগত ভক্ত কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া পুরী মহারাজ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। অপার করুণা ঝরিয়া পড়িল এই তরুণ ভক্তের উপর। অদ্বৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিলন দৃশ্যের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।
তাহা দেখিয়া মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী
কহে ইঁহো ভক্তিবর্ম্মে উত্তমাধিকারী।
সামান্য জীবেতে না হয় শুদ্ধা প্রেমভক্তি।
চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তাব স্থিতি।
শুদ্ধ প্রেমাসব ইঁহো করিয়াছে পান।
অন্তর্নিত্যানন্দ ইঁহার নাহি বাহ্যজ্ঞান।
ইঁহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ।
জগতে তারিতে বুঝোঁ হৈলা প্রকটন।

ভক্ত সাধুদের উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনি বারম্বার শ্রবণের পর কমলাক্ষ আচার্য্য সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ; দুই নয়নে তাঁহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। প্রসন্ন মনে ভাববিহ্বল তরুণ পণ্ডিতের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন।

কমলাক্ষ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন। মিনতি করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন পেলাম। সবাই জানে, আপনি ভক্তত্রাতা, এ যুগের ভক্তিকল্পবৃক্ষ।

আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধন্য করুন, আমায় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিন।”

পুরী মহারাজ সম্মতি দিলেন। কমলাক্ষ আচার্য্যের জীবনে দেখা দিল এবার সদ্‌গুরু কৃপার অরুণোদয়, জীবন তাঁহার নবরাগের বর্ণচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। দীক্ষা ও প্রেমভক্তিতত্ত্বের উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাঁহাব নব রূপান্তর।

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজের সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার বিদায় গ্রহণের পালা। কমলাক্ষ স্বভাবতঃই মানবপ্রেমিক, লোকমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সহজাত। করুণ কণ্ঠে সদ্‌গুরুর কাছে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে আদর্শহীন, ধর্ম্মহীন। সর্ব্ব দিক দিয়ে তারা নীতিভ্রষ্ট। ভুবনমঙ্গল হরিনাম, কৃষ্ণনাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা ক’রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি ক’রে তারা উদ্ধার পাবে।”

পুরী মহারাজের আননে খেলিয়া যায় স্মিত হাসি। মধুর কণ্ঠে কহেন, “কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর আবির্ভাব চাই। তা নইলে তো চলবে না। তুমি মহাভক্ত। জীবের কল্যাণ সাধনের এষণা যেমন তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে ঐশী শক্তির প্রকাশ। শ্রীভগবান্‌কে ডাকবার, তাঁকে জাগ্রত করবার ভার তুমিই আজ থেকে নাও বৎস।”

সদ্‌গুরুর এ নির্দ্দেশ কমলাক্ষ আচার্য্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে গাঁথা হইয়া যায়। ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থ দর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থল তিনি দর্শন করেন আর হৃদয়ে তাঁহার অপার আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভক্তবর কখনো ভাবাবেশে শুরু করেন উদ্দণ্ড নর্ত্তন কীর্ত্তন,

কখনো বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, কোন হুঁস নাই।

সেদিন তিনি গিরিগোবর্দ্ধনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তরে বহিয়া চলিয়াছে দিব্য আনন্দের প্রবাহ। পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন।

সারাদিন পাগলের মত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; এবার রাত্রি সমাগত। চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত দেহে আচার্য্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছেন। অল্পকাল মধ্যে দুই চোখে নামিয়া আসিল গভীর নিদ্রা।

এ সময়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দর্শন করিলেন।—শিখিপুচ্ছধারী মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাঁহার ভুবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কহিতেছেন, "আচার্য্য, জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা। যথাসাধ্য ভক্তিতত্ত্বের প্রচার তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করো। আর এই সঙ্গে করো লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন। আর শোন, তোমায় আমি একটা নিগূঢ় সংবাদ দিচ্ছি। আমার এক দিব্যমূর্ত্তি দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে, যমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে। আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে —মদনমোহন। দ্বাপরে কুব্জা আমার এই মূর্ত্তির সেবা করেছে। আজো বিগ্রহ যমুনা তটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুমি এর উদ্ধার সাধন করো, সেবার প্রবর্ত্তন করো।"

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্য্যের আর ঘুম হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সোৎসাহে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শুনিয়া লোকজন জুটিতে দেরী হয় নাই। কোদাল শাবল নিয়া গ্রামবাসীরা দলে দলে দ্বাদশ আদিত্য তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল।

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় এক পরম মনোহর কৃষ্ণমূর্ত্তি। ললিত ত্রিভঙ্গঠামে উহা দাঁড়াইয়া

আছে। স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি হাতে পাইয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হন। অতঃপর একটি ভক্তিমান্ সদাচারী ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের সেবার ভার দিয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান।

প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই। অদ্বৈত আচার্য্যকে এবার তিনি এক নতুন খেলা দেখাইতে শুরু করিলেন।

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাণ্ডব। স্বপ্নলব্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আচার্য্য বৃন্দাবনে আসিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যায়।

ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই বিগ্রহকে তোলা হইয়াছে; তাই এটির দর্শনের জন্য সর্ব্বদাই জনতার ভীড় লাগিয়াই থাকে। একদল দুষ্টস্বভাব পাঠানের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা সমারোহ ও জনসংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই। একদিন দল বাঁধিয়া তাহারা মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে। এটির মর্য্যাদা হানি করা ও ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর।

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত করেন। পাঠানেরা কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তো সেখানে নাই। কে যেন তড়িৎ-বেগে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়া তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

নূতন পূজারী এতক্ষণ যমুনায় দাঁড়াইয়া স্নান-তর্পণে রত ছিলেন। পাঠানদের হামলার কথা শুনিয়া ত্রস্তব্যস্তে কুটিরে গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত বিগ্রহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা এটি অপবিত্র করিয়া এবং জল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। খেদের তাঁহার আর সীমা রহিল না, হায়-হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সংবাদ শুনিয়া আচার্য্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা। অস্নাত অভুক্ত অবস্থায়

চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্তু হারানো বিগ্রহের কোন সন্ধানই মিলিল না।

রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্য্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। স্বপ্ন-যোগে আবার মিলিল শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ। মধুর কণ্ঠে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে আচার্য্য, কেন শুধু শুধু তুমি খেদ করছো, আর এমন ক'রে ভেবে মরছো? আমায় তো পাঠানেরা ভেঙে ফেলে নি, অপসারিতও করে নি। আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই দুষ্টু ব্রজের গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল-বাগান আছে, তারই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি। ওখান থেকে আমায় তুলে নিয়ে এসো। আর শোন, এখন থেকে আমার এই দুষ্টু গোপাল-লীলার স্মৃতিই এখানে জাগরূক থাক্, আর আমার এ বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদ্‌লে দাও তুমি।"

আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনি পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়া যান। কিছুটা অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদন-গোপালরূপে ইঁহার সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

ঠাকুর কিন্তু শীঘ্রই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন। আবার একদিন কমলাক্ষের উপর স্বপ্নাদেশ হইল, "আচার্য্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, সেখানটা তেমন সুরক্ষিত নয়। ম্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশঙ্কা আছে। তুমি এক কাজ করো। মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী দু'একদিন মধ্যে এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো। তাহলে আমার সেবা-পূজার কোন বিঘ্ন আর হবে না।"

আচার্য্যকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর আরো কহিলেন, "বৎস, তুমি খেদ ক'রো না। এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তান্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকালের, তোমার মত মহাভক্তের মধ্য দিয়েই যে আমার লীলার পরিপুষ্টি। আরও শোন। আমার এক সুপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুঞ্জবনে সংগোপিত। শ্রীরাধার প্রিয় সখী

বিশাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল। এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও।”

পরদিনই মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদন-গোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হৃদয়েও পৌঁছিয়া গিয়াছে। আচার্য্যের কাছে আসিয়া দৈন্যভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। সাশ্রুনয়নে আচার্য্য প্রাণ-প্রিয় শ্রীবিগ্রহ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন শান্তিপুরে। অর্চ্চনার জন্য সঙ্গে আনিলেন নিকুঞ্জবনের সেই পবিত্র চিত্রপট।

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইয়া কমলাক্ষের আনন্দের অবধি রহিল না।

বৃন্দাবন হইতে আনীত কৃষ্ণের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাঁহার দিব্য ভাবাবেশ। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর প্রিয় শিষ্য কমলাক্ষকে ডাকিয়া সেদিন এই নিগূঢ় উপদেশটি তিনি দিলেন :

পুরী কহে বাছা তুহুঁ শুদ্ধ প্রেমবান।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নির্ম্মাণ।
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয়।
অতএব যুগল সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।

(অদ্বৈত প্রকাশ)

বলা বাহুল্য, অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার গুরুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই যুগল ভজন শুরু করিয়াছিলেন। প্রাক্ চৈতন্য যুগের তাঁহার অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি রাধার এই যুগল উপাসনা অত্যল্পকাল পরে প্রভু চৈতন্যের মণ্ডলীকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাই আচার্য্যের সাধনজীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শান্তিপুর ত্যাগ করার পূর্ব্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী আরো একটি কথা বলিয়া গেলেন। কহিলেন, “বৎস, এবার তুমি বিবাহ ক’রে

সংসারাশ্রমী হও। সংসারে থেকে, কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করো, জীবের কল্যাণ সাধন করো।”

সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া পুরী মহারাজ শান্তিপুর হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে শুরু হয় কমলাক্ষের আচার্য্য জীবন। নিজ গৃহে শান্তিপুরে তিনি এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসেন। প্রতিভাধর বিদ্যার্থীর দল এই সাধক ও শাস্ত্রবেত্তার কাছে আসিয়া শরণ নেয়। তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলীও এ সময়ে এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকালে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব সাধনার ক্ষীণ ধারাটি বহিয়া চলিতে থাকে। তাই পরবর্ত্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের নায়কেরা এই পূর্ব্বসূরীর কাছে কম ঋণী নন।

কমলাক্ষ আচার্য্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্যামাদাস। আচার্য্যের সহিত তত্ত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া নত-শিরে তিনি তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্যামদাস এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচার্য্য। এখন হইতে কমলাক্ষ পণ্ডিত এই নূতন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

অদ্বৈতের অপর শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ। বৈষ্ণব-দীক্ষা প্রাপ্তির পর ইহার নূতন নাম হয় কৃষ্ণদাস। বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণদাস অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য যবন-হরিদাস আচার্য্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তরুণ হরিদাসের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনে সেদিন প্রেমভক্তির ঢল নামিয়াছে। হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় শান্তিপুরে অদ্বৈতের ধর্ম্মসভায় একদিন তিনি আসিয়া উপস্থিত। আচার্য্য প্রভুর নাম এবং সাধন-ঐশ্বর্য্যের কথা তিনি শুনিয়াছেন, মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের পথপ্রদর্শক রূপে।

কৃষ্ণপ্রেমরসে বিহ্বল, হরিদাস অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে থাকেন।

আচার্য্যের হৃদয় গলিয়া যায়। কে এই গৌরতনু চারু-দর্শন তরুণ ভক্ত, দর্শনমাত্রে যে প্রাণমন কাড়িয়া নেয়? সিদ্ধ সাধকের অপূর্ব্ব লক্ষণসমূহ তাঁহার চোখে মুখে। সারা দেহে ভক্তি-রসের লাবণ্য টলমল করিতেছে।

আগ্রহাকুল কণ্ঠে আচার্য্য প্রশ্ন করেন, "বৎস, কি নাম তোমার? কোথা থেকে তুমি আসছো?"

পদতলে পতিত তরুণ ভক্ত উত্তর দেন, "প্রভু, আমি ম্লেচ্ছাধম। আপনার শরণ নিতে এসেছি। কৃষ্ণভক্তি কি ক'রে পাবো, কৃপা ক'রে সেই উপদেশ আমায় দিন।"

পরম স্নেহভরে আচার্য্য-প্রভু নবাগত ভক্তকে বুকে তুলিয়া নেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া শুরু হয় হরিদাসের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন। আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য ভক্তি-তত্ত্ব তিনি আহরণ করেন, কীর্ত্তিত হন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

ভক্ত হরিদাস আর্ত্তি আর দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাই একদিন আচার্য্যের কাছে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আপনার কৃপায় শাস্ত্র পাঠ, সাধনা, এসব তো করলাম। কিন্তু আমার মত জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কাজ নয়। আপনার কৃপা শক্তি ছাড়া তো এ কাজ সম্পন্ন হবে না! সেই কৃপাশক্তিই আজ প্রয়োগ করুন, নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোন উপায় নেই।"

অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন—

কহে, শুন বৎস ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ বাণী।
কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি।
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়।
সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাধিক হয়।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ যেই সেই নরাধম। (অদ্বৈত প্রকাশ)

জীবোদ্ধারের যে উদার সর্ব্বজনীন আহ্বান পরবর্ত্তীকালে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে গৌরসুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অদ্বৈতের মুখে শোনা গেল তাহারই পূর্ব্বাভাস।

অদ্বৈতের কাছে যবন হরিদাসের বৈষ্ণবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ এবার তাই শান্তিপুর ত্যাগ করিবেন ঠিক করিয়াছেন।

আচার্য্য তাঁহাকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "হরিদাস, তুমি নামমন্ত্রের মহাচাবণ। এই নাম প্রচাবের ব্রতই তুমি একান্ত ভাবে গ্রহণ করো, দিগ্‌বিদিকে পরমপ্রভুর নাম ছড়িয়ে দাও। গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ এই নির্দ্দেশই আমায় দিয়েছিলেন। তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নির্দ্দিষ্ট কর্‌ছি—

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম।
নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ।
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়।
নামাভাসে জীব মাত্রের ত্রিতাপ না রয়।
নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খণ্ডয়!
নাম-চিন্তামণি-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
ব্রহ্মাণ্ডে সদ্বস্তু নাস্তি নামের সমান।
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন।
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায় প্রেমধন।"

বৈষ্ণব সাধক হরিদাসকে আচার্য্য প্রভু সন্ন্যাস দিলেন। মস্তক মুণ্ডন করাইয়া কটিতে পরাইয়া দেওয়া হইল কৌপীন-ডোর, গলায় তুলসীর মালা। শক্তি-সঞ্চারিত নামের বীজ আচার্য্য এই মহাভক্তের কর্ণে দিলেন।

হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা। টলিতে টলিতে গিয়া গঙ্গার মৃত্তিকা-গোফায় বসিয়া পড়িলেন। এখন হইতে তাঁহার নিত্যকার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ নাম জপ। অদ্বৈত আচার্য্যের অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূপে যেন দেখা দিলেন নামব্রহ্মের চারণ

যবন হরিদাস। আচার্য্য তাঁহার নাম দিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ভক্তির মহিমা ছড়াইয়া গিয়াছেন দিক্‌বিদিকে।

গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর নির্দ্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। অচিরে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটিয়া গেল।

নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ী এক ধর্ম্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহার দুইটি যমজ কন্যা—সীতা ও শ্রীরূপা। এই দুই কন্যাকে তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে সম্প্রদান করিলেন।

শান্তিপুরের পণ্ডিতসমাজে প্রতিভাধর অধ্যাপক অদ্বৈতের তখন বিরাট প্রতিষ্ঠা। বহু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী, বিশেষ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার। শিক্ষার্থীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ভীড় করিতেছে। উচ্চস্তরের বিষ্ণুভক্ত সাধক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি প্রচুর। ভক্তিমার্গের সাধন যাঁহারা লাভ করিতে চান তাঁহাদের অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্য্যের গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের খ্যাতিও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইতেছে।

ভক্তপ্রবর হরিদাস সেদিন শিক্ষাগুরু অদ্বৈতের সঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাই. হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া উঠে নূতন ভাবাবেগ নূতন উদ্দীপনা।

শান্তিপুরের ব্রাহ্মণেরা যবন-ভক্ত হরিদাসের আগমনের কথা জানিলেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথা তাঁহারা লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের কাছে হরিদাসের এই প্রতিষ্ঠা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকিল। ম্লেচ্ছ সাধককে নিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিতে তাঁহারা রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক অদ্বৈতকে বলিয়া দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে তাঁহাকে একঘরে করা হইবে।

ইতিমধ্যে শান্তিপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। স্থানীয় একজন ধনী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সেদিন পূজা-উৎসব চলিতেছে।

গ্রামের গণ্যমান্য শতাধিক ব্যক্তি আসিয়া সেখানে জুটিয়াছেন, আহারাদির যোগাড় হইতেছে। এমন সময় নিকটস্থ বৃক্ষমূলে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। অপূর্ব্ব তাহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে সিদ্ধ সাধকের দিব্য দ্যুতি। সন্ন্যাসী শুধু বাক্‌সিদ্ধই নয়. পরম কৃপালুও বটে। কাঁদিয়া কাটিয়া যে যাহা ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাই মিলিতেছে। পদধূলি মাখিয়াই কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়া গেল। বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার ভীড়।

উৎসব গৃহের কর্ম্মকর্ত্তারা ছুটিয়া আসিলেন। গলবস্ত্র হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু আজ এখানে আহারাদির ব্যবস্থা হয়েছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ছে আপনিও দয়া ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন।"

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "কিন্তু বাবা আমি তো অ-নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করিনে! বিষ্ণুর প্রসাদ যদি থাকে তবেই আহারে বসতে পারি।"

"বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ শিলা রয়েছেন। তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে আপনাকে ভোজ্যদ্রব্য এনে দিচ্ছি। পাতা দেওয়া হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে এসে বসুন।"

সন্ন্যাসী তখনো ভাবাবেশে মত্ত। ধীরে ধীরে ভোজনস্থানে গিয়া বসিলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আহার্য্য পরিবেশন করা হইল।

কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া কহিলেন, "একি হরিদাস তুমি এখানে! আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দেখ্‌ছি, তোমায় নিয়ে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে গেছেন! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড। এ আবার তোমার কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ?"

অদ্বৈতের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া হরিদাস কহিলেন, "প্রভু আমার দোষ নেবেন না। কৃষ্ণকৃপায় এই সজ্জনেরা আমায় আজ কি এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন জানিনে। আগ্রহ ক'রে এঁদের পঙ্‌ক্তি ভোজনের ভেতর এনে বসিয়েছেন।"

আচার্য্যের চরণতলে পড়িয়া হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। দুই চোখ বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, আর ভাব গদ্গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন আচার্য্যের স্তবগান। এক অপূর্ব্ব ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা সবাই নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সেদিনকার এ ঘটনায় বিশেষ করিয়া মহাভাগবত হরিদাসের ব্যক্তিত্বের এই ইন্দ্রজাল দর্শনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। এই সঙ্গে অদ্বৈতের মহিমাও তাঁহারা কিছুটা উপলব্ধি করিলেন। যবন হরিদাসের অলৌকিক কাহিনী তাঁহারা শুনিয়াছেন, আজ তাঁহার কিছুটা প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন। আচার্য্য অদ্বৈত হইতেছেন এই শক্তিধর নবীন বৈষ্ণবেরই এক প্রধান পথিপ্রদর্শক। এই আচার্য্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করার জন্য যাঁহারা চেষ্টিত ছিলেন তাঁহারা এবার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া নিলেন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের মহিমা সাধারণ মানুষে কি করিয়া বুঝিবে? এ মহিমা বুঝিয়াছিলেন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈত। তাই নিজের গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর প্রথম ভোজ্যপাত্র তিনি দিয়াছিলেন ভক্তি-সিদ্ধ এই যবন ভক্তকেই।

আচার্য্যের এ আচরণে হরিদাস সেদিন চমকিয়া উঠেন। যুক্ত-করে নিবেদন করেন, "সে কি প্রভু? এ শ্রাদ্ধপাত্রে যে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এ আপনি আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন কেন?"

প্রেমাশ্রু-ছলছল নেত্রে অদ্বৈত উত্তর দিলেন, "হরিদাস, আমার দৃষ্টিতে তুমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব। জানতো? প্রকৃত বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা বিহার করেন গোলকপতি। তোমার মত মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়া যে বহু ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমান। আমি তো এতে অন্যায় কিছু করি নি?"

যবন-সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সেদিন এক বৈপ্লবিক সৎসাহস প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন

তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও সাধন-মাহাত্ম্যের দিকে চাহিয়াই তাঁহার এই কার্য্যকে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়।

অদ্বৈত আচার্য্যের এই ঔদার্য্য ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্ত্তী-কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অদ্বৈতের নবদ্বীপস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জাঁকিয়া উঠে। গীতা ভাগবত, স্মৃতি প্রভৃতি রোজ তিনি সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ করান, আর নিশাযোগে পরমভক্ত হরিদাসের সঙ্গে স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাবেশে করেন নামকীর্ত্তন।

সুপণ্ডিত বিষ্ণুভক্ত, অদ্বৈত আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তেরা আচার্য্যের ধর্ম্মসভায় প্রায়ই উপস্থিত হন, কৃষ্ণকথায় আনন্দে কাল কাটাইয়া গৃহে ফিরিয়া যান।

দেশের চারিদিকে তখন ধর্ম্মের নামে নানা অনাচার ও অধর্ম্মের তাণ্ডব চলিয়াছে। পাষণ্ডীদের অত্যাচারে সমাজজীবন জর্জ্জরিত। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদেরই প্রতি যেন তাহাদের আক্রোশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

এ অবস্থা আর যেন সহ্য করা যায় না। ভক্ত হরিদাস এক একদিন সাশ্রুনয়নে আচার্য্যকে কহেন, "প্রভু, ধরণীর ভার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? শ্রীভগবান্‌কে প্রাণের আকুতি জানাচ্ছি-- তিনি কবে আসবেন? কবে ক'রবেন জীবের উদ্ধার সাধন?"

আচার্য্য সান্ত্বনা দেন, "হরিদাস, তুমি উতলা হ'য়ো না, তোমার মত আমিও যে দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী আর গঙ্গাজলে কৃষ্ণের আরাধনা ক'রছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে। ভেবো না. তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন!"

শ্রীবাস, শুক্লাম্বর, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার সভায় বসেন, পাষণ্ডীদের অনাচারের কথা বর্ণনা করেন। পরমাশ্রয়,

সর্ব্বজীবের উদ্ধারকর্ত্তার আবির্ভাব কবে হইবে বলিয়া ভক্তেরা খেদ জানান।

শুদ্ধাচারী মহাতেজস্বী আচার্য্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন। ভক্তদের সম্মুখে নিজের আশা ও সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করিয়া বলেন—

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখহ হেথাঞি।

(চৈতন্য ভাগবত)

'অদ্বৈত সিংহে'র হুঙ্কার, আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় বসিয়া নামকীর্ত্তন ও আর্ত্তির ফল অচিরেই ফলিল। নিজ গৃহের ধর্ম্মসভায় বসিয়া আচার্য্য সেদিন আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় জনৈক ভক্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর, তার্কিক বিদ্যাগর্ব্বী বিশ্বম্ভর, গয়াধাম হইতে এক মহাবৈষ্ণবে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়াছেন। অলৌকিক ভাব-প্রবাহ উচ্ছলিত তাঁহার সর্ব্বসত্তায়, দুর্লভ সাত্ত্বিক প্রেমবিকার স্ফুরিত তাঁহার সর্ব্বদেহে। সবাই বলাবলি করিতেছে, তবে কি এই তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আসন্ন ঐশী লীলার মহাপ্রকাশ ঘটিতে যাইতেছে ?

অদ্বৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ তাঁহার তখন ভাবাবেগে কণ্টকিত, নয়ন দুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল। প্রাণে জাগিয়া উঠিল পরম আশ্বাস--তবে কি কৃষ্ণ এতদিনে কৃপা করিলেন ? নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের এই তরুণ পুত্রের মধ্য দিয়াই কি তাঁহার আত্মপ্রকাশ ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন্ আধারে কেমন করিয়া প্রকটিত হইতে চলিয়াছে।

যাই হোক, আচার্য্য ধৈর্য্য ধরিবেন, অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। পরমতমের আবির্ভাব যদি হইয়াই থাকে, তবে তাঁহাকে যে আচার্য্যের কাছে আসিতেই হইবে। তাঁহার দীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ আরাধনা, তাঁহার

তুলসীগঙ্গাজলসহ আর্ত্তি তো বিফল হইবার নয়। আবির্ভূত পুরুষকে আপনা হইতেই যে অদ্বৈতের আঙিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে।

সেদিন প্রভাতে আচার্য্য আঙিনার তুলসীতলায় পূজা বন্দনাদি করিতেছেন। কখনো গোলকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র নতি, কখনো বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হইয়া ছাড়িতেছেন প্রবল হুঙ্কার!

এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয়া বিশ্বম্ভর সেখানে উপস্থিত। আচার্য্যকে দর্শনমাত্র তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্গ। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। দেহে সম্বিতের চিহ্নমাত্র রহিল না।

অদ্বৈত নির্নিমেষে এই মূর্চ্ছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। এ কি অপরূপ দিব্য লাবণ্যময় দেহ! একি বিস্ময়কর প্রেমবিকারের দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে! এই অদ্ভুত ভক্তি-আবেশ তো মানুষের মধ্যে দেখা যায় না! অদ্বৈত আর যে এই মোহন মূর্ত্তি নয়ন হইতে ফিরাইতে পারেন না।

ভক্তিসিদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল এক পরম বোধ, ইনিই যে সেই মহাবস্তু যাহার জন্য আজীবন তিনি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন—ইনিই যে তাঁহার প্রাণনাথ।

ভাববিমুগ্ধ আচার্য্য বিষ্ণু পূজার উপকরণাদি নিয়া বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছিত দেহের সম্মুখে আসন পাতিয়া বসেন। পরম ভক্তিভরে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া, বিষ্ণু-স্তোত্র গাহিয়া করেন তাঁহার বন্দনা।

সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আচার্য্যপ্রভুর নয়নাশ্রু অবিরাম ঝরিতেছে, আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বম্ভরের চরণ দুটি হইতেছে সিক্ত।

গদাধর তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত। সর্ব্বজনবরেণ্য প্রবীণ আচার্য্য অদ্বৈতের এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও তাঁহার হইল। আচার্য্যকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিলেন, "প্রভু, বিশ্বম্ভর আপনার কাছে বালকমাত্র। তাকে এভাবে পূজা অর্চ্চনা আপনি যেন আর করবেন না।"

ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা আচার্য্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, "গদাধর, এ বালক যে কে, তা অচিরেই বুঝবে। আর একটু অপেক্ষা তোমরা করো।"

ইতিমধ্যে বিশ্বম্ভরের বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট, অশ্রু-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

বিশ্বম্ভর ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন; অদ্বৈতের পদধূলি মাথায় নিয়া দৈন্যভরে কহেন—

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়।
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥

নির্নিমেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, হে কপটী, এ আবার তোমার কোন্ ছল? কিন্তু আর তো আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। যে পরম আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি, তা যে পরিগ্রহ করেছে তোমারই ভেতরে। আমার ধ্যানের ধন আজ ধরা দিয়েছে আমার সম্মুখে।

ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "না বিশ্বম্ভর, আর তুমি আমায় এড়াতে চেয়ো না। আমার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে— তুমিই হচ্ছো আমার শ্রেয় বস্তু। আর শোন, বৈষ্ণব জীবনের ধারা সারা দেশে স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভক্তেরা সবাই দিন কাটাচ্ছে চরম নৈরাশ্যে, মনোবেদনায় আর উৎকণ্ঠায়। তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, তোমায় নিয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হবার জন্য তারা ব্যাকুল। তুমি তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো।"

চিহ্নিত নেতা আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছেন। একবার তিনি তাঁহার নিজগণ চিনিয়া নিন, সুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই যে অদ্বৈত চাহিতেছেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই অদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য, কিছুকাল নবদ্বীপের বাহিরে থাকিয়া বিশ্বম্ভরকে পরীক্ষা করা। যদি তিনি সত্যই অদ্বৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া থাকেন, এই লীলা পরিকরকে তিনি নিজেই ডাকিয়া নিবেন।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভক্ত সমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন লীলা। শ্রীবাসের অঙ্গনে একের পর এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবেরা প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া জড়ো হইতেছে, মণ্ডলীর শক্তি দিন দিনই বাড়িতেছে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আগমনে এ শক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

মাধবেন্দ্র পুরীর পরম স্নেহভাজন নিত্যানন্দ। ভক্তি প্রেমরসের তিনি এক উৎসস্বরূপ। মাধবেন্দ্রেরই প্রচারিত কৃষ্ণ ভক্তিরসের অন্যতম ধারক ও বাহক এই প্রবীণ আচার্য্য। তাই নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত উভয়ে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোৎসব তেমন যেন জমিতেছে না।

সেদিন প্রভু শ্রীচৈতন্য দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে ডাকিয়া কহিলেন—

চলহ রামাই! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনি আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন।

(চৈঃ ভাঃ)

প্রকাশের লগ্ন উপস্থিত। প্রভু গৌরসুন্দর এবার আর যেন রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে চান না। আবির্ভাবের পরম তত্ত্বটি নানাভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছেন—এসময়ে চিহ্নিত পার্ষদ অদ্বৈত আচার্য্যকে যে তাঁহার অবিলম্বে চাই।

রামাই পণ্ডিতকে প্রভু আরো কহিলেন, "ছাখো, তুমি গোপনে আচার্য্যকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা। এখানে এত দিন ধরে যা কিছু দেখেছো ও শুনেছো, আচার্য্যকে সব বলবে। আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য্য যেন পূজোর সব উপচার সংগ্রহ ক'রে আনে, সস্ত্রীক এখানে এসে আমার পূজো করে।"

রামাইকে দেখিয়াই আচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "কি হে রামাই, হঠাৎ তুমি এসময় শান্তিপুরে এলে কি মনে ক'রে, বলতো। আমায় ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে বুঝি।"

রামাই বুঝিলেন কোন কথাই এই শক্তিমান্ বৈষ্ণবের অগোচর নাই। মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে সব কিছুই তো আপনার জানা। আদেশ হয়েছে, এবার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রভুর সকাশে চলুন।"

বৃদ্ধ আচার্য্য বড় চতুর—মনোভাব তাঁহার বড় দুরবগাহ। প্রভুর দূতকে চাপিয়া ধরিলেন, "আচ্ছা রামাই, তোমরা সবাই এত হৈ-চৈ করছো, কিন্তু আমায় কি বোঝাতে পারো, কেন শ্রীভগবান মানবদেহে আবির্ভূত হবেন। কেনই বা তিনি বিশ্বের এত স্থান থাকতে নবদ্বীপের মাটিতে নেমে আসবেন? ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথ আমি বুঝি, তাই ব্যাখ্যা করি—তোমার অগ্রজ শ্রীবাস পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে সবই জানে। কিন্তু রামাই, তোমাদের এ কান্নাকাটি আর ভাবমত্ততা কেন, তা তো বুঝতে পারিনে।"

রামাই জানেন, আচার্য্য অদ্বৈত গৌরসুন্দরের নব আন্দোলনের এক বড় স্তম্ভ। প্রভু তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন—তাঁহার জন্য তিনি আজ প্রতীক্ষমান। তাছাড়া, গদাধরের কাছে তাঁহারা সবাই শুনিয়াছেন, আচার্য্য সেদিন নিজেই প্রভুকে আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার প্রাণপ্রভুরূপে। স্বগৃহে তুলসীমঞ্চের সামনে তাঁহাকে পূজা করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আজিকার এ কথা তো তাঁহার প্রাণের কথা নয়!

যাই হোক, ভক্ত রামাই ভাবিলেন—তিনি দূতমাত্র। প্রবীণ, মহাজ্ঞানী আচার্য্যের সহিত আঁটিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তিনি হুবহু আচার্য্যের সম্মুখে এ সময়ে আওড়াইয়া গেলেন।

যুক্তকরে কহিলেন, "আচার্য্য, প্রভু ব্যাকুল হয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনি পূজোর সজ্জা ও উপচার নিয়ে শিগ্‌গীর আসুন। আর আমরা সবাই প্রভু আর তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরের মিলন মধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখা গেল আচার্য্যের এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রেমভক্তির প্রচণ্ড আবেগে তাঁহার দেহখানি থরথর কাঁপিতেছে। মহাপণ্ডিত আচার্য্য বালকের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—"এসেছেন, এসেছেন! প্রভু আমার ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ধূলায় তিনি নেমে এসেছেন!"

কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হইলেন। রামাই এই সুযোগে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "আচার্য্যবর, প্রভু কিন্তু আপনাকে অবিলম্বেই তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।"

অদ্বৈত পণ্ডিত এবার তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "ছাখো রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, ব'লে মেনে নেব, যখন তিনি আমায় তাঁর আপন ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য দেখাবেন, আর আমার এই পক্ককেশাবৃত মস্তকের ওপর তাঁর চরণদুটি তুলে ধরবেন।"

সস্ত্রীক নবদ্বীপে পৌঁছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন না। নন্দন আচার্য্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

রামাই একলা শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "ছাখো ছাখো, নাড়া এখনো আমায় পরীক্ষা করতে চায়। আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন আচার্য্যের ঘরে সস্ত্রীক সে লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।"

অদ্বৈত ও অদ্বৈত-পত্নীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল।

প্রভু আজ ঐশ্বরীয় মহাভাবে প্রমত্ত। দিব্য রূপৈশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভাববিহ্বল অদ্বৈত নির্নিমেষ নয়নে এ দৃশ্য

দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছত্র। গদাধর পণ্ডিত তাঁহার তাম্বুল-করঙ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্যজন কবিতেছেন, আর শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তগণ চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মুখে বিস্তারিত গৌরসুন্দরের সৌন্দর্য্যসুধার সমুদ্র। অদ্বৈত হতবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেছেন—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর।
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর।

শুধু তাহাই নয়, অদ্বৈত আচার্য্যের দৃষ্টি হইতে প্রভু যেন একটা পর্দ্দা অপসারিত করিয়া নিয়াছেন। অনাবৃত করিয়াছেন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দিব্যরূপ। এ রূপের জ্যোতিতে সকল কিছু হইয়া উঠিয়াছে উদ্ভাসিত। ভক্তকবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়—

কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর।

এ অলৌকিক দর্শনের ফলে পতি ও পত্নী উভয়ে আনন্দে আত্ম-হারা! পরম ভক্তিভরে, ষোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পূজা তাঁহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোদ্বেল আচার্য্যের মুখে বার বার উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিষ্ণুধ্যানের স্তবগাথা।

পূজা ও স্তব গানের শেষে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ সর্ব্বজনমান্য মহান্ আচার্য্যের শিরে তিনি অবলীলায় স্থাপন করিলেন নিজের চরণদ্বয়। ভক্ত-গোষ্ঠীর হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্বৈতের সঙ্কল্প ছিল, ঈশ্বর বলিয়া যাঁহাকে তিনি স্বীকার করিবেন, জীবনপ্রভুরূপে হৃদয় সিংহাসনে বসাইবেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য, নিজ শক্তিতে কাড়িয়া নিতে হইবে অদ্বৈতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। সে সঙ্কল্প আজ তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে।

আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। প্রভু ও তাঁহার স্বজনদের জ্যোতির্ম্ময় রূপ যে তিনি আজ দেখিয়াছেন। অদ্বৈতের শিরে পদ স্থাপন করিয়া প্রভু আদেশ দিলেন, "অদ্বৈত, এবার শান্ত হয়ে উঠে ব'সো, পঞ্চ উপচারে সস্ত্রীক আমার চরণ পূজা করো।"

এই আদেশের জন্যই যে আচার্য্য এতদিন অপেক্ষমান। প্রভু এমনি করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিবেন, তাঁহার জীবন-বেদীতে নিজেকে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই তো তিনি চান।

এবার সোৎসাহে উঠিয়া বসিয়া মালা, বস্ত্র, অলঙ্কারে প্রভুকে সাজাইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ষোড়শোপচারে প্রভুর পূজা সম্পন্ন করিলেন। আচার্য্যের দুই চোখে তখন বহিতেছে পুলকাশ্রুর ধারা।

প্রভু বিশ্বম্ভর আজ অপূর্ব্ব দিব্যভাবে উদ্দীপিত। গম্ভীরভাবে অদ্বৈতের পূজা আরতি তিনি গ্রহণ করিলেন, তারপর এই বর্ষীয়ান্ মহাভক্তের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন নিজের গলার প্রসাদী মালা।

এবার শোনা গেল আচার্য্যের প্রতি প্রভুর আর এক নূতন আদেশ, "ওরে নাড়া, পূজো আমার শেষ হয়েছে। এবার কীর্ত্তন হবে, তাতে তুই নৃত্য কর্।"

ভক্তগণ সোল্লাসে কীর্ত্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল এক অদ্ভুত দৃশ্য। মহাজ্ঞানী গম্ভীরস্বভাব, বৃদ্ধ আচার্য্য পরমানন্দে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজী বাহিয়া ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু। অদ্ভুত প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপনা বিস্মৃত হইয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া সাবস্ময়ে ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, অদ্বৈত আচার্য্য—বহু ভক্তজন যাঁহার আশ্রিত, বহুজনের অধ্যাত্ম-জীবনের যিনি পথিপ্রদর্শক? পরশমণি প্রভুর যাদুস্পর্শে এই ভাবগম্ভীর জ্ঞানীপুরুষ আজ নৃত্যকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় অদ্ভুত, বড় নয়ন-মনোরম।

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য, এবার অকপটে বল, তোমার কি প্রার্থনা।

তুমি আমার কাছে বর চেয়ে নাও, যা চাইবে তা-ই আজ আমি তোমায় দেব।"

আচার্য্য যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন না। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ছাড়িতে রাজী নন। ভাবাবেশে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বার বারই কহিতেছেন, "না আচার্য্য তুমি বর প্রার্থনা করো। কি তোমার অন্তরের অভিলাষ, তা জানাও।"

অদ্বৈত আচার্য্য তবুও নিরুত্তর।

প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, "তবে শোন আচার্য্য, ঘরে ঘরে নামকীর্ত্তনের প্রচার এবার আমি শুরু করবো। অপূর্ব্ব ভক্তি সম্পদ চারদিকে বিলিয়ে দেবো।"

অদ্বৈত এবার মুখ খুলিলেন। করুণার্দ্র নয়নে কহিলেন, "প্রভু, যদি কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হয়েছো, যদি তোমার দেবদুর্লভ ভক্তি বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা আগে তাদেরই দাও যারা রয়েছে সবার পশ্চাতে—চিরবঞ্চিত হয়ে। শূদ্র আর স্ত্রীজাতির মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছড়িয়ে দাও।"

ভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহার এই প্রার্থনা পূরণে স্বীকৃত হইলেন, সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন হুঙ্কার।

প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে, ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে, আচার্য্যের দিন বড় আনন্দে কাটিতেছে। কিন্তু অন্তরে তাঁহার একটা কাঁটার খোঁচা থাকিয়াই যাইতেছে। বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব নেতা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ভক্তি করেন, সম্ভ্রম দেখান। এক একদিন আচার্য্যকে সবলে ভূতলে ফেলিয়া তাঁহার চরণতলে নিজের শির ঘর্ষণ করেন। অদ্বৈতের সারা অন্তর তখন এক অব্যক্ত কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চায়। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভু এমন করিয়া শুধু শুধু তাঁহাকে বিড়ম্বিত করেন? প্রভু তাঁহার প্রভুত্ব দেখাইতে থাকুন, আচার্য্যকে কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তো বুঝা যাইবে তাঁহার অন্তরঙ্গতা।

আচার্য্য ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সহিত

চাতুর্য্যপূর্ণ খেলাই তিনি খেলিবেন। অল্প কয়েকদিন পরে, হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া তিনি শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন।

আচার্য্যের পূর্ব্বেকার সে ভক্তিমধুর রূপ যেন আর নাই। এবার তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এক তীক্ষ্ণধী, বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ্‌রূপে। আর তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার মূলে আছে জ্ঞান বিচারের দিগ্‌দর্শন—

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া।
"জ্ঞান বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সর্ব্বশক্তি।
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন।
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম?
আদি বৃদ্ধ আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র।" (চৈঃ ভাঃ)

অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবেরা তো অবাক্! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির অন্যতম ধারক ও বাহক অদ্বৈতের মুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের কথা। আচার্য্য কি তবে জীবনাদর্শ বদলাইয়া ফেলিলেন?

শুধু মহাপ্রেমিক হরিদাসের চোখে আচার্য্য ধূলা দিতে পারেন নাই। হরিদাস বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গৌরসুন্দরের সহিত চতুরতার যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভুকে অবিলম্বে শান্তিপুরে টানিয়া না আনিয়া তিনি ছাড়িবেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক কোণে বসিয়া তাঁহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্ত্বব্যাখ্যা শুনেন, আর নীরবে মুচ্‌কি হাসি হাসেন।

অচিরেই অদ্বৈত আচার্য্যের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাৎ গৌরসুন্দর শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত।

আচার্য্য ও তাঁহার গৃহের সকলে ত্রস্তেব্যস্তে আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িল।

অদ্বৈত যুক্তকরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে নাড়া, আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল্—ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়।"

অদ্বৈত দেখিলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। ইহাই যে তিনি চাহেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবেন, দণ্ড দিবেন, আর তিনি সে দণ্ড সানন্দে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। এইজন্যই তো চতুর অভিনয় তাঁহাকে এ কয়দিন ধরিয়া করিতে হইয়াছে।

সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, সর্ব্বকালে সর্ব্ব সমাজে জ্ঞানই তো বড়। জ্ঞানহীন ভক্তি দিয়ে কোন্ কার্য্য সাধিত হবে?"

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? ওরে নাড়া, তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুই একথা উচ্চারণ করছিস্!"

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ আচায্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাইলেন। তারপর প্রবল বেগে বর্ষিত হইতে লাগিল অজস্র কিল-চড়।

প্রহার জর্জ্জরিত আচার্য্যের মুখ দিয়া কিন্তু একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না। মৃতপ্রায় হইয়া তিনি ভূতলে শায়িত আছেন। আচার্য্য গৃহিণী এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দোহাই তোমার! বুড়ো বামুনকে একেবারে প্রাণে মেরো না। এবার ক্ষান্ত হও।"

ভক্তপ্রবর হরিদাস একপাশে দণ্ডায়মান। প্রভুর এই বিচিত্র কোপ-লীলা দর্শনে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীতি ও বিস্ময়। ঘন ঘন তিনি কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতেছেন।

হৈ-চৈ শুনিয়া আচার্য্যের আঙিনায় বহু লোকজন জড়ো হইয়াছে। সবাই মহা সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ আচার্য্যের এ কি দুর্গতি।

শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছেন।

অদ্বৈত আচার্য্যকে প্রভু এবার মুক্তি দিলেন। ক্রোধ তিনি সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দীপনা আজিকার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়া দিয়া গেল প্রভুর আত্মপরিচয়। 'মুঁই সেই, মুঁই সেই', বলিয়া বার বার তিনি তাঁহার ভগবত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কৃপাদণ্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা নাই। বৃদ্ধ বৈষ্ণবনেতা আঙিনায় দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন।

নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, "প্রভু নিজ হাতে আমায় দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুরালি তো দেখিয়েছ। তোমার এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাতেই যে আমি চেয়েছিলাম। এবার আমায় তোমার চরণাশ্রয় দান করো।"

প্রভু গৌরসুন্দর পরম প্রেমভরে অদ্বৈতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। উভয়ের কপাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। আচার্য্যের আঙিনায় সেদিন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়া উঠিল।

প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচার্য্যকে যে প্রহার ও লাঞ্ছনা করিয়াছেন সেজন্য খুব লজ্জিত। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে অদ্বৈতকে কহিলেন, "আচার্য্য, সবাই আজ জেনে রাখুক, তিলার্দ্ধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেবে, তার শত অপরাধ আমি মার্জ্জনা ক'রবো।"

প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বার বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, আর নয়নজলে তাঁহার বসন ভিজিয়া যাইতে থাকে।

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীলা ও ইষ্টগোষ্ঠী। নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার রঙ্গ ও হাস্য পরিহাস চলিতে থাকে। অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবীর আজ আনন্দের সীমা নাই। সোৎসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়া তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন করিতে বসেন।

গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া প্রভু তুলসীমঞ্চের সম্মুখে গিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। অপূর্ব্ব ভাবরসে তিনি উদ্বেল। সুগৌর সুঠাম দেহের রেখায় রেখায় ঝলকিয়া উঠিতেছে দিব্য লাবণ্যশ্রী। রসনায় উচ্চারিত হইতেছে ইষ্টনাম। ভক্ত ও পার্ষদেরা এ অপূর্ব্ব প্রেমঘন মূর্ত্তির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছেন।

ভাবাবিষ্ট প্রভু হঠাৎ এসময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অদ্বৈত এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। সবেগে তিনি গৌরসুন্দরের পদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন। পরমভক্ত হরিদাসও এ মহা সুযোগ হারাইবার পাত্র নহেন। অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরসুন্দরের পরমাশ্রয় তাঁহার জীবনে মিলিয়াছে —আজ তুই সংত্রাতাই তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পড়িয়া আছেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া হরিদাসও সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈতের চরণতলে পতিত হইলেন।

আচার্য্যের আঙিনায় সর্ব্বজন সমক্ষে সেদিন ফুটিয়া উঠিল এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। শায়িত ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, জাতিবর্ণ নির্বিবশেষে ভক্তদলের তিনি প্রতীক। তাঁহার শিরে চরণ স্থাপন করিয়া আছেন অদ্বৈত-প্রভু। সর্ব্বোপরি রহিয়াছেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। বৃন্দাবন দাস এই ত্রয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'ধর্ম্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে'।

ইহার পর আসিল ভোজন পর্ব্ব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সদাই বাল্যভাব। আনন্দের আবেশে বসিয়া বসিয়া তুই হাত দিয়া অন্ন ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ত্ব ভালোরূপেই জানেন। তাই তাঁহার সহিত কৃত্রিম কোন্দল করিতে, তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে, তাঁহার বড় আনন্দ।

আচার্য্য কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহা বিপদে পড়া গেছে এই নিত্যানন্দকে নিয়ে। সকলের জাতধর্ম্ম নাশ না ক'রে এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে এ মাতাল এসে জুটলো তা কে জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী ব'লে। জাতি কি, কোন্ ঘরে জন্ম তা বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে

যার-তার হাঁড়িতে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহা অনাছিষ্টি। হরিদাস, তোমরা সবাই আগে থাকতে সাবধান হও।”

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ ও হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। এ বালসুলভ কোন্দল দেখিয়া প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিদাস হাসিয়া অস্থির হন।

কিছুক্ষণ বাদে লড়াই থামিয়া গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়কে পরম আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন।

এইভাবে আচার্য্যের ভবনে কয়েক দিন থাকিয়া প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাসের এবারকার আগমন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত করিল এক নূতনতর শক্তি।

বিশেষতঃ অদ্বৈত আচার্য্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাই আচার্য্য ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রভুর নব আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-স্তম্ভ রূপে। নবদ্বীপের লীলাক্ষেত্রে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন প্রভুর প্রধান সহায়করূপে। এবার সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিল অদ্বৈত আচার্য্যের মর্য্যাদা, জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বশক্তি। তাই চৈতন্য-ভাগবত এই দুই প্রধান পার্ষদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, -‘প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুইজনে।’

বৎসরখানেক পরের কথা। প্রভু গৌরসুন্দর ইতিমধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার লীলানাট্যের এক নূতনতর অঙ্ক।

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচার্য্যের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। শুধু প্রভুর এই নবরূপ ও ভাবোন্মাদ লীলা দর্শনের আশাতেই যে তিনি বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাওয়ার আগে জননী ও ঘনিষ্ঠ ভক্তদের কাছে বিদায়

নিতে চান। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া নিজে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুকে দর্শনের জন্য সহস্র সহস্র দর্শনার্থী সেদিন আচার্য্য ভবনে ভীড় করিয়া দাঁড়ায়, নৃত্যকীর্ত্তনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। শান্তিপুর পরিণত হয় ভক্তি-প্রেমের আনন্দ হাটে।

গৌরসুন্দরের সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্য মূর্ত্তি দর্শনে অদ্বৈত আচার্য্য আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ভাবোদ্বেল হইয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মূর্চ্ছিত।

বহুক্ষণ পরে আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। প্রভু এবার ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈতের শিশুপুত্র অচ্যুত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগড়ি গিয়া আপন মনে এতক্ষণ খেলা করিতেছিল। এবার এই জনসংঘট্ট ও দেবদুর্লভ মূর্ত্তি প্রভুকে দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধূলিধূসরিত শিশুকে গৌরসুন্দর কোলে তুলিয়া নিলেন, সস্নেহে কহিলেন, "অচ্যুত, বলতে পারো, তুমি আমার কে? জানতো, আচার্য্য আমার পিতা, কাজেই তুমি আর আমি হচ্ছি দুই ভাই।"

সবাইকে বিস্মিত করিয়া শিশু সেদিন উত্তর দিয়াছিল, "না-গো তা নয়। দৈবের বিধানে তুমি এসেছ জীবসখারূপে—তোমার জনক তো কখনো কেউ থাকতে পারে না—তুমি যে স্বপ্রকাশ।"

ভক্তদল ও দর্শনার্থীরা হতবাক্! অদ্বৈত আচার্য্যের এ অবোধ শিশু একি অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা বলিতেছে। অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া ইহার জন্ম, এ শিশু যে অনন্যসাধারণ!"

নবদ্বীপে প্রভুর যে ঈশ্বরীয় আবেশ যে ঐশ্বর্য্য ভক্তগণ দেখিয়াছিলেন, অদ্বৈত গৃহে তাহাই শেষবারের মত সকলে দেখিলেন। দিব্য উদ্দীপনাভরে বিষ্ণুখট্টার উপর প্রভু উঠিয়া বসিলেন। স্বমুখে বার বার 'মুই সেই, মুই সেই' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন নিজতত্ত্ব।

বিদায়ের পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে তাঁহার অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই।
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্ত বশ স্বভাব আমার।
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব্ব অবতার।
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জানাইয়া।

প্রতি বৎসরই ভক্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাভের জন্য নীলাচলে যান, আর তাঁহাদের এই পদযাত্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত আচার্য্য। এই অভিযাত্রায় শুধু ভক্ত বৈষ্ণবেরাই নয়, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরাও কেহ কেহ থাকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের আগ্রহের অন্ত নাই। যা কিছু আহার্য্য তিনি আগে পছন্দ করিতেন, যা কিছু এখনো ভালোবাসেন, সযত্নে তাহাই ভারে ভারে শুষ্ক করিয়া নিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন।

তখনকার দিনের যাত্রাপথ ছিল বড়ই বিপদসঙ্কুল। দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোষ্ঠী নীলাচলে পৌছিতেন, প্রভুর দিব্য মনোহর রূপ দর্শন করামাত্র তাঁহাদের পথ পর্য্যটনের সমস্ত কিছু শ্রান্তি এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইত।

প্রাণপ্রিয় বৈষ্ণবেরা তাঁহার দর্শনে আসিতেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রভুও ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যান। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতে থাকেন। প্রভুর গোষ্ঠী আর অদ্বৈতের গোষ্ঠীর মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া যায়, আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে।

প্রভুর পূজার্চ্চনার জন্য আচার্য্য নানা উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহারের উপায় কই? মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘটিয়া যায় আত্মবিস্মৃতি। প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস দুকূল ছাপাইয়া উঠে, বৃদ্ধ আচার্য্য আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার দিতে থাকেন, "এনেছি এনেছি, প্রভুকে আমি এনেছি।"

আচার্য্যের ব্যাকুল ক্রন্দনেই প্রভু আসিয়াছেন—এ বিশ্বাস রহিয়াছে সকল ভক্তেরই অন্তরে। তাই সমবেত কণ্ঠে প্রভু ও আচার্য্যের জয়রব ধ্বনিত হয়, দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠে।

প্রভুর ইঙ্গিতে জগন্নাথদেবের আজ্ঞামালা নিয়া সেবকেরা ছুটিয়া আসে। এই মালা ও চন্দন প্রথমে তিনি পরাইয়া দেন আচার্য্যবরের কণ্ঠে, তারপর অপর বৈষ্ণবেরা মালা প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন।

সেবার নীলাচলে পৌঁছিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের অভিলাষ হইল প্রভুকে একদিন ভোজন করাইবেন এবং স্বহস্তেই সব কিছু তিনি রাঁধিবেন।

নিমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীচৈতন্য মহা উল্লসিত—

> প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায়।
> কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়!
> আচার্য্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
> তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন।
> তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
> মাগিয়া খাইতে আমার তথি হয় মন।

ভক্তবৎসল প্রভুর এই মধুর কথা শুনিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? আচার্য্য আনন্দে আপনহারা হইয়া গেলেন।

আজ প্রভুর নিমন্ত্রণ। আচার্য্য ও আচার্য্যপত্নী প্রত্যুষ হইতেই কর্ম্ম-ব্যস্ত। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে আচার্য্য রন্ধনের অধিকারটি পত্নী সীতাদেবীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। প্রভুর কাছে যে এই অধিকারটি নিজেই তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভক্ত পরমোৎসাহে নানা উপাদেয় বস্তু রন্ধন করিতেছেন, আর পত্নী সীতাদেবী নিকটে বসিয়া সব কিছু জুটাইয়া দিতেছেন।

আচার্য্যের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন ইচ্ছা স্ফুরিত হইতেছে। প্রভু যখন ভিক্ষা গ্রহণে আসেন, প্রায়ই তাঁহার সহিত আসিয়া উপস্থিত হয় একদল সেবক ও ঘনিষ্ঠ ভক্ত। বড় আশা করিয়া বহু কষ্টে আচার্য্য আজ এত সব প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু

প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তো তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়ানো যাইবে না।

পত্নীকে ডাকিয়া আচার্য্য মনের কথাটি খুলিয়া বলিলেন, তারপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আহা, এমন কোন দৈব. দুর্য্যোগ কি আজ হতে পারে না, যাতে প্রভু একলাটিই আমার কুটিরে এসে উপস্থিত হন। তা'হলে পরম পরিতোষ সহকারে তাঁকে ভোজন করানোর সুযোগ পাই!"

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। আচার্য্য সবে মাত্র রন্ধন শেষ করিয়াছেন, হঠাৎ আচম্বিতে আকাশে দেখা দিল মেঘের ঘনঘটা। অল্প সময়ের মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বৃষ্টি।

আচার্য্য প্রমাদ গণিলেন। একি ঘোর বিপদে আজ পড়া গেল। প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই মধ্যে একি দৈব দুর্য্যোগ! এ অসময়ে এমন ঝড় বাদলের তাণ্ডব শুরু হইবে তাহা কে জানে!

এমন সময় দেখা গেল আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। ঝড় জলে ভিজিয়া 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভু তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া আচার্য্য তাঁহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন। কিছুটা বিশ্রামের পর প্রভু আহারে বসিলেন।

বহু বিচিত্র আহার্য্য সম্ভার! আচার্য্য প্রাণপণে অজস্র খাবারের যোগাড় করিয়াছেন। পীড়াপীড়ি করিয়া প্রভুকে আকণ্ঠ ভোজন করানোর পর ভক্তের প্রাণে শান্তি আসিল।

এবার ভক্তিভরে আকাশের দিকে চাহিয়া অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার স্তুতি শুরু করিয়া দিলেন।

প্রভু মহা বিস্মিত। কহিলেন, "আচার্য্য, হঠাৎ ইন্দ্রদেবের ওপর তোমার এত ভক্তি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন বলতো?"

উত্তর হইল, "প্রভু, আজ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে একলাটি পেলাম, পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো৷

প্রভু একথা মানিতে রাজী নন। ঝড়-শিলাবৃষ্টির সময় তো এ নয়। এ যে আচার্য্যেরই কাজ। তাঁহারই বৈষ্ণবীয় ভক্তির বলে এই অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘটিত হইয়াছে। অদ্বৈতের প্রশস্তি গাহিয়া কহিলেন—

কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বথা।
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ?

আবেগকম্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়াছেন। বার বার কাঁদিয়া কহিতেছেন, "প্রভু, তুমি সেবকবৎসল, সেবকের মনোবাঞ্ছা তোমার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, আর সে বাঞ্ছা পূরণও তুমি করো। আমার যা কিছু শক্তি তা যে এই প্রত্যয়েরই উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকে আমায় বলে—অদ্বৈত সিংহ। কিন্তু রা তো জানে না, সিংহের বল হচ্ছে তার প্রভুরই বল!"

ভক্তগোষ্ঠী নিয়া প্রভু বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কৃষ্ণকথা ও কীর্ত্তনে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে।

বহুজন পরিবৃত হইয়া সেদিন তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈত আচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

প্রভু সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "এই যে আচার্য্য! কোথা হতে তুমি আস্‌ছো। কোন্ কাজেই বা ব্যাপৃত ছিলে, বলতো?"

"প্রভু, শ্রীমন্দিরেই এতক্ষণ বসেছিলাম। জগন্নাথ দর্শন সেরে এইমাত্র আসছি।"

"খুব ভাল কথা, আচার্য্য। কিন্তু বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর আর কি তুমি করেছো।"

"প্রভু, শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের পর তাঁকে রোজ প্রদক্ষিণ করি। আজও সেই কাজই ক'রে এলাম।"

উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিয়া প্রভু কহিলেন, "আচার্য্য, এবার তুমি সত্যই হেরে গেলে!"

অদ্বৈত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাঁহার পরাজয় হইবে, সে একটা বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় কিসের, তাহা তো বুঝা যাইতেছে না। কহিলেন, "প্রভু, আগে বল, হার-জিতের বিষয়টি কি। তবে তো আমি তা মেনে নেব।"

প্রভু ও ভক্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে। এবার সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিল—

প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার।
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা।
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত।
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখো জগন্নাথ মুখ বিনে॥

ইষ্ট দর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব যে ইহাই। আর এই দর্শনই চৈতন্যদেব প্রতিদিন করিয়া থাকেন—জগন্নাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাঁহার নয়নে থাকে চিরস্থির।

ভক্ত জনেরা সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া আছেন, কহারো মুখে কথা সরিতেছে না।

অদ্বৈত এবার যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "প্রভু তোমার কাছে পরাজিত হয়েই যে রয়েছি—এ পরাজয় তো নূতন কিছু নয়। তবে এটা বুঝতে পারি, জগন্নাথ দর্শনের এই তত্ত্ব শুধু তোমার শ্রীমুখেই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।"

বৃদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, যে চৈতন্যতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত, তাহারই আলোর ধারা দিকে দিকে তিনি ছড়াইয়া দিতে চান। শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "এসো আজ আমরা সবাই মিলে প্রভু শ্রীচৈতন্যের নামকীর্ত্তন শুরু ক'রে দিই। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভু

অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। তবে প্রভুর নামগানে, স্তুতিগানে, বাধা কোথায়?"

ভক্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট হয়ে, 'মুঁই কৃষ্ণদাস' ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন। তাঁর নাম কীর্ত্তনের উৎসাহ কাহারো কম নাই। কিন্তু প্রভু তাঁর নিজের স্তুতিগান শুনিয়া যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তবেই বিপদ।

অদ্বৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই ভয় কাটিয়া গেল। শুরু হইল উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনিয়াদের গানে নিজের এ আত্মস্তুতি শুনিতে প্রভু রাজী নন। ধীর পদক্ষেপে তিনি স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সেবক গোবিন্দের কাছে শোনা গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ নিজের শয্যায় শায়িত। আপন মনে একেবারে চুপচাপ পড়িয়া আছেন।

অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়া ভক্তেরা কুটিরে ঢুকিলেন।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা শ্রীবাস, তোমরা সব সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান্ ভক্ত থাকতে এ সব কি হচ্ছে, বলতো? কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছো কেন?"

শ্রীবাস উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমাদের স্বাতন্ত্র্যই বা কি, শক্তিই বা কোথায়? ঈশ্বর যা বলিয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ করেছি।"

প্রভু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমরা সবাই শাস্ত্রবিদ্, স্থিরবুদ্ধি। আচ্ছা বলতো, যে আত্মগোপন প্রয়াসী তাকে কি জনসমক্ষে ঠেলে বার ক'রে দিতে হয়? তা কি সঙ্গত?"

শ্রীবাস স্মিতহাস্যে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া হস্ত দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করার ভঙ্গী দেখাইলেন।

প্রভু কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে, সবটা প্রকাশ ক'রে বল।"

উত্তর হইল, "প্রভু হাত দিয়ে আমি সূর্য্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সত্যই কি ও বস্তু ঢাকা যায়? তোমার লুকানো ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি, কোন কিছু দিয়ে ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখা যায় না।"

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সেদিন চলে নাই। প্রভুর গৃহদ্বারে হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট জনসমুদ্র। গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিল, এবার তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে, 'প্রভু'কে দর্শনের জন্য। অচল জগন্নাথের পরে সচল জগন্নাথ দেখিয়া তাহারা ঘরে ফিরিবে। এই দর্শনার্থী জনতা সেদিন জানাইয়া দিয়া গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ—কোন গোপনতার আড়ালই তাঁহাকে জনচক্ষুর অগোচব কবিয়া রাখিতে পারে না।

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্টা এমনি করিয়া সেদিন জয়যুক্ত হইয়া উঠে, উদ্ঘাটিত করে প্রভুর লীলানাট্যের এক মহত্তর রূপ।

সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের স্মরণ নিয়াছেন। প্রভু তাঁহার দুই বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব ভক্তকে সম্মুখে রাখিয়া প্রথমে অদ্বৈতের খুব খানিকটা গুণগান করিলেন। তারপর কহিলেন, "ছাখো, প্রেমভক্তি যদি সত্যই পেতে চাও তবে তোমরা অদ্বৈতের শরণ নাও। তাঁর কৃপা না হলে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি উপজিত হবে না।"

নবাগত ভক্তদ্বয় তখনি সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈত আচার্য্যের চরণে পতিত হইলেন। প্রভু প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য, এ দুজনকে তুমি কৃপা করো। তুমি হচ্ছো ভক্তিধনের ভাণ্ডারী, তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে তো এদের অভীষ্ট লাভ হবে না।"

সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শক্তি আচার্য্যের সুবিদিত। বুঝিলেন, প্রভু চাহেন প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি এই দুই মহা-প্রতিভাধর ভক্তের হৃদয়ে স্ফুরিত হোক, আর তাহার সূচনা হোক

প্রবীণতম বৈষ্ণবনেতা, ভক্তি-শাস্ত্র পারঙ্গম অদ্বৈতের আশীর্ব্বাণী নিয়া।

আচার্য্য কহিলেন, "প্রভু, কৃষ্ণ ভক্তির ভাণ্ডারের অধিকারী হচ্ছো তুমি। আমি সে ধনের ভাণ্ডারী কিনা জানি না। যদি হয়েই থাকি, তবে ভাণ্ডারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের আজ্ঞায়। তুমি ইচ্ছাময়, যখন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে ভক্তদের কৃপা বিতরণ করো। আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই আশীর্ব্বাদই করছি--এদের দু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।"

সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিযা প্রভু শ্রীচৈতন্য কহিলেন,—"আর তোমাদের কোন চিন্তা নেই। শক্তিধর আচার্য্যের কৃপা আজ তোমরা পেয়েছো—

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি ॥
(চৈঃ ভাঃ)

আর একদিনের কথা: অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বসিয়া আছেন। ভাবাবেশে দেহ তাঁহার কম্পিত হইতেছে, আয়ত নয়ন দুইটি ঢুলুঢুলু। হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিত, আমায় বল দেখি, অদ্বৈতকে তুমি কেমনতর বৈষ্ণব বলে মনে করো?"

বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন। কি ইহার উত্তর দেওয়া যায়? ক্ষণকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃপূত হইল না। অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের গালে ঠাস্ করিয়া তখনি এক চড় বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর ভাবাবেশে কাটিয়া গেল। শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রভু শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে অদ্বৈতের স্বরূপ মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তদের হৃদয়ে অদ্বৈত-তত্ত্বটি চিরতরে সেদিন অঙ্কিত হইয়া গেল।

প্রতি বৎসরই আচার্য্য অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে উপস্থিত হন। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কর্ম্মক্ষেত্র গৌড়দেশে। সেখানে তিনি বিরাজিত থাকেন প্রভুর প্রবর্ত্তিত ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে।

সেবার আচার্য্যের এক ভক্ত তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। এই ভক্তটির নাম বাউলিয়া বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ দেনার জন্য তাঁহাকে বড় বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

বাউলিয়া বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাব তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। তিনি মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতো, এত সব ঐশ্বর্য্যশালী ভক্ত ও রাজরাজড়া থাকিতে আচার্য্যের এমন দুর্গতি চলিতে থাকিবে? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রের কানে একবার এ কথাটি তুলিতে পারিলেও ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়।

বাউলিয়া বিশ্বাস তাহাই করিলেন। প্রতাপরুদ্রকে আচার্য্যের অর্থকৃচ্ছ্রের কথা জানাইয়া তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়া বসিলেন।

কথাটি কি করিয়া যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সেবকদের আদেশ দিলেন, "ছাখো, বিশ্বাস যেন কখনো আমার কাছে না আসে, আমি তার মুখদর্শন করতে চাইনে। শুদ্ধসত্ত্ব অদ্বৈত আচার্য্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে চায়! জান্‌বে, আমার কাছে কোনদিন তার ক্ষমা নেই।"

প্রভুর এই দণ্ডাজ্ঞা নীলাচল ও গৌড়ে আলোড়ন তুলিল। ভক্ত সমাজের সম্মুখে ইহা দেখা দিল এক সতর্ক-সঙ্কেত রূপে। সকলেই বুঝিলেন—প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে গেলে বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ করা চলিবে না।

বাউলিয়া বিশ্বাসের এই দণ্ড অদ্বৈতের প্রাণে বড় বাজিল। প্রকৃত পক্ষে নিজের জন্য সে কোন সাহায্য চাহে নাই, চাহিয়াছে আচার্য্যেরই শুভার্থী হইয়া।

কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সহিত আচার্য্যের সাক্ষাৎ।

আচার্য্য সকৌতুকে কহিলেন, "প্রভু, বাউলিয়া বিশ্বাসের ওপর তোমার এমন কৃপা, অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও তাকাও না।"

প্রভু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আচার্য্য, তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল, তুমি তো নিশ্চিতরূপে আমার মতবাদ জানো। প্রকৃত বৈষ্ণব হবে ঈশ্বরচরণে নিবেদিতপ্রাণ, ঈশ্বর প্রেমে সদা-উন্মত্ত। বিষয়কূপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে সাহায্যের প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার ঋণ শোধের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন যাবে কেন, বলতো? যোগক্ষেম বহনের প্রতিশ্রুতিতে যিনি আবদ্ধ, তোমার ভার যে তিনিই নিয়ে বসে আছেন। তবুও বাউলিয়া বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিতা করলো? তাই তো আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি। অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছো, এ দণ্ড তাকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে করেই, সে তোমার ভক্ত ব'লে। বুঝেছি, ভক্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচলিত করেছে। আচ্ছা এবার আমি বিশ্বাসকে মার্জ্জনা ক'রলাম। আর যেন কখনো তার এমন কুমতি না হয়।"

ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত সেবার নীলাচল হইতে গৌড়ে গিয়াছেন তাঁহার মাধ্যমে বৃদ্ধ অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের জন্য এক তরজা পাঠাইলেন

প্রভুকে কহিও আমার
কোটি নমস্কার
এই নিবেদন তাঁর
চরণে আমার
—'বাউলকে কহিও লোকে
হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে
না বিকায় চাউল

বাউলকে কহিও কাজে
নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা
কহিয়াছে বাউল।

নীলাচলে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় জগদানন্দ এই তরজাটি সেখানে আবৃত্তি করিলেন। বড় প্রহেলিকাময় আচার্য্যের এই তরজা। সকলেই চুপচাপ হইয়া বসিয়া আছেন। প্রভু স্মিতহাস্যে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "বেশ, তাঁহার যে আজ্ঞা।"

প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই ছিলেন। মনে তাঁহার বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আমরা কেউ এ হেঁয়ালীর মানে বুঝে উঠতে পারলুম না। আপনার কথাও বড় দুর্ব্বোধ্য ঠেকছে। কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন।"

উত্তর হইল, "স্বরূপ, জানতো অদ্বৈত আচার্য্য আগম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন, দুই অনুষ্ঠানই তাঁর জানা আছে। আচার্য্য বোধহয় একটা কিছু ইঙ্গিত জানাতে চেয়েছেন। কিন্তু তোমাদের মত আমিও সবটা বুঝতে পারিনি।"

প্রভু আসল কথাটা চাপিয়া গেলেও স্বরূপ বুঝিলেন, আচার্য্য তাঁহার দেবতার বিসর্জ্জনের ইঙ্গিতই এই হেঁয়ালীর মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছেন। স্বরূপের অনুমান মিথ্যা হয় নাই, অদ্বৈতের এই তরজা শ্রবণের পর হইতে প্রভু হইয়া উঠেন আরো অন্তর্মুখীন। গম্ভীরার মধ্যে আপনাকে তিনি একেবারে গুটাইয়া নেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিল তুলসী আর অশ্রুজলে যে লীলা আচার্য্য ত্বরান্বিত করেন, আরব্ধ কার্য্যশেষে তাহারই উপর যবনিকা ক্ষেপণের কথাটি নিজেই তিনি ধ্বনিত করিয়া যান।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা সম্বরণের পরও দীর্ঘদিন অদ্বৈত আচার্য্য

নরদেহে অবস্থান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম স্তম্ভ-রূপে এই বৃদ্ধ আচার্য্যকে সসম্মানে বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়।

ভক্তজনচিত্তে আচার্য্যের সেই দিব্য রূপটিই এসময়ে ভাস্বর হইয়া উঠে, যে রূপটির ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রিয় সখা মুরারী গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করেন

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য।
ততোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য।
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু।...
তাঁর দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।

(চৈঃ মঙ্গল—লোচন)

শঙ্করদেব

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় নূতনতর ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয়। এই ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব---আরাধ্য পরম বস্তু শ্রীভগবান্ লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। জাতিবর্ণের পার্থক্য তাঁহার কাছে নাই। ভক্তি প্রেমের উপচার নিয়া, একান্ত শরণাগতি নিয়া, যে কোন শ্রেণীর সাধক তাঁহার আরাধনা করিতে পারে, পৌঁছিতে পারে তাঁহার দিব্যধামে। এই উদার সর্ব্বজনীন ভক্তি-ধর্ম্মের আলোকধারা অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সর্ব্ব স্তরে; আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়া উঠে নূতনতর মানবতা-বোধ।

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তৎশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, তেলেগু দেশে বল্লভাচার্য্য, গৌড় ও উড়িষ্যায় চৈতন্য-মহাপ্রভু এই যুগে উৎসারিত করেন উদার ভক্তিধর্ম্মের এক একটি বিপুল তরঙ্গ। আসামের বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবও ছিলেন ইঁহাদের মত ভক্তি-আন্দোলনের এক পথিকৃৎ।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদেবের উপাস্য। এই উপাস্যকে জন-মানসের সম্মুখে তিনি স্থাপিত করেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে। শ্রদ্ধাভক্তি, শরণাগতি ও নামধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হয় তাঁহার সাধনপূত জীবন ও বাণীর মাধ্যমে। তৎকালীন আসামের অনগ্রসর এবং বহুবিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে তিনি আনয়ন করেন ভক্তি-প্রেমের বিপুল জোয়ার। সর্ব্ব ভারতের ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজ্য আসামের আত্মিক যোগবন্ধনটিও গড়িয়া উঠে শঙ্করদেবের সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাহিত্যের মধ্য দিয়া।

শঙ্করের জন্মস্থানের নাম আলিপুখুরি। বর্ত্তমান আসামের নওগাঁ শহর হইতে ষোল মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে

প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতার নাম কুসুমবর, মাতা—সত্যসন্ধ্যা। পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ, সেবা-পূজার মধ্য দিয়া ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ তাঁহারা পোষণ করিতেন।

সন্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সত্যসন্ধ্যার অন্তিম-কাল উপস্থিত হয়, ইষ্টবিগ্রহ শঙ্করের নাম জপ করিতে করিতে তিনি তনু ত্যাগ করেন। তাই তাঁহার নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় শঙ্কর। গৌরকান্তি, অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই শিশু, দর্শনমাত্রেই লোকের মন কাড়িয়া নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের ভার সযত্নে গ্রহণ করেন তাহার বৃদ্ধা পিতামহী।

শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ধনী সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী। তাঁহাদের বলা হইত শিরোমণি ভূঁইয়া, অর্থাৎ ভূঁইয়াদের মধ্যে ধনে মানে ও কীর্ত্তিকলাপে তাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সৎ কায়স্থ গৌড়দেশে নিয়া আসেন। এই কায়স্থদেরই কয়েকটি উত্তর পুরুষ পরবর্ত্তীকালে আসামে আসিয়া বসবাস করেন। আসামের অন্যতম রাজা দুর্লভনারায়ণ গৌড়ের অধিপতি ধর্ম্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কয়েকটি পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অনুমতি

---

১ অনেকের মতে, শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু আসামের ঐতিহাসিক স্যর এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম-সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহার ধারণা আরো ৩০।৪০ বৎসর পরে শঙ্করদেব ভূমিষ্ঠ হন।

অনিরুদ্ধ ছাড়া কোন অসমীয়া জীবনীকারই শঙ্করের জন্ম-সাল লিপিবদ্ধ করেন নাই। অনিরুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্করের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ, ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, শঙ্করদেবের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছিল, অহোম রাজা চুহ-মুঙ্ (১৪৯৭-১৫৩৯) এবং কোচরাজ নরনারায়ণের রাজ্যকালে (১৫৪০-১৫৮৪); সেই জন্য মনে হয় হয়তো প্রচলিত ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে অনিরুদ্ধ কথিত ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দকে শঙ্করদেবের জন্ম-সাল ধরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।—উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩।

দেওয়া হয়। তদনুযায়ী গৌড়রাজ একদল সদাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন। নবাগত ঐ কায়স্থদের মধ্যে কেহ কেহ নওগাঁ জেলার মৈরাবাড়ী অঞ্চলে নিজেদের বাসভূমি গড়িয়া তোলেন। আসামের রাজারা ইহাদের কর্ম্মদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া কোন কোন মৌজার শাসনভার অর্পণ করেন এবং ভূঁইয়া উপাধিতে ভূষিত করেন।

শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ চণ্ডী ভূঁইয়া ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর রাজধর প্রভৃতিও ছিলেন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী। নিজ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া শঙ্কর পয়ার ছন্দে তাঁহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিয়াছেন :

বরদয়া নামে গ্রাম শস্যে মৎস্যে অনুপাম
লোহিতার অতি অনুকূল।
সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাজধর
কায়স্থ কুল পদ্মফুল॥
তানে পুত্র সূর্য্যবর মহা বড় দেশধর
দানী মানী পরম বিশিষ্ট।
যার যশ এভো জলৈ জয়ন্ত মাধবদলৈ
দুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ॥
তানে পুত্র কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার
প্রসিদ্ধ কুসুম নাম যার।
তানে সুত শিশুমতি কৃষ্ণপায়ে করি নতি
বিরচিল শঙ্করে পয়ার॥

(১২০০১—২)

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষরা প্রতিষ্ঠাবান্ ভূম্যধিকারী ছিলেন। অনেকের মতে, তাঁহারা ছিলেন প্রতাপশালী বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শঙ্করের পিতা কুসুমবরের সময়ে পরিবারের পূর্ব্ব ধন-মানের গৌরব হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি একজন সম্পন্ন জমিদার এবং সদাচারী ও ধার্ম্মিক বলিয়া নিজ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন।

মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যত্নে যেমন লালিত হইতে থাকে, তেমনি তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থাও গোড়া হইতে করা হয়। নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই শঙ্করের চালচলন ও কথাবার্ত্তায় ফুটিয়া উঠে নানা বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্ব জন্মের শুভ সংস্কার নিয়া সে জন্মিয়াছে। সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামান্য মেধা ও প্রতিভা। এক একদিন বালকের প্রশ্নে ও কথাবার্ত্তায় ঝলাকয়া উঠে তাহার প্রতিভার দীপ্তি, বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত লোকেরাও ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যান। কবিতা রচনার শক্তিও স্ফুরিত হইতে দেখা যায় এই কচি বয়সেই। যুক্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই কিন্তু এই সময়েই সে রচনা করে তাহার প্রসিদ্ধ কবিতা—'করতল কমল কমলদল নয়ন।' সকলেই সোৎসাহে বলাবলি করিতে থাকেন,—'এ বালক বাক্‌দেবীর অনুগৃহীত, আশিস্ প্রাপ্ত, উত্তরকালে অবশ্যই এ প্রসিদ্ধি লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে।'

বারো বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভর্ত্তি করা হয় পণ্ডিতবর মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে এই আচার্য্য পারঙ্গম। কিশোর ছাত্রও তেমনি বিস্ময়কর ধীশক্তির অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠে। আচার্য্য মহেন্দ্র কন্দলী নিজে ভক্তিমান্ তাই ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহ বেশী। তাঁহার এই ভক্তি প্রবণতার প্রভাব কিশোর ছাত্র শঙ্করের উপরও বেশ কিছুটা আসিয়া পড়ে। নবীন ছাত্রের পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করিয়া ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া প্রবীণ আচার্য্যের হৃদয় আনন্দে গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

কয়েক বৎসর পরে শঙ্কর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু করেন হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর দর্শনের তত্ত্বালোচনা।

ভক্তি ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। শিক্ষক মহেন্দ্র কন্দলীর সান্নিধ্য ও প্রভাবও তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তরুণ পণ্ডিত শঙ্করের জিজ্ঞাসু মন

জীবনের দিক্‌দর্শন সম্পর্কে, পরমতত্ত্ব সম্পর্কে, এখনো স্থিরভূমি প্রাপ্ত হয় নাই, প্রত্যয় ও নিঃসংশয়তার ভিত্তি তাঁহার জীবনে গড়িয়া উঠে নাই।

মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা শঙ্করকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। পরম সত্যের পথসন্ধান ও আত্মিক উপলব্ধির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। দিনের পর দিন উঠে চিন্তার তরঙ্গরাশি,—জীব কোথা হইতে সংসারে আগত হয়, এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের কি সম্পর্ক, কোথায়ই বা তাহার যোগসূত্র? জীব ও ভগবানের মিলন কি সম্ভব? যদি সম্ভবই হয়, তবে তাহার পন্থা কি? কাহার সাধন প্রণালী তিনি অনুসরণ করিবেন, কোথায় সেই পরম কারুণিক দিক্‌দিশারী?

এই সময়ে কিছুদিনের জন্য এক পরিব্রাজনরত যোগীর সাহচর্য্য তিনি লাভ করেন। ইঁহার নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামের গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া নিয়া শুরু করেন যোগসাধনা।

শঙ্করদেবের প্রামাণিক জীবনচরিত-লেখক দৈত্যারি ঠাকুর এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

প্রাণ অপান সমান উদান
আদি করি বায়ুচয়।
বশ্য করিলন্ত, চলাইবে পাবন্ত
যি বায়ু যৈত লাগয়॥
বায়ুক ক্ষেপিয়া, উপাসে ধরিয়া
আসন ভিরি হরিষি।
থাকন্ত সদায়, সুনিশ্চয় কায়
দিন দুই চারি বসি॥

কিন্তু এই যোগসাধনার পথ বেশী দিন তিনি অনুসরণ করেন নাই। নিজ অন্তরের গভীরে অবগাহন করিয়া অচিরে বুঝিতে পারেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার দিকেই তাঁহার প্রধান প্রবণতা। ভক্তিপ্রেমের সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, এবং এই সংস্কারই অনিবার্য্য-রূপে এবার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাঁহার সাধন জীবনে।

অতঃপর কয়েকটি বৎসর শঙ্কর গভীরভাবে ভারতের পুরাণ-শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় নিবিষ্ট হন, ভক্তিধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে হন যত্নবান।

শঙ্করের তখন বাইশ বৎসর বয়স। মনে সঙ্কল্প স্থির করিলেন, এবার কিছুদিনের জন্য সারা ভারতের তীর্থ পরিব্রাজনে তিনি বহির্গত হইবেন। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুর পাদপীঠ গয়াধাম ও কৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সঙ্কল্প সাধনের পথে সেদিন বাধা পড়িয়া গেল। পিতা হঠাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থভ্রমণে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো।"

"আজ্ঞে হাঁ, মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছে"---সবিনয়ে শঙ্কর নিবেদন করেন।

"বাবা, এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু তার সময় তো এখন নয়, অনেক পরে। তীর্থ পরিব্রাজনের বয়স হয়েছে বরং আমার। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তুমি বয়সে নবীন, এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে অনেক কিছু কর্ত্তব্য। আগে সেসব সমাপন করো, তারপর তীর্থে বেরুবে।"

"কিন্তু বাবা, আমি যে—"

"না, আর কিন্তু-টিন্তু নয়। এ বয়সে তোমার তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে বেড়ানো চলবে না। হ্যাঁ, আমি স্থির করেছি, এবার তোমার বিবাহ দেবো। সুপাত্রীও পেয়েছি। বিবাহের পর তুমি সংসারী হও, প্রয়োজনীয় বিষয়-কর্ম্ম ছাখো, পিতা ও পিতৃপুরুষের বাঞ্ছিত পুণ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করো। তারপর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সব সমাধা ক'রে প্রবীণ বয়সে তীর্থভ্রমণ ক'রবে। এই আমি চাই।"

পিতার নির্দ্দেশ অমান্য করা চলে না। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করকে বিবাহ করিতে হইল। পত্নী সূর্য্যবতী যেমনি রূপবতী তেমনি সর্ব্ব গুণসম্পন্না, পতির উচ্চাদর্শ ও ধর্ম্মজীবনের সহায়িকারূপেই তিনি তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু শঙ্করের এই গার্হস্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, বিবাহের চার বৎসর পরে সূর্য্যবতী এক শিশুকন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতা কুসুমবরও প্রস্থান করেন পরলোকে।

পর পর এই দুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে, জীবনে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ।

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এই ইচ্ছাও এসময়ে তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নির্দ্দেশটিও স্মরণে আসিয়া যায়। 'সংসারের প্রধান কর্ত্তব্যগুলি সমাপন করার পর পরিব্রাজন বা তীর্থ দর্শন করবে' এই কথাটিই বিশেষভাবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তাই শঙ্করকে আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। অতঃপর কন্যা মনুর জন্য হরি নামক এক সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবককে পাত্ররূপে তিনি নির্ব্বাচন করিলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন। এবাব আসে শঙ্করের বিদায়ের পালা। বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয় জয়ন্ত ও মাধব দলই-কে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পরিব্রাজনে যাচ্ছি। সারা ভারতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে। পথে বিপদের অন্ত নেই, আর কোন দিন দেশে ফিরে আসবো কিনা তাও জানিনে। আমার কন্যা আর আত্মীয়-স্বজনেরা রইলো, তোমরা সতর্কভাবে তাদের দেখাশুনা করবে। আমার জমিদারী ও বিত্তবিষয় রক্ষণের ভারও রইলো তোমাদের ওপর। তোমরা আমার বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন; প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি নিয়ে আমার কর্ত্তব্য কাজ তোমরা চালিয়ে যাবে। শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বহু অনুরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

অতঃপর প্রায় বারো বৎসর তিনি আসামের বাহিরে নানা তীর্থে ও সাধনপীঠে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার অনুচরদ্বয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব।

শঙ্কর তীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রটিয়া গেল। আচার্য্য মহেন্দ্র কন্দলী তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন, 'বৎস, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভারতের বৈষ্ণব তীর্থগুলো পরিক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের। তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায়ও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

শিক্ষাগুরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন। আরো পনের ষোলজন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া গেল। এবার শুরু হইল তাঁহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থযাত্রা। শঙ্করের এই তীর্থদর্শনের বিস্তারিত তথ্য ও কাহিনী তাঁহার বিভিন্ন চরিতকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন।[১] যেসব বৈষ্ণবতীর্থগুলি এ-সময়ে তিনি পরিক্রমা করেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি।

সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহার পরিব্রাজনে রত থাকেন বারো বৎসর ব্যাপিয়া। এই দীর্ঘ বৎসরগুলি তিনি শুধু বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করেন নাই, যেখানে যে দেবমন্দির বা সাধনপীঠে গিয়াছেন সেখানকার সাধক ও শাস্ত্রবিদদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া প্রেম-ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়া সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে তিনি বাস করিয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বান্বেষী মন তৃপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানে।

এই সময়েই শঙ্করের জীবনে ঘটে বহুবাঞ্ছিত গুরুর আবির্ভাব। দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরু তাঁহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভক্তির সাধন পথ। বিদায়কালে নির্দ্দেশ দেন, "বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করি, শুদ্ধাভক্তির পথ অনুসরণ ক'রে তুমি ইষ্টলাভ করো। ভক্তির যে

১ শঙ্করের চরিতকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামচরণ ঠাকুর ও তৎপুত্র দৈত্যারি ঠাকুর, ভূষণ দ্বিজ, রামানন্দ দ্বিজ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি।

শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে, অচিরে তা সফল হয়ে উঠুক, চৈতন্যময় হয়ে উঠুক।"

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। একথা নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, "বৎস, বিধি-নির্দ্দিষ্ট বহু কাজ তোমায় সংসারে থেকে করতে হবে। সংসার জীবনে থেকে, সংসারকে ভগবৎ-সংসারে পরিণত করার কাজে তুমি আত্মনিয়োগ করো, এই আমি চাই। সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে, পরম কারুণিক বিষ্ণু বা তাঁর অবতার কৃষ্ণই হচ্ছেন মানবের উপাস্য, মানবের ইষ্ট। এই পরমপ্রভুর একান্ত শরণ নিয়ে, সর্ব্বত্র নামধর্ম্মের প্রচার করো, নামযজ্ঞ উদ্‌যাপন করো। নামী আর নাম অভেদ, এই পরম জ্ঞান ছড়িয়ে দাও আসাম রাজ্যের সর্ব্বত্র। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর তাঁর জীবন ও বাণীর ভাষ্যগ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমায় সহায় হবেন।"

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ও উদীয়মান্ ধর্ম্মনেতা। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের তীর্থ পরিব্রাজন এবং সিদ্ধ সাধুসন্ত ও তাত্ত্বিকদের সাহচর্য্য ও কৃপা তাঁহাকে পরিণত করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে। বৈষ্ণবীয় সাধনার দৃঢ়ভূমি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের অমৃতলোকের সিংহদ্বার।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আদিষ্ট কর্ম্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরী করেন নাই। সংসারী জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্ম্মে উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষ্ণের সংসারে পরিণত করিতে হইবে। তাই দ্বিতীয়বার তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন। আলিপুখুরির বসবাস উঠাইয়া দিয়া, নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নূতন ভবন ও প্রচার কেন্দ্র। শুরু করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান। নবদীক্ষিত শিষ্যদের সহায়তায় বরদোয়াতে একটি সত্র বা মঠ নির্ম্মিত হইল এবং প্রবর্ত্তিত হইল একটি নাম-ঘর। এই নামঘরে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গ্রাম সন্নিহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীর্ত্তনে ও নাম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দিন হইত নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

আচার্য্য জীবনের এই প্রথম পর্য্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া উঠেন শঙ্করদেব নামে, তাঁহার প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম অভিহিত হয় 'একশরণ ধর্ম্ম' নামে।

তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্মের মূল কথা,—এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হইতেছেন বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই অদ্বিতীয় পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একান্ত শরণ, উৎসর্গ করিতে হইবে মানবজীবন। শঙ্করের একশরণ ধর্ম্মে অপর উপাস্য বা ইষ্টের স্থান নাই। নিজের শুদ্ধাভক্তি ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, এককেন্দ্রিক রাখার জন্য একশরণীয়া ভক্তেরা কখনো অপর ইষ্ট বিগ্রহ বা দেবীর উপাসনা করিবে না, অপর দেবমন্দিরে যাতায়াত করাও চলিবে না। অন্যথায় ভক্তিসাধনা তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, পথচ্যুত।

"একশরণ ধর্ম্মে ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের মধ্যে কোন চাওয়া-পাওয়ার স্থান নাই, সুখ-সুবিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। ভক্ত ত্যাগতিতিক্ষা বরণ করিবেন আর ভগবান্ তাহার জন্য পুরস্কার বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য—ভক্ত সাধক ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা নিয়া দৃঢ়পদে, ধীরে ধীরে, অধ্যাত্ম-উজ্জীবনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেন, নূতনতর অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন প্রাণ সঁপিয়া দিবেন পরম প্রভুর শ্রীচরণে[২]।"

নামকীর্ত্তন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, বরদোয়ার সত্র ও নামঘরে ভক্ত নরনারীর ভীড়ের অন্ত নাই। চারিদিকে তখন শঙ্করদেবের নূতন ভক্তিধর্ম্ম নিয়া চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু শঙ্করদেবের মনে উৎকণ্ঠার অবধি নাই। যে মহান্ ঐশ্বরীয় কর্ম্ম তিনি উদ্‌যাপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভাবালুতা কিছুদিন পরে স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে।

১ শঙ্করদেব : বৈষ্ণব সেইন্ট্ অব্ আসাম—বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

২ শঙ্করদেব (চৈতন্য টু বিবেকানন্দ : অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ)—বাণীকান্ত কাকতি

তাছাড়া, তাঁহার নূতন ধর্ম্মের বিরোধী শক্তিগুলিও কম সক্রিয় নয়। শঙ্কর জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে তাঁহার ভক্তি আন্দোলনে টানিয়া আনিতেছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পাণ্ডাদের প্রাধান্য খর্ব্ব করিতেছেন। ইহার ফলে অচিরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত। এ সম্পর্কে অবহিত না হইলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বিপদ অনিবার্য্য।

এজন্য দরকার তাঁহার এই নূতন ভক্তিধর্ম্মের একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই তাঁহার প্রচারিত উদার ও সর্ব্বজনীন ভক্তি আন্দোলন স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিবে। এজন্য ভাগবত পুরাণের সাহায্য তাঁহাকে নিতে হইবে। ভাগবতের আলোকে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা ও অমৃতময় বাণীর নূতন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিস্তারিত করিতে হইবে তাঁহার এই নবধর্ম্ম। কৃষ্ণভক্তিকে তিনি ছড়াইয়া দিবেন সমাজের সর্ব্বস্তরে, একশরণীয়া ভক্তিধর্ম্মকে জনমানসে করিবেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাছাড়া, এই মহান্ কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চাই একটা দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ সংগঠন। স্থির করিলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত হইবে একটি করিয়া সত্র বা মঠ, এবং প্রতি শহরে জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে নামঘর। যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নির্ধন, শুদ্ধাচারী সাধক ও পাপাচারী পাষণ্ডীরা, সবাই মিলিতভাবে করিবে নামকীর্ত্তন, প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিবে পরম প্রভুর পুণ্যময় লীলাকথা।

প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বহুতর বিপদ ও বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু সব কিছুই তিনি অতিক্রম করেন আপন আত্মিক শক্তির বলে। ধর্ম্ম দেশ ও জাতির উজ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে তাঁহার জীবনের ঐশী নির্দ্দিষ্ট ব্রত।

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চলিয়াছে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও অবক্ষয়ের যুগ। সমগ্র আসাম বহুতর স্বাধীন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। দূর পূর্ব্বাঞ্চল চুটিয়াদের শাসনাধীন, দক্ষিণ-পূর্ব্বে রহিয়াছে কচারীদের অধিকার। ইহাদের আশেপাশের স্থান ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ভুঁইয়াদের কর্ত্তৃত্বাধীন। দূর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল কামতা রাজ্যের শাসন। সে-সময়ে উহা কুচবিহার নামে পরিচিত। কোচ রাজারা সেখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অবশিষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজের অধিকারে। আসামের জনজীবন এইরূপ বহু প্রতিযোগী রাজশক্তির দ্বারা বহু-বিচ্ছিন্ন।

এসময়কার ধর্ম্মীয় জীবনে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব—তান্ত্রিক ধর্ম্মের। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রধানতঃ সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ এই ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। খণ্ডজাতীয় লোকেরা হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত প্রেত ও বৃক্ষপূজায়ই তাহারা বেশী বিশ্বাসী।

সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে তন্ত্রধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের প্রচলন রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই তন্ত্রধর্ম্ম এবং সাধনার মধ্যেও এসময়ে দেখা দিয়াছে নানা অনাচার। তন্ত্রের উচ্চতর নিগূঢ় সাধন সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত ধর্ম্মের নামে লিপ্ত আছেন পাপকর্ম্ম, ভোগলিপ্সা ও ব্যভিচারে।

এই প্রসঙ্গে আসামের তন্ত্রপীঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু দেখিয়া নেওয়া দরকার। পৌরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামরূপ রাজ্য, রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে—বর্ত্তমানে যাহা গৌহাটি নামে পরিচিত। প্রাচীনকাল হইতেই এখানে তন্ত্রধর্ম্মের প্রচলন ছিল। রাজারা ও উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন তন্ত্রমতেরই ধারক বাহক। নীলাচল বা কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার পীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানই উদ্বুদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, অমাত্য ও আচার্য্যদের। মহাভারত এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরাণশাস্ত্রে, বিশেষত কালিকা পুরাণে, কামরূপের তান্ত্রিকতার নানা কাহিনী পাওয়া যায়।[১]

এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ এথিক্স্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন (২-১৬৩)

প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউএনথ্‌ সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা সমকালীন আসামের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা তথ্য পাই। কুমার ভাস্করবর্ম্মণ তখন কামরূপের রাজা। রাজা ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিয়া গিয়াছে ধর্ম্মীয় গণ্ডীর বাহিরে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে রণকুশল অহোমরা বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে; কামরূপের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় ছেদ পড়িয়া যায়।

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপত্তি। ইহারা জাতিতে শান্‌, উত্তর বর্ম্মা হইতে পাতকই গিরিপথ দিয়া ইহারা অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে। শান্‌ জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তর্ঁ্যা দ্য লাকুপ্‌রি বলেন, এই জাতি মঙ্গোল, নেগ্রিটো ও চীনেদের এক সংমিশ্রণ। যুদ্ধকুশল, দৃঢ়চেতা ও পরিশ্রমী বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। কিন্তু সুজলা সুফলা উপত্যকায় বাস করার পর কয়েক শতকের মধ্যে ইহারা শক্তিহীন ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠে। অহোম রাজারা এবং সাধারণ অহোমরা প্রাচীন কামরূপীয় জাতিগুলির সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং কালক্রমে তাহাদের জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়।

অহোম রাজারা খুব ইতিহাস-সচেতন, তাঁহাদের সময়কার লেখা বুরুন্‌জী-তে রাজশক্তির উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে। অহোম রাজাদের প্রায় সবাই তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী কামাখ্যার উৎসাহী ভক্ত ছিলেন। আসামের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে ইঁহাদের অবদান যথেষ্ট।

ষোড়শ শতকে, বৈষ্ণব আচার্য্য শঙ্করদেবের অভ্যুদয় কালে পশ্চিম আসামে রাজত্ব করিতেছিলেন কোচ রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮–১৫৮৪), আর পূর্ব্বাঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছিল অহোম রাজা চুহুমুঙ-এর (হিন্দু নাম—স্বর্গনারায়ণ) অধিকারে।

নরনারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি চিলা রায়ের অসামান্য শৌর্য্য ও দক্ষতায় রাজ্যের প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়, আর নরনারায়ণ নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তন্ত্রধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে। মুসলমান আক্রমণকারীরা কামাখ্যা মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজা নরনারায়ণ এটি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন এবং সাড়ম্বরে এই ইষ্টদেবী বিগ্রহের করেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আসামের তান্ত্রিকদের আচার আচরণে এসময়ে নানা দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করে, শক্তি সাধনা ও শক্তি আরাধনার মধ্যে দেখা দেয় পাপের পঙ্কিলতা। সমকালীন এই অবক্ষয়ের চিত্রটি ঐতিহাসিক গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট : "এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অন্যতম প্রথা ছিল জীবহত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকা ; ইহাতে মানুষ-বলিও বাদ দেওয়া হইত না। কালিকা পুরাণে বলা হইয়াছে, সেই মানুষকেই বলিরূপে উৎসর্গ করা যায়, যার দেহে কোন খুঁত নাই। এ ছাড়া ঐ বলিযোগ্য মানুষটিকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়া শিরশ্ছেদ করা হইবে, কিভাবে রুধির রাখিতে হইবে, এসব অনেক কিছু খুঁটিনাটি তথ্যও ঐ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

"কামাখ্যা দেবীর নূতন মন্দিরের যেদিন উদ্বোধন করা হয়, সেই উৎসব দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বলিদান। এ উৎসবে অন্যূন একশত চল্লিশটি মানুষের মস্তক খড়্গাঘাতে ছেদন করা হয় এবং এই রক্তাপ্লুত মস্তকগুলি তাম্রপত্রে সজ্জিত করিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয় দেবীর চরণে। হাফ্‌ৎ ইক্‌লিম-এর বর্ণনা অনুসারে, এই সময়ে কামরূপে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহারা স্বেচ্ছায় দেবীর বলিরূপে নিজেদের নিবেদন করিত—ইহারা অভিহিত হইত 'ভোগী' নামে। যেদিন তাহারা ঘোষণা করিত, দেবী তাঁহাদের আহ্বান জানাইয়াছেন এবং বলিরূপে উৎসর্গীত হইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত, সেই দিন হইতে তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোন বাধা দেওয়া হইত না। সে অঞ্চলের যে কোন রূপসী নারীর দেহ তাহারা নির্ব্বিবাদে সম্ভোগ করিতে পারিত। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে কাঠগড়ায়

ফেলিয়া করা হইত তাহাদের মুণ্ডচ্ছেদ এই সময়কার একদল তান্ত্রিকের কাছে নানারূপ ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোন কোন ভবিষ্যৎবক্তা ও তান্ত্রিক অভিচারকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহ ছেদন করিয়া ভ্রূণ বাহির করিতেন এবং রহস্যজনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিত। এইসব তান্ত্রিকেরা চক্রে বসিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো যেসব জঘন্য কুক্রিয়া করিত তাহা প্রকাশযোগ্য নয়।[১]

অধঃপতিত ও তান্ত্রিকদের মণ্ডলীগুলি পর পর বহু অসমীয়া রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয়। এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হৃতগৌরব ও পতনশীল, এবং এই রাজবংশগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য সমাজ হইতে। ইহাদের ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকেরা সমকালীন আসামের জনজীবনে সৃষ্টি করিয়াছিল রহস্যময় বিভীষিকা ও নৈরাশ্যের।[২]

শঙ্করদেবের প্রচারিত উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং সুস্থ নীতিধর্ম্মভিত্তিক সামাজিক জীবন গঠনের আহ্বান এসময়ে আগত হয় দেবতার আশীর্ব্বাদ রূপে। নিপীড়িত, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, মানুষের সম্মুখে একশরণ ধর্ম্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহামন্ত্র।

ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে স্থাপন করিতে হইবে, জনমানসে ব্যাপকভাবে ইহার তত্ত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, এজন্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি সহজবোধ্য ও সুললিত অসমীয়া অনুবাদ। শঙ্করদেব নিজে প্রতিভাধর সাহিত্যিক, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিধর্ম্মের আকর এবং প্রকরণ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডও ইতিপূর্ব্বে তিনি পাঠ করিয়াছেন। তাই তাঁহার পক্ষে একটি অসমীয়া ভাগবত রচনা করা খুব কঠিন কাজ নয়।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পাঁচশত

---

১ হিস্টরী অব আসাম: স্যর এডওয়ার্ড গেইট।

২ ই-আর ই: আসাম—অ্যাণ্ডারসন।

বৎসর পূর্ব্বে, বিশেষত তন্ত্রধূত আসাম রাজ্যে, ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। শঙ্করদেব বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাঁহার সকল কিছু সমস্যার চমৎকার সমাধান হইয়া গেল।

বরদোয়ার সত্রে সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া শঙ্করদেব বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পুরীধাম হইতে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া শঙ্করদেবের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ যুক্তকরে সবিনয়ে কহিলেন, "আমার নাম জগদীশ মিশ্র, নিবাস মিথিলার ত্রিহুতে। আপনার দর্শনের জন্যই আমি এতটা দূরের পথ এসেছি।"

শঙ্করদেব সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা জানান। মধুর কণ্ঠে কহেন, "আপনার আগমনে আমরা সবাই পরম আনন্দিত। আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি। কিন্তু কি কারণে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, দয়া ক'রে তা প্রকাশ করুন।"

"তবে শুনুন। অন্তরে আমার সঙ্কল্প ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, প্রভু জগন্নাথদেবের সম্মুখে ব'সে গোটা ভাগবত আমি পাঠ ক'রে শোনাবো। সে পবিত্র কাজ শুরুও করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ—'ওহে মিশ্র, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। কিন্তু আরো বেশী প্রসন্ন হবো একটি কাজ করলে। অচিরে তুমি আসামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার পরম ভক্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে বসে পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ করো।' এই আদেশ পাবার পর আর আমি দেরী করি নি। গ্রন্থের পেটিকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

একি অদ্ভুত কৃপালীলা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের! অন্তর্যামী শঙ্করদেবের অন্তরের কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব করেন নাই।

অশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্করদেব উঠিয়া মিশ্রজীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। পরদিন হইতে শুরু হইল প্রভুর আদিষ্ট ভাগবত পাঠ।

কথিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ মিশ্র বৎসর খানেকের বেশী জীবিত থাকেন নাই। মনে হয় যেন প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন করাই ছিল এই পরম ভক্তের জীবনের প্রধান ও পবিত্রতম কাজ। সে কাজ সমাপ্ত হইবার অল্পকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পড়িয়া গেল।[১]

সাধক শঙ্করদেব এবার দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড এবার তিনি ভাষ্যসহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলেন। তারপর শুরু করিলেন অসমীয়া ভাষায় এবং সুললিত কাব্যছন্দে তাঁহার মহান্ গ্রন্থের রচনা। তাঁহার এই অসমীয়া ভাগবত একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়া ভক্তের প্রাণে কৃষ্ণরস সিঞ্চন করিয়াছে, তাহাদের জীবনে ভক্তিধর্ম্মের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি ইহা গণ্য হইয়াছে অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উৎসরূপে। রাজ্যের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান হইয়াছে সুদূরপ্রসারী।

অসমীয়া বৈষ্ণব শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রতিবেশী, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রায় সমকালীনও বটে। উত্তর-জীবনে শঙ্করদেব একবার তাঁহার বহু ভক্তশিষ্যসহ তীর্থ দর্শনের কালে প্রভু চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়ীয় মতবাদ দ্বারা তেমন বেশী প্রভাবিত হয় নাই।

নিজের ধর্ম্মমত প্রচারে এবং অসমীয়া ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তি ও একান্ত শরণাগতির উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী ; দাস্য-ভক্তিভাবের দিকেই তাঁহার প্রধান প্রবণতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত তিনি মাধুর্য্যরসের তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেন নাই।

ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে— রসিকশেখর কৃষ্ণ কেলি করিতে করিতে হঠাৎ কোন এক গোপীকে নিয়া অন্তর্দ্ধান হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই গোপীকে চিহ্নিত করিয়াছেন রাধা বলিয়া।

১ শঙ্করদেব : বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

শঙ্করদেব কিন্তু ইহাকে রাধা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই কৃষ্ণের আরাধিকা কোন গোপীর কথাই তিনি বলিয়াছেন।

কৃষ্ণকে গোপীরা বনাঞ্চলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সেস্থলে কিন্তু তাঁহাদের মুখ দিয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কথা বাহির করেন নাই, বরং চমৎকার রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শুদ্ধাভক্তি ও দাস্য ভাব। গোপীরা বলিতেছেন:

আকে পাইলে পাতকিয়ো সংসার নিস্তার।
শুদ্ধ হঞুঁ বুলি ব্রহ্মা হরো শিরে ধরে॥
আইস ঘসো এহি ধূলি আমিয়ো মাথাত।
হুয়া শুদ্ধ মাধবক দেখিবো সাক্ষাত।
জগত দুর্লভ কৃষ্ণ পদরেণু মাখি।
হেনোবা পবিত্র হুয়া কৃষ্ণমুখ দেখি॥

—এসো আমরা কৃষ্ণের সেই পদধূলি মাথায় মাখি, যার মহিমায় সংসারের পাতকীরা সংসার থেকে পায় নিস্তার, যা মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হন ব্রহ্মা আর হর, এ ধূলি মাথায় নিলে আমরা হবো পরিশুদ্ধ, সাক্ষাৎ মাধবের পাবো দর্শন।

দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের তুলিকায় গোপীরা চিহ্নিত হইয়াছেন দাস্যভক্তির সংবাহিকা রূপে, মধুর রসের দ্যোতনা তাঁহাদের মধ্যে নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিবাদের আরো পার্থক্য আছে। গৌড়ীয়েরা জপ ও কীর্ত্তন করেন 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া বৈষ্ণবেরা স্মরণ ও মনন করেন চারি নাম।

"সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মে রূপের ও রসের উপাসনা। ইহাতে নিরাকার ব্রহ্মের স্থান নাই। কিন্তু শঙ্করদেব তাঁহার ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

প্রণত তারণ নারায়ণ নিরাকার
কৃষ্ণের চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

রাসলীলা শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন যে. কৃষ্ণ কথামৃত কর্ণ ভরিয়া পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাভ হইবে—

"মোক্ষক্ষেবে পাইবা পাপ কারয়া নির্যাল .
কৃষ্ণকথামৃত কর কর্ণভবি পান[১] ."

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই মতবাদ সদাই অতিশয় সতর্কভাবে পরিহার করিয়া চলেন।

শুদ্ধাভক্তির ব্যাখ্যায় শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবতের স্থানে স্থানে কিন্তু গোপীদের প্রেম-মধুর ভাবটিও অতি মনোরম ভাষায় এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য-সুষমা ও প্রেমরসের অপূর্ব্ব সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে। শঙ্করদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের সঙ্গীত অতি মনোরম :

পরম মোহন বংশী যাও চুম্বি তোলৈ নাদ
বঢাবয় সম্যকে সুরতি !
মহা মহা সার্ব্বভৌম বাজারো সুখক লাগি
যাক দোখ না যাই আউর মতি ॥
লোকর সমস্ত শোক দু:খ-ভয় বিনাশয়
দরশন মাত্র কতে যাক
জগতের মনোনিত হেনয় অধরামৃত
দিয়া আমি জীযায়ো আমাক ॥

(ভাগবত—১১৯-২৮)

শঙ্করদেব ভক্তির কথা, সাধনার কথা বলিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই। ভক্তিধর্ম্মের যে নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-সাহিত্য ও উপদেশের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নাই।

১ অসমীয়া ভাগবত ও শঙ্করদেব, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩,— ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

"জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ—ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কেননা, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। তাই স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অভেদ ; কিন্তু জীবাংশে মায়া বর্ত্তমান এবং ঈশ্বর মায়াতীত। এই নিমিত্ত ভেদজ্ঞানও বর্ত্তমান। এ বিষয়ে তিনি ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়া শ্রীশঙ্করদেবের মতকে 'ভেদাভেদ'-বাদও বলা যায়। ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করদেবের আদর্শ স্পষ্টতর গীতোক্ত 'পুরুষোত্তম'। ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে স্বতন্ত্র নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষোত্তমই অনন্ত নামরূপী ভগবান্। নাম-ধর্ম্মের ইহাই এক বিশেষত্ব[১]।"

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে শঙ্করদেব বরদোয়ার বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রতিবেশী কচরী-রাজ ও তাহার দুর্দ্ধর্ষ প্রজারা বার বার এ অঞ্চলে হামলা করিতে থাকে। এই উপদ্রব ও অশান্তি এড়াইবার জন্য শঙ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত করেন। তারপর স্থায়ীভাবে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বসবাস করিতে থাকেন ধুয়াহাটাতে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মজুলি দ্বীপের এই স্থানটি যেমনি শান্তিপূর্ণ ও মনোরম, তেমনি শস্য-শ্যামল। এই স্থানে বসিয়া আপন উদার ভক্তিধর্ম্ম তিনি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন।

ভাগবত পুরাণ শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাভরে তিনি বলিয়াছেন

পুরাণ সূর্য্য মহা ভাগবত
বেদান্তরো ইতো পরমতত্ত্ব'

এই পরমতত্ত্বকে অধিগত করিতে হইবে শরণাগতি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সহায়ে। বৈষ্ণব সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্তির সহায়ক এই শ্রদ্ধাভক্তির গুণ-কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

১ শ্রীশঙ্করদেব ও নামধর্ম্ম, উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ;—সত্যেন্দ্র শর্ম্মা রায়।

প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে ভজন করে
ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে,
একবারে মিটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন।
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভক্তি,
দেহাত্মক বুদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত,
হৃদয়ে তাঁর স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে
প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের মাধুর্য্য-মূর্ত্তি।
ত্রয়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীবনে,
ক্ষুধার্ত্ত অভাগার কাছে
এক-এক মুষ্টি অন্ন, হয়ে উঠে পরমান্ন।
প্রতি গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্টি
হে রাজন্, প্রেম-ভক্তির পেলে শুধু একটি কণা,
জীবনের পরম ক্ষুধার হয় চিরনিবৃত্তি।

(নিমি নব সিদ্ধ সম্বাদ)

শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাহিনীর বিন্যাস, তত্ত্বের ব্যাখ্যান, কবিত্ব ও পদ-মাধুর্য্যের লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। বহু প্রতিভাধর অসমীয়া পণ্ডিত ও ছাত্র ভাগবত পুরাণে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

শঙ্করের জীবনীকার ভূষণ দ্বিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কণ্ঠভূষণ নামে এক অসমীয়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কিছুদিনের জন্য বারাণসীতে গিয়াছেন। আশ্রয় নিয়াছেন তিনি ব্রহ্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদান্তীর চতুষ্পাঠীতে। একদিন শাস্ত্রতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী শ্রীমদ্‌ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ টানিয়া আনিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, ছাত্রদের অনেকেই ভাগবতের এই শ্লোকটির মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিতেছে না, চুপ করিয়া তাহারা বসিয়া আছে। এমন সময়ে অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কণ্ঠভূষণ, উঠিয়া দাঁড়ান, শ্লোক কয়টির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন।

ব্রহ্মানন্দজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, ভাগবত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছো তা প্রশংসনীয়। বলতো, কোথায় তুমি এসব শিখলে ?"

কণ্ঠভূষণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু বৈষ্ণব আচার্য্য শঙ্করদেবের রচিত অসমীয়া ভাগবত আমরা পাঠ করতে অভ্যস্ত। তাই এই শ্লোক কয়টির তত্ত্ব আমার অজানা নয়।"

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব আখ্যান ও উপকথা নিয়া শঙ্করদেব অসমীয়া ভক্তদের জন্য ছোট বড় বহুতর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আসামের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এগুলি পরম সম্পদরূপে গণ্য।

শঙ্করদেবের কীর্ত্তন তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমনি পরিচয় দেয় অসামান্য কাব্য প্রতিভার। এই সুললিত কীর্ত্তনে প্রেমভক্তি লীলার নানা অনুভূতি—মিলন বিরহ, আনন্দ দুঃখ, রোষ ও ক্ষমা প্রভৃতির অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, শঙ্করদেবের কীর্ত্তন সকল বয়সের শ্রোতাদেরই আনন্দ দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। শিশুরা কীর্ত্তনে বর্ণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকৃষ্ট হয়, যুবজনেরা মুগ্ধ হয় কবিত্বের মধুর রসে, আর প্রবীণেরা তৃপ্তি লাভ করেন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যানে।

একটি মনোরম কাব্যকাহিনীর বর্ণনায় বৈষয়িক সম্পদের তুচ্ছতা ও আনন্দের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব বলিতেছেন—

তিন লোকে রয়েছে কত ধন সম্পদ,
রয়েছে দিব্য রূপলাবণ্যবতী কত নারী—
রাজ অট্টালিকা আর রাজকোষের রত্ন,
কিন্তু এত কিছু প্রাপ্তির পরেও কি
নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা ?
গয় আর পৃথুর মত রাজার ধনতৃষা
হয় কি কখনো বিদূরিত ?

সপ্তদ্বীপ পদানত করেছেন অবলীলায়,
কিন্তু বাসনা জয়ে তাঁরা হয়েছেন ব্যর্থ।
ইন্দ্রিয়কে যে করে বশীভূত
হৃদয়ে যার নেই তৃষ্ণা আর আর্ত্তি,
দিব্য আনন্দের সেই যে শুধু অধিকারী।
লোভ আর আসক্তি যদি না হয় সংযত
তিন ভুবনের সম্পদেও আসবেনা তো সন্তুষ্টি।

(বালী ছলন—শঙ্করদেব)

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগীত বা ভজন-সঙ্গীত। এই বরগীতগুলিতে ছড়ানো রহিয়াছে আত্মিক অনুভূতি, পরমার্থ তত্ত্ব ও ভক্তহৃদয়ের আর্ত্তি।

প্রথম জীবনের একটি বরগীত-এ শঙ্করদেবের শরণাগতির মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আমরা পাই। এই ভজনগীতটি তিনি রচনা করেন হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে বসিয়া। তিনি গাহিয়াছেন—

মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীরাম-চরণে,
দেখছো না কি—অন্ত আসছে এগিয়ে?
আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষীণ
জীবনদীপ অচিরে হবে নির্ব্বাণ,
কাল-ভুজঙ্গ এগিয়ে আসে ঐ প্রতিদিন,
—মৃত্যু নিয়ে আসে সর্ব্ব বিনষ্টি।
এই ভঙ্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত,
তাই মন মোর ভেদ করে মায়াজাল,
শরণ নাও শ্রীরাম-চরণে।
হে দুর্ভাগা মন, তুমি যে অন্ধ,
বিষয়-ধাঁধায় মরছো তুমি ঘুরে ঘুরে।
জেগে ওঠো তামসিক সুপ্তি থেকে,
জেগে ওঠো, ভজ এবার শ্রীগোবিন্দ।
হে মন, শঙ্কর বলছে দৃঢ়স্বরে,
রাম চরণ বিনা নাই কো তোমার গতি।

আর একটি বরগীত-এ পরমপ্রভুর কাছে ভক্ত শঙ্করদেব জানাইতেছেন তাঁহার হৃদয়ের আকুতি, মাগিতেছেন পরমাশ্রয় :

হে প্রভু নারায়ণ,
চরণে তোমার এই প্রার্থনা আজ মোর,
বিষয়-বিলাস-পাশ থেকে দাও মুক্তি।
নাসিকা মোর সুগন্ধের জন্য লুব্ধ,
শ্রবণ মাগে সুমধুর নারীকণ্ঠ,
নয়নদ্বয় হয়েছে অধীর
দেহের রূপ আর স্পর্শসুখের লাগি,
তবে কি ক'রে ক'রবো তোমার ভজন ?
কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান—
এই সব মহাশত্রু করেছে আমায় বেষ্টন।
শঙ্কর কহে আকুল স্বরে,
হে প্রভু, হে আমার গোপাল,
তোমার এই দীন দাসকে
কে বাঁচাবে এই শত্রুদলের হাত থেকে ?

অংকিয় নাট এবং ভাওনা আসামের ধর্ম্ম সংস্কৃতিময় জীবনে শঙ্করদেবের আর দুইটি বড় অবদান। সঙ্গীতময় নাট্য অভিনয়, ধর্ম্মীয় কাহিনীর রূপায়ণ ও সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় এই অভিনয় জনচিত্ত জয় করিয়াছে এবং শত শত বৎসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবাহিত করিয়াছে ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মহলে, দূর-দূরান্তের জনপদে ও শহরে, এই অংকিয় নাট আর ভাওনা কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণকাহিনীর অমৃত স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে,—শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মকে করিয়াছে সর্ব্বজন-বোধ্য, সর্ব্বজনপ্রিয়।

শঙ্করদেবের প্রধান ভক্ত মাধবদেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "ইতিপূর্ব্বে প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হতো শুধু স্বর্গের সীমানার ভেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন শক্তিবলে ভেঙে দিলেন

সেই তটিনীর তটভূমি, তাইতো তার 'অমিয়-ধারা আজ মর্ত্তের দিকে দিকে হচ্ছে বিস্তারিত।"

ধূয়াহাটাতে শঙ্করদেব তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, অসমীয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে উভয়ের এই সাক্ষাৎ স্মরণীয় হইয়া আছে।

লখিমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ বয়সেই শাক্ত শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন, তান্ত্রিক আচার্য্যদের আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও অর্জ্জন করেন দক্ষতা।

মাধবদেবের জননী একসময়ে খুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন, চিকিৎসা নানা রূপই করা হয়, কিন্তু রোগিনীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না। মাধবদেব অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়া উঠিলে, দেবী-বিগ্রহের প্রীত্যর্থে একটি ছাগশিশু বলিরূপে প্রদান করিবেন।

জননী কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। এবার প্রতিশ্রুত বলিদান সম্পন্ন করিতে হইবে। মাধবদেবের ভগ্নিপতির নাম গয়াপানি, তিনি শঙ্করদেবের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। পারিবারিক অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্নিপতির উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহাকে কহিলেন, "ভাই, তুমি খোঁজখবর করে, বলিদানের উপযোগী নিখুঁত একটি ছাগশিশু আমায় এনে দাও। দেবীর কাছে যে মানৎ করেছি তাড়াতাড়ি তা আমায় রক্ষা করতে হবে।"

গয়াপানি শ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, "তুমি দেখছি, মহাশক্তি জগজ্জননীকে ছাগশিশুর কচি মুণ্ডু খাইয়েই সন্তুষ্ট করতে চাও। পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে, এসব কি করছো, বলতো ?"

মাধবদেব তো মহা ক্রুদ্ধ। কহিলেন, "শাক্তধর্ম্ম আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। এর মর্ম্ম তুমি বুঝবে কি ? তোমার গুরু শঙ্করদেবই যে তোমার মাথাটি গুলিয়ে দিয়েছে। ছাখো, আমাদের দেবী যেমন জাগ্রত, তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানও তেমনি সদ্য ফলপ্রদ। তোমাদের

বৈষ্ণবেরা যত লাফালাফি করুক আর যত নেচে গেয়েই বেড়াক, দেবতার আসন তাতে টলে না।”

গয়াপানি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমার জন্ম সত্যিই দুঃখ হয়। ধর্ম্মের প্রাণবস্তু কি তা জানলে না, ভগবান্ জীবের প্রেম চান—না ছাগলের রক্ত চান, তা বুঝতে চাইলে না। অনেকবার তো বলেছি, চলো আমাদের গুরু শঙ্করদেবের কাছে, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি তা জানতে পারবে।”

অনেকদিনই মাধবদেব ভগ্নিপতির মুখে একথা শুনিয়াছেন। আজ তাঁহার জেদ চাপিয়া গেল। কহিলেন, “বেশ, চলো তোমার গুরুর কাছে। শাক্তধর্ম্ম বড় না বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়, তার বিচার আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে এসেছি। আজ আমি তাঁকে যাচাই ক'রে দেখবো, আহ্বান করবো তর্কবিচারে।”

অতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে। আত্মপ্রত্যয়ের সুরে মাধবদেব কহেন, “আচার্য্য, আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, আমি শুনেছি। নূতন ভক্তিধর্ম্ম আপনি আসামে প্রচার করেছেন এবং জাতিভেদ ও অধিকারীভেদ না মেনে নির্ব্বিচারে দিয়ে চলেছেন নামমন্ত্র। কিন্তু এতো শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র ও পার্ব্বত্য জাতি, সবাইকে এক ক'রে দিলে তো এই সুপ্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচানো যাবে না। সারা দেশ তলিয়ে যাবে রসাতলে। আপনি আমার সঙ্গে বিচারসভায় বসুন। যদি আমি পরাস্ত হই, শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো। আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে।”

“ধর্ম্ম রসাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হচ্ছে বলেই তো আমার এই উদার সর্ব্বজনীন ভক্তিধর্ম্মের প্রচার আমি প্রাণপণ প্রয়াসে করছি।” সহাস্যে উত্তর দেন শঙ্করদেব।

“যাই হোক, স্থানীয় বিদ্বান্মণ্ডলীকে ডাকুন। তাঁদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হোক আমাদের আজকের তর্ক যুদ্ধ। দেখা যাক, কার মতবাদ জয়ী হয়।”

শঙ্করদেব এই দ্বন্দ্বের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন সমাগত শাস্ত্রবিদ্ ও সুধীজনের সম্মুখে শুরু হইল তত্ত্ব বিচার।

শঙ্করদেব সর্ব্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাছাড়া, নূতন ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া আসামের শাক্ত ও তান্ত্রিকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইবে, এজন্য শাক্ত শাস্ত্র তিনি অভিনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন। সর্ব্বোপরি ভারতের ভক্তি-আন্দোলনগুলির নিহিত তত্ত্ব তাঁহার অধিগত।

বিচার সভায় প্রথমে তিনি শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের যুক্তি-তর্কগুলি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার নব ভক্তিবাদ। হিন্দু শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে ভক্তিবাদের সমর্থক অজস্র শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

সুগৌর কান্তি, সমুন্নত বপু, পরম প্রশান্ত, ভক্তি-আন্দোলনের এই বর্ষীয়ান্ নেতার ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে তাহা কে জানে! বিচার বিতর্কে দক্ষ এবং আপন পাণ্ডিত্যে চির-আস্থাবান্ মাধবদেব সব কিছুর খেই হারাইয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে শঙ্করদেব দিব্য আবেশে উদ্দীপিত হইয়া আবৃত্তি করিলেন, ভাগবতের সেই মহান্ ভক্তি-রসাত্মক শ্লোকটি, যাহার মর্ম্মকথা :—

> তরুর মূলে সিঞ্চন ক'রো স্নিগ্ধ সলিল,
> তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশক্তি
> তরুর যত শাখা আর পত্র পল্লব।
> জঠরে প্রদান কর ভোজ্য বস্তু—
> সারা শরীর ও ইন্দ্রিয় তোমার হবে প্রাণবন্ত।
> তেমনি প্রভু অচ্যুতের চরণে ঢালো ভক্তিরস,
> সর্ব্ব দেবদেবী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট।

আবেগকম্পিত স্বরে, করজোড়ে মাধবদেব কহিলেন, "আচার্য্য আপনার মাহাত্ম্য আপনার ভক্তিধর্ম্মের মাহাত্ম্য আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি আপনার সাধনোজ্জ্বল

তত্ত্ব ব্যাখ্যানে! আজ থেকে আপনার চরণে আমি শরণ নিলাম। এখন থেকে সারা আসাম রাজ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করা হবে আমার জীবনের প্রধান ব্রত।"

প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন প্রতিভাধর পণ্ডিতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাঁহার 'একশরণ' মণ্ডলীতে।

শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কন্যার সঙ্গে। গুরুর আশ্রয় লাভের পর মাধবদেব সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, গার্হস্থ্য আশ্রমে তিনি আর প্রবেশ করিবেন না, বৈষ্ণবীয় সাধনায় এ জীবন উৎসর্গ করিবেন, একান্তভাবে গুরুর ভক্তি-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ।

নবীন শিষ্য মাধবদেবকে গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করানোর জন্য শঙ্করদেব ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মাধবদেবকে রাজী করানো যায় নাই। ত্যাগ-তিতিক্ষাময় বৈরাগীর জীবনই তিনি নিজের জন্য চিরতরে বাছিয়া নেন।

উত্তরকালে বহু বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই বৈরাগ্যপূত, ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ করেন। এই বৈরাগী সাধকেরা সত্রসমূহের পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কেওয়ালিয়া (চিরকুমার) বৈষ্ণব সাধক রূপে ইহারা পরিচিত হইয়া উঠেন।

মাধবদেবের আগমনে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেক বেশী শক্তিশালী হয় এবং মাধব গণ্য হন তাঁহার প্রধান শিষ্যরূপে। উত্তর-কালে অসমীয়া বৈষ্ণবদের এক প্রখ্যাত নেতা বলিয়া মাধবদেব কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরেও মাধবদেব তাঁহার অসামান্য সংগঠন শক্তি নিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জীবন সাধন করেন, নিজস্ব সাধন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভক্তি-আন্দোলনের স্রোতকে আরও বেগবতী করিয়া তোলেন।

অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্করদেবকে লিপ্ত হইতে

হয়। অহোমরাজ চুহুমুঙ-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঙ্করদেবের ডাক পড়িল। সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন।

রাজা কহিলেন, "শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস করছেন, ভালো কথা। কিন্তু আপনি নাকি নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের অছিলায় নানা অনাচার করে চলেছেন। হিন্দু ধর্ম্মবিরোধী ও বেদ-বিরোধী পাপ কার্য্যে আপনি লিপ্ত আছেন। রাজসভার পণ্ডিতেরা আর তান্ত্রিক মোহান্তেরা এই অভিযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে।"

শঙ্করদেব প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আমি হিন্দুধর্ম্মের ক্ষতিসাধন করছি, এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। বরং হিন্দু-ধর্ম্মকে বাঁচানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ধর্ম্মের দীপ জ্বালানোর জন্যই আমি উৎসর্গ করেছি আমার এই জীবন।"

"বেশ তো, তা হলে আপনি সভায় উপস্থিত অভিযোক্তাদের সঙ্গে বিচারে বসুন। শাস্ত্রীয় যুক্তি তথ্য দিয়ে আপনার নূতন ভক্তি ধর্ম্মের যৌক্তি কথা ও কল্যাণকারিতা প্রমাণ করুন।"

অহোম রাজ সনাতন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সব সময়ে পরিবৃত থাকেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক রূপে নিজেকে তিনি জাহির করিতে চান। তাছাড়া, রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এসময়ে কেবলি তাহাকে উস্কানি দিতেছেন শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে, কারণ শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য মানিয়া চলে না। শূদ্র ও অন্ত্যজদের দেয় সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অধিকার।

শঙ্করদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে না। তবুও ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া তিনি আপন ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুরু হইল ধর্ম্ম-বিচার সভা।

সর্ব্ব দর্শন ও সর্ব্ব ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। সারা ভারতের পণ্ডিত এবং সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার অজানা নয়। তাছাড়া, নিজের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট কর্ম্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্জীবন আনয়ন

করিতেও তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। সাধনার উৎকৃষ্ট, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া শঙ্করদেব অনন্যসাধারণ। তাই তাঁহার সহিত কূপমণ্ডুক ও রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? অল্পকাল মধ্যেই শঙ্করদেব তাঁহার প্রতিপক্ষকে সেদিন পরাস্ত করিলেন।

শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কুচক্রী ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল না। অহোমরাজও তাঁহার উপর পূর্ব্ববৎ রহিলেন বিদ্বিষ্ট।

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া যায়। অহোমরাজ তখন ধূয়াহাটা অঞ্চলে হাতী ধরার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী হাতীর খেদা বা অবরোধ-বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত গ্রামের লোকদেরও সহযোগিতা করিতে হয়। গ্রামবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড দিয়া খেদার অংশবিশেষ গড়িয়া তোলে। হাতীর দল যখন উগ্রমূর্ত্তি হইয়া খেদার বেষ্টনী ভেদ করিতে চায়, তখন প্রত্যেক গ্রামীণ দলকে তাহার প্রতিরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতী পলায়ন করে রাজ সরকার তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন।

সেবারকার খেদা অভিযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আসিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার লোকজনদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দিয়াই বুনো হাতীর দল কঠোর বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পলাইয়া যায়। শঙ্করদেবের বিরোধী দুষ্টচক্র এবার সক্রিয় হইয়া উঠে এবং চরম দণ্ড বিধানের জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিতে থাকে।

অহোমরাজ এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও পুরোহিতেরা এ যাবৎ নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুগামী বৈষ্ণবদের উপর করিয়াছেন। শঙ্করদেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন। কিন্তু এবারকার পরিস্থিতি তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, রাজার এই বিরোধিতার মুখে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। বরং রাজার অত্যাচারের ফলে তাঁহার এই নূতন গড়িয়া উঠা ভক্তি-আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট।

ভক্তদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, অবিলম্বে সদলবলে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ জেলায়। ঐ অঞ্চল তখন কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা চিলা রায়ের শাসনাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা সেখানে উন্নত-তর, এখানকার মত দুষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে ততটা সক্রিয় নয়।

একদল অনুগামীসহ শঙ্করদেব গোপনে ধূয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাতা শ্রীমান্ হরি। উভয়ে রাজরক্ষীদের হাতে বন্দী হইলেন। মাধবদেব সন্ন্যাসী বলিয়া অহোমরাজ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হরিকে দেওয়া হইল মৃত্যুদণ্ড। এই ঘটনায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

কামরূপ জেলায়, বরপেটার নিকটে পটবৌসি গ্রামে শঙ্করদেব এবার তাঁহার নূতন নিবাস স্থাপন করেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের জন্য একটি সত্র এবং নামঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হইতে এই স্থানটি হয় শঙ্করদেবের প্রধান সাধনপীঠ ও প্রচার কেন্দ্র।

কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের খ্যাতি কামরূপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহার চিহ্নিত অনুগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, হরিদেব এবং অনন্ত কণ্ডলী ইঁহাদের অন্যতম। এই তিনজন ভক্ত সাধকই জাতিতে ব্রাহ্মণ। শঙ্করদেবের সাধন ঐশ্বর্য্য, ব্যক্তিত্ব ও উদার ধর্ম্ম ইঁহাদের উদ্বুদ্ধ করে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণে। উত্তরকালে ইঁহারা অসমীয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তম্ভ রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন।

বরপেটা অঞ্চলে থাকাকালে, প্রবীণ আচার্য্য শঙ্করদেব আর একবার ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন শতাধিক ভক্ত শিষ্য। এই সময়কার ভ্রমণকালে শঙ্করদেব পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১] ভারতের অন্যান্য তীর্থ

১ শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মতে, শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎ ঘটে স্বল্পকালের জন্য, এ সময়ে আলাপ-আলোচনা বা মতবিরোধের কোন সুযোগ তিনি পান নাই।

ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত তিনি মিলিত হন। ইহার ফলে, একদিক দিয়া অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম যেমন নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সহিত, মানসলোকের সহিত, আসামের নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের যোগসূত্র রচিত হয়, নূতন ঐক্যবন্ধন গড়িয়া উঠে।

আসামে ফিরিয়া আসার পর শঙ্করদেব তাঁহার ভক্তি-আন্দোলনে সঞ্চারিত করেন নূতন উৎসাহ নূতন প্রেরণা। সর্ব্ব জাতি ও বর্ণের মধ্যে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামরূপের শাক্ত আচার্য্য ও পুরোহিতদের চঞ্চল করিয়া তোলে। কোচরাজ নরনারায়ণের কাছে সবাই মিলিয়া উপস্থিত হন।

করজোড়ে তাঁহারা কহেন, "মহারাজ, আপনি এদেশের অধিপতি, ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্ত্তমান থাকতে এসব কি হচ্ছে, বলুন তো। দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ধর্ম্ম যাচ্ছে রসাতলে।"

"কি ব্যাপার, আপনারা সব খুলে বলুন।"

"মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কায়স্থ হয়েও সে আচার্য্য হয়ে বসেছে। জাতিবর্ণের পার্থক্য সে মানে না, প্রাচীন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। ম্লেচ্ছের মত তার আচার-আচরণ। উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করার অছিলায় বেদ-বহির্ভূত এক নূতন ধর্ম্ম সে প্রচার করছে। নিম্ন বর্ণের মানুষ, অর্দ্ধসভ্য পাহাড়ী, এরা সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এর প্রতিবিধান আপনাকে করতেই হবে।"

নরনারায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি। কহিলেন, "বেশ, আমি শঙ্করদেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যও আমি শুনবো। আপনারা সভায় উপস্থিত থেকে যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে তাঁর মতবাদ করবেন খণ্ডন।"

শঙ্করদেব তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়া রাজা নরনারায়ণের সভায় উপনীত হন। শাক্ত আচার্য্যেরাও সবাই সদলবলে উপস্থিত।

অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্করদেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, "মহারাজ, আমার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করে বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। বেদে বিষ্ণু উপাসনার কথা রয়েছে। স্মৃতি ও পুরাণে আছে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য। তাছাড়া, বিশেষ ক'রে ভাগবত পুরাণের ভিত্তিতে আমার বৈষ্ণবীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণদাস্য আর সদাচার হচ্ছে এই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা। একে বেদ বহির্ভূত বলা হচ্ছে সত্যের অপলাপ।"

শাক্ত আচার্য্যদের মধ্যেও প্রতিভাধর পণ্ডিতেরা রহিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্র সাধনার তত্ত্ব তাঁহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন।

শঙ্করদেব তখন ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ অজস্র ধারায় নির্গত হইতেছে তাঁহার কণ্ঠ হইতে, ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাঁহার বদনমণ্ডল। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের দিকে সভাজনেরা বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া নির্নিমেষে তাকাইয়া আছে।

শাক্ত পণ্ডিতেরা এবার নিস্তেজ হইয়া পড়েন। নিঃশব্দে নত শিরে গ্রহণ করেন নিজ নিজ আসন।

রাজা নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি কৃপা ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন। আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার নব বৈষ্ণবধর্ম্ম তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে। আপনার এই ধর্ম্ম আসামের জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করুক। নূতনতর ধর্ম্মীয় উজ্জীবন এদেশে দেখা দিক্—তা-ই আমি কাম্য বলে মনে করি।"

রাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি চিলা রায় শঙ্করদেবের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উভয়ে তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হন নাই। রাজাকে বুঝাইয়া বলেন, "মহারাজ, আপনার ধৃতি হচ্ছে রাজসিকতা। দিনচর্য্যা অনুরূপ। যে ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই

আপনি আপাততঃ অনুসরণ করুন। আমার প্রচারিত ধর্ম্মে নিবৃত্তি মার্গই বড় কথা, সে মানসিকতা, ত্যাগ তিতিক্ষা আর নীতিনিষ্ঠা আমি আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তবে, একথা জানবেন, আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোন সমস্যায় আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো।"

শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্ববৎ রত রহিলেন ভক্তি-উপাসনা ও নামধর্ম্মের প্রচারে।

রাজা নরনারায়ণ ও চিলা রায় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্য রাজধানী কুচবিহারে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন।

ভক্তিমান্ চিলা রায় কুচবিহার নগরের অনতিদূরে ভেলাডাঙায় শঙ্করদেবের জন্য একটি সত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার আশা ছিল, এই সত্রকে উপলক্ষ করিয়া কোচ রাজপরিবারের সহিত শঙ্করদেবের যোগাযোগ আরো নিবিড় হইয়া উঠিবে, মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও কৃপালাভে তাঁহারা ধন্য হইবেন— এ আশা তাঁহার অনেকাংশে সফল হইয়াছিল।

শঙ্করদেবের ভক্তি-আন্দোলনের পুণ্যধারা ক্রমে বিস্তারিত হয় সারা আসামের দিক্‌বিদিকে। মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যেরা একদিকে যেমন ছিলেন ভক্তিসিদ্ধ, অপরদিকে তেমনি ছিলেন সংগঠন-নিপুণ ও প্রচারকুশল। আসামের জনজীবনে ইঁহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের সর্ব্বত্র সত্র আর নাম-ঘরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত হইয়াছে সহস্র সহস্র মানুষের নিত্যপাঠ্য মহাপবিত্র গ্রন্থ। অগণিত ভক্ত নরনারী তাঁহার কীর্ত্তন, বরগীত, অংকিয়-নাট আর ভাওয়ানা'র রসমাধুর্য্যে হইতেছে অভিসিঞ্চিত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু নয়, অন্ত্যজ শূদ্র ও অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য নরনারীও শঙ্করদেবের প্রসাদে মত্ত হইয়াছে কৃষ্ণনাম রসে। নামধর্ম্মের জয়গানে আজ তাহারা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ঐশ্বরীয় ব্রত উদ্‌যাপনের পালা এবার সমাপ্তির পথে। শঙ্করদেব কিছুদিনের জন্য ভেলাডাঙার সত্রে বাস করিতেছেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের এক চিহ্নিত দিনে চিরবিদায়ের লগ্নটি সমাগত হয়। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম শিষ্য, চির-ব্রহ্মচারী মহাবৈষ্ণব মাধবদেবকে সেদিন প্রদান করেন তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতৃত্বের আসন[১]। তারপর কৃষ্ণরসে রসায়িত সিদ্ধ মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যধামে।

১ শঙ্করদেবের পুত্র ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধক এবং সম্প্রদায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা, তাই মণ্ডলীর নেতার আসন অনেকে তাঁহাকেই দিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব এ দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মনোনীত করেন ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবদেবকে।

গোস্বামী রঘুনাথ দাস

নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পরিকর ও লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথদাস। দৈন্যময় বৈষ্ণবীয় ভজন আর ব্রজরসের নিগূঢ় সাধনার অপূর্ব্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার জীবনে। মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে বিরাট ভক্তিসাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন তাহার অন্যতম ধারক ও বাহক।

সংসার-জীবনে তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীয় একমাত্র পুত্র। পিতা ও পিতৃব্যের অফুরন্ত স্নেহ, প্রাসাদের রাজসিক বিত্ত বিভব ও ভোগৈশ্বর্য্য, রূপসী তরুণী ভার্য্যার প্রেম, কোন কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উন্মাদের মত তিনি বাহির হইয়াছেন সর্ব্বময়ের সন্ধানে। পরম সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়া হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ।

শ্রীচৈতন্যের কৃপা আর তাঁহার 'দ্বিতীয় স্বরূপ' স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় রঘুনাথের সাধনজীবন অচিরে ধন্য হইয়া উঠে ও ব্রজরসের পরমতত্ত্বের সন্ধান তিনি অবগত হন। উত্তরকালে তাঁহারই মাধ্যমে বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধক মহলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার তত্ত্ব ও ব্রজরসের মহিমা প্রচারিত হয়। রঘুনাথের পরমভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের ভিতর দিয়া এই রসের মাহাত্ম্যই বিস্তারিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় ভক্ত-সমাজে।

কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যটি পরিস্ফুট :

চৈতন্যের লীলা রত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল ইহা ভেটে॥

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥

(চৈ, চ, মধ্য ২)

অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হন রঘুনাথদাস। তিনি শুধু সপ্তগ্রামের পৈতৃক জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, এই জমিদারী পরিচালনার ভারও পিতা ও পিতৃব্য শেষের দিকে তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু রঘুনাথের জন্মগত সাত্বিক সংস্কার রাজসিক কর্ম্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, জীবনে তাঁহার ঘটায় বিস্ময়কর রূপান্তর।

আনুমানিক ১৫০১ খৃষ্টাব্দে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবর্দ্ধনদাস মজুমদার। জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাসের কোন সন্তান ছিল না, রঘুনাথকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে অপার স্নেহে তিনি পালন করিতে থাকেন। সপ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা চাঁদপুরে ছিল মজুমদারের পৈতৃক নিবাস।

সপ্তগ্রামের এই সুবিখ্যাত জমিদারবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থাগম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধুনী গঙ্গা তাঁহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক ত্রিধারায় পুনর্বিমুক্ত হইয়া স্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছে, সেই "মুক্ত" ত্রিবেণীর সন্নিকটে এই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সপ্তপুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই তপঃক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দুরাজত্ব কালে এইস্থানে সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র ছিল। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহা ক্রমে একটি বাণিজ্যবহুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কবি কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে—

সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥

"মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা তখন পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লইয়া একটি মুলুক বা খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। পাঠানেরা যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে তাঁহাদের অন্ততঃ দুই শতাব্দ লাগিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যেও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিলিব্যবস্থা লইয়া সর্ব্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে "বুলবাদ-খানা" বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান সুলতানগণ স্বাধিকারভুক্ত দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বার্ষিক মোক্তা রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপন্ন লোককে ইজারা দিতেন। যাহারা এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, তাহাদিগকে সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হইত। মোগল আমলে এই সকল মুলুক লইয়া এক একটি সরকার গঠিত হয়, মজুমদারেরা জমিদার হন। এখন একটা পরগণার আংশিক অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে এক বা ততোধিক পরগণা অন্তর্ভুক্ত থাকিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বার্ষিক বারলক্ষ টাকা মোক্তা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজারা লইয়াছিলেন দুই জন মৌলিক কায়স্থ—দুই ভ্রাতা, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস। পাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ণ ঔপনিবেশিক, স্বজাতিরক্ষক সাহসী বীর এবং প্রবল পরাক্রান্ত শাসকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহারাই গুরু পুরোহিত রূপে এবং আত্মীয়-কুটুম্বরূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাঁহাদের পিতৃপুরুষের কোন বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের কোন বিশেষ গুণ, সম্মান বা প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজানুগৃহীত

পাঠান আমীরের কবল হইতে তাঁহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত লইতে পারিতেন না। বন্দোবস্ত লইলেও তাঁহাদের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল। এই ভ্রাতৃদ্বয় "বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ" অর্থাৎ তাঁহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে বারলক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া আট লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। ইহা ত শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় শুল্ক হইতে তাহাদের আয় আরও ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় হইত। সুতরাং তাহাদের মোট বার্ষিক আয় ১০।১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহা দেখিয়া কত জনের নেত্র পীড়া জন্মিত। বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদতুল্য বসতি বাটী ছিল।

"ধনৈশ্বর্য্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সৎকার্য্যের গৌরবও তাঁহাদের কম ছিল না। "গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা" বলিয়া প্রবাদ-বাক্য এই যশ কীর্ত্তন করিত। কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন।—

"মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
(চৈ, চৈ, মধ্য, ১৬শ)

নদীয়া অঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি অথবা সাময়িক বৃত্তি পাইয়া জীবনধারণ করিতেন। বিপুল তাঁহাদের বিভব, ধর্ম্মে তাঁহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভরা তাঁহাদের যশ, রাম-লক্ষ্মণের মত তাঁহারা অভিন্ন হৃদয়—অভাব তাঁহাদের কিছুরই ছিল না। কেবলমাত্র বহুকাল পর্য্যন্ত উভয়ে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যদাস অপুত্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ছিল একটি

মাত্র সন্তান—রঘুনাথ[১]।" এই রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ দুই ভ্রাতার নয়নের মণি।

অতুল ঐশ্বর্য্য আর স্নেহমমতার পরিবেশে রঘুনাথ লালিত হন। পিতা ও পিতৃব্যের অভিলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের উপযুক্ত পুত্র। বংশের রাজসিক ধারা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ভূম্যধিকারের পরিচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেমনি সুনাম অর্জ্জন করিবেন দানশীলতা ও পুণ্যকর্ম্মে। কিন্তু এ অভিলাষ তাঁহাদের পূর্ণ হয় নাই। জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া রঘুনাথ জন্মিয়াছিলেন, তাই ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখা যায় তাঁহার জীবনে।

তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। নবদ্বীপ ছিল সেকালের অক্সফোর্ড, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পড়ুয়ারা এখানে পড়িতে আসিত, নব্যন্যায় ও অন্যান্য দর্শন আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রেও বর্ত্তমান ছিল শাস্ত্রপাঠের আদর্শ পীঠ।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন। তাই দুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। গৃহে বসিয়া বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ করা তাঁহাদের মত ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণ্যদাস তাহা করেন নাই। চিরাচরিত ভারতীয় প্রথামত ছাত্রেরা অধ্যাপকের আবাসে থাকিয়াই পাঠ সমাপন করে, তাঁহার সাহচর্য্য ও তত্ত্বাবধানে জীবন গড়িয়া তোলে। এই প্রথাই তিনি অনুসরণ করিলেন ; বালক রঘুনাথকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল কুলপুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে। এখানে থাকিয়াই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্রের মতই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছদে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলরাম আচার্য্য শুধু শাস্ত্রবিদ্ই

১ সপ্ত গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

ছিলেন না, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। গ্রামে কোন সাধুসন্ত উপস্থিত হইলে তাঁহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবস্থা। এই পরিবেশে থাকিয়া বালক রঘুনাথ সাধুসেবা ও সদাচারের দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

বলরাম আচার্য যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম, বালক বিদ্যার্থী রঘুনাথও তেমনি অসাধারণ মেধা প্রতিভার অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে রঘুনাথ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

উত্তরকালে ভক্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমালা রচনা করেন, তাহার মূলে রহিয়াছে বালককালের শিক্ষার এই উৎকর্ষ এবং সাফল্য।

নামমূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর সে-বার বেনাপোল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। বলরাম আচার্য্য সাদরে তাঁহাকে জানান অভ্যর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে পর্ণকুটির তৈরী করা হয় এই ভক্ত অতিথির জন্য। সেই কুটিরে বাস করিয়া হরিদাস তাঁহার নিত্যকার জপ ও নামকীর্ত্তন সমাধা করিতেন আর বলরাম আচার্য্যের গৃহে গিয়া করিতেন ভিক্ষা নির্ব্বাহ!

বালক রঘুনাথের কৌতূহলের অন্ত নাই। সুযোগ ও অবসর পাইলেই তিনি ঘুর্‌ঘুর্ করেন হরিদাসের পর্ণকুটিরের আশেপাশে। হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে যুক্তকরে তিনি সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান, ধন্য হন তাঁহার আশীর্বাদ ও স্নেহস্পর্শে। দিনের পর দিন এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের ভজননিষ্ঠা ও দৈন্যময় সাধনা দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হন, দিব্য ভাবাবেশের ছবিটি কোমল হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়।

শুধু বলরাম আচার্য্যই নন, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও ছিলেন ভক্তি-সিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের অতি অনুগত। ফলে বালক রঘুনাথও এই মহাপুরুষের দ্বারা এসময়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হইয়া পড়েন।

হরিদাস ঠাকুরের কৃপাকর সম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে ভক্তি-সাধনার দুয়ার উন্মোচিত এ তথ্যটি রঘুনাথের শিষ্য কৃষ্ণদাস

কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। রঘুনাথের শ্রীমুখ হইতেই তাঁহার বালক কালের এই মানস বিবর্ত্তনের ইতিহাস কৃষ্ণদাস শ্রবণ করেন এবং চরিতামৃতে তাহা লিখিয়া যান :

হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে॥

অতঃপর হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে অন্যত্র চলিয়া যান, এবং ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্যক্রমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন।

প্রভু কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার দিব্য জীবনের নবতম অধ্যায়। সপ্তগ্রামের বহু লোকই তাঁহার এই অভ্যুদয়ের সংবাদ রাখেন। বিশেষ করিয়া জমিদার এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরণ্যদাস ও তাঁহার ভ্রাতা গোবর্দ্ধনদাস প্রভুর নবদ্বীপ লীলা ও সন্ন্যাস গ্রহণের সকল সংবাদ অবগত আছেন।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এই মজুমদারদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহাদের সভা ছিল রাজসভার মত, এবং এই সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে আসিতেন।

হিরণ্যদাসদের সহিত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর। এই সুবাদে প্রভু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসকে 'আজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাজেই প্রভুর ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার ও সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

প্রভু কাটোয়া হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিলেন। ভক্তি-প্রেমের রসঘন বিগ্রহ, দেবদুর্লভ মূর্ত্তি, এই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য শান্তিপুরে ভীড় জমিয়া যায়, নানাদিক হইতে ভক্ত নরনারী সেখানে ছুটিয়া আসিতে থাকে। সপ্তগ্রাম হইতেও বহু লোক শান্তিপুরের দিকে রওনা হয়। এ সময়ে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়া রঘুনাথও তাহাদের সঙ্গী হন।

অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন।[১] প্রেমঘন, দিব্যমধুর মূর্ত্তি। একবার দর্শন করিলে নয়ন ফিরাইয়া নেওয়া যায় না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে প্রভু টলমল করিতেছেন। কখনো হইতেছেন সংজ্ঞাহীন। সারা দেহে তাঁহার ফুটিয়া উঠিতেছে অশ্রুকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার।

প্রভুকে ঘিরিয়া প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভক্তদের নৃত্য ও কীর্ত্তন। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত। মর্ত্ত্যলোকে যেন এক দিব্য আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসের সহিত অদ্বৈত আচার্য্যেব পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। তাই বালক রঘুনাথের প্রতি স্নেহ-সমাদরের ক্রুটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণধূলি ও পবিত্র প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত করিলেন।

রঘুনাথ শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন প্রভু শ্রীচৈতন্যকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রভুর অলোক-সামান্য রূপ, প্রেমার্ত্তি, দিব্য ভাবাবেশ, আর ভক্তদের আনন্দোচ্ছ্বাস, সবকিছু মিলাইয়া যে অপরূপ ভাবমূর্ত্তিটি তাঁহার মানসপটে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে তাহার রং দিনের পর দিন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে। প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাঁধা পড়িয়া যায় এক অজ্ঞাত প্রেমের বন্ধনে।

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; রঘুনাথ পদার্পণ করিয়াছেন সতের বৎসরে। এই তরুণ বয়সে লোকে সাধারণতঃ আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পার্থিব ভোগ সুখের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রঘুনাথের বেলায় দেখা যায় তাহার বিপরীত। হৃদয়ে তাঁহার সদাই বহিতেছে বৈরাগ্যের হাওয়া—সংসারে মন একদণ্ডও টিকিয়া থাকিতে চায় না।

১ বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতাদের মধ্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথমে প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রাপ্ত হন।

লোকমুখে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী নিয়া যে লীলা তিনি করিতেছেন, প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়াছেন, সে সংবাদও রঘুনাথ পাইতেছেন। এসব শুনিয়া মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার অভিলাষ হইয়াছে, দুর্নিবার। এ সময়ে বার বারই চেষ্টা করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্তু বার বারই তাঁহার অভিসন্ধি ফাঁস হইয়া যায়, ধরা পড়িয়া যান।

রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তোমরা ওর ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করো, কোন ফাঁকে যেন না পালায়।"

এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেরী হইল না; কয়েকজন সঙ্গী ও পাইক নিযুক্ত হইল এই কাজে। তাহাদের উপর নির্দ্দেশ রহিল, রঘুনাথ সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও না যান, সেদিকে তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

পিতা ও পিতৃব্য ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ সাত্ত্বিক প্রকৃতির যুবক, ত্যাগ বৈরাগ্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা। এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন বড় প্রশ্ন, কোন্ উপায়ে তাঁহাকে সংসারে ধরিয়া রাখা যায়? পিতা ভাবিলেন, কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিয়া সাধন ভজন শুরু করিলে, পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে রত হইলে, হয়তো গৃহত্যাগের ঝোঁক কমিয়া যাইবে। ধীরে ধীরে সংসার জীবনে সে আকৃষ্ট হইবে।

যদুনন্দন আচার্য্য গোবর্দ্ধনদাসদের কুলগুরু। ইনি অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সুপণ্ডিত ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া সুনামও যথেষ্ট। তাঁহাকে আনাইয়া রঘুনাথকে মন্ত্র-দীক্ষা দেওয়া হইল।

গুরুর নির্দ্দেশমত বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধন ভজন করিয়া চলিলেন, কিন্তু মন তাঁহার শান্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীব্রতা দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে।

অভিভাবকেরা এবার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যাক্। রূপসী তরুণী পত্নীর আকর্ষণে যদি বা সংসারের দিকে মন কিছুটা ফিরিয়া আসে।

সুলক্ষণা পরমা সুন্দরী পাত্রী মিলিতে দেরী হয় নাই। এক শুভলগ্নে জাঁকজমক সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু বিবাহিত জীবনেও রঘুনাথের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, বৈরাগ্য দিন দিনই চলিল বৃদ্ধির পথে।

এই সময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের বিস্তারিত সংবাদ পৌঁছে সপ্তগ্রামে। প্রভু নীলাচল হইতে সম্প্রতি গৌড়-রামকেলীতে আসিয়া রাজমন্ত্রী সনাতন ও রূপকে কৃপা করেন। তারপর বৃন্দাবনে গমনের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাত্রায় তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিবেন। হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছে সেখানে, দিনরাত বহিতেছে কীর্ত্তন-নর্ত্তনের আনন্দ স্রোত।

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও পিতাকে খুলিয়া বলিলেন তাঁহার মনের কথা। প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এবার বহু সলাপরামর্শ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। এবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় কয়েক-দিন কাটাইয়া আসিয়া যদি সে কিছুটা শান্ত হয়, মন্দ কি? সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই মিলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবে সপ্তগ্রামে।

অভিভাবকদের অনুমতি নিয়া, প্রচুর ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদল-বলে উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে।

কিন্তু এই দর্শন ও সান্নিধ্য তো ভক্ত রঘুনাথকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। প্রভুর দিব্যমূর্ত্তি, আর তাঁহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই

নবীন সাধককে আরো যেন উত্তাল করিয়া তুলিয়াছে। চরণতলে লুটাইয়া সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ কহিলেন, "প্রভু, মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছি, আপনি ছাড়া এ জগতে আর আমার কোন আশ্রয় নেই। বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে পশুর জীবন আমি যাপন করছি। কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।"

অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন কিছুই অজানা নয়। রঘুনাথ যে তাঁহার চিহ্নিত পরিকর, তাঁহার দিব্যলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কিন্তু সব কিছুরই একটা ক্রম আছে, নির্দ্ধারিত লগ্ন আছে। রঘুনাথকে এখনো যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে নিজের প্রস্তুতি।

তাঁহাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া প্রভু প্রশান্ত স্বরে কহিলেন :

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

(চৈ, চ, মধ্য, ১৬৭)

নিভৃতে বসিয়া প্রভু আরো কহিলেন, "বৎস রঘুনাথ, তুমি মনে দুঃখ ক'রো না। বৃন্দাবনধাম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের কাছে ফিরে আসবো। তখন তুমি কোন ছলে আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে। কোন্ ছলে, কি ক'রে যাবে, যথাসময়ে কৃষ্ণ তোমায় তা বলে দেবেন। কৃষ্ণ কৃপা রয়েছে যার ওপর তাকে কে ঠেকাবে ?"

রঘুনাথ শুদ্ধসত্ত্ব আধার, প্রেমভক্তির আলোকে হৃদয় কন্দর তাঁহার আলোকিত। তাই প্রভুর এই ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরী হইল না। প্রভু কহিয়াছেন, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে হইবে, বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা করিতে হইবে। আর এই সঙ্গে অটুট

রাখিতে হইবে প্রেমভক্তির নিষ্ঠা। তবেই জীবনে তাঁহার নামিয়া আসিবে কৃষ্ণ-কৃপার অমৃতধারা। প্রভুর শ্রীমুখের কথা কি করিয়া রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন ?

অন্তরের আর্ত্তি এবার অনেকটা প্রশমিত হইল। স্থির করিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে রত থাকিবেন, আর অপেক্ষা করিবেন সেই পরম লগ্নের জন্য যখন প্রভু তাঁহাকে করিবেন বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার, ঠাঁই দিবেন তাঁহার চরণকমলে।

শান্তিপুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, প্রভুর সস্নেহ আশ্বাস-বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন এই সুযোগে তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম পরিচালনায় নিয়োজিত করিলেন। সুবিস্তৃত মুলুকের রাজস্ব সংগ্রহ, সুলতানের প্রাপ্য অর্থ জমা দেওয়া, অবাধ্য প্রজার শাসন প্রভৃতি অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ মজুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক ; শিক্ষা দীক্ষা, মেধা প্রতিভা তাঁহার যথেষ্ট। এবার বিষয়কর্ম্মে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া সাংসারিক দায়িত্ব সে বুঝিয়া নিক্, ইহাই পিতা ও পিতৃব্যের পরম কাম্য।

রঘুনাথের এই কার্য্যভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল এক কঠিন সঙ্কট। এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপস্থিত না থাকিলে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের রাজস্ব ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইত, সমূলে তাঁহারা ধ্বংস হইতেন।

গৌড়-অধিপতি হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর সপ্তগ্রামের মোক্তাদার হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়া নেন। তাঁহার লোভ ছিল অত্যধিক, নিষ্পেষণের চাপে প্রজাদের অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজস্ব আদায় পুরাপুরিভাবে হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়া নিয়া সুলতানের খাতে রাজস্ব আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বলিয়া বৎসরের পর বৎসর এই ধরণের প্রশ্রয় নিতে তিনি সাহসী হইতেন। শেষটায়

সুলতান বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনকে নিযুক্ত করেন তাঁহার স্থানে।

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সহিতই রাজস্ব আদায়ের কাজ করিতেন। তাঁহার আমলে প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমত হইত। সুলতানকে তাঁহার পাওনা বারো লক্ষ টাকা মিটাইয়া দিয়াও আটলক্ষ টাকা মজুমদারেরা নিজের ঘরে তুলিতে পারিতেন। পূর্ব্বতন মোক্তাদার, আমীর, ইহা লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ষার আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলেন, হিরণ্যদাস কয়েক লক্ষ টাকা বেশী আদায় করিতেছে, কিন্তু অন্যায়ভাবে সরকারী কোষাগারকে করিতেছে বঞ্চিত এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল।

সুলতান হুসেন শাহ তখন রাজস্বের আদায় বৃদ্ধি করিয়া রাজ-সিংহাসনকে সুদৃঢ় করিতে ব্যগ্র। আমীরের উস্কানীতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে পাঠাইলেন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়া গৌড়ে নিবার জন্য।

হিরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন। সেনাদল আসিতেছে খবর পাইয়া ভ্রাতাসহ তিনি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিয়া থাকা যাক্, তারপর সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত হইলে আত্মপ্রকাশ করা যাইবে।

এদিকে মজুমদার ভ্রাতাদের দেখা না পাইয়া উজীর তাঁহাদের প্রতিনিধি রঘুনাথকেই গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌড়ে নিয়া গিয়া নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে।

কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে রঘুনাথকে হাজির করা হয়। আর ভর্ৎসনা ও ভীতি প্রদর্শন চলিতে থাকে দিনের পর দিন।

রঘুনাথকে সুলতান চরম দণ্ড দিতেছেন না দুটি কারণে। প্রথমত, মজুমদারেরা দক্ষ লোক। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বারা রাজস্ব বাড়ানো যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারা জাতিতে কায়স্থ, চাতুর্য্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া বা অপর কোন

কূট চাল চালিয়া রাজস্বের আদায় ব্যবস্থা ইহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে।

রঘুনাথ বুঝিলেন, কৌশল অবলম্বন না করিলে এই নির্য্যাতনের হাত এড়ানো যাইবে না। স্থির করিলেন, মিষ্টি কথায় সুলতানের হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করিবেন একটা আপোষ মীমাংসার জন্য।

করজোড়ে, সবিনয়ে সেদিন সুলতানকে নিবেদন করিলেন, "আমার বাবা ও জ্যেঠা আপনার ভাই ; আর আমি হচ্ছি আপনার পুত্রের মত। আমাদের ভেতর বিরোধ বা মনোমালিন্য থাক্‌বে কেন? তাছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক। জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব সব কিছু আপনার আয়ত্তে। আপনার মত মহান্ ব্যক্তি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তবে কার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াবো?"

এই বিনয়নম্র বচন, আর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি, হুসেন শাহের মন গলাইয়া দিল। মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ছাখো বেটা, তোমার জ্যাঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই। আট লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর রাজস্ব থেকে একলা সে ভোগ করে। তা থেকে আমায় কিছু দেওয়া কি তার উচিত নয়? তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তাকে একথা বুঝিয়ে বলো। আমি তোমাদের সবাইকে মার্জ্জনা করলাম।"

রঘুনাথ সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন, পিতৃব্যকে এ প্রস্তাবে তিনি রাজী করাইবেন। মুক্তি পাইয়া সপ্তগ্রামে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় এবং সুলতানের মনান্তর অতঃপর অতি সহজে মিটিয়া যায়।

এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রীচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরো কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম রঘুনাথ অনাসক্ত হইয়া করিয়াছেন। আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছে এই অনাসক্তির মধ্য দিয়া। শুধু তাহাই নয়, জমিদারী পরিচালনার ভার এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না থাকিলে

সুলতানের সহিত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইত না। ফলে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারকে হইতে হইত সর্ব্বস্বান্ত।

কিছুদিনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নির্ধন সবাইকে নির্বিচারে বিলাইতেছেন প্রেমধন। তাঁহার উদ্দণ্ড কীর্ত্তন-নর্ত্তনে আর আনন্দ রঙ্গে শত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। রাঘব পণ্ডিতের ভবন হইয়াছে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র।

পানিহাটি সপ্তগ্রাম মুলুকেরই অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, খুব বেশী দূরেও নয়। রঘুনাথ স্থির করিলেন, একবার নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আসিবেন।

"কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয়া ভাবাবেশে আকুল করিতে হয়, 'অক্রোধ পরমানন্দ' নিত্যানন্দ তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার মূর্ত্তিতে কি দিব্য ভাব ছিল, মুখের কথায় কি মধু ছিল, কীর্ত্তনে কি মদিরা ছিল, হাস্যরসে কি চটুলতা ছিল যে, যখনই কেহ তাঁহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত, তখনই সে কেমন ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের লোক নাচিয়া উঠিত, সব ফেলিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ছুটিত, আর দেশময় লোকারণ্য হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ঘনান্দোলিত হইয়া সে স্থলে বিজয়ী সেনাপতির মত এই অগরূপ অবধূতের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিত। চৈতন্য-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত লীলা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে লীলার বৈদ্যুতিক শক্তিতে তিনমাস কাল সে স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্মৃতের মত ছিলেন।"[১]

নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেশেতে॥

১ সপ্তগোস্বামী, বাতুল রঘুনাথ

তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহারো না স্ফুরে॥

(চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫ম)

রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে কীর্ত্তন-নর্ত্তনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্বগণ পরিবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ। আয়ত নয়ন দুটি দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। সদানন্দময় এই মুক্ত পুরুষের দিকে ভক্তেরা নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। এসময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তেরা রঘুনাথকে চিনিতেন। তাহারা তাঁহার পরিচয় জানাইয়া দিলেন, "প্রভু, ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস মজুমদার, সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধনদাসেব পুত্র।"

নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকিতে শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের কথা, তাঁহার প্রেমার্ত্তির কথা শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাঁহাকে কাছে টানিয়া নেন, নিজের চরণ দুটি স্থাপন করেন তাঁহার মস্তকে। কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন, "ওহে চোরা, তবে দেখছি এতদিন পরে তোমার দেখা পেলাম। ভালই হল, এবার তুমি আমার ভক্তদের দধি চিড়া খাইয়ে তৃপ্ত করো।"

কৌতুকী নিত্যানন্দের 'চোরা' কথার নিহিতার্থ, রঘুনাথ তাঁর প্রকৃত স্বরূপটি চমৎকাররূপে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তি-প্রেমের সাধনা ও আর্ত্তির ফলে অন্তর তাঁহার রহিয়াছে কৃষ্ণময়, কিন্তু বাহ্যজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফেরা করিতেছেন।

এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সেদিন সবার সমক্ষে জানাইলেন তাঁহার সোৎসাহ সাধুবাদ। শুধু তাহাই নয়, সহস্র সহস্র ভক্ত বৈষ্ণবকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার বিরল সুযোগও এসময়ে তাঁহাকে তিনি দান করিলেন।

অর্থের এমনতর সদ্ব্যবহারই যে রঘুনাথ চাহেন। তাই পরম উৎসাহে তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন দধি চিড়ার এই মহোৎসবে। লোকজন ও অর্থের তাঁহার অভাব নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সকল

কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্ব্বত প্রমাণ চিড়ার স্তূপ আর শত শত ভাণ্ডের দধি, ক্ষীর, গুড় যেমন দেখা গেল, তেমনি আসিয়া জুটিল সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সেদিন পানিহাটিতে সম্পন্ন হয়, তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সারা গৌড়দেশের দিকে দিকে।

কথিত আছে, সেদিনকার মহোৎসবে, নিত্যানন্দের আকর্ষণে ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্য সূক্ষ্মদেহে পুলিন-ভোজনে আবির্ভূত হন, পঙ্‌ক্তির মধ্যে বসিয়া ভক্তপ্রদত্ত চিড়া দধি সানন্দে গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবেরা অনেকেই বলিতে থাকেন, রঘুনাথ মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তাঁহাকে কৃতার্থ করার জন্যই ঘটিয়াছে কৃপালু প্রভুর আবির্ভাব।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহেও সেদিন রাত্রেতে বৈষ্ণব সেবার সময়ে ঘটে এমনি এক অলৌকিক কাণ্ড। নিত্যানন্দের পাশে রাখা হইয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজন-আসন। এই আসনে সশরীরে প্রভু আবির্ভূত হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পণ্ডিত উভয়ে এই লীলাদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

রাঘব দুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত্নে আনিয়া দিলেন। স্নেহভারে আশিস্ জানাইয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এসে ভোজন ক'রে গেলেন আজ এখানে। এই নাও তাঁর পবিত্র প্রসাদ, জীবন তোমার ধন্য হোক্, সর্ব্ববন্ধন থেকে মুক্ত হও তুমি।"

পরের দিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া নিত্যানন্দ ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সজল নয়নে, যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু আমি বিষয়ী—জীবাধম। বামন হয়ে চাঁদ ধরার অভিলাষ জেগেছে মনে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কিন্তু ভব-বন্ধন আমার যে এখনো টুটছে না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়।"

নিত্যানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ, আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি। শ্রীচৈতন্যের চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে সেবার অধিকার তুমি লাভ করবে।"

শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদের এই আশীর্ব্বাণী রঘুনাথের সাধন-জীবনে উত্তরকালে সফল হইয়া উঠিয়াছিল।

পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দর্শন ও মহোৎসবে ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গ লাভের পর রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষ্ণা চরমে উঠে। প্রভু চৈতন্যের সন্নিধানে কবে যাইবেন, কি করিয়া যাইবেন, ইহাই হয় তাঁহার ধ্যান জ্ঞান।

সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করিলেন না। বহির্ব্বাটিতে, দুর্গামণ্ডপের এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কান্না, পত্নীর আর্ত্তি, আর অভিভাবকদের তিরস্কার কোন কিছুতেই ফল হইল না।

পিতা ও পিতৃব্য এবার তাঁহার পাহারার ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করিলেন। যখন যেখানে তিনি যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাতা বা প্রচ্ছন্ন রক্ষী সতর্কভাবে ঘিরিয়া থাকে। এই ব্যূহ ভেদ করিয়া নীলাচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন।

প্রভু চৈতন্যের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আসিল,—কৃষ্ণ তাঁহার অবরোধ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অচিরে সুযোগ একটা উপস্থিত হইবেই। খিন্ন হৃদয়ে এই আশা নিয়াই তিনি দিন গুণিতে থাকেন।

এসময়ে একদিন অযাচিতভাবে আসিয়া যায় তাঁহার পলায়নের সুযোগ। কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্য হঠাৎ শেষ রাত্রে রঘুনাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "বাবা রঘুনাথ, আমি এক মহা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি আপনার সেবক। কি আমার করতে হবে, আদেশ দিন। আমি যথাসাধ্য তা করবো।" ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন রঘুনাথ।

"আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, তা জানো। যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি এই বিগ্রহের পুজো ক'রে সে আজ ক'দিন হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমি নিজে অশক্ত। কি ক'রে ঠাকুরের সেবা পূজা নির্ব্বাহ হবে ভেবে পাচ্ছিনে। পূজারী ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তুমি যদি নিজে বলে দাও, তাহলে তোমার কথা ঠেলতে সে সাহস করবে না। তুমি এখনই একবার চল, আমায় মুক্ত করো এ বিপদ থেকে।"

রঘুনাথ তখনই রওনা হইলেন তাঁহার সঙ্গে। কুলগুরুর সঙ্গে যাইতেছেন তাঁহারই জরুরী কাজে। তাই রক্ষীরা কেউ আর তাঁহাকে বাধা দিল না।

প্রাসাদের বাহিরে কিছুটা রাস্তা গিয়া রঘুনাথ আচার্য্যকে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপনি সোজা আপনার বাড়ীতে চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ওখানে যাচ্ছি।"

আচার্য্য ভাবিলেন, এ অতি উত্তম কথা। রঘুনাথের জন্য তিনি নিজ গৃহেই অপেক্ষা করিবেন।

পলায়নের এই পরম সুযোগ রঘুনাথ ছাড়িলেন না। পূজারী ব্রাহ্মণকে যদুনন্দন আচার্য্যের কাছে পাঠাইয়া দিয়া ধাবিত হইলেন নীলাচলের দিকে। রাজপথ পরিহার করিলেন, কারণ রক্ষীরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হয়তো ধরিয়া ফেলিবে। দ্রুতপদে চলা শুরু করিলেন বনপথ দিয়া।

উষার আলোক তখনো ফুটিয়া উঠে নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া রঘুনাথ পথ চলিতেছেন, কাঁটা ও কাঁকরের আঘাতে পদতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত। কোনদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মাদের মত উর্দ্ধশ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়া চলিয়াছেন। মুখে নিরন্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ-পঙ্কজে।

পদব্রজে নীলাচল যাত্রা তখনকার দিনে ছিল অতি দুরূহ। পথে সাপ বাঘের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দস্যুদের উপদ্রব। এসব কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম করিলেন বারো দিনে। এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, আর বাকী নয়দিন কাটিয়াছে অনাহারে। এই অবস্থায়, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া তিনি পৌঁছিলেন। তারপর সরাসরি পতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে।

প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। চরণে পতিত, অস্থিচর্ম্মসার, অচেতন-প্রায় নবাগত ভক্তকে চিনিতে পারিয়া প্রভুর পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত চমকিয়া উঠিলেন। এ কি! এ-যে সপ্তগ্রামের ক্রোড়পতি জমিদারের তনয় রঘুনাথ—বিষয়-বিরাগী ভক্ত রঘুনাথ!

প্রভু তখন ভাবাবেশে রহিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত ভূতলে শায়িত রঘুনাথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, ব্যস্তভাবে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের অধরে ফুটিয়া উঠে, প্রসন্ন মধুর হাসি। মুমুক্ষু রঘুনাথকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া তিনি আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ বিভোর হন স্বর্গীয় আনন্দে, পথশ্রম আর অনাহার অনিদ্রার সব কিছু কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যান, প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাণের আকুতি, মাগেন পরমাশ্রয়।

আশ্বাস ও অভয় দিয়া প্রভু রঘুনাথকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। সকলকে নির্দ্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য।

প্রেমপূর্ণ স্বরে প্রভু এবার কহেন, "রঘুনাথ, ছাখো, কৃষ্ণের কি অপার কৃপা। এবার তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কূপ থেকে। প্রেমভক্তির আনন্দলোকে এবার তোমার যাত্রা শুরু হ'লো।"

সজল নয়নে, বাষ্পাকুল কণ্ঠে রঘুনাথ উত্তর দেন, "প্রভু, আমি কৃষ্ণ জানিনে, কৃষ্ণকৃপা কি তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চিতরূপে জেনেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, তোমার কৃপাই আমায় আজ উদ্ধার করলো।"

কৃপাময় প্রভু তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া কহিলেন,

"এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥

"স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ: যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনই, গুরুগম্ভীর ভাবময় রসজ্ঞ ভক্ত। প্রভু নিজেই বলিতেন, নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব ও ব্রজের লীলারস রহস্য তাঁহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার বিষয় তিনি বুঝিয়াছিলেন। ঐরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গূঢ়তত্ত্ব অনুশীলনের অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর। এজন্য প্রভু তাঁহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়া সেই মর্ম্মী ভক্তের করে সমর্পণ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয় ভক্তটিকে যথোচিত আদর যত্ন বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা সুযোগ তাঁহার নাই; এজন্য রঘুনাথের একান্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাঁহাকে পুত্রবৎ ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজপুত্রকে ধনীর গৃহে পোষ্যপুত্র করিয়া দিবার মত রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বরূপকে দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, তিনি 'স্বরূপের রঘুনাথ' নামে সকলের নিকট পরিচিত হইলেন[১]।"

গৌড় হইতে আসিবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। পথশ্রম, অর্দ্ধাশন ও অনিদ্রায় শরীর প্রায় বিধ্বস্ত। তদুপরি কয়েক দিন তাঁহাকে জ্বরে ভুগিতে হইয়াছে এবং এজন্য লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে।

লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বস্তু ভোজনের জন্য স্বাভাবিক একটা ইচ্ছা জন্মে। রঘুনাথের বেলায়ও তাহা দেখা দিল। সুস্বাদু ভোজ্য বস্তুর জন্য তিনি উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে বলিয়া দিয়াছেন, কয়েকদিন

১ রঘুনাথদাস গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

রঘুনাথকে যেন তাঁহার পাতের প্রসাদই দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, সে প্রসাদ বৈরাগী সন্ন্যাসীদেরই উপযোগী। অথচ সদ্য রোগমুক্ত রঘুনাথের জিহ্বার লালসা যাইতেছে না। অগত্যা সেদিন তিনি মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা রুচিকর চব্যচোষ্য ভোগ দেন, তারপর মনে মনেই তাহা গ্রহণ করিয়া হন পরিতৃপ্ত।

এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়া প্রভু স্বরূপকে কহিলেন, "স্বরূপ, আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই, অজীর্ণ হয়েছে। রঘুনাথ আমায় কাল অতিরিক্ত ভোজন করিয়েছে[১]।"

দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনাথদাস নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রভুকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করানোর সামর্থ্য তাঁহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ ভোজন তো কাহারো চক্ষে পড়ে নাই? স্বরূপ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বুঝিলেন, ইহা প্রভুর মানস ভোজন, আর ইহা সম্ভব হইয়াছে ভক্ত রঘুনাথের মানস-নিবেদনের ফলেই।

রঘুনাথও উপলব্ধি করিলেন, অন্তর্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভক্তদের ভাবনা চিন্তার ক্ষীণতম বুদ্‌বুদ্‌টিও ধরা পড়িয়া যায়। তাই তাঁহার বৈরাগ্য সাধনা সম্পূর্ণ করিতে হইবে পরম নিষ্ঠাভরে, আর সারা দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায়।

কয়েকদিন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিল। এবার তিনি ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য। তাঁহার সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে স্বরূপ দামোদরের উপর। তাই স্বরূপকে সেদিন একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েকটি দিন গত হ'লো। কই, প্রভু তো আমায় সাধন ভজন সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না? আমার হয়ে আপনি তাঁকে একটু বলুন।"

স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘুনাথের ব্যাকুলতার কথা উঠাইলেন তখনি সর্ব্ব সাক্ষাতে প্রভু দিলেন তাঁহার নির্দ্দেশ:

১ ভক্তমাল গ্রন্থে অন্তর্যামী প্রভুর এই মনোরম আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইঁহ তাহা জানে॥
গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ॥[১]

(চৈ, চৈ, অন্ত্য-৬)

সাধারণভাবে প্রভু নবীন ভক্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিগূঢ় ব্রজরস তত্ত্ব। শিক্ষা দেওয়ার ভার রহিল স্বরূপ দামোদরের উপর। সেইজন্যই তো তিনি স্বরূপের হাতে রঘুনাথকে একান্তভাবে সঁপিয়া দিয়াছেন।

এদিকে রঘুনাথের পলায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের অন্ধকার। রঘুনাথের তরুণী পত্নী অবিরত ক্রন্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন। জননী হইয়াছেন উন্মাদিনীর মত, তাঁহার বুক ফাটা হাহাকার শুনিয়া অশ্রুজল রোধ করা যায় না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন একমাত্র পুত্রের অদর্শনে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুঝিয়া নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণে। আর তাঁহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম হইতে ফিরাইয়া আনা যাইবে না।

কিন্তু রঘুনাথের মাতাকে শান্ত করা যায় কই? কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, "যেমন ক'রে হোক্ তোমরা আমার নয়নের মণি রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো। দরকার হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো। এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী, আছে কী করতে?"

গোবর্দ্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানা ভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা করেও রঘুনাথকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে বিধিলিপি। আরো কহিলেন:

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ীর বাঁধনে তারে রাখিব কি মতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥

(চৈ, চৈ, অন্ত্য-৬)

শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রতি বৎসর গৌড় হইতে যাহারা নীলাচলে প্রভুর দর্শনে যাইতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন এই শিবানন্দ। যাত্রীদলের পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁহার উপর।

গোবর্দ্ধন মজুমদার রঘুনাথ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন শিবানন্দের কাছে। জানিলেন, নীলাচলে থাকিয়া কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন সে যাপন করিতেছে। সে বৈরাগ্য সে দৈন্যদশা দেখিলে অশ্রুরোধ করা কঠিন হয়।

গোবর্দ্ধনের অন্তর বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের মত বিলাস বৈভবে যে এযাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া সে সহ্য করিবে। অবিলম্বে রঘুনাথের জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য তিনি নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন চারিশত মুদ্রা ও বহুতর সুস্বাদু খাদ্য।

পাচক ও ভৃত্য নীলাচলে পৌঁছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু মুদ্রাগুলি কি করিবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এগুলি সঞ্চিত রাখিবেন নিজের কাছে। এই অর্থ দিয়া প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো যাইবে।

ভক্তাধীন প্রভু রঘুনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রতি মাসে দুই তিন দিন করিয়া রঘুনাথের কুটিরে তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নানা সুস্বাদু ভোজ্য তৈরী হয়, প্রভু ও তাঁহার সঙ্গী

বৈষ্ণবেরা তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহণ করেন। ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকৃতার্থ।

প্রায় দুই বৎসর এভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর হঠাৎ রঘুনাথের মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। প্রভু তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন আর এই উপলক্ষে রঘুনাথ পাইতেছেন কত আনন্দ, কত তৃপ্তি। কিন্তু এই সঙ্গে কি তাহার অহমিকা কিছুটা মিশ্রিত নাই? 'প্রভু আমার কুটিরে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, ভক্তদের মধ্যে আমি বিশেষ একটা মর্য্যাদা এর ভেতর দিয়ে পাচ্ছি' এই ধরণের প্রচ্ছন্ন অভিমান হয়তো রহিয়াছে। তাছাড়া, প্রভু কি সত্যই এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন?

ভাবিলেন, 'প্রভু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের আদর্শই তিনি তাঁহার অনুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে ধরছেন। চরম বৈরাগ্যের আধার না হলে কোন সাধকই পরম প্রেমরস বা ব্রজরস সহজে ধারণ করতে পারে না। অনুগামী বৈরাগী সন্ন্যাসীদের প্রতি এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। সেই বৈরাগ্যমূর্ত্তি প্রভুকে আমি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। আমার পিতা ও পিতৃব্য বিষয়ী, ধনী জমিদার। তাঁদের প্রেরিত অর্থে যে আহার্য্য প্রস্তুত হয়, তা ভোজনে প্রভুর তো সত্যকার আনন্দ হবার কথা নয়। তাই তো। ভ্রান্তবুদ্ধি হয়ে আমি এ কি করছি?'

অতঃপর রঘুনাথ প্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর হঠাৎ একদিন প্রভু প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা স্বরূপ, রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ডাকছে না। ব্যাপার কি?"

স্বরূপ নিবেদন করেন, "প্রভু, রঘুনাথ [illegible] অন্ন আপনাকে নিবেদন করাটা ঠিক নয় [illegible] ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন, [illegible] মন আজকাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে [illegible]

একথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত। [illegible]

বুঝেছে। বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধা পড়ে। রঘুনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যকার পথ চিনে নিতে ভুল করেনি।”

আহার বিহারে সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র সাধন, এইদিকে রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি পতিত হইল। কারণ, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে নিজে এই পন্থার অনুরাগী। তাছাড়া, রঘুনাথ আরও ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত্র, বিলাস-বহুল জীবনে বহুতর অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে—ভোগেচ্ছার সূক্ষ্ম অঙ্কুর হয়তো এখনো রহিয়াছে উদগ্র। এ অঙ্কুরকে নির্ম্মমভাবে বিনাস না করিলে শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গড়িয়া উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, কায়মনোবাক্যে সত্যকার বৈরাগ্যকে তিনি বরণ করিয়া নিবেন, ভোগলিপ্সা ও আত্ম-অভিমানের কাঁটাকে সমূলে করিবেন উৎপাটিত।

শ্রীচৈতন্যের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দ্দেশ ছিল, ভক্ত রঘুনাথ তাঁহার ভজনপূজন ও সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া প্রভুর দর্শনে আসিলে প্রভুর প্রসাদান্ন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। কিছুদিন ইহা ভোজন করিয়াই রঘুনাথের দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ শুরু হইল তাঁহার আত্মসমীক্ষণ, ‘তাই তো, বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আমি পা বাড়িয়েছি। কিন্তু আর পাঁচজন বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর মত যত্রতত্র ভিক্ষা ক’রে তো উদরপূর্ত্তি করছিনে? বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছি। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, আহার ঠিকমত জুটছে, নিরুদ্বেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। এ তো ঠিক নয়। বৈরাগী জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে বরণ ক’রে নিতে হবে।’

দশদণ্ড রাত্রি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেন। তারপর আসিয়া দাঁড়াইতেন মন্দির প্রাঙ্গণে, সিংহদ্বারের কাছে। কাঙাল বৈষ্ণব বলিয়া দর্শনার্থীরা দয়া করিয়া কেহ যদি কোন খাদ্য ভিক্ষাস্বরূপ দিত, তাহা দিয়া কোনমতে করিতেন ক্ষুন্নিবৃত্তি।

এই অযাচক-বৃত্তিই তো নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সাধুর আচরণীয় ধর্ম্ম। এখন হইতে এভাবেই শরীর ধারণের উপযোগী আহার্য্য গভীর রাত্রে

রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন। তারপর সারারাত কাটাইতেন জপ ধ্যান ও ভজনে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘুনাথের মনঃপূত হইল না। প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাহিরে অযাচক বৃত্তির ভান আছে বটে, কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রহিয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের সূক্ষ্ম ইচ্ছা। মুখে কিছু না বলিলেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তুক দাতা সম্পর্কে কত কিছুই না ভাবিতে থাকে! কখনো ভাবে—এই যে আমার পরিচিত ভিক্ষাদাতা এগিয়ে আসছেন, কাল ইনি আমায় দিয়েছেন, আজো হয়তো দিয়ে যাবেন। কখনো বা কাহারো সম্পর্কে হয় বিপরীত মনোভাব—এই দাতাটি তেমন সুবিধের লোক নন, বোধহয় এর কাছে আজো কিছু পাওয়া যাবে না। রঘুনাথ কহিলেন, 'না—এই কপট অযাচক বৃত্তি আর নয়। বরং সত্রে গিয়ে কাঙালীদের মত মেগে খাবো।'

প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রায়ই মত্ত থাকেন মহাভাবে। কখনো ইষ্টগোষ্ঠী করেন, কখনো বা ভক্তদের ভীড়ের মধ্যে থাকেন ব্যতিব্যস্ত। কয়েক দিন রঘুনাথের সংবাদ রাখেন নাই। সেদিন ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন, "রঘুনাথ কেমন আছে? আর কি করেই বা আজকাল তার ভিক্ষা নির্ব্বাহ হচ্ছে, বলতো?"

জানানো হইল, রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচকভাবে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। এখন তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। সত্রে গিয়া কাঙালীদের সাথে বসিয়া ভোজন করেন।

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "তা বেশ করেছে। সত্রে মেগে খাওয়াই তো ভালো। মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্যাবৃত্তিরই মত। দাতার চোখে পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দাঁড়িয়ে থাকা- এ বড় জঘন্য!"

ভাববিলাসী বৈষ্ণবেরা প্রভুর কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরতা সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও তিনি হইতে পারেন?

গৌড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোড়পতির পুত্র, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুত্র রঘুনাথ—তাঁহাকে শেষটায় তিনি কাঙালীদের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজনে টানিয়া নামাইলেন!

অতঃপর সর্ব্বত্যাগী বৈষ্ণব-সাধক রঘুনাথ আসিয়া দাঁড়ান কৃচ্ছ্র-সাধনের শেষ ধাপে। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করার কালে প্রভু কতদিন বলিয়াছেন—

জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

সত্রে কাঙালীর সারিতে বসিয়া খাইতে হয় বটে, কিন্তু ভোজন মিলে প্রচুর এবং নিশ্চিতভাবে। উদরপূর্ত্তি করার পর সারাদিন রঘুনাথ ভজনানন্দে কাটাইয়া দেন। কিন্তু সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে বাহির হইয়াছে, চরম বৈরাগ্য ও দৈন্যের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে, একমাত্র কৃষ্ণকৃপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে সত্রের নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তো সমীচীন নয়। সত্রে গিয়া চাহিয়া খাওয়া—আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তিনি অবলম্বন করিবেন। এমন বস্তু সংগ্রহ করিবেন যাহা কাহারো কাছে চাহিতে হয় না; যাহার জন্য কাহারো কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। শুধু তাহাই নয়, যে বস্তু খাইলে অপর কোন জীবকে বঞ্চিত করা হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন।

রঘুনাথের এই বৈরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত ভক্তকবি কবিরাজ গোস্বামীর অমর লেখনীতে বিধৃত রহিয়াছে চিরকালের ত্যাগতিতিক্ষা-ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য :

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥

ভিতরেতে দড ভাত মাজ্ঞি যেই পায়।
লূন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়।
(চৈ, চৈ, অন্ত্য ৬)

এ যেন বৈরাগ্যের এক অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নির দহনে তপস্বী রঘুনাথ নিজেকে নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে চান, কৃষ্ণকৃপার মহারস ধারণের সামর্থ্য অর্জন করিতে চান।

মন্দিরের কাছে পসারীরা মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় করে। প্রতিদিন সবটা বিক্রীত হয় না। ঐ বাসি প্রসাদে দুর্গন্ধ হইলে সিংহদ্বারের পাশে দাঁড়ানো গাভীদের সম্মুখে তাহা ঢালিয়া দেওয়া হয়। গাভীরা কতকটা খায়, কতকটা দুর্গন্ধের জন্য ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। রঘুনাথ এই বাসি পচা অন্নকণা কুড়াইয়া আনেন। বার বার জলে ধৌত করার ফলে কোন কোন অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। এগুলি সংগ্রহ করিয়া নুন সহযোগে রঘুনাথ তাহা ভোজন করেন।

যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক রঘুনাথ, তেমনি কৃপালু ও কল্যাণকামী তাঁহার সাধন পথের দিক্‌দিশারী স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনার এই শেষ পর্য্যায়টি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। একদিন রঘুনাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "রঘুনাথ, এমন অমৃতময় প্রসাদান্ন রোজ তুমি ভক্ষণ করো, আর আমাদের দাও না। একি অদ্ভুত প্রকৃতি তোমার!" তারপর ঐ বাসি ভাতের প্রসাদান্ন পরম আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে। রঘুনাথের কৃচ্ছ্রব্রতের সাফল্যে জানাইলেন অন্তরের অজস্র সাধুবাদ।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্য দৃষ্টির কাছে রঘুনাথের তপশ্চর্য্যার কোন কিছুই অজানা নাই। তবুও ত্যাগী ভক্তের মহিমা বাড়ানোর জন্য ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে কহিলেন, "স্বরূপ, তোমার রঘুনাথের সমাচার বল। দিনচর্য্যা তার কিভাবে চলছে?"

স্বরূপ করজোড়ে রঘুনাথের কৃচ্ছ্রের কথা সবিস্তার বিবৃত করেন। প্রভুর আয়ত নয়ন দুটি তখন পুলকাশ্রুতে ছলছল। স্বরূপকে নিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া যান রঘুনাথের কুটিরে।

রঘুনাথ তখন ভোজনে বসিবেন। বাসি প্রসাদান্ন জলে মাজিয়া নিয়া, নুন মাখাইয়া পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, এ তোমার কি রকমের স্বার্থবুদ্ধি? এমন মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ কর্‌ছো, আর আমাদের ডাক্‌ছো না!"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদানা প্রভু মুখে পুরিয়া দিলেন। আবার হাত বাড়াইয়া নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তাঁহার হাতটি খপ্‌ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, "না —না প্রভু, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। আমার পাপের মাত্রা আর তুমি বাড়ায়ো না প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও।"

ভক্তেরা তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সবাই পরমানন্দে দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ।

ভক্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়া বার বার প্রভু তাঁহার এই দৈন্যময় সাধনার প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে সেদিন স্বরূপের রঘুনাথ, স্বরূপের মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সেদিন প্রতিভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষ্ণবীয় সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে।

রঘুনাথের কঠোর তপস্যা দেখিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্যের আনন্দের সীমা নাই। সেদিন রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রভু তাঁহার দুইটি পরম প্রিয় বস্তু দান করিলেন।

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক ভক্ত সন্ন্যাসী বৃন্দাবনে গিয়া একটি গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্যকে এই দুইটি পবিত্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং এখন হইতে এই দুইটি প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবর্দ্ধন শিলাটির দিকে দৃষ্টি পড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন লীলা স্ফুরিত হইয়া উঠিত। আর পরম প্রেমভরে গুঞ্জামালা গলায় পরিয়া শিলাখণ্ডটিকে সেবা করিতেন কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় এই শিলাখণ্ড করিতেন মস্তকে ধারণ।

এই পবিত্র বস্তুদু'টি রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ,

এই শিলা কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ। সাত্ত্বিকভাবে, নিষ্ঠাভরে, তুমি জল ও তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এঁর সেবা পূজা করো, অচিরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবে তুমি।”

তরুণ সাধক রঘুনাথের প্রতি প্রভুর এই কৃপা দেখিয়া লীলাচলের ভক্তেরা বিস্মিত হইয়া যান, ভজননিষ্ঠ রঘুনাথকে সবাই জানাইতে থাকেন সাধুবাদ।

পবিত্র শিলা বিগ্রহ তো পাওয়া গেল, কিন্তু ইহার পূজার জন্য সামান্য কিছু উপচার উপকরণ যে চাই। আসন, বস্ত্রখণ্ড ও দু'এক পয়সার খাজা সন্দেশও তো যোগাড় করিতে হইবে। কিন্তু কাঙাল রঘুনাথের কাছে তো একটি কানাকড়িও নাই। তবে উপায়?

এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন স্বরূপ দামোদর। প্রভুর সেবক গোবিন্দকে বলিয়া এই উপচারগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তারপর প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, “রঘুনাথ, গোবর্দ্ধন-শিলা আর গুঞ্জামালা দান ক'রে প্রভু তোমায় কোন্ বিশেষ ইঙ্গিত দিলেন তা কি বুঝতে পেরেছো?”

রঘুনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিক্ষাগুরুর দিকে চাহিয়া আছেন। স্বরূপ দামোদর উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, “প্রভুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃষ্ণ ভজন সফল করার জন্য তোমায় যেতে হবে গোবর্দ্ধন-শৈলে। আর গুঞ্জামালা অর্পণের মূল কথা হ'লো, এখন হতে তোমার স্থান হ'লো রাধারাণীর চরণে।”

রঘুনাথের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেন, “প্রভু কেন আমার ওপর এত নির্দ্দয়? কেন আমায় বৃন্দাবনে গিরি গোবর্দ্ধনে পাঠাচ্ছেন? আমি যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ধ্রুবতারা। বৃন্দাবনের ঘনীভূত রূপ যে আমি প্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ প্রভুর মধ্যেই যে আমি দেখেছি, আর তাঁর এই তত্ত্বই যে এতদিন অনুধ্যান ক'রে আসছি।”

“না—রঘুনাথ, তোমার ভয় নেই। এখনি প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে যেতে বলছেন না। যাবে তুমি পরবর্ত্তীকালে, তোমার তপস্যার

শেষ পর্য্যায়ে। এখন পরমানন্দে প্রভুর সাহচর্য্য তুমি করো, ব্রজরস সাধনার যে সব অত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রভুকে কেন্দ্র ক'রে দিনের পর দিন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ করো, তোমার ভজনময় জীবনকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোল।"

বিস্ময়কর ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমনি ছিল অসামান্য ভজননিষ্ঠা। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি অতিবাহিত করিতেন ভজন পূজন, রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা, আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষীভূত লীলা দর্শনে। প্রেমভক্তির মহাসমুদ্র প্রভু শ্রীচৈতন্য। সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দিনের পর দিন নৃত্য করিতেছে অগণিত ভাবতরঙ্গ, এই তরঙ্গভঙ্গ প্রভুকে উত্তাল করিয়া তুলিতেছে। কখনো মিলনের আনন্দে হাসিতেছেন, গাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনো বা বিরহের শোকে হইতেছেন মুহ্যমান। এই ভাবতরঙ্গের মোহন লীলা যেমন অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ প্রভৃতির হৃদয়কে নাচাইতেছে,—তেমনি উদ্বুদ্ধ করিতেছে রঘুনাথ প্রভৃতি ভজননিষ্ঠ নবীন ভক্তদের।

প্রভুর এসময়কার অলৌকিক প্রেমলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা রঘুনাথ। স্বরূপ ছিলেন প্রভুর সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী ও তাঁহার মহাভাবের সূত্রকার, আর এই পরম নিগূঢ় সূত্রের বৃত্তিকার হইলেন রঘুনাথ।

দিনের বেলায় প্রভুর সান্নিধ্যে থাকিয়া রঘুনাথ তাঁহার অপার অনন্ত ভাবশাবল্য প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর রাত্রিতে প্রভু গম্ভীরা-গর্ভে বসিয়া মহাভাবের যে লীলানাট্য উদ্‌ঘাটিত করিতেন, তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না বটে, কিন্তু এই লীলানাট্যের মর্ম্মকথা রঘুনাথ দিনের পর দিন শুনিতেন তাঁহার শিক্ষাগুরু স্বরূপ দামোদরের মুখে। ভজননিষ্ঠা আর ইষ্টকৃপার ফলে ভক্ত রঘুনাথের অন্তর্জ্জীবন প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাধুর্য্যের রসে রসায়িত হইয়া উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের পরমোদয় দেখা দেয় তাঁহার সাধন-সত্তায়।

ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ নীলাচলে প্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেন,

প্রভুর কৃপা আর স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় এসময়ে তাঁহার জীবন-তপস্যা সফল হইয়া উঠে। ইহার পর আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের পালা। নীলাচলের লীলানাট্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া প্রভু হন অন্তর্দ্ধান। প্রভু-সর্ব্বস্ব স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মর্ত্ত্যধাম।

পর পর দুইটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ উন্মত্তের মত হইয়া উঠেন। কয়েকদিনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালাটি ঝুলিতে পুরিয়া রওনা হন তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে। মনে মনে স্থির করেন, সেখানে গিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ দুই প্রবীণ পার্ষদ সনাতন ও রূপের চরণে দণ্ডবৎ করিবেন, তারপর এই নরদেহ ত্যাগ করিবেন ভৃগুপাত করিয়া। পুণ্যগিরি গোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এবার তিনি ছেদ টানিয়া দিবেন বিরহখিন্ন অকিঞ্চিৎকর জীবনে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় অন্ত্যলীলা দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাই সেখানকার গোস্বামীরা ও ভক্তেরা অধীর হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

সনাতন ও রূপ তাঁহাকে বহুতর প্রবোধ দিলেন, কহিলেন, "রঘুনাথ, আমরা দুই ভাই প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আছি। তুমি হচ্ছো আমাদের আর এক ভাই। এসো তিন ভাইয়ে মিলে বৃন্দাবনে প্রভুর আদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করি। তাছাড়া, তুমি ভৃগুপাত ক'রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীলা গম্ভীরালীলার কথা আমরা কার মুখ থেকে শুনবো? প্রভুর অন্ত্যলীলায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই পরম লীলাতত্ত্ব স্বরূপ দামোদর তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ ক'রে স্বরূপ তোমায় নিজের কাছে রেখে বিশেষভাবে প্রভুর লীলাতত্ত্ব বুঝিয়েছেন। তুমি নিজেও সেই লীলা দর্শন করেছো, তার মাধুর্য্যে অবগাহন করেছো। সেই পুণ্যকথা ও পুণ্যতত্ত্বই তো তোমার মুখে আমরা শুনতে চাই।"

সনাতন ও রূপের স্নেহের বন্ধনে রঘুনাথ বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে থাকিয়া ব্রজরস-সাধন করিতে হইবে এই ইঙ্গিত প্রভু শ্রীচৈতন্য বহু পূর্ব্বে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ তাই এবার কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া শুরু করেন প্রভু-নির্দ্দিষ্ট সাধনা, এই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হইতে থাকে তাঁহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্যা।

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর নিগূঢ় প্রেমলীলাব কথা আলোচনা করিতেন, তাঁহার মুখে এই লীলার মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব শ্রবণ করিতেন। এবার বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি লাভ করিলেন মহাপ্রেমিক সাধক রূপগোস্বামীর স্নেহময় সান্নিধ্য। প্রভুর মাধুর্য্যরস উদ্‌ঘাটনে রূপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' মাধুর্য্যময় সাধনা ও নিগূঢ় প্রেমরহস্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সমুজ্জ্বল। শ্রীরূপ যেমন তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিতেন, রঘুনাথও তেমনি বর্ণনা করিতেন মহাভাবময় জীবনের বহু রোমাঞ্চকর দৃশ্য। তাই উভয়ের মধ্যে এসময়ে গড়িয়া উঠে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্বন্ধ। প্রেমভক্তিসিদ্ধ রূপ গোস্বামী মধুর রসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে পারদর্শী। এখন হইতে রঘুনাথের সাধন জীবনে তিনি গ্রহণ করেন স্বরূপের স্থান।

শ্রীচৈতন্যের লীলা কাহিনী শোনার জন্য, স্বরূপ ও রামানন্দের প্রেমতত্ত্ব শোনার জন্য, বৃন্দাবনের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর ভক্তেরাই রঘুনাথেব কুটিরে আসিতেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একান্ত অনুগত। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভূতি। শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও তাঁহার মর্য্যাদা ছিল অপরিসীম। ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, মাধুর্য্য রসের সাধনায় ব্রতী হন। কৃষ্ণদাস প্রায় সময়েই রঘুনাথের সান্নিধ্যে থাকিতেন, সুযোগ পাইলেই তাঁহার সেবা যত্নে নিজেকে করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

---

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রকৃত দীক্ষাগুরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত প্রমাণ নাই। কেহ বলেন তাঁহার গুরু ভট্ট গোস্বামী, কেহ বলেন রূপ গোস্বামী।

রঘুনাথের সঙ্কল্প, গোবর্দ্ধনে গিয়া কঠোর তপস্যায় তিনি ব্রতী হইবেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে কাটাইয়া দিবেন অবশিষ্ট জীবন। রূপ গোস্বামী এবার আর তাঁহাকে বাধা দিলেন না। শুধু কহিলেন, "গোবর্দ্ধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্তু, সদাই তুমি থাকো ভাবোন্মত্ত, বাহ্য-জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তো দেহ থাকবে না। কৃষ্ণদাস তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা করবে।"

রূপ গোস্বামীর কথা অমান্য করার উপায় নাই। কৃষ্ণদাসকে তাই সঙ্গে নিতে হইল। অতঃপর পদব্রজে কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে উপনীত হইলেন গোবর্দ্ধনে। এই গোবর্দ্ধনেই রঘুনাথের সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতের মহামূল্যবান তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানুভূতির বলে রচনা করেন অমর গ্রন্থ -চৈতন্যচরিতামৃত।

গোবর্দ্ধনের পাদদেশে রহিয়াছে গৌড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার উপবেশন ঘাট। এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রভুর উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবৎ জানাইয়া রঘুনাথ আশ্রয় নেন এক বৃক্ষতলে। এখানেই শুরু তাঁহার নূতনতর তপস্যা।

সনাতন গোস্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধন ভজন করিতেছেন। তিনি তখন অতিশয় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না থাকিলে চলাফেরা বড় একটা করেন না। পরম স্নেহভাজন রঘুনাথের আগমনের কথা শুনিয়া সনাতন ছুটিয়া আসিলেন। দুই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল।

তবে কৃষ্ণদাসের লেখা অনুযায়ী এবং ভক্তিরত্নাকরের মতে, রঘুনাথই তাঁহার গুরু : শ্রীমৎ দাসগোস্বামী—রসিকমোহন।

দীক্ষাগুরু না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাগুরু বা "সারগুরু যে রঘুনাথ তাহাতে বিতর্কের অবকাশ নাই : চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা—রাধাগোবিন্দ নাথ।

সনাতন উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ এস্থানে তপস্যা করবে বলে এসেছো, তা ভালই। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তোমায় এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে দেব না। তোমার জীবন মহাপ্রভুর আশিস্‌পূত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে তাঁরই মাধুর্য্য লীলার স্তবগান, লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে।"

"আমি কাঙাল বৈষ্ণব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো যথেষ্ট, প্রভু।" করজোড়ে নিবেদন করেন রঘুনাথ।

"না রঘুনাথ তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুমি ভজনময় জীবন যাপন করো। এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংস্র জন্তুজানোয়ারের অভাব নেই। বৃক্ষতলে রাত্রিকালে বাস করা সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, তোমার এখন বয়স হয়েছে, কুটিরের আশ্রয় নেওয়াই দরকার।"

সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া ভক্ত গ্রামবাসীরা দলে দলে সেখানে সমবেত হইতে থাকে। সনাতনের আদেশে তখনি সবাই মিলিয়া পর্ণকুটির বাঁধিয়া ফেলে, রঘুনাথ ও তাঁহার সেবক কৃষ্ণদাস যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সনাতনের কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা নবাগত সাধক রঘুনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে থাকে।

যেস্থানে ভজন কুটিরটি তৈরী করা হয় তাহার নাম অরিট গ্রাম। জনশ্রুতি আছে, অরিস্ট নামে এক অসুর বৃষের রূপ ধরিয়া ব্রজমণ্ডলে দৌরাত্ম্য শুরু করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এই স্থানটিতে তাহাকে বধ করেন। অসুর বধের পর্ব্ব তো শেষ হইল, কিন্তু এসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকে তিনি কহিলেন, "বৃষরূপী অসুর তুমি বধ করেছো, এর ফলে হয়েছো মহাপাপের ভাগী। সর্ব্বতীর্থের জলে স্নান না করলে তো তোমার এ পাপ মোচন হবে না।"

চাতুর্য্য ও পরাক্রমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয়। তখনি সহাস্যে তিনি পদাঘাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত করিলেন সর্ব্বতীর্থের পুণ্যময়

সলিল ধারা তাহার ফলেই সৃষ্ট হয় এই অঞ্চলে পবিত্র শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড।

গিরি গোবর্দ্ধনের পাদদেশেই রহিয়াছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। প্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহার গোবর্দ্ধন পরিক্রমার কালে, ভাবাবেশে মত্ত থাকা অবস্থায়, এই কুণ্ড দুইটি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে মজিয়া গিয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছে নীচু ধানের ক্ষেত রূপে। প্রভুর আবিষ্কৃত পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান রঘুনাথ তাঁহার ধ্যানবলে নির্ণয় করিলেন। কিন্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তো কাজ হইবে না, গভীর করিয়া এ দুটিকে খনন করা দরকার। সারা ভারতের ভক্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করা দরকার।

রঘুনাথ নিজে কাঙাল বৈষ্ণব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় পাইবেন? তাই খেদের তাঁহার পরিসীমা রহিল না।

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইষ্টদেবের কাছে, সজল নয়নে রঘুনাথ নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি, "হে প্রভু, করুণাসিন্ধু, পরম পবিত্র কুণ্ড দুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব ক'রে তোল। লক্ষ লক্ষ ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের এই আর্তি বিফলে যায় নাই। ভক্তবৎসল প্রভু অচিরে ইহার ব্যবস্থা করিলেন।

সেদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে বিশ্রাম করিতেছেন, অন্তরে বার বার উঠিতেছে চিন্তার তরঙ্গ— 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা আজো সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ যে তাঁর বড় সাধের কাজ!'

এমন সময়ে এক পশ্চিমদেশীয় ধনী বৈষ্ণবভক্ত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানায়। করজোড়ে নিবেদন করে, "বাবাজী, আপনিই কি গোস্বামী রঘুনাথদাস?"

"হ্যাঁ বৎস, আমিই গোস্বামীদের দাস—রঘুনাথ। কোথা থেকে তুমি আসছো। কি প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধ্যমত আমি তা করতে চেষ্টা করবো।" শান্ত স্বরে উত্তর দেন রঘুনাথ।

"প্রভু, আপনার কাছে একটা জরুরী কাজে আমি এসেছি। এখন সোজা আসছি বদরিনারায়ণ থেকে। প্রভু নারায়ণজীর কাছে পূজার মানৎ ছিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে, সাড়ম্বরে তাঁর পূজো দেবো ব'লে বদরিনাথে পৌঁছালাম। সেই রাত্রেই প্রভুজী স্বপ্নে দিলেন প্রত্যাদেশ—এখানকার পূজোয় বেশী অর্থ ব্যয় করার তোমার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পূজো সম্পন্ন করো, তারপর সোজা চলে যাও ব্রজমণ্ডলের অরিট গ্রামে। সেখানে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথদাস চিন্তিত হয়ে পড়েছে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন কাজের জন্য। ব্যয়সাপেক্ষ এ কাজটি তুমি ক'রে দাও। রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করো। এই জন্যেই আপনার কাছে আমি এসেছি।"

রঘুনাথের নয়ন দুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন। নিজেই সব কিছুর ব্যবস্থা তাই করিয়াছেন।

অচিরে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে খনন করিয়া পরিণত করা হয় স্নিগ্ধ সরোবরে। এই জলপূর্ণ পবিত্র কুণ্ডদ্বয়ের মহিমার কথা এসময়ে ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী এখানে আসিয়া পুণ্যস্নান সম্পন্ন করিতে থাকে। এখন হইতে রঘুনাথ অভিহিত হইতে থাকেন রাধাকুণ্ডের দাস গোস্বামী নামে।

রঘুনাথের পর্ণকুটিরটি ছিল রাধাকুণ্ডের অতি নিকটে। অতঃপর তাঁহার তপঃপ্রভাবে এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে নির্ম্মিত হয় বহুতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন কুটির। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়া ভজন সাধন করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া আরো বহু বৈষ্ণব সাধক এখানে ভজন কুটির স্থাপন করেন এবং রাধাকুণ্ড ক্রমে পরিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনে।

নীলাচলের মত রাধাকুণ্ডে থাকিতেও রঘুনাথ তাঁহার কৃচ্ছ্রব্রত

ও ভজননিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসিতে দেন নাই। পাষাণের রেখার মত স্থির অবিচল ছিল তাঁহার এই দৈন্য-বৈরাগ্যময় সাধনার ক্রম। কখনো কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় হওয়ার উপায় ছিল না। সদাসঙ্গী ও ভক্তশিষ্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার এই দিনচর্য্যার বর্ণনা দিয়াছেন :

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥
রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে॥

(চৈ, চৈ, আদি ১০ম)

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ও যুগল লীলার মানস পূজা ছিল রঘুনাথের প্রেম সাধনার মূল উপজীব্য। রসরাজ কৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি মহাভাবময়ী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্জ্বল থাকিতেন তাঁহার সাধন সত্তায়। রাধাকৃষ্ণের এই মিলিত মাধুর্য্যমূর্ত্তি তিনি দর্শন করিতেন ইষ্টদেব প্রভু-শ্রীচৈতন্যের মধ্যে।

'অন্তরঙ্গ সেবা' বা সখী বা মঞ্জরী রূপে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবায় রঘুনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম। এই সাধনার বিভিন্ন স্তরে যে দুরবগাহ ভাবময়তা ও প্রেমোন্মাদনা তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিত, ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে তাহা ছিল পরম বিস্ময়কর।

"রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তি, অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ বা বিরহদশায় তাঁহার সখীগণ যেভাবে তাঁহার প্রতি সমদুঃখিনী হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথ ও অন্তর্দ্দশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে, তাঁহার আত্মবিস্মৃত ভাবের উত্তর হইতে উহা বুঝা যাইত। এই অবস্থার কথাই ভক্তমালে আছে—

আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥

"রূপগোস্বামী ললিত মাধব নাটক রচনা করিয়া রঘুনাথকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলম্ভ লীলা অতি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রঘুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। এই জন্য তাঁহার সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে "দানকেলি-কৌমুদী" নামক ভাণিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার করে অর্পণ করেন। প্রতিষেধক ঔষধের মত উহাতে পূর্ব্ব উপদ্রবের নাশ হইল, পুস্তক পাইয়া রঘুনাথ সুস্থ ও সুখী হইলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থারম্ভ ও উপসংহারের আশীর্ব্বচনে এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন।

"একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলে, তাঁহার তপঃপ্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাঁহারা যেন স্থির হইতে পারেন না। একজনের জন্য সমগ্র দেশ উন্নত হয়, ধন্য হয়, পুণ্যময় হয়। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে সকলের প্রাণে এক নূতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ সনাতন যত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন; গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও ভূগর্ভ গোস্বামী তাঁহার নিকটেই ভজন-কুটিরে থাকিতেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা যে যখন শ্রীধামে আসিতেন, রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন।[১]"

রঘুনাথের অকৃত্রিম ভজননিষ্ঠা ও প্রেমসাধনার সিদ্ধি তাঁহাকে সারা ব্রজমণ্ডলে বরণীয় করিয়া তোলে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলার এক মরমী ব্যাখ্যাতা রূপেও তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন্যতম অবদান তাঁহার রসমধুর

---

১ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র।

স্তবাবলীর উল্লেখ করিতে হয়[১]। অন্তরঙ্গ সেবনের মধ্য দিয়া যখন তাঁহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়া উঠিত, অন্তর-পুরুষ তখন দুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেন। সুললিত এবং ভাবময় স্তবরাশি নির্গত হইত এই ভজনসিদ্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠে হইতে। এই স্তবাবলী প্রমাণিত করে যে তিনি দিব্যলীলা দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন এক প্রতিভাধর কবি ও শাস্ত্রবিদ্ সাধক। আজো ইহা অগণিত ভক্তের সাধনপথের পরম পাথেয় হইয়া আছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ রঘুনাথ রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহা বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র সমাদৃত।[২]

ভজন সিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধ রঘুনাথ লাভ করিয়াছেন, অন্তরঙ্গ সেবার কালে ব্রজের মাধুর্য্য-লীলা দর্শনে হইয়াছেন আপ্তকাম। কিন্তু তবুও দৈন্যময় সাধনার পথে তাঁহার সতর্কতার বিরাম নাই। অশন বসনে, আচার ব্যবহারে বৈরাগ্য সাধনার সেই পাষাণের রেখা ঠিক তেমনি রহিয়াছে অবিচল

নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। রঘুনাথের কল্যাণ কামনা নিয়া এই মাতৃস্বরূপা সাধিকা কিছুদিন রাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। এসময়ে তাঁহার কাছে নৈষ্ঠিক বৈরাগী রঘুনাথ নিজের সম্পর্কে যে আর্ত্তি প্রকাশ করেন তাহার তুলনা বিরল। বহু বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়, পরম শ্রদ্ধেয়, এই সিদ্ধ বৈষ্ণব সজল নয়নে বলিতেছেন :

বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাঁসো লাজ ভয়।
কি গুণে চৈতন্য পদ দিবেন অভয়॥

---

১ শ্রীমৎ দাস গোস্বামী : রসিকমোহন। এই গ্রন্থে রঘুনাথের সংস্কৃত স্তবের সুললিত অনুবাদ দেওয়া আছে।

২ অপর গ্রন্থগুলির নাম—শ্রীদাম চরিত, মুক্তাচরিত এবং দানকেলি-চিন্তামণি। স্বরূপ ও দামোদরের প্রখ্যাত কড়চার বৃত্তিকার রূপেও রঘুনাথ ভক্তসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাছাড়া, পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত তিনটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

একদিন না করিনু চরণ সেবন।
তথাপি চরণ মাঁগো হেন দীনজন॥
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥

(প্রে, বি, ৬শ বিলাস)

এই আর্ত্তি ও দৈন্য এখনো কেন রহিয়াছে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের? ব্রজরস সাধনার উত্তম অধিকারী মাত্রেই তাঁহার ঐ উক্তি হইতে বুঝিয়া নিবেন, বৈরাগ্যের নিষ্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ নিজের অহমিকাকে দিনের পরদিন অবলুপ্ত করিয়া দিতেছেন, আর কৃষ্ণ অনুরাগের ভাণ্ডটিকে করিতেছেন প্রশস্ততর।

নীলাচলে থাকিতেই রঘুনাথের কৃচ্ছ্র চরমে উঠে। সাধন জীবন তাঁহার অব্যাহত রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া নামমাত্র আহার্য্য সারাদিনের পর গ্রহণ করিতেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রকট হইবার পর অন্ন তিনি একেবারে ত্যাগ করেন, সামান্য ফল ও দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন।

বৃন্দাবনে আগমনের পর আহার আরও হ্রাস পায়। দুই একটি ব্রজফল এসময়ে খাইতেন, আর দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতেন অল্প পরিমাণ ঘোল।

রাধাকুণ্ডের তপস্যাময় জীবনে তো আহার্য্য সম্বন্ধে কোন হুঁসই তাঁহার থাকিত না। সারা দিন ও রাতের বেশী সময়ই থাকিতেন ভজনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্ণদাস এবং অপর একটি ব্রজবাসী ভক্ত সুযোগ মত পাতার দোনা করিয়া তাঁহার মুখে কিছুটা ঘোল ঢালিয়া দিতেন। এই ধরণের কৃচ্ছ্র চলিতে থাকে প্রায় বিশ বৎসর ব্যাপিয়া।

অতঃপর বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামীদের মধ্যমণি সনাতন তনু ত্যাগ করেন। অগ্রজ প্রতিম এই মহাবৈষ্ণবের তিরোধানে রঘুনাথ শোকে হন মুহ্যমান। তারপর আসে আর এক দুর্দ্দৈব। রূপ গোস্বামীও ভক্ত বৈষ্ণবদের মায়া কাটাইয়া মরধাম হইতে অন্তর্হিত হন। গুরু-স্থানীয় এই সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথা শুনিয়া রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের

জন্য অন্নজল ত্যাগ করেন। এসময়ে তাঁহার দেহটি বাঁচাইয়া রাখা হয় কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ভক্তদের এক বড় সমস্যা।

বিস্ময়ের কথা এই শোকজর্জ্জর অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতনু, মহাসাধকের নিয়মিত ভজন পূজন ও অন্তরঙ্গ সেবায় কিছুমাত্র ব্যত্যয় দেখা যায় নাই।

অতি ক্ষীণ শরীর তুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু তুই চারি দিনে॥
যত্তপিও শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাপয়॥
নিয়ম-নির্ব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে॥

(ভ. র. ষষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ)

প্রেমঘন মূর্ত্তি রঘুনাথ গোস্বামীর চরণতলে এসময়ে অনেক সাধকই আসিয়া উপবেশন করিতেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রঘুনাথগত-প্রাণ ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তিনি সিদ্ধ মহাত্মা রঘুনাথের সাহচর্য্য করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে দিনের পর দিন শুনিয়াছেন গম্ভীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধায়িত মহাপ্রভুর প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা।

আজিও কল্পনা করা যায় : ভজন কুটিরের এক প্রান্তে ঘৃতের প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি জ্বলিতেছে সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব রঘুনাথের যুগলভজনময় জীবনের স্নিগ্ধমধুর দীপশিখা— যে শিখা শত শত বৎসর ব্যাপিয়া অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে বিছাইয়া দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জ্বল রসের স্নিগ্ধ প্রলেপ—মানুষকে উর্দ্ধায়িত করিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিকে, অপ্রাকৃত ব্রজধামের দিকে। আর সেই দীপ শিখারই মৃত্যু আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন ব্রজরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা। তাঁহার প্রাণ-প্রিয় মহান্ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন তিনি গোস্বামী রঘুনাথের দিব্য প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত হইয়া।

আরও কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়। গোস্বামী রঘুনাথ এবার আসিয়া দাঁড়ান তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। বয়স তখন তাঁহার প্রায় চুরানব্বই বৎসর। আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশীর পরম লগ্নটি সেদিন আসিয়া যায়। ১৫১৪ শকের[১] চিহ্নিত ক্ষণটিতে আপ্তকাম মহাসাধক রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়।

রাধাকুণ্ডের ভজনকুটিরের কম্পমান দীপশিখাটি সেদিন নিভিয়া যায়; আবার বুঝি নূতন করিয়া দিব্যরূপে জ্বলিয়া উঠে রাধামাধবের অপ্রাকৃত মহাধামে।

১ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত—অচ্যুতচরণ চৌধুরী। দ্রঃ রঘুনাথ গোস্বামীর মৃত্যু সাল সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলার উপায় নাই। চৌধুরী মহাশয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই সালের কথা লিখিয়াছেন।

সাধু নাগমহাশয়

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই পার্ষদ, বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়, সম্বন্ধে কবিবর গিরিশ ঘোষ দুইটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এ উপমার মধ্য দিয়া এই দুই মহাপুরুষের সাধনসত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে। গিরিশ বলিয়াছেন, "নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যতই তিনি কষে বাঁধেন, ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়িতে কুলোয় না। শেষটায় নরেন এত বড় হ'লো যে মায়া তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো। নাগমশাইকেও মহামায়া বাঁধতে গেলেন। কিন্তু যতই তিনি বাঁধেন, নাগমশাই ততই সরু হয়ে যান। ক্রমে এমন সরু হন যে মহামায়ার জাল গলিয়ে অবলীলায় বেরিয়ে পড়েন।"

অধ্যাত্মক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা, রামকৃষ্ণ-প্রতিভূ স্বামীজী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত। তাঁহার জীবন তথ্য অনেকেরই অবিদিত নয়। কিন্তু ভক্তপ্রবর দুর্গাচরণ নাগ আজীবন ছিলেন আত্মগোপন প্রয়াসী, তাই তাঁহার পুণ্যজীবনের কথা জানিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় নাই। মহামায়ার মায়ার জাল এড়াইবার সাথে সাথে নাগমশাই আশে-পাশের মানুষের দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। দৈন্যময় ভক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ। অপূর্ব্ব ভক্তিবলে নিজেকে যেমন করিয়া তোলেন রামকৃষ্ণময়, তেমনি সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিতে থাকেন রামকৃষ্ণসত্তার পুণ্যময় প্রকাশ। বিবাহিত জীবনের ত্যাগে ও সংযমে, গার্হস্থ্য জীবনের পুণ্যময়তায় তাঁহার জীবন হইয়া ওঠে দিব্য মহিমায় ভরপুর। স্বামী বিবেকানন্দকে তাই একদিন ভাবগদ্গদ কণ্ঠে বলিতে শুনা গিয়াছিল, "পৃথিবীর এত দেশ দেখে এলাম, কিন্তু নাগমশাইর মত মহাপুরুষ একজনও চোখে পড়লো না।"

পূর্ব্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছেই দেওভোগ গ্রাম। এই গ্রামে,

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট দুর্গাচরণ ভূমিষ্ঠ হন। পিতা দীনদয়ালের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। কলিকাতায় কুমারটুলীর পালচৌধুরীদের গদিতে থাকিয়া সামান্য কাজ করেন। পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেশে বাস করিয়া পুত্র দুর্গাচরণ ও কন্যা সারদাকে কোনমতে মানুষ করিতে থাকেন।

দুর্গাচরণের বয়স তখন আট বৎসর। রোগজীর্ণ দেহ নিয়া জননী হঠাৎ একদিন লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। বালক পুত্র ও কন্যার লালন পালনের সমস্ত কিছু ভার পড়ে পিসীমা ভগবতী দেবীর উপর। পিসীমারই স্নেহ যত্নকে অবলম্বন করিয়া দুর্গাচরণের প্রথম জীবন গড়িয়া উঠে।

পিতা দীনদয়াল ছিলেন বড় ধর্ম্মভীরু ও নির্লোভ। সামান্য কর্ম্মচারী হইলেও পালচৌধুরীরা তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন, ঘরের লোকের মত ভাবিয়া বিশ্বাসও কম করিতেন না।

দীনদয়ালের ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোভহীনতার নানা কাহিনী রহিয়াছে। সে-বার পালচৌধুরীদের এক নৌকা-ভর্ত্তি নূনের চালান নারায়ণগঞ্জে যাইতেছে। দূর নৌকাপথে বিপদ যথেষ্ট, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী না হইলে চলে না। তাই দীনদয়ালকেই এ কাজের ভার দেওয়া হইল।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়া নৌকা চলিতেছে. ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া উঠে। কাছে দুই চারিটি বসতি দেখিয়া নৌকা এক জায়গায় নোঙর করা হয় এবং দীনদয়াল সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে থাকেন। অতি প্রত্যূষে নীচে নামিয়া তিনি শৌচে গিয়াছেন, মাটি হাতড়াইতে গিয়া হঠাৎ কি একটা শক্ত ভারি বস্তু আঙুলে ঠেকিল। খুঁড়িয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা ঘড়া, সোনার মোহরে উহা পূর্ণ।

দীনদয়াল ত্রস্তেব্যস্তে নৌকায় ছুটিয়া আসিলেন। মাঝিদের কহিলেন, "ওরে, শিগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দে, এখানে যেন বিপদের আভাষ পাচ্ছি।" তৎক্ষণাৎ নৌকা ভাসানো হইল, আর মোহরের ঘড়া হইতে দূরে আসিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পরে এ কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, "কবে কোন ব্রাহ্মণ এ ঘড়ায় মোহর পুঁতে রেখেছে কি না কে জানে? শেষটায় কি ব্রহ্মস্ব

অপহরণের পাপ মাথায় নেবো? পাছে নিজেরই অজ্ঞাতে মনে লোভ আসে, এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয়, তাই ছুটে পালিয়ে এলাম।"

এমনি সততা ও ধর্ম্মপরায়ণতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন নাগমশায়ের পিতা।

নারায়ণগঞ্জের বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর বেশী পড়ানো হয় না। এ পড়া বালক দুর্গাচরণের শেষ হইল। এবার সমস্যা—কোথায় তিনি পড়িবেন? কাছাকাছি স্কুল কোথাও নাই। বালক পিতাকে ধরিয়া বসিল, কলিকাতায় সে পড়িতে যাইবে। কিন্তু দীনদয়াল রাজী হন না। তাঁহার যে আয় তাহাতে নিজের খরচ চালাইয়া পুত্রকে পড়ানো সম্ভব নয়।

দুর্গাচরণ কিন্তু হটিবার পাত্র নন, লেখাপড়ার ঝোঁক তখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। স্থির করিলেন, দশ মাইল দূরে ঢাকায় গিয়া পড়িবেন। কাজটি বালকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়। যাতায়াতে দুইবেলা প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পিসীমার নয়নাশ্রু, সঙ্গীসাথীদের বারণ, কোন কিছুই সেদিন তাহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি পড়াশুনা শুরু করিয়া দিলেন।

শীতাতপ, ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যায়, দৃঢ়চিত্ত বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই, হাঁটিয়া একাকী নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যোগ দিতে থাকে। এই অধ্যয়নস্পৃহা ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া একটি শিক্ষকের বড় দয়া হয়। দুর্গাচরণকে ডাকিয়া বলেন, "বাছা, কষ্ট ক'রে দূর পথে যাতায়াত না ক'রে তুমি আমার বাসায়ই এসে থাকো। যা হয় কষ্ট ক'রে আমার চলে যাবে।"

এ প্রস্তাবে বালক কিন্তু রাজী হয় নাই। নিত্যকার পথশ্রান্তিকে গুরুত্ব না দিয়া অবলীলায় কহিল, "রোজ এই কয় মাইল হাঁটতে আমার তেমন কষ্ট হয় না। আপনি সেজন্য ভাববেন না।"

দুর্গাচরণ ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। পিসীমা তাহার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাতৃহীন দুর্গাচরণের লালন পালনের ভার তাঁহারই উপর। এবার তাহাকে সংসার

জীবনে ব্রতী করিতে পারিলে তবে তাঁহার স্বস্তি। উদ্যোগী হইয়া তিনি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এগারো বৎসর বয়স্কা কন্যা প্রসন্নকুমারীকে বধূ রূপে ঘরে আনা হইল।

বিবাহের কয়েকমাস পরের কথা। নাগমশাই কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন। এখানে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিনি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা ঘটনার আবর্তে পড়িয়া এই ডাক্তারী পড়া তাঁহাকে ছাড়িতে হয়।

অতঃপর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর অধীনে থাকিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিতে থাকেন।

বিবাহের পর নাগমশাইকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। ইহার পর দুই তিনবার তিনি বাড়ী গিয়াছেন, কিন্তু এযাবৎ স্ত্রীর সাথে আলাপ পরিচয় কিছু হয় নাই। সংসার জীবনের উপর, দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর, এক সহজাত বীতরাগ নিয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছেন। নববধূর সান্নিধ্যে আসিলেই নাগমশাই বড় ভীত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ রাত্রি ঘনাইয়া আসিলেই তাঁহার মনে আসে এক আতঙ্ক। স্ত্রীর সহিত কি করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন. ইহাই হইয়া উঠে বড় সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গে এক ফন্দী বাহির করিয়া বাড়ীর সংলগ্ন এক উঁচু গাছে তর্ তর্ করিয়া তিনি চড়িয়া বসেন। জানাইয়া দেন, এখানেই রাত কাটাইবেন।

পিসীমাকে এবার আগাইয়া আসিতে হয়। চীৎকার ও অনুনয় বিনয়ের পর অবশেষে তাঁহাকে বলিতে হয়, "আচ্ছা, তোকে বৌর কাছে থাকতে হবে না, আমার ঘরেই তুই শুয়ে থাক্‌বি, এবার নেমে আয়।"

নিজের মনকে পিসীমা প্রবোধ দেন, 'দুর্গাচরণের এ ছেলেমানুষী বেশীদিন আর থাকবে না, কিছুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হবেই।'

নাগমশাইর এ সমস্যা কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে হঠাৎ সরল হইয়া যায়। কলিকাতায় একদিন সংবাদ আসে, নববধূ আর ইহজগতে নাই, আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া সে পরলোক গমন করিয়াছে।

নাগমশাই হাঁফ ছাড়িলেন। যাক্ সংসার বন্ধন হইতে এবার তবে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

হাতে ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। তরুণ ডাক্তার নাগমশাই পরম উৎসাহে গরীব দুঃখীদের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান। ভিজিটের কথা দূরে থাকুক, প্রায়ই নিজব্যয়ে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন। দরিদ্রের সেবা ও পরোপকারের নেশা তখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

ডাক্তারিতে এ সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম হইতেছে না। দুঃস্থ ও অসহায় পাড়াপড়শীর দল একান্তভাবে তাঁহারই আশ্রয় নিতে থাকে। ডাক্তারের উপর বিশ্বাস তাহাদের অপরিসীম। নূতন হইলে কি হয়, ধীর মস্তিষ্কে বিবেচনার সহিত যে ঔষধ তিনি দেন অচিরে কার্য্যকরী হইয়া উঠে। ডাঃ ভাদুড়ীকেও এ সময়ে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র নাগমশাইর ঔষধ নির্ব্বাচন ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের অজস্র প্রশংসা করিতে শুনা যাইত।

নাগমশাইর ব্যবহারিক জীবনে এ সময়ে চলিতে থাকে চিকিৎসার মাধ্যমে এই সেবাধর্ম্ম, আর তাঁহার অন্তর্জীবনে শুরু হয় অধ্যাত্ম-সাধনার তীব্র ব্যাকুলতা।

হাটখোলার দত্ত বংশের সুরেশ তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু। বাসার অতি নিকটেই সে থাকে। জীবনাদর্শের দিক দিয়া সুরেশ তখন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। অথচ নাগমশাই রক্ষণশীল, হিন্দু দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁহার অচল অটল। দুই বন্ধুতে যখনি দেখা হয়, তখনি শুরু হয় নানা বিচার বিতর্ক। সুরেশের নিন্দা সমালোচনার উত্তরে এক একদিন নাগমশাই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, “ছাখো, তুমি যতই যা বল, আমাদের বেদপুরাণ তন্ত্রমন্ত্র এসব মিথ্যে নয়। তোমার ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলে, আসলে তা হচ্ছে সাধনার চরম কথা—কিন্তু সাধন ভজনের ভেতর দিয়ে না গেলে মহামায়ার কৃপা না পেলে, সে জ্ঞান কি ক'রে হবে? ব্রহ্মজ্ঞান কি মুখের কথা? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে?”

নাগমশাইর অন্তরে এ সময়ে আসিয়াছে এক তীব্র ব্যাকুলতা। ঈশ্বরীয় কথা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কথায় এখন প্রায়ই তিনি মত্ত হইয়া উঠেন। শাস্ত্র পাঠের উৎসাহও এ সঙ্গে তাঁহাকে পাইয়া বসে। শাস্ত্র গ্রন্থ-সমূহের বঙ্গানুবাদ আনাইয়া পরম উৎসাহে তিনি সেগুলি আয়ত্ত করিতে থাকেন।

কিন্তু প্রাণের আর্ত্তি যায় কই? শাস্ত্রপাঠে ও ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা শ্রবণে তো প্রকৃত শান্তি মিলে নাই। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলেই নাগমশাই রোজ কাশীমিত্রের শ্মশান ঘটে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করেন। চিতার আগুনে শবদেহ জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মিলাইয়া যায়—নাগমশাই উদাসনেত্রে সেদিকে চাহিয়া থাকেন, নশ্বর জীবনের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া বেদনায় হন মুহ্যমান। এ অনিত্য সংসারে নিত্য ও শাশ্বত বস্তুর সন্ধান তিনি কোথায় পাইবেন? কে তাঁহাকে কৃপা করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে গণ্ড বাহিয়া কেবলি ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

কাশীমিত্রের ঘাটে সেদিন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সাথে নাগমশাইর পরিচয় ঘটে। এই সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশে অমাবস্যার নিশীথে তিনি শ্মশানে বসিয়া জপ-ধ্যান শুরু করিয়া দেন।

পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া দীনদয়াল বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন স্থির করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহাকে সংসার বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, নতুবা সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে ঘোরার বাতিক বন্ধ হইবে না। দেশে পত্র লিখিয়া কন্যা ও জামাতার সাহায্যে দুর্গাচরণের বিবাহের কথাও তিনি পাকা করিয়া ফেলিলেন।

পুত্র কিন্তু একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। কিছুতেই তিনি আর বিবাহ করিবেন না। মিনতি করিয়া কহিলেন, বিবাহিত জীবনের উপর তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই, ধর্ম্মপথের তাহা এক বড় অন্তরায়। তাছাড়া, নূতন বধূ আসিয়া পিতার যে পরিচর্য্যা করিবে, দুর্গাচরণ তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সেবা-যত্নে তাঁহাকে রাখিবেন।

দীনদয়াল বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। কন্যাপক্ষকে তিনি কথা দিয়াছেন, শেষকালে তাহাকে এভাবে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে? তাছাড়া,

দুর্গাচরণ যে তাঁহার একমাত্র পুত্র। সে বিবাহ না করিলে বংশ রক্ষাও যে হইবে না।

প্রচণ্ড বাদানুবাদের পরও দুর্গাচরণের মত পরিবর্ত্তিত হইল না। পিতা এবার মনোদুঃখে ঘরে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এ করুণ দৃশ্যটি দুর্গাচরণের চোখে সেদিন পড়িল. অন্তরে উঠিল প্রবল আলোড়ন। এ সংসারে পিতার মত আপনার জন তাঁহার আর কেউ নাই। অপার স্নেহ মমতায় পুত্রকে তিনি এতকাল ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। এই পিতার সন্তোষ বিধানই যে তাঁহার সব চাইতে বড় ধর্ম্ম।

মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্গাচরণ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন, পিতাকে কহিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন।

পাত্রী তাঁহার গ্রামেরই। শুভদিনে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল।

রোগীর চিকিৎসা, জপতপ ও ভগবৎ প্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়া কলিকাতায় নাগমশাইর দিন কাটিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল, দেশে তাঁহার পিসীমা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এই পিসীমা তাঁহার মাতৃস্থানীয়, মাতার মৃত্যুর পর হইতে ইহারই আদর যত্নে তিনি মানুষ হইয়াছেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাত্র ব্যগ্রভাবে দেওভোগে ছুটিয়া গেলেন।

পিসীমার মৃত্যু এবারে দুর্গাচরণের জীবনে আনিয়া দেয় এক চরম নির্ব্বেদের অবস্থা। দিনের পর দিন তিনি ভাবিতে থাকেন, এ নশ্বর জীবনের মূল্য কি? এই স্নেহ মায়া-মমতাই বা কতক্ষণ স্থায়ী? ভঙ্গুর জীবনের উপর এবার আসিয়া গেল তাঁহার এক প্রবল বিতৃষ্ণা। মৃত্যুর ওপারে যে আলোক, যে অমৃত চির-বর্ত্তমান, তাহারই জন্য অন্তরে জাগিয়া উঠিল পরম আকাঙ্ক্ষা।

পিতার সেবার জন্য, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, নাগমশাইকে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যেভাবে চলিলে পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি কই? ডাক্তারের

বেশভূষায় কোন আড়ম্বর নাই, রোগীদের জন্য বসিবার একটি ঘরও নাই। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি তাঁহার আজকাল হইয়াছে, দূর-দূরান্ত হইতে তাই রোগীবাড়ীর আহ্বান আসে। নিতান্ত সাধারণ বেশে ঔষধের ব্যাগটি হাতে নিয়া পদব্রজেই নাগমশাই রোগী দেখিতে বাহির হইয়া পড়েন।

দীনদয়ালের ইচ্ছা, ডাক্তার পুত্রের বেশভূষাটা ভাল হোক, ইহার ফলে উপার্জ্জন বাড়িবে। একদিন নিজেই তাঁহার জন্য দামী জামা-কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া আনিলেন। পুত্রকে কিন্তু এগুলি পরানো গেল না। তিনি বরং বলিয়া দিলেন, "পোষাক পরিচ্ছদের জন্য অপব্যয় না করে এ টাকা গরীব দুঃখীর সেবায় লাগালে সত্যিকার ভালো কাজ হোক।"

আসলে জনসেবা হিসাবে যে ডাক্তারী ব্যবসায় শুরু করিয়াছে, আর্থিক উন্নতি তাহার কাছে আশা করা বৃথা। রোগী দেখিবার সময় নাগমশাই লক্ষ্য করেন, রোগীর গায়ে আবশ্যকীয় গরম জামাকাপড় কিছু নাই, শীতে সে কাঁপিতেছে। অমনি নিজের ভাগলপুরী খেসটি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন।

তিনি যে জানেন, শুধু ঔষধে রোগ সারে না, উপযুক্ত পথ্যাদি দরকার। তাই গরীব রোগীর পথ্যের ব্যবস্থাও সেবাব্রতী ডাক্তারকে মাঝে মাঝে করিতে হয়।

সে-বার এক সঙ্কটাপন্ন রোগীকে দেখানোর জন্য দুর্গাচরণকে কল্ দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, রোগীকে ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। অমনি মনে পড়িয়া যায়, তাঁহার নিজের গৃহে তক্তাপোষ রহিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া রোগীর বাড়ীতে ঐ তক্তাপোষ স্থানান্তরিত করেন, তারপর শুরু হয় তাঁহার চিকিৎসা। ডাক্তারকে ইতিমধ্যে সবাই চিনিয়া নিয়াছে। চতুর লোকেরা চিনিয়াছে আরো বেশী, অনেক সময়ই তাহারা চিকিৎসা করানোর পর পারিশ্রমিক দেয় না। দুর্গাচরণেরও অভ্যাস নয় ভিজিটের জন্য পীড়াপীড়ি করা। ফলে আর্থিক দিক দিয়া তাঁহাকে হইতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। চিকিৎসক হিসাবে যেখানে তাঁহার আয়

হওয়া উচিত তিন চারিশত টাকা সেখানে ঘরে আসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা।

একদল চতুর ডাক্তার দুর্গাচরণের সহৃদয়তা এবং পরোপকার বৃত্তির খোঁজ রাখে। রোগীর কল হইতে ফিরিবার সময় ইহারা তাঁহার বাড়ীতে অপেক্ষা করে। দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিয়া, নানা কাঁদুনি গাহিয়া নাগমশাইর নিকট হইতে ইহারা টাকাকড়ি ধার নেয়। বলা বাহুল্য, এ টাকা তাহাদের পরিশোধ আর কখনো করিতে দেখা যায় না।

পুত্রের চিকিৎসা ব্যবসায়ের এ ধরণ দেখিয়া দীনদয়াল বড় হতাশ হন। বুঝিয়া নেন, সাংসারিক উন্নতি তাঁহার কোনদিনই হইবে না, আর পিতার বৈষয়িক কাজেও সে কখনো আসিবে না।

চিকিৎসক হিসাবে নাগমশাইর আজকাল নামডাক হইয়াছে। রায় পালবাবুরা তাঁহাকেই নিজেদের গৃহ চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেখানে তাঁহাদের গৃহের একটি সঙ্কটাপন্ন কলেরা রোগীর চিকিৎসায় নাগমশাইর ডাক পড়ে। ধীরতা, সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত তিনি এ রোগীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। পাল-বাবুরা ভীত হইয়া প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ভাদুড়ীকেও কল দেন। রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন নির্ভুল বলিয়া ডাঃ ভাদুড়ী মত প্রকাশ করেন, আর দুর্গাচরণের উপরই এ চিকিৎসার ভার দিয়া তিনি চলিয়া যান।

এই রোগী সারিয়া উঠিল। পালবাবুরা দুর্গাচরণের এই চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। এবার ডাক্তারকে ভিজিট ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করা দরকার। একটি রূপার কৌটায় প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভিজিট বাবদ রাখিয়া নাগমশাইয়ের সম্মুখে ধরা হইল। কিন্তু এ অর্থ তিনি কোনমতেই নিতে রাজী নন। সরলভাবে কহিলেন, "ঔষুধের দাম ও আমার ভিজিট বিশ টাকার বেশী কখনো হতে পারে না, আপনারা এত টাকা আমায় কেন দিচ্ছেন?"

অগত্যা ঐ বিশ টাকাই তাঁহাকে দেওয়া হইল। বাকীটা কর্ম্মচারী দীনদয়ালের নামে পূজার সাহায্যবাবদ তাঁহারা খরচ লিখিয়া রাখিলেন।

ঘটনাটি শুনিয়া দীনদয়াল তো ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুই নির্ব্বোধ, তাই নিজের প্রাপ্য টাকাটাও বুঝে নিতে পারিসনে। ও টাকা কেন এমন ক'রে ফেরত দিলি?"

নাগমশাই দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনি চিরকাল আমায় শিখিয়েছেন ধর্ম্মপথে থাকতে। এখন আবার উল্টো বলছেন কেন? আমার ন্যায্য পাওনা থেকে বেশী নিয়ে কি অধর্ম্ম ক'রবো? যাক, আপনি যেন বাকী টাকাটা স্পর্শ করবেন না।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু এভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় তোর আর কতদিন চলবে শুনি?"

"না চলে, নাই চলবে। তাই বলে মিথ্যাচার আমি করতে পারবো না। ভগবান্ হচ্ছেন সত্যস্বরূপ এ মিথ্যাচারে তাঁকে হারাতে হবে। প্রাণ থাকতে তা পারবো না।"

বৈরাগী পুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দীনদয়াল হতবাক্ হইয়া যান।

ইহার পর শ্বশুর ও পতির সেবা-যত্নের জন্য দুর্গাচরণের পত্নী কলিকাতায় আসেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবার মধ্য দিয়া শ্বশুরকে তিনি সুখী করিলেন, কিন্তু স্বামীর মন কোনমতেই আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। চিকিৎসা, পরোপকার ও নিজের ধ্যানজপের শেষে যেটুকু সময় দুর্গাচরণ পান, সেটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভগবৎ প্রসঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন। আর নববধূর সহিত তাঁহার ব্যবধানটি থাকে আগেরই মত। দাম্পত্য জীবনে কোন চাঞ্চল্য কোন তরঙ্গভিঘাতই দৃষ্টিগোচর হয় না।

নাগমশাইর জীবনে এবার দুর্ব্বার বেগে আসিতে থাকে ত্যাগ বৈরাগ্য আর মুমুক্ষার আকাঙ্ক্ষা। কেবলই ভাবিতে থাকেন, 'পরোপকার ও সেবাব্রত তো কতই করিলেন। কিন্তু কই, জীবনে পরম শান্তি তো মিলিল না? ঈশ্বর দর্শন তো আজ অবধি হইল না? এই ক্ষণস্থায়ী সংসার জীবনে ও দাম্পত্য সুখে তাহার কি প্রয়োজন? মুক্তির পথ কোথায়? কোথায়ই বা মুক্তিদাতা দীক্ষা-গুরু?'

দীক্ষা গ্রহণের জন্য নাগমশাইর হৃদয়ে আসিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা

ও আর্ত্তি। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে রোজ তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া থাকেন। ঘাটে ঘাটে সদাই দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসী ও মহাত্মাদের আনাগোনা। নাগমশাইর মনে আশা জাগে—হয়তো কোন এক শুভলগ্নে ইঁহাদের কাহারো কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িবে, প্রার্থিত দীক্ষা পাইয়া তিনি ধন্য হইবেন।

কুমারটুলি ঘাটে সেদিন তিনি বিষাদখিন্ন হৃদয়ে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, একটি নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহাদের কুলগুরু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি নিয়া নাগমশাই তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর হইল, "বাবা, তোমার কাছেই যে ছুটে এলাম। মহামায়ার প্রত্যাদেশ পেয়েছি, তোমায় দীক্ষা দিতে হবে। তাইতো কোন সংবাদ না দিয়েই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম।"

নাগমশাইর দুই চোখ তখন পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার আকুতি জগজ্জননীর কানে পৌঁছিয়াছে। তাই তিনি কৌল সাধক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সানন্দে তিনি এই কুলগুরুর কাছে সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মন্ত্র প্রাপ্তির পর একান্ত নিষ্ঠায় তিনি শুরু করেন সাধন ভজন। এক একদিন জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। একবার গঙ্গাতীরে ধ্যানতন্ময় অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জোয়ারের জল তাঁহাকে ভাসাইয়া নিয়া যায়, সম্বিৎ পাইবার পর অতি কষ্টে সাঁতরাইয়া তিনি তীরে উপনীত হন।

স্ত্রীকে নাগমশাই প্রায়ই বুঝান, "ওগো, একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখবে, কায়িক সম্বন্ধ বা মায়ার সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। ভগবান্‌কে ভালোবাসার ভেতরেই রয়েছে নরজন্মের সার্থকতা, এতেই পাওয়া যায় প্রকৃত মুক্তি। আমার এ হাড়মাসের খাঁচাটার আকর্ষণে নিজেকে জড়িও না। মা জগজ্জননীকে ডাকো, তাঁর শরণাপন্ন হও, ইহকাল পরকাল দুইয়েরই কল্যাণ হবে।"

পিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই নাগমশাই তাঁহাকে অবসর নেওয়াইয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সেবার জন্ম পত্নীকেও সঙ্গে যাইতে হইল। দীনদয়ালের কুতের কাজ দেখাশুনার ভার নাগমশাই নিজেই গ্রহণ করিলেন।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখন কলিকাতায় ছড়াইতেছে; নাগমশাই একদিন বন্ধু সুরেশের সহিত ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন।

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। চারিদিকে সেদিন যেন অগ্নিবর্ষণ শুরু হইয়াছে। বেলা দুইটায় উভয়ে দক্ষিণেশ্বরেব কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে এক শ্মশ্রুধারী সাধক তখন দণ্ডায়মান। নাগমশাই সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন, এখানে একটি সাধু থাকেন শুনেছি। তিনি কোথায়?"

উত্তর হইল, "তিনি তো এখানে নেই। আজ চন্দননগরে চলে গিয়েছেন। তোমরা বরং আর একদিন এসো।"

পথশ্রমে অবসন্নপ্রায় দুই বন্ধুর মুখে তখন কথা সরিতেছে না। হতাশ হইয়া উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দ্বারের আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া কে একজন গোপনে তাঁহাদের ডাকিতেছেন। নাগমশাইর দৃঢ় ধারণা হইল, ইনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যগ্রভাবে তিনি ও সুরেশ কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

পরে উভয়ে জানিলেন, যে শ্মশ্রুধারী সাধকটি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার নাম প্রতাপ হাজরা। দীর্ঘদিন ঠাকুরের কক্ষের পাশে বাস করিয়াও তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নয়, সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের তরুণ দর্শনার্থীদের তিনি বিভ্রান্ত করিতেন, তাহাদের মনে ধোঁকা লাগাইয়া দিতেন।

সর্বজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু সেদিন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত নাগমশাইকে চিনিতে একটুও ভুল করে নাই। তাঁহার গোপন হাতছানিটি এক অযাচিত কৃপার মতই নাগমশাইর জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ঠাকুরের দর্শন পাইয়া নাগমশাইর আনন্দের অবধি রহিল না। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কক্ষের একপাশে গিয়া বসিলেন।

ঠাকুর সস্নেহে নাগমশাই ও সুরেশের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "সংসারে থাকবে ঠিক যেন পাঁকাল মাছের মত।"

বিদায়ের সময় স্নেহভরে নাগমশাইকে কহিলেন, "আর একদিন এসো।"

যাইতে যাইতে নাগমশাই ভাবিতে থাকেন, কই, ঠাকুর তো কৃপা করিয়া একবারও চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না। অথচ এই চরণের জন্য যে তাঁহার লোভের অন্ত নাই।

পরের দিন নাগমশাই আসা মাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো তুমি না-ডাক্তার? একবার দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে।"

নাগমশাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া উত্তর দিলেন, "কই, পায়ে তো কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।"

"ওগো, আরো একটু ভাল ক'রে দেখনা কি হয়েছে।"

মুহূর্তমধ্যে নাগমশাইর অন্তরে চিন্তার রশ্মি খেলিয়া গেল। এতো অন্তর্য্যামী ঠাকুরের ছল ছাড়া আর কিছু নয়। ভক্তের মনের ক্ষোভটি এক মুহূর্তে তিনি জানিয়া নিয়াছেন। তাই কৃপা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। চরণ স্পর্শের অধিকার এভাবে দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন।

ঠাকুরের করুণার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নাগমশাই বলিতেন, "তাঁর কাছে কোন কিছু চাইবার দরকার হোত না। মনের ভাব বুঝে তৎক্ষণাৎ তিনি তা পূরণ করতেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন কল্পতরু। যে যা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে, তাই সে তখনি লাভ করেছে।"

কিছুদিন পরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন নিজের দেহটির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া নাগমশাইকে কহিলেন, "হ্যাগা, তোমার একে কি বোধ হয়?"

পরম ভক্ত যুক্তকরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি—আপনিই সেই।"

কথা কয়টি শোনামাত্র দিব্য ভাবে ঠাকুর উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, ভাবাবিষ্ট হইয়া নাগমশাইর বক্ষে তিনি চরণ স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অনুভূতি। নাগমশাই দেখেন, সমস্ত বিশ্বচরাচর হইয়া উঠিয়াছে চিন্ময়, স্বর্গীয় জ্যোতি সেখানে ওতপ্রোত।[১]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে নাগমশাই একদিন বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ (উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্দ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তিনি অদ্বৈতভাবে ভাবিত ও উদ্দীপিত। অস্ফুট স্বরে কেবলি বলিতেছেন, "চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমশাইর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে কহিলেন, "এই ছাখো, এরই রয়েছে ঠিক ঠিক দীনতা, এতটুকুও ভান এতে নেই।"

ঠাকুরের কথা মানিয়া নিয়া নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "তা আপনি যখন বলছেন, তা হবে।"

নাগমশাই ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে আলাপ শুরু হইল। নাগমশাই শুদ্ধাভক্তি পথের পথিক, কহিলেন, "সকলি তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে, আমরা নিমিত্ত মাত্র ছাড়া আর কি বলুন।"

নরেন্দ্রনাথ তাহা মানিবেন না। উত্তরে কহিলেন, "মশাই, তিনি, তাঁর এসব বুঝিনে। সবই আমি—আমিই পরমাত্মা—আনন্দময় জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিমান্। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই ভেতরে ডুব্‌ছে ভাস্‌ছে।"

"মশাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো দূরের কথা, আপনার কি সাধ্য যে একটা চুলও সোজা করেন? তাঁর ইচ্ছে না হলে গাছের পাতাটাও নড়ে চড়ে না।"

---

১ সাধু নাগমশাই : শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নরেন্দ্রনাথ সেই অদ্বৈত ভাবেরই অনুসরণে বলিয়া চলিয়াছেন, "আমি ইচ্ছে করলে চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হয়—আমারই ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে।"

তক্তাপোষটির উপরে বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন। এবার সস্নেহ হাসি হাসিয়া নাগমশাইকে বলিলেন, "কি জানো, নরেন হচ্ছে খাপ্‌খোলা তরোয়াল—ওর ওকথা শোভা পায় বটে। তা নরেন এমন বলতে পারে।"

নাগমশাইর কাছে ঠাকুরের কথা চরম কথা। ইহার পর আর আলোচনা, তর্ক বা বিচার আর চলে না। নরেন্দ্রনাথের চরণে শির ঠেকাইয়া তিনি নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান লীলা-পার্ষদ, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার বা তর্ক করার অবকাশ নাই।

একবার জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, সত্যকার কোন মুক্তপুরুষ নাগমশাই দেখিয়াছেন কিনা? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দেন, "হ্যাঁ। সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছি, আর দর্শন করেছি তাঁর সর্ব্বপ্রধান পার্ষদ—শিবাবতার স্বামীজীকে!"

নাগমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসিবার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছে। সেদিন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন—ঈশ্বরীয় কথায় তিনি রত। এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন, "ছ্যাখো, ডাক্তার উকীল মোক্তার দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্ম্মলাভ হওয়া বড় কঠিন।"

প্রসঙ্গক্রমে আরো কহিলেন, "এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, তা'হলে কি ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?"

কথাকয়টি নাগমশাইর প্রাণে বড় বাজিল। সত্যই তো! তিনি নিজের অভিজ্ঞতায়ও আজকাল দেখিতেছেন, ধ্যান-ধারণার সময় রোগীদের মূর্ত্তি আসিয়া মনের কোণে ভীড় জমায়, সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন, যে বৃত্তি বা ব্যবহারিক কর্ম্ম ঈশ্বর

লাভের বিঘ্নস্বরূপ তাহা দিয়া তাঁহার কাজ নাই। আজ হইতেই এসব ত্যাগ করিবেন।

গৃহে ফিরিবার পর সেইদিনই ডাক্তারির বই, যন্ত্রপাতি ও ঔষধ ইত্যাদি সব কিছু গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন।

কাজকর্ম্মের দিক হইতে মুক্ত হইয়া এবার আরো দৃঢ় এক নিষ্ঠা নিয়া তিনি সাধন ভজন করিয়া যাইতে থাকেন। বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বড় তীব্র হইযা উঠে। মনে মনে স্থির করেন, এ সংসারে আর থাকা নয়, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন।

ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি সংসার ত্যাগের অনুমতি নিতেই গিয়াছেন। কক্ষমধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "তা সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন থাকলেই হয়। গৃহস্থাশ্রম কেমন জানো? এ যেন কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করা।"

এবার নাগমশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওগো, তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাক্‌বে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম্ম শিখবে।"

ঠাকুরের এ আদেশ মুহূর্ত্তমধ্যে নাগমশাইর মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইল।

বৈরাগ্যের আগুন সেদিন তাঁহার সর্ব্ব সত্তায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অন্তর্জ্বালায় তিনি সদা অস্থির, কিন্তু উপায় তো কিছু নাই। ঠাকুরের এ আদেশ যে অলঙ্ঘনীয়!

ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা এখন হইতে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়, নাগমশাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। সংসার জীবনের কোন কাজকর্ম্ম আর তাঁহার দ্বারা হইবার নয়।

এই সময়ে নাগমশাইকে কিছুদিনের জন্য একবার স্বগ্রাম দেওভোগে আসিতে হয়। পত্নী স্বামীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন, ঈশ্বরের জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, সংসারের কোন বন্ধনই আর তাঁহাকে বাঁধিতে সক্ষম নয়। নাগমশাই নিজেও স্পষ্টভাবে

বলিয়া দিলেন, রামকৃষ্ণ-চরণে যে মন-প্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছেন, সংসারের কোন কাজেই আর তাহা আসিবে না।

সেদিন তিনি চুপচাপ বারান্দায় বসিয়া আছেন। গৃহের পাশের জমিটাতে জন্মিয়াছে একটি সতেজ লাউগাছ। প্রতিবেশীদের একটি গরু এই গাছটার দিকে বার বার ঝুঁকিতেছে, কিন্তু দড়িটা খাটো করিয়া বাঁধা, তাই উহার নাগাল পাইতেছে না। এই দৃশ্যটি দেখিয়া নাগমশাইর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি গরুর খুঁটাটি উপড়াইয়া দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "খাও মা, খাও, এগিয়ে গিয়ে খাও।"

বৃদ্ধ পিতা দীনদয়াল নিকটেই ছিলেন। পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "নিজে তো কিছু উপার্জ্জন করিসনে, তার ওপর আবার রয়েছে এসব অনিষ্ট করার ঝোঁক্। ডাক্তারিটা তো ছেড়ে দিয়ে বস্‌লি, এবার খাবি কি ক'রে, বল্‌তো?

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, "ভগবান্ যা হোক একভাবে চালিয়ে নেবেনই। আপনি এসব এ বয়সে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে যেন মাথা ঘামাবেন না।'

"ওরে, চলবে যে কিভাবে, তাতো বুঝতেই পারছি। এবার ন্যাংটো থাক্‌বি আর ব্যাঙ্ ধরে খাবি।"

অতঃপর দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। নাগমশাই পিতার কথার কোন জবাব দিলেন না, মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের পরিহিত বস্ত্রটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইলেন। গৃহের অঙ্গনের এক কোণে একটি ব্যাঙ পড়িয়া ছিল। এটিকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পিতাকে কহিলেন, "আপনার যাতে সত্য রক্ষা হয়, এজন্য দুটো আজ্ঞাই আমি পালন করলাম। এবার মিনতি করে বলছি, আপনি সংসারের চিন্তা আর করবেন না। বয়স হয়েছে, এবার থেকে বসে বসে কেবল ভগবানের নাম করুন।"

পুত্রের এই অদ্ভুত আচরণে দীনদয়াল বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া তিনি বুঝিয়া নেন, 'ভগবান্ ভগবান্' করিয়া পুত্র এবার একেবারে পাগল হইয়াই গিয়াছে। শঙ্কিত কণ্ঠে

পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহেন, "ছাখো, তোমরা ওর সঙ্গে এখন থেকে বুঝে-সুঝে চ'লো। ওর বিরুদ্ধাচরণ কখনো ক'রো না।"

কলিকাতায় ফিরিবার পর নাগমশাই সেদিন ব্যস্তসমস্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপান্তে বসিয়া সখেদে কহিলেন, "তাঁর ওপর নির্ভর হ'লো কই? এখনো তো নিজের চেষ্টা রয়েই গিয়েছে?"

ঠাকুর নিজের দেহটি দেখাইয়া কহিলেন, "ভয় নেই, এখানকার টান থাকলে সব ঠিক্ ঠিক্ হয়ে যাবে।"

আরেক দিন ঠাকুর তাঁহার এই বৈরাগ্যবান্ ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন. "ছাখো, তুমি গৃহেই থেকো। যেনতেন ক'রে মোটা ভাত কাপড়ে চলে যাবে।"

ঘরসংসারের উপর, বিষয় আশয়ের উপর, নাগমশাইর রহিয়াছে সহজাত বিতৃষ্ণা। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু, গৃহে থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়ই বা কি ক'রে?"

"ওগো, আমি বল্‌ছি, সত্য সত্যই বল্‌ছি, ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হবে।"

"কি ক'রে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে।"

"তোমায় কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হতে হবে না। কেবল সাধুসঙ্গ করবে।"

"ঠাকুর. আমি যে হাঁদা লোক, সত্যিকারের সাধু চিনবো কি ক'রে?"

"তোমায় সাধু খুঁজতে হবে না। যথার্থ সাধুরা নিজে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এজন্য ভেবো না।"

পিতা দীনদয়ালের রোজগার ছিল মহাজন পালচৌধুরীদের কুঠের কাজে। তিনি অবসর নিয়া গ্রামে যাইবার পর নাগমশাই কিছুদিন একাজ দেখাশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, একাজ চালানোর মত মনোবৃত্তি

মোটেই নাই। ভাগ্যক্রমে রণজিৎ নামে একটি তরুণ কর্ম্মী পাওয়া যায়। নাগমশাইর কাজ সুষ্ঠুভাবে সে-ই চালাইয়া নিতে থাকে।

এবার মনে মনে ঠিক করিলেন, ঐ কাজ রণজিৎকেই ছাড়িয়া দিবেন। যদি সে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু দেয় ভাল, নতুবা ইহা নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন না।

মনিব পালচৌধুরীর মধ্যস্থতায় স্থির হইল, কুতের কাজ হইতে যে আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেকটা নাগমশাই পাইবেন। ইহার ফলে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের কোন অসুবিধা হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এ নূতন বন্দোবস্তের কথা উঠিল। নাগমশাইর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর কহিলেন. "তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।"

আহার বিহারের দিক দিয়া নাগমশাই ছিলেন, কৃচ্ছ্রব্রতী। সারা দিনের শেষে দুই গ্রাস আহার্য্য মুখে পুরিয়া তিনি উঠিয়া পড়িতেন। কেহ এ সম্পর্কে অনুযোগ দিলে কহিতেন, "যতদিন দেহ আছে কিছু টেক্স দিতেই হবে, তাই দিচ্ছি। বেশী খেলে বা ভালো কিছু খেলে জিহ্বার যে সুখেচ্ছা হবে।"

এই সদা সতর্ক সাধক নিজের ত্রুটি বিচ্যুতিকে কোনদিন এতটুকুও ক্ষমা করেন নাই। কোনক্রমে কাহারো উপরে হয়তো নাগমশাই রুষ্ট হইয়াছেন, মুখ দিয়া হঠাৎ অশ্রদ্ধাসূচক কথা বাহির হইয়াছে। আর রক্ষা নাই। নিজ দেহকে তিনি নিষ্ঠুর ভাবে শাসন না করিয়া ছাড়িবেন না। সে-বার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দাত্মক ভাষা অতর্কিতে তিনি ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ইহার শাস্তি স্বরূপ তখনি একখণ্ড পাথর তুলিয়া নিয়া নিজ মস্তকে প্রহার করিতে থাকেন। ফলে মস্তক ফাটিয়া গিয়া এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে নাগমশাই নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দিলেন, "বেশ হয়েছে, যে যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি তো তার দরকার।"

নাগমশাইর আর এক অভ্যাস, দেহ-মনকে বশ রাখার জন্য মাঝে

মাঝে তিনি নিরম্বু উপবাস করিতেন। সে-বার কয়েকদিন উপবাসের পর তিনি সবেমাত্র রান্নার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধু সুরেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কোন কারণে এই বন্ধুটির প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। তখনি অস্ফুটস্বরে নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হায়, এখনো আমার মনের ময়লা কাটলো না, অন্যায় মনোবৃত্তি দূর হ'লো না।" প্রায়শ্চিত্ত সাধনে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় নাই। ভাতের হাঁড়িটি অবলীলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেদিনও তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল।

গিরিশ ঘোষকে তাই নাগমশাই সম্পর্কে বলিতে শুনা যাইত, "অহং শালাকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে নাগমশাই তার মাথা ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছেন, তার আর মাথা তোল্‌বার যো আছে কোথায় ?"

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহের লীলা এবার আসিয়াছে শেষ পর্য্যায়ে। কাশীপুরে গোপালবাবুর বাগানবাড়ীতে দুশ্চিকিৎস্য ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যা-শায়ী হইয়া আছেন। ভক্তপ্রবর নাগমশাই বুঝিয়াছেন, ঠাকুরের লীলাসম্বরণের দিনটি আসন্ন। কিন্তু তাঁহার মন যে এ দুর্দ্দৈবকে স্বীকার করিয়া নিতে চায় না। একান্ত নিষ্ঠায় নিজের সব কিছু তিনি ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। সেই প্রাণপ্রভু ঠাকুর এবার যদি অপ্রকট হন, তবে ভক্ত নাগমশাইর জীবন ধারণে কি লাভ ? তাছাড়া, এই রোগযন্ত্রণা ভোগের দৃশ্যও যে তাঁহার পক্ষে দুঃসহ !

নাগমশাই বলিয়াছেন, "ঠাকুরের রোগের যাতনা দেখা দূরের কথা, স্মরণ করতেও হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যেত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ শরীরে এ রোগ রেখে দিলেন, আমরাও কোনমতে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব করতে পারলাম না। তাই তাঁর কাছে না গিয়ে নীরবে ঘরের ভেতরই বসে রইলাম। শুধু মাঝে মাঝে তাঁকে গিয়ে দর্শন ক'রে আস্‌তাম।"

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ সেদিন নাগমশাই ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে

উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরের ক্যান্সারের ঘায়ে তখন তীব্র বেদনা। ভক্ত নাগমশাইকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাগো, তুমি এসেছো? এসো, আরো এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে বসো। তোমার শান্ত শীতল দেহ স্পর্শ করলে আমার জ্বালা যন্ত্রণা কমবে।"

কথা কয়টি বলিয়াই ঠাকুর এই পরম ভক্তকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, ভাবাবেশে বহুক্ষণ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন।

আর একদিনের কথা। রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর নাগমশাইকে সংবাদ দিয়া নিকটে ডাকাইয়া আনিয়াছেন। নাগমশাই কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তুমি এসেছো? এই ছাখোনা, ডাক্তার কবিরাজেরা তো সব হার মেনে গিয়েছে। তুমি কি কিছু ঝাড় ফুঁক জানো? জানো তো ছাখো দিকি যদি কিছু উপকার করতে পারো।"

মুহূর্ত্তমধ্যে মহাভক্ত নাগমশাইর চোখ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরের এ তীব্র যন্ত্রণা, এ দুঃসাধ্য ক্যান্সার দূরীভূত করা তো তাঁহার পক্ষে অসাধ্য নয়। ঠাকুরেরই জীবন-জ্যোতির আলো যে প্রতি-ফলিত তাঁহার সাধনসত্তায়, তাঁহারই শক্তিতে তিনি শক্তিমান্!

ভাবাবিষ্ট নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, জানি, আপনার কৃপায় সব আমি জানি। এখনি আমি এ রোগ সারিয়ে দিচ্ছি।"

উপস্থিত ভক্ত শিষ্যেরা সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন। নাগমশাই শয্যার পাশে আগাইয়া আসিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, যে সঙ্কল্প ভক্ত হৃদয়কে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে তাহা অমোঘ। তাই তাড়া-তাড়ি তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া একাজ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওগো, জানি, তা তুমি পারো, এ রোগ তুমি সারাতে পারো।"

লীলা সম্বরণের কয়েক দিন আগের কথা। অন্যান্য ভক্তের সহিত নাগমশাইও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর নিম্নস্বরে কহিতেছেন, "এ সময় কি আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। আমলকী চিবুতে পারলে ভালো হতো।"

এসময়ে আমলকী জন্মে না। ভক্তরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। একজন বলিয়া বসিলেন, 'এ সময়ে এ ফল আর কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে ?"

ভক্ত নাগমশাইর মনে চিন্তা খেলিয়া গেল—ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া আমলকীর কথা যখন বাহির হইয়াছে, এ বস্তু অবশ্য কোথাও না কোথাও মিলিবে।

নিঃশব্দে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল গ্রামে গ্রামে বনে বাদাড়ে আমলকীর জন্য অবিরাম অন্বেষণ। আহার নিদ্রা ভুলিয়া এই কাজেই তিনি দিনরাত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

তিন দিনের দিন পরিশ্রম তাঁহার সফল হইল, আমলকী সংগ্রহ করিয়া তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর বালকের মত আনন্দমুখর হইয়া উঠিলেন, "আহা, এ অসময়ে এমন চমৎকার আমলকী! তুমি কোথা থেকে যোগাড় করলে গো !"

এই তিনটি দিন নাগমশাইর খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নাই। তাড়াতাড়ি নীচতলায় নিয়া গিয়া তাঁহাকে ভোজনে বসানো হইল। সেদিন ছিল একাদশীর উপবাস, নাগমশাই তাই আহার্য্য স্পর্শ করিতে রাজী নন। অবশেষে ঠাকুর ঐ অন্নব্যঞ্জন মুখে ঠেকাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলে, তবে নাগমশাই উহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিলেন। বিষাদখিন্ন নাগমশাই এবার কলিকাতার বাস উঠাইয়া চলিয়া গেলেন স্বগ্রাম দেওভোগে। অন্য কোথাও বাস করার প্রস্তাব কেহ দিলে, দৃঢ়স্বরে কহিতেন, "ঠাকুর, আমায় গৃহে থাকতে বলে গিয়েছেন। তাঁর বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার কই ?"

এই গৃহাশ্রমে অবস্থান করিলেও মাঝে মাঝে তাঁহার গুরুধাম কলিকাতায়ও তিনি আসিতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সহিত পরমানন্দে কিছুদিন কাটাইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন স্বস্থানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হইবার পর নাগমশাই ভাবিলেন, দেওভোগের প্রান্তে একটা কুটীর বাঁধিয়া তিনি নিভৃতে বাস করিবেন। কিন্তু ইহার প্রয়োজন হইল না। পত্নী কোনদিনই তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অন্তরায় হন নাই। স্বামীর মনোভাব টের পাইয়া আগে হইতেই তিনি আশ্বাস দিলেন, "ছাখো, নিজের দেহ-সুখের জন্য কোন দিনই আমি তোমায় বিরক্ত করিনি, ভবিষ্যতেও কখনো করবো না। তবে এ পৃথক বাসের দরকার কি ?"

সাধ্বী জীবনসঙ্গিনীর এ কথায় তিনি আশ্বস্ত হন, গৃহে থাকিয়া গৃহস্থ-সন্ন্যাসীরূপেই দীর্ঘ দিন করেন অতিবাহিত

নাগমশাইর স্ত্রী স্বামীর পুণ্যময় জীবন ও তাঁহার দেহ-সংযম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তাঁর শরীরে কি মনে কোন রকম মানবীয় বিকার বা পরিবর্ত্তন কখনো দেখা যায়নি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে জৈবভাবের মাথায় লাথি মেরে তিনি চলে গিয়েছেন। আগুনের ভেতর তিনি বাস করেছেন বটে, কিন্তু এক দিনের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয়নি।"

পিতা দীনদয়াল পুত্রের এই তীব্র বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিতৃষ্ণা কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। একবার খুব তিরস্কার করার পর নাগমশাই উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন, "আমার আবার খাওয়া পরার জন্য চিন্তা কি ? গাছে পাতা রয়েছে প্রচুর. তাই খেয়ে দিন কাটাবো। আর আমি জীবনে কোনদিন স্ত্রীসঙ্গ করিনি, মাতৃগর্ভ থেকে যেমন পড়েছিলাম, এখনো তেমনি আছি—কাপড়-চোপড় পরবার আমার দরকার নেই।"

কামিনী ও কাঞ্চন উভয় বস্তুতেই এই রামকৃষ্ণময় ভক্তের ছিল সমান বিতৃষ্ণা।

সে-বার নারায়ণগঞ্জে পালবাবুদের এক আত্মীয় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়, ক্রমে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। ইঁহারা নাগমশাইর চিকৎসানৈপুণ্যের কথা জানিতেন। তাঁহাকে ডাকা হইল এবং তাঁহার ঔষধে রোগী বাঁচিয়া উঠিল। পালদের কর্ত্তাবাবুর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। স্বয়ং দেওভোগে আসিয়া নাগমশাইকে বহু

সাধুবাদ করিলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ তিনশত টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য চিকিৎসককে এ টাকা গ্রহণে সম্মত করায়? অবশেষে বেশী পীড়াপীড়ি করা হইতে থাকিলে নাগমশাই ক্রন্দন শুরু করিলেন। কহিলেন, "হায় ঠাকুর! কেন তুমি আমায় চিকিৎসকের এ হীন বৃত্তি শিখিয়েছিলে, তাতেই তো অর্থের প্রলোভন নিয়ে এরা বার বার চেপে ধরছে, আর আমার এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।

তাঁহার এ অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়া বৃদ্ধ পালমহাশয় সেদিন বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কখনো মানুষ নও!"

কলিকাতার চিকিৎসক জীবনেও নাগমশাই সে-বার এক কাণ্ড করিয়া বসেন। পালচৌধুরীদের এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ফরিদপুরের ভোজেশ্বরে যাইতে হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। গদির বাবুরা এসময়ে তাঁহাকে একটি নূতন কম্বল ও পাথেয় বাবদ আটটি টাকা দিয়া দেন।

ষ্টীমার তীরে ভিড়িতেছে। নাগমশাই টিকিট কিনিতে যাইবেন, এমন সময় এক ভিখারিণী কয়েকটি শিশু সন্তান সহ সম্মুখে উপস্থিত। দুঃখিনীর কান্না ও কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, হাতের সব কয়টি টাকা ও কম্বলটি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "মা, এই নিয়ে তুমি শিশু সন্তানগুলোকে বাঁচাও, নিজের প্রাণ রক্ষা করো।"

প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া ভিখারিণী চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ স্টেশনে বিশ্রাম করার পর নাগমশাই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখান হইতে হাঁটিয়াই কলিকাতায় যাইবেন। পথ দীর্ঘ—হাতে রহিয়াছে মাত্র সাত আনা পয়সা। তা হোক্, তবুও তো ভিখারিণী আর তার ছেলেমেয়ের কয়েকদিন বাঁচার ব্যবস্থা করা গেল।

এই পদযাত্রার কাহিনী বড় বিচিত্র। পথে যেদিন দেবস্থান পড়ে

ও প্রসাদ মিলে, সেদিন খাওয়া হয়। বড় নদী নালা সম্মুখে পড়িলে খেয়ানৌকা যোগে তিনি পার হন, আর সেগুলি অপরিসর হইলে সাঁতরাইয়াই পার হন। এমনি কষ্টের মধ্য দিয়া উনত্রিশ দিন পরে নাগমশাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রোগীদর্শনের পর এমন পদযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়তো খুব কম চিকিৎসকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে।

সদ্‌গুরুর আদেশে নাগমশাই সারা জীবন গৃহেই অতিবাহিত করিয়া যান, আর আপন ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধনার বলে এই গৃহপরিবেশকে তিনি করিয়া তোলেন পরম পুণ্যময়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এক মহনীয় রূপ ফুটিয়া উঠে এই শক্তিধর গৃহী মহাপুরুষের জীবনে।

নাগমশাইর সাধন নিষ্ঠার খ্যাতি এ সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে মাঝে মাঝে তাঁহার গৃহে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিয়া জুটিত। এই সব অতিথিদের সেবা পরিচর্য্যার সুযোগ পাইলে সাধু নাগমশাইর উৎসাহের সীমা থাকিত না। তাঁহার দৃষ্টিতে এই অভ্যাগতেরা ছিলেন নারায়ণ স্বরূপ।

ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কহিতেন, "জান্‌বে, এ সকলই ঠাকুরের লীলা। ঠাকুর লীলা-শরীরে এক ছিলেন, এবার তিনিই আবার নানা মূর্ত্তিতে আমায় কৃপা করতে আসছেন অতিথি রূপে।"

নাগমশাই এক পুরাতন শূলব্যথাতে ভুগিতেন। সেদিন বড় তীব্র ব্যথা শুরু হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়াও পড়িতেছেন। এসময়ে হঠাৎ সাত-আটজন ভক্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অথচ ঘরে একমুষ্টি চা'ল নাই, এতগুলি লোকের খাবার কি করিয়া যোগাড় হইবে? অগত্যা এই অসুস্থ শরীর নিয়াই নাগমশাইকে বাজারে যাইতে হইল। তিনি নিজে না গেলে দোকান হইতে চাল-ডাল ধারে পাইবার কোন উপায় নাই।

জিনিষপত্র ক্রয়ের পর নাগমশাই বোঝাটি মাথায় তুলিয়া নিলেন। অপরকে দিয়া কখনো তিনি নিজের মোট বহনের কাজ

করেন না, ইহা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু গৃহে অতিথি নারায়ণ উপস্থিত। সেবায় বড় বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। তাই অসুস্থ শরীরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি মোট বহন করিয়া চলিলেন।

শূল বেদনায় শরীর বড় দুর্ব্বল। বার বার মাথার বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অভ্যাগতদের কাছে যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, "হায়, হায়। আপনাদের চরণে অপরাধী হলাম। সেবার কাজে দেরী হয়ে গেল।"

শুধু নাগমশাইর নয়, এ ধরণের সেবানিষ্ঠা তাঁহার স্ত্রীর মধ্যেও দেখা যাইত। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ হয়তো অতিথিদের আগমন হইয়াছে। অমনি এই সেবাব্রতী মহিলা একটি ডালা হাতে করিয়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আতপ চা'ল ধার করিতে ছুটিলেন। কেহ ইহাতে আপত্তি উঠাইলে নাগমশাই প্রবোধ দিতেন, "ছাখো, এ সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া। এর ভেতর দিয়ে আমাদের দুজনেরই পরীক্ষা হচ্ছে।"

তখন ঘোর বর্ষাকাল। সারা দিন রাত ব্যাপিয়া অঝোরে বৃষ্টি ঝরিতেছে। রাত্রিতে নাগমশাইর গৃহে দুইটি অতিথি দর্শন দিলেন। খাওয়া-দাওয়া তো একপ্রকার মিটিয়া গেল, এবার গোল বাধিল শয়নের ব্যবস্থা নিয়া। চারখানি ঘরের তিনখানিই অব্যবহার্য্য, চাল দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। শুধু একটি মাত্র ঘর বাসোপযোগী, বর্ত্তমানে সেইটিই নাগমশাইব শয়নগৃহ।

ভক্তপ্রবর পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ছাখো, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। এই দুর্য্যোগের রাতেও অতিথি সেবার সুযোগ আমরা পেয়ে গিয়েছি। অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না? এসো, আজ আমরা ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

পতি পত্নী এই ভাবেই সারা রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ভৃত্য বা ঘরামী নিযুক্ত করা নাগমশাই কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। কেহ তাঁহার দৈনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট করিবে, ইহা ছিল তাঁহার কাছে অসহ্য। সেবার একটি ঘরের চাল একেবারে

নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সংস্কার না করিলে আর চলে না। নাগমশাই সেদিন কোথাও বাহিরে গিয়াছেন, পত্নী এ সুযোগে এক ঘরামীকে ডাকিয়া আনিলেন। চালের সংস্কার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় নাগমশাই গৃহে ফিরিলেন। ঘরামীকে চালের উপরে কর্ম্মরত দেখিয়াই তো তাঁহার চক্ষুস্থির! সকাতরে কহিতে থাকেন, চাল থেকে নেমে এসো বাবা। দয়া ক'রে নেমে এসো।

পারিশ্রমিকের আশায় ঘরামী কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা সে ত্যাগ করিবে কেন?

অবশেষে নাগমশাইর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায় ঠাকুর, কেন তুমি আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বলে গিয়েছো? আমার দুঃখের জন্য একজন মানুষ খাটবে, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? ধিক্ আমার এই সংসারে!"

ভাবাচ্যাকা খাইয়া ঘরামীকে এবার নামিতে হইল। নাগমশাই ব্যস্তভাবে তাহার সেবা পরিচর্য্যায় রত হইলেন। সযতনে তাহাকে তামাকু সেবন করানো হইল, নিজহাতে পাখার হাওয়া দিয়া তাহার শ্রম অপনোদন করিলেন। অতঃপর মজুরির টাকাটি নিয়া তবে সে বেচারা সেদিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে!

সেবাব্রতী, নিরীহ পরম শান্ত ভক্ত বলিয়া সবাই নাগমশাইকে জানে। আবার এই নাগমশাইরই ব্যক্তিসত্তায় এক একদিন ফুটিয়া উঠিত অকুতোভয় তেজোদৃপ্ত যোদ্ধার রূপ। আদর্শ ও ইষ্ট সম্পর্কে যেখানে ঘটে মতের সংঘাত, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁহার অনমনীয় দৃঢ়তা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত একমুহূর্ত্তে তিনি জ্বলিয়া উঠেন।

সেদিন কি এক কাজে নাগমশাই তাঁহার শ্বশুর গৃহে গিয়াছেন। তখন সেখানে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। ভদ্রলোকটি কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুরু করিয়া দিলেন। গুরুনিন্দা শুনিবামাত্র নাগমশাইর ক্রোধের সীমা রহিল না। উত্তেজিত কণ্ঠে

কহিলেন, "এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দে চলবে না মশাই, আপনি এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।"

ভদ্রলোকটি বড় দাম্ভিক। এ কথা কানে না তুলিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গালাগালি শুরু করিয়া দিলেন।

এবার নাগমশাইর আর ধৈর্য্য রহিল না। হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বেরোও শালা এখান থেকে!" সঙ্গে সঙ্গে চলিল ভদ্রলোকটির পৃষ্ঠে জুতা-প্রহার।

নিন্দুকটি এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। অনেকের সম্মুখে এভাবে অপমানিত হইয়া ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। শাসাইয়া গেলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু, আর কি ক'রেই বা তুমি এ গ্রামে থাকো!"

বাড়ী ফিরিয়া আসার পর নাগমশাই দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হায়, ঠাকুর! কেন তুমি এসব লোককে আমার সামনে নিয়ে আসো, আর বসে বসে তোমার নিন্দে আমায় শুনতে হয়। তোমার আজ্ঞায় সংসার-আশ্রমে থাকতে গিয়ে একি দুর্দ্দৈব আমায় ভুগতে হচ্ছে!"

ভক্তের এ আর্ত্তি ব্যর্থ হয় নাই। কয়েকদিন পরে সেই নিন্দুক ব্যক্তিটি নতশিরে নাগমশাইয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অনুশোচনায় হৃদয় তাঁহার দগ্ধ হইতেছে, সজল নয়নে বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটির কথা গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কানে গিয়াছিল। নাগমশাই সে-বার কলিকাতায় আসিলে গিরিশবাবু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো জুতো কোনদিন পরেন না, তা হ'লে লোকটিকে মারবার সময় জুতো পেলেন কোথায়?"

নাগমশাই সহজ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কেন? তার জুতো দিয়েই যে সেদিন তাকে মারলাম!"

দেওভোগের আশেপাশে জলাভূমিতে বুনো হাঁস ও নানা জাতীয়

পাখী বাস করে। নারায়ণগঞ্জের পাটকলের সাহেবেরা মাঝে মাঝে এগুলি শিকার করিতে আসে।

সেবার দুটি সাহেব এজন্য আসিয়া উপস্থিত তাহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অহিংসাব্রতী নাগমশাইর অন্তর বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। শিকারীদের সম্মুখে তিনি ছুটিয়া গেলেন,করজোড়ে মিনতি জানাইলেন, "আপনারা নিরস্ত হোন। শুধু শুধু এ নিরীহ প্রাণীগুলোকে হত্যা করবেন না।"

রুক্ষ আকৃতি ও মলিন বেশভূষা দেখিয়া নাগমশাইকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ মনে করা কঠিন। তাছাড়া, তাঁহার কথার অর্থও বিদেশীরা বুঝিতে পারিতেছে না। অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আবার তাহারা বন্দুকে গুলি ভরিল।

এবার নাগমশাইর পক্ষে আর ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব নয়। তর্জ্জনী তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন. "না, এরকম অধর্ম্ম এখানে আপনারা করতে পারবেন না।"

সাহেবরা তাঁহাকে আমল দিতে চাহে না, একটা পাগলের কথায় এ আমোদ তাহারা ছাড়িয়া যাইবে কেন? শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার তাহারা বন্দুক তুলিল। নাগমশাই মুহূর্ত্ত মধ্যে সিংহবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বভাবতঃই তিনি ধীর স্থির, ক্ষীণ কলেবর। কিন্তু এ সময়ে তাঁহার দেহে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইল প্রচণ্ড শক্তি। অবলীলায় সাহেব দুইটিকে পরাস্ত করিয়া বন্দুক ছিনাইয়া নিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

শিকারী ইংরেজ দুইটির পক্ষে এ ধরণের অপমান হজম করা শক্ত। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা স্থির করিল নাগমশাইকে চিরদিনের মত শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়িবে, অবিলম্বে তাহার নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিবে।

ইতিমধ্যে ঐ পাটকলেরই এক কর্ম্মচারীর হাত দিয়া নাগমশাই বন্দুক দুইটি পাঠাইয়া দেন। নাগমশাই একজন অসামান্য সাধু— অহিংসাকে তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, এসব কথা শোনার পর সাহেবরা নরম হইয়া পড়ে, তাঁহার প্রতি কি জানি কেন তাহাদের

বড় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। বলা বাহুল্য, অতঃপর এ ব্যাপার আর বেশীদূর গড়ায় নাই।

সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে নাগমশাই তাঁহার পরম প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিতেন। প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যাইত চারিদিকে হাত জোড় করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। একবার এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "প্রায় সময় আপনি এমন হাত জোড় ক'রে থাকেন কেন, বলুন তো?"

ভক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, "কি করবো বলুন, ভূতে ভূতে যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।"

নাগমশাইর পত্নী বড় পতিপ্রাণা। এই পতিই ছিলেন তাঁহার ধ্যেয়, ইষ্ট, এবং তাঁহার ছবিটির পূজা প্রতিদিন সম্পন্ন না করিয়া এই ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা জল গ্রহণ করিতেন না। একবার মহাষ্টমী পূজার দিন তাঁহার ইচ্ছা হয়, নাগমশাইর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন।

নাগমশাই ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় পত্নী স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিয়া প্রণাম করিলেন।

নাগমশাই শান্ত স্বরে শুধু বলিয়া উঠিলেন, "যাকে আমি পূজা করি, তার সেবা পূজা নেওয়া কি ঠিক?"

অর্থাৎ, জগন্মাতার প্রকাশ রূপেই যে তিনি স্ত্রীকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাঁহার পূজা তাই কি করিয়া নিবেন?

একবার একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নাগমশাইর পত্নী গৃহকর্ম্মে রত, স্বামীর এবং গৃহের অভ্যাগতদের সেবা ও যত্নের জন্য তিনি সদা তৎপর। নবাগত ভক্তটির অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। ভাবিলেন, এ আবার কেমন সাধু? সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া যে চলিতেছে, তাঁহার আবার ভার্য্যা নিয়া বাস করা কেন?

এই চিন্তার তরঙ্গ অন্তর্য্যামী নাগমশাইর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তখনি

তিনি উত্তরে কহিলেন, "কেন, কেন? এতে দোষ কোথায়? মা অন্নপূর্ণা যে স্বয়ং এ গৃহে বাস ক'রে আমাদের অন্নের যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন।"

ভদ্রলোক তো অবাক্! নাগমশাইর পত্নী সম্বন্ধে প্রশ্নটি আলোড়িত হইয়াছে তাঁহার মনে, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলেন নাই। অথচ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ তাঁহার অন্তস্তলের চিন্তাকে টানিয়া বাহির করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার উত্তর দিয়া দিলেন। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তিনি নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রাণী মাত্রেরই উপর নাগমশাইর ঈশ্বর ভাব, আর নারী মাত্রকেই তিনি দেখেন জগজ্জননীর প্রতীকরূপে। পত্নীকে তিনি চিরকাল যে এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত!

সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন—ইহা তাঁহার জীবনে ছিল এক উপলব্ধ পরম সত্য। তাই দেখা যাইত, মশা মাছি গায়ে বসিলে তিনি সেগুলি তাড়াইতে পারিতেন না। গৃহ-অঙ্গনস্থিত কোন গাছের পাতা কেহ ছিঁড়িলে তাঁহার বুকে বাজিত সুতীব্র ব্যথা। সকাতরে বলিয়া উঠিতেন, "আহা, আহা, এমন ক'রে ছিঁড়ো না। জানো, এদেরও ব্যথা বেদনা বোধ রয়েছে আমাদেরই মত।"

সেবার এক ভক্তের চোখে পড়িল—নাগমশাইর পূজামণ্ডপের বেড়াটিতে অজস্র উইপোকা বাসা বাঁধিতেছে। শেষে কি সারা ঘর নষ্ট হইবে? তখনি তিনি একটা বাঁশ দিয়া এই বেড়াটির উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। উই-এর বাসা ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু উই পোকাও এ সময়ে নিরাশ্রয় হইয়া ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য নাগমশাইর কাছে দুঃসহ। অশ্রুসজল চোখে বিলাপ করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এ কি অনর্থ আপনি করলেন? এতকাল এরা এই বেড়ার ভেতরে ঘর-দোর তৈরী ক'রে বসবাস করছিলো, এবার সে আশ্রয়টুকুও রইলো না। বড় অন্যায় করেছেন, বড় অধর্ম্ম করেছেন।"

ভক্তটি নির্ব্বাক ও অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এবার উই পোকাগুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাগমশাই করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "আপনারা আবার বাসা তৈরী করুন, আর কোন ভয় নেই।"

মানুষের ভাষা বুঝুক আর না বুঝুক ভক্তের হৃদয়-আকুতি বুঝিতে বল্মীকদের ভুল হয় নাই। ক্ষণপরেই আবার সদলবলে আসিয়া তাহারা মণ্ডপের এই বেড়াটি অধিকার করে। বলা বাহুল্য, অচিরে উই-এর আক্রমণে ঘরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

নাগমশাইর বাড়ীর পাশেই রহিয়াছে এক পুষ্করিণী। সেদিন একটি জেলে সেখান হইতে এক চুপাড় মাছ ধরিয়া নিয়া নাগমশাইর বাড়ীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। সদ্য ধরা হইয়াছে তাই অধিকাংশই তখনো জ্যান্ত।

এগুলির দিকে তাকাইতেই নাগমশাইর হৃদয় গলিয়া গেল। তখনি ঐ এক চুপড়ি মাছ তিনি কিনিয়া ফেলিলেন। তারপর যে পুকুর হইতে এগুলি ধরা হইয়াছিল তাহারই গর্ভে দিলেন বিসর্জ্জন।

ধীবর তো নাগমশাইর কাণ্ড দেখিয়া অবাক! মৎস্য বিক্রয়ের জন্য অতঃপর এবাড়ীতে আর কোনদিন সে আসে নাই।

সে-বার কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ শুরু হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা কেবলি চলিয়াছে বৃদ্ধির দিকে। আতঙ্কে বহু লোক শহর ছাড়িয়া এ সময়ে পলাইতে থাকে। পালবাবুরাও কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার ভার রাখিয়া গেলেন নাগমশাইর উপর।

কয়েক দিনের মধ্যেই গদির একটি মুহুরি প্লেগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের সর্ব্বাপেক্ষা বড সমস্যা সেবাপরিচর্য্যার। সহজে রোগীকে কেহ স্পর্শ করিতে চায় না। নাগমশাই নিজেই প্রাণপণে লোকটির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই বড় খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এবার সে নাগমশাইকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে অবিলম্বে যেন গঙ্গাতীরে নিয়া যাওয়া হয়, সেখানেই সে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চায়।

কিন্তু গঙ্গাতীরে তাঁহাকে অপসারণ করা সহজ নয়, প্লেগ রোগীর ঘরের কাছেও কেহ যে ঘেঁষিতে চাহে না। এ অবস্থায় তাঁহার দেহ বহন করিবে কে?

কোন লোক পাওয়া যাইতেছে না, অগত্যা নাগমশাইকে একলাই এই প্লেগ রোগীকে বহন করিয়া নিতে হইল। গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নাগমশাইর কোলে শুইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বহু কষ্টে লোক যোগাড় করিয়া, মৃত ব্যক্তির সৎকার শেষে নাগমশাই ঘরে ফিরিয়া আসেন।

নাগমশাইর সঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের বড় সম্প্রীতি ছিল। রামকৃষ্ণ-নিষ্ঠ এই দুই ভক্তবীরের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিত।

সেদিন সাধু নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পরম সমাদরে তখনি তাঁহাকে দোতালার বৈঠকখানায় নিয়া যাওয়া হইল। আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশের মজলিশে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

নাগমশাই শয্যা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে শয়ন করা দূরের কথা উপবেশনও করেন না। ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের দিকে আর গেলেন না, নিতান্ত দীনভাবে মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

তিনি যে এক উচ্চ স্তরের সাধুপুরুষ ইহা অনেকেরই জানা আছে। সবাই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ফরাসে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, পীড়াপীড়িও শুরু হইল।

গিরিশ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে এই সমাদরের বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। কহিলেন, "থাক্ থাক্, ওঁকে আপনারা আর বিরক্ত ক'রবেন না। উনি যেখানে যে ভাবে বসে সুখী হন, সেই ভাবেই বসুন।"

গিরিশ এবার অনুরোধ জানাইলেন, "নাগমশাই, আজ বড় সৌভাগ্য, আপনার মত লোক দয়া ক'রে এসেছেন। এবার ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, সে অমৃত বাণী পান ক'রে আমরা কৃতার্থ হই।"

নাগমশাই দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি। করজোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, "আমি মূর্খ দুরাচার, তাঁকে চিনতে পারলাম কই? আপনারা কৃপা করুন যাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে সত্যকার ভক্তি জন্মে, জীবন সফল হয়।"

উপস্থিত সবাই এই পরম ভক্তের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। দৈন্য ও আত্মবিলুপ্তির এই মূর্ত্ত বিগ্রহের সান্নিধ্যে বসিয়া নিজেদের অহংবোধও যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ সৃষ্টি এই ভক্তবীরের সম্মুখে বসিয়া গিরিশের দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন, "তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? যাঁর কৃপাগুণে মানুষের এমন অবস্থা হয়, তাকে কি ভগবান্ না ব'লে থাকা যায়!"

আর একদিনের কথা। নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। এ সময়ে নিরঞ্জনানন্দ নাগমশাইকে কহিলেন, "মশাই, ঠাকুর বলতেন, 'নিজেকে দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়'—আপনি দিনরাত অমন ক'রে আপনাকে দীনহীন মনে ক'রেন কেন?"

নাগমশাই হাত জোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "সে কি কথা! নিজের চোখে নিরন্তর দেখ্‌ছি, আমি অতি হীন, অতি অধম, কি ক'রে আমি নিজেকে শিব মনে ক'রবো। আপনি ও কথা বল্‌তে পারেন। আপনারা ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু আমার ও রকম ভক্তি হ'লো কই? আপনাদের কৃপা হ'লে, ঠাকুরের কৃপা হ'লে আমি যে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবো।"

কি অপূর্ব্ব আর্ত্তি ও দৈন্য এই মহাভক্তের বাক্যে আর বচন ভঙ্গীতে! নিরভিমানতার কি অপরূপ প্রকাশ তাঁহার ব্যক্তিসত্তায়! উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে বেশ কিছুকাল বসিয়া রহিলেন, বাদ-বিতর্কের ভাষা কাহারও মুখে যোগাইল না।

এই দিনকার ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে কহিতেন, "ঠিক ঠিক দীনতা হ'লে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হ'লে, মানুষের নাগমশাইর মত অবস্থা হয়। এ সব মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয়।"

সে-বার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মা সারদামণিকে তিনি দর্শন করিতে যান। পরম ভক্তের এই মাতৃ-মিলনের মধুর দৃশ্যটি নাগমশাইর চরিতাকার শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

—"কুমারটুলির বাসায় গিয়া দেখিলাম, নাগমশায় মায়ের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুন পেড়ে কাপড় কিনিয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় মা মা করিতেছেন। কুমারটুলি হইতে আহিরীটোলায় আমরা একখানি চল্‌তি নৌকায় উঠিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌছিলাম। ঘাটে পৌছিয়াই নাগমশাই বাতাহত কদলী পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। জয় মা, জয় মা—বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমশাইকে দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে উঠিবামাত্র তিনি নাগমশায়কে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন।

"প্রায় আধঘণ্টা পরে তাহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসেন। তখনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল!' স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'আহা! আজ নাগমশায়ের উপর মা কি কৃপাই করিয়াছেন!' নাগ-মহাশয়ের সন্দেশ মা নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর পান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা বিদায় লইলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় আলোড়ন তুলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভক্ত শরৎচন্দ্র নাগমশাইর কাছে যাতায়াত করেন শুনিয়া স্বামীজী তাহাকে ডাকাইলেন, কহিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতা, মধুকর ত্বং খলু কৃতী।" অর্থাৎ আমরা তত্ত্ব অন্বেষণের পেছনে ঘুরে মরছি, কিন্তু মধুকর তুমিই হচ্ছো প্রকৃত

কৃতী—তুমিই পান করেছ মধুরস! স্বামীজীর এই মধুকর হইতেছেন রামকৃষ্ণরসে রসায়িত প্রাণ ভক্তপ্রবর নাগমশাই।

সে-বার নাগমশাই বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম! কোন মতেই তাঁহাকে ঠেকানো সম্ভব হইল না।

স্বামীজীর শরীর তখন বড় অসুস্থ। নাগমশাই তাই তাঁহার জন্য বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রেমভরে কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন, আপনি হচ্ছেন মোহরেব বাক্স। ঠাকুরের কথা তো মিথ্যে হতে পারে না। সত্যিই তো মোহরের বাক্স। একবার দেহের দিকে দৃষ্টি দিন, আপনার এ দেহের রক্ষায় দেশের কল্যাণ হবে, জগতের কল্যাণ হবে।"

নব-প্রবর্ত্তিত মঠ মিশন প্রভৃতি সংগঠনকর্ম্ম শুরু করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, প্রবীণ ভক্তের কাছে স্বামীজী তাহা যাচাই করিয়া নিতে চান। নাগমশাইকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন।

উত্তর হইল, "ঠাকুবের ইচ্ছায় এসব কাজ হচ্ছে। এতে মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা, নাগমশাই বেলুড় মঠে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার পূত চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকিয়া মঠের সন্ন্যাসীরা প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাইবে।

নাগমশাই জানাইলেন, "কি করি, কেমন ক'রে ঠাকুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? তিনি যে আমায় গৃহেই থাকতে বলে গিয়েছেন!"

স্বামীজী সমবেত সন্ন্যাসীদের কহিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে বুঝতে পারা যায়। কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয় সংযমে, ইনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

স্বামীজীকে একথাও একবার বলিতে শুনা গিয়াছিল, "পৃথিবীর এত দেশ ঘুরে এলাম, কোথাও নাগমশাইর মত মহাপুরুষ চোখে পড়লো না।"

পূর্ব্ববঙ্গে সফরে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ নাগমশাইর

এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ও দেশে গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই। যে দেশ নাগমশাইর চন্দ্রালোকে আলোকিত, সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলবো।"

ভক্তটি বলিয়া উঠেন, "কিন্তু স্বামীজী, তিনি তো অতি গুপ্তভাবে ছিলেন, সাধারণের কাছে তেমন কিছু বলেন নি।"

"ওরে, মুখে নাই বা কিছু বললেন। নাগমশাইর মত মহাপুরুষদের চিন্তা তরঙ্গে দেশের চিন্তাস্রোতের গতি ফিরে যায়।"

ত্যাগ বৈরাগ্য আর শুচিতায় ভরা ছিল সাধু নাগমশাইর জীবন। নিঃশব্দে নিভৃতে তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। আত্মগোপনপ্রয়াসী এই গৃহীসন্ন্যাসী তাই কোনদিনই নিজের চতুষ্পার্শে ভক্ত ও শিষ্যের ভীড় রাখিতে চান নাই।

কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে -মধুলোভী ভ্রমরকে ঠেকানো যায় কই? তাই সাধু নাগমশাইর পদপ্রান্তে ধীরে ধীরে সমবেত হইতে থাকে একদল পুণ্যলোভী, মুক্তিকামী ভক্ত। সংখ্যা তাঁহাদের বেশী নয়, কিন্তু আন্তরিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দিক দিয়া তাঁহাদের তুলনা বিরল। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "নাগমশাই তাঁর সাধক ভক্তদের ওপর স্নেহময়ী জননীর মত সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।"

সাধু নাগমশাইর ভক্ত-প্রীতির নানা কাহিনী ছড়ানো রহিয়াছে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতার 'মাষ্টার অ্যাজ আই স' হিম্' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে :

সেবার ঢাকাস্থিত একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। তখন বর্ষাকাল। বিশেষ করিয়া সেদিন দেখা দেয় ঘোর দুর্য্যোগ।

সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিয়া দেখেন, ঘাটে একটি নৌকাও নাই। সারাদিন অশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাত্যা বিক্ষোভও কম নাই। মাঝিরা ভয়ে নৌকা নিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে। ভক্তটি বড় বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার দুর্য্যোগময় রাত্রিতে

নৌকা ছাড়া দেওভোগ গ্রামে কি করিয়া যাইবেন ? চারিদিক জলে জলাময় হইয়া গিয়াছে। তবে উপায় ?

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে দেরী হইল না। সাধু নাগমশাইকে স্মরণ করিয়া এই ভক্তটি জলে ঝাঁপ দিলেন। সাঁতরাইয়া সারা পথ অতিক্রম করিয়া যখন নাগমশাইয়ের গৃহে পৌঁছিলেন তাঁহার দেহ তখন ক্লান্তিতে অসাড়। এত রাত্রে এ ভাবে ভক্তটিকে আসিতে দেখিয়া নাগমশাই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। বিচলিত হইয়া কহিলেন, "এই অন্ধকারে, বর্ষার এই দুর্য্যোগে কি এমন ক'রে আসতে আছে ? তাছাড়া, এই বন্যার সময় কত সাপ বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কেন একাজ আপনি করেছেন ?"

ভক্তটি সজলনয়নে উত্তর দেন, "আপনাকে আজ একটিবার দর্শন করার বড় তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল। তাই এ কাজ না ক'রে আমার উপায় ছিল না।"

রাত্রি যথেষ্ট হইয়াছে। এবার ভক্ত অতিথির জন্য কিছু রন্ধন করা প্রয়োজন। গৃহকর্ত্রী জানাইলেন, ঘরে একটুক্‌রো শুক্‌নো কাঠও নেই, কি ক'রে ভাত রাঁধবো ?"

এ দুর্য্যোগময় রাতে কোথায় যাইবেন ? কেই-বা জ্বালানি কাঠ দিবার জন্য দুয়ার খুলিবে ? অগত্যা নাগমশাই কুঠার দিয়া একটি ঘরের খুঁটি কাটিতে শুরু করিলেন।

ভক্তটি ছুটিয়া গিয়া নাগমশাইকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। নাগমশাইর পত্নী তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে উত্তর হইল, "যারা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে সাপের মুখে সাঁতার কেটে আমায় দেখতে আসেন, তাদের জন্য আমি কি সামান্য একটা ঘরের মায়া ছাড়তে পারিনে! প্রাণ দিয়েও যদি আমি এদের উপকার করতে পারি, তবে আমার এ দেহ সার্থক হয়।"

বলা বাহুল্য, কাঠের এই খুঁটি কাটিয়া সেদিনকার অতিথি সেবার কাজে লাগানো হয়, ঘরটিও অল্পকাল মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়ে।

প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্য নাগমশাইকে মাঝে মাঝে অলৌকিক শক্তিও প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে।

এক নতুন ভক্ত কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। নাগমশাইর সঙ্গে সবে পরিচয় হইয়াছে। আর এ পরিচয় তাঁহার হৃদয়ে জ্বালিয়া দিয়াছে মুমুক্ষার আগুন। দিনরাত কেবলি সে ভাবিতে থাকে কবে আবার নাগমশাইর দর্শন পাইবে, মহাপুরুষের শ্রীমুখের অমৃতবাণী শুনিয়া প্রাণ তৃপ্ত করিবে।

অবশেষে একদিন আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। এমন মহাপুরুষকে পাইয়াও সে তাঁহার চরণতলে চিরতরে আশ্রয় নিতে পারে নাই--বরং পাইয়া তাঁহাকে হারাইয়াছে। তবে এ ছার প্রাণ রাখিয়া আর লাভ কি? ভক্তটি স্থির করিল, ছাদ হইতে পড়িয়া সে আত্মহত্যা করিবে।

ছাদের আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া যেই সে ঝাঁপ দিতে যাইবে, অমনি শুনিল, কে যেন স্পষ্ট স্বরে তাহাকে বলিতেছে, "অযথা ভেবো না, শান্ত হও। আগামী কালই নাগমশাইর সাথে তোমার দেখা হবে।"

এ কাহার দৈববাণী? যুবক ভক্তের সর্ব্বদেহে জাগিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব শিহরণ। মনের বিক্ষোভ ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া গেল।

পরদিন ভোরবেলায় নাগমশাইর দর্শন ঠিকই পাওয়া গেল। ছাত্রাবাসের দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া ভক্তটিকে তিনি ডাকিতেছিলেন। হাতে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী, সবেমাত্র দেশ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

শান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ কহিলেন, "আপনি কি সব করতে যাচ্ছেন ভেবে ভেবে মন বড় খারাপ হ'লো। তাই তো হঠাৎ কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের রাজ্যে এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই। জেনে রাখবেন আত্মনাশ এক মহাপাপ"

ভক্তটির মুখ দিয়া একটি কথাও সরিতেছে না, এই অন্তর্য্যামী সাধকের সম্মুখে তিনি চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছেন।

নাগমশাই আবার তাঁহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "এতদিন ছিলেন খালে-বিলে, এবার এসে পড়লেন সমুদ্রে।" অর্থাৎ,

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা-সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে, অমৃত সাগরে ভাসিয়া বেড়ানোর সৌভাগ্য তাহার। তবে আবার কিসের ভয়?

আশ্রয়ার্থী বহু ভক্তের জীবন নাগমশাইর পবিত্র স্পর্শে দিনের পর দিন রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কৃপাঘন দিব্য দৃষ্টি বহু আর্ত্তের আধি-ব্যাধি দূর করিয়াছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আত্ম-গোপনপ্রয়াসী মহাপুরুষ তাঁহার অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া ঘটাইয়াছেন নীরবে, প্রচ্ছন্নভাবে।

সিদ্ধপুরুষ নাগমশাইর অলৌকিক লীলার প্রকাশ একবার কিন্তু প্রকটরূপেই দেখা গিয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল দেওভোগ গ্রামে। পিতৃসেবার তীব্র আবেগ সেদিন মহাপুরুষের মনের ইচ্ছাটিকে উদগ্র করিয়া তোলে, এক বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দৃশ্য বহুজন সমক্ষে সেদিন উন্মোচিত হয়।

নাগমশাই তখন বাস করেন কলিকাতায়, আর বৃদ্ধ পিতা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে দেওভোগে। সে-বার আসিয়াছে পুণ্যময় অর্দ্ধোদয় যোগ। লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। এই পবিত্র যোগের কয়েকদিন আগে নাগমশাই স্বগ্রামে গিয়া উপস্থিত। শুনিয়াছেন পিতার শরীর বড় অসুস্থ।

বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু এসময়ে পুত্রকে গ্রামে আসিতে দেখিয়া বড় রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "ছাখ্, এই অর্দ্ধোদয় যোগে কত লোকে টাকা-কড়ি ব্যয় ক'রে আর সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ক'লকাতায় যাচ্ছে গঙ্গা-স্নান করতে। আর তুই এ সময়ে গঙ্গাতীর ত্যাগ ক'রে এলি? তোর ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্ম আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনো তো তিন-চার দিন বাকী আছে। আমায় একবার ক'লকাতার গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবি? শেষ কালের পুণ্য করতে দিবি?"

পুত্র ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যদি কারো সত্যিকার ভক্তি থাকে, ভাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন—তাকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না!"

গঙ্গাস্নানের দিন দেওভোগে এক অপূর্ব্ব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল।

নাগমশাইর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠিক অর্দ্ধোদয় যোগের সময় অঙ্গনের অগ্নিকোণে দেখা গেল এক উচ্ছলিত জল-প্রবাহ। ভূগর্ভ ভেদ করিয়া কলকল শব্দে উহা উপরে উঠিতেছে, সারা প্রাঙ্গণ ভাসাইয়া ফেলিতেছে। কৌতূহলী জনতার মধ্যে তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল।

নাগমশাই গৃহ মধ্যে কি এক কাজে ব্যাপৃত, কলরব শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। ভক্ত হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল তীব্র ভাবোন্মাদনা, "মা! পতিত পাবনী মা-ভাগীরথী!" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া সাষ্টাঙ্গে এ জলধারার সম্মুখে তিনি প্রণত হইলেন। পুণ্যতোয়া গঙ্গার জয়-ধ্বনিতে সেদিন নাগমশাইর অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠে। দলে দলে পুণ্যার্থী নরনারীরা এই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হয়। এই পবিত্র জলস্পর্শে কাহারো কাহারো দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এ সময়ে নিরাময় হয়। শত শত লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত এই উৎসধারা ঘণ্টাখানেক পরে থামিয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অলৌকিক ঘটনাটির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সে আর এমন কি কথা? অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় সব কিছু সম্ভব হয়। এঁদের ইচ্ছা অমোঘ, এ ইচ্ছাশক্তিতে জীব উদ্ধার পেয়ে যায়।"

অপ্রাকৃত দর্শন, অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন, ইত্যাদির দিকে ভক্তেরা যাহাতে বেশী না ঝুঁকে ইহাই নাগমশাই চাহিতেন। এজন্য তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধনার মূল তত্ত্বটির দিকেই প্রধানতঃ ভক্তদের চিন্তাধারাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিতেন। বলিতেন, "গাছের তলায় জেগে বসে থাকার মত, সাধনার দ্বারা আপনাকে সদাই জাগ্রত রাখতে হয়। কিন্তু ফল রয়েছে তাঁর হাতে। তিনি নিজে কৃপা ক'রে ফল দিলে তবে জীব তার অধিকারী হয়, নতুবা নয়। দেখা যায়—কেউ বা ঘুমিয়ে আছে, ভগবান্ দয়া ক'রে হয়তো তার মুখে ফল ফেলে দিলেন, তাকে আর কোন কিছু সাধন ভজন করতে হয় না। এসব সাধক কৃপাসিদ্ধ হন। ভগবান্ যতদিন না কৃপা করেন, ততদিন কেউ তাঁর স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হয় না। তিনি

কল্পতরু—যে যা চায়, নিশ্চয় তাকে তা দান করেন। কিন্তু যাতে জীবকে বার বার জন্ম মৃত্যুর পথে যেতে হয় এমন বাসনা কখনো করা জীবের উচিত নয়।

"ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তবেই জীব সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবৎ কৃপায় মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসনা ত্যাগ করা যায়, তা থেকে জীবের কল্যাণ সাধনা আসবেই। কিন্তু যিনি ভগবান, ভক্ত ও ভগবৎ প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন তাঁর ত্রিতাপ জ্বালা অন্তে দূর হয়ে যায়।"

সাধু নাগমশাইর এ সব কথার পশ্চাতে ছিল তাঁহার জীবনের সূক্ষ্মতর দিব্য অনুভূতি, আর তাঁহার উপলব্ধ সত্য। মা জগজ্জননীর অসীম কৃপা ছিল এই মহাসাধকের উপর, মাতৃসাধনার সিদ্ধি তাঁহার হইয়াছিল করতলগত।

এক ভক্ত সে-বার নাগমশাইর পত্নীর কাছে বসিয়া মহাপুরুষের সাধন জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে নাগমশাইর পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ওঁর সাধন ভজনের কথা কি ব'লছো ; উনি ইচ্ছে ক'রে যে দেবদেবীকে ডাকেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ ওঁকে দর্শন দেন। উনি নিজেই যে একথা কতদিন আমায় বলেছেন।"

নাগমশাই দেবদেবীর উপর বড় ভক্তিমান্। হৃদয়ে একবার ভাবাবেগ উপস্থিত হইলেই মা-মা বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন। দেব-দেবীর সাথে ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় অস্ফুট স্বরে কথাবার্ত্তাও তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়। ভক্ত শরৎচন্দ্র তাই একদিন মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন, তবে কি নাগমশাই শুধু দেবতাসিদ্ধ ! তিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন ! এই ভাবনার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা তিনি দিয়াছেন —"আমি এরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তাঁহার পূর্ণ ভাবাবেশ —বলিলেন, 'মা কি আমার এই খড়ে মাটিতে আবদ্ধ ! তিনি যে

অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী। মা যে আমার মহাবিদ্যা স্বরূপিণী।' বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতা ঠাকুরাণীকে আমি একথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি তো তাঁর এ অবস্থা আজ নূতন দেখ্‌লে। এক এক দিন দুই তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না। এক এক দিন আমার মনে হয়, তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝিবা চলিয়া গেলেন।"

সাধনা ও সিদ্ধির পথ বাহিয়া মহাসাধকের মরজীবন এবার ধীরে ধীরে শেষ অঙ্কের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

১৩০৬ সালের শীত ঋতু। মহাসাধক নাগমশাই তাহার শেষ শয্যায় শায়িত। জীর্ণ দেহের প্রাকার টুটিবার এবার আর বেশী দেরী নাই। নিকটে উপবিষ্ট ভক্তটিকে একদিন ডাকিয়া কহিলেন, একবার পঞ্জিকাটা দেখুন দেখি। সামনে যাত্রার ভাল দিন কবে!

পঞ্জিকা দেখিয়া বলা হইল, "আজ্ঞে ১৩ই পৌষ ১০টার পর যাত্রার বেশ দিন রয়েছে।"

"আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে ঐ দিনই মহাযাত্রা করবো।"

সেবক ভক্তটি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নাগমশাইর সাধ্বী পত্নী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আর কেন কাঁদ্‌ছো বাবা! উনি কিছুতেই এ শরীর আর রাখবেন না। ওঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দেহত্যাগ করুন। দেখে আমরা আনন্দিত হবো।"

নির্দ্দিষ্ট দিন ও লগ্নটি আসিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বীরভক্ত চিরতরে মরদেহ ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় একবার কিছুটা নড়িয়া উঠে। অস্ফুট স্বরে শেষ বাণীটি উচ্চারিত হয় 'কৃপা, কৃপা—নিজগুণে কৃপা।'

পরমহংস দয়ালদাস-বাবা

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কথা। এই সময়ে শুধু পাঞ্জাবেই নয়, সারা উত্তর ভারতে প্রচারিত ছিল ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। পাতিয়ালা জেলার বসেরা গ্রামের আশ্রমটি ছিল তাঁহার নিভৃত সাধনকেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিতে অল্প সংখ্যক অন্তরঙ্গ মুমুক্ষু শিষ্য নিয়া তিনি বাস করিতেন, সাধন-পথের দিতেন দিক্‌দর্শন। আবার মাঝে মাঝে মণ্ডলীসহ বাহির হইতেন তীর্থ পরিক্রমায়। যে গ্রামে, যে শহরে এই সদানন্দময় মুক্ত পুরুষ আবির্ভূত হইতেন, দেখা দিত বিরাট জনসংঘট্ট, সাধু-সন্ত ও ভক্ত গৃহস্থেরা দলে দলে ভীড় করিত তাঁহার চরণতলে। পুণ্যলোভী দাতা ও শেঠেরা সোৎসাহে ভাণ্ডারা লাগাইত তাঁহার ছাউনিতে। তীর্থ পরিক্রমার শেষে আবার নিজ গ্রামের আশ্রমটিতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরদাস-বাবা রত হইতেন নিভৃত সাধনায়।

বসেরার মঠ প্রাঙ্গণে সেদিন তিনি শিষ্য পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্ত জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসজী নানা তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে চলিতেছে মৃদু মধুর হাস্য পরিহাস।

এমন সময়ে একটি বালক সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বয়স তাহার প্রায় বারো বৎসর। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত, তীক্ষ্ণ নাসা, বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ দুটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পরনে রহিয়াছে গৈরিক বহির্বাস। নগ্নপদ দুইটিতে জমিয়াছে প্রচুর পথের ধূলা। দেখিলেই মনে হয়, বহু দূরের পথ অতিক্রম করিয়া সে আসিয়াছে।

আগন্তুক বালক প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঠাকুরদাস-বাবার নয়ন দুটি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। স্মিত হাস্যে বলিয়া

উঠেন, "আরে, এ দেখ্‌ছি আমাদের ছোটেলালজী! তারপর, কি মনে ক'রে? তোমার বাড়ীর সবাইর কুশল তো?"

মঠের ভক্ত ও সেবকেরা এতক্ষণে বুঝিয়া নিয়াছেন, এই বালক পরমহংস-বাবার পূর্ব্ব পরিচিত। কিন্তু এত অল্প বয়সে গৈরিক নিয়া সে সাধু হইয়াছে? সবাই বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন।

বালক করজোড়ে উত্তর দেয়, "বাবা, আমি এসেছি আপনারই কাছে। আপনার কাছে আশ্রয় নিতে। আমি সাধু হবো। সাধু হয়ে ভগবান্ লাভ ক'রবো, এজন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

"তা ছোটেলালজী, তুমি তো দেখ্‌ছি আগে থেকেই গৈরিক প'রে ফেলেছো, সাধু তো তুমি ব'নেই গেছো।"

বালক বড় সপ্রতিভ। শান্তস্বরে, স্পষ্ট ভাষায় সে উত্তর দেয়, "না- মহারাজ। এটা আমার লোক দেখানো বেশ। আমার মাতাজী বললেন,—'আমাদের কপিয়াল গাঁও থেকে বসেরা যে অনেক দূর, ক'দিনের পথ পায়ে হেঁটে যাবি, সে ক'দিন তোকে খেতে দেবে কে? তবে কি অনাহারে মরবি?'

"আমি বললাম, তোমার কোন ভয় নেই, একটা গৈরিক কাপড় জড়িয়ে আমি চলে যাবো, ভালো গৃহস্থেরা দু টুক্‌রো শুক্‌নো রুটি আমায় দেবেই। তাই আমার এ বেশ।"

"হো-হো-হো"—অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়েন ঠাকুরদাস-বাবা। বলেন, "তুমি চতুর ছেলে, মাথায় ভাল ফন্দী এটেঁছিলে। কিন্তু ছোটেলালজী ভগবান্ লাভ করবে বলে তো পথে বেরিয়েছো। ভগবান্ কিন্তু বড় চতুর, ধরতে গেলেই পালিয়ে যান, হাতের মুঠো যত শক্তই ক'রো, ফস্‌কে যান। তাঁর সাথে এঁটে উঠতে পারবে কি?" —কৌতুকের সুর ফুটিয়া উঠে ঠাকুরদাস-বাবার কথা কয়টিতে।

"মহারাজ, সবার কাছে শুনি, আপনার মতো মহাত্মারা সেই ভগবান্‌কে বশে রাখার কৌশলটি জানেন। আমি সে কৌশল আপনার কাছেই শিখে নেবো। প্রাণপাত ক'রে তা শিখ্‌বো।

এবার গম্ভীর হইয়া উঠেন ঠাকুরদাস-বাবা। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন

করেন, "উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা, ছোটেলালজী। কিন্তু তোমার বাবা মায়ের সম্মতি এতে আছে তো? সব আমায় খুলে বলো।"

"মহারাজ, মাপ ক'রবেন, এতক্ষণ কথায় কথায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার বাবা আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছেন। এই যে সেটি।"

পরমহংসজীর নির্দ্দেশে একজন সেবক চিঠিটি সেখানে পাঠ করিলেন। মর্ম্ম এইরূপ:

বাবা মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। অতঃপর সমাচার এই, অনেকদিন যাবৎ আপনার দর্শন না পাইয়া আমরা মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটেলালকে আপনি জানেন। বয়সে সে বালক, কিন্তু আর সে এখন গৃহে থাকিতে চায় না, সাধু হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রামে বহু সাধু-সন্তের সমাগম হয়। ছোটেলাল তাঁহাদের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাঁহাদের ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে, চাপাটি তৈরী করিয়া দেয়, নানাভাবে তাঁহাদের সেবা করে। আপনার সেবার সুযোগ পাইয়াও সেবার সে অনুগৃহীত হইয়াছে। সাধু-সঙ্গ ও সাধু সেবার ফলে ভগবান্ প্রাপ্তির অভিলাষ তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। স্থির করিয়াছে, সংসার সে ত্যাগ করিবে, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবে।

আমাদের আরো কয়েকটি জোয়ান ছেলে আছে। তাহারা আমার ক্ষেতের কাজ করে, বিষয়-কর্ম্মে সাহায্য করে। আমি এবং ছোটেলালের মা তাই পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, একটি পুত্রকে প্রভু শিবজীর সেবায় নিয়োগ করিব, সন্ন্যাসী হইতে দিব। ছোটেলাল এই অল্প বয়সে ভগবানের জন্য পাগল। দিনরাত সাধুর পিছনে ঘোরে আর গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়া ধ্যান-ভজন করে। আমার ছেলেদের মধ্যে সেই-ই সাধু হওয়ার যোগ্য। তাই আমরা তাহাকে এজন্য অনুমতি দিতেছি। তাছাড়া, সাধু যদি হইতেই হয় সে আপনার মত কৃপালু মহাত্মার মঠে থাকিয়াই সাধুর জীবনযাপন করুক। তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব।

আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, একটি ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া মুক্তি লাভ করিলে তাহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হয়, পৃথিবী পুণ্যবতী হয়। আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন হয়। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—শ্রীচরণাশ্রিত...

ঠাকুরদাস-বাবা প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "তথাস্তু। যাও বেটা, আর বিলম্ব না ক'রে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো, আর এ বেশ ত্যাগ ক'রে মঠের গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করো আমার হাত থেকে।"

তারপর প্রবীণ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া আদেশ দিলেন, "আজ অতি শুভ দিন। পুণ্যলগ্নও সমাগত। তোমরা ছোটেলালের জন্য বিরজাহোমের সব ব্যবস্থা করো। আজই আমি তাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেবো।"

জনৈক সেবক আর কালবিলম্ব না করিয়া ছোটেলালকে নিয়া মঠের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

প্রবীণ শিষ্যদের মধ্যে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন, তাইতো, এত তাড়াহুড়া করিয়া গুরু মহারাজ তো কখনো কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই! তাছাড়া, এত অল্প বয়স্ক বালকের সরাসরি সন্ন্যাস-দীক্ষা? গুরুজী তো ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তুতির উপর সদাই গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু কই, এ ক্ষেত্রে তো তাহার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলিতেছেন না?

অন্তর্য্যামী পরমহংসজী প্রবীণ শিষ্যদের মনোভাব মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "ছোটেলাল, আজ এই মঠে আত্মসমর্পণ করতে আসবে—এ আমি জানতাম। তাই প্রাঙ্গণে বসে তার প্রতীক্ষা করছিলাম। দু'বছর আগে আমি একটা সাধু জমায়েৎ নিয়ে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। ছোটেলাল আমার সেবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। তখনি দেখলাম, ওর মস্তকের চারদিকে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতির বেষ্টনী। বুঝলাম, শিগ্‌গীরই মুমুক্ষার আগুন জ্বলে উঠবে ওর জীবনে, চিরতরে গৃহ ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবে সন্ন্যাস জীবন।"

জনৈক শিষ্য মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন, "কিন্তু গুরু মহারাজ, সাধারণ

ভাবে আমরা দেখে আস্‌ছি, আগে সাধকের ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়া হয়। এর বেলায় দেখছি ভিন্নরূপ ব্যবস্থা।"

পরমহংসজী উত্তর দিলেন, "বেটা, সমর্থ গুরু শিষ্যের জন্য ব্যবস্থা-পত্র দেয় তার বিগত তিন জন্মের সুকৃতি বিচার ক'রে। তাছাড়া, এ জন্মের তীব্র বৈরাগ্য, তীব্র মুমুক্ষার কথাও তো বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। জান তো, শ্রুতি বলেছেন, যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রব্রজেৎ, অর্থাৎ যেদিনই সাধকের সত্যকার তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হবে, সেইদিনই গুরু তাঁকে দেবেন সন্ন্যাস। এতে তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষের প্রশ্ন ওঠে না। তবে সর্ব্বদা মনে রাখবে, এই মুমুক্ষার তীব্রতা যাচাই করার অধিকারী হচ্ছেন সমর্থ গুরু।"

সেইদিনই বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া ছোটেলাল সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার কাছে। নব নামকরণ হয় —দয়ালদাস। উত্তরকালে দয়ালদাস পরিণত হন এক সার্থকনামা সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। তাঁহার যোগবিভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞানের খ্যাতি বিস্তারিত হয় দিগ্‌বিদিকে। সমকালীন ভারতের বহু উচ্চকোটির সাধক, মনীষী শাস্ত্রবিদ্‌ ও ধর্ম্ম প্রচারক তাঁহার পরমাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন।

দয়ালদাসের আশ্রম জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত হয় কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতেই তাহাকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত, নিয়মিত ধ্যান-জপের পর শুরু হইত বৃদ্ধ গুরু মহারাজের শাস্ত্র অধ্যাপনা ও বেদান্তের ব্যাখ্যান। ইহার শেষে দয়ালদাসকে লাগিতে হইত আশ্রমের কাজে। দূরের কূপ হইতে বৃহৎ ভাণ্ডে জল টানিয়া আনা, গরু-মহিষের সেবা আর পরিচর্য্যা করা ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। আশ্রমবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য যাহারা রসুই করিত ও বাসন মাজিত তাহাদের কাজেও দয়ালদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিতে

হইত। দিনে রাতে অবসর বা বিশ্রামের সুযোগ খুব কমই ছিল। এত দৌড়-ঝাঁপ ও খাটুনীর পর আহার মিলিত কয়েক টুক্‌রা শুষ্ক রুটি আর এক হাতা সিদ্ধ সব্‌জি।

রাত্রে নিদ্রার সময়ও গুরুজীর শ্যেন দৃষ্টির কবল হইতে নিস্তার ছিল না। দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রার পরই একটি মোটা লাঠি হাতে নিয়া তিনি চীৎকার শুরু করিতেন, "ওরে তোদের ভোজন ও নিদ্রায় যদি এতই অনুরাগ, তবে শুধু শুধু ঘরের আরাম ছেড়ে এখানে কেন এসেছিস্। উঠে পড়্ তামস নিদ্রা ছেড়ে।"

শিষ্যেরা উঠিয়া জপ-ধ্যানে বসিয়া গেলে, তবেই ঠাকুরদাস-বাবা শান্ত হইতেন। নিজের কুঠরীতে গিয়া হইতেন ধ্যানস্থ। প্রাতঃকালে বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যান শুরু হইত আশ্রমের প্রাঙ্গণে। এই শাস্ত্রচর্চার মজলিশে, বয়সে ছোট হইলেও দয়ালদাস ছিলেন অনন্য সাধারণ। বোধশক্তি প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, তাই যে কোন জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। গুরুমহারাজ তাই দিনের পর দিন তাহাকে উৎসাহিত করিতেন অধ্যাত্মশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার জন্য।

তরুণ জীবনের এই কঠোর দিনচর্য্যা সম্বন্ধে উত্তরকালে দয়ালদাস বাবা কহিতেন, "আমার গুরু সদাই কৃপালু ছিলেন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ আমায় করাতেন বটে, কিন্তু দেখতাম আড়ালে গিয়েই গোপনে মুছে ফেলতেন নিজের চোখের জল। বুঝতাম, কঠোর হয়ে তিনি শাসন করতেন আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, কিন্তু হৃদয় তাঁর ব্যথাতুর হয়ে উঠ্‌তো। আমরা যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলাম তাঁর। ঐ জওয়ান বয়সে গুরুজী যদি কৃচ্ছ্র সাধনে অভ্যাস না করাতেন, তবে কি দেহবুদ্ধি যেতো? ত্যাগ বৈরাগ্য কোনদিনই আসতো? চিত্তের মল কি দূরীভূত হতো? অভীষ্ট কি আর সিদ্ধ হতো? ভাগ্যগুণে এমন দয়াল গুরুর দাস হয়েছিলাম বলেই তো আজ আমি তোমাদের দয়ালদাস-বাবা।"

তরুণ শিষ্য এই কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হইবার পর গুরু মহারাজ কহিলেন, "দয়ালদাস, এবার তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি

আয়ত্ত করতে হবে। বেটা, ব্রহ্মসাধন একটা মস্ত বড় লড়াই— এজন্য চাই মজবুত দেহ, আর সুসংযত ও কেন্দ্রীভূত মন। পর পর্য্যায়ে রাজযোগ সাধনার ভেতর দিয়ে তোমায় যেতে হবে। বেটা, যা পারো তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই শরীর আজকাল জীর্ণ হয়ে এসেছে। এটাকে আর বেশী দিন আমি ধরে রাখবো না।"

একাদিক্রমে পনের বৎসর এ আশ্রমে দয়ালদাস বাস করেন। সিদ্ধ গুরুজীর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া গোপনে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন তাঁহার যোগসাধনা। এই সময়ে উচ্চতর যোগবিভূতির নানা প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার সাধনজীবনে।

কিন্তু গুরু ঠাকুরদাস-বাবা তাঁহার সতর্ক প্রহরা দিয়া শিষ্যকে সদাই ঘিরিয়া রাখিতেন, তাঁহার যোগশক্তিকে করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। উচ্চতর অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিলেই শিষ্যকে গুরু কহিতেন, "দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় তোমার নানা দর্শনাদি ঘটছে, কিন্তু এ নিয়ে কখনো মত্ত হয়ে উঠো না, প্রতিষ্ঠার দিকে কখনো পা বাড়িয়ো না। সদাই স্মরণ রাখবে, প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা। বৎস, একমনে দৃঢ় পদক্ষেপে আত্মজ্ঞানের সাধনায় এগিয়ে যাও। পরাজ্ঞান যেদিন তোমার সাধনসত্তায় ফুটে উঠবে, এই মানবজীবন হয়ে উঠবে সার্থক।"

বৃদ্ধ গুরু মহারাজ ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়েন মরজীবনের প্রান্তসীমায়। বিদায় ক্ষণের প্রাক্কালে শোকাকুল শিষ্য ও সেবকেরা সবাই তাঁহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়ান। স্থিতধী মহাপুরুষ একে একে সবাইকে জানান তাঁহার অন্তরের আশীর্ব্বাদ আর বিদায় সম্ভাষণ।

প্রিয় শিষ্য দয়ালদাসের দিকে তাকাইয়া গুরু কহিলেন, "বেটা দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় অভীষ্ট তোমার অচিরেই পূর্ণ হবে। আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হবে তোমার সাধনসত্তায়। তোমার প্রথম দর্শনের দিনেই আমি জেনেছিলাম, তুমি লোকগুরু হবে। লোক মঙ্গলের জন্য

জীবন ধারণ করবে। তাই তোমার তপস্যাময় জীবনকে এত সতর্কতা দিয়ে আমি ঘিরে রেখেছিলাম।"

শোকার্ত্ত দয়ালদাস ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবা আশ্বাস জানাইয়া কহিলেন, "বৎস, শেষ বিদায়ের আগে জানাই তোমায় আমার আশীর্ব্বাদ। ঋদ্ধি সিদ্ধি চিরদিন থাকুক তোমার করায়ত্ত। অন্নহীনে অন্নদান আর মুমুক্ষুকে মুক্তিদান, হোক তোমার জীবন ব্রত।"

একটু থামিয়া গুরু মহারাজ আবার বলিলেন, "কলিকালে মানুষ অন্নগত প্রাণ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। ধীর স্থির হয়ে বসে যোগাভ্যাস করার সময় তাদের নেই। তাদের মধ্যে বেদান্তের পরমতত্ত্ব তুমি প্রচার করো, নিত্যানিত্য বস্তু-বিচারের কথা নূতন ক'রে জাগিয়ে তোল।

গুরু মহারাজের মহাপ্রয়াণ শেলের মত দয়ালদাসের বুকে বাজিল। শেষ কৃত্যের পর কয়েকটা দিন চলিয়া গেল শোকার্ত্ত অবস্থায়। তার পর দয়ালদাস আহ্বান করিলেন আশ্রমের শিষ্য সেবক এবং বাহিরের ভক্ত গৃহস্থদের। কহিলেন, "গুরু মহারাজের দেহান্তের পর একটা বড় কাজ বাকী রয়ে গিয়েছে। তাঁর স্মৃতিপূজার জন্য এবার আমাদের একটা বৃহৎ ভাণ্ডারা অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। তাতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এ অঞ্চলের গরীব দুঃখী মানুষ আর সাধু সন্তদের।"

প্রবীণ শিষ্যেরা চমকিয়া উঠেন। কহেন, "দয়ালদাস, তোমার প্রস্তাব অবশ্যই অতিশয় সাধু। কিন্তু ভাই, বড় রকমের ভাণ্ডারা দেবার সাধ্য আমাদের কই? তুমি তো জানোই, আশ্রমে সঞ্চিত কোন অর্থ নেই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আশেপাশের গৃহস্থ লোকেরা কেউ তেমন ধনবান্ নয় যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে। দূর-দূরান্তের ভক্তেরা কে কি সাহায্য দেবে বুঝতে পারছিনে। এ অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী কাজ করাই কি ভালো নয়? ছোটখাটো একটা ভাণ্ডারা দিয়েই কাজ শেষ করা যাক্, কি বলো?"

দয়ালদাস উত্তরে প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলেন, "গুরুজী তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা মোটেই হারাইনি, কোনদিন

হারাবোও না। তাঁর ভাণ্ডারা বিরাটভাবেই করতে হবে, অর্থ ও দ্রব্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আপনারা এই পবিত্র কাজে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হোন।"

বয়সে নবীন হইলেও দয়ালদাসের প্রতি সতীর্থেরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। অবশেষে তাঁহার সিদ্ধান্তই সবাই মানিয়া নেন। সোৎসাহে এবার কাজকর্ম্ম শুরু হইয়া যায়।

বিভিন্ন মঠ মণ্ডলী আখড়ায় এবং হাটে বাজারে ঘোষিত হয় পরমহংস ঠাকুরদাস বাবার ভাণ্ডারার কথা। কোথা দিয়া কি ঘটিয়া যায়, দূর দূরান্ত হইতে উপস্থিত হইতে থাকেন শেঠ, সওদাগর ও ধনী গৃহস্থ ভক্তেরা। অকাতরে সবাই বাবার কাজে অর্থ দান করেন। সংগৃহীত হয় বিপুল পরিমাণ ঘৃত, চিনি, আটা, সুজি ইত্যাদি। অল্প সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র বসেরা গ্রামের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক রাজকীয় ভাণ্ডারা, দশ বারো হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও সাধুসন্ন্যাসী সেদিন সেখানে ভোজন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন। পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

সঙ্কল্প-করা কাজ শেষ হইয়াছে। দয়ালদাস এবার সতীর্থ ও আশ্রম-ভক্তদের জানাইয়া দেন, আশ্রমে আর তিনি অবস্থান করিবেন না, শেষ পর্য্যায়ের তপস্যার জন্য আত্মগোপন করিবেন হিমালয়ে।

তরুণ সাধক দয়ালদাসজীর জনপ্রিয়তা অসাধারণ, সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন, বার বার অনুরোধ জানাইতে থাকেন বসেরায় থাকার জন্য। কেহ কেহ বলিয়া উঠেন, "গুরুজী গত হয়েছেন, এখন তাঁর আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তাঁর পুণ্যস্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা—এটাই তো আপনার প্রধান কর্ত্তব্য।"

উত্তরে দয়ালদাস বলেন, "আমার গুরু মহারাজ বিষয়ী মোহান্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী শিবকল্প মহাত্মা। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর শিষ্যদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো নিভৃত তপস্যার পথে আমি বেরিয়ে পড়ছি। আপনারা প্রার্থনা করুন, গুরুর যে আশীর্ব্বাদ আমি পেয়েছি তা যেন সফল হয়ে ওঠে আমার জীবনে।"

সাতাশ বৎসর বয়সে এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দয়ালদাস বহির্গত হন, আসন গ্রহণ করেন হিমালয়ের এক সিদ্ধপীঠে। এখানে প্রায় দশ বৎসর তাঁহার অতিবাহিত হয় চরম কৃচ্ছ্রব্রত আর আত্মিক সাধনায়। তারপর গুরুকৃপায় হন তিনি সিদ্ধকাম। আত্মজ্ঞানী মহাসাধকরূপে, ঋদ্ধি-সিদ্ধির অধিকারী শক্তিধর মহাপুরুষরূপে, অচিরে সন্ন্যাসী সমাজে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাসের অন্তরে চিরজাগরূক রহিয়াছে তাঁহার কৃপাময় গুরু-মহারাজের আদেশ। তিনি বলিয়াছেন, বুভুক্ষুকে অন্ন দাও, আর মুমুক্ষুকে দাও মুক্তির আলো। এই আদেশই চিরদিন রহিবে তিনি শিরোধার্য। আর এই আদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিতে হইলে, কোন মঠ-মন্দির বা স্থায়ী সাধনকেন্দ্রে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; এখন হইতে ত্যাগব্রতী সাধুদের মণ্ডলী নিয়া তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন করিবেন, জনতার মাঝে থাকিয়াই সাধন করিবেন গুরু-উপদিষ্ট পরম কল্যাণ।

অতঃপর অল্পকাল মধ্যে সন্ন্যাসী দয়ালদাসের ঋদ্ধি-সিদ্ধির খ্যাতি সাধু সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। হরিদ্বারের বিশিষ্ট মোহান্ত ও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে পরমহংস ও সিদ্ধাবধূত আখ্যায় ভূষিত করেন।

কি কুম্ভমেলায়, কি হিমালয়ের গহন তীর্থে, কি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-নর্ম্মদা-কাবেরীর পবিত্র কূলে, যেখানেই তিনি সাধু জমায়েৎ নিয়া উপস্থিত হন, দলে দলে ভক্ত নরনারী, রাজা উজীর শেঠ, লুটায় তাঁহার চরণতলে। তাঁহার বৈরাগ্যময় মূর্ত্তি, জ্ঞান প্রোজ্জ্বল নয়নদ্বয় একবার যে দর্শন করে, অমৃতময় স্নেহবচন একবার যে শ্রবণ করে, মোহিত হইয়া যায়,—এক অমোঘ, অনির্দ্দেশ্য আকর্ষণের বশে করে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। যেখানেই দয়ালদাস-বাবার অধিষ্ঠান হয়, বহিয়া যায় ভাণ্ডারার স্রোত আর ধর্ম্ম উপদেশ। শাস্ত্রালাপ ও ভজন কীর্ত্তনে চারিদিক মুখর হইয়া উঠে. জনজীবনে জাগিয়া উঠে বিপুল আধ্যাত্মিক উজ্জীবন।

গঙ্গা-যমুনা নর্ম্মদার তীরে তীরে, সারা ভারতের তীর্থে তীর্থে

যেখানেই পরমহংস দয়ালদাস-বাবা উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে দেখা যায় এক বিরাট সাধু জমায়েৎ, গৃহস্থ ভক্তেরাও সমবেত হয় দলে দলে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে ঘিরিয়া ভগবৎ আনন্দের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

গুরু ঠাকুরদাসজীর আশীর্ব্বাদ এ সময় হইতে পরিপূর্ণরূপে দয়ালদাস-বাবার আচার্য্য জীবনে রূপায়িত হইয়া ওঠে। ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এক মহিমময় বিগ্রহরূপে দেশের দিকে দিকে তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাস-বাবার অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপজী লিখিয়াছেন,[১]—তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কার্য্যেও তিনি তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকট কোন দীন দুঃখী গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন না করাইয়া যাইতে দিতেন না। কৌপীন কমণ্ডলু মাত্র সম্বল লইয়া অবধূত দয়ালদাস আগন্তুক অভুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকল তাঁহার বৈরাগ্য ও বদান্যতায় বিমুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র সেবার জন্য আটা, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল। তিনিও দুইহাতে দান করিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান সেইখানেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পরিচিত অপরিচিত বোধ নাই, সাধু অসাধু, গৃহস্থ সন্ন্যাসী বিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র দেখা নাই, স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্য নাই, যে অভুক্ত সে-ই ভোজন করিবে, যেখানে স্বামী দয়ালদাস সেইখানেই মা অন্নপূর্ণার এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান।

"স্বামী দয়ালদাস এক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতেছেন। শত শত সহস্র সহস্র সাধু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হইত। স্বামীজীর সঙ্গে বৈরাগী, বৈষ্ণব, রামাইৎ, উদাসী, সন্ন্যাসী, পরমহংস, অবধূত সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধু ও যতিগণ

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপ

প্রেমের তারে একত্রিত হইয়া একসূত্রে মণি, মুক্তা, প্রবাল আদি গ্রথিত মালার স্থায় সুশোভিত থাকিতেন। তিনি সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এইজন্য কেহই তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না।

"তিনি সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর নেতা হইয়াও কখন আপনাকে প্রধান মনে করিতেন না। মোহান্তদিগের মত তাঁহার স্বতন্ত্র গদি বা আসন থাকিত না। তিনি তৃণাসন ও বালুকাসন বড় ভালবাসিতেন। কেহ তাঁহার স্তুতিবাদ করিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন ও ভক্তিসহ ভগবানের স্তুতি করিতে বলিতেন। রাজা, উজীর, শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, স্ত্রী-পুরুষ যে তাঁহার একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই তাঁহার সেবা না করিয়া, তাঁহার অশেষ প্রশংসা না করিয়া, থাকিতে পারে নাই।"

সে-বার দয়ালদাস-বাবা একটি বিরাট জমায়েতের প্রধান রূপে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাইতেছেন। বিহারের পথে আসিবার সময় তিনি মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে শহরের বহু নরনারী জড়ো হইল তাঁহার মণ্ডলীর সম্মুখে। শেঠ ও মহাজনেরাও ভক্তিভরে আগাইয়া আসিলেন সাধুদের সেবার জন্য।

পৌষ মাস তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। বিহারের প্রচণ্ড শীতে দয়ালদাসজী ও তাঁহার সাধু শিষ্যেরা নদীর চড়ায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে পরমানন্দে ধুনি জ্বালাইয়াছেন, আসন পাতিয়া বসিয়াছেন।

একজন গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, এই দুঃসহ শীতের রাত্রে ঘরের ভেতরে থেকেই আমরা কাঁপতে থাকি। প্রচণ্ড হিমের মধ্যে আপনাদের নিদ্রা হয় কি ক'রে?"

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, "নিদ্রা না হলেই বা অসুবিধা কি? সাধুদের একমাত্র কাজ ভগবৎ ভজন। শীতের দাপটে রাত্রে যেদিন নিদ্রা না হয়, আমরা ধ্যান জপ ও ভজন শুরু ক'রে দিই। এ নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।" অতঃপর তিনি সোৎসাহে বেদান্তের তত্ত্ব আলোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন।

সেদিন শীতের রাত্রে হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া যায়। দলের

কয়েকটি সাধু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে থাকেন, "তাই তো! ধুনির কাঠ সংগ্রহের কি উপায় হবে? শুকনো কাঠ পাওয়া তো অসম্ভব!"

দয়ালদাস-বাবা হাসিয়া কহিলেন, "ছাখো, সাধুদের বোঝা বইবেন ভগবান্। তোমরা এজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমাদের ভোজনের জন্য. পুরী মালপোয়া তৈরীর জন্য, ধনী শেঠেরা এগিয়ে এসেছেন। কত আটা, ঘি, চিনি জড়ো করেছেন। তেমনি ভগবদ্ ভক্ত দরিদ্র লোকেরাও তোমাদেব সেবার জন্য রয়েছে উৎকণ্ঠিত। একটু সবুর করো, একজন কাঠুরে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। যত খুসী ধুনি জ্বালাও, আর সারা রাত ধ্যানজপ করো।"

সত্যিই তাই। ঝড় বাদল কিছুক্ষণ হয় থামিয়া গিয়াছে। এই অবসরে এক ব্যক্তি মাথায় একটি বৃহৎ কাঠের বোঝা নিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বোঝা নামাইয়া যুক্তকরে সে নিবেদন করে, "বাবা, আমি অতি দরিদ্র, ছা-পোষা লোক। বন থেকে কাঠ কেটে আনি, তা বিক্রি ক'রে কোনমতে দিন গুজরান হয়। ঘরে কিছু শুকনো কাঠ ছিল, আপনাদের সেবার জন্য নিয়ে এলাম।"

বাবার নির্দ্দেশে এই কাঠওলাকে পরিতোষ সহকারে পুরী মালপোয়া ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

আর একদিনের কথা; গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবার ধুনির সম্মুখে শহরের একদল ভক্ত দর্শনার্থী যুক্তকরে বসিয়া আছে। বাবার মুখে বেদান্তের বৈরাগ্য অভ্যাস ও নিত্যানিত্য বিচার সম্পর্কে উপদেশ শুনিতেছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক হিন্দুস্থানী ভক্ত এই কয়দিনেই বাবার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লোকটি শুদ্ধসত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণ, সাধনার এক উত্তম আধার। তাই তাহার উপর পড়িয়াছে দয়ালদাসজীর বিশেষ কৃপা। কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ায় এই ভক্তটি হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিদায় গ্রহণের জন্য বাবার অনুমতি সে প্রার্থনা করে।

বাবা তন্ময় হইয়া এসময়ে একটি তত্ত্ব উপদেশ দিতেছিলেন। ভক্তটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আরে, তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রসুই করার জন্য ব্যস্ত হয়েছো। ভগবৎ কথা শুনছো এখানে, তাই

ভগবান্‌ই তোমার সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। ঘরে ফিরেই দেখবে, ভোজনের সব তৈরী।"

ভক্তটির ঘরে দ্বিতীয় কেহ নাই, নিজের আহার্য্য রোজ নিজ হাতেই তাহাকে প্রস্তুত করিতে হয়। যাই হোক বাবার এই কথায় সে নিরস্ত হয়। ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্ববৎ শ্রবণ করিতে থাকে।

মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ভক্তটি দেখে, হঠাৎ একজন আত্মীয় তাহার গৃহে অতিথি হইয়াছে, এবং গৃহস্বামীর দেরী দেখিয়া নিজেই রুটি সব্‌জি তৈরী করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

অল্প কয়েকদিন যাবৎ দয়ালদাস-বাবা মুঙ্গেরে এই নদীর ঘাটে অবস্থান করিতেছেন। ইহারই মধ্যে এই অঞ্চলের চারিদিকে তাঁহার যোগবিভূতির খ্যাতি, কৃপালীলার নানা কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাধু জমায়েতের তিনিই হইতেছেন মধ্যমণি, তাই সাধু সন্ন্যাসী ও মুমুক্ষু গৃহস্থেরা সবাই জড়ো হইতেছে তাঁহার ছাউনিতে। সংসারের তাপে ক্লিষ্ট, আর্ত্ত ভক্তেরাও আসিতেছে তাহাদের নানা সমস্যা নিয়া।

শহরের এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেদিন বাবার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাহার এক পরমাত্মীয় দূরদেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। চিঠি আসিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। ভদ্রলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর স্বরে কহেন, "বাবা, এ সঙ্কটে ডাক্তার কব্‌রেজদের কিছু করবার নেই। আপনার মত যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাত্মারাই শুধু এমন মৃতকল্প রোগীকে বাঁচাতে পারেন। আপনার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি। যা হয় আপনি করুন।"

দয়ালদাসজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, তুমি শান্ত হও— কেঁদো না। কেঁদে কোন ফল হবে না। তোমার আত্মীয়টি আর বেঁচে নেই, ঘণ্টাখানেক আগে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে।"

ভদ্রলোকটি এই শোক সংবাদের আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। পরমহংস দয়ালদাসজী স্নেহপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, "বেটা, দুঃখের আঘাত, মৃত্যুর আঘাত, সব মানুষের জীবনে আসবেই আসবে। তোমার এই দেহ, তোমার প্রিয়তম নিকট আত্মীয়দের দেহ—এ সবই অনিত্য, প্রপঞ্চ। যা অনিত্য তার ধ্বংস তো

এক সময়ে হবেই, এজন্য আমাদের আগে থেকেই তৈরী থাকা উচিত এ সংসারে সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। কেবল ভগবান্‌ই নিত্য। তাই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে সে সম্বন্ধে কখনো ছেদ পড়ে না। বৈরাগ্য অবলম্বন করো, চিত্তের মল অপসারণ করো। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে, সৎ-চিৎ আনন্দময় পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তা হলে আর বিচ্ছেদের দুঃখ শোক ভোগ করতে হবে না।" এইভাবে শোকমগ্ন ভক্তটিকে প্রবোধিত করিয়া বাবা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে অবস্থান করার কালেই দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভ করেন তরুণ সাধনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উত্তরকালে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে সমগ্র ভারতে তিনি প্রখ্যাত হন, এ দেশের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তারূপে লাভ করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁহার 'ধর্ম্ম-প্রচারক' পত্রিকা, ব্যাপক ধর্ম্মান্দোলন, অসামান্য বাগ্মিতা, অগণিত হরিসভার স্থাপনা এবং কাশীর ধর্ম্মকেন্দ্র যোগেশ্বরী মঠ সারা দেশে যোগায় বিপুল আত্মিক প্রেরণা। কাশীর স্বামী আনন্দপ্রকাশ, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পরমহংস বালানন্দ স্বামী, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির সহযোগিতায় সনাতন ধর্ম্মের উজ্জীবনের জন্য কৃষ্ণানন্দ যে অবদান রাখিয়া যান, আজো তাহার স্মৃতি দেশের জনমনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে

গঙ্গার ঘাটে ধুনি জ্বালাইয়া দয়ালদাস-বাবা সেদিন ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কিছু সংখ্যক ভক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন বাবার ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে সাধু জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণপ্রসন্নের বয়স তখন মাত্র বিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই ভগবৎ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এযাবৎ কত সাধু মণ্ডলীতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কত মহাত্মার শরণ নিতে গিয়াছেন প্রাণের উৎকণ্ঠা নিয়া, কিন্তু বহুবাঞ্ছিত গুরুর সন্ধান আজো তাঁহার মিলে নাই। দীর্ঘ বপু, নিমীলিত নয়ন, ধ্যাননিবিষ্ট দয়ালদাস-বাবার দিকে চোখ পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অন্তরাত্মা

হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'ওরে, এই মহাত্মাই যে তোর পরমাশ্রয়, ইঁহারই চরণে কর্ আত্মসমর্পণ।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বিহ্বলভাবে নীরবে ধুনির পাশে বসিয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই দয়ালদাস-বাবা চক্ষু উন্মীলন করিলেন। গৌরকান্তি উজ্জ্বল নয়ন তরুণ দর্শনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্নের দিকে করিলেন প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার আয়ত নয়ন দুইটিতে, ভক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন চিরতরে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গের আলোচনা চলিল, তারপর দর্শনার্থীরা উঠিয়া গেলে কৃষ্ণপ্রসন্ন মহাত্মার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর্ত্ত স্বরে কহিলেন, "বাবা, ঈশ্বর প্রাপ্তির সঙ্কল্প নিয়ে পাগলের মত আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমায় আশ্রয় দিন, সন্ন্যাসের দীক্ষা দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য।"

অন্তর্য্যামী দয়ালদাস-বাবা জানিতেন, মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন এই গঙ্গার ঘাটেই করিবেন তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। এই নবীন সাধকের প্রতীক্ষায়ই যে এ কয়টি দিন তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছেন।

বাবার সম্মতি পাওয়া গেল। কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার কৃপায় গ্রহণ করিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস, নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

ইহার অব্যবহিত পরেই, দয়ালদাস-বাবা ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া, তাঁহার সাধুমণ্ডলী নিয়া, রওনা দিলেন মহাতীর্থ গঙ্গাসাগরের দিকে।

গঙ্গাসাগর দর্শনের পর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের নানা তীর্থ ও পীঠস্থানে দয়ালদাসজী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সব সময়েই তাঁহার মণ্ডলীর সঙ্গে আসিয়া জুটে নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী, গড়িয়া উঠে এক বৃহৎ জমায়েৎ। এই জমায়েৎ নিয়াই পরমানন্দে তিনি সর্ব্বত্র গতায়াত করেন। যেখানেই যান গৃহস্থ জনসাধারণকে দান করেন বেদান্তের উপদেশ—দান ধ্যান, ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

একবার জমায়েৎ নিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দয়ালদাসজী উপস্থিত হন কপিয়াল গ্রামে, তাঁহার জন্মভূমিতে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর সন্ন্যাসীদের একবার পূর্ব্বাশ্রমের জন্মভূমি ও পিতামাতাকে দর্শন করিয়া আসিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই কপিয়াল গ্রামে সেদিন তাঁহার আগমন। এ সময়ে সঙ্গে রহিয়াছে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী। এই সাধু জমায়েতের আগমনে সারা গ্রামে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। ধনী বণিক এবং সাধারণ গৃহস্থেরা সবাই মিলিয়া এই সাধুদের সেবায় তৎপর হইয়া উঠেন।

নিজের পূর্ব্বাশ্রমের গৃহে উপনীত হইলেন দয়ালদাস। বৃদ্ধ পিতা ইতিপূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননীও এখন বৃদ্ধা, চলৎ-শক্তি রহিত। দয়ালদাস ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম নিবেদন করেন, প্রকাশ করেন আত্মপরিচয়।

এতদিনের পরে পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধা জননীর তাই আনন্দের অবধি নাই। "মেরে ছোটেলাল, মেরে ছোটেলাল" বলিয়া পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে ছোট বালক জ্ঞানে তিনি কত আদর করিতেছেন, কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

জননীর গৃহের প্রাঙ্গণে সেদিন এক বড় সভার আয়োজন হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, শীর্ষস্থানীয় সমাজ নেতারা, সবাই আন্তরিক অভিনন্দন জানান তাঁহাদের গ্রামের পরম গৌরব পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে।

সমাজের মুখপাত্রেরা এই সভায় দয়ালদাস মহারাজকে বলেন, "আমাদের শাস্ত্র মহাপুরুষদের উদ্দেশ ক'রে বলেছেন :

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরেব্রহ্মণি যস্যচেতঃ।

"আপনার সিদ্ধি সমুজ্জ্বল জীবনও তাই আপনার বংশকে পবিত্র করেছে, আমার জননীকে কৃতার্থা করেছে, আর বসুন্ধরাকে করেছে

পুণ্যবতী। আমরাও আপনার স্বজন ও বান্ধব হিসেবে হয়েছি এই পুণ্যের ভাগী।"

দয়ালদাস-বাবাও এই উপলক্ষে সমবেত জনতার কাছে নিবেদন করেন, "আপনারা আজ আমার সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করলেন, তার মূলে রয়েছেন আমার জনক ও জননী। এঁদের পুণ্যফলেই বহুবাঞ্ছিত সন্ন্যাস জীবন আমি লাভ করতে পেরেছি, আর পেয়েছি সমর্থ গুরুর আশ্রয়। জীবন আমার কৃতার্থ হয়েছে। আজ যাঁরা আমায় স্নেহ ভালবাসা জানাতে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য—আপনারা সংসারে রয়েছেন। এখানে মাত্র ছুটো লেন-দেনের দিকে সতত দৃষ্টি রাখুন। সদাই নিতে হবে ভগবানের নাম, আর অন্নহীনকে করতে হবে অন্নদান। সতত স্মরণ রাখুন, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই পাওয়া যায় সত্যকার ভোগসুখ, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই আসে ভগবানে অনুরাগ। সংসারের সব বস্তুই অসার, অনিত্য। তা হারিয়ে গেলেই আমরা দুঃখ শোকে অধীর হয়ে উঠি। একমাত্র সারবস্তু ও নিত্যবস্তু, যা কখনো হারায় না, তা হচ্ছেন ভগবান্। এই ভগবানে অনুরাগ এলে তা কখনো নষ্ট হয় না। আর এই ভগবান্‌কে লাভ করলে সেই সম্ভোগ হয়ে থাকে অক্ষয়, অব্যয়। ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেম বলেই তো আজ আমি চরম ও পরম সম্ভোগ খুঁজে পেয়েছি। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, এই বোধ নিয়ে জীবন হয়েছে মধুময়। আপনারা তাই নিত্যকার জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের বোধকেই জাগ্রত ক'রে তুলুন।"

মাতৃভূমি ও মাতার দর্শন সমাপনান্তে দয়ালদাস-বাবা জমায়েৎ সহ আবার বাহির হইয়া পড়েন তাঁহার চিরাচরিত পরিব্রাজনে।

১২৮৬ সালের কথা। হরিদ্বারে সে-বার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলী মেলা প্রাঙ্গণে এক বিরাট সত্র খুলিয়া বসিয়াছে। সাধু মহাত্মা, ভক্ত দর্শনার্থী ও অন্ন-প্রার্থী দীন দুঃখীর ভীড়ে সারা অঞ্চলটি গমগম করিতেছে।

শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীও এসময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য, মেলায় সমাগত সাধু মহাত্মাদের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ।

গুরু মহারাজের ছাউনিতে আসিয়া, রাজসূয়ের মত দান যজ্ঞের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তো কৃষ্ণানন্দের চক্ষু স্থির। প্রায় এক সহস্র সন্ন্যাসী অবধূত ও পরমহংস সেখানে অবস্থান করিতেছেন। একদিকে অবিরাম চলিয়াছে শাস্ত্রালাপ ও ধ্যান ভজন, আর একদিকে সাধু সন্ন্যাসী ও কাঙালীদের ভোজন পর্ব্ব—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে চারিদিক সরগরম।

কৃষ্ণানন্দ বিস্মিত হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, এই রাজসূয় যজ্ঞের ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি ভাবে? গুরুদেব দয়ালদাস-বাবা তো একটি মুদ্রাও স্পর্শ করেন না, যাচ্‌ঞা করেন না কোন কিছুই। অযাচক ও অনিকেত সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি। তবে কাহারা বহন করিতেছে এই বিপুল ব্যয়ভার? অবশ্য, একথা ঠিক, কল্পতরুর মূলে যিনি সদাই বাস করেন, তাঁহার আর কোন কিছুর অভাব কি? তবে এই অভাব কিভাবে কোন্ অলৌকিক পন্থায় মোচন হইতেছে, সেই প্রশ্নটিই বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে তাঁহার মনে।

করজোড়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। এই বিরাট যজ্ঞের ব্যবস্থা কিভাবে চলছে, কে করছে, বলুন তো?"

দয়ালদাসজী সহাস্যে উত্তর দেন, "দেখো বেটা,—ভজন করনা মেরা কাম, ভোজন দেনা মালিক্‌কা কাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তার সৃষ্ট জীবকে, আশ্রিতকে ভুলে থাকতে পারেন? এমনকি যে নাস্তিক, যে ভগবান্ বিরোধী, তার আহারও যোগাচ্ছেন ভগবান্। কাজেই এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু তো নেই।"

গুরু মহারাজ মুখে যাহাই বলুন না কেন, কৃষ্ণানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিয়াছেন—এসবই তাঁহার নিজেরই ঋদ্ধি-সিদ্ধির ফলশ্রুতি।

দয়ালদাসজী সেদিন কহিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ, যদি পরমাত্মার

কৃপা চাও, অরূপের রূপ দর্শন করতে চাও, সর্ব্বদা মনকে অন্তর্বৃত্তিশীল করো, ডুবে যাও ধ্যান সমাধির গভীরে।"

আর একদিন কৃষ্ণানন্দকে গুরুজী নিকটে ডাকিলেন, স্নেহভরে নানা সাধন-উপদেশ দানের পর কহিলেন, "বেটা, গঙ্গার ওপারে, পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছেন এক প্রাচীন আত্মজ্ঞানী মহাত্মা। তোমার সঙ্গে আমার এক চেলাকে দিচ্ছি, সে তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। এই মহাত্মার আশীর্ব্বাদ অমোঘ। তুমি আজই তাঁকে প্রণাম নিবেদন ক'রে এসো।"

শিবকল্প মহাপুরুষ নিভৃত গুহায় স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি জানাইলেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ। কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাচ্চা, মানুষেরা ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলেই বস্তু দেখা যায়। আমি বলবো—এটা তাদের ভ্রম। আসল কথাটা কি জানো? যখন আমরা মাতৃগর্ভে থাকি, তখন দুই চোখ মুদিত থাকে, আসল বস্তুর দর্শন তখনই মিলে। জন্ম হবার পর যখন আমরা চোখ মেলে চাই, তখন দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ায় যত অবস্তু, অর্থাৎ, মায়াময় অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চ। মাতৃগর্ভে যে বস্তুকে, যে অরূপকে, যে পরম সত্যকে দেখছিলাম, তা তখন হয় অন্তর্হিত। ভাগ্যগুণে সদ্‌গুরু তোমার মিলেছে, তাঁর কাছ থেকে মায়াবন্ধন কাটবার কৌশল শিখেছো, এবার তাই প্রয়োগ করো তোমার জীবনে। চক্ষু মুদিত করো আর অন্তরের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হও। সেখানেই মিলবে পরম ধন, হবে আত্মসাক্ষাৎকার।"

মহাত্মা নয়ন নিমীলিত করিলেন, মগ্ন হইলেন গভীর ধ্যানে। নীরবে এই শিব স্বরূপ মহাসাধকের চরণে প্রণাম জানাইয়া কৃষ্ণানন্দ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দেহ মন প্রাণ তাঁহার দিব্য অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, অন্তরে জাগিয়াছে পরম প্রশান্তি। মেলার ছাউনিতে ফিরিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুজীর কাছে বিবৃত করেন মহাত্মার উপদেশ বাণীর কথা এবং তাঁহার নিজের আত্মিক উপলব্ধির কথা।

কুম্ভমেলায় ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সাধু-সন্তেরা যেমন আসিয়া জুটিয়াছেন, তেমনি ভীড় জমাইয়াছে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ নরনারী। সবাই পুণ্যস্নান সমাপন করে, আর দলে দলে উপস্থিত হয় উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মাদের তাঁবু ও ছাউনিতে। সেদিন একদল ভক্ত গৃহস্থ দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে আসিয়া হাজির। বাবার শ্রীমুখের দুই চারিটি কথা না শুনিয়া তাহারা সেখান হইতে উঠিবে না।

বৈরাগ্য ও নিত্যানিত্য বস্তু বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান সোপান—এ কথাটি নানাভাবে নানা সময়ে দয়ালদাসজী তাঁহার ভক্ত দর্শনার্থীদের এ যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ঐসব উপদেশ ও বাণী সঙ্কলন করিয়া শিষ্যেরা 'বিচার-সাগর' নামক একটি হিন্দি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে উল্লেখিত দুই চারিটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, "আজকাল একটা কথা শুনা যায়,— জনকের মত যোগ ভোগ দুই-ই করো। এসব শূন্য গর্ভ বচনে কোন ফলোদয় হয় না। জনক হওয়া মানে দেহাত্মবোধ শূন্য হওয়া। সে যে কঠোর-সাধন সাপেক্ষ। একটি কথা তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, দেহ সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের জন্ম, মরণ, ভোগ, রোগ প্রভৃতি দুঃখের কারণ। দেহ সংযোগ থেকেই বার বার উৎপত্তি হচ্ছে তার বাসনা এবং এই দেহ সম্বন্ধ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি মমত্ব বুদ্ধি। ফলে চারদিকের মায়ার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে। এই দেহের প্রতি অনাস্থাভাব জাগিয়ে তোল, তা হলে দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পদার্থের উপরই স্বাভাবিকভাবে বিরাগ এসে পড়বে, বন্ধন খসে পড়তে থাকবে। বিচারশীল হও, আর ধ্যান মননের অভ্যাস দ্বারা মনকে ক'রে তোল অন্তর্ম্মুখীন। তার ফলে, এই দেহটি সম্বন্ধে মনে হবে—এটি ইহজীবনের এক অস্থায়ী আবাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই চিন্তা জাগলে দেহের প্রতি মমত্ব হ্রাস পায়, সঙ্গে সঙ্গে এই দেহ সংশ্লিষ্ট বিত্তবিভব, স্ত্রী ও বিলাস উপকরণের বাসনাও শিথিল হয়ে পড়ে।

"আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা।

ব্রহ্মচারী জীবনে বিষয় সংস্রব থেকে মানুষ দূরে থাকতো, সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হতো। তারপর গার্হস্থ্য জীবনের জন্ম ছিল দান, যজ্ঞ ও দম বা ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যবস্থা। এ সবের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ভোগাসক্তি কমে আসতো, হতো বৈরাগ্যের উদয়। তারপর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি হ'লে সংসার ছেড়ে দিয়ে আরণ্যক জীবন তারা যাপন করতো, তারপর কেউ কেউ গ্রহণ করতো সন্ন্যাস। আজকাল মানুষের জীবনে এই চতুরাশ্রমের প্রস্তুতি দেখা যায় না। যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য অবধি সবাই ভোগসুখে মত্ত থাকে। তার ফলে ভোগ সামর্থ্য চলে গেলেও ভোগাসক্তি দূর হয় না।

"যুগের হাওয়া যত উল্টেই যাক, ঋষি ঋণ, দেব ঋণ আর পিতৃ ঋণ শোধ না ক'রে কিন্তু কারুর মুক্তির সম্ভাবনা নেই। গুরু সেবা, শাস্ত্রাভ্যাস, আত্মসংযম ও বীর্য্যধারণ ক'রে ঋষিদের সন্তুষ্ট করতে হবে। দেবতাদের প্রসন্ন করতে হবে দান, ব্রত ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা। আর ভোগাসক্তি বর্জ্জন ক'রে, ধর্ম্মধৃত জীবন যাপন ক'রে, সুপুত্র উৎপাদন ক'রে শোধ দিতে হবে পিতৃপুরুষের ঋণ।"

অতঃপর দয়ালদাসজী সমবেত সাধু-সন্ত এবং গৃহস্থ ভক্ত সবাইকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সৎ-চিৎ আনন্দময় আত্মা থেকে আমরা সবাই জন্মেছি, আত্মাতে বিধৃত রয়েছে আমাদের এই জীবন। আবার সেই আত্মাতেই আমরা সবাই ফিরে যাবো, লীন হয়ে যাবো। এই আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু। শ্রুতির কথা সদাই করবে স্মরণ মনন অনুধান—'তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরম্ যদয়মাত্মা।'—আত্মা পুত্র থেকে প্রিয়, ধন থেকেও প্রিয়, অপর সমস্ত প্রিয় বস্তু থেকেও প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এই আত্মার সাক্ষাৎকারই তোমাদের জীবনের পরম কাম্য হয়ে উঠুক, এই আশীর্ব্বাদ আমি সবাইকে করছি।"

সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীরা মহাত্মার এই স্নেহপূর্ণ ভাষণে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বার বার উঠিতে থাকে জয়ধ্বনি—'জয় বাবা দয়ালদাস মহারাজ কি জয়!'

হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় আসিয়া শিষ্যপ্রবর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী পরমানন্দে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন সাধনপথের বহুতর নিগূঢ় নির্দ্দেশ। মুঙ্গের হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন দুইটি সাধু এবং অন্নদা নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। শহরের একটি ভিন্ন আস্তানায় তাঁহারা তিনজন অবস্থান করিতেছেন। সেদিন মেলা-ক্ষেত্রে সাধুদের ছাউনিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অন্নদাবাবু ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে কোথায় তিনি তলাইয়া গেলেন। দুই দিন ঘোর দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আশ্রয় ও আহার জুটিতেছে কিনা, তাছাড়া তিনি বাঁচিয়াই আছেন কিনা, তাহাই বা কে বলিবে? অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণানন্দ ভাবিলেন, গুরু মহারাজ অন্তর্য্যামী, তাঁহার কাছেই এ বিপদের কথা বলিবেন, বন্ধুটির সন্ধান জানিয়া নিবেন।

কিন্তু দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভের পর কৃষ্ণানন্দ এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বহুতর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সেখানে চলিতেছে। তিনি ভাবিলেন,—'আমার কি ভ্রান্ত বুদ্ধি, গুরু মহারাজের কাছে এসে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো, জীবন সমস্যার সমাধান জেনে নেব, তা নয়, কে কোথায় হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছি।' এবার তাই শান্ত মনে ধর্ম্মালাপে নিবিষ্ট হইলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ কৃষ্ণানন্দের মনে পড়িল অতীতের একটি ঘটনা। সে-বার গুরুদেব মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, তাঁহার একমাত্র পুত্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন না। গুরুদেবের প্রাণ গলিয়া গেল, আর্ত্ত ভদ্রলোকটিকে হারানো পুত্রের সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই পিতা পুত্রের মিলন ঘটিল।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের মনে চিন্তার ঝলক খেলিয়া যায়, 'অচেনা এক

দর্শনার্থীকে কৃপালু গুরুজী তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। আর আমি তাঁর প্রিয় শিষ্য—আমার অন্তরের দুঃখ কি তিনি বুঝবেন না? গুরুজী অন্তর্য্যামী এবং মহা শক্তিধর মহাত্মা। অন্নদাবাবুর জন্য আমি যে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছি, তা নিশ্চয়ই তিনি উপলব্ধি করছেন। একটা কিছু তিনি করবেনই।'

এমন সময়ে দয়ালদাস-বাবা হঠাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "বেটা, তুমি কোন্ পথ দিয়ে আমার ছাউনিতে এসেছো? এবার ফিরবেই বা কোন্ পথে?"

"বাবা, কনখলের পথ ঘুরে সাধুদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমি এসেছি। সেই পথেই বাসায় ফিরবো বলে ভাবছি।"—নিবেদন করেন কৃষ্ণানন্দ।

"না বেটা, তুমি ও পথ দিয়ে যেয়ো না। সামনের নৌসেতু পার হয়ে ভীমগড়া দিয়ে চলে যাও।"

"বাবা, ও পথটা আমি চিনিনে। তাই ভাবছি—"

"না-না, বেটা ঐ পথেই তুমি অবশ্য যাবে। পথ না চিনলে কি আসে যায়? একটু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নিও।"

গুরু মহারাজের এই আদেশ কৃষ্ণানন্দ শিরোধার্য্য করিলেন, ভীমগড়ার পথ ঘুরিয়াই চলিলেন নিজ বাসস্থানের দিকে। কিছুটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, বন্ধু অন্নদা উদ্‌ভ্রান্তের মত পথের পাশে বসিয়া আছেন। শরীর তাঁহার অসুস্থ ছিল, তারপর লোকের ভীড়ের চাপে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। এই দুইদিন অবর্ণনীয় কষ্টে তাঁহার কাটিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে দেখা মাত্র ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরেন, সন্তর্পণে তাঁহাকে বাসায় নিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এবার বুঝিলেন, বিপন্ন অন্নদাকে উদ্ধার করার জন্যই অন্তর্য্যামী গুরুদেব ভীমগড়ার পথ সম্পর্কে এত জেদ করিতেছিলেন।

দয়ালদাস-বাবার আশ্রয় নিবার পর হইতে অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেও কৃষ্ণানন্দ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। বাবাও এই নবীন তপস্বীকে সদ্‌গুরু মহিমা উপলব্ধি করানোর জন্য মাঝে মাঝে প্রয়োগ করিতেন নিজের অলৌকিক শক্তি।

কুম্ভমেলা তখন ভাঙিয়া গিয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীরা সবাই দলে দলে হরিদ্বার ত্যাগ করিতেছেন। তখনকার দিনে হরিদ্বার অবধি ট্রেন হয় নাই। গরু ঘোড়া বা উটের গাড়ী নিয়া সাহারাণপুরে গিয়া যাত্রীরা ট্রেন ধরিত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সহযাত্রীরা যান-বাহন কেন্দ্রে আসিয়া দেখিলেন, সব গাড়ীই ভাড়া হইয়া গিয়াছে। একখানিও অবশিষ্ট নাই। অথচ সেইদিনই রওনা না হইলে কোন কোন সহযাত্রীকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। এ সময়ে পদব্রজে সাহারাণপুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। সঙ্গীরা সবাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন।

অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণানন্দ স্মরণ করিলেন গুরু মহারাজকে। ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, জীবনের যেকোন সমস্যার জন্যই যে শ্রীগুরুর কৃপার উপর তিনি নির্ভর করিয়া আছেন। অচিরে দয়ালদাস-বাবার প্রেমঘন মূর্ত্তিটি তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল, দুশ্চিন্তার মেঘ এক নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল। সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়া তিনি কহিলেন, "আপনারা সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর ভাববেন না। অচিরে এ বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো।"

সহযাত্রীরা তাঁহার কথা শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে এক অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণানন্দকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায়ই বা যাবেন, বলুন তো?"

উত্তর হইল "মুঙ্গের থেকে এসেছি, যেতে চাই সাহারাণপুরে। কিন্তু কোন গাড়ী আমরা যোগাড় করতে পারিনি।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। বিকেল চারটায় আমি গাড়ী নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য।"

যথা সময়ে ভদ্রলোকটি একটি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়া সেখানে উপস্থিত হন, কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের অতি যত্ন সহকারে তাহাতে তুলিয়া দিয়া রওনা করেন সাহারাণপুরের পথে।

কোথা হইতে কেন এই অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আবির্ভূত

হইলেন, কেনই বা গ্রীষ্মের গরমে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহা রহস্যময়।

কৃষ্ণানন্দ কিন্তু উপলব্ধি করিলেন, কৃপালু গুরু মহারাজের অদৃশ্য হস্তটি সঞ্চালিত হইয়াছে এই আগন্তুকের মধ্য দিয়া, নির্ভরশীল শিষ্যকে তিনিই আজিকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া সে-বার কৃষ্ণানন্দ বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতেছেন। বাড় নামক স্টেশনে তাঁহাকে গাড়ী বদলাইতে হইবে। এ কয়দিন দীর্ঘ রেলপথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীর বড় ক্লান্ত। ইতিমধ্যে কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলেন, ট্রেনটি ধীরে ধীরে একটি স্টেশন ত্যাগ করিতেছে। সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এটি বাড় স্টেশন এবং ত্রিহুত অঞ্চলে যাইতে হইলে এখানেই গাড়ী বদল করিতে হয়।

কৃষ্ণানন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বরে নির্গত হইল, "হায় গুরুদেব, একি বিপদে আমি পড়লাম। বদল না করতে পারলে অনেক ঘুরে আবার এ পথে আমায় ফিরতে হবে, অনেক কিছু জরুরী কাজ হয়ে যাবে বানচাল।"

কি আশ্চর্য্য। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল এঞ্জিনের একটা ভয়ঙ্কর শব্দ, এবং গাড়ীটিও ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। তখন অবধি কিন্তু উহা প্ল্যাটফরমের সীমানা ত্যাগ করে নাই। এই সুযোগে কৃষ্ণানন্দ মালপত্র নিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গার্ড ও ড্রাইভারদের মধ্যে ততক্ষণে ছুটাছুটি শুরু হইয়া গিয়াছে। কয়েক মিনিট পরে এঞ্জিন ঠিক করিয়া নিয়া গাড়ীটি আবার ধাবিত হয় গন্তব্য পথে। কৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, গাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে তাঁহার গুরু মহারাজেরই করুণা লীলা। শিষ্যের ক্লেশ নিবারণের জন্যই যোগবিভূতি আজ এই সময়ে তিনি প্রকটিত করিলেন। তাছাড়া, এই ঘটনার মধ্য দিয়া শিষ্যের হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দিলেন তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্যের স্বরূপটি।

কয়েক বৎসর পরের কথা। পরমহংস দয়ালদাস-বাবা সে-বার তাঁহার মণ্ডলী নিয়া পদব্রজে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ তিরুপতিতে চলিয়াছেন বালাজী বিগ্রহ দর্শনের জন্য। তাঁহার ঋদ্ধি সিদ্ধির প্রসিদ্ধি ইতিমধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাই অপর সম্প্রদায়ের বহু সাধুও তাঁহার সঙ্গ নিয়াছেন। ফলে পরমহংসজী একটি বড় জমায়েৎ নিয়াই পথ চলিতেছেন।

সেদিন কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা দিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। লোকালয় এদিকে খুব বেশী নাই। দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীদের ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার গ্রামের লোকেরা সজ্জন, সাধুদের জন্য তাঁহারা ভাণ্ডারা দিয়াছে। তোমরা সবাই আজ ভাল ক'রে ভোজন সেরে নাও। আগামী কাল অন্ন মিলবে না।"

ঠিক তাহাই ঘটিল। পরদিন গহন অরণ্য পথে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ মিলিল না। সারা দিনের পথ চলার পর সাধুরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও সবাই কাতর। তাঁহাদের মলিন মুখ দেখিয়া দয়ালদাসজী তাঁহার ধ্যানাসনে গিয়া বসিলেন। ব্রহ্মলীন গুরুদেব ঠাকুরদাস মহারাজকে মনে মনে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "বাবা, এতবড় একটা সাধু জমায়েৎ আমার সঙ্গে আজ চলছে, অথচ আহার্য্য সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা নেই। এরা সবাই যে আমার উপরই নির্ভর ক'রে আছে। তুমি কৃপা ক'রে এর একটা বিহিত করো।"

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাসজীর মাননপটে ভাসিয়া উঠিল একটি বিরাট বৃক্ষ, উহার শাখায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে সুস্বাদু ফল।

আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি সেবক শিষ্যদের বলিলেন, "তোমরা আশেপাশে শিগ্‌গীর একটু তল্লাসী চালাও তো। আজ বৃক্ষই হবেন আমাদের ভোজন দাতা। ছাখো কোথাও কোন বৃক্ষে সুপক্ক ফল রয়েছে কিনা।"

খোঁজাখুঁজি তখনই শুরু হইয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ দূরে সন্ধান মিলিল একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষের, সত্যই অজস্র সংখ্যক পাকা ফল উহাতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীরা ঐসব আম্র ভোজন করিয়াই সেদিন ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিলেন।

সাধুরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, এই আম্র ফলিয়াছে নিতান্ত অসময়ে। তাছাড়া, এই বিরাট বনে একটি ছাড়া আর কোন আম্রবৃক্ষ বর্ত্তমান নাই। সকলেই বুঝিয়া নিলেন, ইহা পরমহংস দয়ালদাসজীর যোগবিভূতিরই এক নিদর্শন।

পরমহংস দয়ালদাস-বাবা তাঁহার জমায়েৎ নিয়া কয়েকটি তীর্থ ঘুরিয়াছেন। এবার রওনা হইয়াছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে। পদব্রজে সবাই চলিয়াছেন। একটি দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করার পর সূর্য্য অস্তমিত হইল। নিকটে কোথাও গৃহস্থদের গ্রাম নাই যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাইবে। পথে কেবলি পড়িতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আর কণ্টক ও প্রস্তরময় দুর্গম পথ। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময় রাত্রি. তদুপরে আকাশ ব্যাপিয়া শুরু হইয়াছে মেঘের ঘনঘটা। জমায়েতের সাধুরা অতি কষ্টে দুর্গম পথ দিয়া চলিয়াছেন, কাঁটা ও প্রস্তরের ঘায়ে অনেকেরই পা হইয়াছে ক্ষত বিক্ষত। অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় পথের নিশানা বার বার ভুল হইতেছে ; সাধুরা মাঝে মাঝে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরও বিপদে পড়িতেছেন। এই ঘোর বিপদে সবাই দয়ালদাস-বাবার কাছে মিনতি জানাইতে থাকেন, "বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকেও একি সঙ্কটে আজ আমরা পড়েছি। একেই দেহ পথ-শ্রমে অবসন্ন। তার ওপর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে শোনা যাচ্ছে মেঘের গর্জ্জন। আপনি আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন।"

"তোমরা সাধু, সব কিছু ভার পরমাত্মায় ন্যস্ত করেছো। তোমরা বিপদের মুখে এমন অধীর হবে কেন? পরমাত্মাকে ডাকো, কৃপা তিনি অবশ্যই করবেন।"—নির্ব্বিকার চিত্তে প্রশান্ত কণ্ঠে দয়ালদাসজী কথা কয়টি বলিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল বিপদভঞ্জন পরম প্রভুর কৃপা-সঙ্কেত।

"অকস্মাৎ সাধুগণ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল, এবং প্রায় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল, যেন একজন স্থুল কলেবর উলঙ্গ পুরুষ হস্তে প্রদীপ্ত মশাল লইয়া নাচিতে নাচিতে মণ্ডলীর অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, আর একজন কৃষ্ণবর্ণ৷

বিবসনা নারী তাঁহারই তালে তালে নাচিতে নাচিতে তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। সাধুগণ আলো দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন; ঐ আলোকের ছটায় পথ দেখিয়া মশালধারীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ এই আলোকের ছটায় সাধুগণ অক্লেশে গমন করিলেন। তাহার পর অকস্মাৎ আলোটি নিবিয়া গেল। যিনি কৃপা করিয়া আলো দেখাইতেছিলেন, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। দিগম্বরী নারীও কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

"সাধুগণ দেখিলেন, তাঁহারা একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তথায় থাকিবার আশ্রয় পাইলেন, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

"নির্ব্বিঘ্নে সাধুগণ গ্রামে পৌঁছিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ,—আলো ধরিয়া আসিল কে?

"স্বামীজী বলিলেন, 'তোমরা কি চিনিতে পার নাই? সাধুগণ কাতর হইয়া ডাকিলে যিনি অভয় দান করিয়া থাকেন, ভক্ত ডাকিলে যিনি ভক্তের দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না, এ যে সেই হরপার্ব্বতী। সাধুদিগের হৃদয় ভক্তের সখার অতুল কৃপার পরিচয় পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইল[১]।"

পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল পরমহংস দয়ালদাসজীর গুরু-স্থল এবং জন্মস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবে বহু পাঞ্জাবী সাধক তাঁহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মণ্ডলীতে আসিয়া আশ্রয় নিত, সন্ন্যাস দীক্ষা নিত তাঁহার নিকট হইতে।

মণ্ডলী সঙ্গে নিয়া দয়ালদাস মহারাজ সেবার কিছুদিনের জন্য লাহোরে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তর চলিতেছে। নবাগত সন্ন্যাসী কহিলেন, "বাবা, আমরা শুনেছি, আপনি অপনার গুরুর কাছে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, আবার বেদান্তের আত্মতত্ত্বও হয়েছে পরিজ্ঞাত। আজকাল তো আপনি বেদান্ততত্ত্বের শিক্ষাই বেশী দিয়ে থাকেন। সাধন পথের

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী: শ্রীমৎ আনন্দ স্বরূপ

আমরা নূতন পথিক। কৃপা ক'রে আমাদের বলুন, কোন্ পথ আমরা অনুসরণ করবো।"

বাবা উত্তরে কহিলেন, "আমার ওপর আমার গুরুর কৃপা ছিল অপরিমেয়। তিনি সর্ব্ব সাধনায় পারঙ্গম ছিলেন, সর্ব্ব দর্শনে ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। বালক কালে যোগসাধনা ও যোগসিদ্ধির উপর আমার প্রবণতা দেখে, সেই পথেই আমায় করেছিলেন তিনি সিদ্ধকাম। তারপর বেদান্তের আত্মজ্ঞানের পরম পথটি আমায় তিনি প্রদর্শন করেন, তাঁর কৃপায় জীবন আমার ধন্য হয়। আমি নিজে সাধনার সব পথ অনুসরণ করেছি, অনেক কৃচ্ছ্র, অনেক তপস্যা করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, আজকের দিনের মানুষের পক্ষে যোগ সাধনার পথ বড় কঠিন। বরং সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে থেকে তারা চিত্তের মল অপসারণ করুক নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার করে আত্মাকে উপলব্ধি করুক। তাই হবে তাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল সাধনা। এই জন্যই সর্ব্ব সাধারণের কাছে বেদান্তের উপদেশই আমি দিই।"

নবীন সন্ন্যাসীদের অনুরোধে বাবা বেদান্তের কয়েকটি মূলতত্ত্ব এ সময়ে বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু বেটা, তোমরা গৃহস্থ নও, সন্ন্যাসী। মোক্ষের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছো। একটা কথা মনে রেখো। শুধু বেদান্ত শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার ত্বরান্বিত হবে না। এজন্য চাই নিত্য অভ্যাস, নিত্য নিদিধ্যাসন। জানতো, বিবেক চূড়ামণি বলেছেন,

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্॥

—বেদান্ত শ্রবণ অপেক্ষা মনে মনে বেদান্তসিদ্ধান্তের চিন্তন করার ফল শতগুণ বেশী, তা অপেক্ষা লক্ষগুণ ফলপ্রদ হচ্ছে আত্মায় নিদিধ্যাসন অভ্যাস করা, পরমাত্মায় প্রলীন হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাওয়ার ফল হচ্ছে অনন্তগুণ।

"অপোরোক্ষানুভূতি-তেও রয়েছে সেই একই কথা।—প্রতিনিয়ত নিদিধ্যাসনের অভ্যাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না।

অতএব মুমুক্ষু পুরুষকে আত্মকল্যাণের জন্য সদাই রত থাকতে হবে ব্রহ্মধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনে।"

তত্ত্ব প্রসঙ্গ শেষ হইলে জনৈক সেবক জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, আপনি কাল বলেছিলেন, এখানকার ডেরা ভাণ্ডা এবার ওঠাতে হবে—এসম্বন্ধে আর তো কিছু নির্দ্দেশ দিচ্ছেন না।"

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, "হাঁ বেটা, এবার আমরা চলার পথে। কিন্তু দুটি লোকের জন্য যে আমায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তাই তো, তারা যে এখনো এসে পৌঁছুলো না।"

"কাদের আস্‌বার কথা মহারাজ? কোন পুরোনো ভক্ত?" সেবকটি স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নিয়া প্রশ্ন করে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখীন হইয়া যান দয়ালদাস-বাবা। আপন মনে নিম্নস্বরে কহিতে থাকেন, "আহা, বেটা কতদূর থেকে ছুটে আসছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পা দুটো হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। হ্যাঁ, প্রাণে যখন বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে, মানুষ তখন এমনি ব্যাকুলতা নিয়েই এগিয়ে আসে।"

উপস্থিত শিষ্য ও সেবকেরা বাবাকে চাপিয়া ধরিলে আসল কথাটি এবার ভাঙিয়া বলিলেন, "লাহোর থেকে অনেক দূরের পথ, সতানা গ্রাম থেকে আসছে মুন্না সাহুকার। এ শরীরের দর্শন আগে সে কখনো পায়নি, মন তার উতল হয়ে উঠেছে বেশ কিছুদিন ধরে। স্বপ্নে দেখেছে, এখান থেকেই পাবে সে তার সন্ন্যাস দীক্ষা। তাই জীবন পণ ক'রে সে ধাবিত হয়েছে। এমন বৈরাগ্যের উদয় যার হয়েছে, তাকে ঠেকানো কঠিন। তাই তো এখানে অপেক্ষা করছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দয়ালদাস-বাবার তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় সেই বৈরাগ্যবান্ মানুষটি, কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়ে তাঁহার চরণ-তলে। বার বার নিবেদন করে নিজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

সেই দিনই এক শুভ লগ্নে দয়ালদাসজী এই নবাগত মুমুক্ষুকে দান করেন সন্ন্যাস দীক্ষা। নব নামকরণ করেন—দয়ানন্দ স্বামী। গুরুর নির্দ্দেশে বৈরাগ্যময় তপস্যা শুরু করিয়া দয়ানন্দজী উত্তরকালে পরিণত হন এক সার্থকনামা সাধকে। কাশীতে দীর্ঘদিন তিনি

অবস্থান করেন, তারপর দয়ালদাস-বাবার প্রিয় শিষ্য ও মণ্ডলী-নেত স্বামী আনন্দপ্রকাশজীর সঙ্গে থাকিয়া উত্তরভারতের নানা তীর্থে গুরুর ইঙ্গিত কর্ম্ম অন্নদানব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবা অপর যে লোকটির জন্ত লাহোরে সেদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবার সেও আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকটি জাতিতে জাঠ, বাড়ী লাহোরের অনতিদূরে গোছীগাঁও-এ। দেশে তাহার চাষবাসের ভাল খামার আছে, বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। কিন্তু একমাত্র কন্যাটিকে নিয়া এই জাঠ জোতদার বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাটি উন্মাদ রোগগ্রস্তা, ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়া দীর্ঘদিন তাহার চিকিৎসা করানো হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। গোছীগাঁও-এর বহু লোক সম্প্রতি পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। তাহাদের মুখে বাবার যোগবিভূতির খ্যাতি শুনিয়াছে এই জাঠ। তাই উন্মাদ কন্যার রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

দয়ালদাসজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত ভক্তটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "বাবা, এই কন্যাটি ছাড়া সংসারে আর আমার আপন বলতে কেউ নেই। আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে কয়েক বৎসর যাবৎ। শুধু এই কন্যাটিকে অবলম্বন ক'রে আমি দিন গুজরান করছি। আজ ক' বৎসর হ'লো সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এখন সব চিকিৎসার বাইরে। আপনি কৃপা ক'রে তাকে রোগমুক্ত করুন সেই সঙ্গে আমার প্রাণও রক্ষা করুন।"

দয়ালদাসজীর চোখ দুটিও অশ্রু ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহ পূর্ণস্বরে কহিলেন, "বেটা, তোমার জন্যই যে আমি আজ এখানে অপেক্ষা করছি। আমার তো এর আগেই লাহোর ছেড়ে যাবার কথা ছিল। ওঠো, এবার শান্ত হয়ে বসো, আর কেঁদো না। তোমার কন্যা আমার অপরিচিতা নয়। তাঁর পূর্ব্ব জন্মের খবর আমি রাখি। আসলে উন্মাদ রোগে সে ভুগছে না। তোমার ডাক্তার কব্‌রেজরা ভুল করেছে, অসুস্থতার কারণ ধরতে পারেনি।"

"সে কি মহারাজ! তাহলে—"

"হাঁ, বেটা, তোমার কন্যা হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, পূর্ব্ব জন্মে সে ছিল যোগভ্রষ্টা সাধিকা। এ জন্মের গোড়াতেই তার পূর্ব্ব স্মৃতির কিছুটা উদয় হয়েছে, পূর্ব্বের যোগসিদ্ধির অনুভূতিও স্ফুরিত হবার অবকাশ খুঁজছে। তোমার কন্যা উন্মাদ নয়, সে ভুগছে যোগজ ব্যাধিতে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আজ থেকে সে ভাল হয়ে উঠবে, খুঁজে পাবে সে নিজ সাধনার ভিত্তিভূমি।"

আর্ত্ত জাঠ ভক্তটির হৃদয় হইতে পাষাণ ভার নামিয়া যায়। করজোড়ে সে নিবেদন করে, "মহারাজ, আপনার অসীম কৃপার কথা এতদিন লোক মুখে শুনে এসেছি, এবার তা নিজে অনুভব ক'রে ধন্য হলাম। মহারাজ আর একটু কৃপা এ অধমকে করুন। আপনার চরণামৃত আমায় দিন, গোছীগাঁও-এ ফিরে গিয়ে আমার কন্যাকে তা পান করাবো।"

"বেটা, তার কোন আবশ্যক নেই। তবে একটা কাজ তুমি করবে। তোমার গৃহে একটি ছোট শিবমন্দির তৈরী ক'রে দাও, তোমার কন্যা শিব বিগ্রহের পূজো ও জপধ্যান নিয়ে থাকুক। আমি আবার আশীর্ব্বাদ করছি। তাঁর পূর্ব্ব জন্মের সাধনা এবার সার্থক হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে এগিয়ে যাক্।"

ভক্ত জাঠটি আনন্দে বাবার এই নির্দ্দেশ মানিয়া নেয়। তারপর বহু কাকুতি মিনতির পরে দয়ালদাস মহারাজের চরণামৃত সে সংগ্রহ করে, রওনা হয় স্বগ্রামের দিকে।

"অন্নদানে বাবা দয়ালদাসের ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে তিনি শুধু একবার সেই সমস্ত স্বয়ং দর্শন করিতেন ও সদ্‌গুরুর কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক সাধুদিগকে পরিবেশন করিবার অনুমতি দিতেন। জানা নাই শুনা নাই, অনাহূত, রবাহূত কত লোকই যে ভোজন করিতে বসিত তাহার সীমা নাই। কিন্তু কখনও কোন দিনও স্বামী দয়ালদাসের ভাণ্ডারে অন্নের ন্যূনতা হয় নাই। একবার হৃষীকেশে সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অন্ন প্রস্তুত ছিল, তদতিরিক্ত অন্যূন আট শত সাধু উপস্থিত হইলেও সেই অন্নেই সকলের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, বরং কিছু অন্ন উদ্বৃত্তও ছিল।

"তিনি যে তীর্থে বা যেখানে যাইতেন, তাঁহার নাম শুনিলেই দোকানদারগণ তাঁহার মণ্ডলীর জন্য যত দ্রব্য আবশ্যক হইত সমস্তই সরবরাহ করিত। মূল্য কে দিবে, দোকানদার তাহা কখনও জিজ্ঞাসা করিত না। কোন চিঠা নাই, পত্র নাই, স্বামী দয়ালদাসের নাম শুনিলেই দোকানদার দ্রব্য দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিন হাজার, চার হাজার টাকার সামগ্রী দিল, তবু দোকানদার টাকার তাগিদ করিত না। তাহারা জানিত, স্বামীজী সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কেহ না কেহ সেই টাকা পরিশোধ করিবেই করিবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিত। তজ্জন্য স্বামীজীকে বা দোকানদারকে কোন চিন্তাই করিতে হইত না।

"১২৯৭ সালের হরিদ্বার কুম্ভমেলার শেষে যখন স্বামীজীর মণ্ডলীর স্থানান্তরে যাওয়া স্থির হইল, তখন মণ্ডলীর একজন সাধু আসিয়া বলিলেন যে, দোকানদার প্রায় সাত-আট হাজার টাকার সামগ্রী যোগাইয়াছে, ভক্তগণ প্রায়ই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও আটশত টাকা তাহার বাকী আছে।

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন,—তজ্জন্য তুমি উদ্বেগ করিও না, এ ঋণ পরিশোধ করিয়া তুমি দুইশত উদ্বৃত্ত দেখিতে পাইবে। সাধু নীরব রহিলেন।

অন্তর্য্যামী সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? তাহার পরিদিন কোথা হইতে একজন ধনাঢ্য ভক্ত আসিয়া স্বামীজীর চরণে এক হাজার টাকা ভেট দিয়া প্রণাম করিলেন, সকল লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। দোকানদারের আটশত টাকা পরিশোধ হইয়া সাধুদের জন্য দুইশত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল।[১]"

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রথা নাই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। সেবকেরা জানাইলেন, "বাবা, এই উদ্বৃত্ত দুইশত টাকা নিয়ে কি করা হবে, আপনি নির্দ্দেশ দিন।"

ভিন্ন মণ্ডলীর কয়েকটি প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী দূর দেশ হইতে মেলায় আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে।

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী: শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ।

দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কাছে ডাকাইলেন, শিষ্যদের আদেশ দিলেন, "উদ্বৃত্ত টাকা সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই সাধুদের ট্রেনভাড়া ও-থেকে দিয়ে দাও। তারপরে যে কটি টাকা বাঁচবে, তা দিয়ে ওদের দু'একটি শাস্ত্রগ্রন্থ আর বহির্ব্বাস কিনে দাও সব ল্যাঠা চুকে যাক্।"

রাজপুতানা আলোয়ারের প্রসিদ্ধ মোহান্ত বাবা ভগবান্‌দাসজী এক সময়ে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সে-বার কুরুক্ষেত্রে এক এক বিরাট ধর্ম্মমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। দয়ালদাসজীও সেখানে তাঁহার মণ্ডলী ও আশ্রিত সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত।

সাধু, দর্শনার্থী ভক্ত ও কাঙালীদের ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। রোজ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অন্নদান করা হইতেছে। এই সময়ে ভাণ্ডারার সব ভার ছিল বাবা ভগবান্‌দাসজীর উপর। মেলা শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল, ধনী শেঠ ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে এবং দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা সবটা তখনও শোধ করা যায় নাই। দুই হাজার টাকার উপর দেনা রহিয়া গিয়াছে। অথচ দুই একদিনের মধ্যে তাঁবু ভাঙিয়া দেওয়া হইবে।

ভগবান্‌দাসজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাই দয়ালদাসজীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "মহারাজ, আমাদের সবাইকে তো এবার এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দোকান বাকীর টাকার তো কোন ব্যবস্থা নেই। কি উপায় হবে?"

"টাকাটা এখানে ব্যয় করা হয়েছে কেন? সাধুদের জন্যই তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমি তো আমার বেটা বেটীর বিয়ের জৌলুষে খরচ করিনি? তুমি এতো দুশ্চিন্তায় পড়েছো কেন? সদ্‌গুরু সব সময়েই এ সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, প্রতিদিন তা প্রত্যক্ষও ক'রছো। তবে এই চিত্তচাঞ্চল্য কেন?"

দুই দিন পরেই দেখা গেল, এক সিন্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। দয়ালদাস-বাবা এখনো মেলা-ক্ষেত্রে রহিয়াছেন শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই শেঠ দুই হাজার টাকার একটা পুঁটুলী বাবা মহারাজের চরণতলে রাখিয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ দয়ালদাস-বাবা ভাণ্ডারার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ভগবান্‌দাস-জীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "এই নাও বেটা, সদ্‌গুরু কৃপা ক'রে এই টাকা আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা এখনি পরিশোধ ক'রে দাও। তারপর আমিও মণ্ডলী নিয়ে অন্যত্র রওনা হই।"

এই কুম্ভমেলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ সাধক, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় লিখেন:

"এই মহামেলায় রাজা রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্ন্যাসী সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়া বোধ হইল। আখড়াধারী মোহান্ত-গণের সাজসজ্জা প্রধান প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক জাঁক-জমকের। হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী, ভেরী প্রভৃতির তুমুল ব্যাপার, এবং প্রত্যেক আখড়ার সহস্র সহস্র সাধু, গৃহস্থ অভ্যাগতের অবিরত অন্নদান দর্শনে আমাদের হৃদয় উৎসাহ ও উল্লাসযুক্ত হইল। নাগা, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, ঊর্দ্ধবাহু, নখী, ঠারেশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, শরশয্যী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, অন্তঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভুখড় কুখড়, উখড়, ঘরবড়া, সর্ব্বঙ্গী, দশনামীসন্ন্যাসী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, অবধূত, ব্রহ্মচারী হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধারী, কাণফাটা যোগী আদি কত শ্রেণীর কত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী যে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল। চক্ষু সফল ও মানবজন্ম পবিত্র হইল।

"এই মহা মহর্ষি মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তির ফোয়ারা ছুটিতেছে দেখিতে পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলাখেলা আর

ভাল লাগে না, জীবের বৃথা মান অভিমান যেন কোথায় পলায়ন করে।

"এবারে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া আর একটি অলভ্য লাভ হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের সুযোগ্য দীক্ষাগুরু শ্রীমদবধূত দয়ালদাস স্বামীজী মহারাজের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি সমস্ত জনতার প্রান্তবর্ত্তী নির্ম্মল সৈকতভূমিতে, তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে আসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শত শত পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটিরে আসন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং গম্ভীর প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। বহুদিনের পর তিনি তাঁহার দিগ্দেশ বিখ্যাত সুযোগ্য শিষ্য কুমার পরিব্রাজককে (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং বহু শাস্ত্রবেত্তা অন্যান্য সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন।

"স্বামীজীর মণ্ডলীতে আমরা কয়েকদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম। যখনই যাই, তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, ত্যাগী, সংযোগী, স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। তাঁহার মহত্ব, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার সদয় ভাব দর্শন করিয়া শত শত শির তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে যিনি কাহারও বাটিতে গমন করেন না, তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহ অন্যূন চারি সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, দুঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তুক, অভ্যাগত, পুরী মালপোয়া মোহনভোগ অন্নব্যাঞ্জনাদি তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেছে। দুই বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত। কিছু বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতেছে। তাঁহার জ্ঞানগম্ভীর ও প্রেমপূর্ণ বাণী যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ মন খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ধন্য তাঁহার তপঃশক্তি, ধন্য তাঁহার ভগবদ্ভক্তি।

কখনই যাই তখনই দেখি তাঁহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, না হয় ভাবভজন, সংকীর্ত্তন না হয় সদ্বার্ত্তালাপ হইতেছে। মুহূর্ত্তমাত্র তথায় সময় অপব্যয়িত হয় না।"

১৩০০ সালের ভাদ্র মাস। দয়ালদাস মহারাজ এই সময়ে কয়েকদিনের জন্য বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছে প্রায় তিনশত সাধুর এক বিরাট দল। অসি ঘাটের নিকটে এক আম্রকুঞ্জে তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের জন্য ভীড় করিয়াছে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী। কেহ তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া অর্থ দিতেছে, কেহ দিতেছে বস্ত্র, ফলমূল ও মিষ্ট দ্রব্যাদি। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ এই সব ভেটদ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীনদুঃখীদের মধ্যে।

এই সঙ্গে সমাগত সাধু সজ্জন ও গৃহস্থদের দিতেছেন তিনি শাস্ত্রের উপদেশ। বার বার কহিতেছেন, "দুঃখের চিরনিবৃত্তি যদি চাও, সত্যকার আনন্দ যদি লাভ করতে চাও, তবে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করো, ভোগসুখকে দাও দূরে সরিয়ে। সদাই স্মরণে রাখো 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই পরম তত্ত্ব। তুমি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নও। বাসনা আর মায়া মমতার ফলে চিত্তে তোমার মল জমে গিয়েছে। ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধনা ক'রে, নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে এই মলকে দূরীভূত করো, পরম চৈতন্যময় আত্মসূর্য্য ভাস্বর হয়ে উঠবেন তোমার সাধনসত্তায়।"

ভক্ত দর্শনার্থীরা বিস্মিত হইয়া দেখে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে শুধু তাঁহার অনুগামী শিষ্যেরাই নয়, অপর সম্প্রদায়ের সাধুরাও পরম আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের এই সব সাধু সন্ন্যাসীরা দয়ালদাসজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার দিব্য সঙ্গ লাভের জন্য তাঁহারা এত ব্যাকুল। দয়ালদাসজীও এই সাধুদের ভালবাসেন নিজের মণ্ডলীর শিষ্য ভক্তদের মত।

দয়ালদাস-বাবার স্বনামধন্য বাঙালী শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্থায়ী বাসস্থান বারাণসীতেই। আরাধ্য গুরুদেবের আগমনে তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। প্রতিদিনই অসিঘাটের বাগানে গিয়া তিনি গুরুদেবের চরণ দর্শন করেন, তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের তত্ত্বালোচনা শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী মন্দিরের তখন খুব সুনাম। বহু ভক্ত ও সাধনার্থী সেখানে যাতায়াত করে, সাধক ও ধর্ম্মবক্তা কৃষ্ণানন্দের উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্ম-জীবন গঠন করিতে প্রয়াসী হয়। নিজের মণ্ডলীসহ দয়ালদাসজী একদিন যোগেশ্বরী মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, কৃষ্ণানন্দের অনুরোধে সমাগত ভক্ত নরনারীকে দান করেন সাধন-উপদেশ।

সেদিন বারাণসীর কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত দয়ালদাস-বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইঁহাদের একজন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ আপনি কোন্ স্বামী ?"

প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য—দয়ালদাসজী দশনামী সন্ন্যাসী স্বামীদের কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তাহা জানিয়া নেওয়া।

দয়ালদাস-বাবা সহাস্যে উত্তর দেন, "আমি শুধু স্বামী নই, আমি—দাস স্বামী।

"এ কি কথা আপনি বলছেন, মহারাজ ? সন্ন্যাসী তো কখনো দাস হন না। সবাই তাঁহাদের জানে 'স্বামী' ব'লে।"

"পণ্ডিতজী, তবে শুনে রাখুন, সন্ন্যাসী মাত্রেই যেমন স্বামী, তেমনি তাঁরা দাসও বটেন।"

"এ বড় অদ্ভুত কথা। এর তাৎপর্য্য তো আমরা বুঝতে পারছিনে, মহারাজ।"

"অদ্ভুত নয় পণ্ডিতজী, এটা যে পরম সত্য কথা।"

"একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন কি ?"

"তবে শুনুন। নিজ নিজ শিষ্যের কাছে প্রত্যেক সন্ন্যাসী হচ্ছেন—স্বামী, আর নিজ নিজ গুরুর কাছে তাঁরা—দাস।"

"তাই তো, এ দিকটা তো আমরা তেমন ভেবে দেখিনি।"

"তাছাড়া, পণ্ডিতজী, ভেবে দেখেছেন কি, শুধু সন্ন্যাসীদেরই

কেন স্বামী আখ্যা দেওয়া হবে ? আরো অনেকেরই তো স্বামীত্ব রয়েছে ; যেমন ধরুন—ভূস্বামী, গৃহস্বামী। আসল কথাটা কি জানেন, সন্ন্যাসীদের লোকে স্বামী বলে ডাকে বটে, কিন্তু যাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁরা জানেন যে তাঁরা—দাস, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যিনি মানব-জীবনে সম্ভব ক'রে তোলেন সেই গুরুদেবের তিনি একান্ত দাস।"

দয়ালদাস-বাবার এই মন্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যাগত পণ্ডিতজী কিছুটা ভড়্কাইয়া গিয়াছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনার কথায় সব ধারণা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, দয়া ক'রে বলুন তো আপনি কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ?"

উত্তর হইল, "গগন মঠের।"

"গগন মঠ ? এর নাম তো কখনো শুনি নি ?" পণ্ডিতজীর চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

"বেশ তো, আপনি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনেছেন, বলুন তো।"

"বড় বড় খ্যাতনামা মঠের নাম কে না জানে ? এই ধরুন—শৃঙ্গেরি মঠ, জ্যোতিঃমঠ, সারদা মঠ, গোবর্দ্ধন মঠ।"

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার স্বর এবার গম্ভীর হইয়া উঠে—"বলতে পারেন, এসব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে ? না—নূতন কোন সাধকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ?"

"মহারাজ, এসব মঠ তো প্রতিষ্ঠা করেছেন আচার্য্য শঙ্কর।"

"উত্তম কথা কথা, পণ্ডিতজী। কিন্তু, বলুন তো আচার্য্য শঙ্কর আর তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন ?"

প্রশ্নকারী পণ্ডিত এবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইলেন। আর তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছে না।

দয়ালদাস মহারাজ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "নিত্য ও শাশ্বত পরম বস্তু পাবার জন্য যাঁরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবেন, পিতা মাতার পরিচয় নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন, তাঁদের কি আবার সন্ন্যাস-আশ্রমের পরিচয় বহন্ ক'রে বেড়াতে হবে ? নূতনতর কৌলীন্য

ঘোষণা করতে হবে ? স্মরণ রাখবেন, যেখানেই সম্প্রদায়ের পরিচয় সম্প্রদায়ের গণ্ডী, বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই জেগে ওঠে অভিমান; আর সে অভিমান হয় অখণ্ড পরমবোধের পরিপন্থী।"

নীরবে নতমস্তকে বসিয়া পণ্ডিতজী এতক্ষণ দয়ালদাস-বাবার কথাগুলি শু'নয়া যাইতেছিলেন। এবার মৃদুস্বরে কহিলেন, "কিন্তু মহারাজ, আচার্য্য শঙ্করের মঠমালাকেই যে আজকের দিনের সাধু সন্ন্যাসীরা গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন—"

"তাঁরা ভালোই করেছেন, তাতে মঠমণ্ডলীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মোহান্ত ও সাধু সন্ন্যাসীর দল। এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অভিমানও কম বেড়ে ওঠে নি। একথাটি সদাই স্মরণ রাখবেন, আচার্য্য শঙ্কর বা তাঁর গুরুপরম্পরার কেউ ই কোন মঠের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। সেই জন্যেই আমি বলেছি— আমি গগন মঠের সন্ন্যাসী। অনাদি অনন্ত যে মহাকাশে ব্রহ্মলীলা আর সৃষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, সেই মহাকাশই আমার মঠ—আমার পরমাশ্রয়।"

পণ্ডিতজী এবার তাঁহার আসন ত্যাগ করেন, ভাবাবেশে লুটাইয়া পড়েন পরমহংস দয়ালদাসজীর চরণ তলে। আর্ত্তকণ্ঠে কহেন, "মহারাজ, আপনার বিচার পদ্ধতি, আর আপনার উদার সার্ব্বভৌম বাণী, আজ আমার ভেতর জাগিয়ে তুলেছে নূতনতর চেতনা। সন্ন্যাস জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য আজ বুঝতে পেরেছি। আমি অবোধ অজ্ঞান, আপনি আমায় কৃপা করুন, চরণাশ্রয় আমায় দিন।"

পরিব্রাজনের পথে দয়ালদাসজী সে-বার সদলে গয়া হইতে রাজগীর অভিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রার প্রাক্কালে গয়ার ভক্তেরা কহিলেন, "মহারাজ, রাজগীরের পথ বড় জনবিরল, পথে সমৃদ্ধ কোন গ্রাম নেই। আপনি তিনশত লোকের জমায়েৎ নিয়ে চলেছেন, ভোজনের দ্রব্য তো পথে মিলবে না। বরং আমরা এখান থেকেই প্রচুর আটা, ঘিউ, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।"

দয়ালদাস-বাবা গম্ভীর স্বরে বলিয়া দিলেন, "না। কোন খাদ্যবস্তু এই জমায়েতের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই।"

মণ্ডলীর দুইজন প্রবীণ সাধু কহিলেন, "বাবা, তিনশত মূর্ত্তি আপনার জমায়েতে রয়েছে। জনহীন রাস্তায় এত লোককে আমরা কি ভোজন ক'রতে দেবো ? সবার কত কষ্ট হবে। এরা যখন দিতেই চাচ্ছেন, কিছুটা খাদ্য সঙ্গে নিয়ে নেওয়া মন্দ কি ?"

দয়ালদাস মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যদি গৃহস্থদের মত সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বহন ক'রেই আমরা পথ চলি, তা হলে গৃহ ছেড়েছি কেন বলতে পারো ?"

"বাবা, অনাহারে এতগুলো লোকের কষ্ট হবে, এ ভেবেই আমরা কথাটি বলেছিলুম।"

"তোমাদের ভয় ভাবনার কোন কারণ নেই। সদ্‌গুরু সব সময়েই তাঁর কৃপাদৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন এই জমায়েতের ওপর। একথাটি কখনো ভুলো না।"

শিষ্য ও সেবকেরা দয়ালদাস-বাবার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রওনা হইলেন পদযাত্রায়।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড পথচারীদের উপর অগ্নি বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সাধুরা সবাই পথশ্রমে কাতর। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। এমন সময়ে পথিপার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বটবৃক্ষতলে জমায়েৎ আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাস-বাবার সম্মুখে উপস্থিত হন এক ভক্ত শেঠ। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া শেঠজী কহেন, "বাবা, আজ দুদিন হয়, তাঁবু খাটিয়ে, লোকজন নিয়ে আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি। স্বপ্নে প্রত্যাদেশে পেয়েছি, আপনি এক বিরাট সাধু জমায়েৎ নিয়ে এই পথে যাচ্ছেন, আপনার সেবার জন্য আমি যেন তৈরী থাকি।"

মহাত্মা দয়ালদাস-বাবার দুই চোখে তখন দুষ্টুমির হাসি। শিষ্য সন্ন্যাসীদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "ছাখো, গৃহস্থের মত ভূতের বোঝা বয়ে আনো নি বলেই, এই সজ্জন গৃহস্থ তোমাদের সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।"

জমায়েতের এক প্রবীণ সাধু দয়ালদাসজীর দিকে তাকাইয়া সহাস্যে মন্তব্য করিলেন, "মহারাজ ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলে গিয়েছেন,-- তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। আপনার বেলায় সব সময়েই এটা প্রভু প্রয়োগ করছেন, আর চাইছেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে।"

শেঠজীর লোকরা ভোজ্য বস্তু সব তৈরী করিয়াই রাখিয়াছে। সাধুরা বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলেই, তাঁহাদের সম্মুখে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জড়ো করা হইল গরম লুচি, হালুয়া ও মালপোয়া। সবাইকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ শেঠজী বিদায় গ্রহণ করেন, পরমহংস দয়ালদাসজীর জমায়েৎ আবার চলিতে থাকে রাজগীরের পথে।

১৩৩০ সালের প্রয়াগ কুম্ভমেলা। প্রতিবারে মত এবারও এই ধর্ম্মমহামেলায় দেখা যায় দয়ালদাস মহারাজের বিপুল প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা। শুধু তাঁহার নিজস্ব মণ্ডলীর সাধু ও গৃহস্থেরাই তাঁহার সত্রে ভীড় করে নাই, অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও আশ্রয় নিয়াছেন এই উদার, সদানন্দময়, আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে। দয়ালদাসজীর পরম আনন্দ অন্নদানে আর বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যানে। তাই তাঁহার তাঁবুটিকে কেন্দ্র করিয়া মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুরা গড়িয়া তুলিয়াছে এক বিরাট জমায়েৎ। ভক্ত দর্শনার্থী ও কৌতূহলী তীর্থযাত্রীরাও বাবার দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য আসিতেছে দলে দলে।

ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় এ সময়কার আনন্দময় পরিবেশটির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন স্বামী রামানন্দ ভারতী। পূর্ব্বাশ্রমে ইনি পরিচিত ছিলেন রামকুমার বিদ্যারত্ন নামে; ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক রূপে ইনি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন। ভারতী মহারাজ লিখিয়াছেন:

"আমরা কোন মণ্ডলীর অন্তর্গত না হইলেও পরমহংস পরিব্রাজক বাবা দয়ালদাস স্বামীর মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিতাম। বাবা

দয়ালদাসের অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাবা দয়ালদাসের উদারতা, প্রেম, দীনের প্রতি দয়া, শিষ্য বাৎসল্য উপমার যোগ্য। বাবা দয়ালদাস একজন যাযাবর সন্ন্যাসী। তাঁহার মঠ নাই, মন্দির নাই, বাসস্থানের কিছুই ঠিক নাই, তিনি যেখানে যান, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভক্ত শিষ্য আছেন। এই কুম্ভমেলা বসিবার অন্যূন একমাস পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন,—তোমরা মেলায় যাইয়া সত্র খুলিয়া দাও, যে সব সাধুরা পূর্ব্বে যাইবেন, তাঁহাদের ভিক্ষার যেন কোন কষ্ট না হয়।

"তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাত্মা দয়ালদাস স্বামীর শিষ্যেরা আসিয়া মেলাক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকের রেতীর পরপারে অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। সাধুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটির সকল নির্ম্মিত হইল এবং সদাব্রত কার্য্য আরম্ভ হইল। বাবা দয়ালদাস যেখানে ছাউনি করিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সিদ্ধের নানকসাহী সাতবেলা মঠের ও স্বামী কেশবানন্দের ছাউনি হইয়াছিল। স্বামী দয়ালদাসের মণ্ডলীতে একটি পট্টাবাস ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বাস করিতেন না। সেই পট্টাবাসে অপরাপর সাধু বাস করিতেন, এবং ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষিত হইত ; তিনি সামান্য কুটিরে অপরাপর সাধুর ন্যায় বাস করিতেন, সমস্ত দিন প্রায় বালুর মধ্যেই বসিয়া থাকিতেন ও অপরাপর সাধুদিগের ও ভিক্ষার্থী কাঙ্গালিদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। কখন কখন দেখিয়াছি পাঁচ সাত শত সাধু, এবং পাঁচ সাত শত কাঙ্গালি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মহাত্মা দযালদাস তাঁহাদের এক পার্শ্বে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। কখনো তিনি বালুর মধ্যে বসিয়া আছেন, ধনী মানী গণ্যমান্য শত শত লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কি সুন্দর দৃশ্য!

"বাবা দয়ালদাসের ভাণ্ডার অফুরন্ত—চাবিদিক হইতে আহারীয় দ্রব্য আসিয়া তাঁহার ভাণ্ডারে পুঁজি হইতেছে, আর সাধু দরিদ্র-দিগকে বিতরিত হইতেছে। কোন বিচার নাই—যে চাহিতেছে, সেই পাইতেছে। পাতা লইয়া বসিলেই হইল। অবারিত দ্বার।

"কোন এক সময়ে বাবা দয়ালদাসকে একজন সাধু বলিয়াছিলেন,

'আপনি আপামর সাধারণকে অন্ন বিতরণ করেন কেন? সাধু ভোজনে বিশেষ ফল আছে, সাধুদিগকেই অন্ন বিতরণ করুন।'

"উত্তরে বাবা বলিলেন, 'সকলেরই একটা মর্য্যাদা আছে, রাজা আসিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে; পণ্ডিত আসিলে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। আহারটা ক্ষুধার মর্য্যাদা দান মাত্র। সাধু ভোজনে কেবল সাধু ভোজনের ফল হয়, কাঙ্গালি ভোজন করাইলে শিব ভোজনের ফল; কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রহীন।' বাবার এই উত্তর শুনিয়া সাধুটি অবাক হইয়া গেলেন।"

কুম্ভস্নানের মিছিল চলা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন মণ্ডলী ও আখড়ার মোহান্তেরা, কেহ হাতীর উপরে কিংখাবে মোড়ানো হাওদায় কৌপীনবস্ত হইয়া সমাসীন। কেহ বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ঘোড়ায় চাপিয়া চলিয়াছেন। আর আগে পিছে চলিয়াছেন রূপার আশাশোটা হস্তে শত শত অনুগামী সন্ন্যাসী। পতাকা ধ্বজা, ত্রিশূল ও সন্ন্যাস দণ্ডের ছড়াছড়ি চতুর্দ্দিকে। গঙ্গার তটভূমি আর আকাশ বাতাস লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত গৃহস্থের আনন্দোল্লাস এবং জয়ধ্বনিতে তখন ভরপুর।

জমায়েতের এক তরুণ সন্ন্যাসী দয়ালদাসজীকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, স্নানের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে, ঐ দেখুন, গজবাজী সহ সাড়ম্বরে মোহান্তেরা সবাই এগিয়ে আসছেন। আপনার মণ্ডলী চল্‌বে কখন?"

পরমহংস দয়ালদাসজী ভারতখ্যাত এক প্রকাণ্ড সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অধিপতি। কিন্তু চাল চলনে ব্যবহারে কোন আড়ম্বর তাঁহার নাই, নিরভিমানতার মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। সন্ন্যাসীটির প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে কহিলেন, "বেটা, আমি হচ্ছি সাধুদের দাস। অতি গরীব আমি, নিজের বলতে একটা কানাকড়িও নেই। আমার আবার ধুমধাম কি? মিছিলে যোগ দেবার সামর্থ্যই বা কই? মূলবান জিনিষপত্র, গজবাজী, রূপোর হাওদা আমার কিছুই নেই। কি ঐশ্বর্য্য দেখাবো আমি সবাইকে, বলতো?"

"সে কি মহারাজ! যাঁর জমায়েতে হাজার হাজার লোক রোজ

বিজয়, তাঁকে গরীব বলবো কি ক'রে।" বিস্মিত হইয়া উত্তর সে-বার সন্ন্যাসী।

সহাস্যে দয়ালদাস বলেন, "বেটা, সব সময়ে মনে রাখবে, লোকে অন্ন পাচ্ছে অন্নপূর্ণা মায়ীর দরবারে, আমার দরবারে নয়।"

দর্শনার্থী শেঠ ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা বাবার চরণে ভেট দেয় তোড়া তোড়া টাকা, গাঁট গাঁট লুই, শাল, কম্বল, বস্ত্র, টুপী প্রভৃতি। আর সেই মুহূর্ত্তেই দয়ালদাসজী ঐসব ভেটের দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীন দরিদ্রদের মধ্যে।

জনৈক সরল হৃদয় গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'বাবা, দেশের নানা অঞ্চল থেকে ভারে ভারে এত সব দ্রব্য কেন আসছে, কেন এখানে আপনার চরণতলে স্তূপীকৃত হচ্ছে, এর কারণ কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এ কি আপনার ইন্দ্রজাল না যোগবিভূতির খেলা?"

দয়ালদাসজী উত্তরে হাসিয়া বলেন, "বেটা, এ রহস্য তুমি ভেদ করতে পারছো না? আচ্ছা আমি তোমায় গোপন কথাটি ভেঙে বল্‌ছি। এ সব বস্তু আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কৃপাময়ী অন্নপূর্ণাজী। জানতো বেটা—

দেৎ কো দেৎ হ্যায় জাঁহা তাঁহা সে আন্।
অন্ দেৎ মাঁগৎ ফিরে সাহেব ন স্নুনে কান্॥

যে মানুষ নিজে কোন বস্তু ভোগ না ক'রে অপরকে দান করেন, ভগবান্ যে কোন স্থান থেকে এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দেন সে সব বস্তু। আর যে মানুষ কখনো দান করে না, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়ালেও তার আবেদন কখনো পৌঁছে না ভগবানের কানে।

শুধু এদেশের বিভিন্ন কুম্ভমেলা ক্ষেত্রেই দয়ালদাস-বাবার মহিমা প্রচারিত ছিল না, ভারতের সর্ব্ব অঞ্চলে, সর্ব্ব তীর্থ ও সাধনপীঠে ছিল এই সিদ্ধ মহাত্মার জয় জয়কার। তাছাড়া, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত প্রতিভাধর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি দিক্‌পাল। সাধন-ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা ও সংগঠন-

শক্তিতেও অনেকে ছিলেন অতুলনীয়। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখ্য ষড়দর্শনবেত্তা স্বামী আনন্দ প্রকাশ, মণ্ডলীশ্বর জগদীশান অবধূত সুন্দরদাসজী, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দিগম্বরাবধূত মুক্তানন্দ, পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ, সাধু চৈতন্যদেবজী, শ্রীমৎ ব্রহ্ম-প্রকাশজী, পরমহংস রামেশ্বরানন্দ স্বামী, মৌনী মহারাজ, শঙ্করানন্দ স্বামী, মোহান্ত রামস্বরূপজী, স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দ, স্বামী বালানন্দ (কাশী), স্বামী সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি।[১]

দয়ালদাস-বাবার গৃহস্থ শিষ্য ভক্তদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। ভারতের সর্ব্ব তীর্থে, শহরে ও জনপদে কয়েক শত সাধুর জমায়েৎ নিয়া তিনি পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আর এই সময়ে শক্তিধর মহাপুরুষ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এবং ধনী দরিদ্রের কোন তারতম্য না করিয়া আর্ত্ত ও মুমুক্ষু গৃহস্থদের করিতেন কৃপা বিতরণ। নাভার বৃদ্ধ মহারাজ ধর্ম্মপ্রাণ হীরাসিংজী দয়ালদাসজীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা পূজা করিতেন। পাতিয়ালার তৎকালীন মহারাজা দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন। পরমহংস দয়ালদাসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মহারাজা তাঁহার কৃপাভাজন হন, লাভ করেন একটি পুত্ররত্ন। পাতিয়ালার প্রভাবশালী মন্ত্রী সর্দ্দার গুরুমুখ সিংজীও দয়ালদাসজীর অন্যতম অনুগৃহীত ভক্ত। বাবার বৃহৎ জমায়েতের সেবায় সর্দ্দারজী চিরদিন অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে চাতুর্ম্মাস্য কালে কয়েক শত সন্ন্যাসীসহ তিনি দয়ালদাসজীকে আহ্বান করিতেন, তাঁহার মণ্ডলীর সেবা-পরিচর্য্যা করিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

দয়ালদাসজীর সত্রে ও জমায়েতে রাজা, রাজমন্ত্রী, শেঠ বণিকেরা যেমন অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন, তেমনি হাজার হাজার দরিদ্র ভক্তও প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিত তাঁহার ভাণ্ডারা ও দীন দুঃখীর সেবা-কর্ম্মে। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল ভক্তই এই উদার মহাপুরুষের মণ্ডলীসূত্রে বিধৃত থাকিত নানা রঙের নানা ঔজ্জ্বল্যের রত্নখণ্ডের মত।

১ দ্য বেঙ্গলী, ক্যালকাটা—১৩. ৪. ০৯

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সার্থকনামা শিষ্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সে-বার প্রয়াগ কুম্ভমেলায় দয়ালদাস-বাবার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্য তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাত্মা দয়ালদাস পঞ্জাব সাধু সম্প্রদায়ের এক প্রধান ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ বক্তা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় দয়ালদাসেরই মন্ত্রশিষ্য। এই আশ্রমে আমরা স্নানাহার করিলাম। দয়ালদাসের আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহা অতি অদ্ভুত। আজানুলম্বিত হস্ত, সুদীর্ঘ কায়, গৈরিকধারী দয়ালদাস-বাবাকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা দয়ালদাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায়, যে কয়দিন কুম্ভমেলায় থাকিব, আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু কিছু উপদেশ শুনিলাম। সদ্‌গুরু বাণীতে সে সমস্ত উপদেশ আছে, সে সমস্ত অতিশয় দুর্লভ। সেই সমস্তের যদি বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়, তবে তাহা দেশের একটি বিশেষ সম্পত্তি হইবে[১]।

"দয়ালদাস মহারাজের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘমাসের আরম্ভ হইতেই কিছুই আহার করেন নাই, যেদিন তাঁহাকে দেখিলাম সেদিন ২৪শে মাঘ। তিনি অতি বিনম্রভাবে আমাদিগকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথা দয়ালদাসের সদাব্রত। দয়ালদাসের সদাব্রত কুম্ভমেলার একটি বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে দুঃখী দরিদ্রের অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে রাখে? দয়ালদাসের আশ্রমদ্বার একমাসকাল তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্ত্তৃপক্ষের সাধু-সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল-ভোজন। কিন্তু দয়ালদাসের সাধু কাঙ্গাল সকলই সমান। একদিন একজন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু-ভোজন অপেক্ষাও কাঙ্গাল-ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার কারণ কি?

১ দয়ালদাস-বাবার উপদেশ সংগ্রহ হিন্দি ভাষায় বিচার প্রকাশ নামে সঙ্কলিত হয়। এই পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ কাশী যোগাশ্রম হইতে শ্রীকামাখ্যা নাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

"দয়ালদাস উত্তর করিলেন, 'সকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধু বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মানমর্য্যাদা ধর তবে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদিগকে ভোজনের ফল হয়, তবে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত কাঙ্গালিদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়।' মহাত্মা দয়ালদাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক!

"দয়ালদাসের কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বার মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যখন যেখানে থাকেন, সেইখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাঁহার অতিথি। কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর তাঁহার নির্ভর নাই। শিলাবৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে টাকা ছুটিয়া আসে, একজন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিলেন, এক শিষ্য কুড়াইয়া নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া ফেলিলেন। অর্থাপাদরজোপমা—এ কথা ইঁহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থব্যয় করে। ইঁহাদের ব্যবহার দেখিলে ঘোর সংসারাসক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন হইয়া যায়।

"মহাত্মা দয়ালদাস বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদের কীর্ত্তন তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের কাছে সেকথা তিনি বলিয়াছিলেন। দয়ালদাস দয়ার সাগর, ভক্ত প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কর্ম্মী বা কর্ম্মহীন সন্ন্যাসী নহেন।"

এই কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের সমাগম যেমন হয়, তেমনি মঠমণ্ডলী আখড়ার মোহান্ত ও শেঠেরাও সদাব্রতের জন্য ব্যয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীর মাধ্যমেও কম টাকা এসময়ে ব্যয়িত হয় নাই।

এক কৌতূহলী দর্শনার্থী সেদিন দয়ালদাসজীর তাঁবুতে আসিয়া

তাঁহার এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই মেলার সদাব্রত ও দানসত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল, তার স্থায়ী ফল বা গঠনমূলক কাজ কি হ'লো? দেশের কি কল্যাণ সাধিত হ'লো?"

শিষ্যটি উত্তর দিলেন, "দেখুন, সমাজতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই। তবে, এতে যে দেশের কল্যাণ হচ্ছে, তা বিশ্বাস করি। কল্যাণ শব্দটির এক মোটামুটি অর্থ আমরা বুঝি—যাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, তাকেই বলি সত্যকার কল্যাণ। সে কল্যাণ কিছুটা সাধিত হয় অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা, গঠনমূলক কাজ দ্বারা। আবার অর্থকে ধূলি মুষ্টির মত জলে ফেলে দিয়েও এ কল্যাণ সাধন করা যায়।"

"সেটা কি রকম?"—প্রশ্ন করেন দর্শনার্থী।

"এই ধরুন, সেদিনকার মেলাক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা। আমাদের শত শত লোকের চোখের সামনে এটি ঘটলো। এক ধনী শেঠ দয়ালদাস-বাবাকে প্রণাম ক'রে এক বস্তা টাকা তাঁর সামনে রেখে দিলো। মিনতি ক'রে বললো, 'বাবা, এ টাকাটা আপনি সাধু বা দীন দুঃখীর ভাণ্ডারায় লাগিয়ে দিন, আমায় কৃতার্থ করুন।' বাবা উত্তর দিলেন, 'তা কি ক'রে হয়, বেটা? এখানে তো আজ আর টাকা নেওয়া যাবে না। আগে যারা দিয়ে গিয়েছে, তাদের টাকা সবটা খরচ না হলে তোমার টাকা খরচ করি কি ক'রে? তুমি বরং অন্য কোথাও যাও।' লোকটি কত কাকুতি মিনতি করলেন। কিন্তু বাবা পূর্ব্ববৎ তাঁহার সিদ্ধান্তে রইলেন অটল। ভেবে দেখুন, এ ঘটনাদি যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন, টাকাকড়ি সম্পর্কে অনাসক্তি তাদের কত বেড়ে গেল, প্রাণে জেগে উঠ্‌লো ত্যাগ বৈরাগ্যের হাওয়া। একে কি সত্যকার কল্যাণ বলে না?"

প্রশ্নকারী ভক্ত দর্শনার্থীর অন্তরে কথা কয়টি আলোড়ন তুলিয়া দিল। নীরবে সেস্থান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার শেষে মণ্ডলীর তিনশত সাধু সমভিব্যাহারে দয়ালদাসজী কানপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। এবার এখানকার ভক্তদের

সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিবেন।

হরিভক্তি প্রদায়িণী সভার আহ্বানে বাবার শিষ্য, ধর্ম্মবক্তা কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও তখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাঁবুতে আসিয়া ভক্তি-ভরে দয়ালদাস-বাবাকে তিনি প্রণাম জানাইলেন। প্রিয় শিষ্যকে আশিস্ জানাইয়া বাবা কহিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ, ভালই হয়েছে তুমি ঠিক এসময়ে কানপুরে উপস্থিত হয়েছ। এর পর এ অঞ্চলে আমার আর আসা হবে না, এ মরদেহে থাকাও হবে না। এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।"

"সে কি বাবা, এসব কি অলক্ষুণে কথা আপনি আমায় বলছেন ?" কৃষ্ণানন্দের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

দয়ালদাস-বাবা এবার মৃদু স্বরে বলেন, "হাঁ বেটা, এবার শরীর আমি ছেড়ে দেবো। অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এটা।"

কৃষ্ণানন্দ আর্ত্ত স্বরে কহেন, "বাবা, আপনাকে পেয়ে অবধি সংসারের সব কিছু ভুলে আছি, আর দিন কাটাচ্ছি দিব্য আনন্দে। আপনি দেহ ছাড়লে যে আমরা সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বো।"

স্মিতহাস্যে দয়ালদাসজী বলেন, "বেটা, নিরাশ্রয় কেন হবে ? আমার এ শরীরের সান্নিধ্য তো বড় কথা নয়। আমার আত্মা, আমার শাশ্বত পরম সত্তাই হচ্ছে আসল বস্তু। তাঁর সঙ্গে তোমাদের অনেকের যোগ সাধিত হয়েছে। সেই নিত্য, অখণ্ড পরম বোধটিকে মনের ভেতর ধরে রাখো, বৈরাগ্যময় তপস্যা চালিয়ে যাও। আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সিদ্ধকাম হবে।"

কয়েক মাস পরে চাতুর্ম্মাস্য আসিয়া পড়ে। পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী সর্দ্দার গুরুমুখ সিং দয়ালদাসজীর পরম ভক্ত। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা চাতুর্ম্মাস্যের কয়েকটি মাস বাবা মহারাজ তাঁহার কাছে অবস্থান করুন, সেবার সুযোগ দিয়া তাঁহাকে ধন্য করুন

এ সাদর আমন্ত্রণ দয়ালদাসজী গ্রহণ করেন, প্রায় এক শত সঙ্গী

সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত হন পাতিয়ালায়। সর্দ্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্যান বাটিকায় নির্দ্দিষ্ট হয় তাঁহার মণ্ডলীর বাসস্থান।

এ সময়ে হঠাৎ এক মারাত্মক পীড়ায় দয়ালদাস-বাবা আক্রান্ত হন। সেবক গুরুমুখ সিংজী এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। পাতিয়ালার মহারাজের নির্দ্দেশে চিকিৎসার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হয়। শিষ্য ও সেবকেরা প্রাণপণে করিতে থাকেন বাবার সেবা শুশ্রূষা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা যত্নই বিফল হয়। রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

একদিন সেবকদের ডাকিয়া বাবা কহিলেন, "মাধোলাল এসেছে? আহা, বেটা, বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তাঁকে ডেকে আনো।"

সেবকেরা এ উহার মুখের দিকে চায়। কাহার কথা বলিতেছেন দয়ালদাসজী? তাঁহারা প্রশ্ন করে, "কে এই মাধোলাল, বাবা?"

বাবা উত্তর দেন, রোহতক জেলায় গুরুদ্বার গাঁও-এ তার বাড়ী। আমার পুরোনো শিষ্য। আমার সঙ্গে যে তার বড় জরুরী দরকার। সে এসেছে কি?"

"না—বাবা, এমন কোন লোক তো আসেনি।"

"তা হলে আমিই যাবো তার কাছে। হ্যাঁ আজই যাবো, বড় জরুরী।"

সেবকেরা ভাবিলেন বাবা রোগের প্রকোপে ভুল বকিতেছেন। একথা নিয়া আর তাঁহারা আলোচনা করিলেন না।

দেহ ত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীয় সাধু সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের নিকট ডাকিলেন। আদেশ মত উদ্যানের মধ্যস্থলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া যাওয়া হইল।

প্রসন্নমধুর দৃষ্টি বুলাইয়া মহাপুরুষ সবাইকে জানাইলেন অন্তরের আশীর্ব্বাদ। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন "আমার শরীর এবার চলে যাচ্ছে। তাতে তোমরা শোক ক'রো না। আমার ভেতর যে নিত্য বস্তু, শাশ্বত বস্তু রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে চলো, তবেই এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি।"

একটু থামিয়া আবার ভক্তদের কহিলেন, "আত্মার কথাই

চিরজীবন বলে আস্‌ছি, এই দেহ পড়ে যাবার সময়েও সেই কথাই বল্‌বো। আত্মা ব্যাপক, অনাদি ও অনন্ত। জন্ম মৃত্যু বলে কিছু তো নেই, অনিত্য ও সসীম বস্তুতেই এই জন্ম মৃত্যুর কথা প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রের জল আর তার তরঙ্গে কোন ভেদ নেই, সব রয়েছে অখণ্ড অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত। সারা জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মময়, জগৎ অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে এই ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণ।

"আসলে দ্বৈতভাবের ফলেই মরণকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি, ভয় পাই। কিন্তু তোমাতে দ্বৈত নেই। তুমি—অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রুতি ও গুরুবাক্য স্মরণে রেখে অদ্বৈত ব্রহ্মের চৈতন্যময় প্রকাশ অনুভব ক'রো, অজ্ঞানজনিত জগৎ প্রপঞ্চ স্বতঃই বিলীন হয়ে যাবে। এই দেহের জন্য কেউ শোক ক'রো না। আর এই দেহভস্মের ওপর কোন স্মৃতিসৌধও কেউ যেন তৈরী ক'রো না।"

কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, লীলাবৈচিত্র্যময় সিদ্ধজীবনের উপর নামিয়া আসিল চিরবিরতির যবনিকা। ১৩৩১ সনের ১৭ই ভাদ্র, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি এই দিনটি তাঁহার সহস্র সহস্র ভক্তের স্মৃতিতে চিরচিহ্নিত হইয়া রহল।

পাতিয়ালার প্রধান প্রধান সর্দ্দার, অগণিত সাধু সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ বাবা মহারাজের শবদেহের অনুগমন করেন। বাদ্য ভাণ্ড সহ, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও ধ্বজ পতাকাদি সহ, চলিতে থাকে সমারোহপূর্ণ এক বিরাট মিছিল। সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধার্ঘ্য সমর্পণের পর দয়ালদাস মহারাজের মরদেহ সমাহিত হয় নদীগর্ভে।

ঠিক এই সময়েই পরমহংস দয়ালদাস-বাবার এক অলৌকিক লীলা অনুষ্ঠিত হয় রোহতক জেলার ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রাম গুরুদ্বার-এ। মাধোলাল বেদী দয়ালদাসজীর এক পুরাতন শিষ্য, এই গ্রামেই তাঁহার বাস। দয়ালদাসজীর কাছে বহুদিন আগে দীক্ষা নিয়া এ যাবৎ নিভৃতে তিনি আপন সাধনা চালাইয়া যাইতেছেন। এবার সাধনার এমন এক স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যে গুরু মহারাজের সাক্ষাৎ

দর্শন ও সাধন-উপদেশ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য কয়েকদিন যাবৎ কাতরভাবে গুরুজীকে তিনি স্মরণ করিতেছেন। লোকমুখে শুনিয়াছেন, চাতুর্ম্মাস্যের জন্য দয়ালদাস-বাবা পাতিয়ালায় অবস্থান করিতেছেন। আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, দুই এক দিনের জন্য পাতিয়ালায় যাইবেন, গুরুমহারাজের দর্শনের পর মাগিয়া নিবেন তাঁহার প্রার্থিত সাধন বস্তু। কিন্তু সংসারের নানা জটিল জালে জড়াইয়া থাকায় গ্রাম ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

হঠাৎ মাধোলাল দেখিলেন, গুরুজী দয়ালদাস-বাবা গ্রামের বড় রাস্তাটি ধরিয়া তাঁহারই বাড়ীর দিক দ্রুত পদে আসিতেছেন। একি কাণ্ড! হঠাৎ গুরুমহারাজ এখানে? তাছাড়া, একলাই আসিয়াছেন, সাঙ্গোপাঙ্গ নাই। এ বড় বিস্ময়ের কথা।

গুরুজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাধোলাল দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেন। প্রশ্ন করেন, "একি মহারাজ, আপনি একলা এত-দূরের পথ হেঁটে আস্‌ছেন। আপনার মণ্ডলী কোথায়? দু' একশ' সাধু সন্ন্যাসী সঙ্গে না নিয়ে তো আপনি পথ চলেন না?"

গুরুজী হাসিয়া বলেন, "বেটা মাধোলাল, তোমার ব্যাপারটা যে জরুরী। এ ক'দিন কাতর হয়ে আমায় কত ডেকেছো। তাই আমি একলাটিই তোমার কাছে এলাম। মণ্ডলী? হাঁ, তা পরে আসছে।"

অতঃপর কৃপালু দয়ালদাসজী শিষ্য মাধোলালের ভজনকুটিরে গিয়া বসিলেন, নিভৃতে তাঁহাকে দান করিলেন সেই নিগূঢ় সাধনক্রিয়া যাহার জন্য প্রিয় শিষ্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

এবার প্রসন্নমধুর হাসি হাসিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, "বেটা আমার জরুরী কাজ শেষ হয়েছে, তোমার সন্তোষ বিধানও করতে পেরেছি। এবার আমি পাতিয়ালায় ফিরে যাই। সবাই যে শোকার্ত্ত হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছে। হাঁ, বেটা, তুমি এখানকার কাজের ঝামেলা মিটিয়ে দুই দিন পরে পাতিয়ালায় চলে এসো।"

গুরুর আদেশ মাধোলাল শিরোধার্য্য করিয়া নেন। কাজকর্ম্ম গুছাইয়া রাখিয়া দুই দিন পরে গুরুমহারাজের দর্শনের জন্য তিনি পাতিয়ালায় আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু একি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

শিষ্য সেবকেরা সবাই সর্দ্দার গুরুমুখ সিং-এর উত্থানে শোকার্ত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, বাবা দুই দিন পূর্ব্বে ছেদ টানিয়া দিয়াছেন তাঁহার মরলীলায়। ঠিক যে সময়ে গুরুদ্বার গাঁও-এ মাধোলালের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন, সেই সময়েই বাদ্যভাণ্ড ও মিছিল নিয়া পাতিয়ালায় লক্ষাধিক লোক অনুগমন করিতেছিল তাঁহার শবদেহের।

"এ কি দৈবী মায়া! এ কি অলৌকিক রহস্য! বাবা, মহারাজের এ কি অত্যাশ্চর্য্য কৃপা লীলা!"—কথা কয়টি বার বার মাধোলাল বলিতেছে, আর কপোল বহিয়া ঝরিতেছে শোকের অশ্রুধারা।

স্বামী শিবানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন হয় নরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গুরুর বিরহে ও শোকে ভক্ত শিষ্যেরা রহিয়াছেন মুহ্যমান। এমনি সময়ে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসু একদিন তাঁহার গৃহে বরানগর মঠের তরুণ গুরুভাইদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা, সবাই মিলিয়া ঠাকুরের পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবেন।

বলরামের গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর স্মৃতিবিজড়িত। ভক্তদের নিয়া কত আনন্দই না তিনি এখানে করিয়াছেন! তাঁহার কীর্ত্তন-নর্ত্তন, ভাবাবেশ ও সমাধি দর্শন করিয়া সবাই হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। তাই বরানগর হইতে নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সোৎসাহে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভজন কীর্ত্তন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের শেষে ঠাকুরের স্মৃতিচারণ চলিতেছে। এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে নরেন কহিলেন, "আমাদের ঠাকুরই ছিলেন একমাত্র কামজিৎ পুরুষ। বিবাহিত জীবনে এমন কামজিৎ জগতে আর কেউ হয়েছেন বলে শোনা যায় নি।"

একথায় কিন্তু মৃদু একটু প্রতিবাদ উঠিল। তরুণ সাধক তারক সবিনয়ে কহিলেন, "তা কেন? ঠাকুর কৃপাবলে আরও কামজিৎ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই ধরুন, আমার ভেতরেই তিনি এমন শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন যার বলে বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রেও আমি কাম জয় ক'রতে পেরেছি।"

"তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ!" বিস্ময় ও সম্ভ্রম জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন নরেন্দ্রনাথ—উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত এই 'মহাপুরুষ' আখ্যাই তারককে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে চিরচিহ্নিত করিয়া দেয়, মহাপুরুষ মহারাজ নামে তিনি মণ্ডলীতে পরিচিত হইয়া উঠেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নব নামকরণ হয় শিবানন্দ স্বামী।

সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর দিক্‌দিশারী ছিলেন স্বামী শিবানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নূতনতর ধর্ম্ম-আন্দোলনে এবং মঠ মিশনের সংগঠন ও পরিচালনায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভ্রাতা, বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মহাধর্ম্ম বা মহাসঙ্ঘের গঠন প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব-বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক—তিনেরই অঙ্গাঙ্গী প্রয়োজন আছে। তিনটির মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধর্ম্মের বা মহাসঙ্ঘের কোন কার্য্য চলিতেই পারে না ; একের অবর্ত্তমানে অপরের সার্থকতাও থাকে না—ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল।"

ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যে নব তরঙ্গ উৎসারিত করিয়া যান, মহাপুরুষ শিবানন্দ সেই তরঙ্গে সঞ্চারিত করেন তাঁহার সাধন শক্তি—কীর্ত্তিত হন তাঁহাদেরই এক উত্তরসাধকরূপে।

গুরুভাই তারক যে একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ ধারণাটি পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছিল। এ সম্পর্কিত এক অলৌকিক ঘটনারও তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে, মারাত্মক ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যাশায়ী। গুরুর সেবা পরিচর্য্যায় তরুণ ভক্ত শিষ্যেরা সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, আর অলক্ষ্যে গুরু-কৃপায় তাঁহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যময় সান্নিধ্য ও স্পর্শে হৃদয়ে তাঁহাদের জ্বলিতেছে মুমুক্ষার আগুন। এই আগুন এক সময়ে আরো তীব্র হইয়া উঠে।

নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করেন বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের তপস্যাপূত ভূমিতে গিয়া কয়েকটা দিন ধ্যানাবিষ্ট থাকিবেন, প্রতীক্ষা করিবেন মুক্তির আলোক সঙ্কেতের।

এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক ও কালিপ্রসাদও উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তিন গুরুভ্রাতা এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হন, শুরু করেন তাঁহাদের তপস্যা।

এ সময়কার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখতে পান, একটি শক্তি তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারক-নাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।"

নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ এ সময়ে বলেন, "ওরে কোথাও কিছু নেই, এবার সব এখানে। আর যেখানেই যাওনা কেন, কিছুই পাবে না। এখানকার সব দুয়ার খোলা।"

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত এই মহা-ইঙ্গিতটি তারক তাঁহার দীর্ঘ তপস্যাময় জীবনে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই। এই দিব্যোজ্জ্বল ইঙ্গিতটিতে সযতনে তিনি রাখিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়সম্পুটে, ইহা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার সাধনপথের পরম পাথেয়। জীবন তাঁহার হইয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণময়, লাভ করিয়াছিলেন তিনি বহুবাঞ্ছিত অধ্যাত্মসম্পদ।

তারকের পিতা রামকানাই ঘোষাল ছিলেন এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক আচার্য্যের শিষ্য। নিজেও তিনি বহুতর তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন।

বারাসতের এক বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন রামকানাই। আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি যেমন ছিল, তেমনি সদ্ব্যয়ও ছিল প্রচুর।

ধনজনে পরিপূর্ণ সংসার। কিন্তু রামকানাই ও তাঁহার পত্নী বামা-সুন্দরীর অন্তরে সুখ নাই। এ যাবৎ তাঁহাদের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। এজন্য পূজা ব্রত অনেক কিছুই করা হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই।

অবশেষে উভয়ে বাবা তারকেশ্বরের পূজা দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বামাসুন্দরী অতিশয় সাধ্বী, শ্রদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী। বাবা তারকেশ্বর এ সময়ে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন। প্রত্যাদেশ হয়—'ওগো, মনে খেদ ক'রো না। এ বৎসরের মধ্যেই এক পুত্ররত্ন তুমি লাভ করবে।"

প্রত্যাদেশের ফল ফলিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণা একাদশীর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইল এক নয়নাভিরাম পুত্র।

সুন্দর সুঠামতনু শিশুকে পাইয়া ঘোষাল দম্পতির আনন্দের অবধি নাই। ধন জনে পূর্ণ প্রাচুর্য্যের সংসার এবার আরো আনন্দময় হইয়া উঠে।

কিন্তু মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘদিন এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুত্রের নবম বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। বালক তারকের জীবনে জননীর এই বিয়োগ ব্যথা এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। দিন দিন সে উদাসীন হইয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যাইত, সহপাঠী ও সঙ্গীদের সহিত থাকিয়াও সে যেন তাহার জীবনের চতুর্দ্দিকে এক গণ্ডী রচনা করিয়া চলিয়াছে। আপন উদাস মনোবৃত্তি নিয়া সে যেন সবার মধ্যে থাকিয়াও নিঃসঙ্গ। মাতার মৃত্যুর পর এক ভগিনীর মৃত্যু ঘটে। তারপর আসে আর এক শোচনীয় দুর্দ্দৈব। অপর এক ভগিনী বিধবা হন। এ সময়ে পিতার আর্থিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে থাকে।

তারকনাথ যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন তখন তাঁহার হৃদয় নানা-ভাবে বিপর্য্যস্ত। অবশেষে তিনি পিতৃগৃহের পরিবেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ থাকিবার পর পর গ্রহণ করেন রেলওয়ের চাকুরী। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে

উপার্জ্জন করিবেন, আর তীর্থদর্শন ও ভগবৎ-চিন্তায় কাল কাটাইবেন, ইহাই তখন তাঁহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা।

এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলিতেন, "সেই সময় সমাধি জিনিষটা যে কি তা নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হত। সমগ্র জগৎ সংসার ভুলে কি ক'রে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকা যায়—এই আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রাণে সর্ব্বক্ষণ জ্বলত। শিবের ধ্যানমূর্ত্তি, বুদ্ধের ধ্যানমূর্ত্তি—এসব খুব ভাল লাগত। মোট কথা সমাধিলাভ করবার জন্য প্রাণ খুব ছট্‌ফট্ করত এবং যাতে সমাধি লাভ করতে পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। মাসের পর মাস গিয়েছে, রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্ব্বক্ষণ ঐ এক চিন্তা—কি করলে সমাধি লাভ হয়।"

তারকনাথের পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পুত্র একেবারে সংসার বিমুখ। অবশেষে তারককে পড়িতে হইল এক কঠিন পরীক্ষায়। পিতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছে। কিন্তু পাত্র পক্ষের সর্ত্ত অনুযায়ী তারককে বিবাহ করিতে হইবে বরের ভগিনীকে। মাতৃহীনা কনিষ্ঠা ভগিনীর কল্যাণে তারকনাথ কি এ প্রস্তাবে রাজী হইবেন না?"

তারকের ইচ্ছা ছিল বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না। তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর রত হইবেন সাধন ভজনে।

অসহায়া ভগিনীর দিকে তাকাইয়া এই ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। বাধ্য হইয়া বিবাহে তিনি মত দিলেন।

বারাসতের নিকটে মহেশ্বরপুর গ্রাম। এই গ্রামের পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, নিত্যকালী দেবী, তারকের বধূরূপে ঘোষাল গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তারকনাথ একটি নূতন কর্ম্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

তখনকার দিনে আদর্শবাদী তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের খুব প্রতিপত্তি। তারকনাথ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় মাঝে মাঝে যোগদান করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের অদম্য পিপাসা

সেখানে মিটিতেছে কই? সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তখন তাঁহার জীবন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক একদিন গভীর রাতে উঠিয়া কাঁদিতেন, আর প্রার্থনা করিতেন, "হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দাও, আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও। কি করলে এই জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, কৃপা ক'রে তাই শিখিয়ে আমায় দাও।"

১৮৮০ সালের মধ্যভাগ। একদিন কয়েকটি ভক্ত নিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ঘরে বাহিরে দর্শনার্থী জনতার ভীড়। এইদিন তারকনাথও সকলের সাথে ঠাকুরকে দর্শন করিলেন।

আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে পরমহংসদেব হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইযা কি যেন তিনি বলিতে চান। কখনো অস্ফুট কখনো বা আধ-আধ কথা। খানিক বাদে মন নিম্নভূমিতে অবতরণ করিল। তখনও সেই পরম অনুভূতির রেশ টানিয়া সমাধির প্রসঙ্গে ঠাকুর নানা তত্ত্বকথা কহিতেছেন।

একি দেবদুর্লভ ভাবাবেশ! একি আনন্দঘন রূপ! তারকনাথের হৃদয়ে এ দিনের স্মৃতি চিরতরে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

এই সঙ্গে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কবিলেন, এই সমাধিবান্ মহাপুরুষই তাঁহার সংত্রাতা, ইঁহার কৃপালাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু।

সেদিনকার এই দর্শন তারকের জীবনে আনিয়া দেয় ঈশ্বরপ্রাপ্তির তীব্র ব্যাকুলতা। আবার কবে এই দিব্য পুরুষের সন্নিধানে যাইবেন, তাহাই হয় তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান।

ইহার পর এক বন্ধুর সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিযা উপস্থিত হন। তারকের মনে কি ভাব জাগিল কে জানে? বালকের মত ঠাকুরের কোলে মাথা ঠেকাইয়া বার বার তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। ঠাকুর যেন এক করুণাঘন পরমাশ্রয়। মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ ও মাধুর্য্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে তাঁহার দিব্য মূর্ত্তি হইতে।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। ভবতারিণীর মন্দিরে কাঁসর শঙ্খ ঘণ্টা অবিরত বাজিয়া চলিয়াছে। আর ঠাকুর বসিয়া আছেন ভাবাবিষ্ট

অবস্থায়। আরতি থামিলে তারককে প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি সাকার মান—না নিরাকার?"

"আমার ভাল লাগে নিরাকার।" নিজের প্রবণতা ও ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তাধারাকে মিলাইয়াই একথাটি তিনি বলিলেন।

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা গেল, "শক্তি মান্‌তে হয়।"

ইহার পর পরমহংসদেব ভাবোন্মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজে ও কেশবচন্দ্রের সভায় ঘোরাফেরা করিয়া তারক নিরাকার ঈশ্বরের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তাই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ভাবিলেন, কালী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিবেন কিনা।

কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় এই দ্বিধা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। বুঝিলেন যিনি বিভু, ভূমা—প্রস্তর মূর্ত্তিতে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবা কেন? সাকার নিরাকার, খণ্ড ও অখণ্ড, দুই-ই যে তিনি।

মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন, "আবার এসো।"

দিব্যভাবে সদা আবিষ্ট এই মহাপুরুষের প্রেম-মধুর মূর্ত্তির আকর্ষণ যে অমোঘ! পরদিনই সন্ধ্যায় তারক আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ করিলেন। সযত্নে তাঁহাকে দেবীর প্রসাদ খাওয়াইয়া বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়া দিলেন।

কোন ভক্তই দক্ষিণেশ্বরে সেদিন উপস্থিত নাই। ঠাকুরের নিবিড় সান্নিধ্য ও দিব্য স্পর্শ লাভের পর তারকনাথের হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ বহিতেছে। শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিতেছে না। মধ্যরাত্রিতে দেখিলেন, ভাবোন্মত্ত ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া পায়চারী করিতেছেন, আর উচ্চারণ করিতেছেন কি সব দুর্ব্বোধ্য বাণী।

ইহার পর বারান্দায় আসিয়া তারককে ডাকিতে লাগিলেন, "ওগো ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটু রামনাম শোনাও তো!"

শশব্যস্তে উঠিয়া তারক ঠাকুরকে বহুক্ষণ রামনাম শুনাইয়া শান্ত করিলেন। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-আবেগের মধ্য দিয়া তারকের সেই রাতটি অতিবাহিত হইল।

বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর কহিলেন, "আবার এসো—একলা।"

একলাই তারকনাথ আবার একদিন ছুটিয়া আসিলেন। এই দিনকার অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন—"তিনি হঠাৎ তাঁহার পা আমার বুকে দিলেন। সে দিব্য স্পর্শে আমায় বাহ্যিক সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা জানিনে, কিন্তু পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন, 'মা, নেমে এস, নেমে এস।' ঐরকম অবস্থায় অপরের বেলায়ও তাঁকে এরকম করতে দেখেছি।"

তারক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু এতদিন ঠাকুর তাঁহার কোন পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেন কতদিনের পরমাত্মীয়কে আবার কাছে পাইয়াছেন, এই রকম ভাব। এইবার হঠাৎ তারকের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর শুনিয়া তিনি মহাখুসী। বলিলেন, "বটে। তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর নেবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাবাকে যে খুব জানি। তিনি রাণী রাসমণির বাড়ীর মোক্তার। ভারি সাধক লোক। এখানে এসে গঙ্গাস্নান ক'রে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে আসতেন। তখন মনে হত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব! যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ—বুকটা যেন সর্ব্বদা লাল হয়েই থাকত। মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত; সে পেছনে বসে নানা দেহতত্ত্ব ও শ্যামা বিষয়ক গান গাইত, আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন—অবিরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ লাল হয়ে যেত—তাঁর সামনে আসতে লোকের ভয় হত।

"আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ—অসহ্য জ্বালা সর্ব্বাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বল্লাম, 'হ্যাগো, তুমি তো মাকে ডাক, আমিও মাকে ডাকি—একটু ধ্যানও হয়। কিন্তু আমার যে এত গা জ্বালা করে, এর মানে কি বলতে পার? দ্যাখো, আমার এমনি গাত্রদাহ যে

লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনও কখনও বড় অসহ্য হয়।' তখন তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য! এই কবচ ধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাঁকে একবার আসতে বলিস্ তো?" [১]

তারকের পিতা লোকের কাছে শুনিলেন, পুত্র দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, এ সংবাদে তিনি বেশ আনন্দিতই হইলেন।

তারক ক্রমে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে মনের গোপন কথা, দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথা খুলিয়া বলেন। সেদিন কহিলেন, "দেখুন, বিয়ে ক'রে ফেলেছি বাধ্য হয়ে। ঘরে স্ত্রী রয়েছে। মনে ভয় হয়, আমার সংযমের বাঁধ যদি ভেঙে যায়, ঈশ্বর দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, যা নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি, তা ব্যর্থ না হয়ে যায়।"

আশ্রিত শিষ্যকে ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি রে? আমি আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাক্‌বে তাকে দেখাশুনা করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য্য ধর্। মা সব ঠিক ক'রে দেবেন।"

এ সম্পর্কে উত্তরকালে স্বামী শিবানন্দ কথা প্রসঙ্গে মঠের ভক্তদের বলিয়াছেন, "ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়াত করতুম তখন আবার মাঝে মাঝে বাড়ীও দেখতে হত। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল কিনা আগে। আমার কিন্তু আদৌ ভাল লাগত না; কোনরকমে নাক কান বুজে ভগবানের নাম ক'রে রাতটা কাটিয়ে দিতুম। স্ত্রী অনেক কান্নাকাটি করত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে, আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালুম। ঠাকুর সব শুনে, আমায় একটা ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং বল্‌লেন—'ভয় কি? আমি তো রয়েছি। আমায় খুব স্মরণ করবি, আর এই ক্রিয়া করবি, তোর কিছুই হবে না। যা, স্ত্রীর সঙ্গে এক

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ: স্বামী অপূর্ব্বানন্দ

ঘরে থাকলেও তোর কোন ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর বৈরাগ্য এতে আরও তীব্র হবে।" ১

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্ব্বাদ ফলপ্রসূ হয় সাধক তারকনাথের জীবনে। স্ত্রী তাঁহার পরমা ভক্তিমতী। সাত্ত্বিক ও শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। স্বামী তারকনাথের কাছে তাঁহার সাধনা ও সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনিয়া, তাঁহার মন আরো পরিবর্ত্তিত হয়। স্বামীর সাধন জীবনের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা তিনি করিতে থাকেন।

তারকনাথের সাধ্বী পত্নী বেশীদিন বাঁচিয়া থাকেন নাই। অল্প-কালের ব্যবধানে, রোগে ভুগিয়া, ইহধাম তিনি ত্যাগ করেন। তারকের সংসার বন্ধন এবার ছিন্ন হইয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিয়া, একনিষ্ঠভাবে নিজের সঙ্কল্প সাধনে তিনি ব্রতী হইয়া পড়েন।

ধনী সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবক তারক। ঠাকুর প্রথমেই তাহার অভি-মানের কাঁটা উৎপাটন করিতে শুরু করেন। সাধনায় ব্রতী হইতে হইলে অনেক কিছু ভাঙচুর আগে করিয়া নিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আগেই এদিকে মনোযোগ দিলেন, মাঝে মাঝে তারককে পাঠাইতে লাগিলেন ভিক্ষা সংগ্রহে। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে ভিক্ষা নিয়া তারক যখন ফিরিতেন, ঠাকুরের আনন্দের অবধি থাকিত না। দিন ও রাত্রির সর্ব্ব কর্ম্মে, শয়নে ভোজনে ঠাকুরের সতর্ক প্রহরা তরুণ সাধককে রক্ষা কবচের মত ঘিরিয়া থাকিত।

গুরু শিষ্যের এ সময়কার মধুর সম্বন্ধটির স্বরূপ স্বামী শিবানন্দের মুখে উত্তরকালে শোনা যাইত—"আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব ছিল তাতে ঐশ্বর্য্যের ভাব একটুও ছিল না। আমরা আমাদের কথা বলছি—ঠাকুরকে সেভাবে দেখিনি। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন। কেউ অবতার, কেউ ভগবান, এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন। ওতে আপন বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়। ··কি ভাগ্যবান্ আমরা—পান

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

সেজে তামাক সেজে খাইয়েছি, তাঁর সেবা করেছি—আদর ভালবাসা কত পেয়েছি।”

এমনি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া সুদক্ষ কাণ্ডারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আশ্রিতদের অধ্যাত্ম-জীবনের পরপারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তখন ভক্ত তারকনাথের অন্তর-সত্তায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইয়া দিতেছে। মুমুক্ষু জীবনের চারিপাশের আকর্ষণ ও বন্ধন যেন কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে অপস্রিয়মান। ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শনের একি পরম বিস্ময়কর ফলশ্রুতি! তারকের অন্তর্জীবনের তুষারাবরণ যেন অধ্যাত্ম-সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে আজ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

ঠাকুরের সহজ ভালবাসা ও কল্যাণেচ্ছার প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই ভালবাসার শক্তি কাজ করিত প্রচ্ছন্নভাবে. কিন্তু ইহার ক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে শিবানন্দ স্বামী বলিয়াছেন:

“ঠাকুরের কাছে হয়তো দু এক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব দিন তেমন কথাবার্ত্তাও হত না, কিন্তু ফল বহুদিন পর্য্যন্ত থাকতো। কেমন যেন একটা নেশার মত হয়ে যেত—সর্ব্বক্ষণই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম ··· তাঁর কৃপা-কটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। তিনি স্পর্শমাত্রেই ভগবৎ-দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন।”

সুদক্ষ অধ্যাত্ম-শিল্পী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; নিজ ভক্তদের রূপান্তর তিনি সাধন করিয়াছেন অসামান্য ধৈর্য্য ও সতর্কতা নিয়া। দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া এই সাধকদের জীবন অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়াছে। তারপর ঠাকুর তাঁহার দিব্য করস্পর্শে থরে থরে ইহাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কুসুমরাজি।

তারকের মনে পড়ে, দুই তিনবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি তাঁহাকে মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে নিয়া যান, তারকের জিহ্বায় নিজের আঙুল দিয়া কি যেন এক মন্ত্র লিখিয়া দেন। অদ্ভুত

তাহার প্রতিক্রিয়া! তারকনাথের চেতনার কেন্দ্রটি যেন এক মুহূর্তে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। পার্থিব জগতের অস্তিত্ব তখন তাঁহার চৈতন্য হইতে বিলুপ্ত। জড় সমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ইহার পরও তিনি আরও দুইবার চৈতন্য-বিলুপ্তির এই অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর প্রিয় শিষ্যের প্রস্তুতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন। তারপর উপযুক্ত সময়ে ঢালিয়া দিতেন কৃপাবারি।

তরুণ সাধক তারকের মন কয়েকদিন যাবৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনের পিপাসা হইয়াছে দুর্নিবার। একদিন তিনি নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বকুল তলায় বসিয়া খুব কাঁদিতেছেন। এদিকে ঠাকুর নিজের কক্ষে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথায় ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি তারকের জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। "তারক কই গো, তারক কই গো?" বলিয়া সবার কাছে খোঁজ নিতেছেন। তারকনাথ উপস্থিত হইলে পরম কারুণিক ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বোস্ বোস্, ছাখ্ ভগবানের কাছে খুব কাঁদবি, প্রাণভরে কাঁদবি। কাঁদলে তার ভারী দয়া হয়।" ভক্ত জীবনে তখন তীব্র আকুতি, ক্রন্দন ও পবিশুদ্ধির পালা চলিতেছে—অন্তর্য্যামী ঠাকুর এ সংবাদটি জানিতেন।

আর একদিনের কথা। নিভৃতে পঞ্চবটিতে বসিয়া তারকনাথ ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান খুব গাঢ় হইয়াছে, সদ্গুরুর অন্তর্লোকেও পৌঁছিয়াছে তাঁহার আকর্ষণ। পরমহংসদেব ত্বরিৎ-পদে এ সময়ে ধ্যানাবিষ্ট তারকনাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হুহু ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভেতর গুর্ গুর্ ক'রে উঠল, আর এমন কাঁপুনি যে, থামে না। ঠাকুর আর একজনকে ডেকে বললেন, 'ওরে এ কান্না কি অমনি হয়? ওর একটা ভাব এসেছে, ওকে নিয়ে আয়।' আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া ঠাকুর অতঃপর তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরম ত্যাগী সাধক, অপাপবিদ্ধ মহান্ পুরুষ। তাঁহারই জীবনাদর্শে তারকনাথ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া

নিতেছিলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া, জীবনের পশ্চাৎপটখানি একেবারে মুছিয়া দিয়া, ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়া বসিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

কিছুদিন রোগভোগের পর পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এবার তারকের সংসার জীবনের এক বড় বন্ধন খসিয়া গেল। স্থির করিলেন, গৃহে গিয়া পিতার নিকট গ্রহণ করিবেন শেষ বিদায়। তারপর সদ্‌গুরুর চরণতলে বসিয়া শুরু করিবেন ঈশ্বর লাভের কঠোর তপস্যা।

শক্তি-সাধক রামকানাই ঘোষাল সেদিন পুত্রের সমক্ষে শক্তি-মানের মতই আচরণ করিলেন। তারককে আশীর্ব্বাদ করিয়া সজল চক্ষে বলিলেন, "আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি; সংসার এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। বাবা, প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভগবান্ লাভ হোক।" সংসার ত্যাগের প্রাক্কালে পিতার নিকট হইতে এমন আশীর্ব্বাদ কোন সন্তানের ভাগ্যে মিলে?

দক্ষিণেশ্বরে ও রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া তারক-নাথ কিছুদিন একান্তে সাধন ভজন করেন। অতঃপর কাঁকুড়গাছির বাগানের নির্জ্জন পরিবেশে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন। এই অঞ্চল তখন জঙ্গলে পূর্ণ—সাপ, ব্যাঙ ও মশার রাজত্ব সেখানে। শিবানন্দ তখনকার জীবনসম্বন্ধে বলিতেন, "বেশ থাকতাম খুব নিরিবিলিতে। ...একটি আমগাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে সেইখানেই পড়ে থাকতাম। ধ্যান, জপ, বিশ্রাম সবই ওখানে। সাপগুলি ধুনির আগুন দেখে আসতে আসতে আবার চলে যেত। আমি এক একবার শুধু দেখতাম—তা আমার দিকে আসতো না। দিনে একবার ভিক্ষায় বের হতাম, যা জুটতো তাই খাওয়া যেত—বেশ লাগত।"

কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছ্রব্রতের ফলে তারকের দেহ তখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন দুটি সদা অন্তর্ম্মুখীন, অন্তরের অন্তস্থলে কোন্ পরশমণি যেন তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সারে ভুগিতেছেন। এই সময়ে রোগশয্যায়

থাকাকালীনই তিনি শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার কৃপার ধারা শেষবারের মত ঢালিয়া দিয়া যান। ত্যাগব্রতী রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূচনা দেখা দেয়, আর শেষ শয্যায় শায়িত গুরুকে কেন্দ্র করিয়া গুরুভাইদের মধ্যে রচিত হয় এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র।

চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরে আনয়ন করিলে ভক্ত তারক ও তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিনরাত পালা করিয়া গুরুর সেবা, আর অবসর সময়ে তীব্র সাধন-ভজন, ইহাই ছিল তখন তরুণ সাধকদের নিত্যকার কাজ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসময়ে একটা সহজ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ত্যাগী শিষ্যদের দান করেন প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাস। বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাব ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি?—এখানেই সব রয়েছে। এই ছোকরাদের খাওয়ালেই সব হবে।"

তাঁহার ইঙ্গিতে গেরুয়া বস্ত্র ও মালাচন্দন তখনি আনা হইল এবং তাঁহার প্রিয় একাদশটি ত্যাগী ভক্তকে নিজ হস্তে তিনি এসব দান করিলেন।

ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রদত্ত মালাচন্দন ও গেরুয়া বসন তারকের সন্ন্যাসকামী জীবনের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরে অমৃতময় জীবনের এক নূতনতর ইঙ্গিত।

কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে, ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে শোক আর নৈরাশ্যের ছায়া। এসময়ে তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আগাইয়া আসেন তাঁহার অসামান্য নেতৃত্ব শক্তি নিয়া। বরানগর মঠে তাঁহারই উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে ত্যাগী ভক্তেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ঠাকুরের আদর্শ ও বাণী প্রচারে তাহারা উদ্বুদ্ধ হয়। ঠাকুরের প্রদত্ত পরোক্ষ সন্ন্যাসব্রতকে নরেন্দ্রনাথ এইবার দিলেন আনুষ্ঠানিক রূপ। নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি ঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস নিলেন। তারকের নব নামকরণ হইল স্বামী শিবানন্দ।

বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম-প্রস্তুতি এবার গড়িয়া উঠিতে থাকে। চরম দারিদ্র্য, সামাজিক লাঞ্ছনা ও মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তরুণ সাধকেরা নিজেদের আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন।

সঙ্গীদের সাথে তারকও এ সময়ে ধ্যানানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। অন্তরে তাঁহার সদাই জাগিতেছে নির্গুণ রূপাতীতের ধ্যানাকাঙ্ক্ষা। এইবার বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরালে থাকিয়া শিবানন্দের অধ্যাত্ম-স্রোতকে বদলাইয়া দিলেন। ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। সারতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া কহিলেন, "ওরে, গুরুই সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।"

নির্গুণ ধ্যানের পরিবর্তে শিবানন্দ মত্ত হইলেন শ্রীগুরুর ধ্যানে, গুরুকে গ্রহণ করিলেন ইষ্টদেব রূপে।

পরবর্তী কালে তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার পরতে পরতে স্ফুরিত হয় এই সদ্‌গুরু-ভাবনা, জীবন তাঁহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে।

বরানগরের মঠ-জীবনে শিবানন্দের কঠোর তপস্যা ছিল গুরু-ভ্রাতাদের শ্রদ্ধার বস্তু। রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন। তাঁহার ত্যাগসর্ব্বস্ব জীবন উত্তরকালে উদ্বুদ্ধ করে হাজার হাজার ভক্ত নরনারীকে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও মঠ-জীবনের উজ্জীবনেও তাহা বিস্তার করে পর্য্যাপ্ত প্রভাব।

বরানগরের তরুণ সাধকদের মধ্যে তখন তপস্যার বান ডাকিয়াছে। ঈশ্বর দর্শনের আকুলতা হইয়া উঠিয়াছে দুর্নিবার। জপ ধ্যানেই বেশী সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়।

একদিন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পণ করিয়া বসিয়াছেন, জপ-সাধন ভঙ্গ করিয়া কোনমতেই তিনি আহারে বসিবেন না। এদিকে গুরু ভ্রাতারাও তাঁহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতে রাজী নন। অবশেষে ত্রিগুণাতীতানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "তারকদা যদি আমায় স্পর্শ ক'রে থাকেন, তা'হলে তা জপের সমান কাজ করবে। সেই অবসরে আমি দুটি খেয়ে নেব।"

তারকনাথকে তখন বাধ্য হইয়া এ কাজ করিতে হয়। এই

হইতে বুঝা যায়, ধ্যানী তারকনাথ গুরুভাইদের দৃষ্টিতে এ সময়ে কতটা আস্থা ও সম্ভ্রমের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারকের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিটি গড়িয়া দিয়াছিলেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে এই ভিত্তিকে তারক দৃঢ় করিয়া তোলেন নিজের একনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় তপস্যা দ্বারা।

বিশেষ করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে তপস্যার ধুনি তারক ও তাঁহার ত্যাগী গুরুভাইরা প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহা আনিয়া দেয় পরমা সিদ্ধি। এ সম্পর্কে মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন:

"যদিও তারকনাথ এবং অপর সকলে পরমহংস মশায়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে। তাঁহাদের প্রকৃত সাধক জীবন কাশীপুর বাগান হইতেই শুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে কয়েকটি অন্তরঙ্গ যুবকবৃন্দ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কঠোর তপস্যা পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান্ হইয়াছিল। ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া জপ ধ্যান, কখনও বা কীর্ত্তন করা, কখনও বা সৎচর্চ্চা, সৎপ্রসঙ্গ করা, কখনও বা হলঘরটিতে বসিয়া জপ করা, ধ্যান করা ইত্যাদি। দিবারাত্রি তাঁহারা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, কঠোর দুরূহ তপস্যা অর্থাৎ প্রাণস্পর্শী তপস্যা এই সময় হইতেই চলিতে লাগিল।"

ইহার পর শুরু হয় বরানগর মঠে এই ত্যাগব্রতী তরুণ তাপসদের সাধনা। একদিকে চরম দারিদ্র্য এবং কৃচ্ছ্রব্রত, আর একদিকে ভগবৎ-দর্শনের জন্য প্রাণপাত তপস্যা—এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তারক প্রভৃতি সাধকদের অন্তর্লোক ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় চেতনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে।

এ সময়ে কয়েকমাস এমন আকাশবৃত্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন, যাহার তুলনা সচরাচর মিলে না। পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শেষে আসিয়া ঠেকিয়াছে একটিতে। কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিয়া

সবাই মঠে বাস করিতেন এবং ধ্যানভজন করিতেন। কাহারো বাহিরে যাইবার দরকার হইলে, একটি বস্ত্রই ছিল সম্বল।

সকলেই তাঁহারা মোটামুটি সচ্ছল ঘরের ছেলে। কিন্তু বৈরাগ্যময় জীবন অবলম্বন করার ফলে আহার্য্য জুটিত শুধু নুনভাত। একদিন কিছুই জুটিল না, অগত্যা সবাই কীর্ত্তন-আনন্দে কাটাইয়া দিলেন।

"বরানগর মঠ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের দিন ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ কাহারও কোন বস্তু গ্রহণ করিত না। সাধনা আর তপস্যা, একমাত্র মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্যার বিঘ্ন হয়, এইজন্য সাধ্যমত কেহ কাহারও কোন দান গ্রহণ করিত না। একদিকে আহারের কষ্ট, অপর দিকে কঠোর তপস্যা, এইরূপ কঠোর তপস্যা করায় হৃদয়ে সিংহবিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদক্ষেপে বোধ হইত যেন মেদিনীকে কম্পিত করিয়া এই কয়টি যুবক জগতে বিচরণ করিবে। তাহারা জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্তু বা জগতের আকর্ষণী শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল। কি করিলে ব্রহ্মলাভ হয়, জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি বিকাশ করা যায়— এইটাই তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা যাইল যে, এই কয়টি যুবক গম্ভীর নিস্তব্ধ পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎকে বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল। বরানগর মঠে ইহাদের জীবনের প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জাগ্রত ছিল, প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে পরে তাহা দেখাইয়াছেন।"

স্বামী শিবানন্দের পুণ্যস্মৃতি অনুধ্যান করিতে গিয়া মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :

তারকদা সকালে রামতনু বোসের গলির বাড়ীতে আসিলেন। গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মতন একটা নেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উড়ি খুড়ি চুল, আর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি।

আমি বল্লুম, 'তারকদা, চল তোমায় নাইয়ে দি।' সেই সময় দিল্লী থেকে একজন গা মাজবার গোঁজ বা বগলী, যাকে খিস্‌সে বলে—সেইটে এনেছিলু। আমি তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে

নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদার গা ঘস্‌তে লাগলুম। গা ঘসতে ঘসতে কাদাটে কাদাটে জল বেরুতে লাগল। এইরূপ অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা, মুখ ঘসার পর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো।

আমি বললুম 'তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন?' তারকদা বললেন, 'সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটা ডুব দিয়ে আসি। গাও ঘসিনি, গাও পুঁছিনি। যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। সেইজন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে।'

তারপর তিনি বললেন, 'ওহে একটু গুল দাও দিকিনি? দাঁতটা মাজি। অনেকদিন দাঁত মাজতে ভুলে গেছি।'

আমি তখন একটু গুল গুঁড়িয়ে এনে দিলুম। তখন তারকদার জোয়ান বয়স, রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গা ঘসে দেবার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে হল, কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছ্‌ল। তারপর কাপড়-চোপড় রোদে শুকুতে দিলুম।

তারকদা ঘরের ভিতর গিয়ে একটু শুলেন। দেখি না, পায়ের গোড়ালীগুলো একেবারে ফেটে গেছে। আমি নারকেল তেল এনে সেই ফাটাগুলোর ভিতর দিতে লাগলুম। তারকদা একটু হেসে বললেন, 'ওহে, তুমি একদিন দিয়ে আর কি করবে? আমায় সর্ব্বদাই এ রকম অবস্থায় থাকতে হয়। পা-টা ফেটে গেছে এতে আর কি ক্ষতি হয়েছে? যাগা হোক, তারকদা আহারাদি ক'রে চলে গেলেন। এই সময়ে তিনি সাধন-ভজনে বিভোর থাক্‌তেন, দেহের দিকে কিছুই মন ছিল না।

বরানগর মঠবাড়ীটা আসলে ছিল একটা জঙ্গলাকীর্ণ, অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাগান বাড়ী। তারক প্রভৃতি তরুণ রামকৃষ্ণ-ভক্তেরা এখানে বাস করার সময় যে সব কাণ্ড করিতেন, মহেন্দ্রনাথ তাহার চিত্র দিয়াছেন :

"মঠবাড়ীর আশে পাশে অনেক পোড়ো জমি ছিল। কেলোমালী একটা উড়ে মালী। সে কিছু ক্ষেত করেছিল। সেই ক্ষেতে বড় বড় শাঁড় শসা হ'ত। মধুর বালকস্বভাব তারকদা এক একদিন চটে উঠতেন—'হুরতেরি ছাই। এমন তুথ্‌ চেটে খাওয়া আর খাওয়া

যায় না।' এই বলে তিনি হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেলো মালীর ক্ষেতে যেতেন এবং দু-চারটা পাঁড় শসা তুলে আনতেন।

কেলো মালী সেই সময় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকত, সুমুখে আসত না। তার পরদিন, কেলোমালী এসে ন্যাকামি করে কান্না সুরু করত। সে বলত, আমি গরীব মানুষ, আমার শসা নিলেন? আমি এখন কি করব।' সেটা কিন্তু মৌখিক ছিল। তারকদা কখনও কখনও দু-চারখানি রুটি দিতেন। কখনও বা কোন ভক্ত এলে তাঁকে বলে কেলো মালীকে একটা টাকা বা একখানা কাপড় দেওয়াতেন। এই শসা তুলবার সময় কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন। সে একটা হাসি তামাসা আমোদের জিনিস ছিল।

দু'চারটা শসা এনে তারকদার কি আহ্লাদ। কি হাসি। যেন কত দিগ্বিজয় হ'ল। তিনি ঘাড় নেড়ে নেড়ে মুখ নেড়ে নেড়ে, ডান হাতের তর্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাসি তামাসা করতেন, তাতে সকলেই বড় আনন্দিত হ'তেন। সে চিত্র এখনও আমার সুমুখে রয়েছে। যা হোক সেই কেলো মালীর শসা একটু নুন ঝাল দিয়ে তরকারী হত।"

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহব্যথা এক একদিন শিষ্যদের মুহ্যমান করিয়া ফেলে। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলের মধ্য দিয়া করেন তাঁহারা স্মৃতি তর্পণ। বিরহের মধ্য দিয়াই ভাবময় রামকৃষ্ণ-সত্তায় চলে তাঁহাদের আত্মিক অবগাহন। প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ তারকনাথের এমনি এক বিরহখিন্ন দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়: "আমি বরানগর মঠে গেলুম। মেঘলা করেছে। ঝিম ঝিম বৃষ্টি হচ্ছিল। বড় ম্যালেরিয়া হওয়ায় সকলেই বাইরে পালিয়েছে। শশী মহারাজ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-আরতির উদ্যোগ করিতেছেন। বড় ঘরটাতে তারকদা ও শরৎ মহারাজ আছেন। তারকদা দক্ষিণদিকের দেওয়ালেতে পিছন করে বাঁ দিকের হাতে মাথা রেখে বেঁকে শুয়ে আছেন। শরৎ মহারাজ একটু দূরে আধশোয়া হয়ে, হাতে মাথা রেখে, শুয়ে রয়েছেন। আমি কাছে গিয়ে বসলুম।

বৃষ্টির জল পড়ায় বাগানের আম পাতা থেকে টোপ টোপ জল

গড়াচ্ছে, বাড়ী নিস্তব্ধ। দু'জনের মুখ ভাবে বিভোর ও বিষাদে পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। খানিকক্ষণ পরে তারকদা বললেন, 'শরৎ, বাঁয়াটা পাড়ো তো, ঠেকা দাও তো।' তারকদা উঠে বসে গাইতে লাগলেন—

হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথ পড়ল, সহি! মালতী মালা;
নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস,
সুখ গেল প্রিয় সাথে, দুঃখ মোহি পাশ।"

তারকদা প্রাণের আবেগে এ বিরহগীত এমন সুন্দর গাইতে লাগলেন যে আমার পর্য্যন্ত মন দ্রব হয়ে গেল। আর তারকদার ও শরৎ মহারাজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল—'নয়ন জলে বয়ান ভাসে।'

হৃদয় বিদারক বিরহ যে কি জিনিস এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যে অতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহা যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সঙ্গীত প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে নাদ ব্রহ্ম—যা হৃদয় হতে উদ্ভূত হয়ে কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ হয়েছিল। সেই গাওয়া ও শুনায় আমরা তিনজনেই স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অন্তরে যেন বিরহভাবের তরঙ্গ চলতে লাগল। পক্ষান্তরে ইহা তারকদা ও শরৎ মহারাজের সাধক জীবনের অন্যতম রূপ; কারণ তাঁহাদের প্রাণও তখন ভগবান্ লাভের জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। এইজন্য নিজেদের হৃদ্‌গতভাবে তাঁরা নিজেরাই সুর করে ভজন গাইছিলেন।

শেষ সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বললাম, 'বরাহনগর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে আছে?'

শরৎ মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন সেটা খুব মনে আছে, প্রাণে বড্ড ধাক্কা লেগেছিল।'

কয়েক মাসের মধ্যেই বরানগরের চরম দারিদ্র্য বরণের পালা

শেষ হইল। গৃহী ভক্তেরা এই ত্যাগী সাধকদের মঠে কিছু কিছু সাহায্য দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের পূজা ভোগ ও সন্ন্যাসী আশ্রমিকদের অশন বসনের কিছুটা সুরাহা হইল।

তারকনাথ ছিলেন স্বভাবতঃই ধ্যানী. গুরুর দেওয়া সাধন নির্দ্দেশের মধ্য দিয়া নিজের তপস্যা তিনি চালাইয়া যাইতে থাকেন পরম নিষ্ঠাভরে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "প্রথম হইতেই একটা ভাব তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হইত। একদিকে যেমন তিনি নির্লিপ্ত ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, কোন বস্তুতে যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা ছিল না, অপরদিকে তাঁহার অতিশয় উদার ভাব ছিল অর্থাৎ কোন গণ্ডী বা সীমার ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না। এই সময় তাঁর মুখে প্রায় এই কথাটা থাকিত—'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'। এত বিধি নিয়ম পূজা—এসব তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁর ধাতস্থ এসব নয়। 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ভাবটাই তাঁর খুব প্রবল ছিল। অপর যা' কিছু তিনি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁর প্রাণের জিনিস নয়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা আরও প্রবলভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল,—যদিও তিনি কোন বিশেষ ভাবের বিরোধী বা পক্ষপাতী ছিলেন না। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবটি-ভবিষ্যতে তাঁর ভিতর ভালবাসা উদ্ভূত করিয়াছিল। এই ভালবাসা হইতেছে আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ নিজের আত্মাকে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে দর্শন করা।"

অতঃপর স্বামী শিবানন্দের জীবনে শুরু হয় পরিব্রাজনের পালা। ভারতের বহু তীর্থ তিনি পরিভ্রমণ করেন, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে তপস্যা করার জন্য মঠ হইতে কয়েকবার নিষ্ক্রান্ত হন।

এসময়কার তিতিক্ষাময় জীবনের নানা কাহিনী তিনি উত্তরকালে ভক্তদের কাছে বর্ণনা করিতেন :

"এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাকতো না। সেই এক কাপড়ই অর্দ্ধেক পরে আর অর্দ্ধেক গাঁতি মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়তো কোন

কুয়োতে স্নান ক'রে, কৌপীন প'রে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে নিতাম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র বৈরাগ্য। শারীরিক আরামের কথা মনেই হোত না। কঠোরতাতেই আনন্দ।"

নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক জীবনের নানা দুঃখ ও দুর্দ্দশায় সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁহার ভরসা স্থল, অন্তরালে থাকিয়া তিনিই তাঁহাকে সতত দিয়েছেন আশা আশ্বাস ও আশ্রয়। শিবানন্দ মহারাজ কহিতেন, "এসময়ে ঠাকুরই সর্ব্বদা সঙ্গে থেকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কখনও অভুক্তও রাখেননি। অবশ্য এমন দিন গিয়েছে যে খুব সামান্যই আহার জুটেছে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। বিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। দুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি। তখনও খাওয়া হয়নি। নিকটে কোন লোকালয় ছিল না। এমন সময় পাশের বেলগাছ থেকে একটা পাকা বেল ধুপ্ ক'রে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল। তখন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে সেদিন কাটিয়ে দিলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিলেন। রামকৃষ্ণ শিষ্য-মণ্ডলীতে আনন্দের বান ডাকিল, এবং সারা ভারতেও অপূর্ব্ব প্রাণ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ মঠ তখন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই দৃষ্টিতে এক পরম গৌরবের বস্তু। এই মঠের উৎস-মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অন্যান্য গুরু ভাইদের মত শিবানন্দও এ সময়ে বিবেকানন্দের এই কর্ম্মযজ্ঞের পাশে আসিয়া দাঁড়ান।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ধ্যানী শিবানন্দ মহারাজ এবার আবির্ভূত হন কর্ম্মযোগীরূপে। বেদান্ত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারকল্পে শিবানন্দ এই সময়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। এই সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রতিভাত হইতেন বেদান্তেরই এক জীবন্ত ভাষ্যরূপে। শিবানন্দের বেদান্ত প্রচার সে সময়ে মাদ্রাজ ও কলম্বোতে চাঞ্চল্যের

সৃষ্টি করে। তাঁহার কলম্বো কেন্দ্রের ছাত্রী হরিপ্রিয়া (মিসেস পিকেট) তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইয়া পরবর্ত্তীকালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজী-ল্যাণ্ডে বেদান্তের প্রচারে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বারাণসীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন শিবানন্দের অন্যতম অবদান। তিরোধানের কিছু পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের জন্য ভীঙ্গার রাজার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হন। এই টাকা দিয়া বারাণসীতে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তিনি করেন এবং শিবানন্দকেই দেন ইহার দায়িত্বভার।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। শিবানন্দ মহারাজ উপলব্ধি করিলেন, শুধু মৌখিক ভাষণ-দানে তো বেদান্তের তত্ত্ব মানুষের জীবনে প্রতি-ফলিত হইবে না, ভজন-সাধন ও পূর্ণ বেদান্তের অনুকূল জীবনের আদর্শ দেখাইতে হইবে। তবেই সম্ভব হইবে বেদান্তের প্রকৃত বিস্তার সাধন।

অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার বলে একাজ তিনি সম্ভব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিজের ও সহকর্মীদের এই সময়কার তপস্যা ও বৈরাগ্যের আদর্শ কাশীধামে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোড়ার দিকে চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে শিবানন্দকে কাটাইতে হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিটি সদা বিরাজিত থাকিত অটল মহিমায়। নিত্যকার ধূলি ঝঞ্ঝার ঊর্দ্ধে, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায়, সর্ব্ব সময়ে তিনি অবস্থান করিতেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :

"কাশীতে যখন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, তখন কাশীবাসী অনেকেই আপত্তি তুললেন—'অদ্বৈত আশ্রম বলছেন আবার এখানে পূজা হোম ইত্যাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত মতের বিরোধী ভাব!' এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার আপত্তি তুলতে লাগলেন। আমি এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম! শেষে জিজ্ঞাসুদের বুঝিয়ে দিলুম যে, নীরস অদ্বৈতবাদ—সেভাব এখানে নয়। এখানে হচ্ছে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত অদ্বৈতভাব। এখানে রসে বশে সারেমাতে বস্তু থাকবে। অধিকারী হিসাবে অদ্বৈতজ্ঞানও থাকবে, ভক্তি পূজা পাঠ ইত্যাদিও থাক্‌বে। একঘেয়ে অদ্বৈতবাদ হ'লে প্রাণটা বড় শুষ্ক হয়ে যায়। ভক্তি প্রাণকে সরস রাখ্‌বার একটা উপায়। আর কর্ম্মও নিতান্ত আবশ্যক—এও এক বড় সাধনা।"

সহজ ভাষায়, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে এমন করিয়া তিনি এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিলেন যে, কাহারো মনে কোন প্রশ্ন রহিল না, বিরূপ ভাব রহিল না। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের বহুকথিত মূল তাত্ত্বিক সূত্রটি—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—সকলের মনে গ্রথিত হইয়া গেল।

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব অর্থাভাব। বাড়ী ভাড়াও অনেক বাকী পড়িয়া গিয়াছে। শিবানন্দ মহারাজ বহু কষ্টে একদিন একশত টাকা যোগাড় করিয়াছেন এবং বাড়ীওয়ালাকে দিবার জন্য তাহা রাখিয়া দিয়াছেন একটি ভাঙ্গা ক্যাসবাক্সে।

আশ্রমের একটি নবাগত যুবক কর্ম্মীর উপর এই সময়ে বাজারের ভার ছিল। লোভে পড়িয়া সে ঐ টাকাটা আত্মসাৎ করিয়া বসে এবং আশ্রম হইতে পলায়ন করে। সব টাকা নিয়া গিয়াও সে কিন্তু ক্যাসবাক্সে একটি পয়সা রাখিয়া যায়। কোনমতে তাহা দিয়াই সেদিন বাতাসা কিনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্ভব হইল।

বহু কষ্টে যোগাড় করা টাকাগুলি তো উধাও হইয়া গেল। এখন বাড়ীভাড়ার টাকা আসিবে কোথা হইতে। এত টাকা আবার কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে বাড়ীওয়ালাটি অতি দুর্দ্দান্ত লোক, বাগে পাইলে সহজে কাহাকেও সে ছাড়ে না। আশ্রমিকেরা প্রমাদ গণিলেন।

বাড়ীওয়ালা শিবানন্দ মহারাজকে ডাকাইয়া নেয় এবং টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাকে নিজের গদীতে আটকাইয়া রাখে। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আপাততঃ মিটমাট হইল, এবং মহাপুরুষজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

বিস্ময়ের বিষয়, যে যুবকটির জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহার উপর

শিবানন্দ স্বামীর এতটুকু রুষ্টভাব নাই। প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলিলেন, "ছেলেটির অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার ধর্ম্মবুদ্ধি কিছুটা ছিল—তাই তো একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল। আর তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া গেল। কাজ তো আটকায় নি।"

শিবানন্দ মহারাজের সেদিনকার এই ক্ষমাসুন্দর রূপ সেদিন মঠের কর্ম্মী ও ভক্তদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক মহিমা ও অপূর্ব্ব মহাপ্রাণতা ছিল বলিয়াই, শুধু বারাণসীর যুবক মহলেই নয়, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহলেও তাঁহার আত্মিক প্রভাব সে সময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিবিড় ধ্যান-তন্ময়তার মধ্য দিয়া তখন মহাপুরুষজীর দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত হইত। যে অতীন্দ্রিয় আনন্দ-আস্বাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনে সম্ভব করিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই নিবিড়ভাবে, নিরন্তর ধারায়, তিনি উপলব্ধি করিতে চাহেন। তাই কোনদিন ইষ্টদর্শন না হইলে, দিব্য অনুভূতির রসে অন্তর অভিষিক্ত না হইলে, দুঃখের তাঁহার সীমা থাকিত না। বালকের মত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া খেদোক্তি করিতেন, "চন্দ্র, দিনটা আজ বৃথায় গেল। আজ তাঁর দর্শন পেলাম না—তাঁর জন্য একটু চোখের জলও বেরুল না।"

ধ্যানী সাধকের অন্তরাত্মায় মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে সর্ব্বপ্লাবী ঈশ্বরীয় চেতনা। কঠোরতপা, ধ্যান-গম্ভীর সাধক উদ্বেল হৃদয়ে বারান্দায় পায়চারা করিয়া বেড়ান, আর ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলেন—

তুমি পূর্ণ পরাৎপর ;
তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ! কার সাধ্য
ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই কত
তুমি বাক্য মনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত
তোমারে দেখিতে চায়॥

শিবানন্দের কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, নয়ন দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত। রামকৃষ্ণময় সাধকপ্রবরের এই রসাপ্লুত, প্রেমমধুর মূর্ত্তি যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে চিরতরে।

বারাণসীর আশ্রমে শিবানন্দ মহারাজ সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা-পূত জীবনের এটি এক সুবর্ণময় যুগ। দিনের পর দিন তখন অদ্বৈত আশ্রমে চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ চলিয়াছে। কোন দিন ব্রহ্মচারীদের হয়তো আহার জোটে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় পাশের বাড়ীর বাগান হইতে তাহারা দুই চারিটা পেয়ারা পাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে। এই ত্যাগ তিতিক্ষাময় দিনগুলিতে কিন্তু শিবানন্দ মহারাজের কঠোর তপস্যা বহিয়া চলিয়াছে অবিরাম ধারায়। সংঘাতময় বাস্তব জীবনের বহু উর্দ্ধে, এক অবিচল ধ্যানতন্ময়তায় তিনি আবিষ্ট হইয়া আছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া হাসিয়া বলিতেন, "তারকদা, তোমার ধ্যান কি টাকার যোগাড় করতে পারবে? আশ্রমের জন্য শিগ্‌গীর টাকা সংগ্রহে লেগে পড়ো।" কিন্তু একথা শুনিবার মত মানুষটি তখন যেন হারাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর ক্রমাগত কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের ফলে শিবানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। অতঃপর তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্ব অপর একজনের উপর ন্যস্ত করিয়া বেলুড়ে চলিয়া আসেন।

সে বার ডায়মণ্ড-হারবারের একটি বাগ্দী ছেলে দীক্ষা নিবার জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে ঐ ছেলেটিও পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া গেল। ভোজন শেষে এক রক্ষণশীল ভক্ত জাত বিচারের কথা উঠাইয়া মঠ সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে থাকেন।

জাত বিচারের এই কথা শিবানন্দ মহারাজের কানে গেল। শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দ্যাখো, এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান্

লাভ, সাধন-ভজন—এই হল এখনকার মূল উদ্দেশ্য। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা ও সাধন ভজন করা, এইটাই হচ্ছে দেখবার জিনিস। বামুন কি কায়েত, কি বাগ্দী, একথার কোন আবশ্যক নেই; কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোন কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন-ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। যে ঠাকুরকে মানবে, সাধন-ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে। জাতাজাতির কথাটা এখানে যেন না হয়।"

সে-বার শীতকালে বড়দিনের সময় বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিশেষ ভোগ দেওয়া হইতেছে। বহু ভক্ত ও অভ্যাগত প্রসাদ পাইবার জন্য আসিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত শিবানন্দের এ সময়কার একটি আচরণ সম্পর্কে লিখিতেছেন:

"দুপুরবেলায় উঠানে সকলে খাইতে বসিয়াছেন, দালান আর উঠানের মাঝখানে যে জমিটা সেখানে সকলে জুতা ছাড়িয়া রাখিয়াছেন। তখনও প্রায় শতাবধি লোক দাঁড়াইয়া আছেন, বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, ঐ জায়গাটার জুতাগুলি সরাইলে ভক্তেরা বসিতে পারেন। সকলেই এই কথা বেশ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন; কেহই উঠিয়া নিজের নিজের জুতা সরাইলেন না—মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন। তারকদা স্বভাব সুলভ বালকভাবে কহিতে লাগিলেন 'ঠিক তো, ঠিক। জুতাগুলি সরালে এদেরও জায়গা হয়।' এই কথা বলিয়া, কোন দ্বিধা না সঙ্কোচ না করিয়া সেই জুতাগুলি দুইবাহু ও বক্ষের মাঝে ধরিযা, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। জুতা উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'কি করেন মহাপুরুষ, কি করেন? আমার জুতায় হাত দিবেন না, তিনি বলিলেন, 'ওহে! বস, বস—খাও। এই সামান্যর জন্য এত চঞ্চল হবার দরকার নেই, এটা এখনি ক'রে নিচ্ছি।' এইরূপ তিন চারিবার করিতেই জায়গাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। পরে নিজে একটা ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁট দিলেন। তারপর সকলকে নিজ নিজ আসন আনিয়া বসিতে বলিলেন।

যাঁহারা আহারের জন্য উঠানের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, 'হাঁ, সত্যকার মহাপুরুষ বটে। কোন মান, অভিমান নাই।' এই উপাখ্যানটিতে তাঁহার একটি বিশেষ মনোভাবের চিত্র পাওয়া যায়। যিনি উপস্থিত সকলের গুরু বা গুরুস্থানীয়, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সকলের জুতা দুই বাহু ও বুকের মাঝে রাখিয়া সরাইলেন—কোনই সঙ্কোচ করিলেন না। তিনি আদেশ করিলে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি জুতা সরাইত। কিন্তু তিনি এত বিনয়ী ও অভিমানশূন্য লোক ছিলেন যে, এসব বিষয়ে কোন প্রাধান্য বা ইতর বিশেষ ভাব তাঁর একেবারেই মনে আসিত না।[১]

কয়েক বৎসর পরের কথা। শিবানন্দজী আবার বারাণসীতে আসিয়াছেন। এসময়ে প্রায়ই থাকেন তিনি ধ্যানমগ্ন, বাস করেন অপার্থিব আনন্দ রাজ্যে। অদ্বৈত আশ্রমের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার একটি ফটো তুলিবেন। বহু অনুরোধের পর তাঁহাকে সম্মত করানো গেল। আসনে উপবেশন করার পর যুক্তকরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন, সম্মুখে রাখা হইল একটি কমণ্ডলু। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাপুরুষজী ধ্যানতন্ময় হইয়া পড়িলেন। দৃষ্টি ভ্রূনিবদ্ধ, একেবারে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। ছবি তোলার ব্যাপারটি মহাপুরুষের কাছে তখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ এই সঙ্কটের অবসান করিলেন। ধ্যানাবিষ্ট শিবানন্দজীর গায়ে ধাক্কা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "মহাপুরুষজী, প্রকৃতিস্থ হয়ে বসুন, আপনার ফটো তুলবে যে!"

বার বার ডাকাডাকির পর মহাপুরুষজীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিদ্রোত্থিতের মত বলিতে লাগিলেন, "অ্যাঁ...অ্যাঁ কি বলছো?" কোনক্রমে তাড়াতাড়ি করিয়া সেদিনকার ফটো তোলা পর্ব্ব শেষ করা হইল।

শিবানন্দ মহারাজের এই সময়কার জীবন আত্মসমর্পণের সাফল্যে

---

১ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান: মহেন্দ্রনাথ দত্ত

মহিমোজ্জ্বল- গুরুকৃপার দিব্য রসধারায় তাহা অমৃতময়। তাঁহার সমকালীন এক চিঠিতে ইহার আভাষ মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন, …'তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ। আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার কৃপালাভ। সেও তাঁহারই নিজগুণে! আমার এমন কোন গুণ ছিল না, যদ্দ্বরা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন-- এই মাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

অন্যত্র আবার লিখিতেছেন—"আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস এই মাত্র জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তাঁকে স্মরণ করান তখন স্মরণ করি। যখন পাঠ করান তখন পুস্তাকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহারও সহিত ধর্ম্মকথা আলাপ করি --এই আমার কাজ। ভরসা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা---সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে আমার কিছুই নাই এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও নাই তাঁহার কৃপায়। আমি এখন প্রভু যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব। নিজের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই; প্রভু যেরূপ করাইবেন, তাহাই করিব।"

দীর্ঘ অধ্যাত্ম প্রস্তুতির পর শিবানন্দকে সদ্‌গুরু কর্ম্মবৃত্তের মধ্যে টানিয়া আনেন। জীবনের চল্লিশ বৎসর কটিয়াছে কঠোর প্রব্রজ্যা ও তপশ্চর্য্যায়। এবার তিনি মঠের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই মঠ যে ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই তৈরী! আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রাণকেন্দ্ররূপে এ যে তাঁহারই সুমহান্ সৃষ্টি! প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া ঠাকুর স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছেন, এই মঠ ও মিশনকে স্থাপন করিয়াছেন নূতন অধ্যাত্ম ভাবধারার উৎস রূপে। এই ধৃতিটি শিবানন্দের হৃদয়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

বড়লাট-পত্নী লেডি মিন্টো সেবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া উঠেন, "স্বামী বিবেকানন্দই তো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। তাই না?" শিবানন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, "না—তা কেন? প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই সঙ্ঘ আমরা

কেউ সৃষ্টি করিনি! ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর সকলকে শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি করে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালনা করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। সেই হল মঠের গোড়াপত্তন।”

জীবন-প্রভুর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এইবার তিনি নিষ্ঠা সহকারে আঁকড়িয়া ধরিলেন। জপ ধ্যান ও প্রব্রজ্যার শেষে তাঁহার জীবনে শুরু হইল কর্ম্মযোগের নবতম অধ্যায়।

পূর্ব্বের পরিব্রাজক জীবন ও তপস্যার কথা কেহ উল্লেখ করিলে তিনি কহিতেন, “এক সময় এ সব খুব করা গেছে। এখন তো ঠাকুর আমাদের কর্ম্মব্রতে টেনে এনেছেন। তাঁর যুগধর্ম্ম প্রচারের জন্য এইরূপই প্রয়োজন হয়েছে। তাই এখন এই বুড়ো বয়সে আমাদের দ্বারাও ঠাকুর তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম যে, তপস্যা ক'রেই জীবন কাটিয়ে দেব...করেছিলামও তাই। কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায়?”

ভক্তজনের জন্য বাবুরাম মহারাজের ছিল প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা—মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হৃদয়যোগ তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর দেখা গেল, বহিরাগত ভক্তের দল ক্রমে ক্রমে মঠের সহিত যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। বাবুরাম মহারাজ নাই, আর কে তাহাদের দরদভরা দৃষ্টি নিয়া দেখিবে? কে আদর-যত্ন করিবে? সাধন-নির্দ্দেশই বা এত উৎসাহ করিয়া কে দিবে? অনেকে মঠে আসা বন্ধও করিয়াছিলেন।

এক রাত্রিতে কিছুসংখ্যক যুবক ভক্ত বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। আরতির পর তাঁহারা নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শিবানন্দজী আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা তোমরা আজকাল আর আগের মত মঠে আসছো না কেন? আগে যেমন মঠে আসতে এখনও তেমনি এসো। জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি।”

এই ধ্যান-গম্ভীর মহাপুরুষের অন্তর্লোকে এমনতর প্রেমের ফল্গু

বহিতেছে একথা জানিয়া যুবক ভক্তদল বিস্মিত হইলেন। ইহার পর হইতে বহু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধক শিবানন্দের স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইতে থাকে। বহুতর প্রাণ-শিখা তাঁহার অধ্যাত্ম-জ্যোতিতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, রামকৃষ্ণ মণ্ডলী ও বেলুড় মঠ তাঁহার প্রভু রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় সৃষ্ট। মনে প্রাণে সদাই তিনি আশা করিতেন, এই মণ্ডলী ও মঠ হইবে অধ্যাত্ম-শক্তির এক বিরাট উৎস। তাই নিষ্ঠাভরে নিজের আত্মিক সাধনা ও কর্ম্মসাধনাকে এই মঠের সহিত একান্তভাবে তিনি যুক্ত করিয়া দিলেন। নিজে যেমন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় সদা বিভোর থাকিতেন তেমনি মঠের কর্ম্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিস্তারিত করিতেন সেই চিন্তা ও সাধনার ধারা।

অধ্যাত্ম-আলোচনা প্রসঙ্গে যে কোন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ও ভক্তের চেতনাকে তিনি অবলীলায় ঊর্দ্ধতর স্তরে নিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও সাধন তত্ত্বের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কোন গৃহস্থ ভক্ত একবার বলিতেছিলেন, "মহারাজ, জীবনে কত পাপ করেছি। আপনি মহাপুরুষ। আমায় কৃপা করুন।"

শিবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা? তুমি কি ঠাকুরের কথা শোননি? ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, পাপ—তুলোর পাহাড়। পাহাড় প্রমাণ তুলো যেমন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই অচিরে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ভগবানের কৃপাকণা লাভে পাহাড়-প্রমাণ পাপও ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কোন ভয় নেই। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম করো। আর কিছু করতে হবে না!"

রাঁচীর ভক্তগণ একবার শিবানন্দ মহারাজকে তাঁহাদের উৎসবে নিয়া গিয়েছেন। এটি ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মতিথি উৎসব। শিবানন্দজী ইষ্টদেবের পূজায় উপবিষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া ঠাকুরের চরণে পুষ্পবিল্বদল দিয়া তখন পূজাকক্ষের বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার দেহ ভাবাবেশ ও দিব্য অনুভূতিতে থর থর

করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন দুটি রক্তবর্ণ। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়েন।

শিবানন্দজী প্রশ্ন করিলেন, "কি চাই ?" মহিলা ভক্তটি করজোড়ে কহিলেন, "মুক্তি।"

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "আচ্ছা তা হবে। আমি ঠাকুরকে বলব।" প্রত্যয় ও করুণার দীপ্তিতে তাঁহার আননখানি তখন সমুজ্জ্বল।

এই সময়ে এক উপদেশ-প্রার্থী ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিতেছিলেন, "ঠাকুরের নামই তো শুনছি, তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য তো আমাদের হল না, মহারাজ !"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "সে কি কথা ? যাঁরা ভগবানের পুত্রকে দেখেছে, তারা যে ভগবান্‌কেও দেখেছে ! আমি আর আমার পিতা যে একই।" এই তেজোদৃপ্ত বাণী শুনিয়া সকলে নির্নিমেষে সম্ভ্রমভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বহুদিন আগের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, রাখাল, তারক প্রভৃতিকে বলিতেছিলেন, "ছাখ্, কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।"

তারক বলিয়া উঠিলেন, "আমি কিন্তু ওসব পারবো না।"

ঠাকুর তখন উত্তর দিয়াছিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে। তুই এখন অত ভাবিস্ কেন ?"

সেই ঐশী ইচ্ছা এইবার বুঝি রূপায়িত হইতে থাকে। এতদিন শিবানন্দ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। মুমুক্ষু ভক্তেরা কত কাঁদাকাটি করিয়াছে, প্রবীণ গুরুভ্রাতারা বার বার অনুরোধ উপরোধ করিয়াছেন, তিনি সে সব কানে তোলেন নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা পরিভ্রমণের কালে, দীক্ষাদান সম্পর্কে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়, সম্মত হন মুমুক্ষুদের সাহায্য দানে।

ঢাকা শহর ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক ভক্ত স্বামী শিবানন্দের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান দীক্ষার জন্য। শিবানন্দজীর মন এবার নরম হয় এবং কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান

তাঁহার নির্দ্দেশের জন্য। এ নির্দ্দেশ তিনি লাভ করেন, এবং মঠ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আদেশপ্রার্থী হইয়া তিনি এক পত্র লিখেন।

ব্রহ্মানন্দজী উল্লসিত হইয়া উত্তর দেন, "খুব দিন, প্রাণ খুলে দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাঁদের জীবন তো ধন্য হয়ে যাবে।"

শিবানন্দ মহারাজ এই সময়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ঢাকাতে আমি প্রায় দেড়মাস ছিলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার নাম পাইয়াছে। সে সময় ঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভিতরও একটি ভাব আসিয়াছিল।"

মঠের নবীন ব্রহ্মচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া শিবানন্দজী উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন,[১] "খুব ডেকে যাও, খুব তাঁর নাম ক'রে যাও। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পড়ে থাক —যখন যা দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। পবিত্র হৃদয়ে ভগবান্ শীঘ্র প্রকটিত হন, কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার চেষ্টা করো। এখন তো তোমাদের ছাত্র জীবন। ছাত্র জীবন বড়ই পবিত্র। ঠাকুর পবিত্রহৃদয় ও বিষয়-বাসনাহীন ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। যার মনে বিষয়ের দাগ লাগেনি তার শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য হবে। আর দরকার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেমন বললাম, সরল প্রাণে সব বিশ্বাস ক'রে নিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে সাধনায় লেগে যাও। দেখবে তাঁর দয়া হবে খুব আনন্দ পাবে। আসল কথা কাজ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন—'খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো নেশা হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে—পরিশ্রম ক'রে ঘুঁটতে হবে, সিদ্ধি খেতে হবে—তবেই নেশা হবে।' তেমনি ভগবানের নাম করো, তাঁর ধ্যান করো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো—আন্তরিক ভাবে, তবেই আনন্দ পাবে।"

সে-বার একটি মহিলা ভক্ত মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করেন,

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন।

বাবা, আমাদের কি ক'রে উদ্ধার হবে? কি ক'রে এ মায়া থেকে মুক্ত হব? আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।"

তিনি এ কথার উত্তরে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ছাখো, আসল কথাটা কি জানো, এ সংসার যে অনিত্য, এ বোধ তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ছাড়া এ-মায়া-জাল কাটাবার অন্য কোন উপায় তো নেই মা! শ্রীভগবান্ নিজেই গীতাতে বলেছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত ক'রে রেখেছে, তা বাস্তবিকই দুস্তরা, এ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু যারা অনন্য মনে আমায় ভজনা করে, তারা এই দৈবী মায়া অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।'

"অনন্য মনে তাঁকে ডাকা ছাড়া আর তো জীবনে কোন উপায় নেই। তোমরা সংসারে রয়েছ, নানা কাজকর্ম্ম আছে। তোমাদের তো সাধনভজন করবার মত সময় নেই। তোমরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক আর কাঁদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা করো, 'প্রভু দয়া করো, দয়া করো।' কাঁদতে কাঁদতে মনেব ময়লা ধুয়ে যাবে। তখন তিনি সহস্র সূর্য্যপ্রভায় প্রতিভাত হবেন। তখন দেখবে যে তিনি অন্তরেই রয়েছেন। খুব কাঁদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার করবে। একমাত্র ভগবান্ই সত্য, আর সংসার, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ সবই অনিত্য। এইরকম বিচার আব প্রার্থনা করতে করতে তবে তাঁর দয়া হবে: সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের দিকে যাবে।"

সাধারণভাবে মঠের ভক্ত সাধকেরা শিবানন্দ স্বামীর ধ্যান-পরায়ণ, গম্ভীর রূপটির সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবীন ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে গিয়া হাসি-তামাশাও তিনি কম করিতেন না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন:

"হাসি-তামাশার ভিতরেও একটা বিশেষত্ব দেখতুম, যদিও তিনি নানা রকম রঙ্গভঙ্গী ক'রে নিজে হাস্‌চেন বা অপরকে হাসাচ্ছেন, কিন্তু তা হলেও তাঁর মনটা আর একদিকে রয়েছে। মুখে তিনি এক বলছেন—মন কিন্তু আর এক দিকে। উনি সেটা এমনভাবে বলছেন যে তাতেও আর একটা বড় উচ্চভাব রয়েছে। আবার এই রঙ্গভঙ্গী করবার মুহূর্ত্তেক পরেই তিনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন পুরুষ হইয়া যাইতেন; তখন আর পূর্ব্বের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাউনি নাই, মুখের আর সে ভাবও নাই! সহসা এক গম্ভীর ধ্যাননিমগ্ন ব্যক্তির বিকাশ পাইল এবং যাহারা পূর্ব্বে তারকদার চাপল্যের কথা শুনিয়া হাস্য-কৌতুক করিতেছিল তাহারাও তারকদার এই আশ্চর্য্য ভাব পরিবর্ত্তনে স্তম্ভিত ও সংযত হইয়া যাইল।

"আজীবন কাল আমি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগৎ হইতে সব সময় যেন পৃথক বা বিচ্যুত রহিয়াছেন। এইটিই তাঁহার স্বাভাবিক ভাব ছিল। এই জন্যই বোধহয় জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাঁহাকে যতটা উচিত ততটা শ্রদ্ধা করে নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে যখন এই ভাবটি ঘনীভূত হইয়া বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল তখন তাঁহাকে সকলেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল। যাহা হউক তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কোন ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ধ্যানী ভাবটি তাঁহার প্রিয় ছিল—এই মাত্র। এইজন্য তিনি তাণ্ডবনৃত্যে বা অন্য প্রকার ভাবেতে ততটা মিশিতেন না, দূর হইতে সমস্ত দেখিতেন। তিনি ধ্যানী ছিলেন—কীর্ত্তনী ছিলেন না।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিতেছে কত ভক্ত, কত মুমুক্ষু। ইহাদের দেখিয়া শিবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই। এক সুশিক্ষিত মুসলমান ভক্ত ঠাকুরের নাম নিয়া সাধনা করেন, কৃপাও কিছু পাইয়াছেন। সপরিবারে শিবানন্দ মহারাজের

কাছে আসিয়া, সেদিন তিনি উপস্থিত। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিবানন্দ হর্ষভরে একদিন বলিয়াছিলেন :

'ভক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন, আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে এসেছেন। তাঁর কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম ক'রে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল ভাবে ভজনা করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপর ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা, তাঁর ইষ্টদেবই রামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি। বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম ক'রে বললেন—আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল 'ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা!' তোমায় কে বুঝবে বল? সেই শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের কথা মনে হল—

তব তত্ত্বং ন জানামি কাদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥

'—হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাতো আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপই হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।' বাস্তবিক ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ কথাই বলতে হয়। তাঁকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরও অনেক মুসলমান ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাডাপায়। খুব মানী লোক, গভর্নমেণ্ট খান খানবাহাদুর খেতাব দিয়েছে। ওঁরা স্যুফী সম্প্রদায়ের, কিন্তু ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি। ওখানে ঠাকুরের একটি ছোট আশ্রম আছে। ঐ খান বাহাদুর এবং স্থানীয় কালেক্টর—তিনিও মুসলমান—প্রভৃতি পাঁচজনে চেষ্টা ক'রে এ আশ্রমটি করেছিলেন।

আমরা তিন চারদিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে কি বিকেলে, সেই খান বাহাদুর ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে বসে আছেন খুব দীনহীন ভাবে, আর একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ধারণা যে, তাঁদের পয়গম্বর মহম্মদই এবার রামকৃষ্ণ-রূপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন। এমনি ক'রে কত ভাবে যে ঠাকুর কত লোককে কৃপা করেছেন, তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত সাধন-ভজন ও জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিবানন্দ মহারাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "ঠাকুরের কথাতেই তো আছে সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড়মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু সারাটি মন পড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ীর দিকে। তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই সেবাযত্ন করবে; কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানবে যে, তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান্। তিনি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। তা বলে স্ত্রীপুত্রদের অবহেলা করবে না। তাদের ভগবানের প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাশক্তি সেবা করবে। তাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ করবে।

"সংসারে থাকবে; কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে। আর ঠাকুর বলতেন—'বিচার করা খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাতে ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।' খুব বেশী সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান পেতে দিও না। সাধারণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো ক'রে নিয়েছ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে; মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে—কামকাঞ্চন ও মানযশের দিকে। সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লীন করতে হবে। জীবনে মানুষের সব

চাইতে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ভগবান্ লাভ। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মনে সর্বক্ষণ ধরে রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌঁছতে পারো তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।"

তরুণ সাধকদের পক্ষে মনকে শান্ত করিয়া গুটাইয়া আনা, ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া একটা বড় সমস্যা। এ সম্পর্কে তাঁহাদের উৎসাহ দিয়া বলিতেন, "এজন্য মোটেই ভেবো না। অশান্ত মনকেও ক্রমে শান্ত করে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করা যেতে পারে। ধ্যান জপ করতে আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান শুরু করো না। প্রথমটায় ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে। ঠাকুর হলেন জীবন্ত সমাধিস্বরূপ, তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ক'রে তাঁকে চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে। বলবে—'প্রভু, আমার মন স্থির ক'রে দাও।' এই ভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে ঠাকুরের সমাধির কথা ভাব্‌বে। তাঁর যে ছবি দেখছো, এ ছবি খুব উচ্চ সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও। মন হল তোমার, তুমি মন হতে স্বতন্ত্র আত্মস্বরূপ। ধীরভাবে দ্রষ্টার মত বসে মনের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে যাবে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন আপনা হতেই শান্ত হয়ে পড়বে। তখন মনকে ধরে এনে ধ্যানে লাগাবে। যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধরে নিয়ে আসবে। এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে। কিছু দিন ঠিক যেমন ক'রে বল্লুম তেমনি ক'রে যাও দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে। তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য নিয়মিতভাবে এটি ক'রে যেতে হবে।"

"ভগবান্ লাভের ব্যাকুলতা একদিনে আসে না এবং তাঁর কৃপা ছাড়াও হয় না। সেজন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়—আর কেঁদে কেঁদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়—'প্রভু, দয়া করো, আমি সাধারণ মানুষ। তুমি দয়া ক'রে দর্শন না দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার

দর্শন পাই! কৃপা করো প্রভু। এই দুর্বলকে কৃপা করো'—এভাবে নিত্য প্রার্থনা করবে। যত তাঁর জন্য কাঁদবে তত মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। তোমরা সাধু হয়েছ, তার নাম ক'রে ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ—তাঁর উপর তো তোমাদের দাবী আছে। ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে তাঁর উপর জোর করবে। দয়া করবেন বলেই তো তিনি তোমাদের মা বাপের কোল থেকে টেনে এনেছেন এবং তাঁর আশ্রয়ে তাঁর সঙ্ঘে স্থান দিয়েছেন।

"পড়ে থাক, বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাকো তাঁর দুয়ারে। পওহারী বাবা যেমন স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'গুরুকে দুয়ারমে কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো।' স্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার বলেছিলেন। কুকুর যেমন কখনও প্রভুর বাড়ী ত্যাগ করে না, তাকে খেতে দাও আর নাই দাও, মারো আর যাই করো, সে যেমন কখনও প্রভুর বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না, তেমনি আমাদেরও প্রভুর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে, তাঁর শরণাগত হয়ে, পড়ে থাকতে হবে। ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে হোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তেতো খেয়ে হোক, যো-সো ক'রে যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে তার হয়ে যাবে।

"তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে রয়েছ, তাঁর সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ, তোমাদের আর ভাবনা কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বাপ যে ছেলের হাত ধরেছেন, সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না।' তেমনি যতদিন এ সঙ্ঘে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে—ততদিন কোন ভয় নেই, তিনি ঠিক তোমাদের উদ্ধার করবেন—নিশ্চয় জেনো।"

ভগবৎ-দর্শন ও পরম শান্তি লাভ সম্বন্ধে এক তরুণ মুমুক্ষু প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উত্তরে শিবানন্দজী প্রশান্ত স্বরে বলিলেন:

"ছাখো বাবা, শান্তি লাভ করা অত সোজা কথা নয়। এ রাস্তা খুবই কঠিন—খুব কণ্টকাকীর্ণ—

'ক্ষুরস্য-ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥'

—ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ্ণ ও দুরতিক্রমণীয়, তত্ত্বদর্শীরা সেই আত্মসাক্ষাৎকারের পথকে সেইরূপ দুর্গম ব'লে থাকেন। এসব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কথা। এ বড় দুর্গম পথ। বাইরে থেকে যত সোজা বলে মনে হয়, ততটা সোজা নয়—অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে যদি তাঁকে চাওয়া যায়--তবে তাঁর কৃপা হয়, এও সত্যি। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো, তাঁকেই কত কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল। তবে তো মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সবই লোকশিক্ষার জন্য করেছেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। "ভগবানের উপর অনুরাগ না এলে কিছুই হবে না। আন্তরিক টান চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান্ লাভ হয়—সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর টান। এই তিনটান এক হলে যতটা ব্যাকুলতা জন্মায়, সেই পরিমাণ ব্যাকুলতা যদি কারু প্রাণে আসে তবেই তার ভগবান্ ও শান্তি লাভ হয়।"

এক ব্রহ্মচারী সেদিন তাঁহার কাছে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর তো বলেছেন, সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখতে নেই, কিন্তু আমাদের তো নানা কাজকর্মে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পয্যন্ত বলতে হয়। এসব অবস্থার ভেতর আমাদের কিভাবে থাকতে হবে?"

মহাপুরুষ কিছুটা মৌন থাকিয়া বলেন, "ত্যাখো. বাবা, বাড়ীতে যখন ছিলে তখন মা বোন ছিল তো? মা, বোনদের সঙ্গে যেমন সরল প্রাণে মেলামেশা করতে, ঠিক সেই রকম মন নিয়ে এখানে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথাবার্ত্তা বলবে। মনে মনে ভাববে যে তারা তোমার মা, বোন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি ভক্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা না বলাই ভাল--বিশেষ ক'রে আলাদাভাবে। পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। তোমরা সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে। নারী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশ ব'লে জ্ঞান করবে। এই হল সাধনা।"

"কিন্তু তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো কি ক'রব মহারাজ ?"

মহাপুরুষজী তদুত্তরে একটু দৃঢ়স্বরে বল্লেন,—"যেখানে সেখানে মেয়েমানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তারা সাধু হবার তো উপযুক্ত নয়ই এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত হয়নি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে স্ত্রীলোকের কোন সংস্রব নেই এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে জীবন যাপন ক'রে মনের ঐ সকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস ক'রে তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে।"

জপের কার্য্যকারিতার উপর শিবানন্দ মহারাজ সব সময়েই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "প্রীতির সঙ্গে বার বার নাম করাই জপ। তাই করবে, করতে করতে আনন্দ পাবে। জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই—সব সময় চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলতে পারে। আসল জিনিস হল—প্রেম। যত প্রেমভরে তাঁর নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে। তিনি যে অন্তর্য্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে—সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রত্যক্ষ করবে। বালক যেমন মা-বাপের কাছে আব্দার ক'রে কাঁদে, ঠিক তেমনি ক'রে তাঁর কাছে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয় পাবে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, পতিত পাবন, কলিকল্মষহারী, পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল ও প্রেমময়। খুব তাঁর নাম ক'রে যাও। সব সময় তো যতটা পার জপ করবেই ; কিন্তু বিশেষ ক'রে সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম ক'রে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, একই স্থানে বসে জপধ্যান করা খুব দরকার। তাই করো।"

এ সম্পর্কে আর একদিন আরো বিশদ করিয়া কহিলেন, "জপ তিন রকমে করা যেতে পারে। মালাতে হাতের করে বা মনে মনে। মনে মনে জপ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন, 'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, মন জপে তো বলিহারি যাই।' মনে মনে জপ করার অভ্যাস করলে চলতে ফিরতে, খেতে শুতে সব সময়ই জপ

করা যেতে পারে। কিছুকাল ঐভাবে মানস জপের অভ্যাস করলে তখন এমনি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে একটা আনন্দের ধারা বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্যা রেখে জপ করা ভাল; এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত দুবার ক'রে আসনে বসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করবে, আর এক একবারে হাজারের যেন কম না হয়—তার বেশী যত পারা যায় ততই ভাল। সংখ্যা করেও রাখা চলে বা মালায়ও রাখা যায়।

"ঠাকুর বলতেন, 'নাম নামী অভেদ' ইষ্টমন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্ত্তিও চিন্তা করবেন। এই ভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে পারে। ভগবান্ অন্তর্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ঠিক ঠিক আন্তরিকভাবে একবারও যদি ভগবানের নাম নেওয়া যায়, তাতে উড়ো-উড়ো মন নিয়ে লক্ষ জপের চাইতেও বেশী ফল হবে। চাই ইষ্ট চিন্তার তীব্রতা, চাই ব্যাকুলতা আর চাই আন্তরিকতা। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে শীঘ্রই হয়ে যাবে। এসব একদিনে হয় না—রোক ক'রে লেগে পড়ে থাকতে হয়, ক্রমে সব হয়।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় সতের বৎসর স্বামী শিবানন্দ বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও মিশনের দায়িত্ব-পূর্ণ পরিচালনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিপূর্ব্বে বার বার তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—তপস্যায় নিমগ্ন না থাকিয়া তিনি যেন মঠ ও মিশনের কল্যাণকর্ম্মে আগাইয়া আসেন। কিন্তু ধ্যানী সাধক শিবানন্দকে তখন এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী হইতে দেখা যায় নাই। কাশী অদ্বৈত আশ্রমের সংগঠনে, মিশনের বিভিন্ন ত্রাণ কর্ম্মে, রামকৃষ্ণ বাণীর প্রচারে মাঝে মাঝে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, ঠিকই, কিন্তু একটানা ভাবে মঠ ও মিশনের পরিচালনাকে কিছুটা এড়াইয়া গিয়াছেন। এবার তাঁহার পূর্ব্বতন মানসিকতায় পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ মহারাজের জীবনীকার স্বামী অপূর্ব্বানন্দ লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষজীর জীবনের যেন একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল ; যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল অনেক সময়েই প্রব্রজ্যা ও নির্জনবাসে কাটাইয়াছিলেন—কোন প্রকার গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, এইবার তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশে ঠাকুরের কাজে ষোল-আনা আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন হইতে দীর্ঘ সতের বৎসর কাল তিনি তীর্থভ্রমণ বা নির্জনবাস ভুলিয়া গিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর দ্বারে বেলুড় মঠে পড়িয়া রহিলেন, ঠাকুরের কাথ্য উপলক্ষ ছাড়া তিনি আর কোথাও যান নাই। অনেক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজী শিবানন্দকে একদিন সপ্রেমে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—'তারকদা, আপনাকে তপস্যায় যেতে দেব না।' কিন্তু শিবানন্দের মনের অবস্থা এমনই ছিল যে, তিনি স্বামীজীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।" এবার মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটিল কর্ম্মযোগের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাস। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর মুকুটমণি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। প্রিয় গুরুভ্রাতার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় শিবানন্দ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। ধ্যানাসনে বসিয়া মুমূর্ষু ব্রহ্মানন্দের রোগমুক্তির জন্য ঠাকুরের নিকট এই সময়ে তিনি প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। রাত্রিতে তিনি তিনবার বিদেহী রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। আর প্রতিবারই প্রার্থনার উত্তরে দেখা যায় ঠাকুরের মৌন ও গম্ভীর মুখ, প্রতিবারই তিনি প্রার্থনায় কোন সাড়া না দিয়া অন্তর্দ্ধান হন। বুঝা গেল, ব্রহ্মানন্দ আর নরদেহে থাকিবেন না। প্রভাতে উঠিয়া শিবানন্দ সেবক-ব্রহ্মচারীকে এ কথাটি হতাশ প্রাণে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ইহার পরই নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।[১]

স্বামী শিবানন্দ এইবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন। অভিমানশূন্য মহাপুরুষ মঠ ও মিশনের ভার নিতে

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী : অপূর্ব্বানন্দ

গিয়া ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তো তাঁর (ব্রহ্মানন্দ মহারাজের) চাকর। তাঁর পাদুকা মাথায় ক'রে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করেছিলেন, আমিও তেমনই মহারাজের পাদুকা মাথায় ক'রে তাঁর কাজ চালাচ্ছি—তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি।"

এই সেবক-বুদ্ধি নিয়াই রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতা, মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শিবানন্দ স্বামী তাঁহার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ বার বৎসর কাল বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

শিবানন্দজীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল সঙ্ঘের ভাবী কর্ম্মীদের সাধনপথের মূল্যবান পাথেয়।

'মিশনের কর্ম্ম বড়—না ধ্যানজপ বড়', এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, "ধ্যান জপের প্রাধান্য অতীতে ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজের কথা বলছো? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর সত্যকার আদর্শ অনুযায়ী কাজ তো কখনও করা যেতে পারে না। ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ওয়ারসিপ—কর্ম্ম ও উপাসনা, এক সঙ্গে চালাতে হবে।"

তাছাড়া, বার বার তরুণ কর্ম্মীদের মর্ম্মে এই কথাটিও তিনি প্রবেশ করাইয়া দিতেন, "সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আনুগত্য।"

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্ম-পরিধি এ সময়ে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে বহু নূতন নূতন স্থানে বিস্তারিত হইতেছে মঠ ও কর্ম্মকেন্দ্র। তাই এই অধ্যাত্মগোষ্ঠীর সংহতির উপর শিবানন্দ এত গুরুত্ব দিতেন।

ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দের এই সময়কার মূর্ত্তিটি ছিল পরম প্রেমময়, পরম কারুণিক। আশ্রিতের সামান্য একটু প্রার্থনায়, আর্ত্তের দৈন্য-ময় সংবেদনে হৃদয় তাঁহার ভাবাবেগে আকুল হইয়া উঠিত, গলিয়া ঝরিয়া পড়িত। কেহ কেহ ভাবিতেন, এই কোমলকান্ত মহাপুরুষ কি মঠ ও মিশন পরিচালনার ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করিতে পারিবেন? দৃঢ়

মুষ্টিতে হাল ধরিতে পারিবেন? মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মনেও এই চিন্তাটি দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন: "সেই সময় তাঁর কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন স্নেহপূর্ণ, এমন নম্র, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সকলের কাছেই নম্র, সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই ঋজু। কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো।

"মহাপুরুষ শিবানন্দের এইরূপ ঋজু ভাব দেখিয়া প্রথমটা আমি একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে হইল, তিনি এইরূপ হইয়া যাইলে মিশনেব সমস্ত কাজকর্ম্ম কি করিয়া করিবেন। কারণ, সাধারণের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি তেজা ও দাপট করিতে পারে, সেই বড় কর্ম্মী হয়। এইজন্য, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং এইজন্যই আমি মহাপুরুষ শিবানন্দেব এই অতীব ঋজু ভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। দু' তিনদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুরুষ শিবানন্দ একটা নূতন পথ বাহির করিলেন—নম্রভাব, ঋজুভাব, এবং ভালবাসা দিয়াও প্রভূত কার্য্য করা যাইতে পাবে। পূর্ব্ব ভাব একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ যেন এক নূতন ভাবের মানুষ হইলেন।

"পববর্ত্তী কয়েক বৎসর তিনি যে অসীম ভালবাসা ও শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। ইহাকেই বলে অহৈতুকী ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—প্রতিদানের কোনই প্রত্যাশা নাই। মোট কথা, এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় হইতে একটা ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণের উৎস উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহা অযাচিতভাবে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।"

কিছুদিন পরে শিবানন্দ স্বামী এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জের মঠে গিয়া অবস্থান করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তখন এখানে উপস্থিত। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লিখিয়াছেন:

"মুঠিগঞ্জের মঠে দেখিলাম—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মানী, কি সামান্য লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে সকলেই সমান ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এমন একটা লোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এইসব পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসার পাত্র। কোনও প্রকার সামাজিক ব্যবধান বোধ বা অন্য কোন প্রকার পার্থক্যের ভাবও সেই সময়টা কাহারও মনে ছিল না, কোনও প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উঁচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল না; কিন্তু সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে যাঁহার পরিধি ও উন্নতত্ত্বের কিছুই পরিমাণ করা যায় না। অথচ তিনি পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতন। 'অনো-রণীয়ান মহতো মহীয়ান্'—অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও তিনি বড়। আমি দিনের পর দিন তাঁহাকে দেখিতাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতাম, 'এখন হইতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত শক্তি বিকাশ করিবেন এবং ঋজুতা ও মিষ্ট ভাষা দিয়া তাহা জগৎকে বিতরণ করিয়া যাইবেন।' এই সময়টাকেই তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তির বহির্বিকাশের কাল বলা যাইতে পারে।

"...দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের ভিতর হইতে এক প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা উঠিতেছে—তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চর্ম্ম দগ্ধ করে না। সেই অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ স্নিগ্ধ, স্থির ও মাধুর্য্যপূর্ণ। ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণ জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল।"

মহাপুরুষ শিবানন্দের কৃপাভাণ্ডার এবার যেন সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রকৃত সাত্ত্বিক আধার নিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের ভাব নিয়া, যাহারা আসেন, ধন্য হন তাঁহার দীক্ষার দাক্ষিণ্যে। সে-বার সুদূর সিন্ধুপ্রদেশ হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে

স্বপ্নে তিনি এক মন্ত্র লাভ করেন। ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া শিবানন্দ স্বামীর নিকট পত্র লিখেন, তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া প্রার্থনা করেন দীক্ষা ও সাধন নির্দ্দেশ।

কিছুদিন পরে মহাপুরুষের সম্মতি পাইয়া ভক্তটি বেলুড়ে চলিয়া আসেন। এবার মনোবাসনা তাঁহার পূর্ণ হয়, ধন্য হন স্বামী শিবানন্দের কৃপা লাভে।

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুরুষজীর নির্দ্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন। ভক্তটি ঠাকুরঘর হতে এসে খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, তাঁর চরণতলে উপবেশন করে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন—"আপনার দয়ায় আমি শান্তিলাভ করেছি। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আপনার মুখ থেকে সেই স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রই পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখে-ছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমায় যিনি কৃপা করেছিলেন তিনি আপনিই।"

এই সিন্ধী ভক্তটির দীক্ষাদানের পর এক অপূর্ব্ব দিব্য ভাবে শিবানন্দ মহারাজ আবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ব্রহ্মচারী এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন, "আহা, লোকটি খুবই ভক্তিমান্! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে ; তা না হলে অত ভক্তি হয় না! কার কেমন আধার, দীক্ষা দেবার সময় বেশ বুঝতে পারা যায়। যাদের আধার খুব ভালো তারা মন্ত্র পাওয়া মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে—অশ্রু, পুলক, কম্পন এইসব হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোনা মাত্রই সর্ব্বাঙ্গে কম্পন ও একটু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। আর কী প্রেমাশ্রু! দু চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

দিয়ে খুবই আনন্দ হয়—মন্ত্র দেওয়া সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্‌পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়া মাত্র উহা যেন সযত্নে আঁকড়ে ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথা। আহা! তিনি কতভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। দেশ-বিদেশের কত লোক যে তাঁর কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধন্য প্রভু!"

সেবক ভক্তটি সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো এতটা উদ্দীপনা হয় না। যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি কোন কল্যাণ হবে না?"

"তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। সিদ্ধগুরুর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্যের মনকে তৈরী ক'রে নিতে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ; বিশেষ ক'রে সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞগুরুর ভেতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। ঠাকুর বলতেন—সদ্‌গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। আর গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, শিষ্য মুক্ত হয় না।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এক ভক্ত সেদিন মঠে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আধার প্রস্তুত হলেই তুমি দীক্ষা পাবে।" কিন্তু তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় আর ইহা সম্ভব হয় নাই। সকাতরে ভক্তটি আরও কহিলেন, "ঠাকুরের কাছে আমি খুবই কাতর প্রার্থনা করছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজ তিনদিন হল স্বপ্নে মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্রও দিয়েছিলেন; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর স্মরণ করতে পারিনি। খুব চেষ্টা করেছি—কিন্তু কিছুতেই হল না। সেই থেকে মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভক্ত মাত্রেই স্বামী শিবানন্দের অতি আপন জন। তাহাদের জন্য শিবানন্দের কৃপার দুয়ার সদা উন্মুক্ত। এই ব্যাকুল ভক্তটিকে নানা কথায় তিনি শান্ত করিতে লাগিলেন।

"ভক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাস বাণীতে শান্ত না হয়ে মন্ত্র দেবার জন্য তাঁরই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। অগত্যা কতকটা যেন রাজী হয়ে, ভক্তটিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে, তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। (তখনও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির নির্ম্মিত হয়নি। মহারাজ মঠে যে ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ছিল এবং নিত্য পূজা হত।) প্রায় আধঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তটিকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। খানিক পরে মহাপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে রইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন—'আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। স্বপ্নে মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই আমায় বলে দিলেন। এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে। তিনি আপনার ভিতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেয়েছি। এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ জীবনে ইষ্ট দর্শন হয়।'

"মহাপুরুষজী কহিলেন, যে মন্ত্র পেয়েছেন নিয়মিতভাবে জপ করে যান। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন—প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মে মন যাতে লীন হয়, তাই ক'রে দাও।' তিনি তাই করবেন—নিশ্চয় জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা এবং জীবের সর্ব্বস্ব। সংসারে যাদের আমার আমার বলে লোক কাঁদছে তারা সব দু'দিনের, চিরস্থায়ী একমাত্র তিনিই। আপনি একমনে খুব নাম-জপ ক'রে যান; দেখবেন ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে

করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ স্থায়ী হলে তাও একরকমের ধ্যান। ধ্যানের বহুপ্রকার আছে। খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন; আর ভাববেন যে, তাঁর শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে আপনার হৃদয় কন্দর আলোকিত হয়ে গেছে। এইরকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব্ব আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে। ক্রমে ক্রমে মূর্ত্তিও লয় হয়ে যাবে এবং কেবল চৈতন্যময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে। এও এক-প্রকারের ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে—পরে পরে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন।

আসল কথা হল আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকা। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে। আপনার কখন কি প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাঁকে কিভাবে ডাকতে হবে, সেসব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন, ঠাকুরের কথায় পড়েছেন তো? তিনি বলতেন—'কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে সাধন-ভজন করা। তিনি সদাই কৃপা করবার জন্য বসে আছেন—যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকেন, তেমনি। একটু ক'রে দেখুন—তবেই তাঁর কত কৃপা তা অনুভব করতে পারবেন[১]।"

কথা প্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সেদিন পাশ্চাত্য দেশের ধন-ঐশ্বর্য্য, জীবনযাত্রার উচ্চমান ও ঐহিক সুখের কথা উঠিল। শিবানন্দ মহারাজ কহিলেন,—"ওসব সুখ তো ক্ষণিক সুখ। ওতে আছে কি? ওরা ভগবৎ-আনন্দের আস্বাদ কখনও পায়নি বলে ঐ ক্ষণিক আনন্দে মত্ত হয়ে আছে। বাবা, সে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই। তা স্বর্গেই থাক, আর যেখানেই থাক—বিদ্বান্‌ই হও, আর যাই হও;

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন।

কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই। এ ভগবানের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদও বলেছে—

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি…'

"আসল সুখ রয়েছে সেই ভূমা বস্তুতে। তাই জানতে হবে। বিজ্ঞান সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারেনি। বিজ্ঞান নাড়াচাড়া করছে জড় বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে করতে ভোগস্পৃহা দিন দিনই বাড়তে থাকে। তাতে তৃপ্তি কোথায়? তাতে শান্তি কোথায়? ভোগের ভেতরই তো অশান্তির বীজ।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥'

"পরে জীবনে শান্তিলাভ প্রসঙ্গে বললেন—"অনাত্ম বস্তুতে শান্তি নেই। আত্মজ্ঞান লাভেই প্রকৃত শান্তি। আর সেই শান্তির সন্ধানও করতে হবে ভিতরে। শান্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম সব ভেতরে। সাধন-ভজন করো, ভগবান্‌কে ডাক। বাবা, শান্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয়।"

সে-বার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু এক ভক্ত শিবানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুর কি নিজে দীক্ষা দিতেন?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, দিতেন—তবে খুব কম। তা-ছাড়া, তাঁর দীক্ষা তো সাধারণ দীক্ষার মত কান-ফোঁকা দীক্ষা নয়। তিনি কাউকে স্পর্শ করে চৈতন্য করে দিতেন, বা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা কারো মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন। তিনি হলেন জগদ্‌গুরু। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। 'জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে, আর মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে।' তিনি ভক্তদের অন্তরে ঐশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত ক'রে দিতেন, আর অধিকারভেদে সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন করাতেন। একঘেয়েমি তাঁর ছিল না। যে যে মার্গেই সাধনা করুন না কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন।"

মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্পর্কে, আর্তের রোগ-

মুক্তি ঘটানো সম্পর্কে এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিবানন্দ স্বামী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "শারীরিক ব্যাধি দূর করা স্পর্শমাত্র—এ আর কি বেশী অলৌকিক ? এসব তো সহজ ব্যাপার। ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন—স্পর্শমাত্র মানুষকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন! জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি একমুহূর্তে ক্ষীণ ক'রে দিয়ে মানুষের সমগ্র মনের গতি ভগবৎ-মুখী ক'রে দেওয়া—এ হল সব চেয়ে বড় সিদ্ধাই।……উঃ। কি কাণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি! সে সব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন, মনের আড়বাঁক সব ইচ্ছামাত্র সোজা ক'রে দিতেন। তাঁর স্পর্শমাত্র মনের সব ব্যাধি আরাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর! বাহির থেকে দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত, কিন্তু তাঁর দেহ আশ্রয় ক'রে লীলা করতেন সর্ব-শক্তিমান্ ভগবান্।"

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠিলেই মহাপুরুষের সর্ব্ব সত্তায় দিব্য আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিত, ঠাকুরের লীলাকথায়, মাহাত্ম্য প্রচারে, এই সদা অন্তর্লীন সাধক মুখর হইয়া উঠিতেন। কহিতেন, "যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে তার মুক্তি অনিবার্য্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প তোমরা শোননি ? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা ক'রে বলেছিল—'বাবা, আমায় কৃপা করলে না ? আমার গতি কি হবে ?' তখন ঠাকুর বলেছিলেন 'ভয় নেই, তোর হবে ; মৃত্যু সময় আমায় দেখতে পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলে উঠল—'এই যে বাবা এসেছ—বাবা এসেছ—!' এই বলতে বলতে মারা গেল।

"ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের।

বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য্য রকমের। তার তো খুবই কঠিন অসুখ; সকলেই মহা চিন্তিত। দেহত্যাগের দু'তিন দিন আগে থেকেই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আসতে দিতেন না। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদের কেবল দেখতে চাইতেন। আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ করার একদিন আগেই ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরামবাবুব স্ত্রী শোকে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবুব স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে। পরে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাতে একখানি দিব্য রথ।' ক্রমে ঐ রথ বলরাম মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর ঐ রথ থেকে নেমে এসে বলবামবাবু যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ঢুকলেন। খানিক পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন। তখন সেই রথ উর্দ্ধে উঠে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বলরামবাবুর প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল। এমন সব কত অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে; ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে যাচ্ছে। ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে নিশ্চয়।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণতলে ভেট স্বরূপ কিছু টাকা রাখিয়া ছিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, "টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তো কোন দরকার নেই—আমরা বাবা সাধু মানুষ; টাকা দিয়ে কি করবো? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া করে 'দো রোটি' দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন—

'প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটি এক লঙ্গেটী তেরে পাস্ মৈ পায়া।

ভকতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাওয়া ॥
প্রভু মৈ গোলাম তেরা ॥'

—তা তিনি দয়া ক'রে দো রোটি তো দিচ্ছেনই, আর কি হবে টাকা-কড়িতে? নিয়ে যাও বাবা ঐ টাকা। তোমরা গৃহস্থ; তোমাদেরই টাকার দরকার।"

ভক্তটি কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বার বার পীড়াপীড়ি করাতে শিবানন্দজী সেবককে নির্দ্দেশ দিলেন, ঐ টাকা যেন ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়া দেওয়া হয়।

মঠের নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা একে একে শিবানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিতেছেন। প্রাণে তাঁহার অপার আনন্দ, নয়ন দু'টি দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল। প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ত্যাখো বাবা, নামরূপ এ সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য—দুদিনের; এসব কিছুই নয়। নাম রূপের পারে যেতে হবে; সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে। আত্মবস্তু লাভ করতে হবে। সন্ন্যাসের অর্থ তো তাই। বিরজা-হোম করে শিখাসূত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পরা ও সন্ন্যাসী হওয়া তো সহজ। সে তো প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করো। যাও বাবা, এখন খুব ধ্যান লাগাও। আত্মবস্তু অনুভব করো। তবেই ঠাকুরের সঙ্ঘে আসা, সন্ন্যাস নেওয়া, এ সব সার্থক হবে। আমার কথা শুনতে চাও তো এই।"

সাধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি, একথার উত্তরে একদিন তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "সাধু উঠবে খুব সকালে। রাত তিন চারটার পর আর ঘুমুবে না। সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার পর আর কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল সকাল স্নান করবে। স্নান ক'রে ধ্যান ধারণাদি করবে। স্নান ক'রেই খাবে না। স্নান ক'রে ধ্যানভজন না ক'রে খাওয়া, সে তো অন্যান্য লোকেরা করে, সাধু তা করবে না। সাধুর চেহারা কথাবার্ত্তা সবই অন্যরূপ হবে, সরল সুন্দর দেবোপম। সাধুর টাকা কেন থাক্‌বে?

সাধু একদম নির্ভরশীল হবে—ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। ত্যাগের পথে যারা থাকবে তাদের পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয়। সাধু রাত্রে বেশী খাবে না। ঠাকুর বলতেন—রাত্রের খাওয়া হবে জলখাবার মত। সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচর্চ্চা করবে। সাধুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সাধু মিষ্টভাষী, ধীরস্থির হবে, ভদ্র ব্যবহার করবে। সাধু সর্ব্বদাই কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাৎ থাকবে। কামিনীকাঞ্চনের কোন সংসর্গ রাখবে না।"

এক নবীন সন্ন্যাসী শিবানন্দজীকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেন,[১] "মহারাজ, সন্ন্যাসজীবনে কি কি নিয়ম পালন ক'রে চলতে হবে? পরমহংস উপনিষদে এবং নারায়ণ উপনিষদে সন্ন্যাসীর পক্ষে যে সব নিয়মের বিধি আছে সে সব তো আমাদের এই কাজকর্ম্মের ভিতর অনেক সময় মেনে চলা সম্ভবপর নয়।" উত্তরে শিবানন্দ মহারাজ বলেন, "হ্যাঁ, সন্ন্যাসীর পক্ষে অনেক সব নিয়ম আছে, কিন্তু সে সব নিয়ম তোমাদের মানতে হবে না। ও তোমাদের জন্য নয়। তোমরা হলে কর্মযোগী সন্ন্যাসী। তোমাদের জন্য স্বামীজী নূতন আদেশ রেখে গেছেন। তোমাদের সাধনভজন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে অনাসক্ত হয়ে সাধনভজনের অনুকূল কর্ম্ম। কাজেই তোমাদের পক্ষে ঐ সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা সম্ভবপর নয়। সেসব নিয়ম হল কেবল জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীদের জন্য—যাঁরা কোন কাজকর্ম্ম করেন না, কেবল জ্ঞান বিচার করেন, তাঁদের জন্য। তবে কি জানো বাবা, মূল জিনিস ক'টা ঠিক রাখতে পারলে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যায়।

"মূল জিনিসটি কি, মহারাজ?"

"মূল জিনিস হ'ল খালি বাহ্যিক ত্যাগ নয়, কামকাঞ্চনাসক্তিও ত্যাগ করতে হবে। ঐ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি, ঐ সমস্ত এষণার মূলেই হল কাম ও কাঞ্চন এই দুটো

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন

জিনিস। কামকাঞ্চন ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে—এই হ'ল সন্ন্যাসীর একমাত্র বিশেষ ক'রে মানবার জিনিস। ঠিক ঠিক শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে তাঁর কাছে। তিনি তো ভগবান্, তিনিই কৃপা ক'রে সব জানিয়ে দেবেন, সব বুঝিয়ে দেবেন।

"কিন্তু মহারাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহরক্ষার জন্যে কিছু কিছু এষণা তো রাখতেই হবে?"

"হ্যাঁ, সে ঠিক। তা শাস্ত্রেও তেমন বিধি রয়েছে—। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই রয়েছে, 'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি'—'ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হয়ে পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হয়ে, অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন ক'রে থাকেন।' শরীর ধারণমাত্রের জন্য যতটা দরকার ততটুকু মাত্র এষণা রাখতে হবে। ভিক্ষাদিও প্রয়োজন মত অতি সামান্য করবে। কিন্তু চব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় খেতে হবে বা আরামে থাকতে হবে, তেমন কথা কোথাও নেই। আর শরীর ধারণের উদ্দেশ্যও হবে তাঁকে প্রাণভরে ডাকা এবং তাঁর সেবাদি কাজ করা, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।"

মঠের সাধনরত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা আন্তরিকভাবে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত; তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইতে গিয়া ভাবাবেগে তিনিও উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। কহিতেন:

"তোমরা সর্ব্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবন-সর্ব্বস্ব করেছ; তোমাদের উপর আশীর্বাদ থাকবে না তো কার উপর থাকবে? কিন্তু তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপাবাতাস তো বইছেই; তুই পাল তুলে দে না।' ঐ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা। ঐকান্তিক অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই—বিশেষ ক'রে সৎ কাজের জন্য, সাধন ভজনের জন্য। আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে হবে। উদ্যম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া, কিছুই হবার জো নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি

আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা সাধু হয়েছ, বাপ মা, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছ কেন? না, ভগবান্ লাভ করবে বলে। আর পূর্ব্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ; বিশেষ ক'রে আমাদের কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকার সুযোগও ঠাকুর ক'রে দিয়েছেন। এত সব সুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মনে খুব জোর আনবে। তাঁর পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভব সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ; একটু জোরে ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এসব তো মহামায়ার বিভীষিকা। এ সব দেখিয়ে তিনি সাধকদের পরীক্ষা করেন, ওসবে এখন সাধকের মন বিচলিত না হয়; সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকে; তখন মহামায়া প্রসন্না হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড়নি? স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া মারের রূপে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন।"

মঠের এক দক্ষিণ-দেশীয় সন্ন্যাসী তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া শিবানন্দজীকে বলেন, "মহারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছে, শ্রীভগবান্‌কে আমি সর্ব্বভূতে দর্শন করবো। কিন্তু কবে এ আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ হবে, কৃপা ক'রে তা বলুন।"

ভাবের ঘরে কোন ফাঁকী মহাপুরুষ সহ্য করিতে পারিতেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কহিলেন, "বাবা, আগে ভগবান্‌কে নিজ হৃদয়ে দর্শন করতে হবে। অন্তরে তাঁর দর্শন না হলে বাইরে সর্ব্বভূতে তাঁকে দেখা কি ক'রে সম্ভব? আত্মানুভূতিতে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র তাঁর দর্শন হয়; তাই সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই অবস্থা লাভ হয়।"

সন্ন্যাসীটি করজোড়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ। সত্যকথা,

সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেম, নির্বিকার চিত্তে সব দুঃখ সহ্য করা, এসব নৈতিক গুণের পূর্ণতা নিয়ে সে অবস্থায় কি পৌছানো যায় না?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়। একথা ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করলেই যে ভগবদ্দর্শন হবে না। নিরন্তর তাঁর ধ্যান করতে করতে তিনি কৃপা ক'রে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন। চাই তাঁর ধ্যান—সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যো সো ক'রে একবার ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদা ক'রে নৈতিক চরিত্র গঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্‌বৃত্তি তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার ভয় নেই। আসল কথা কি জান বাবা? কৃপা, কৃপা। তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেই মানুষ তাঁর দর্শন পেতে পারে। ভজনসাধন এসব মনকে ভগবন্মুখী করার উপায় মাত্র।"

অতঃপর কিছুক্ষণ ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন যে, কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা? এই পাল তুলে দেওয়াই হল পুরুষকার—সাধনভজন। ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করার মত ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রতে হবে—ভজনসাধন দ্বারা। বাকী তাঁর কৃপা। নিরন্তর তাঁর স্মরণ মনন তাঁর ধ্যান করতে করতে মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়; আর ঐ শুদ্ধ মনে স্বতই ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়, ভগবৎকৃপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, সাধু হয়েছ, সব ছেড়ে ছুড়ে তাঁর আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান্ লাভ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের তো তাঁকে নিয়েই সব সময় থাকতে হবে। ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে জাগরণে, সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্‌কে নিয়েই বিলাস করবে। তাঁর বিষয় স্মরণ, তাঁর বিষয় পাঠ,

আলোচনা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাবে, আর তাঁর আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে। ভগবান্ অন্তর্য্যামী। যেখানে আন্তরিক ব্যাকুলতা, সেখানে তাঁর কৃপাও হয়। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই।"

সন্ন্যাসীর জীবন ত্যাগ তিতিক্ষাময়, দেহবুদ্ধি বিনষ্ট করাই তাঁহার সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই তত্ত্বটি শিবানন্দ মঠের উপদেশ প্রার্থী সন্ন্যাসীদের মনে গ্রথিত করিয়া দিতেন। একদিন পরম স্নেহভরে কহিতেছিলেন, "বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর। আর তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। তোরা তাঁরই আশায় এসেছিস তা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিস, সেও মহা সৌভাগ্যের কথা। তোদের উপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে তা ভেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর ক'দিন। এর পরে তোদের দেখেই লোকে শিখবে। ত্যাগই হল সন্ন্যাস জীবনের ভূষণ। যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয়।

"খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন ; তাছাড়া, খালি বিরজাহোম করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস ত্যাগ করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে পারবিনি। সঞ্চয় করতে নেই ; এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে নেই। ঠিক সাঁকোর জলের মত একধার দিয়ে আসবে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে ; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর আসবে না, তখন ময়লা জমতে শুরু করবে। আর কখনও কোন জিনিস চাইতে নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক। যখন যা দরকার মা সব দেবেন। এই দেখ না, এখন এত জিনিসপত্র খাবারদাবার কাপড়চোপড় সব আসছে যে সামলানো দায়। একদিন গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখানা কাপড়ই সকলে মিলে পরতাম। আর এখন নিত্য নূতন গরদ পরলেও ফুরোয় না। তবে কি জানিস, তাঁর দয়ায় মনটা তখনও যা ছিল এখনও তাই। পরনের কাপড় ছিল না ব'লে মনে কোন দুঃখ ছিল না ; কোন

অভাব বোধ হত না। তিনি কৃপা ক'রে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন। এই দেখ্ না, তোরা তো এখন আমায় দু হাত গদির উপর শুইয়ে রেখেছিস্, কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা—যখন শীতকালে কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম। তাতে যা আনন্দ তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

"দেখ্, আমার সেবা করছিস এ খুবই ভাল। ঠাকুরের মহা কৃপা তোর উপর যে, তাঁর একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও করা চাই। নিয়মিত জপধ্যান, ভজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের উপর মানুষবুদ্ধি এলেই মারা যাবি—বেশ মনে রাখবি। ভগবদ্‌বুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র সাধনা। ভগবানের নাম, তাঁর ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে সেই শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমরা তো ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি ; তবু তিনি আমাদের কত উগ্র সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান্, তিনি যে এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম ? ক্রমে সাধনভজনের দ্বারা সে জ্ঞান পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয়নি। তবে কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কৃপা করেনও।"

শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রক্তের চাপ মাঝে মাঝে খুব বৃদ্ধি পায়। অথচ দীক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু ভক্ত নরনারীর আনাগোনা লাগিয়াই আছে। সেদিন শরীরটা খুবই অবসন্ন। ডাক্তারেরা কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। একজন দর্শনার্থী আসিলে সেবকটি সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবানন্দজী বলিলেন—"আমি রামকৃষ্ণের চেলা। তাঁর অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও যখনই কেউ এসেছে, তার জন্য কত ভাবনা, কত আলাপ। আর আমি চুপ ক'রে বসে থাকব ? শরীর খারাপ তা কি হবে ? তোমরা

এসে শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাও—তোমরাই বা কি ভাববে? ভাববে—'রামকৃষ্ণের চেলা এই রকম।'

রামকৃষ্ণ-চেতনা ছিল মহাপুরুষ শিবানন্দজীর সাধন জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য, এই চেতনার পূর্ণতাকেই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন আপন অভীষ্টরূপে। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে। তাহা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন ও তাঁহার কৃপা।···যিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ রামকৃষ্ণ-ধৃত এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"এই একটিমাত্র ঘটনা দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এক গৌরবময় স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ সেই যুগটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে উহার স্মৃতি চিরদেদীপ্যমান্ থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মসঙ্ঘের গুরুপারম্পর্য্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধিযুগ বলাও বোধ করি অন্যায় নয়। প্রাচীন অল্পপরিধিযুক্ত কিন্তু অগাধ-স্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবর্ত্তী—বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তার লাভ করিতেছে। মহাপুরুষজী যেন প্রাচীনকে তাঁহার ভিতর বহুভাবে দেখিবার সুযোগ দিয়া গেলেন আর আগামীকেও ভগবদ্‌বিধানে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন।"

গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজী শিবানন্দ মহারাজের এ সময়কার কৃপা-লীলা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, "শেষ বয়সে শারীরিক নানা অসুস্থতা হেতু তাঁহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যেরূপ অবিচলিতভাবে সে সকল সহ্য করিতেন, তাহাতে মনে হইত যেন তাঁহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না। সেই অবস্থাতেও বহুদূর দূর স্থানের অনেক লোক তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য আসিত।

তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপা করিতেন। পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, অফুরন্ত কৃপা ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেন। মানুষে এতটা সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই যেন তাঁহার ভিতর রাখিয়া বহু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে। তাঁহার উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ।”

এই কৃপার শক্তি মহাপুরুষ শিবানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার কৃপালু সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে। ঠাকুর তাঁহার সকল শক্তির উৎস,—এই পরম সত্যটি নিজের দীর্ঘ জীবনে এক মুহূর্তের তরেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই দেখি মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যাকে তিনি লিখিতেছেন,—

“ঠাকুরের কৃপায় আমাদের আধারানুযায়ী উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর স্পর্শে, তাঁর ইচ্ছায় আমার নিজেরই—তাঁর জীবৎকালে তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল—তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও আমি বেঁচে আছি।”

শিবানন্দস্বামী সে-বার দেওঘরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন তাঁহাকে বৈদ্যনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে নেওয়া হয়। মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডারা তাঁহাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়া গেলেন। তারপর তাঁহাদের ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তবে একথাও জানানো হইল, দর্শন ও পূজার জন্য শিবানন্দ মহারাজকে সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। এদিকে মন্দিরে ঢুকিয়া লিঙ্গ বিগ্রহকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। নির্দ্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তবুও তাঁহার কোন হুঁস নাই। অবশেষে নানা চেষ্টার পর তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং

সবাই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহার পর তিনি আনন্দ সহকারে বার বার বলিয়াছিলেন, "বাবার কৃপায় আজ খুব দর্শন হল।"

এই সময়ে একদিন রাত্রিতে শিবানন্দ মহারাজ প্রবল হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হন। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম। এই সঙ্কট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হন এবং দেহবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সারা রাত্রি কাটাইয়া দেন।

পরের দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা! অল্পক্ষণ পরেই মনটা একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে চলে গেল। তখন দেখি কোন যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই—স্থির প্রশান্তি। বাইরের ঝড়ঝাপটা সেখানে স্পর্শ করতে পারছে না।"

এক সেবক এই সময়ে প্রশ্ন করেন, "ওটা কি ব্যাপার, মহারাজ!" মহাপুরুষ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওই তো আত্মা?"

শিবানন্দজীর শরীর একে অসুস্থ, তদুপরি নিদ্রা নাই। সেবক ব্রহ্মচারীটি বলেন, "মহারাজ একটু ঘুমুবেন না?"

ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ উত্তর দেন, "আমার আবার ঘুম কি রে?" সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গুন্‌গুন্‌ স্বরে গাহিতে থাকেন—'ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগ যাগে জেগে আছি। এবার যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি। এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, ভাল ভাবার কাছে ভাব শিখেছি। যে দেশে রজনী নেই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।'

নিদ্রার প্রসঙ্গে আর একদিন বলিলেন, "চণ্ডীতে আছে যে, মা-ই সেই নিদ্রারূপিণী—'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।' তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আধারভূতা জগতস্তমেকা।' সেই মা-ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। আমার হৃদয় কন্দর আলোকিত ক'রে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাঁকে দর্শন করলেই যে সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, ঘুমের আর দরকারই বোধ হয় না। যখনি একটু

শ্রান্তি বোধ করি, তখনি মাকে দেখে নিই। ব্যস্, আনন্দম্। সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।"

মহানিশায় জপ ধ্যান করা স্বামী শিবানন্দ খুব পছন্দ করিতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়া সেবক ব্রহ্মচারিটিকে কহিতে লাগিলেন, "ছাখ্, জপ করবি গভীর রাতে। মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। এত আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছা হবে না। এই তো আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ করবি—বুঝলি? সময় বৃথা যেতে দিস্নি বাবা। তাঁর নামে ডুবে যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না। যতটুকু কববি তন্ময় হয়ে করবি; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো ঠাকুর গাইতেন - 'ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' যে কোন কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন—প্রাণ, আন্তরিকতা; তিনি সময় দেবেন না। আর ধ্যান জপ নিত্য নিয়মিত-ভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে যায়। নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা চাই। গীতাতে ভগবান্ বলেছেন-- 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে নিত্য ডেকে যা; দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠবেন, ব্রহ্মানন্দেব রাস্তা খুলে দেবেন। সেই ব্রহ্মময়ী মা প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' সেই তিনিই প্রসন্না হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য; কিন্তু নিচ্ছে কে? তাঁর কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন—ভক্তি মুক্তি সব।

"বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান্ লাভ করবি বলে। ঐ তো জীবনের উদ্দেশ্য। আসলে যেন ভুল না হয়ে যায়। খুব খেটে জপ ধ্যান স্মরণ-মনন ক'রে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নে; তখন খালি আনন্দম্—খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। আমাদের শরীরই বা আর কদিন? এই তো বৃদ্ধ শরীর। এখন চলে

গেলেই হল—তখন সব অন্ধকার দেখবি। কিন্তু জপ ধ্যান ক'রে যদি ইষ্ট দর্শন ক'রে নিতে পারিস্ তো তখন দেখবি যে, গুরু ইষ্ট একই এবং গুরু তোর হৃদয় মন্দিরেই চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থূল দেহনাশে গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাই তো আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

স্বামী শিবানন্দের শেষ জীবনের ভাবময় প্রেমঘন মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ-দর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখনীতে অপরূপ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিতে দেখি :

—এই সময় তিনি একটি ভালবাসার মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সকলের জন্যই তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং তাঁহাদের কল্যাণের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিতেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ' তাঁর অতি আপনার জন—তাঁর নিজস্ব।

- কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক দুঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন করিতেন, যেন একটি ছোট-খাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইতেন। তিনি প্রকাশ্য কর্ম্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্ম্মী। সাধারণতঃ, কর্ম্মী বলিতে বুঝায় যিনি বহুপ্রকার চাঞ্চল্যকর কার্য্য করিতেছেন ; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হইয়া তাঁর ভালবাসা ও হৃদ্‌গত শক্তি দিয়া অপরের নিজস্ব ভাবটি—অপরের নিজস্ব কর্ম্মের ভাবটি, জাগ্রত করিয়া দিতেন। তিনি স্থির হইয়াও চঞ্চল ছিলেন ; একস্থানে থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন ; বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াও চিন্তা করিতেন।

—ভালবাসা ছাড়া তাঁহার আর একটি শক্তি—যাহার বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে- উদ্ভূত হইয়াছিল গুণাতীত জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। তর্ক, যুক্তি, বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা মানুষ যতটা উঁচুতে উঠিতে পারে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বহু উর্দ্ধে উঠিতেন। তাঁহার সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই সত্য হইত যে সেখানে বিচারবুদ্ধি চলে না। তিনি জগৎকে ও সৃষ্টিকে অন্য এক স্তর হইতে,

অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগৎকে কারণ অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপ দেখিতেন না। তিনি কারণ অতীত হইতে জগৎকে দেখিতেন।

—মহাপুরুষ শিবানন্দ আনন্দময় লোকে তাঁহার মনকে সর্ব্বদাই তুলিযা রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে যাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকিবেন যে তিনি অধিকাংশ সময় এই 'আনন্দময় লোকেই' বিচরণ করিতেন বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা হইল জীবন্মুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ। মহাপুরুষ শিবানন্দ এই আনন্দময় লোকে অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগৎকে আনন্দময় দেখিতেন। এইজন্য জীর্ণ দেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও তিনি সর্ব্বত্র 'আনন্দ' বা 'ব্রহ্ম' দেখিতেন।

—যে আনন্দ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বা ব্যক্ত করি সে আনন্দ দেহজ ; কিন্তু মহাপুরুষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দের। সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের অংশটুকু প্রকাশ করা হয়। চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনের বৃত্তি, চঞ্চল ভাব স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদূর্দ্ধে উঠিলে সৎ বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। সৎ অব্যক্ত ও স্বয়ং। এই দুই অবস্থার বিষয় কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না—কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অল্পবিস্তর প্রকাশ করিতে পাবেন। এইজন্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ জগৎকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন ; কিন্তু স্বয়ং তদূর্দ্ধ অবস্থায় চলিয়া যাইতেন। সে অবস্থা প্রকাশ করিবার নয়। 'সৎ, চিৎ, আনন্দের' এক অংশ তিনি জনসমাজের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর দুই অংশ তিনি নিজেই হইয়া যাইতেন ; কারণ সেই অবস্থা বাক্য মনের অতীত—অবাঙ্ মনসোগোচরম্।"

মঠের এক ব্রহ্মচারী অনবধানতা বশতঃ সেদিন শিবানন্দজীর একটি নির্দ্দেশ পালন করে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া বার বার সে ক্ষমা চাহিতে থাকে।

মহাপুরুষ ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বুঝেছ। এখানকার কথা শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। এখান থেকে এখন যে-সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে। এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।" মনের দুয়ার তখন আলগা ছিল, তাই তাদাত্ম্য বোধের স্বীকৃতি হঠাৎ এদিন শোনা গেল সিদ্ধকাম মহাপুরুষের মুখে।

স্বল্পবাক্, গম্ভীর পুরুষ, শিবানন্দজীর মধ্যে এই সময়ে এক এক দিন যেন মধুর স্বভাব বালকের মুখরতা আসিয়া হাজির হইত। স্বীয় আনন্দময় অনুভূতির কথা আর যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সে-বার তিনি কাশীধামে আসিয়াছেন। সকালবেলায় আশ্রমের সন্ন্যাসীরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। এমন সময় একজনকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, "গ্যাখ্, কাল রাতে একটা ভারী মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাজূটধারী ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে! আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি—কী সকরুণ চাউনি! তাঁকে দেখবামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় ক'রে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম·· আর খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মূর্ত্তিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, আর তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্য বদন, আমার হাত ধরে ইসারা করে বল্লেন, 'তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।' ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নীচের দিকে আসতে লাগলো এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগলো। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।"

এই দর্শনের পর হইতেই শিবানন্দ স্বামীর মন সর্ব্বক্ষণ এক অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-ভূমিতে অবস্থিত থাকিত। আহার নিদ্রায় দেখা যাইত বিস্ময়কর নির্লিপ্তি। ডাক্তারেরা এটিকে বায়ুরোগ বলিয়া ধরিয়া নেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাও করিতে থাকেন।

মঠের এক সন্ন্যাসীর মনে কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি গোপনে মহাপুরুষকে বলেন, "মহারাজ, ডাক্তারেরা বলছেন এটা বায়ুরোগ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বোধহয় এটা যোগজ। কাশীতে আপনার কি কোন দর্শনাদি হয়েছিল? কাশী হতে আসার পর থেকেই এর সূত্রপাত দেখছি।"

শিবানন্দ স্বীকার করিলেন, "হ্যাঁ, কাশীতে এক শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময় যোগীমূর্ত্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে।"

ভক্ত ও দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা এ সময়ে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিন মঠের এক সন্ন্যাসীকে শিবানন্দ বলিতে থাকেন, "ছাখ্, স্বয়ং ঠাকুরই প্রেরণা দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এই শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমায় দেখে এত লোক আসবে কেন? আমি তাঁর নাম স্মরণ মনন করি, অন্য কিছু জানিনে। যারা এখানে আসে আমি সকলকে তাঁরই পায়ে সঁপে দিই। বলি, 'এই নাও ঠাকুর, তোমার জিনিষ তুমি নাও।' লোকে যেমন নানা ফুল দিয়ে তাঁর চরণ পূজা করে, আমিও তেমনই নানা রকম মানুষ অঞ্জলি ক'রে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। তা সকলকে তিনি গ্রহণ করছেন, স্পষ্টই দেখতে পাই।"

এক একদিন দিব্য উদ্দীপনা ভাব। আশীর্ব্বাদ প্রার্থীদের বলিতেন, "ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, আশীর্ব্বাদ তো সর্ব্বদাই বয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে। এমনি বলছি যে তা নয়—ঠিক্।"

আবার এক একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিতেন, "যে আসবে, কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।"

কোন কোন দিন মহাপুরুষের সর্ব্ব সত্তায় মহাভাবের মাতামাতি আরম্ভ হইয়া যাইত। আনন্দে তিনি তখন গর্গর মাতোয়ারা। ভাবের উপশম ঘটিলে ভক্তসেবকদের ডাকিয়া বলিতেন, "শরীরে যেন একটা ডাকাত ঢুকেছিল। কালী কীর্ত্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে বাপ, শরীরটা যেন তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে। এ রকম ভাব ঠাকুরের হত। আমি তো তাঁরই সন্তান! কুছ নহী তো থোড়া থোড়া তো আছে?"

শরীরে হাঁপানী ও রক্তচাপের যন্ত্রণা খুব চাপিয়া বসিয়াছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। মাঝে মাঝে সিদ্ধ সাধক দ্রষ্টা স্বরূপে বলিতে থাকেন, "আজকাল একটা ভারী মজা দেখছি। এটাকে অবলম্বন ক'রে দুটো ব্যাপার চলছে—একটা শরীরের আর একটা আত্মার। শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আত্মার দিক থেকে নির্ম্মল আনন্দ—বেশ আনন্দ হয় দেখে, আর ভেবে।"

কিছুদিন যাবৎ শিবানন্দজীর অধ্যাত্মজীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রে পরম অনুভূতির একটা বিশেষ অবস্থা। দর্শনার্থী ভক্ত, মঠের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী যে কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহাকেই ভক্তিভরে করজোড়ে তিনি প্রণাম নিবেদন করেন। কেহ বিস্মিত হন, কেহ বা ভয়ে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন।

একদিন গভীর রাতে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীটিকে করজোড়ে প্রণাম জানাইলেন। এই সেবকটি তাঁহারই দীক্ষিত শিষ্য। ভীত স্বরে তিনি বলিয়া উঠেন, "মহারাজ, এভাবে প্রণাম ক'রে আমায় আর পাপের ভাগী করবেন না।"

শিবানন্দ মহারাজ শান্ত স্বরে কহেন, "আসল ব্যাপারটা কি জানিস্, যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখতে পাই; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম করি। কোন লোক সামনে এলেই প্রথমটা তার ভেতরকার যা সত্তা সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবির্ভূত হন। লোকজন তখন ছায়ার মত অস্পষ্ট, আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও জীবন্ত দেখায়। তাই তো প্রণাম করি। প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় রূপ অন্তর্দ্ধান হয়। তখন লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও পারি।"

উচ্চতর দিব্য অনুভূতিসমূহ তখন তরঙ্গায়িত হইতেছে শিবানন্দের সাধনসত্তায়। একদিন আপন মনে সেবকদের কহিতে লাগিলেন, "কৃপা—কৃপা—কৃপা। তিনি কৃপা ক'রে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে

কি ক'রে তাঁকে বুঝবে? দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত—খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি করছেন। কিন্তু তারই ভেতরে যে এত কাণ্ড তা কি ক'রে লোকে বুঝবে বল, তাঁর বিশাল শক্তির খেলা যত দিন যাবে ততই লোক দেখতে পাবে। ধর্ম্মজগতে একটা মহা ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুর কৃপা ক'রে কত যে দেখিয়ে দিচ্ছেন তা আর কাকে বলব? কাকেই বা বলি, আর কেই বা ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন! তার বিষয়ে কত কথা যে প্রাণের ভিতর (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) গজ্‌গজ্‌ করছে, কাউকে তো তা বলবার জো নেই। কেউ ওসব বুঝতে পারবে না। তোমাদেরও বলতে পারিনে। এমনকি তোমরাও ওসব বুঝতে পারবে না। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যতদিন ছিলেন, তাঁর কাছে প্রাণ খুলে ওঁসব কথা বলতুম, বলে প্রাণটা খোলসা হ'ত। তিনিও আনন্দ পেতেন, আমারও আনন্দ হ'ত। সে-সব অতি গুহ্য কথা। তাঁর সঙ্গে নিরিবিলিতে কত সব কথা হয়েছে! তিনিও অনেক সময় নিজের অনেক কথা বলতেন। এখন তো আর তা হবার জো নেই। এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথা প্রাণের ভেতরই রয়ে যাচ্ছে, বলবার লোকই পাইনে। সবই যে তাঁর ইচ্ছা। তবে আন্তরিক প্রার্থনা করছি, জগতের কল্যাণ হোক্, তোমাদের কল্যাণ হোক্, তোমরা সব শান্তিতে থাক।"

স্বামী শিবানন্দের শরীর এখন প্রায় পতনোন্মুখ, অন্তর্লোকে নিরন্তর চলিয়াছে মা-ব্রহ্মময়ীর কৃপা আস্বাদন। সেদিন নিজের সম্বন্ধে সেবক শিষ্যদের বলিতে থাকেন, 'কামনা-বাসনা থাকলে চির শান্তিলাভ করা অসম্ভব; আর সেই কামনা-বাসনা ভগবৎকৃপা ছাড়া সমূলে বিনষ্ট হওয়াও সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা ক'রে আমার সব কামনা-বাসনা একেবারে মুছে দিয়েছেন; কোন বাসনা নেই। এই শরীরটা কেবল তাঁর ইচ্ছায়, তাঁরই কাজের জন্য রয়েছে; আমি হচ্ছি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিন্তু কোন বাসনা নেই, বুঝলি

আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ।'—এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। তখন তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে; তিনি যেন এক নূতন লোক। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন মনেই বলতে লাগলেন—'মা আমায় কৃপা ক'রে সব দিয়েছেন। তাঁর ভাণ্ডার খালি ক'রে আমায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তাঁর কৃপায় সব লাভ হয়েছে—যং লব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ। তবু যে তিনি এ শরীরটা কেন রেখেছেন তিনিই জানেন।

"...গভীর রাত। মহাপুরুষজী তাঁর নিজের খাটে বসে আছেন—ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে আপন ভাবে এক একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বেড়াল ঘরের মেঝের উপর মিউ মিউ ক'রে ডেকে উঠলো। তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বেড়ালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তিনি যে বেড়ালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নি। সেজন্য সে একটু সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বল্লেন—"ছাখ্, ঠাকুর আমায় এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি 'চিন্ময়', ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সর্বপ্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা—কেবল নামের ভেদমাত্র; কিন্তু মূলে সব একই। বেশ পরিষ্কার দেখছি, চেষ্টা ক'রেও সে ভাবটা সামলাতে পারছি না। সবই চৈতন্যময়। এই বেড়ালের ভেতরও সেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বলজ্বল করছে। এইভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপুর ক'রে রেখেছেন। লোকজন আসে যায়; কথাবার্ত্তা বলতে হয় বলি; সাধারণ কাজকর্ম্ম আহারাদি করতে হয় করি। যেন অভ্যাসবশতঃ ক'রে যাই। কিন্তু এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্ব্বত্রই সেই চৈতন্যের খেলা। নামরূপ এসব তো অতি নিম্ন স্তরের ব্যাপার। নাম-রূপের ওপরে মন গেলেই, বাস্। তখন সবই চৈতন্যময়, আনন্দময়। এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই জানে।' আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঐটুকু বলেই

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধ প্রাণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল[১]।"

শিবানন্দজী রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়া সেবকগণ অতিশয় বিব্রত, দিবারাত্র তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। নিজ দেহের নশ্বরতার কথা মহাপুরুষ যেমন বলিতেন আবার তেমনি উদ্দীপনা ভরে বলতেন, "এই শরীরের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি। এতটা করি কেন, জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়। এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান্-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবান্‌কে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁর সেবা করেছে। এই শরীরটাকে তিনি যুগধর্ম্ম প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন—তাই এত।"

তাঁহার শরীর খারাপ বলিয়া ভক্ত শিষ্যদের ঠেকানোর উপায় নাই। কারণ, ডাক্তারেরা নিষেধ করিলেও তিনি মানিতে চাহেন না। বিদায় লগ্নে সিদ্ধকাম শিবানন্দ যেন সদাব্রত খুলিয়া বসিয়াছেন।

এ সময়ে সর্ব্ব অস্তিত্বে তিনি ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ পাইতেছেন। মাঝে মাঝে তাই বলিয়া উঠেন, "ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন, সর্ব্বদা শ্বাসে শ্বাসেই তাঁর দর্শন পাচ্ছি।"

কোন ভক্ত বা আগন্তুক মঠে আসিয়া প্রসাদ না পাইয়া চলিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীদের আর রক্ষা নাই। ভাণ্ডারীকে ভয়ে ভয়ে সদা সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার গঙ্গায় তাহার ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাহার সব কিছুই ডবল দামে বেলুড়-মঠকে কিনিয়া রাখিতে হইবে—বড় দুঃস্থ সে, তাঁহার দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া একদিন সে শিবানন্দজীকে জানাইয়া দিয়াছে।

উৎসবের কুলী মজুর, পাড়ার বাগ্দী, সাঁওতাল ভৃত্য, দারোয়ান সকলেরই 'বাবার' কাছেই দরকার। বারান্দায় দাঁড়াইয়া 'বাবা' তাঁহাদের খোঁজখবর নেন, প্রয়োজন বোধে নোট-টাকা ছুঁড়িয়া ফেলেন, দরাজ মনে আদেশ দেন, 'ভাণ্ডারসে লে যাও।'

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

ঠাকুর শব্দ উচ্চারণেই হয় দিব্যভাবের উদ্দীপন। পূজারীকে দেখিলেই ঠাকুরের কালের আনন্দস্মৃতি উদ্বেল হইয়া উঠে। মা ভবতারিণী দক্ষিণেশ্বরীর মূর্ত্তিটি দেখিলেই হন আনন্দে মাতোয়ারা।

গায়ক হয়তো তাঁহার সম্মুখে মায়ের নাম গাহিতেছেন, আর শিবানন্দ মহারাজ মুহূর্ত্তে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন। আনন্দাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গায়ককে বলিতেছেন, "যা যা---পালা পালা! এঃ হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে! এ যেন শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'একটুতেই দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে'—তাই হয়েছে।"

এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাঁহার সাধন-সত্তায় লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে ভাব জলধির বিচিত্র তরঙ্গমালা। কখনো মায়ের কথা. কখনো ঠাকুরের কথা নিয়া নানাভাবে চলিতেছে মধুর আস্বাদন।

দিব্য অনুভূতির শিখরদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া স্বামী শিবানন্দ এবার বিরাজিত 'ভাবমুখে'। মা ব্রহ্মময়ীর অঙ্কে বসিয়া আছেন—মায়ের বালকটি। সেদিন এক স্নেহভাজন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তুই কি পড়ছিস্ আজকাল?"

"আজ্ঞে, মাণ্ডুক্যকারিকা পড়ছি," সবিনয়ে উত্তর দেন নবীন সাধক।

"দূর শালা! ওতে কি আমার মায়ের নাম আছে?" পরমানন্দে বলিযা বসেন শিবানন্দ মহারাজ।

সর্ব্ব বন্ধনহীন, শুদ্ধম অপাপ বিদ্ধম এই কুসুমপেলব বৃদ্ধ শিশুর আননে সদা স্ফুরিত রহিয়াছে দিব্য জ্যোতির আভা। জগৎপ্রপঞ্চে ওতপ্রোত পরম সত্তার মধ্যে নিজেকে যেন নিরন্তর তিনি বিস্তারিত করিয়া দিতেছেন।

অপূর্ব্ব তাঁহাব এসময়কার শিশু-লীলা। বিছানায় বসিয়া মহাপুরুষ কখনো শালিক ময়নাকে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছেন। কখনো বা খেলনার ডমরু শব্দে দিতেছেন দূরে তাড়াইয়া।

হঠাৎ একদিন আব্দার ধরিলেন, রিস্ট্ওয়াচ একটি এখনি তাঁহার

চাই। তখনি তাহা আসিয়া গেল। ছুই একবার হাতে বাঁধিবার প
আর উহার কোন প্রয়োজন রহিল না।

১৯৩২ সালের কথা। কোন কোন দিন দেখা যাইত এই সি
মহাপুরুষ বালকবৎ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। "বিছানার উপর
কথামৃত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটি খঞ্জনী,
লাঠি, ছবির বই—ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন—যেন
পাঁচ বছরের একটি বালক। আর ইচ্ছানুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া
করছেন। হয়তো একটু খঞ্জনী বাজালেন, ঠাকুরমার ঝুলি একটু
পড়লেন, আবার কখনো বা হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের
শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ আচরণ করতেন তার একটু আভাস
পাওয়া যায়—তাঁর একদিনকার কথা থেকে। জনৈক সেবককে
কথায় কথায় বলেছিলেন—'ছাখ্, মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে
ছুটে যেতে চায়; তাই এসব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে
রাখার চেষ্টা করি। মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন,
তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।"

মঠের প্রবীণ সাধকেরা বুঝিলেন, নির্গুণ পথের অভিযাত্রী,
নির্ব্বানোন্মুখ এই মহা সাধককে আর বেশীদিন ধরিয়া রাখার উপায়
নাই।

শেষটি বিদায়ের দিন আসিয়া পড়িতেছে। আজকাল শিবানন্দ
মহারাজ মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেহী গুরুভ্রাতাদের দর্শন লাভ করেন।
একদিন ভক্তদের বলিলেন, "কাল খুব ধ্যান হয়েছিল। এইসব রাজ্য
ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল উর্দ্ধলোকে। স্বামীজীকে
দেখলাম। একটা জ্যোতির সূতোর মত ঝুলছে, সেটিকে ছেড়ে দিয়ে
স্বামীজী নীচে এসেছিলেন। মহারাজকেও দেখেছি, তিনিও রয়েছেন।
বেশ আনন্দে ছিলাম।"

আর একদিন জানাইলেন, "এই মাত্র স্বামীজী ও মহারাজ
এসেছিলেন। আর বললেন, 'চল তারকদা'। তোরা কেউ দেখতে
পেলিনে? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।"

মারাত্মক সন্ন্যাস রোগে শিবানন্দ স্বামী আক্রান্ত হইয়াছেন। মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা, গৃহস্থ ভক্তেরা, সেবায় কোন ত্রুটি হইতে দিতেছেন না। স্যর নীলরতন প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা প্রাণপণ চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। স্যর নীলরতন সেদিন পরম শ্রদ্ধাভরে মন্তব্য করিলেন, "যে ক'রেই হোক এঁকে আপনারা আটকে রাখুন। বলুন তো এমন মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?"

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন এলাহাবাদ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন স্বামী শিবানন্দকে দর্শনের জন্য। তিন দিন পরে, বিদায় নিতে গিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দজী নীরবে বাম হাতটি তাঁহার মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে উত্তরকালে বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, "যেদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্য্যন্ত আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌বে, সে পর্যান্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাবো।"

১৯৩৪ সালের ২০শে এপ্রিল রোগের সঙ্কট ঘনাইয়া আসে, ডাক্তারেরা বিমর্ষ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। মঠবাড়ী ও মঠপ্রাঙ্গণে শোকাকুল নরনারী ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। সাধুরা স্বামী শিবানন্দের শয্যা ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, নিরন্তর শুনাইতেছেন সদ্‌গুরুর পবিত্র নাম। মহাপুরুষের সারা দেহে তখন দেখা দিতেছে পুলক রোমাঞ্চ। দিব্য আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাঁহার মুখে চোখে।

"শেষ মুহূর্ত্ত যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন তাঁহার অঙ্গে পুলক আরো ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ স্মিত প্রশান্ত। অপরাহ্ণ ৫টা ৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুরুষজীর বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব আনন্দ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুল এবং সর্ব্ব শরীরে লোম কদম্বফুলের মতন খাড়া হইয়া উঠিল এবং

একটু পরেই মুখ দিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল। সেই পুলকিত অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল[১]।"

বেলুড় গঙ্গাতীরে শত শত শোকাকুল নরনারীর সম্মুখে সেদিন ভস্মীভূত হয় মহাসাধক শিবানন্দ স্বামীর মরদেহ, আর এই সঙ্গে নির্ব্বাপিত হয় রামকৃষ্ণ দেউলের একটি সুপবিত্র আলোকবিস্তারী দীপশিখা।

শৈবাচার্য্য অপ্পর

ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতিময় জীবনে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধকদল সংযোজিত করিয়াছেন এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উভয় যুগেই দলে দলে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, মুমুক্ষু সাধকদেব দিয়াছেন দিব্যলোকের আলোক-সঙ্কেত, জনজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়াছেন কল্যাণধারা। এই মহাত্মাদেরই অন্যতম শৈবাচার্য্য অপ্পর। কৃচ্ছ্র, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনন্য ইষ্টসেবা ও কঠোর যোগসাধনার সহিত শৈবাগমের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সমন্বিত হয় তাঁহার সাধনজীবনে। বহুজনের আলোক-দিশারী রূপে সর্ব্বত্র তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

অপ্পর আবির্ভূত হন আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দে। তামিল দেশের, বর্ত্তমান তামিল নাড়ুর, দক্ষিণ আর্কট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম। শিব-সাধনার ঐতিহ্যের ধারাটি দীর্ঘদিন প্রবাহিত ছিল তাঁহাদের বংশে। অপ্পরের পিতা ছিলেন সেই ধারারই এক ধারক ও বাহক। নৈষ্ঠিক শিবভক্ত বলিয়াও স্থানীয় অঞ্চলে তাঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল।

শৈশবেই অপ্পরের জীবনে নামিয়া আসে দৈবের নির্ম্মম আঘাত। অল্প দিনের ব্যবধানে জনক ও জননী শিশুপুত্রের মায়া কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। অপ্পরের বাল্যবিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই সংসারেই বাস করিতেন; এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন তাহার লালনপালনের ভার।

বালক কালেই অপ্পরের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদি অতিশয় যত্নে যেমন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন, তেমনি করেন তাহার লেখাপড়ার সুব্যবস্থা। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অপ্পরকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং অল্পকালের

মধ্যেই উচ্চতর পাঠসমূহ অনায়াসে তাহাকে আয়ত্ত করিতে দেখা যায়। শিক্ষক ও পড়ুয়ারা সবাই চমৎকৃত হন, ভ্রাতার কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়া দিদিরও আনন্দের অবধি নাই। দিনের পর দিন তাহাকে তিনি উৎসাহিত করিতে থাকেন।

নিত্যকার পাঠ যেই সমাপ্ত হয় অমনি বালক অপ্পর স্নেহময়ী দিদির কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া বসেন, তাঁহার মুখ হইতে শোনেন প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্রের মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধু মহাত্মাদের দিব্য জীবনের কত অলৌকিক কাহিনী।

ভক্তিসিদ্ধ শৈবগুরুর কাছে দিদি দীক্ষা নিয়াছেন। সংসারের কাজকর্ম্ম আর অপ্পরের দেখা-শুনার সময় ছাড়া দিন রাতের বাকী সময়টা তাঁহার কাটে শিবের আরাধনা ও জপ ধ্যানে। সকল কিছু অনুষ্ঠানের শেষে, শিব মন্দিরের গর্ভগৃহে বসিয়া এই বর্ষীয়সী পূজারিণী প্রতিদিন ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন সিদ্ধাচার্য্য মাণিক্য-বাচক-এর অপূর্ব্ব স্তোত্রমালা। শিব প্রশস্তির গম্ভীর ধ্বনিতে সারা মন্দির গমগম্ করিয়া উঠে। মন্দির চত্বরে ক্রীড়ারত অপ্পর উচ্চকিত হইয়া উঠে, কি এক অজানা আকর্ষণে ছুটিয়া আসে পূজাবেদীর কাছে, দিদির ভাব-প্রদীপ্ত আননের দিকে চাহিয়া থাকে নির্নিমেষে। শিবভক্তির রসে রসায়িত দিদির সাধনজীবন এমনি করিয়া দিনের পরদিন প্রভাবিত করিতে থাকে বালক অপ্পরকে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে চতুষ্পাঠীর পড়া শেষ হইয়া যায়। এবার কোন উচ্চতর শাস্ত্র পাঠের কেন্দ্রে অপ্পরকে যাইতে হইবে। সারা দক্ষিণদেশে তখন কাঞ্চীর খুব সুখ্যাতি। এ নগরী শুধু পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রের রাজধানীই নয়, ইহা তখন সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। রাজা মহেন্দ্র ধর্ম্মের দিক দিয়া জৈনমতাবলম্বী, তাঁহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর ভারতের বড় বড় জৈন পণ্ডিতেরা রাজধানীতে জড়ো হইয়াছেন। এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে জৈন শাস্ত্রবিদ্ ও তর্কশূরদের এক প্রসিদ্ধ মহাবিদ্যালয়। রাজসভায় প্রায়ই শাস্ত্র বিচার ও তর্কদ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হয়—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব

ধর্ম্মের পণ্ডিতেরাই সমবেত হন নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তাই কাঞ্চী তখন পরিণত হইয়াছে সর্ব্বশাস্ত্রেরই পীঠস্থান রূপে।

চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও পড়ুয়াদের কাছে অপ্পর কাঞ্চীনগরের বিদ্যাবৈভবের কথা শুনিয়াছেন। নিজে তিনি উৎসাহী বিদ্যার্থী, তাছাড়া, সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্প্রতি তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁহার কিশোর মন চঞ্চল হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতীর্থ কাঞ্চীতে বসবাস করার জন্য। সেখানে গিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার অভিলাষ।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে একদিন কহিলেন, "দিদি, কাঞ্চীতে গিয়ে শিক্ষা লাভ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সেই ব্যবস্থাই তুমি আমার ক'রে দাও। বিদ্যার্থী হিসাবে এজন্য যা কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়, আমি তাতে একটুও পশ্চাদ্‌পদ হবো না। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, সেখানে থেকে, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে, আমি দেশে ফিরবো।"

দিদি কহিলেন, "ওরে তুই কৃতী হবি, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবি তাই যে আমি চাই। আর সেই ভরসায়ই যে আমি এতকাল দিন গুন্‌ছি। কিন্তু ভাই, কাঞ্চীর বিদ্যাপীঠে তোর পড়াটা আমার যেন ভাল ঠেক্‌ছে না।"

"কেন বলতো?"—ক্ষুণ্ণ মনে প্রশ্ন করেন অপ্পর।

"শুনেছি, কাঞ্চীতে রাজা মহেন্দ্রের সম্প্রদায়, অর্থাৎ, জৈনেরাই বেশী প্রতিপত্তিশালী। জৈন শাস্ত্রবিদ্‌দের সেখানে প্রবল প্রতাপ, ন্যায়-শাস্ত্রের কূটতর্ক নিয়ে সদাই তাদের কচ্‌কচি। ঈশ্বরের প্রশ্ন সেখানে গৌণ, আমাদের ইষ্ট বিগ্রহ শিব সেখানে রয়েছেন অবজ্ঞাত হয়ে।"

"এ তুমি কি বলছো দিদি। আমি নিজে যদি ঠিক থাকি, আমার নিজের ধ্যানধারণা যদি ঠিক থাকে, তবে কেউ আমার অনিষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া, এযুগে প্রকৃত শাস্ত্রবিদ্ হতে হলে ঈশ্বরমুখী আর ঈশ্বরবিমুখী উভয় শাস্ত্রই পাঠ করতে হবে। কাঞ্চী ছাড়া কোথাও যে তার সুবিধে নেই।"

"আমি বলি কি, তুই বরং চিদম্বরমে চলে যা, সেখানকার শিব-মন্দিরে রয়েছেন শৈবাগমের দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা, আর রয়েছেন সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষেরা।"

"কিন্তু দিদি, সেখানে গিয়ে তো আমায় একটিমাত্র সম্প্রদায়ের একপেশে বিদ্যাচর্চ্চা নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। মনোরাজ্যের দশ দিকের দশটি জানালা তো খুলবে না। দর্শন ও সাধনার বহুমুখী তত্ত্ব তো আমি আয়ত্ত করতে পারবো না। না—না, আমি কাঞ্চীতেই যাবো। তুমি এতে আপত্তি ক'রো না।"

ভ্রাতার সঙ্কল্পে দিদি আর বাধা দিলেন না; কয়েক দিনের মধ্যেই অপ্পর রওনা হইয়া গেলেন কাঞ্চী নগরে।

এখানকার প্রধান বিদ্যাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য। উত্তর-ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ জৈন দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। আর তাঁহাদের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে চলিতেছে শত শত বিদ্যার্থীর শাস্ত্র অধ্যয়ন। তরুণ ছাত্র অপ্পর এই বিদ্যাপীঠেই ভর্ত্তি হইলেন। বহুলখ্যাত পণ্ডিতদের চরণতলে বসিয়া শুরু হইল তাঁহার অধ্যয়ন-তপস্যা।

নবীন ছাত্রের জ্ঞানের স্পৃহা যেমন প্রবল, তেমনি অসাধারণ তাঁহার ধীশক্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অপ্পর নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। বিশেষ করিয়া জৈন শাস্ত্রে জন্মিল তাঁহার অসামান্য অধিকার। বিচার সভা ও তর্কদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই তরুণ পণ্ডিত অল্পকাল মধ্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

শাস্ত্র ও দর্শনতত্ত্বে পারঙ্গমতার জন্যই শুধু নয়, অসামান্য কাব্য-প্রতিভার অধিকারীরূপেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিলেন। প্রবীণ জৈন ধর্ম্মনেতা ও সাধকেরা তাই তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিলেন এক বিরাট প্রতিশ্রুতি।

রাজা মহেন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টিও অচিরে পতিত হইল এই প্রতিভাবান্ স্নাতকের উপর। অবশেষে একদিন রাজগুরুর কাছে জৈনধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন অপ্পর।

রাজসভার পণ্ডিতেরা বুঝিয়া নিলেন, এই প্রতিভাধর তরুণ পণ্ডিতই সেই চিহ্নিত ব্যক্তি, যিনি উত্তরকালে এ রাজ্যের জৈন ধর্ম্ম-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অপ্পর কাঞ্চী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, দিদির স্নেহ সান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়া যান। কিন্তু আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অপ্পর এখন মজিয়া আছেন বিদ্যাচর্চ্চায় ন্যায়ের কূটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া জৈনধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়।

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর। বিদ্যার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে অপ্পরের মনে, জৈন পণ্ডিতদের প্রভাবে পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও হইয়াছে প্রায় তিরোহিত।

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, "কাঞ্চীতে গিয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে বাধা জন্মায়, তার মূল্য যে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস?"

"ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি?"

"আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতর বিদ্যার অভিমান জেগেছে। তাছাড়া, জৈন শুষ্ক তার্কিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী হয়েছিস্। সব চাইতে দুঃখের কথা, ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়েছিস্ তুই। আমাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈব সাধক। তাঁদের পথ থেকে তুই দূরে সরে গিয়েছিস্। এর ফল কি কখনো ভালো হতে পারে?"

কয়েক দিন পরের কথা। হঠাৎ একদিন মারাত্মক শূলব্যথায় অপ্পর একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না। সঙ্কট ক্রমে চরমে উঠিল, মুমূর্ষু অপ্পরকে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ এসময়ে অপ্পরের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গুরুদেব তাঁহাদের গৃহে

আসিয়া উপস্থিত। সিদ্ধ শৈব সাধক বলিয়া এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত। যোগবিভূতির খ্যাতিও তাঁহার প্রচুর। তাই তাঁহার আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন। রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহাকে জানানো হইল।

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, "তোমরা শান্ত হও। এ সংকট অচিরেই কেটে যাবে, অপ্পর বেঁচে উঠবে। কিন্তু তাকে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে। বংশানুক্রমে প্রভু শিবই হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। এই ইষ্টের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তো যতো বিপদের সৃষ্টি। তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিরাজ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ। অপ্পর আজ তাঁর কাছেই করুক আত্মসমর্পণ।

আশীর্ব্বাদ জানাইয়া মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপ্পরের জন্য দিদির এবার আর দুশ্চিন্তা নাই। বুঝিলেন, গুরুদেবের কথা কখনো মিথ্যা হইবার নয়, প্রভু শিবের কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার রক্ষা পাইবে।

অপ্পরকে কহিলেন, "শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তুই ইষ্টদেবকে ভুলে গিয়েছিস্। ইষ্টের চরণে অপরাধ করেই তো তোর এত কষ্ট, এত বিড়ম্বনা। সবাই আমরা তোকে ধরাধরি ক'রে শিব-মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে প্রভু শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, স্তবস্তুতি জানিয়ে তাঁকে প্রসন্ন কর্। দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাজ তো আজ এই কথাটিই বিশেষ ক'রে বলে গেলেন। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তাঁর কথা তো মিথ্যে হবার নয়।"

প্রচণ্ড শূলবেদনায় অপ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই দৈব কৃপার উপর নির্ভর করিতে তাঁহার আপত্তি হইল না।

রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থম্‌থমে ঘন অন্ধকার। মন্দিরের অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার্ত্ত অপ্পর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাম। হঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া

উঠিল। সেই সঙ্গে শোনা গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, "বৎস অপ্পর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েছো তুমি, লাভ করেছো নবজন্ম। আশীর্ব্বাদ জানাই, নূতনতর ঈশ্বরীয় চেতনা জাগ্রত হোক তোমার সাধনসত্তায়, আর তোমার মাধ্যমে সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অপ্পর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র শূলবেদনা দূরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নূতন চেতনার জোয়ার। সুষুপ্তিময় রাত্রির শেষে এ যেন আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তাঁহার নবজাগরণ।

দিব্য আনন্দের রসে অপ্পর উচ্ছল উদ্বেল। লিঙ্গবিগ্রহের বেদীতলে ভাবাবেশে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্ত-করে নিবেদন করিলেন শিবমহিমার অপরূপ স্তবগাথা।

আবার শোনা যায় দিব্যপুরুষের বাণী, "বৎস অপ্পর, তোমার স্তবমালা আমায় প্রসন্ন করেছে। আজ থেকে শিবভক্তেরা জানবে তোমায় 'তিরুণাবক্করসু' নামে, ঈশ্বরের আ৷শস্পূত বাক্-পতি ব'লে পরিচিত থাক্‌বে তুমি এ অঞ্চলের শৈব-সমাজে।"

যুক্তপাণি অপ্পর কাতর কণ্ঠে নিবেদন করেন, "প্রভু, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তোমার দাসরূপেই যেন এ জীবন অতিবাহিত করতে পারি, তোমার সেবায় যেন কায়মনপ্রাণ হয় চিরদিনের জন্য উৎসর্গীত। তোমার মহিমা ধ্যানই যেন এখন থেকে হয় আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত।

মন্দিরের স্বর্গীয় জ্যোতির ধারা অন্তর্হিত হইয়া গেল। দিব্য প্রেরণায় উদ্দীপিত অপ্পর কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের পাশে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দুই নয়ন তাঁহার পুলকাশ্রুতে ছলছল, আননে অপার তৃপ্তির হাসি। ভ্রাতা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন, স্বধর্ম্মের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন,

প্রভুর আশীর্ব্বাদে হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। চিত্ত তাঁহার তাই ইষ্টদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

শিবের প্রত্যাদেশের কাহিনী দিদি অপ্পরের মুখ হইতে আনুপূর্ব্বিক শুনিলেন। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "আর কিন্তু দেরী করা নয়, ভাই। আমাদের কুলগুরু, সিদ্ধ শৈবাচার্য্যের কাছ থেকে তুই দীক্ষা গ্রহণ কর্। যে কৃপা দেবাদিদেব শিব তোকে আজ করেছেন, অচিরে তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক। শিব সাধনায় তোর সিদ্ধি লাভ হোক্, তা-ই যে আমি চাই।"

গুরুর কাছে দীক্ষা নিবার পর অপ্পর শুরু করেন তাঁহার কঠোর সাধনা। ইষ্টদেব শিবের ধ্যান জপে নিরন্তর নিবিষ্ট হইয়া থাকেন, দিন রাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, সে সম্বন্ধে কোন হুঁশ নাই। গুরুর নির্দ্দেশিত পথে নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হন, নিগূঢ় সাধনার এক একটি স্তর ভেদ হয়, আর নবতর প্রেরণায় ও শক্তিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

গুরু একদিন কৃপাভরে কহেন, "বৎস, অপ্পর, সাধনার এই দুরূহ ক্রমসমূহ যে ভাবে তুমি আয়ত্ত করছো, তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। বৎস, একটি কথা তুমি স্মরণে রেখো, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তোমার সাধনসত্তায় মিলিত হয়েছে অসাধারণ শিবভক্তি ও দিব্য অনুভূতি। তার কারণ, জনকল্যাণ সাধনের জন্য পূর্ব্ব হতেই প্রভু তোমায় চিহ্নিত ক'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, সিদ্ধ মহাত্মা মাণিক্যবাচক-এর সাধনপথ ও শিবভক্তি প্রচারের পথ তুমি অনুসরণ করো। তাঁর স্তবগাথার সঙ্গে মিলিয়ে নাও তোমার সাধন-জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও চিন্ময় দর্শন। এর ফলে আদিষ্ট কর্ম্ম উদ্‌যাপন তোমার সহজতর হয়ে উঠ্‌বে।"

সিদ্ধ শিবযোগী মাণিক্যবাচক-এর পবিত্র জীবন, তাঁহার সাধনপন্থা আর স্তবগাথা দক্ষিণদেশের হাজার হাজার শৈব সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে। দিব্য জীবনের দুয়ার তাঁহাদের সম্মুখে

করিয়াছে উন্মোচিত। গুরুর আদেশে অপ্পর তাই শুরু করিলেন মাণিক্যবাচক-এর শিক্ষা ও সাধনার অনুধ্যান।

মাদুরার সন্নিকটে বাদাবুর গ্রামে, এক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ বংশে, আবির্ভূত হন মাণিক্যবাচক। তরুণ বয়সেই অসামান্য প্রতিভার বিকাশ দেখা যায় তাঁহার জীবনে। সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ্ ও পরমধার্ম্মিক পণ্ডিত রূপেও তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সমকালীন পাণ্ড্যরাজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্ম্মপ্রাণ। দূত পাঠাইয়া বাদাবুর হইতে তরুণ পণ্ডিতকে তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। অমানুষী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন মাণিক্যবাচক ; অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, শুধু তাহাই নয়, কহিলেন, "পণ্ডিত, বয়সে তরুণ হলেও, প্রভু শিবজীর কৃপায় অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞান তুমি অর্জ্জন করেছো। বাদাবুর গ্রামে বসে ক্ষুদ্র চতুষ্পাঠী চালানোর জন্য তো তোমার জন্ম হয় নি। তোমার যোগ্য স্থান রাজধানীতে। এবার এখানে তুমি চলে এসো, তোমার প্রতিভাকে নিয়োজিত করো দেশের ও দশের কল্যাণে। আমার রাজকার্য্যে তুমি সহায়তা করো। তোমায় আমি নিযুক্ত করছি এ রাজ্যের মন্ত্রীর পদে।"

"মহারাজ, শাস্ত্রানুশীলন আমার উপজীব্য, সত্যের সন্ধানই আমার জীবনের ব্রত। রাজধানীতে থেকে, রাজকর্ম্মের ভীড়ে, আমার সে ব্রত উদ্‌যাপনে যে বাধার সৃষ্টি হবে।" সবিনয়ে উত্তর দেন মাণিক্যবাচক।

"না পণ্ডিত, এ কাজ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা হবে না। আমার রাজধানীতে দিনের পর দিন আসছেন কত প্রখ্যাত শাস্ত্রবিদ্, কত সিদ্ধ সাধক। তাঁদের সান্নিধ্য পেয়ে তুমি উপকৃত হবে, আর আমার রাজ-প্রশাসন লাভবান হবে তোমার মত কর্ম্মক্ষম, শুদ্ধাচারী ও জ্ঞানী সচিবের সাহায্য পেয়ে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তুমি এ কার্য্যভার গ্রহণ করো, লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীর হিতসাধন করো।"

পাণ্ড্যরাজ সত্যকার গুণগ্রাহী ও পরমধার্ম্মিক। প্রজাদের

সত্যকার কল্যাণ সাধনেও তিনি সদা তৎপর। সর্ব্বোপরি তরুণ পণ্ডিত মাণিক্যবাচক-কে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এই ভালবাসার টান এড়ানো সম্ভব হইল না, মন্ত্রিত্বের পদ মাণিক্যবাচক গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদিন প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ তিনি পরম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন, আর বাকী সময় অতিবাহিত করেন শাস্ত্রচর্চ্চা, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে।

তত্ত্বজ্ঞান ও মুমুক্ষার তৃষ্ণা চিরদিনই জাগিয়া রহিয়াছে তাঁহার অন্তর্জ্জীবনে; এক এক সময়ে এই তৃষ্ণা প্রবলতর হইয়া উঠে, ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে বসেন, রাজধানীতে থাকার ফলে বহু জ্ঞানী শাস্ত্রবিদ্ ও সিদ্ধ সাধকদের সঙ্গ তিনি পাইতেছেন, তত্ত্ব আলোচনার পরম সুযোগও আসিতেছে। কিন্তু তৎ-এর সাক্ষাৎ তো জীবনে ঘটিতেছে না। শাস্ত্রানুশীলন ও সাধন-ভজনের লক্ষ্য—সেই 'তৎ', সেই পরমপুরুষ। তাঁহার দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি তো আজিও হয় নাই। এ জীবন তাই একেবারে ব্যর্থ, 'বন্ধ্যা'। প্রকৃত সমর্থ সদ্‌গুরুর কৃপা না পাইলে, ইষ্ট সাক্ষাৎ তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু কে তাঁহার এই সদ্‌গুরু? কোথায় কখন ঘটিবে তাঁহার কৃপাঘন আবির্ভাব? আজকাল এই চিন্তাই বেশীর ভাগ সময় মাণিক্যবাচককে ব্যাকুল করিয়া রাখে।

এ সময়ে পাণ্ড্যরাজ একদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, "ছাখো মন্ত্রী, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মতিগতি তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করতে হলে অশ্বারোহী সেনাকে নূতন ক'রে সংগঠিত করা দরকার। এজন্য চাই প্রথম শ্রেণীর অশ্ব সংগ্রহ। কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে তুমি নিজেই তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে চলে যাও। উৎকৃষ্ট অশ্ব কিনে নিয়ে এসো।"

অর্থ ও লোকলস্কর নিয়া মাণিক্যবাচক চলিয়া গেলেন। কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্যরূপ। তিরুপ্পেরুন্দুরাই-তে পৌঁছানোর পর তাঁহার জীবনে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা। যে সদ্-

গুরুর জন্য এতকাল ব্যাকুল হইয়া দিন কাটাইয়াছেন, এ সময়ে এখানে হঠাৎ তিনি হন আবির্ভূত।

গুরু ছিলেন এক সিদ্ধ শৈবযোগী, তাঁহার কৃপায় তরুণ সাধক মাণিক্যবাচক অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যান। দিব্য অনুভূতি লাভ ও ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহার সাধনজীবন হয় কৃতকৃতার্থ।

মাণিক্যবাচক-কে কয়েকদিন নিজ সান্নিধ্যে রাখার পর গুরু মহারাজ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়-ক্ষণে কহিলেন, "বৎস, আমার ঈশ্বর-আদিষ্ট কাজ শেষ হয়েছে। আমি এবার পরিব্রাজনে যাচ্ছি, পরে প্রয়োজন মত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তোমার প্রতি আমার দুটি নির্দ্দেশ রইলো। এই স্থানটি বড় জাগ্রত, বড় পবিত্র। এস্থানে তুমি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করো। বহু শিবভক্ত এর আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এটা হবে তাঁদের প্রধান সাধনকেন্দ্র, বহু নরনারী এর ফলে উপকৃত হবে। আর একটি কথা। এখন থেকে তুমি ব্রতী হও প্রভু শিবজীর স্তবগাথা রচনায়। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার এই শিবস্তবমালা যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষকে প্রেরণা দেবে, মোক্ষপথের পাথেয় হয়ে থাকবে।"

গুরুর নির্দ্দেশ পালন করিতে মাণিক্যবাচকের বিলম্ব হয় নাই। রাজার অশ্ব ক্রয়ের জন্য হাতে যে টাকা ছিল তাহাই তিনি নিয়োজিত করিলেন মন্দির নির্ম্মাণের কাজে। তারপর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব শেষ করিয়াই উপস্থিত হইলেন পাণ্ড্যরাজের সকাশে। অকপটে নিবেদন করিলেন তাঁহার অপরাধের কথা। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, রাজকোষের অর্থ আপনার বিনা অনুমতিতে আমি ব্যয় করেছি, আমি জানি আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। আপনি আমার সমুচিত দণ্ড বিধান করুন।"

পাণ্ড্যরাজ তখন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। তৎক্ষণাৎ মাণিক্যবাচককে তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন, প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে কারাগারে। কহিলেন, সমস্ত ঘটনার তদন্ত শেষ হলে আমি এই অপরাধের বিচার করবো।"

নির্দ্ধারিত দিনে, বিচার সভায় বন্দী মাণিক্যবাচক-কে নিয়া আসা হইল। পাণ্ড্যরাজের ক্রোধ ইতিমধ্যে কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে। ঘটনার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শুনিয়া প্রিয় প্রাক্তন মন্ত্রীর উপর কিছুটা সদয় হইয়াও উঠিয়াছেন।

রাজা কহিলেন, "মাণিক্যবাচক, রাজমন্ত্রী হয়ে যে অপরাধ তুমি করেছো, তা অত্যন্ত গুরুতর। এজন্য সমুচিত দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড। কিন্তু সে দণ্ড আমি তোমায় দিচ্ছিনে। সরকারী তদন্তের ফলে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তুমি ভাবাবেগের বশে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলে, রাজকোষের অর্থ দিয়ে শিব মন্দির তৈরী করেছিলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এ অর্থ তুমি নাও নি। আরও একটা কথা। তুমি মন্ত্রী পদে আসীন থাকার কালে আমার এ রাজ্যের কল্যাণে অনেক কিছু করেছো। তাছাড়া, শিবভক্ত সাধক বলে তোমায় আমরা এতকাল মর্য্যাদা দিয়ে আসছি। এসব কথা স্মরণে রেখে, আমি তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান দিচ্ছিনে। তুমি পদচ্যুত হয়েছো, কারাগারে এতদিন যাপন করেছো, তাতেই তোমার শাস্তি কিছুটা হয়েছে। তবে রাজ-অর্থের অপব্যবহারের জন্য তোমার সমস্ত কিছু অর্জিত ধন-সম্পত্তি আমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করলাম। এবার তুমি মুক্ত। অতঃপর যেখানে তোমার ইচ্ছে, তুমি যেতে পারো।"

পাণ্ড্যরাজের আদেশ শুনিয়া মাণিক্যবাচক-এর আনন্দ আর ধরে না। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, এমনিতর মুক্তিই যে আমি এযাবৎ মনে-প্রাণে কামনা ক'রে এসেছি। আমার ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে আপনি আমায় বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার থেকে আমার একমাত্র কাজ হবে দীনবেশে ইষ্টদেব শিবজীর স্তুতিগান করা আর এদেশের সাধন-পীঠে মন্দিরে মন্দিরে পরিব্রাজন করা।"

শিবভক্তি ও শিবমাহাত্ম্য প্রচারের এই ব্রতই মাণিক্যবাচক জীবনের শেষ দিন অবধি উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ও ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে অপরূপ

স্তবমালা দিনের পর দিন তিনি রচনা করিয়াছেন, দেশের ভক্তজন ও অধ্যাত্মরসের রসিকদের কাছে তাহা গণ্য হয় মণিমাণিক্যের মত মূল্যবান বলিয়া। জনসাধারণ তাই তাঁহাকে আখ্যা দেয়—মাণিক্য-বাচক, অর্থাৎ বাক্য তাঁহার মাণিকের মত দ্যুতিমান, মূল্যবান।

শৈব সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ চিদম্বরমে মাণিক্যবাচক তাঁহার জীবনলীলায় ছেদ টানিয়া দেন। জনশ্রুতি আছে, দিব্য ভাবাবেশে শিবের স্তুতিগান করিতে করিতে এই মহাত্মা চিদম্বরমের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ নটরাজের অভ্যন্তরে লীন হইয়া যান।

মাণিক্যবাচকের জীবন ছিল দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শিব-চৈতন্যময়। তাঁহার অমর স্তবগাথার গ্রন্থ 'তিরুবাচকম' উত্তরকালে কীর্ত্তিত হয় ভক্তি প্রবাহের উৎস রূপে, উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের অমৃতরসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে এই স্তবমালায়। সাধকজীবনের স্তরে স্তরে যে দিব্য অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, যে দিব্য-চেতনার মধ্য দিয়া সাধক চরম পর্য্যায়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন, তিরুবাচকম-এ রহিয়াছে তাহারই অপরূপ ব্যঞ্জনা। আজো তামিল দেশের শৈব ভক্ত ও মুমুক্ষুরা এই স্তবগাথা হইতে লাভ করে পরম পথের পাথেয়।[১]

সিদ্ধ শৈব মহাপুরুষ এই মাণিক্যবাচকের ত্যাগপূত আদর্শ এখন হইতে হইয়া উঠে অপ্পরের সাধনজীবনের ধ্রুবতারা, তিরুবাচকম-এর স্তবগাথার প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন, নিগূঢ় চৈতন্যময় জীবনের স্তর একটির পর একটি উন্মোচিত হয় তাঁহার সম্মুখে। শুধু তাহাই নয়, এখন হইতে ভাবাবিষ্ট অপ্পরের কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইতে থাকে ইষ্টদেব শিবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক স্তোত্রমালা। অচিরে এই স্তোত্রসমূহ জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

ইষ্ট দর্শন ও মুমুক্ষুর আকুতি অতঃপর অপ্পরকে ব্যাকুল করিয়া

১ কালচারাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া ভল্যু. ২,—দ্য শৈব সেইণ্টস্ঃ এস, এস, পিল্লেই

তোলে। গুরু মহারাজের নিকট নূতনতর সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য তিনি ছুটিয়া যান।

শৈব সাধনার কয়েকটি নিগূঢ় ক্রম গুরু এবার তাঁহাকে শিক্ষা দেন। প্রসন্ন কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া বলেন, "বৎস, সাধনার এই ক্রমগুলো সমাপ্ত করো, আর এই সঙ্গে নিজের অহংবোধের মূলকে করো উৎপাটিত। ইষ্টদেব শিবজীর ভৃত্যরূপে নিজেকে সদাই গণ্য ক'রে চলবে। আশীর্ব্বাদ করছি, অচিরে হবে তোমার ইষ্টদর্শন। ইষ্টকৃপায় মোক্ষলাভও তোমার হবে।"

এখন হইতে সাধনার গভীরে অপ্পর নিমজ্জিত হইয়া যান। নিত্যকার সাধন-ভজন শেষে যেটুকু সময় পান, আপন মনে স্বরচিত শিবস্তব তিনি গাহিয়া বেড়ান। সর্ব্বত্যাগী সাধকের পরনে একটি জীর্ণ বহির্ব্বাস, হস্তে একটি খুরপি -গ্রামে গ্রামান্তরে যেখানে যে শিবমন্দির আছে এই খুরপি দিয়া তাহার পরগাছা উৎপাটন আর ময়লা নিষ্কাশন করাই হয় তাঁহার নিত্যকার কর্ম্ম। প্রভু শিবের একান্ত দাস " সেবকরূপে তামিল দেশের সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

শিব শরণাগতির এই সাধনা, অহংবোধ উৎপাটনের এই ব্রত অপ্পরের জীবনে এবার সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব পরম কারুণিক শিবের সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেন।

মধুর কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস অপ্পর আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, যেমন তোমার অভিরুচি---বর মেগে নাও।"

ত্যাগব্রতী সাধক করজোড়ে উত্তর দেন, "প্রভু, দাসরূপে সেবা ক'রে তোমার দুর্লভ সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, তোমার দাসরূপেই যেন চিরদিন আমি থেকে যাই। এই কৃপাই তুমি আমায় করো।"

ইষ্টদেব স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তথাস্তু।"

সিদ্ধ সাধক অপ্পরের জীবনে এবার উন্মোচিত হয় এক নূতন অধ্যায়। দৈন্যময়, ত্যাগব্রতী এই মহাপুরুষের চরণতলে আসিয়া দিনের পর দিন সমবেত হইতে থাকে শত শত নরনারী। গৃহপ্রাঙ্গণ

শিবভক্তদের উচ্চারিত স্তবগানে মুখর হইয়া উঠে। কাঞ্চী, মাদুরা, চিদম্বরম প্রভৃতি নগরেও শৈব সাধক অপ্পরের খ্যাতি অচিরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

কাঞ্চীর জৈন সাধক ও শাস্ত্রবিদেরা এবার চঞ্চল হইয়া উঠেন। অপ্পর যে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের এক প্রতিভাধর নবীন পণ্ডিত। তাঁহার উপর অনেক আশা-ভরসা করিয়া আছেন। রাজধর্ম্মের বিশিষ্ট ধারক বাহকেরা। জৈনধর্ম্মের প্রচারে অপ্পর প্রাণমন ঢালিয়া দিবেন, এই ধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবেন, তাহা নয়, একেবারে বিপরীত বুদ্ধি নিয়া শৈব ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় তিনি ঘটাইতে বসিয়াছেন!

রাজপণ্ডিতেরা পাণ্ড্যরাজের কাছে গিয়া অভিযোগ তুলিলেন, "মহারাজ, জৈন মণ্ডলীর সংস্রব অপ্পর ত্যাগ করেছে. শুধু তাই নয়, সরকারী বিদ্যাপীঠে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে যে উপকার সে পেয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে হয়েছে বিস্মৃত। জৈনধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে শুরু করেছে শৈবধর্ম্মের প্রচার। অবিলম্বে তার দণ্ডবিধান না করলে রাজকীয় ধর্ম্ম শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, আদেশ দেন, "জৈনধর্ম্মত্যাগী এই নবীন আচার্য্যকে সত্বর রাজসভায় উপস্থিত করো। বিচারে তার সমুচিত দণ্ড বিধান করা হবে।"

অপ্পরকে রাজার সন্নিধানে নিয়া আসা হইল। রাজ-পণ্ডিতদের অভিযোগের উত্তরে শান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আমি চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে রত রয়েছি। এজন্য বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ কোন পন্থারই শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ বাদ দিই নি। জৈন মত আমি গ্রহণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁর পরে প্রভু শিবজীর অপার করুণায় পরমতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি। ইষ্ট সাক্ষাৎকারের ফলে জীবন আমার হয়েছে কৃতকৃতার্থ। এতে আমার কোন অপরাধ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

পাণ্ড্যরাজ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তুমি কি জানো না, জৈনধর্ম্ম এখানকার রাজধর্ম্ম? সেই ধর্ম্ম একবার গ্রহণ ক'রে

তুমি তা ত্যাগ করেছো। এজন্য কঠোর শাস্তি তোমায় পেতে হবে। তাছাড়া, অপ্পর, তুমি রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করেছো, রাজকোষের বহু অর্থ রাজপণ্ডিতদের বহু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে তোমার জন্য।"

"মহারাজ যা বলছেন তা সত্যি। কিন্তু আমার দিক দিয়ে কিন্তু অধর্ম্মাচরণ আমি কিছু করি নি। ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য—পরম সত্য আবিষ্কার করা, আর সেই সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকা। শৈবধর্ম্মের ছায়াতলে এসে, পরমপুরুষ শিবের আশ্রয়ে এসে, আমি সত্যকেই লাভ করেছি। জীবন আমার ধন্য হয়েছে।"

"তবে কি তুমি বলতে চাও, রাজকীয় জৈনধর্ম্মে সত্যবস্তু নেই? তা রয়েছে শুধু শৈবধর্ম্মেই।"—রাজা তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়ার মত হইয়াছেন।

সভায় উপস্থিত জৈন পণ্ডিতেরা উত্তেজিত স্বরে কোলাহল শুরু করিলেন, "মহারাজ, রাজধর্ম্মের অবমাননাকারী এই দুর্বৃত্তকে আপনি চরম দণ্ড দিন। নইলে এ রাজ্যের মহা অকল্যাণ হবে।"

পাণ্ড্যরাজ দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য অপ্পর! তুমি রাজধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, তার বিরুদ্ধে অপমানসূচক বাক্য ব'লে ঘোরতর অপরাধ করেছো। সুপণ্ডিত হয়েও একাজ তুমি করেছো, তাতে অপরাধের গুরুত্ব আরো বেড়েছে। তাই তোমার জন্য চরম দণ্ডের,—প্রাণদণ্ডের আদেশ আমি দিচ্ছি।"

ফৌজদারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল, অপরাধী অপ্পরকে বধ করা হইবে উচ্চ পাহাড়ের চূড়া হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া। এই দণ্ডদানের দৃশ্য দেখার জন্য কৌতূহলী জনতার ভীড় জমিয়া উঠে।

রাজার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয় বটে, কিন্তু সাধক অপ্পর বিস্ময়করভাবে প্রাণে বাঁচিয়া যান। দেখা যায়, পর্ব্বত শীর্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত তাঁহার দেহটি সানুদেশের এক আগাছার উপর পতিত হইয়া কোনমতে রক্ষা পাইয়াছে।

সমবেত জনতা এবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। উচ্চ কণ্ঠে

অপ্পরের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। অনেকে বলাবলি করিতে থাকে—'শিবের একান্ত ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ এই অপ্পর। স্বয়ং শিবই কৃপা ক'রে রক্ষা করেছেন ওর জীবন।'

রাজপুরুষেরা ছুটিয়া গিয়া রাজসকাশে এই ঘটনার কথা নিবেদন করিলেন। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি অপ্পরকে আবার পাহাড় চূড়া হইতে নিক্ষেপ করা হইবে?

পাণ্ড্যরাজ কহিলেন, "না, এভাবে আর ওর প্রাণ বধের চেষ্টা ক'রো না। হাজার হাজার উত্তেজিত লোকের সামনে একাজ করারও প্রয়োজন নেই। বরং অপ্পরকে তোমরা গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাও। গলদেশে ভারী পাথর বেঁধে জলগর্ভে ফেলে দিয়ে এসো।"

আদেশ মত কাজ সমাধা করিয়া রাজপুরুষেরা কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল—এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সমুদ্র-গর্ভে তলাইয়া গিয়াও অপ্পর প্রাণ হারান নাই, ইষ্টদেব শিবের কৃপায় গলার বন্ধনী হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটি কখন খসিয়া গিয়াছে। তারপর তাঁহার অচেতন দেহ তরঙ্গের আঘাতে বেলাভূমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।[১] সেখান হইতে ধীবরেরা তাঁহাকে উঠাইয়া নেয় এবং শুশ্রূষার ফলে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে।

সুস্থ হইয়া উঠিয়া অপ্পর ধীবরদের সব কথা খুলিয়া বলেন তারপর ধীরপদে উপনীত হন রাজপ্রাসাদের দ্বারে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হয় নাই, তাই তাঁহার পিছনে সমবেত হইয়াছে এক বিরাট জনতা।

জনতার বিশ্বাস, সাধক অপ্পর শিবের অনুগৃহীত, তাই শিবের কৃপাতেই দুই-দুইবার তিনি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাহাদের কয়েকজন মুখপাত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

১ তামিলদেশের তীরভূমির লোকদের বিশ্বাস, শিবের কৃপা অপ্পরের গলার প্রস্তরকে হাল্কা ভাসমান কাষ্ঠে পরিণত করে এবং তাঁহাকে বেলাভূমিতে ভাসাইয়া নিয়া আসে। অপ্পরের ভাসমান দেহটি সমুদ্রতটের যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আজিও বহু শৈবসাধক ও ভক্ত সেস্থানটিকে পুণ্যপীঠ বলিয়া গণ্য করেন।

অপ্পর শিবের কৃপায় দ্বিতীয়বার প্রাণে বেঁচে এসেছেন, ইনি সিদ্ধ পুরুষ—এ যুগের প্রহ্লাদ। আপনি এবার তাঁকে মুক্তি দিন, সমবেত জনগণের সন্তুষ্টি বিধান করুন।"

দুই দুইবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপ্পর অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাইয়াছেন। পাণ্ড্যরাজের মনোভাব তাই ইতিমধ্যে নমনীয় হইয়া আসিয়াছে। অপ্পরকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "অপ্পর, আমি বুঝতে পারছি, কোন বিরাট শক্তি দ্বারা তুমি রক্ষিত। প্রকৃত ব্যাপারটি কি তুমি আমায় খুলে বলো।"

উদ্ধারকর্তা ইষ্টদেব শিবের কথা স্মরণ করিতেই সাধক অপ্পর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। নয়ন দুটি তাঁহার নিমীলিত, আননে দিব্য জ্যোতির আভা, কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। যুক্তকরে গাহিয়া উঠেন স্বরচিত শিবমহিমার স্তবগাথা :

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালা
গলায় পরেছেন আমার প্রভু দেবাদিদেব,
সৃষ্টি আর প্রলয়ের লহরী লীলায়—
কখনো মঙ্গলময় শিবরূপে, কখনো রুদ্ররূপে
নিজেকে করছেন তিনি বিলসিত।
এই আদি অন্তহীন বিভুকে
কি ক'রে করবো ধারণ
ক্ষুদ্র মানুষের এই অন্তর পটে ?
কি ক'রেই বা পাবো উদ্ধার
ভয়াল মৃত্যু আর বিনষ্টির হাত থেকে ?
মূর্খ আমরা, তাই অভিমানের প্রাচার গ'ড়ে
ঠেকিয়ে রেখেছি শিবের ত্রিনয়নের জ্যোতি,
সত্য শিব সুন্দরকে রেখেছি দূরে সরিয়ে।
আত্ম-অভিমানের সে প্রাচীর গুঁড়িয়ে দাও
এগিয়ে চলো দৈন্য আর একান্ত শরণের সাধনায়,
প্রভুর কিঙ্কর আর সেবক রূপে
দাও নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে।

তবেই তো হবে প্রভুর করুণা সম্পাত,
তবেই তো প্রিয় দাসকে করবেন আত্মসাৎ।
কল্যাণ আর অমৃতের ধারা
তবেই তো পড়বে ছড়িয়ে জীবনের স্তরে স্তরে।

(তেবরম্)

এই দিব্য ভাবাবেশ আর এই প্রাণ গলানো ইষ্টস্তুতির মধু-ঝঙ্কার পাণ্ড্যরাজকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অপ্পরের পদতলে তিনি লুটাইয়া পড়েন, ব্যাকুল কণ্ঠে মাগেন তাঁহার কৃপা ও আশ্রয়।

শৈবসাধক অপ্পরের কাছে রাজা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, ইহার ফলে সারা তামিলদেশে দেখা দেয় শৈব সাধনা ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। মাত্বরা, কাঞ্চী ও চিদম্বরমের মন্দির ও ধর্ম্মসভাগুলিতে শিবভক্ত সন্ন্যাসী ও আচার্য্যদের প্রাধান্য এবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

রাজগুরু অপ্পরকে পরম সমাদরে আহ্বান করা হয় নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। কিন্তু এ আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যুক্তকরে কহেন, "আমি শিবের দাস, শিব-কৃপার দীন ভিখারী। আমার জীবনের একমাত্র ব্রত স্বহস্তে ইষ্ট বিগ্রহের সেবা পূজা করা, আর দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া তাঁর মাহাত্ম্যের কথা। শিবের দাসত্ব ক'রে শিবের কৃপা যেন মর্ত্ত্যধামে নামিয়ে আনতে পারি, এই আশীর্ব্বাদই আপনারা আমায় করুন।"

সমকালীন শৈব-আন্দোলনের নেতা যিনি, রাজগুরুরূপে লোক-গুরুরূপে সর্ব্বত্র যিনি পূজ্য, এ কি অদ্ভুত দৈন্যময় আচরণ তাঁহার। একফালি জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড তাঁহার কোমরে জড়ানো, হাতে একটি ঝুড়ি আর খুরপি। এই বেশে অপ্পর দেশের নানা শৈব তীর্থ ও জনপদে ঘুরিয়া বেড়ান। সঙ্গে চলে কোদালী ও সম্মার্জ্জনী হস্তে শত শত ভক্ত। শিব মন্দিরের আগাছা ও ময়লা সযত্নে তাঁহারা পরিষ্কার করেন। ধৌত করেন আঙিনা ও পয়ঃপ্রণালীর যত কিছু পূতিগন্ধময় জঞ্জাল। এই সঙ্গে পথে-ঘাটে মন্দির-অঙ্গনে গীত হইতে থাকে অপ্পরের ভক্তিরসাত্মক শিব-ভজন ও শিবস্তুতি। ত্যাগ

তিতিক্ষা ও নিরভিমানতার মূর্ত্ত বিগ্রহ মহাপুরুষ অপ্পর যে মন্দিরে যে সাধনপীঠে উপস্থিত হন, সহস্র লোকের ভীড় জমিয়া উঠে। তাঁহার প্রচারিত দাসমার্গীয় শৈব সাধনার উঠে জয় জয়কার।

এমনি এক পদযাত্রার কালে, চিদম্বরমের শৈবপীঠে অপ্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে শিবভক্তি-সিদ্ধ কিশোর সাধক 'জ্ঞানসম্বন্ধর'-এর। সম্বন্ধর নামে জনসাধারণের মধ্যে এই সাধক পরিচিত; উভয়ের এই সাক্ষাতের ফলে তামিলদেশের শৈব আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভক্ত সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় নূতনতর চেতনায়।

মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া অপ্পর সেদিন খুরপি হস্তে পরগাছা ও ময়লা নিষ্কাশন করিতেছেন, শত শত অনুগামীর কণ্ঠে উদ্‌গীত হইতেছে শিব মহিমার স্তুতি গান। এমন সময়ে ভক্ত-প্রবর সম্বন্ধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। শিব-চেতনায় সদা আবিষ্ট, সিদ্ধ মহাত্মা অপ্পরকে দর্শন করা মাত্র ভাবাবেশে তিনি উদ্দীপিত হন, ছুটিয়া গিয়া লুটাইয়া পড়েন তাঁহার চরণতলে। আকুল কণ্ঠ হইতে বার বার উচ্চারিত হইতে থাকে, অপ্পর—অপ্পর।[১]

ভূমিতল হইতে সম্বন্ধরকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া অপ্পর তাঁহাকে আবদ্ধ করেন নিবিড় আলিঙ্গনে। দুই প্রসিদ্ধ শিবভক্তের মিলনে মন্দির-চত্বরে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া যায়।

বয়সে কিশোর হইলেও সম্বন্ধর ছিলেন এক ভক্তিসিদ্ধ সাধক। তিনি ছিলেন কৃপাসিদ্ধ। কথিত আছে, হরপার্ব্বতীর কৃপার ধারা বালক বয়সেই তাঁহার উপর বর্ষিত হয় এবং বালক বয়স হইতেই তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগবিভূতি। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার অলৌকিক সিদ্ধির প্রসিদ্ধি স্থানীয় শৈব ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

সম্বন্ধর তখন নিতান্ত বালক। পিতার সঙ্গে গ্রামের উপান্তে

১ তামিল শব্দ অপ্পর-এর অর্থ—পিতা। প্রথম জীবনে সাধক অপ্পর ভক্ত সমাজে পরিচিত ছিলেন তিরুণাবুক্করসু নামে জনশ্রুতি আছে, চিদম্বরমে সাক্ষাতের কালে কিশোর সাধক সম্বন্ধর ভাবাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে অপ্পর বলিয়া ডাকিয়া উঠেন। উত্তরকালে ভক্ত সমাজে এই অপ্পর নামই প্রচলিত হয়।

শিব মন্দিরে সেদিন বেড়াইতে গিয়াছেন। স্নান-তর্পণ সমাপন করিয়া পূজায় বসিতে হইবে, পিতা তাই পবিত্র কুণ্ডের জলে দাঁড়াইয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আর পুত্র রহিয়াছেন তীরে দণ্ডায়মান। হঠাৎ দেখা গেল, বালক পুত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দুই চোখ রক্তবর্ণ, দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, গদ্‌গদ স্বরে বার বার সে বলিতেছে, "ঐ যে বাবা, আর ঐ যে আমার মা। বাবা—মা, বাবা—মা।" বার বার ব্যগ্রভাবে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে শিব মন্দিরের চূড়ার দিকে !

পিতা তো মহা সন্ত্রস্ত। তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। পুত্র কি কোন কারণে হঠাৎ ভয় পাইয়াছে ? অথবা বিষাক্ত কিছু খাইয়া আবোল-তাবোল বকিতেছে ?

লক্ষ্য করিলেন, তাহার গালের দুই কস্‌ বাহিয়া দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িতেছে। "কোথায় কি খেয়েছিস্‌ ঠিক ক'রে বল্‌। ওরে শিগ্‌গীর বল্‌।"—পিতা আকুল স্বরে প্রশ্ন করেন।

পুত্র এবার কিছুটা স্থির হয়, বাহ্যজ্ঞান তাহার ফিরিয়া আসে। ধীর কণ্ঠে জানায়, এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কুণ্ডের তীরে সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ দেখে—মন্দির শীর্ষে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে হরপার্ব্বতী হইয়াছেন আবির্ভূত। কৃপাময়ী মা পার্ব্বতী দুগ্ধপূর্ণ একটি সোনার ভাঁড় হাতে নিয়া নীচে নামিয়া আসেন, স্নেহভরে বালককে উহা পান করান। সেই দুগ্ধেরই চিহ্ন এখনো রহিয়াছে তাহার মুখে।

হরপার্ব্বতীর দিব্য মূর্ত্তি ক্ষণপরেই আকাশে মিলাইয়া যায়। কিন্তু যে অহেতুক কৃপার ধারা এই বালকের প্রতি বর্ষিত হয় তাহার ফলে অলৌকিক জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে, প্রকাশ ঘটে অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতির।

কুণ্ডের তীরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তখন বহু স্নানার্থী ও ভক্তের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হর-পার্ব্বতীর আশিস্‌-প্রাপ্ত বালক আবৃত্তি করিতে থাকে তাহার স্বরচিত অপরূপ শিবস্তুতি। চারিদিকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এই

কৃপাসিদ্ধ বালকের বিস্ময়কর কাহিনী। বালককালেই শিবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাই ভক্তসমাজ এই বালকের নামকরণ করেন—'জ্ঞানসম্বন্ধর' অর্থাৎ, দিব্যজ্ঞানের সহিত যিনি রহিয়াছেন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত।

সম্বন্ধর যেমন অপ্পরকে পিতারূপে গ্রহণ করেন, তেমনি অপ্পরও তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই ভক্তিসিদ্ধ শৈবসাধক এক নিগূঢ় আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দক্ষিণদেশের শৈবধর্ম্মের উজ্জীবনে একযোগে প্রচার কর্ম্ম শুরু করেন। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যুক্তভাবে এই দুই মহাত্মা পরিব্রাজন করিতেন, আর শত শত ভক্ত নরনারী করিত তাঁহাদের অনুসরণ।

ইষ্টদেব শিবকে সাধক অপ্পর আরাধনা করিতেন কিঙ্কররূপে, আর সম্বন্ধর-এর দৃষ্টিতে শিব প্রতিভাত হইতেন পিতারূপে। পৃথক দৃষ্টি-কোণ হইতে ইষ্ট-আরাধনায় উভয়ে রত থাকিলেও ত্যাগ তিতিক্ষা ও শরণাগতির দিক দিয়া তাঁহারা ছিলেন একই সাধনপথের সহযাত্রী। সিদ্ধ শৈবাচার্য্য হিসাবে অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর জীবনে যে অলৌকিক জ্ঞান ও যোগ-বিভূতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহাও সমভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে দেশের অগণিত শিবভক্ত নরনারীকে। অপ্পর ও সম্বন্ধর-এর রচিত শিব-মহিমার শত শত স্তবগাথা আজও তামিলদেশের সাধকেরা পথে-প্রান্তরে মঠে-মন্দিরে গাহিয়া বেড়ান, ভক্তহৃদয়ে শিবভক্তির প্লাবন বহিয়া যায়।[১]

সে-বার ভক্তপ্রবর জ্ঞানসম্বন্ধর কিছুদিনের জন্য অন্যত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন। মহাত্মা অপ্পর স্থির করিলেন, কিছুদিন তিনি নিভৃতে বাস করিবেন, নিগূঢ় সাধনায় থাকিবেন নিমজ্জিত। পরিব্রাজনের পথে পড়িল তিরুপ্পুগালুর-এর প্রসিদ্ধ শিব মন্দির ও সাধনপীঠ। এখানেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১ তেবরম্ গ্রন্থে অপ্পর-এর রচিত বহু দিব্যভাবের উদ্দীপক স্তবগাথা সংকলিত হইয়াছে ; এই স্তবসমূহের সংখ্যা তিন শতাধিক।

অপ্পরের নব ধর্ম্মপ্রচার ও সিদ্ধপুরুষরূপে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা একদল বিরোধী লোকের সহ্য হয় নাই। তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য দুষ্টেরা গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। তিরুপ্পুগালুর-এ অপ্পর যখন নিভৃতে বাস করিতেছেন, তখন তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

রাত্রিকালে কয়েকটি সুন্দরী ভ্রষ্টা নারীকে তাহারা পাঠাইয়া দেয় অপ্পরের কাছে, প্রচুর ধনরত্নের প্রলোভনও তাঁহাকে দেখানো হয়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক অপ্পরকে প্রলুব্ধ ও বশীভূত করা দূরের কথা, এই নারীরাই তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ে, চরণতলে লুটাইয়া বার বার করে ক্ষমা প্রার্থনা।

চক্রান্তকারীরাও অনুতপ্ত হয় এবং তাহাদের কয়েকজন এ সময়ে অপ্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, বিশিষ্ট শৈব সাধকরূপে উত্তরকালে তাহারা পরিচিত হইয়া উঠে।[১]

দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ শৈব সাধক ও আচার্য্যদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। ভক্তদের মতে, পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ঋষি ছিলেন শৈব সাধনার প্রধান ধারক ও বাহক। তামিল দেশীয় পুরাণে শিব ও মুরুগ-এর (সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়) সিদ্ধ সাধক অগস্ত্য সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিক যুগে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে, পাণ্ড্য রাজসভার আচার্য্য শৈব সাধক নক্কির-এর প্রভাব প্রতিপত্তির নানা তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী শতকে কালহস্তীর অরণ্যচারী রাজা কন্নপ এক সিদ্ধ শিব-ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, কন্নপ এক সময়ে ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া ইষ্টদেব শিবের চরণে পুষ্পরূপে অর্ঘ্য প্রদান করেন তাঁহার নিজের একটি চক্ষু। অপর চক্ষুটিও উৎপাটন করিতে যাইবেন এমন সময়ে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন তাঁহার সম্মুখে। প্রভুর বরে ভক্ত-প্রবর লাভ করেন পরম দিব্যলোক দর্শনের শক্তি।

---

১ কালচারাল্ হেরিটেজ—শৈব সেইন্ট্স্ : এম. এস. পিল্লেই

পঞ্চম শতকে তামিলদেশে আবির্ভূত হন প্রখ্যাত শৈবযোগী তিরুমূলার। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক যোগবিভূতির নানা কাহিনী দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। জনশ্রুতি আছে, পরকায় প্রবেশের শক্তি ছিল তিরুমূলার-এর। এক শুদ্ধসত্ত্ব রাখাল বালকের মৃতদেহে তিনি যোগবলে প্রবিষ্ট হন এবং এই দেহে থাকিয়া সহজ সরল ভাষায় রচনা করেন প্রায় তিন হাজার শিব-মহিমার স্তব-গাথা। তিরুমূলার-এর জীবন ও বাণী শিবতত্ত্ব ও শৈব ধ্যান-ধারণাকে দেশের দিক্‌বিদিকে বিস্তারিত করে।

পরবর্ত্তী যুগে দক্ষিণী শৈব সাধনা ও ধর্ম্ম-আন্দোলন সুসম্বদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে চারিটি প্রধান শৈবাচার্য্যের মাধ্যমে। মাণিক্যবাচক, অপ্পর (তিরুণাবুক্করসু), জ্ঞানসম্বন্ধর, এবং সুন্দরমূর্ত্তি যথাক্রমে প্রচার করেন শিবসাধনার চারিটি পৃথক পৃথক পন্থা—জ্ঞান, চর্য্যা, ক্রিয়া ও যোগ। এই পন্থাগুলি সন্মার্গ, দাসমার্গ, সৎপুত্র মার্গ ও সহমার্গ নামেও শৈব আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া আছে।

সিদ্ধ শৈব সাধক আচার্য্যপ্রবর অপ্পর ছিলেন দাসমার্গের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। তাঁহার মতে, 'দেবাদিদেব শিব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর তিনিই একমাত্র প্রভু। জীব তাঁহার নিত্যদাস। আত্মঅভিমান ত্যাগ করিয়া দাস রূপে তাঁহার সেবা করো, একান্ত শরণ নিয়া তাঁহার চরণে তনু মন প্রাণ করো উৎসর্গ, তবেই লাভ করবে বহু প্রার্থিত পরমা মুক্তি।'

অপ্পরের এই দাসমার্গীয় শৈবধর্ম্ম শুধু তামিলদেশেই নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দ্রুত প্রসার লাভ করে। পাণ্ড্যরাজ মহেন্দ্র ছিলেন তাঁহার অনুগত শিষ্য। কাঞ্চী মাদুরা চিদম্বরম প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরাও মহাত্মা অপ্পরের শিব ভক্তির আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। শহরে জনপদে যেখানেই যাওয়া যাইত, শত শত ভক্ত গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসীর কণ্ঠে শুনা যাইত এই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের কৃপালীলার নানা অলৌকিক

কাহিনী। মন্দিরে মন্দিরে পথে-প্রান্তরে গীত হইত তাঁহার রসমধুর শিবগাথা।

সিদ্ধ জীবনের লীলা, পরিব্রাজন ও শিবমহিমার প্রচার এবার শেষ অধ্যায়ে আসিয়া পড়ে, মহাত্মা অপ্পর এবার উৎসুক হন ইষ্টদেব শিবের চরণে লীন হওয়ার জন্য। প্রবীণ সিদ্ধপুরুষের স্তবগাথায় বার বার ধ্বনিত হইতে থাকে "প্রভু, এবার তোমার কিঙ্করকে কৃপা ক'রে টেনে নাও তোমার জ্যোতির্লোকে, পরমা মুক্তির মহাসাগরে করো তাকে নিমজ্জিত।

ইষ্টদেব মহেশ্বর সেদিন আবির্ভূত হন। অপ্পরের নয়ন সমক্ষে, আর্ত্তি ও প্রার্থনার উত্তরে বলেন,—'তথাস্তু'।

৬৮০ খৃষ্টাব্দে একাশী বৎসর বয়স্ক এই প্রবীণ সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় শৈবাচার্য্যের মরলীলায় ছেদ পড়িয়া যায়, চির ঈপ্সিত শিবধামে ঘটে তাঁহার মহা উত্তরণ।

অদ্বৈত আচার্য্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রাক্‌কাল পূর্ব্ব-নবদ্বীপ তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের তখন মহাপ্রতাপ। বিদ্যাগর্ব্বী পণ্ডিতেরা আপন অহমিকা নিয়া মত্ত, ন্যায়ের কচ্‌কচি আর কূটতর্কের ভীড়ে ভক্ত বৈষ্ণবের দল কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে। প্রেমভক্তির কথা উত্থাপন করিলে, নৃত্য কীর্ত্তন ও নামগান করিতে গেলে, লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হইতে হয়। এমনি সময়ে মুষ্টিমেয় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত।

অসাধারণ শাস্ত্রবেত্তা এই আচার্য্য। পাণ্ডিত্যের সাথে তাঁহার জীবন পাত্রে আসিয়া মিশিয়াছে প্রেমভক্তির অপরূপ সুধা—বহু বৎসরের নৈষ্ঠিক সাধনার ফলে তাঁহার জীবনে উপর্জিত হইয়াছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। সেদিনকার দিনে ভক্ত সাধক অদ্বৈত আচার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন বৈষ্ণবদের প্রবীণতম নেতা, তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ও ভরসাস্থল।

কখনো শান্তিপুরে, কখনো বা নবদ্বীপে নিয়মিতভাবে আচার্য্যের ধর্ম্মসভা বসে। গৌরকান্তি, শ্মশ্রু গুম্ফ-শোভিত, প্রবীণ সাধক তাঁহার ক্ষুদ্র ভক্ত সভাটিতে বসিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতা ও ভাগবতের শ্লোক। দুই নয়ন তাঁহার ভক্তিরসে ছলছল হইয়া উঠে, ভক্ত শ্রোতাদের অন্তরে জাগে দিব্য শিহরণ।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ অদ্বৈত প্রভু তাঁহার সাধ্যমত প্রদান করেন। সারগর্ভ ব্যাখ্যা ও ভাবময় সংবেদনের মধ্য দিয়া ভক্তির শুচিশুভ্র কুসুম ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সারা দেশ যে এসময়ে অনাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে উপলব্ধি করেন, এসময়ে তাঁহার এই ক্ষীণকায়া ভক্তি স্রোতের ধারায় তো ঈশ্বরবিমুখ

মানুষের দল উদ্ধার লাভ করিবে না। এজন্য চাই প্রেমভক্তির বেগবতী ভক্তিগঙ্গা-ধারা—আর চাই সেই ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার মত এক নব ভগীরথ।

হৃদয়ে দিনের পর দিন আর্ত্তি জাগে, কোথায় সে মহাশক্তিধর যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ? কবে ঘটিবে তাঁহার মহা আবির্ভাব? তিল তুলসী আর গঙ্গাজল দিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য ভক্তিভরে দিনের পর দিন এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন। সারা ভুবনের মঙ্গলের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সিক্ত করেন বিষ্ণুঘরের মৃত্তিকা।

জনকয়েক বৈষ্ণব ভক্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য্য সেদিন বসিয়া আছেন। পবিত্র ভাগবতের মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা চলিতেছে, এমন সময় এক ভক্ত সুসংবাদ জানাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বড় আশ্চর্য্যের কথা—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে এসেছে এক পরম বৈষ্ণবরূপে। এ যেন এক নূতন মানুষ। পাণ্ডিত্যের অহমিকা কোথায় ভেসে গিয়েছে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। প্রভু! এ দিব্য উন্মত্ততার ছোঁয়াচও কম নয়। যে তাকে একবার দেখছে, তার আকুল ক্রন্দন শুনছে, সেই হয়ে পড়ছে অভিভূত ও ভাববিহ্বল। তরুণ অধ্যাপক নিমাই যেন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকাবার শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে নবদ্বীপে।"

আচার্য্য বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, চোখ দুইটি উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।. কহিলেন, "ভাই, তোমাদের কথা সত্য হোক, আশা ফলবতী হোক, এই প্রার্থনাই আমি করছি।"

কিছুক্ষণ মৌনী থাকার পর আবার তিনি স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তা হলে একটি গোপন কথা তোমাদের ভেঙে বলছি,—কাল শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম, গীতার একটি বিশেষ শ্লোকের নিহিতার্থ বুঝতে না পেরে সেদিন আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তাই উপবাসী থেকে এই শ্লোকের কথাই কেবল ভাবছিলাম। রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখলাম, তোমাদের ঐ নিমাই আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। ডেকে বলছে—আচার্য্য তুমি আর মনে দুঃখ ক'রো না,

ওঠো।” কি অদ্ভুত ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে গীতার শ্লোকের অর্থটিও উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।”

“মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হলো এক অপূর্ব্ব পুলকস্রোত। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে আগে আমি মাঝে মাঝে দেখেছি—তার বড় ভাই বিশ্বরূপের সাথে প্রায়ই সে আসতো আমার গৃহে। সে অনেক দিন আগের কথা। যাক্‌, তোমাদের সংবাদ বড়ই শুভ। দেখা যাক্‌ শ্রীভগবান এই মহাবৈষ্ণবের ভেতর দিয়ে তাঁর কোন্‌ লীলানাট্যের সূত্রপাত করতে চাচ্ছেন।”

এ নাট্যলীলা অনুষ্ঠিত হইতে দেরী হয় নাই। অচিরে নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেন ভক্তি-প্রেমের এক রসময় বিগ্রহরূপে, ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণনামের ধারায় সারা দেশ তিনি প্লাবিত করেন, আর প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্য্যকে করেন তিনি আত্মসাৎ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের এক প্রধান পার্ষদরূপে, লীলানাট্যের অন্যতম সূত্রধাররূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে অদ্বৈত প্রভুর যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দেরই পরবর্ত্তী। চৈতন্য ভাগবত নিতাই ও অদ্বৈতকে অভিহিত করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যের দুই বাহু রূপে। অদ্বৈতের প্রতি ভক্ত মানবের ঋণের কথা জানাইতে গিয়া ভক্তকবি বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন, “যার ভক্তি কারণে চৈতন্য অবতার।”

চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাপ্রভু—আর প্রভু হইতেছেন দুইটি—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। আর কোন চৈতন্যপার্ষদ এই প্রভুত্বের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ ভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য্য।

চৈতন্য-পার্ষদ অদ্বৈত ভক্তদের 'প্রভু', মহাপ্রভুর বাহু, এবং কৃষ্ণ-ভক্তিদাতা। তাছাড়া, আরও একটা বিশেষ মর্য্যাদা তাঁহার আছে। অদ্বৈত হইতেছেন সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তরঙ্গ শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে গয়াধামে যে মন্ত্র শ্রীচৈতন্য প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় এক পরম রূপান্তর। তাই মাধবেন্দ্র-শিষ্য এই আচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য জ্ঞান করিতেন গুরুর মত। সুযোগ পাইলেই অদ্বৈতের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া সবাইর সম্মুখে দিতেন তাঁহাকে অসীম মর্য্যাদা। চৈতন্য চরণাশ্রিত বৃদ্ধ বৈষ্ণব চৈতন্যের এই ভক্তির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। কোন বাদ-প্রতিবাদে ফল হইত না। লৌকিক লীলায় মহাপ্রভু কোন সময়েই ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ও লৌকিক আচার-আচারণের মর্যাদা রক্ষণে ত্রুটি করিতেন না, তাই অদ্বৈতের প্রতি ভক্তি নিবেদনের বেলায়ও তাঁহাকে কখনো নিরস্ত করা যায় নাই।

শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতের পারস্পরিক সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর, বড় অন্তরঙ্গ। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে এ সম্পর্কের স্বরূপটি মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

> মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই জ্ঞানে।
> আচার্য্য গোসাঞিকে প্রভু গুরু করি মানে।
> লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ।
> স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন।
> চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান।
> আপনাকে করেন তাঁর দান অভিমান।

সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের এই প্রবীণ প্রতিভাধর নেতা, মহাপ্রভুর অন্যতম এই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, অদ্বৈত আচার্য্যের হয় শ্রীহট্টে। বর্ত্তমানের সুনামগঞ্জ মহকুমা অঞ্চল তৎকালে ছিল লাউড় পরগণা নামে পরিচিত। এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত নবগ্রামে আনুমানিক ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হন।[১]

১ অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যর জন্মকালে, অদ্বৈত আচার্য্য ছিলেন বাহান্ন বৎসর বয়স্ক। চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে।

পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যরূপে তাঁহার তখন যথেষ্ট খ্যাতি। বংশের গৌরব ও ঐতিহ্যও কম নয়। স্বনামধন্য নৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ। পাঠান যুগের গৌড়ীয় হিন্দু রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়া নৃসিংহ নাড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধির দিক দিয়া তাঁহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানীতে তখন খুব কমই ছিল।

কুবের আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী লাভা দেবীর বড় দুঃখ, পর পর তাঁহাদের কয়েকটি পুত্রসন্তাম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একটিও জীবিত রহে নাই! আর যে কোন পুত্রসন্তান জন্মিবে সে আশাও নাই। তবে কি বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না? মৃত্যুর পর পুত্রসন্তানের পিণ্ডও পাওয়া যাইবে না? এই সব ভাবিয়া স্বামী স্ত্রী কাহারো মনে শান্তি নাই, সংসার-কর্ম্মেও দিন দিন বড় উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। এই বৈরাগ্যপ্রবণ মন নিয়া অবশেষে একদিন তাঁহারা লাউড় ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন।

পতি-পত্নী উভয়ে এবার স্থির করিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিবেন, ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে পূজা, ব্রত প্রভৃতি উদ্‌যাপন করিবেন।

নূতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর লাভা দেবী সন্তান-সম্ভবা হন। কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠে। ইতিমধ্যে রাজসভার আহ্বানও আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত আনন্দিত মনে সস্ত্রীক আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

মাঘী সপ্তমীর পুণ্যতিথিতে এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা নাই। নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ।

বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপূর্ব্ব ভক্তিপরায়ণতা। সহজাত ধর্ম্ম-সংস্কার নিয়াই সে জন্ম নিয়াছে। নিবেদিত বস্তু ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে আহার করানো যায় না।

দেব পূজায় বালকের অসীম আগ্রহ, বিশেষ করিয়া পিতা যখন নারায়ণ শিলা অর্চ্চনা করিতে বসেন ভাবাবিষ্ট হইয়া সেখানে সে বসিয়া থাকে, দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু।

কুবের তর্কপঞ্চানন লক্ষ্য করেন, ছেলে তাঁহার শ্রুতিধর। এই সঙ্গে সমাহার ঘটিয়াছে অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির। বুঝিলেন, বালক উত্তরকালে শাস্ত্রপারঙ্গম হইবে, বংশগত ঐতিহ্যের ধারাটিও সে বজায় রাখিতে পারিবে।

কমলাক্ষের বয়স তখন বারো বৎসর; অধ্যয়নের জন্য পিতা তাঁহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর এই কিশোর শিক্ষার্থী। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি এবং ষড়দর্শনের পাঠ সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

কমলাক্ষের জনক-জননী ইতিমধ্যে শ্রীহট্ট হইতে চলিয়া আসেন। এখন হইতে পুত্রের সহিত একত্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। নব্বই বৎসর বয়সে পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন মরদেহ ত্যাগ করিয়া যান এবং কিছুদিন পরে মাতা লাভা দেবীরও লোকান্তর ঘটে।

পণ্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবার বৈরাগ্যের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। স্থির করিলেন, অবিলম্বে গয়াধামে গিয়া জনক-জননীর উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণতি জানাইয়া বাহির হইবেন তীর্থ পর্য্যটনে।

ইতিমধ্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে তাঁহার তরুণ জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিমার্গীয় সাধনার মধ্য দিয়া পরম প্রাপ্তি তাঁহার ঘটিবে, এ সঙ্কল্পই এতকাল হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। এজন্য নিষ্ঠাভরে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া সাধন-ভজনে রত থাকিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াও নিয়াছেন।

গয়ার কার্য্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইলেন, অন্তরে জাগরূক রহিল জীবনতরীর কাণ্ডারী সদ্গুরুর সন্ধান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তিনি একদল মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধর্ম্মসভায় আসিয়া উপস্থিত। নারদীয় সূত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেখানে চলিতেছে। এই ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্ত্বিক ভাববিকার।

দাক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্ন্যাসী, ভক্তিরসের পরম রসিক, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তখন এই মণ্ডলীতে উপস্থিত। নবাগত ভক্ত কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া পুরী মহারাজ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। অপার করুণা ঝরিয়া পড়িল এই তরুণ ভক্তের উপর। অদ্বৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিলন দৃশ্যের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

প্রেমসিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।
তাহা দেখিয়া মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী
কহে ইঁহো ভক্তিবর্ম্মে উত্তমাধিকারী।
সামান্য জীবেতে না হয় শুদ্ধা প্রেমভক্তি।
চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তার স্থিতি।
শুদ্ধ প্রেমাসব ইহো করিয়াছে পান।
অন্তর্নিত্যানন্দ ইহার নাহি বাহ্যজ্ঞান।
ইঁহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ।
জগতে তারিতে বুঝোঁ হৈলা প্রকটন।

ভক্ত সাধুদের উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনি বারম্বার শ্রবণের পর কমলাক্ষ আচার্য্য সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। শুনিলেন, যে মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনিই মহাভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ; দুই নয়নে তাঁহার দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। প্রসন্ন মনে ভাববিহ্বল তরুণ পণ্ডিতের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন।

কমলাক্ষ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে চরণে পতিত হইলেন। মিনতি করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন পেলাম। সবাই জানে, আপনি ভক্তত্রাতা, এ যুগের ভক্তিকল্পবৃক্ষ।

আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধন্য করুন, আমায় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিন।"

পুরী মহারাজ সম্মতি দিলেন। কমলাক্ষ আচার্য্যের জীবনে দেখা দিল এবার সদ্‌গুরু কৃপার অরুণোদয়, জীবন তাঁহার নবরাগের বর্ণচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। দীক্ষা ও প্রেমভক্তিতত্ত্বের উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাঁহার নব রূপান্তর।

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজের সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার বিদায় গ্রহণের পালা। কমলাক্ষ স্বভাবতঃই মানবপ্রেমিক, লোকমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সহজাত। করুণ কণ্ঠে সদ্‌গুরুর কাছে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, এ কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে আদর্শহীন, ধর্ম্মহীন। সর্ব্ব দিক দিয়ে তারা নীতিভ্রষ্ট। ভুবনমঙ্গল হরিনাম, কৃষ্ণনাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা ক'রে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি ক'রে তারা উদ্ধার পাবে।"

পুরী মহারাজের আননে খেলিয়া যায় স্মিত হাসি। মধুর কণ্ঠে কহেন, "কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের উদ্ধার সাধন করতে যে পরমপ্রভুর আবির্ভাব চাই। তা নইলে তো চলবে না। তুমি মহাভক্ত। জীবের কল্যাণ সাধনের এষণা যেমন তোমার রয়েছে, তেমনি তোমাতে রয়েছে ঐশী শক্তির প্রকাশ। শ্রীভগবান্‌কে ডাকবার, তাঁকে জাগ্রত করবার ভার তুমিই আজ থেকে নাও বৎস।"

সদ্‌গুরুর এ নির্দ্দেশ কমলাক্ষ আচার্য্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে গাঁথা হইয়া যায়। ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থ দর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থল তিনি দর্শন করেন আর হৃদয়ে তাঁহার অপার আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভক্তবর কখনো ভাবাবেশে শুরু করেন উদ্দণ্ড নর্ত্তন কীর্ত্তন,

কখনো বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, কোন হুঁস নাই।

সেদিন তিনি গিরিগোবর্দ্ধনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তরে বহিয়া চলিয়াছে দিব্য আনন্দের প্রবাহ। পরমপ্রভুর দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন।

সারাদিন পাগলের মত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন; এবার রাত্রি সমাগত। চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত দেহে আচার্য্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছেন। অল্পকাল মধ্যে দুই চোখে নামিয়া আসিল গভীর নিদ্রা।

এ সময়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দর্শন করিলেন।—শিখিপুচ্ছধারী মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাঁহার ভুবনমোহন ভঙ্গীতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কহিতেছেন, "আচার্য্য, জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা। যথাসাধ্য ভক্তিতত্ত্বের প্রচার তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করো। আর এই সঙ্গে করো লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন। আর শোন, তোমায় আমি একটা নিগূঢ় সংবাদ দিচ্ছি। আমার এক দিব্যমূর্ত্তি দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে, যমুনার তীরে, লুকানো রয়েছে। আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে —মদনমোহন। দ্বাপরে কুব্জা আমার এই মূর্ত্তির সেবা করেছে। আজো বিগ্রহ যমুনা তটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে আছে। তুমি এর উদ্ধার সাধন করো, সেবার প্রবর্ত্তন করো।"

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্য্যের আর ঘুম হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সোৎসাহে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শুনিয়া লোকজন জুটিতে দেরী হয় নাই। কোদাল শাবল নিয়া গ্রামবাসীরা দলে দলে দ্বাদশ আদিত্য তীর্থের দিকে ছুটিয়া আসিল।

খননের পর সত্য সত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় এক পরম মনোহর কৃষ্ণমূর্ত্তি। ললিত ত্রিভঙ্গঠামে উহা দাঁড়াইয়া

আছে। স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি হাতে পাইয়া আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হন। অতঃপর একটি ভক্তিমান্ সদাচারী ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের সেবার ভার দিয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান।

প্রভু মদনমোহনের লীলা-নাট্য এখানেই থামে নাই। অদ্বৈত আচার্য্যকে এবার তিনি এক নতুন খেলা দেখাইতে শুরু করিলেন।

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে। চারিদিকে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাণ্ডব। স্বপ্নলব্ধ মদনমোহন বিগ্রহের সেবা-পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আচার্য্য বৃন্দাবনে আসিলেন। ইতিমধ্যে এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যায়।

ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই বিগ্রহকে তোলা হইয়াছে; তাই এটির দর্শনের জন্য সর্ব্বদাই জনতার ভীড় লাগিয়াই থাকে। একদল দুষ্টস্বভাব পাঠানের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এতটা সমারোহ ও জনসংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই। একদিন দল বাঁধিয়া তাহারা মদনমোহন বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে। এটির মর্য্যাদা হানি করা ও ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর।

প্রভু মদনমোহন কিন্তু এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত করেন। পাঠানেরা কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, বিগ্রহ তো সেখানে নাই। কে যেন তড়িৎ-বেগে সরাইয়া ফেলিয়াছে। হতাশ হইয়া তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

নূতন পূজারী এতক্ষণ যমুনায় দাঁড়াইয়া স্নান-তর্পণে রত ছিলেন। পাঠানদের হামলার কথা শুনিয়া ত্রস্তব্যস্তে কুটিরে গিয়া উপস্থিত হন। দেখেন, বেদীর উপরিস্থিত বিগ্রহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই পাঠানেরা এটি অপবিত্র করিয়া এবং জল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। খেদের তাঁহার আর সীমা রহিল না, হায়-হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সংবাদ শুনিয়া আচার্য্য ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার দুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা। অস্নাত অভুক্ত অবস্থায়

চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্তু হারানো বিগ্রহের কোন সন্ধানই মিলিল না।

রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্য্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। স্বপ্ন-যোগে আবার মিলিল শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ। মধুর কণ্ঠে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে আচার্য্য, কেন শুধু শুধু তুমি খেদ করছো, আর এমন ক'রে ভেবে মরছো? আমায় তো পাঠানেরা ভেঙে ফেলে নি, অপসারিতও করে নি। আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই দুষ্টু ব্রজের গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তারপর চুপিচুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল-বাগান আছে, তারই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি। ওখান থেকে আমায় তুলে নিয়ে এসো। আর শোন, এখন থেকে আমার এই দুষ্টু গোপাল-লীলার স্মৃতিই এখানে জাগরূক থাক্, আর আমার এ বিগ্রহকে দাও মদনগোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদ্‌লে দাও তুমি।"

আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনি পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়া যান। কিছুটা অনুসন্ধানের পর শ্রীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদন-গোপালরূপে ইঁহার সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

ঠাকুর কিন্তু শীঘ্রই নিজের জন্য আরও এক ব্যবস্থা করিলেন। আবার একদিন কমলাক্ষের উপর স্বপ্নাদেশ হইল, "আচার্য্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো, সেখানটা তেমন সুরক্ষিত নয়। ম্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবে, এ আশঙ্কা আছে। তুমি এক কাজ করো। মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী দু'একদিন মধ্যে এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করো। তাহলে আমার সেবা-পূজার কোন বিঘ্ন আর হবে না।"

আচার্য্যকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর আরো কহিলেন, "বৎস, তুমি খেদ ক'রো না! এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তান্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকালের, তোমার মত মহাভক্তের মধ্য দিয়েই যে আমার লীলার পরিপুষ্টি। আরও শোন। আমার এক সুপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুঞ্জবনে সংগোপিত। শ্রীরাধার প্রিয় সখী

বিশাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল। এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও।”

পরদিনই মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদন-গোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হৃদয়েও পৌঁছিয়া গিয়াছে। আচার্য্যের কাছে আসিয়া দৈন্যভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। সাশ্রুনয়নে আচার্য্য প্রাণ-প্রিয় শ্রীবিগ্রহ তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন শান্তিপুরে। অর্চ্চনার জন্য সঙ্গে আনিলেন নিকুঞ্জবনের সেই পবিত্র চিত্রপট।

মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইয়া কমলাক্ষের আনন্দের অবধি রহিল না।

বৃন্দাবন হইতে আনীত কৃষ্ণের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাঁহার দিব্য ভাবাবেশ। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর প্রিয় শিষ্য কমলাক্ষকে ডাকিয়া সেদিন এই নিগূঢ় উপদেশটি তিনি দিলেন :

পুরী কহে বাছা তুহুঁ শুদ্ধ প্রেমবান।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নির্ম্মাণ।
রাধাকৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয়।
অতএব যুগল সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।

(অদ্বৈত প্রকাশ)

বলা বাহুল্য, অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার গুরুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই যুগল ভজন শুরু করিয়াছিলেন। প্রাক্ চৈতন্য যুগের তাঁহার অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি রাধার এই যুগল উপাসনা অত্যল্পকাল পরে প্রভু চৈতন্যের মণ্ডলীকে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাই আচার্য্যের সাধনজীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শান্তিপুর ত্যাগ করার পূর্ব্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী আরো একটি কথা বলিয়া গেলেন। কহিলেন, “বৎস, [illegible]বার তুমি বিবাহ করে

সংসারাশ্রমী হও। সংসারে থেকে, কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করো, জীবের কল্যাণ সাধন করো।”

সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া পুরী মহারাজ শান্তিপুর হইতে জগন্নাথক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন।'

ইহার পর হইতে শুরু হয় কমলাক্ষের আচার্য্য জীবন। নিজ গৃহে শান্তিপুরে তিনি এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসেন। প্রতিভাধর বিদ্যার্থীর দল এই সাধক ও শাস্ত্রবেত্তার কাছে আসিয়া শরণ নেয়। তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলীও এ সময়ে এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকালে এই মণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব সাধনার ক্ষীণ ধারাটি বহিয়া চলিতে থাকে। তাই পরবর্ত্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের নায়কেরা এই পূর্ব্বসূরীর কাছে কম ঋণী নন।

কমলাক্ষ আচার্য্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্যামাদাস। আচার্য্যের সহিত তত্ত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া নত-শিরে তিনি তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্যামদাস এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচার্য্য। এখন হইতে কমলাক্ষ পণ্ডিত এই নূতন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

অদ্বৈতের অপর শিষ্য ছিলেন শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহ। বৈষ্ণব-দীক্ষা প্রাপ্তির পর ইঁহার নূতন নাম হয় কৃষ্ণদাস। বৃদ্ধ রাজা কৃষ্ণদাস অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য যবন-হরিদাস আচার্য্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তরুণ হরিদাসের ত্যাগ বৈরাগ্যময় জীবনে সেদিন প্রেমভক্তির ঢল নামিয়াছে। হরিপ্রেমের উন্মাদনায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় শান্তিপুরে অদ্বৈতের ধর্ম্মসভায় একদিন তিনি আসিয়া উপস্থিত। আচার্য্য প্রভুর নাম এবং সাধন-ঐশ্বর্য্যের কথা তিনি শুনিয়াছেন, মনে মনে তাঁহাকেই বরণ করিয়াছেন সাধন-পথের পথপ্রদর্শক রূপে।

কৃষ্ণপ্রেমরসে বিহ্বল, হরিদাস অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে থাকেন।

আচার্য্যের হৃদয় গলিয়া যায়। কে এই গৌরতনু চারু-দর্শন তরুণ ভক্ত, দর্শনমাত্রে যে প্রাণমন কাড়িয়া নেয়? সিদ্ধ সাধকের অপূর্ব্ব লক্ষণসমূহ তাঁহার চোখে মুখে। সারা দেহে ভক্তি-রসের লাবণ্য টলমল করিতেছে।

আগ্রহাকুল কণ্ঠে আচার্য্য প্রশ্ন করেন, "বৎস, কি নাম তোমার? কোথা থেকে তুমি আস্‌ছো?"

পদতলে পতিত তরুণ ভক্ত উত্তর দেন, "প্রভু, আমি ম্লেচ্ছাধম। আপনার শরণ নিতে এসেছি। কৃষ্ণভক্তি কি ক'রে পাবো, কৃপা ক'রে সেই উপদেশ আমায় দিন।"

পরম স্নেহভরে আচার্য্য-প্রভু নবাগত ভক্তকে বুকে তুলিয়া নেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া শুরু হয় হরিদাসের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন। আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য ভক্তি-তত্ত্ব তিনি আহরণ করেন, কীর্ত্তিত হন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

ভক্ত হরিদাস আর্ত্তি আর দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাই একদিন আচার্য্যের কাছে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আপনার কৃপায় শাস্ত্র পাঠ, সাধনা, এসব তো করলাম। কিন্তু আমার মত জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কাজ নয়। আপনার কৃপা শক্তি ছাড়া তো এ কাজ সম্পন্ন হবে না! সেই কৃপাশক্তিই আজ প্রয়োগ করুন, নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোন উপায় নেই।"

অদ্বৈত তখন প্রেমভরে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন—

> কহে, শুন বৎস ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ বাণী।
> কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য্য নাহি জানি।
> সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি।
> অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়।
> সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাধিক হয়।
> যেই কৃষ্ণ ভজে সেই হয় সর্ব্বোত্তম।
> কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ যেই সেই নরাধম। (অদ্বৈত প্রকাশ)

জীবোদ্ধারের যে উদার সর্ব্বজনীন আহ্বান পরবর্ত্তীকালে শ্রীবাস অঙ্গন হইতে গৌরসুন্দরের শ্রীমুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, অদ্বৈতের মুখে শোনা গেল তাহারই পূর্ব্বাভাস।

অদ্বৈতের কাছে যবন হরিদাসের বৈষ্ণবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তসিদ্ধ মহাপুরুষ এবার তাই শান্তিপুর ত্যাগ করিবেন ঠিক করিয়াছেন।

আচার্য্য তাঁহাকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "হরিদাস, তুমি নামমন্ত্রের মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুমি একান্ত ভাবে গ্রহণ করো, দিগ্‌বিদিকে পরমপ্রভুর নাম ছড়িয়ে দাও। গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ এই নির্দ্দেশই আমায় দিয়েছিলেন। তোমার জন্যও আজ আমি এই ব্রতই নির্দ্দিষ্ট কর্‌ছি—

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম!
নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ।
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়।
নামাভাসে জীব মাত্রের ত্রিতাপ না রয়।
নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খণ্ডয়!
নাম-চিন্তামণি-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
ব্রহ্মাণ্ডে সদ্বস্তু নাঞি নামের সমান।
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন।
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায় প্রেমধন।"

বৈষ্ণব সাধক হরিদাসকে আচার্য্য প্রভু সন্ন্যাস দিলেন। মস্তক মুণ্ডন করাইয়া কটিতে পরাইয়া দেওয়া হইল কৌপীন-ডোর, গলায় তুলসীর মালা। শক্তি-সঞ্চারিত নামের বীজ আচার্য্য এই মহাভক্তের কর্ণে দিলেন।

হরিদাস তখন নামপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা। টলিতে টলিতে গিয়া গঙ্গার মৃত্তিকা-গোফায় বসিয়া পড়িলেন। এখন হইতে তাঁহার নিত্যকার ব্রত সাধন হইল তিন লক্ষ নাম জপ। অদ্বৈত আচার্য্যের অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূপে যেন দেখা দিলেন নামব্রহ্মের চারণ

যবন হরিদাস। আচার্য্য তাঁহার নাম দিলেন—ব্রহ্ম হরিদাস। উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য এই মহাপুরুষ বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ভক্তির মহিমা ছড়াইয়া গিয়াছেন দিক্‌বিদিকে।

গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর নির্দ্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। অচিরে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রীও জুটিয়া গেল।

নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাতুড়ী এক ধর্ম্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহার তুইটি যমজ কন্যা—সীতা ও শ্রীরূপা। এই তুই কন্যাকে তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের কাছে সম্প্রদান করিলেন।

শান্তিপুরের পণ্ডিতসমাজে প্রতিভাধর অধ্যাপক অদ্বৈতের তখন বিরাট প্রতিষ্ঠা। বহু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী, বিশেষ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার। শিক্ষার্থীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ভীড় করিতেছে। উচ্চস্তরের বিষ্ণুভক্ত সাধক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি প্রচুর। ভক্তিমার্গের সাধন যাঁহারা লাভ করিতে চান তাঁহাদের অনেকে এই পরম ভাগবত ব্রাহ্মণের চরণে শরণ নেন, দীক্ষা গ্রহণ করেন। আচার্য্যের গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের খ্যাতিও এসময়ে চারিদিকে ছড়াইতেছে ।

ভক্তপ্রবর হরিদাস সেদিন শিক্ষাগুরু অদ্বৈতের সঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাই, হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া উঠে নূতন ভাবাবেগ, নূতন উদ্দীপনা।

শান্তিপুরের ব্রাহ্মণেরা যবন-ভক্ত হরিদাসের আগমনের কথা জানিলেন। হরিদাসের জপসিদ্ধি ও অলৌকিক শক্তির কথা তাঁহারা লোকমুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের কাছে হরিদাসের এই প্রতিষ্ঠা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকিল। ম্লেচ্ছ সাধককে নিয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিতে তাঁহারা রাজী নন। সমাজের একদল শীর্ষস্থানীয় লোক অদ্বৈতকে বলিয়া দিলেন, হরিদাসের সঙ্গ না ছাড়িলে তাঁহাকে একঘরে করা হইবে।

ইতিমধ্যে শান্তিপুরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গেল। স্থানীয় একজন ধনী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সেদিন পূজা-উৎসব চলিতেছে।

গ্রামের গণ্যমান্য শতাধিক ব্যক্তি আসিয়া সেখানে জুটিয়াছেন, আহারাদির যোগাড় হইতেছে। এমন সময় নিকটস্থ বৃক্ষমূলে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। অপূর্ব্ব তাহার অঙ্গের ছটা, চোখে মুখে সিদ্ধ সাধকের দিব্য দ্যুতি। সন্ন্যাসী শুধু বাক্‌সিদ্ধই নয়, পরম কৃপালুও বটে। কাঁদিয়া কাটিয়া যে যাহা ভিক্ষা চাহিতেছে, তাহাই মিলিতেছে। পদধূলি মাখিয়াই কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়া গেল। বৃক্ষতলে তখন প্রকাণ্ড জনতার ভীড়।

উৎসব গৃহের কর্ম্মকর্ত্তারা ছুটিয়া আসিলেন। গলবস্ত্র হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু আজ এখানে আহারাদির ব্যবস্থা হয়েছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের বড় ইচ্ছে আপনিও দয়া ক'রে এখানে অন্ন গ্রহণ করুন।"

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "কিন্তু বাবা আমি তো অ-নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করিনে। বিষ্ণুর প্রসাদ যদি থাকে তবেই আহারে বসতে পারি।"

"বেশ তো, তাই হবে। গৃহে নারায়ণ শিলা রয়েছেন। তাঁর কাছে নিবেদন ক'রে আপনাকে ভোজ্যদ্রব্য এনে দিচ্ছি। পাতা দেওয়া হয়েছে, আপনি দয়া ক'রে এসে বসুন।"

সন্ন্যাসী তখনো ভাবাবেশে মত্ত। ধীরে ধীরে ভোজনস্থানে গিয়া বসিলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আহার্য্য পরিবেশন করা হইল।

কিছুকাল পরে অদ্বৈত আচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া কহিলেন, "একি হরিদাস তুমি এখানে! আর গ্রামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা দেখ্‌ছি, তোমায় নিয়ে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে গেছেন! এ তো বড় অদ্ভুত কাণ্ড। এ আবার তোমার কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ?"

অদ্বৈতের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেশ কাটিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া হরিদাস কহিলেন, "প্রভু আমার দোষ নেবেন না। কৃষ্ণকৃপায় এই সজ্জনেরা আমায় আজ কি এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন জানিনে। আগ্রহ ক'রে এঁদের পঙ্‌ক্তি ভোজনের ভেতর এনে বসিয়েছেন।"

আচার্য্যের চরণতলে পড়িয়া হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। দুই চোখ বাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, আর ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন আচার্য্যের স্তবগান। এক অপূর্ব্ব ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি সেখানে তখন হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা সবাই নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সেদিনকার এ ঘটনায় বিশেষ করিয়া মহাভাগবত হরিদাসের ব্যক্তিত্বের এই ইন্দ্রজাল দর্শনে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। এই সঙ্গে অদ্বৈতের মহিমাও তাঁহারা কিছুটা উপলব্ধি করিলেন। যবন হরিদাসের অলৌকিক কাহিনী তাঁহারা শুনিয়াছেন, আজ তাঁহার কিছুটা প্রভাব স্বচক্ষেও দেখিলেন। আচার্য্য অদ্বৈত হইতেছেন এই শক্তিধর নবীন বৈষ্ণবেরই এক প্রধান পথিপ্রদর্শক। এই আচার্য্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করার জন্য যাঁহারা চেষ্টিত ছিলেন তাঁহারা এবার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া নিলেন

ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের মহিমা সাধারণ মানুষে কি করিয়া বুঝিবে? এ মহিমা বুঝিয়াছিলেন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীঅদ্বৈত। তাই নিজের গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর প্রথম ভোজ্যপাত্র তিনি দিয়াছিলেন ভক্তি-সিদ্ধ এই যবন ভক্তকেই।

আচার্য্যের এ আচরণে হরিদাস সেদিন চমকিয়া উঠেন। যুক্ত-করে নিবেদন করেন, "সে কি প্রভু? এ শ্রাদ্ধপাত্রে যে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এ আপনি আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে দিচ্ছেন কেন?"

প্রেমাশ্রু-ছলছল নেত্রে অদ্বৈত উত্তর দিলেন, "হরিদাস, আমার দৃষ্টিতে তুমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব। জানতো? প্রকৃত বৈষ্ণবের হৃদয়ে সদা বিহার করেন গোলকপতি। তোমার মত মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়া যে বহু ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমান। আমি তো এতে অন্যায় কিছু করি নি?"

যবন-সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সেদিন এক বৈপ্লবিক সৎসাহস প্রদর্শন করেন। আর রক্ষণশীল সমাজ সেদিন

তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও সাধন-মাহাত্ম্যের দিকে চাহিয়াই তাঁহার এই কার্য্যকে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়।

অদ্বৈত আচার্য্যের এই ঔদার্য্য ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্ত্তী-কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতারা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অদ্বৈতের নবদ্বীপস্থিত চতুষ্পাঠী ইহার পর জাঁকিয়া উঠে। গীতা ভাগবত, স্মৃতি প্রভৃতি রোজ তিনি সোৎসাহে ছাত্রদের পাঠ করান, আর নিশাযোগে পরমভক্ত হরিদাসের সঙ্গে স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাবেশে করেন নামকীর্ত্তন।

সুপণ্ডিত. বিষ্ণুভক্ত, অদ্বৈত আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তেরা আচার্য্যের ধর্ম্মসভায় প্রায়ই উপস্থিত হন, কৃষ্ণকথায় আনন্দে কাল কাটাইয়া গৃহে ফিরিয়া যান।

দেশের চারিদিকে তখন ধর্ম্মের নামে নানা অনাচার ও অধর্ম্মের তাণ্ডব চলিয়াছে। পাষণ্ডীদের অত্যাচারে সমাজজীবন জর্জ্জরিত। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদেরই প্রতি যেন তাহাদের আক্রোশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

এ অবস্থা আর যেন সহ্য করা যায় না। ভক্ত হরিদাস এক একদিন সাশ্রুনয়নে আচার্য্যকে কহেন, "প্রভু, ধরণীর ভার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? শ্রীভগবান্‌কে প্রাণের আকুতি জানাচ্ছি—তিনি কবে আসবেন? কবে ক'রবেন জীবের উদ্ধার সাধন?"

আচার্য্য সান্ত্বনা দেন, "হরিদাস, তুমি উতলা হ'য়ো না, তোমার মত আমিও যে দীর্ঘ দিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী আর গঙ্গাজলে কৃষ্ণের আরাধনা ক'রছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে। ভেবো না, তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন।"

শ্রীবাস, শুক্লাম্বর, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার সভায় বসেন, পাষণ্ডীদের অনাচারের কথা বর্ণনা করেন। পরমাশ্রয়,

সর্ব্বজীবের উদ্ধারকর্ত্তার আবির্ভাব কবে হইবে বলিয়া ভক্তেরা খেদ জানান।

শুদ্ধাচারী মহাতেজস্বী আচার্য্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন। ভক্তদের সম্মুখে নিজের আশা ও সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করিয়া বলেন—

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।
তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখহ হেথাঞি।

(চৈতন্য ভাগবত)

'অদ্বৈত সিংহে'র হুঙ্কার, আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় বসিয়া নামকীর্ত্তন ও আর্ত্তির ফল অচিরেই ফলিল। নিজ গৃহের ধর্ম্মসভায় বসিয়া আচার্য্য সেদিন আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় জনৈক ভক্ত সেখানে নূতন এক সংবাদ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর, তার্কিক বিদ্যাগর্ব্বী বিশ্বম্ভর, গয়াধাম হইতে এক মহাবৈষ্ণবে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়াছেন। অলৌকিক ভাব-প্রবাহ উচ্ছলিত তাঁহার সর্ব্বসত্তায়, দুর্লভ সাত্ত্বিক প্রেমবিকার স্ফুরিত তাঁহার সর্ব্বদেহে। সবাই বলাবলি করিতেছে, তবে কি এই তেজোদৃপ্ত তরুণের মধ্য দিয়াই আসন্ন ঐশী লীলার মহাপ্রকাশ ঘটিতে যাইতেছে?

অদ্বৈত উৎকর্ণ হইয়া এ সংবাদ শুনিলেন। সারা দেহ তাঁহার তখন ভাবাবেগে কণ্টকিত, নয়ন দুইটি পুলকাশ্রুতে ছলছল। প্রাণে জাগিয়া উঠিল পরম আশ্বাস—তবে কি কৃষ্ণ এতদিনে কৃপা করিলেন? নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের এই তরুণ পুত্রের মধ্য দিয়াই কি তাঁহার আত্মপ্রকাশ? কে জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন্ আধারে কেমন করিয়া প্রকটিত হইতে চলিয়াছে।

যাই হোক, আচার্য্য ধৈর্য্য ধরিবেন, অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। পরমভমের আবির্ভাব যদি হইয়াই থাকে, তবে তাঁহাকে যে আচার্য্যের কাছে আসিতেই হইবে। তাঁহার দীর্ঘ দিনের কৃষ্ণ আরাধনা, তাঁহার

তুলসীগঙ্গাজলসহ আর্ত্তি তো বিফল হইবার নয়। আবির্ভূত পুরুষকে আপনা হইতেই যে অদ্বৈতের আঙিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে।

সেদিন প্রভাতে আচার্য্য আঙিনার তুলসীতলায় পূজা বন্দনাদি করিতেছেন। কখনো গোলকপতির উদ্দেশে জানাইতেছেন নম্র নতি, কখনো বা ভাবাবেগে উদ্দীপিত হইয়া ছাড়িতেছেন প্রবল হুঙ্কার!

এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয়া বিশ্বম্ভর সেখানে উপস্থিত। আচার্য্যকে দর্শনমাত্র তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্গ। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। দেহে সম্বিতের চিহ্নমাত্র রহিল না।

অদ্বৈত নির্নিমেষে এই মূর্চ্ছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। এ কি অপরূপ দিব্য লাবণ্যময় দেহ! একি বিস্ময়কর প্রেমবিকারের দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে! এই অদ্ভুত ভক্তি-আবেশ তো মানুষের মধ্যে দেখা যায় না! অদ্বৈত আর যে এই মোহন মূর্ত্তি নয়ন হইতে ফিরাইতে পারেন না।

ভক্তিসিদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল এক পরম বোধ, ইনিই যে সেই মহাবস্তু যাহার জন্য আজীবন তিনি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন—ইনিই যে তাঁহার প্রাণনাথ।

ভাববিমুগ্ধ আচার্য্য বিষ্ণু পূজার উপকরণাদি নিয়া বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছিত দেহের সম্মুখে আসন পাতিয়া বসেন। পরম ভক্তিভরে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া, বিষ্ণু-স্তোত্র গাহিয়া করেন তাঁহার বন্দনা।

সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আচার্য্যপ্রভুর নয়নাশ্রু অবিরাম ঝরিতেছে, আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বম্ভরের চরণ দুটি হইতেছে সিক্ত।

গদাধর তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত। সর্ব্বজনবরেণ্য প্রবীণ আচার্য্য অদ্বৈতের এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও তাঁহার হইল। আচার্য্যকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিলেন, "প্রভু, বিশ্বম্ভর আপনার কাছে বালকমাত্র। তাকে এভাবে পূজা অর্চ্চনা আপনি যেন আর করবেন না।"

ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা আচার্য্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, "গদাধর, এ বালক যে কে, তা অচিরেই বুঝবে। আর একটু অপেক্ষা তোমরা করো।"

ইতিমধ্যে বিশ্বম্ভরের বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট, অশ্রু-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

বিশ্বম্ভর ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসেন। অদ্বৈতের পদধূলি মাথায় নিয়া দৈন্যভরে কহেন—

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়।
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥

নির্নিমেষে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, হে কপটী, এ আবার তোমার কোন্ ছল? কিন্তু আর তো আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। যে পরম আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি, তা যে পরিগ্রহ করেছে তোমারই ভেতরে। আমার ধ্যানের ধন আজ ধরা দিয়েছে আমার সম্মুখে!

ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "না বিশ্বম্ভর, আর তুমি আমায় এড়াতে চেয়ো না। আমার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে— তুমিই হচ্ছো আমার শ্রেয় বস্তু। আর শোন, বৈষ্ণব জীবনের ধারা সারা দেশে স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভক্তেরা সবাই দিন কাটাচ্ছে চরম নৈরাশ্যে, মনোবেদনায় আর উৎকণ্ঠায়। তারা সবাই তোমার নেতৃত্ব চায়, তোমায় নিয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হবার জন্য তারা ব্যাকুল। তুমি তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো।"

চিহ্নিত নেতা আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছেন। একবার তিনি তাঁহার নিজগণ চিনিয়া নিন, সুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠনে ব্রতী হোন, ইহাই যে অদ্বৈত চাহিতেছেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই অদ্বৈত আচার্য্য শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য, কিছুকাল নবদ্বীপের বাহিরে থাকিয়া বিশ্বম্ভরকে পরীক্ষা করা। যদি তিনি সত্যই অদ্বৈতের প্রাণের ঠাকুর হইয়া থাকেন, এই লীলা পরিকরকে তিনি নিজেই ডাকিয়া নিবেন।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের ভক্ত সমাজে শুরু হইয়া যায় শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন লীলা। শ্রীবাসের অঙ্গনে একের পর এক বিশিষ্ট বৈষ্ণবেরা প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া জড়ো হইতেছে, মণ্ডলীর শক্তি দিন দিনই বাড়িতেছে। কিছুদিন পরে নিত্যানন্দের আগমনে এ শক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

মাধবেন্দ্র পুরীর পরম স্নেহভাজন নিত্যানন্দ। ভক্তি প্রেমরসের তিনি এক উৎসস্বরূপ। মাধবেন্দ্রেরই প্রচারিত কৃষ্ণ ভক্তিরসের অন্যতম ধারক ও বাহক এই প্রবীণ আচার্য্য। তাই নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত উভয়ে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোৎসব তেমন যেন জমিতেছে না।

সেদিন প্রভু শ্রীচৈতন্য দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে ডাকিয়া কহিলেন—

চলহ রামাই! তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনি আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন।

(চৈঃ ভাঃ)

প্রকাশের লগ্ন উপস্থিত। প্রভু গৌরসুন্দর এবার আর যেন রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিতে চান না। আবির্ভাবের পরম তত্ত্বটি নানাভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছেন—এসময়ে চিহ্নিত পার্ষদ অদ্বৈত আচার্য্যকে যে তাঁহার অবিলম্বে চাই।

রামাই পণ্ডিতকে প্রভু আরো কহিলেন, "ত্থাখো, তুমি গোপনে আচার্য্যকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমন বার্ত্তা। এখানে এত দিন ধরে যা কিছু দেখেছো ও শুনেছো, আচার্য্যকে সব বলবে। আর জানাবে আমার আদেশ, আচার্য্য যেন পূজোর সব উপচার সংগ্রহ ক'রে আনে, সস্ত্রীক এখানে এসে আমার পূজো করে।"

রামাইকে দেখিয়াই আচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "কি হে রামাই, হঠাৎ তুমি এসময় শান্তিপুরে এলে কি মনে ক'রে, বলতো। আমায় ধরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে বুঝি।"

রামাই বুঝিলেন কোন কথাই এই শক্তিমান্ বৈষ্ণবের অগোচর নাই। মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে সব কিছুই তো আপনার জানা। আদেশ হয়েছে, এবার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে প্রভুর সকাশে চলুন।"

বৃদ্ধ আচার্য্য বড় চতুর—মনোভাব তাঁহার বড় দুরবগাহ। প্রভুর দূতকে চাপিয়া ধরিলেন, "আচ্ছা রামাই, তোমরা সবাই এত হৈ-চৈ করছো, কিন্তু আমায় কি বোঝাতে পারো, কেন শ্রীভগবান মানবদেহে আবির্ভূত হবেন। কেনই বা তিনি বিশ্বের এত স্থান থাকতে নবদ্বীপের মাটিতে নেমে আসবেন ? ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথ আমি বুঝি, তাই ব্যাখ্যা করি—তোমার অগ্রজ শ্রীবাস পণ্ডিত আমার সম্বন্ধে সবই জানে। কিন্তু রামাই, তোমাদের এ কান্নাকাটি আর ভাবমত্ততা কেন, তা তো বুঝতে পারিনে।"

রামাই জানেন, আচার্য্য অদ্বৈত গৌরসুন্দরের নব আন্দোলনের এক বড় স্তম্ভ। প্রভু তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন—তাঁহার জন্য তিনি আজ প্রতীক্ষমান। তাছাড়া, গদাধরের কাছে তাঁহারা সবাই শুনিয়াছেন; আচার্য্য সেদিন নিজেই প্রভুকে আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার প্রাণপ্রভুরূপে। স্বগৃহে তুলসীমঞ্চের সামনে তাঁহাকে পূজা করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আজিকার এ কথা তো তাঁহার প্রাণের কথা নয়!

যাই হোক, ভক্ত রামাই ভাবিলেন—তিনি দূতমাত্র। প্রবীণ, মহাজ্ঞানী আচার্য্যের সহিত আঁটিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী তিনি হুবহু আচার্য্যের সম্মুখে এ সময়ে আওড়াইয়া গেলেন।

যুক্তকরে কহিলেন, "আচার্য্য, প্রভু ব্যাকুল হয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনি পূজোর সজ্জা ও উপচার নিয়ে শিগ্‌গীর আসুন। আর আমরা সবাই প্রভু আর তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকরের মিলন মধুর দৃশ্য দেখে জীবন সার্থক করি!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখা গেল আচার্য্যের এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রেমভক্তির প্রচণ্ড আবেগে তাঁহার দেহখানি থরথর কাঁপিতেছে। মহাপণ্ডিত আচার্য্য বালকের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—"এসেছেন, এসেছেন! প্রভু আমার ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছেন। এই পৃথিবীর ধূলায় তিনি নেমে এসেছেন!"

কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হইলেন। রামাই এই সুযোগে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "আচার্য্যবর, প্রভু কিন্তু আপনাকে অবিলম্বেই তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।"

অদ্বৈত পণ্ডিত এবার তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন, "ছাখো রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি প্রভুকে আমার প্রাণনাথ, আমার ঈশ্বর, ব'লে মেনে নেব, যখন তিনি আমায় তাঁর আপন ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য দেখাবেন, আর আমার এই পক্বকেশাবৃত মস্তকের ওপর তাঁর চরণদুটি তুলে ধরবেন।"

সস্ত্রীক নবদ্বীপে পৌঁছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন না। নন্দন আচার্য্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

রামাই একলা শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "ছাখো ছাখো, নাড়া এখনো আমায় পরীক্ষা করতে চায়। আমায় যাচাই করতে চায়। নন্দন আচার্য্যের ঘরে সস্ত্রীক সে লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।"

অদ্বৈত ও অদ্বৈত-পত্নীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল।

প্রভু আজ ঐশ্বরীয় মহাভাবে প্রমত্ত। দিব্য রূপৈশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভাববিহ্বল অদ্বৈত নির্ম্মিমেষ নয়নে এ দৃশ্য

দেখিতেছেন। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছত্র। গদাধর পণ্ডিত তাঁহার তাম্বুল-করঙ্কধারী। নরহরি প্রেমাবেশে চামর ব্যজন করিতেছেন, আর শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তগণ চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মুখে বিস্তারিত গৌরসুন্দরের সৌন্দর্য্যসুধার সমুদ্র। অদ্বৈত হতবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতেছেন—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর।
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর।

শুধু তাহাই নয়, অদ্বৈত আচার্য্যের দৃষ্টি হইতে প্রভু যেন একটা পর্দ্দা অপসারিত করিয়া নিয়াছেন। অনাবৃত করিয়াছেন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দিব্যরূপ। এ রূপের জ্যোতিতে সকল কিছু হইয়া উঠিয়াছে উদ্ভাসিত। ভক্তকবি বৃন্দাবন দাসের ভাষায়—

কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর।

এ অলৌকিক দর্শনের ফলে পতি ও পত্নী উভয়ে আনন্দে আত্ম-হারা! পরম ভক্তিভরে, ষোড়শোপচারে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পূজা তাঁহারা সম্পন্ন করিলেন। ভাবোদ্বেল আচার্য্যের মুখে বার বার উচ্চারিত হইতে লাগিল প্রভুর উদ্দেশে বিষ্ণুধ্যানের স্তবগাথা।

পূজা ও স্তব গানের শেষে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ সর্ব্বজনমান্য মহান্ আচার্য্যের শিরে তিনি অবলীলায় স্থাপন করিলেন নিজের চরণদ্বয়। ভক্ত-গোষ্ঠীর হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্বৈতের সঙ্কল্প ছিল, ঈশ্বর বলিয়া যাঁহাকে তিনি স্বীকার করিবেন, জীবনপ্রভুরূপে হৃদয় সিংহাসনে বসাইবেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য, নিজ শক্তিতে কাড়িয়া নিতে হইবে অদ্বৈতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। সে সঙ্কল্প আজ তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে।

আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন। প্রভু ও তাঁহার স্বজনদের জ্যোতির্ময় রূপ যে তিনি আজ দেখিয়াছেন। অদ্বৈতের শিরে পদ স্থাপন করিয়া প্রভু আদেশ দিলেন, "অদ্বৈত, এবার শান্ত হয়ে উঠে ব'সো, পঞ্চ উপচারে সস্ত্রীক আমার চরণ পূজা করো।"

এই আদেশের জন্যই যে আচার্য্য এতদিন অপেক্ষমান। প্রভু এমনি করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিবেন, তাঁহার জীবন-বেদীতে নিজেকে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই তো তিনি চান।

এবার সোৎসাহে উঠিয়া বসিয়া মালা, বস্ত্র, অলঙ্কারে প্রভুকে সাজাইলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ষোড়শোপচারে প্রভুর পূজা সম্পন্ন করিলেন। আচার্য্যের দুই চোখে তখন বহিতেছে পুলকাশ্রুর ধারা।

প্রভু বিশ্বম্ভর আজ অপূর্ব্ব দিব্যভাবে উদ্দীপিত। গম্ভীরভাবে অদ্বৈতের পূজা আরতি তিনি গ্রহণ করিলেন, তারপর এই বর্ষীয়ান্ মহাভক্তের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন নিজের গলার প্রসাদী মালা।

এবার শোনা গেল আচার্য্যের প্রতি প্রভুর আর এক নূতন আদেশ, "ওরে নাড়া, পূজো আমার শেষ হয়েছে। এবার কীর্ত্তন হবে, তাতে তুই নৃত্য কর্।"

ভক্তগণ সোল্লাসে কীর্ত্তন শুরু করিয়া দিলেন, আর এই সঙ্গে নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল এক অদ্ভুত দৃশ্য। মহাজ্ঞানী গম্ভীরস্বভাব, বৃদ্ধ আচার্য্য পরমানন্দে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজী বাহিয়া ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু। অদ্ভুত প্রেমাবেশে অদ্বৈত আপনা বিস্মৃত হইয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেছেন, এই কি সেই কঠোরব্রত তাপস, অদ্বৈত আচার্য্য—বহু ভক্তজন যাঁহার আশ্রিত, বহুজনের অধ্যাত্ম-জীবনের যিনি পথিপ্রদর্শক ? পরশমণি প্রভুর যাদুস্পর্শে এই ভাবগম্ভীর জ্ঞানীপুরুষ আজ নৃত্যকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় অদ্ভুত, বড় নয়ন-মনোরম।

প্রভুর আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণাঘন রূপ। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য, এবার অকপটে বল, তোমার কি প্রার্থনা।

তুমি আমার কাছে বর চেয়ে নাও, যা চাইবে তা-ই আজ আমি তোমায় দেব।"

আচার্য্য যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন না। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ছাড়িতে রাজী নন। ভাবাবেশে দুলিয়া দুলিয়া বার বারই কহিতেছেন, "না আচার্য্য তুমি বর প্রার্থনা করো। কি তোমার অন্তরের অভিলাষ, তা জানাও।"

অদ্বৈত আচার্য্য তবুও নিরুত্তর।

প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, "তবে শোন আচার্য্য, ঘরে ঘরে নামকীর্ত্তনের প্রচার এবার আমি শুরু করবো। অপূর্ব্ব ভক্তি সম্পদ চারদিকে বিলিয়ে দেবো।"

অদ্বৈত এবার মুখ খুলিলেন। করুণার্দ্র নয়নে কহিলেন, "প্রভু, যদি কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হয়েছো, যদি তোমার দেবদুর্লভ ভক্তি বিলাবে বলেই স্থির করেছো, তবে, তা আগে তাদেরই দাও যারা রয়েছে সবার পশ্চাতে—চিরবঞ্চিত হয়ে। শূদ্র আর স্ত্রীজাতির মধ্যে তোমার এ পরম সম্পদ আগে ছড়িয়ে দাও।"

ভাবাবিষ্ট প্রভু তাঁহার এই প্রার্থনা পূরণে স্বীকৃত হইলেন, সোল্লাসে ছাড়িলেন ঘন ঘন হুঙ্কার।

প্রেমময় প্রভুর সঙ্গে, ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে, আচার্য্যের দিন বড় আনন্দে কাটিতেছে। কিন্তু অন্তরে তাঁহার একটা কাঁটার খোঁচা থাকিয়াই যাইতেছে। বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব নেতা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ভক্তি করেন, সম্ভ্রম দেখান। এক একদিন আচার্য্যকে সবলে ভূতলে ফেলিয়া তাঁহার চরণতলে নিজের শির ঘর্ষণ করেন। অদ্বৈতের সারা অন্তর তখন এক অব্যক্ত কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চায়। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, কেন প্রভু এমন করিয়া শুধু শুধু তাঁহাকে বিড়ম্বিত করেন? প্রভু তাঁহার প্রভুত্ব দেখাইতে থাকুন, আচার্য্যকে কারণে অকারণে দণ্ড দিন, তবে তো বুঝা যাইবে তাঁহার অন্তরঙ্গতা।

আচার্য্য ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন, চতুর প্রভুর সহিত

চাতুর্য্যপূর্ণ খেলাই তিনি খেলিবেন। অল্প কয়েকদিন পরে, হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া তিনি শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন।

আচার্য্যের পূর্ব্বেকার সে ভক্তিমধুর রূপ যেন আর নাই। এবার তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এক তীক্ষ্ণধী, বিচারপ্রবণ বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ্‌রূপে। আর তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যার মূলে আছে জ্ঞান বিচারের দিগ্‌দর্শন--

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বশিষ্ঠ শাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া।
"জ্ঞান বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান সর্ব্বশক্তি।
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন।
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ?
আদি বৃদ্ধ আমি পাড়লাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র।" (চৈঃ ভাঃ)

অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবেরা তো অবাক্! প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির অন্যতম ধারক ও বাহক অদ্বৈতের মুখে এ আবার কি জ্ঞান বিচারের কথা। আচার্য্য কি তবে জীবনাদর্শ বদলাইয়া ফেলিলেন ?

শুধু মহাপ্রেমিক হরিদাসের চোখে আচার্য্য ধূলা দিতে পারেন নাই। হরিদাস বুঝিয়াছেন, অদ্বৈত এবার গৌরসুন্দরের সহিত চতুরতার যুদ্ধে নামিয়াছেন। প্রভুকে অবিলম্বে শান্তিপুরে টানিয়া না আনিয়া তিনি ছাড়িবেন না। হরিদাস পাঠকক্ষের এক কোণে বসিয়া তাঁহার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্ত্বব্যাখ্যা শুনেন, আর নীরবে মুচ্‌কি হাসি হাসেন।

অচিরেই অদ্বৈত আচার্য্যের কৌশলের ফল ফলিল। হঠাৎ গৌরসুন্দর শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত

আচার্য্য ও তাঁহার গৃহের সকলে ত্রস্তব্যস্তে আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িল।

অদ্বৈত যুক্তকরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রভু উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে নাড়া, আজ তুই আমায় স্পষ্ট ক'রে বল্—ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়?"

অদ্বৈত দেখিলেন, রোষে প্রভুর দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে! ইহাই যে তিনি চাহেন। প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবেন, দণ্ড দিবেন, আর তিনি সে দণ্ড সানন্দে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। এইজন্যই তো চতুর অভিনয় তাঁহাকে এ কয়দিন ধরিয়া করিতে হইয়াছে।

সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, সর্ব্বকালে সর্ব্ব সমাজে জ্ঞানই তো বড়। জ্ঞানহীন ভক্তি দিয়ে কোন্ কার্য্য সাধিত হবে?"

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? ওরে নাড়া, তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুই একথা উচ্চারণ করছিস্!"

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ আচার্য্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাইলেন। তারপর প্রবল বেগে বর্ষিত হইতে লাগিল অজস্র কিল-চড়।

প্রহার জর্জ্জরিত আচার্য্যের মুখ দিয়া কিন্তু একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না। মৃতপ্রায় হইয়া তিনি ভূতলে শায়িত আছেন। আচার্য্য গৃহিণী এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দোহাই তোমার! বুড়ো বামুনকে একেবারে প্রাণে মেরো না। এবার ক্ষান্ত হও।"

ভক্তপ্রবর হরিদাস একপাশে দণ্ডায়মান। প্রভুর এই বিচিত্র কোপ-লীলা দর্শনে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীতি ও বিস্ময়। ঘন ঘন তিনি কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতেছেন।

হৈ-চৈ শুনিয়া আচার্য্যের আঙিনায় বহু লোকজন জড়ো হইয়াছে। সবাই মহা সন্ত্রস্ত। বৃদ্ধ আচার্য্যের এ কি দুর্গতি।

শুধু সদানন্দময় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছেন।

অদ্বৈত আচার্য্যকে প্রভু এবার মুক্তি দিলেন। ক্রোধ তিনি সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু যে উদ্দীপনা আজিকার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া জাগ্রত হইয়াছে তাহাই জানাইয়া দিয়া গেল প্রভুর আত্মপরিচয়। 'মুঁই সেই, মুঁই সেই', বলিয়া বার বার তিনি তাঁহার ভগবত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

প্রভুর কৃপাদণ্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা নাই। বৃদ্ধ বৈষ্ণবনেতা আঙনায় দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন।

নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, "প্রভু নিজ হাতে আমায় দণ্ড দিয়ে নিজের ঠাকুরালি তো দেখিয়েছ। তোমার এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাতেই যে আমি চেয়েছিলাম। এবার আমায় তোমার চরণাশ্রয় দান করো।"

প্রভু গৌরসুন্দর পরম প্রেমভরে অদ্বৈতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। উভয়ের কপাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা। আচার্য্যের আঙিনায় সেদিন কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়া উঠিল।

প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আচার্য্যকে যে প্রহার ও লাঞ্ছনা করিয়াছেন সেজন্য খুব লজ্জিত। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে অদ্বৈতকে কহিলেন, "আচার্য্য, সবাই আজ জেনে রাখুক, তিলার্দ্ধের জন্যও যে তোমার আশ্রয় নেবে, তার শত অপরাধ আমি মার্জ্জনা ক'রবো।"

প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত বার বার আনুগত্য প্রকাশ করেন, আর নয়নজলে তাঁহার বসন ভিজিয়া যাইতে থাকে।

এবার শুরু হয় প্রভুর আনন্দলীলা ও ইষ্টগোষ্ঠী। নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার রঙ্গ ও হাস্য পরিহাস চলিতে থাকে। অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবীর আজ আনন্দের সীমা নাই। সোৎসাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়া তিনি প্রভুর জন্য রন্ধন করিতে বসেন।

গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া প্রভু তুলসীমঞ্চের সম্মুখে গিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। অপূর্ব্ব ভাবরসে তিনি উদ্বেল। সুগৌর সুঠাম দেহের রেখায় রেখায় ঝলকিয়া উঠিতেছে দিব্য লাবণ্যশ্রী। রসনায় উচ্চারিত হইতেছে ইষ্টনাম। ভক্ত ও পার্ষদেরা এ অপূর্ব্ব প্রেমঘন মূর্ত্তির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছেন।

ভাবাবিষ্ট প্রভু হঠাৎ এসময়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অদ্বৈত এমনই এক সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। সবেগে তিনি গৌরসুন্দরের পদমূলে আছড়াইয়া পড়িলেন। পরমভক্ত হরিদাসও এ মহা সুযোগ হারাইবার পাত্র নহেন। অদ্বৈতের মাধ্যমে গৌরসুন্দরের পরমাশ্রয় তাঁহার জীবনে মিলিয়াছে —আজ দুই সংত্রাতাই তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পড়িয়া আছেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া হরিদাসও সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈতের চরণতলে পতিত হইলেন।

আচার্য্যের আঙিনায় সর্ব্বজন সমক্ষে সেদিন ফুটিয়া উঠিল এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। শায়িত ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে প্রথমে রহিয়াছেন হরিদাস, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভক্তদলের তিনি প্রতীক। তাঁহার শিরে চরণ স্থাপন করিয়া আছেন অদ্বৈত-প্রভু। সর্ব্বোপরি রহিয়াছেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। বৃন্দাবন দাস এই ত্রয়ী প্রণামরত পুরুষদের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—'ধর্ম্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে'।

ইহার পর আসিল ভোজন পর্ব্ব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সদাই বাল্যভাব। আনন্দের আবেশে বসিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া অন্ন ছড়াইতেছেন। সবাই মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ নিত্যানন্দের তত্ত্ব ভালোরূপেই জানেন। তাই তাঁহার সহিত কৃত্রিম কোন্দল করিতে, তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে, তাঁহার বড় আনন্দ।

আচার্য্য কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহা বিপদে পড়া গেছে এই নিত্যানন্দকে নিয়ে। সকলের জাতধর্ম্ম নাশ না ক'রে এ ছাড়বে না। কোথা থেকে যে এ মাতাল এসে জুটলো তা কে জানে? গুরু তার কেউ নেই। নিজের পরিচয় দেয় সন্ন্যাসী ব'লে। জাতি কি, কোন্ ঘরে জন্ম তা বোঝবার উপায় নেই। পশ্চিম দেশে

যার-তার হাঁড়িতে ভাত খেয়ে জাত খুইয়ে এসে শুরু করেছে মহা অনাছিষ্টি। হরিদাস, তোমরা সবাই আগে থাকতে সাবধান হও।”

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ ও হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। এ বালসুলভ কোন্দল দেখিয়া প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও হরিদাস হাঁসিয়া অস্থির হন।

কিছুক্ষণ বাদে লড়াই থামিয়া গেল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়কে পরম আনন্দে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন।

এইভাবে আচার্য্যের ভবনে কয়েক দিন থাকিয়া প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাসের এবারকার আগমন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত করিল এক নূতনতর শক্তি।

বিশেষতঃ অদ্বৈত আচার্য্যকে এবার প্রভু একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাই আচার্য্য ফিরিয়া আসিয়াছেন প্রভুর নব আন্দোলনের অন্যতম শক্তি-স্তম্ভ রূপে। নবদ্বীপের লীলাক্ষেত্রে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ইতিপূর্ব্বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন প্রভুর প্রধান সহায়করূপে। এবার সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিল অদ্বৈত আচার্য্যের মর্য্যাদা, জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বশক্তি। তাই চৈতন্য-ভাগবত এই দুই প্রধান পার্ষদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ‘প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুইজনে।’

বৎসরখানেক পরের কথা। প্রভু গৌরসুন্দর ইতিমধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার লীলানাট্যের এক নূতনতর অঙ্ক।

প্রভুর বিচ্ছেদের দহনে আচার্য্যের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। শুধু প্রভুর এই নবরূপ ও জীবোদ্ধার লীলা দর্শনের আশাতেই যে তিনি বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল, প্রভুর নীলাচলে যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাওয়ার আগে জননী ও ঘনিষ্ঠ ভক্তদের কাছে বিদায়

নিতে চান। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া নিজে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুকে দর্শনের জন্য সহস্র সহস্র দর্শনার্থী সেদিন আচার্য্য ভবনে ভীড় করিয়া দাঁড়ায়, নৃত্যকীর্ত্তনে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। শান্তিপুর পরিণত হয় ভক্তি-প্রেমের আনন্দ হাটে।

গৌরসুন্দরের সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্য মূর্ত্তি দর্শনে অদ্বৈত আচার্য্য আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ভাবোদ্বেল হইয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে হইলেন মূর্চ্ছিত।

বহুক্ষণ পরে আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। প্রভু এবার ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। ভক্তদেব দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈতের শিশুপুত্র অচ্যুত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উলঙ্গ শিশু মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া আপন মনে এতক্ষণ খেলা করিতেছিল। এবার এই জনসংঘট্ট ও দেবদুর্লভ মূর্ত্তি প্রভুকে দেখিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধূলিধূসরিত শিশুকে গৌরসুন্দর কোলে তুলিয়া নিলেন, সস্নেহে কহিলেন, "অচ্যুত, বলতে পারো, তুমি আমার কে? জানতো, আচার্য্য আমার পিতা, কাজেই তুমি আর আমি হচ্ছি দুই ভাই।"

সবাইকে বিস্মিত করিয়া শিশু সেদিন উত্তর দিয়াছিল, "না-গো তা নয়। দৈবের বিধানে তুমি এসেছ জীবসখারূপে---তোমার জনক তো কখনো কেউ থাকতে পারে না---তুমি যে স্বপ্রকাশ।"

ভক্তদল ও দর্শনার্থীরা হতবাক্! অদ্বৈত আচার্য্যের এ অবোধ শিশু একি অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা বলিতেছে। অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া ইহার জন্ম, এ শিশু যে অনন্যসাধারণ!"

নবদ্বীপে প্রভুর যে ঈশ্বরীয় আবেশ যে ঐশ্বর্য্য ভক্তগণ দেখিয়াছিলেন, অদ্বৈত গৃহে তাহাই শেষবারের মত সকলে দেখিলেন। দিব্য উদ্দীপনাভরে বিষ্ণুখট্টার উপর প্রভু উঠিয়া বসিলেন। স্বমুখে বার বার 'মুই সেই, মুই সেই' বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন নিজতত্ত্ব।

বিদায়ের পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে প্রভু তাঁহার অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন—

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় কেহ নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই।
যত্মপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্ত বশ স্বভাব আমার।
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব্ব অবতার।
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জানাইয়া।

প্রতি বৎসরই ভক্তগোষ্ঠী প্রভুর দর্শনলাভের জন্য নীলাচলে যান, আর তাঁহাদের এই পদযাত্রার পুরোভাগে থাকেন অদ্বৈত আচার্য্য। এই অভিযাত্রায় শুধু ভক্ত বৈষ্ণবেরাই নয়, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীরাও কেহ কেহ থাকিতেন। প্রভুর সেবার জন্য সকলের আগ্রহের অন্ত নাই। যা কিছু আহার্য্য তিনি আগে পছন্দ করিতেন, যা কিছু এখনো ভালোবাসেন, সযত্নে তাহাই ভারে ভারে শুষ্ক করিয়া নিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন।

তখনকার দিনের যাত্রাপথ ছিল বড়ই বিপদসঙ্কুল। দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোষ্ঠী নীলাচলে পৌঁছিতেন, প্রভুর দিব্য মনোহর রূপ দর্শন করামাত্র তাঁহাদের পথ পর্য্যটনের সমস্ত কিছু শ্রান্তি এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যাইত।

প্রাণপ্রিয় বৈষ্ণবেরা তাঁহার দর্শনে আসিতেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রভুও ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যান; অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের তিনি পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন দিতে থাকেন। প্রভুর গোষ্ঠী আর অদ্বৈতের গোষ্ঠীর মধ্যে হুল্লোড় পড়িয়া যায়, আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে।

প্রভুর পূজার্চ্চনার জন্য আচার্য্য নানা উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহারের উপায় কই? মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘটিয়া যায় আত্মবিস্মৃতি। প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস দুকূল ছাপাইয়া উঠে, বৃদ্ধ আচার্য্য আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার দিতে থাকেন, "এনেছি এনেছি, প্রভুকে আমি এনেছি।"

আচার্য্যের ব্যাকুল ক্রন্দনেই প্রভু আসিয়াছেন—এ বিশ্বাস রহিয়াছে সকল ভক্তেরই অন্তরে। তাই সমবেত কণ্ঠে প্রভু ও আচার্য্যের জয়রব ধ্বনিত হয়, দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠে।

প্রভুর ইঙ্গিতে জগন্নাথদেবের আজ্ঞামালা নিয়া সেবকেরা ছুটিয়া আসে। এই মালা ও চন্দন প্রথমে তিনি পরাইয়া দেন আচার্য্যবরের কণ্ঠে, তারপর অপর বৈষ্ণবেরা মালা প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হন।

সেবার নীলাচলে পৌঁছিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের অভিলাষ হইল প্রভুকে একদিন ভোজন করাইবেন এবং স্বহস্তেই সব কিছু তিনি রাঁধিবেন।

নিমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীচৈতন্য মহা উল্লসিত—

প্রভু বোলে, যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়।
আচার্য্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন।
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়া খাইতে আমার তথি হয় মন।

ভক্তবৎসল প্রভুর এই মধুর কথা শুনিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? আচার্য্য আনন্দে আপনহারা হইয়া গেলেন।

আজ প্রভুর নিমন্ত্রণ। আচার্য্য ও আচার্য্যপত্নী প্রত্যূষ হইতেই কর্ম্ম-ব্যস্ত। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে আচার্য্য রন্ধনের অধিকারটি পত্নী সীতাদেবীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। প্রভুর কাছে যে এই অধিকারটি নিজেই তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। বৃদ্ধ ভক্ত পরমোৎসাহে নানা উপাদেয় বস্তু রন্ধন করিতেছেন, আর পত্নী সীতাদেবী নিকটে বসিয়া সব কিছু জুটাইয়া দিতেছেন।

আচার্য্যের মনে এ সময়ে বার বারই একটি গোপন ইচ্ছা স্ফুরিত হইতেছে। প্রভু যখন ভিক্ষা গ্রহণে আসেন, প্রায়ই তাঁহার সহিত আসিয়া উপস্থিত হয় একদল সেবক ও ঘনিষ্ঠ ভক্ত। বড় আশা করিয়া বহু কষ্টে আচার্য্য আজ এত সব প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু

প্রভু যদি সদলবলে আসেন, তবে তো তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়ানো যাইবে না।

পত্নীকে ডাকিয়া আচার্য্য মনের কথাটি খুলিয়া বলিলেন, তারপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আহা, এমন কোন দৈব দুর্য্যোগ কি আজ হতে পারে না, যাতে প্রভু একলাটিই আমার কুটিরে এসে উপস্থিত হন। তা'হলে পরম পরিতোষ সহকারে তাঁকে ভোজন করানোর সুযোগ পাই!"

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। আচার্য্য সবে মাত্র রন্ধন শেষ করিয়াছেন, হঠাৎ আচম্বিতে আকাশে দেখা দিল মেঘের ঘনঘটা। অল্প সময়ের মধ্যে শুরু হইল প্রবল ঝড় বৃষ্টি।

আচার্য্য প্রমাদ গণিলেন। একি ঘোর বিপদে আজ পড়া গেল। প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই মধ্যে একি দৈব দুর্য্যোগ! এ অসময়ে এমন ঝড় বাদলের তাণ্ডব শুরু হইবে তাহা কে জানে!

এমন সময় দেখা গেল আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। ঝড় জলে ভিজিয়া 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভু তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া আচার্য্য তাঁহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন। কিছুটা বিশ্রামের পর প্রভু আহারে বসিলেন।

বহু বিচিত্র আহার্য্য সম্ভার! আচার্য্য প্রাণপণে অজস্র খাবারের যোগাড় করিয়াছেন। পীড়াপীড়ি করিয়া প্রভুকে আকণ্ঠ ভোজন করানোর পর ভক্তের প্রাণে শান্তি আসিল।

এবার ভক্তিভরে আকাশের দিকে চাহিয়া অদ্বৈত ইন্দ্র দেবতার স্তুতি শুরু করিয়া দিলেম।

প্রভু মহা বিস্মিত। কহিলেন, "আচার্য্য, হঠাৎ ইন্দ্রদেবের ওপর তোমার এত ভক্তি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন বলতো?"

উত্তর হইল, "প্রভু, আজ ইন্দ্রের প্রসাদেই যে তোমায় এখানে একলাটি পেলাম, পরিপাটি ক'রে তোমায় ভোজন করিয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো

প্রভু একথা মানিতে রাজী নন। ঝড়-শিলাবৃষ্টির সময় তো এ নয়। এ যে আচার্য্যেরই কাজ। তাঁহারই বৈষ্ণবীয় ভক্তির বলে এই অলৌকিক কাণ্ড আজ সংঘটিত হইয়াছে। অদ্বৈতের প্রশস্তি গাহিয়া কহিলেন—

কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ সর্ব্বথা।
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ?

আবেগকম্পিত দেহে অদ্বৈত ততক্ষণে প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়াছেন। বার বার কাঁদিয়া কহিতেছেন, "প্রভু, তুমি সেবকবৎসল, সেবকের মনোবাঞ্ছা তোমার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, আর সে বাঞ্ছা পূরণও তুমি করো। আমার যা কিছু শক্তি তা যে এই প্রত্যয়েরই উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকে আমায় বলে—অদ্বৈত সিংহ। কিন্তু তারা তো জানে না, সিংহের বল হচ্ছে তার প্রভুরই বল!"

ভক্তগোষ্ঠী নিয়া প্রভু বড় আনন্দরঙ্গে আছেন। কৃষ্ণকথা ও কীর্ত্তনে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে।

বহুজন পরিবৃত হইয়া সেদিন তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় অদ্বৈত আচার্য্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

প্রভু সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "এই যে আচার্য্য। কোথা হতে তুমি আস্‌ছো। কোন্ কাজেই বা ব্যাপৃত ছিলে, বলতো?"

"প্রভু, শ্রীমন্দিরেই এতক্ষণ বসেছিলাম। জগন্নাথ দর্শন সেরে এইমাত্র আসছি।"

"খুব ভাল কথা, আচার্য্য। কিন্তু বল দেখি জগন্নাথ দর্শনের পর আর কি তুমি করেছো।"

"প্রভু, শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের পর তাঁকে রোজ প্রদক্ষিণ করি। আজও সেই কাজই ক'রে এলাম।"

উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিয়া প্রভু কহিলেন, "আচার্য্য, এবার তুমি সত্যই হেরে গেলে!"

অদ্বৈত বড় থতমত খাইয়া গিয়াছেন। প্রভুর কাছে তাঁহার পরাজয় হইবে, সে একটা বড় কথা নয়। কিন্তু এ পরাজয় কিসের, তাহা তো বুঝা যাইতেছে না। কহিলেন, "প্রভু, আগে বল, হার-জিতের বিষয়টি কি। তবে তো আমি তা মেনে নেব।"

প্রভু ও ভক্তের এই সংলাপ শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া আছে। এবার সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিল—

প্রভু বোলে সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ ব্যবহার।
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা।
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত।
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখো জগন্নাথ মুখ বিনে॥

ইষ্ট দর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব যে ইহাই। আর এই দর্শনই চৈতন্যদেব প্রতিদিন করিয়া থাকেন—জগন্নাথের জগৎ বিমোহন রূপ তাঁহার নয়নে থাকে চিরস্থির।

ভক্ত জনেরা সবাই প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া আছেন, কহারো মুখে কথা সরিতেছে না।

অদ্বৈত এবার যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "প্রভু তোমার কাছে পরাজিত হয়েই যে রয়েছি—এ পরাজয় তো নূতন কিছু নয়। তবে এটা বুঝতে পারি, জগন্নাথ দর্শনের এই তত্ত্ব শুধু তোমার শ্রীমুখেই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।"

বৃদ্ধ আচার্য্যের হৃদয়ে সেদিন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, যে চৈতন্যতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত, তাহারই আলোর ধারা দিকে দিকে তিনি ছড়াইয়া দিতে চান। শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "এসো আজ আমরা সবাই মিলে প্রভু শ্রীচৈতন্যের নামকীর্ত্তন শুরু ক'রে দিই। জীবের উদ্ধারের জন্য প্রভু

অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। তবে প্রভুর নামগানে, স্তুতিগানে, বাধা কোথায়?"

ভক্তদের ভয়, প্রভু নিজে এখন প্রায়ই থাকেন প্রেমে আবিষ্ট হয়ে, 'মুঁই কৃষ্ণদাস' ব'লে সবার কাছে বলেন। আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই তিনি ভালোবাসেন। তাঁর নাম কীর্ত্তনের উৎসাহ কাহারো কম নাই। কিন্তু প্রভু তাঁর নিজের স্তুতিগান শুনিয়া যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তবেই বিপদ।

অদ্বৈতের প্রেমাবেগ ও উৎসাহে সকলেরই ভয় কাটিয়া গেল। শুরু হইল উদ্দণ্ড কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনিয়াদের গানে নিজের এ আত্মস্তুতি শুনিতে প্রভু রাজী নন। ধীর পদক্ষেপে তিনি স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তেরা এবার ভয়ে ভয়ে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সেবক গোবিন্দের কাছে শোনা গেল, প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ নিজের শয্যায় শায়িত। আপন মনে একেবারে চুপচাপ পড়িয়া আছেন।

অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীণদের অগ্রে রাখিয়া ভক্তেরা কুটিরে ঢুকিলেন।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা শ্রীবাস, তোমরা সব সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান্ ভক্ত থাকতে এ সব কি হচ্ছে, বলতো? কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছো কেন?"

শ্রীবাস উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমাদের স্বাতন্ত্র্যই বা কি, শক্তিই বা কোথায়? ঈশ্বর যা বলিয়েছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ করেছি।"

প্রভু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমরা সবাই শাস্ত্রবিদ্, স্থিরবুদ্ধি। আচ্ছা বলতো, যে আত্মগোপন প্রয়াসী তাকে কি জনসমক্ষে ঠেলে বার ক'রে দিতে হয়? তা কি সঙ্গত?"

শ্রীবাস স্মিতহাস্তে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া হস্ত দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করার ভঙ্গী দেখাইলেন।

প্রভু কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার এ সঙ্কেতের মানে আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে, সবটা প্রকাশ ক'রে বল।"

উত্তর হইল, "প্রভু হাত দিয়ে আমি সূর্য্য ঢাকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সত্যই কি ও বস্তু ঢাকা যায়? তোমার লুকানো ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি, কোন কিছু দিয়ে ঢেকেই যে তোমায় গোপন রাখা যায় না।"

আর এ বিতর্ক বেশীক্ষণ সেদিন চলে নাই। প্রভুর গৃহদ্বারে হঠাৎ দেখা দিল এক বিরাট জনসমুদ্র। গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিল, এবার তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে, 'প্রভু'কে দর্শনের জন্য। অচল জগন্নাথের পরে সচল জগন্নাথ দেখিয়া তাহারা ঘরে ফিরিবে। এই দর্শনার্থী জনতা সেদিন জানাইয়া দিয়া গেল, প্রভু স্বপ্রকাশ—কোন গোপনতার আড়ালই তাঁহাকে জনচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিতে পারে না।

অদ্বৈতের প্রকাশ-প্রচেষ্টা এমনি করিয়া সেদিন জয়যুক্ত হইয়া উঠে, উদ্ঘাটিত করে প্রভুর লীলানাট্যের এক মহত্তর রূপ।

সনাতন ও রূপ সে-বার পুরীতে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের স্মরণ নিয়াছেন। প্রভু তাঁহার দুই বৈরাগ্যবান্ বৈষ্ণব ভক্তকে সম্মুখে রাখিয়া প্রথমে অদ্বৈতের খুব খানিকটা গুণগান করিলেন। তারপর কহিলেন, "ছাখো, প্রেমভক্তি যদি সত্যই পেতে চাও তবে তোমরা অদ্বৈতের শরণ নাও। তাঁর কৃপা না হলে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি উপজিত হবে না।"

নবাগত ভক্তদ্বয় তখনি সাষ্টাঙ্গে অদ্বৈত আচার্য্যের চরণে পতিত হইলেন। প্রভু প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্য, এ দুজনকে তুমি কৃপা করো। তুমি হচ্ছো ভক্তিধনের ভাণ্ডারী, তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে তো এদের অভীষ্ট লাভ হবে না।"

সনাতন ও রূপের মনীষা, কবিত্ব ও নেতৃত্ব শক্তি আচার্য্যের সুবিদিত। বুঝিলেন, প্রভু চাহেন প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি এই দুই মহা-প্রতিভাধর ভক্তের হৃদয়ে স্ফুরিত হোক, আর তাহার সূচনা হোক

প্রবীণতম বৈষ্ণবনেতা, ভক্তি-শাস্ত্র পারঙ্গম অদ্বৈতের আশীর্ব্বাণী নিয়া।

আচার্য্য কহিলেন, "প্রভু, কৃষ্ণ ভক্তির ভাণ্ডারের অধিকারী হচ্ছো তুমি। আমি সে ধনের ভাণ্ডারী কিনা জানি না। যদি হয়েই থাকি, তবে ভাণ্ডারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের আজ্ঞায়। তুমি ইচ্ছাময়, যখন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে ভক্তদের কৃপা বিতরণ করো। আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই আশীর্ব্বাদই করছি—এদের দু'ভাই-এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।"

সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য কহিলেন,—"আর তোমাদের কোন চিন্তা নেই। শক্তিধর আচার্য্যের কৃপা আজ তোমরা পেয়েছো—

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি॥

(চৈঃ ভাঃ)

আর একদিনের কথা। অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বসিয়া আছেন। ভাবাবেশে দেহ তাঁহার কম্পিত হইতেছে, আয়ত নয়ন দুইটি ঢুলুঢুলু। হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিত, আমায় বল দেখি, অদ্বৈতকে তুমি কেমনতর বৈষ্ণব বলে মনে করো?"

বড় বিপজ্জনক প্রশ্ন। কি ইহার উত্তর দেওয়া যায়? ক্ষণকাল ভাবিয়া।চন্তিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত যে উত্তর দিলেন, প্রভুর তাহা মনঃপূত হইল না। অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বৃদ্ধ পণ্ডিতের গালে ঠাস্ করিয়া তখনি এক চড় বসাইয়া দিলেন।

অতঃপর ভাবাবেশে কাটিয়া গেল। শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রভু শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে অদ্বৈতের স্বরূপ মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তদের হৃদয়ে অদ্বৈত-তত্ত্বটি চিরতরে সেদিন অঙ্কিত হইয়া গেল।

প্রতি বৎসরই আচার্য্য অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে উপস্থিত হন। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন কর্ম্মক্ষেত্র গৌড়দেশে। সেখানে তিনি বিরাজিত থাকেন প্রভুর প্রবর্ত্তিত ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে।

সেবার আচার্য্যের এক ভক্ত তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া দেন। এই ভক্তটির নাম বাউলিয়া বিশ্বাস। এ সময়ে আচার্য্য প্রভুর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ দেনার জন্য তাঁহাকে বড় বিপদাপন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

বাউলিয়া বিশ্বাস সরল মানুষ, গুরুর অর্থাভাব তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। তিনি মনে মনে ভাবিতে থাকেন, তাইতো, এত সব ঐশ্বর্য্যশালী ভক্ত ও রাজরাজড়া থাকিতে আচার্য্যের এমন দুর্গতি চলিতে থাকিবে? কোনক্রমে উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্রের কানে একবার এ কথাটি তুলিতে পারিলেও ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়।

বাউলিয়া বিশ্বাস তাহাই করিলেন। প্রতাপরুদ্রকে আচার্য্যের অর্থকৃচ্ছ্রের কথা জানাইয়া তিনশত টাকার সাহায্য তিনি চাহিয়া বসিলেন।

কথাটি কি করিয়া যেন চৈতন্যদেবের কানে গেল, তিনি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সেবকদের আদেশ দিলেন, "ছাখো, বিশ্বাস যেন কখনো আমার কাছে না আসে, আমি তার মুখদর্শন করতে চাইনে। শুদ্ধসত্ব অদ্বৈত আচার্য্যকে সে বিষয়ীর দান গ্রহণ করাতে চায়! জান্‌বে, আমার কাছে কোনদিন তার ক্ষমা নেই।"

প্রভুর এই দণ্ডাজ্ঞা নীলাচল ও গৌড়ে আলোড়ন তুলিল। ভক্ত সমাজের সম্মুখে ইহা দেখা দিল এক সতর্ক-সঙ্কেত রূপে। সকলেই বুঝিলেন—প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে গেলে বিষয়ীর দান প্রতিগ্রহ করা চলিবে না।

বাউলিয়া বিশ্বাসের এই দণ্ড অদ্বৈতের প্রাণে বড় বাজিল। প্রকৃত পক্ষে নিজের জন্য সে কোন সাহায্য চাহে নাই, চাহিয়াছে আচার্য্যেরই শুভার্থী হইয়া।

কিছুদিন পরেই নীলাচলে প্রভুর সহিত আচার্য্যের সাক্ষাৎ।

আচার্য্য সকৌতুকে কহিলেন, "প্রভু, বাউলিয়া বিশ্বাসের ওপর তোমার এমন কৃপা, অথচ আমাদের দিকে তুমি একটিবার ফিরেও তাকাও না।"

প্রভু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আচার্য্য, তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল, তুমি তো নিশ্চিতরূপে আমার মতবাদ জানো। প্রকৃত বৈষ্ণব হবে ঈশ্বরচরণে নিবেদিতপ্রাণ, ঈশ্বর প্রেমে সদা-উন্মত্ত। বিষয়কূপে পড়ে যে হতভাগ্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে, তার কাছে সাহায্যের প্রত্যাশী হবে কেন? তোমার ঋণ শোধের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে আবেদন যাবে কেন, বলতো? যোগক্ষেম বহনের প্রতিশ্রুতিতে যিনি আবদ্ধ, তোমার ভার যে তিনিই নিয়ে বসে আছেন। তবুও বাউলিয়া বিশ্বাস কেন এমন হঠকারিতা করলো? তাই তো আমি তাকে দণ্ড দিয়েছি। অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছো, এ দণ্ড তাকে দিয়েছি আমার আপন জন মনে করেই, সে তোমার ভক্ত ব'লে। বুঝেছি, ভক্তের এ দণ্ড তোমাকে বিচলিত করেছে। আচ্ছা এবার আমি বিশ্বাসকে মার্জ্জনা ক'রলাম। আর যেন কখনো তার এমন কুমতি না হয়।"

ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত সেবার নীলাচল হইতে গৌড়ে গিয়াছেন। তাঁহার মাধ্যমে বৃদ্ধ অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের জন্য এক তরজা পাঠাইলেন।

প্রভুকে কহিও আমার
কোটি নমস্কার
এই নিবেদন তাঁর
চরণে আমার
—'বাউলকে কহিও লোকে
হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে
না বিকায় চাউল।

বাউলকে কহিও কাজে
নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা
কহিয়াছে বাউল।

নীলাচলে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় জগদানন্দ এই তরজাটি সেখানে আবৃত্তি করিলেন। বড় প্রহেলিকাময় আচার্য্যের এই তরজা। সকলেই চুপচাপ হইয়া বসিয়া আছেন। প্রভু স্মিতহাস্যে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "বেশ, তাঁহার যে আজ্ঞা।"

প্রভুর লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ স্বরূপ দামোদর নিকটেই ছিলেন। মনে তাঁহার বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "প্রভু, আমরা কেউ এ হেঁয়ালীর মানে বুঝে উঠতে পারলুম না। আপনার কথাও বড় দুর্ব্বোধ্য ঠেকছে। কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন।"

উত্তর হইল, "স্বরূপ, জানতো অদ্বৈত আচার্য্য আগম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন, দুই অনুষ্ঠানই তাঁর জানা আছে। আচার্য্য বোধহয় একটা কিছু ইঙ্গিত জানাতে চেয়েছেন। কিন্তু তোমাদের মত আমিও সবটা বুঝতে পারিনি।"

প্রভু আসল কথাটা চাপিয়া গেলেও স্বরূপ বুঝিলেন, আচার্য্য তাঁহার দেবতার বিসর্জ্জনের ইঙ্গিতই এই হেঁয়ালীর মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছেন। স্বরূপের অনুমান মিথ্যা হয় নাই, অদ্বৈতের এই তরজা শ্রবণের পর হইতে প্রভু হইয়া উঠেন আরো অন্তর্মুখীন। গম্ভীরার মধ্যে আপনাকে তিনি একেবারে গুটাইয়া নেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিরোভাবের দিনটি ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিল তুলসী আর অশ্রুজলে যে লীলা আচার্য্য ত্বরান্বিত করেন, আরব্ধ কার্য্যশেষে তাহারই উপর যবনিকা ক্ষেপণের কথাটি নিজেই তিনি ধ্বনিত করিয়া যান।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা সম্বরণের পরও দীর্ঘদিন অদ্বৈত আচার্য্য

মরদেহে অবস্থান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম স্তম্ভ-রূপে এই বৃদ্ধ আচার্য্যকে সসম্মানে বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়।

ভক্তজনচিত্তে আচার্য্যের সেই দিব্য রূপটিই এসময়ে ভাস্বর হইয়া উঠে, যে রূপটির ইঙ্গিত স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রিয় সখা মুরারী গুপ্তের কাছে বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করেন

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য।
ততোধিক প্রিয় মোর কেহ নাহি অন্য।
আপনে ঈশ্বর অংশ জগতের গুরু। ··
তাঁর দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।

(চৈঃ মঙ্গল—লোচন)

শঙ্করদেব

পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় নূতনতর ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয়। এই ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব—আরাধ্য পরম বস্তু শ্রীভগবান্ লীলাময়, প্রেমময় ও কৃপাময়। জাতিবর্ণের পার্থক্য তাঁহার কাছে নাই। ভক্তি প্রেমের উপচার নিয়া, একান্ত শরণাগতি নিয়া, যে কোন শ্রেণীর সাধক তাঁহার আরাধনা করিতে পারে, পৌঁছিতে পারে তাঁহার দিব্যধামে। এই উদার সর্ব্বজনীন ভক্তি-ধর্ম্মের আলোকধারা অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সর্ব্ব স্তরে; আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে জাগিয়া উঠে নূতনতর মানবতা-বোধ।

উত্তর ভারতে রামানন্দ ও তৎশিষ্য কবীর, পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে নামদেব, তেলেগু দেশে বল্লভাচার্য্য, গৌড় ও উড়িষ্যায় চৈতন্য-মহাপ্রভু এই যুগে উৎসারিত করেন উদার ভক্তিধর্ম্মের এক একটি বিপুল তরঙ্গ। আসামের বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবও ছিলেন ইঁহাদের মত ভক্তি-আন্দোলনের এক পথিকৃৎ।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করদেবের উপাস্য। এই উপাস্যকে জন-মানসের সম্মুখে তিনি স্থাপিত করেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে। শ্রদ্ধাভক্তি, শরণাগতি ও নামধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হয় তাঁহার সাধনপূত জীবন ও বাণীর মাধ্যমে। তৎকালীন আসামের অনগ্রসর এবং বহুবিচ্ছিন্ন সমাজজীবনে তিনি আনয়ন করেন ভক্তি-প্রেমের বিপুল জোয়ার। সর্ব্ব ভারতের ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজ্য আসামের আত্মিক যোগবন্ধনটিও গড়িয়া উঠে শঙ্করদেবের সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাহিত্যের মধ্য দিয়া।

শঙ্করের জন্মস্থানের নাম আলিপুখুরি। বর্ত্তমান আসামের নওগাঁ শহর হইতে ষোল মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে

প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতার নাম কুসুমবর, মাতা—সত্যসন্ধ্যা। পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ, সেবা-পূজার মধ্য দিয়া ঈশ্বর দর্শনের অভিলাষ তাঁহারা পোষণ করিতেন।

সন্তান প্রসবের কয়েক দিনের মধ্যেই জননী সত্যসন্ধ্যার অন্তিম-কাল উপস্থিত হয়, ইষ্টবিগ্রহ শঙ্করের নাম জপ করিতে করিতে তিনি তনু ত্যাগ করেন। তাই তাঁহার নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় শঙ্কর। গৌরকান্তি, অপরূপ রূপলাবণ্যময় এই শিশু, দর্শনমাত্রেই লোকের মন কাড়িয়া নেয়। মাতৃহীন শঙ্করের লালন-পালনের ভার সযত্নে গ্রহণ করেন তাহার বৃদ্ধা পিতামহী।

শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ধনী সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী। তাঁহাদের বলা হইত শিরোমণি ভূঁইয়া, অর্থাৎ ভূঁইয়াদের মধ্যে ধনে মানে ও কীর্ত্তিকলাপে তাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

ত্রয়োদশ শতকে মহারাজ বল্লাল সেন কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সৎ কায়স্থ গৌড়দেশে নিয়া আসেন। এই কায়স্থদেরই কয়েকটি উত্তর পুরুষ পরবর্ত্তীকালে আসামে আসিয়া বসবাস করেন। আসামের অন্যতম রাজা দুর্লভনারায়ণ গৌড়ের অধিপতি ধর্ম্মনারায়ণের নিকট অনুরোধ জানান, কনৌজী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কয়েকটি পরিবারকে যেন আসামে যাওয়ার অনুমতি

১ অনেকের মতে, শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু আসামের ঐতিহাসিক স্যর এডওয়ার্ড গেইট এই জন্ম-সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহার ধারণা আরো ৩০।৪০ বৎসর পরে শঙ্করদেব ভূমিষ্ঠ হন।

অনিরুদ্ধ ছাড়া কোন অসমীয়া জীবনীকারই শঙ্করের জন্ম-সাল লিপিবদ্ধ করেন নাই। অনিরুদ্ধ লিখিয়াছেন, শঙ্করের জন্ম হয় ১৩৮৫ শকে অর্থাৎ, ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, শঙ্করদেবের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছিল, অহোম রাজা চুহ-মুঙ (১৪৯৭-১৫৩৯) এবং কোচরাজ নরনারায়ণের রাজ্যকালে (১৫৪০-১৫৮৪); সেই জন্য মনে হয় হয়তো প্রচলিত ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে অনিরুদ্ধ কথিত ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দকে শঙ্করদেবের জন্ম-সাল ধরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।—উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩।

দেওয়া হয়। তদনুযায়ী গৌড়রাজ একদল সদাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে সপরিবারে আসামে প্রেরণ করেন। নবাগত ঐ কায়স্থদের মধ্যে কেহ কেহ নওগাঁ জেলার মৈরাবাড়ী অঞ্চলে নিজেদের বাসভূমি গড়িয়া তোলেন। আসামের রাজারা ইঁহাদের কর্ম্মদক্ষতায় তুষ্ট হইয়া কোন কোন মৌজার শাসনভার অর্পণ করেন এবং ভূঁইয়া উপাধিতে ভূষিত করেন।

শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষ চণ্ডী ভূঁইয়া ছিলেন একজন কৃতী পুরুষ। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর রাজধর প্রভৃতিও ছিলেন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী। নিজ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া শঙ্কর পয়ার ছন্দে তাঁহার অসমীয়া ভাগবতে লিখিয়াছেন :

বরদয়া নামে গ্রাম শস্যে মৎস্যে অনুপাম
লোহিত্যর অতি অনুকূল।
সেই মহা গ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাজধর
কায়স্থ কুল পদ্মফুল॥
তানে পুত্র সূর্য্যবর মহা বড দেশধর
দানী মানী পরম বিশিষ্ট।
যার যশ এভো জলৈ জয়ন্ত মাধবদলৈ
দুই ভাই যাহার কনিষ্ঠ॥
তানে পুত্র কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার
প্রসিদ্ধ কুসুম নাম যার।
তানে সুত শিশুমতি কৃষ্ণপায়ে করি নতি
বিরচিল শঙ্করে পয়ার॥

(১২০০১—২)

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষরা প্রতিষ্ঠাবান্ ভূম্যধিকারী ছিলেন। অনেকের মতে, তাঁহারা ছিলেন প্রতাপশালী বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শঙ্করের পিতা কুসুমবরের সময়ে পরিবারের পূর্ব্ব ধন-মানের গৌরব হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি একজন সম্পন্ন জমিদার এবং সদাচারী ও ধার্ম্মিক বলিয়া নিজ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন।

মাতৃহীন বালক পিতামহীর আদর-যত্নে যেমন লালিত হইতে থাকে, তেমনি তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থাও গোড়া হইতে করা হয়। নিতান্ত বালক হইলেও, এই বয়সেই শঙ্করের চালচলন ও কথাবার্ত্তায় ফুটিয়া উঠে নানা বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্ব জন্মের শুভ সংস্কার নিয়া সে জন্মিয়াছে। সেই সঙ্গে লাভ করিয়াছে অসামান্য মেধা ও প্রতিভা। এক একদিন বালকের প্রশ্নে ও কথাবার্ত্তায় ঝলকিয়া উঠে তাহার প্রতিভার দীপ্তি, বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত লোকেরাও ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া যান। কবিতা রচনার শক্তিও স্ফুরিত হইতে দেখা যায় এই কচি বয়সেই। যুক্তাক্ষর শঙ্কর তখনো শিখে নাই কিন্তু এই সময়েই সে রচনা করে তাহার প্রসিদ্ধ কবিতা—'করতল কমল কমলদল নয়ন।' সকলেই সোৎসাহে বলাবলি করিতে থাকেন,—'এ বালক বাক্‌দেবীর অনুগৃহীত, আশিস্ প্রাপ্ত, উত্তরকালে অবশ্যই এ প্রসিদ্ধি লাভ করবে অসামান্য কবিরূপে।'

বারো বৎসর বয়সে শঙ্করকে ভর্ত্তি করা হয় পণ্ডিতবর মহেন্দ্র কন্দলীর চতুষ্পাঠীতে। সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে এই আচার্য্য পারঙ্গম। কিশোর ছাত্রও তেমনি বিস্ময়কর ধীশক্তির অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠে। আচার্য্য মহেন্দ্র কন্দলী নিজে ভক্তিমান্ তাই ভক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহ বেশী। তাঁহার এই ভক্তি প্রবণতার প্রভাব কিশোর ছাত্র শঙ্করের উপরও বেশ কিছুটা আসিয়া পড়ে। নবীন ছাত্রের পাণ্ডিত্য এবং বিশেষ করিয়া ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া প্রবীণ আচার্য্যের হৃদয় আনন্দে গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

কয়েক বৎসর পরে শঙ্কর চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন, শুরু করেন হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর দর্শনের তত্ত্বালোচনা।

ভক্তি ও প্রেমের শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। শিক্ষক মহেন্দ্র কন্দলীর সান্নিধ্য ও প্রভাবও তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তরুণ পণ্ডিত শঙ্করের জিজ্ঞাসু মন

জীবনের দিক্‌দর্শন সম্পর্কে, পরমতত্ত্ব সম্পর্কে, এখনো স্থিরভূমি প্রাপ্ত হয় নাই, প্রত্যয় ও নিঃসংশয়তার ভিত্তি তাঁহার জীবনে গড়িয়া উঠে নাই।

মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা শঙ্করকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। পরম সত্যের পথসন্ধান ও আত্মিক উপলব্ধির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। দিনের পর দিন উঠে চিন্তার তরঙ্গরাশি,—জীব কোথা হইতে সংসারে আগত হয়, এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের কি সম্পর্ক, কোথায়ই বা তাহার যোগসূত্র? জীব ও ভগবানের মিলন কি সম্ভব? যদি সম্ভবই হয়, তবে তাহার পন্থা কি? কাহার সাধন প্রণালী তিনি অনুসরণ করিবেন, কোথায় সেই পরম কারুণিক দিক্‌দিশারী?

এই সময়ে কিছুদিনের জন্য এক পরিব্রাজনরত যোগীর সাহচর্য্য তিনি লাভ করেন। ইঁহার নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামের গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া নিয়া শুরু করেন যোগসাধনা।

শঙ্করদেবের প্রামাণিক জীবনচরিত-লেখক দৈত্যারি ঠাকুর এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

প্রাণ অপান সমান উদান
আদি করি বায়ুচয়।
বশ্য করিলন্ত, চলাইবে পাবন্ত
যি বায়ু যৈত লাগয়॥
বায়ুক ক্ষেপিয়া, উপাসে ধরিয়া
আসন ভিরি হরিষি।
থাকন্ত সদায়, সুনিশ্চয় কায়
দিন দুই চারি বসি॥

কিন্তু এই যোগসাধনার পথ বেশী দিন তিনি অনুসরণ করেন নাই। নিজ অন্তরের গভীরে অবগাহন করিয়া অচিরে বুঝিতে পারেন, ভক্তিপ্রেম সাধনার দিকেই তাঁহার প্রধান প্রবণতা। ভক্তিপ্রেমের সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, এবং এই সংস্কারই অনিবার্য্য-রূপে এবার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাঁহার সাধন জীবনে।

অতঃপর কয়েকটি বৎসর শঙ্কর গভীরভাবে ভারতের পুরাণ-শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় নিবিষ্ট হন, ভক্তিধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটনে হন যত্নবান।

শঙ্করের তখন বাইশ বৎসর বয়স। মনে সঙ্কল্প স্থির করিলেন, এবার কিছুদিনের জন্য সারা ভারতের তীর্থ পরিব্রাজনে তিনি বহির্গত হইবেন। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুর পাদপীঠ গয়াধাম ও কৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শন করার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সঙ্কল্প সাধনের পথে সেদিন বাধা পড়িয়া গেল। পিতা হঠাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থভ্রমণে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো।"

"আজ্ঞে হাঁ, মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছে"—সবিনয়ে শঙ্কর নিবেদন করেন।

"বাবা, এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু তার সময় তো এখন নয়, অনেক পরে। তীর্থ পরিব্রাজনের বয়স হয়েছে বরং আমার। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তুমি বয়সে নবীন, এখন তোমার সম্মুখে রয়েছে অনেক কিছু কর্ত্তব্য। আগে সেসব সমাপন করো, তারপর তীর্থে বেরুবে।"

"কিন্তু বাবা, আমি যে—"

"না, আর কিন্তু-টিন্তু নয়। এ বয়সে তোমার তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে বেড়ানো চলবে না। হ্যাঁ, আমি স্থির করেছি, এবার তোমার বিবাহ দেবো। সুপাত্রীও পেয়েছি। বিবাহের পর তুমি সংসারী হও, প্রয়োজনীয় বিষয়-কর্ম্ম ছাখো, পিতা ও পিতৃপুরুষের বাঞ্ছিত পুণ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করো। তারপর কর্ত্তব্যকর্ম্ম সব সমাধা ক'রে প্রবীণ বয়সে তীর্থভ্রমণ ক'রবে। এই আমি চাই।"

পিতার নির্দ্দেশ অমান্য করা চলে না। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করকে বিবাহ করিতে হইল। পত্নী সূর্য্যবতী যেমনি রূপবতী তেমনি সর্ব্ব গুণসম্পন্না, পতির উচ্চাদর্শ ও ধর্ম্মজীবনের সহায়িকারূপেই তিনি তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু শঙ্করের এই গার্হস্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, বিবাহের চার বৎসর পরে সূর্য্যবতী এক শিশুকন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতা কুসুমবরও প্রস্থান করেন পরলোকে।

পর পর এই দুইটি শোকের আঘাত শঙ্করকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে, জীবনে জাগিয়া উঠে তীব্র বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ।

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এই ইচ্ছাও এসময়ে তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু এইসঙ্গে পিতার নির্দ্দেশটিও স্মরণে আসিয়া যায়। 'সংসারের প্রধান কর্ত্তব্যগুলি সমাপন করার পর পরিব্রাজন বা তীর্থ দর্শন করবে' এই কথাটিই বিশেষভাবে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তাই শঙ্করকে আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। অতঃপর কন্যা মনুর জন্য হরি নামক এক সদ্বংশীয় কায়স্থ যুবককে পাত্ররূপে তিনি নির্ব্বাচন করিলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন। এবার আসে শঙ্করের বিদায়ের পালা। বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয় জয়ন্ত ও মাধব দলই-কে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি দীর্ঘ দিনের জন্য তীর্থ পরিব্রাজনে যাচ্ছি। সারা ভারতে আমায় ঘুরে বেড়াতে হবে। পথে বিপদের অন্ত নেই, আর কোন দিন দেশে ফিরে আসবো কিনা তাও জানিনে। আমার কন্যা আর আত্মীয়-স্বজনেরা রইলো, তোমরা সতর্কভাবে তাদের দেখাশুনা করবে। আমার জমিদারী ও বিত্তবিষয় রক্ষণের ভারও রইলো তোমাদের ওপর। তোমরা আমার বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন; প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি নিয়ে আমার কর্ত্তব্য কাজ তোমরা চালিয়ে যাবে। শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বহু অনুরোধ উপরোধেও শঙ্করকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

অতঃপর প্রায় বারো বৎসর তিনি আসামের বাহিরে নানা তীর্থে ও সাধনপীঠে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই দীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার অনুচরদ্বয় নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব।

শঙ্কর তীর্থ দর্শনে চলিয়াছেন, এই সংবাদ গ্রামে রটিয়া গেল। আচার্য্য মহেন্দ্র কন্দলী তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন, 'বৎস, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। ভারতের বৈষ্ণব তীর্থগুলো পরিক্রমা করবো, এ সাধ বহুদিনের। তুমি তীর্থে যাচ্ছো, আমায়ও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

শিক্ষাগুরুর এই অনুরোধ রক্ষায় শঙ্কর সানন্দে সম্মত হইলেন। আরো পনের ষোলজন সঙ্গীও এ সময়ে জুটিয়া গেল। এবার শুরু হইল তাঁহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থযাত্রা। শঙ্করের এই তীর্থদর্শনের বিস্তারিত তথ্য ও কাহিনী তাঁহার বিভিন্ন চরিতকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন।[১] যেসব বৈষ্ণবতীর্থগুলি এ-সময়ে তিনি পরিক্রমা করেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতাকুণ্ড, গয়া, পুরী, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি।

সঙ্গীরা মোটামুটিভাবে তীর্থ দর্শন সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁহার পরিব্রাজনে রত থাকেন বারো বৎসর ব্যাপিয়া। এই দীর্ঘ বৎসরগুলি তিনি শুধু বৈষ্ণবদের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াই অতিবাহিত করেন নাই, যেখানে যে দেবমন্দির বা সাধনপীঠে গিয়াছেন সেখানকার সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের সহিত মিলিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া প্রেম-ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে গিয়া সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে তিনি বাস করিয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্বান্বেষী মন তৃপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানে।

এই সময়েই শঙ্করের জীবনে ঘটে বহুবাঞ্ছিত গুরুর আবির্ভাব। দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরু তাঁহাকে প্রদর্শন করেন শুদ্ধাভক্তির সাধন পথ। বিদায়কালে নির্দ্দেশ দেন, "বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করি, শুদ্ধাভক্তির পথ অনুসরণ ক'রে তুমি ইষ্টলাভ করো। ভক্তির যে

১ শঙ্করের চরিতকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামচরণ ঠাকুর ও তৎপুত্র দৈত্যারি ঠাকুর, ভূষণ দ্বিজ, রামানন্দ দ্বিজ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি।

শুভ সংস্কার ও শুভ বীজ তোমার ভেতর অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে, অচিরে তা সফল হয়ে উঠুক, চৈতন্যময় হয়ে উঠুক।"

বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস নিতে শঙ্কর বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। একথা নিবেদন করায় গুরুদেব কহিলেন, "বৎস, বিধি-নির্দ্দিষ্ট বহু কাজ তোমায় সংসারে থেকে করতে হবে। সংসার জীবনে থেকে, সংসারকে ভগবৎ-সংসারে পরিণত করার কাজে তুমি আত্মনিয়োগ করো, এই আমি চাই। সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে, পরম কারুণিক বিষ্ণু বা তাঁর অবতার কৃষ্ণই হচ্ছেন মানবের উপাস্য, মানবের ইষ্ট। এই পরমপ্রভুর একান্ত শরণ নিয়ে, সর্ব্বত্র নামধর্ম্মের প্রচার করো, নামযজ্ঞ উদ্‌যাপন করো। নামী আর নাম অভেদ, এই পরম জ্ঞান ছড়িয়ে দাও আসাম রাজ্যের সর্ব্বত্র। ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, আর তাঁর জীবন ও বাণীর ভাষ্যগ্রন্থ শ্রীভাগবত তোমার সহায় হবেন।"

শঙ্কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি এক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ও উদীয়মান্ ধর্ম্মনেতা। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের তীর্থ পরিব্রাজন এবং সিদ্ধ সাধুসন্ত ও তাত্ত্বিকদের সাহচর্য্য ও কৃপা তাঁহাকে পরিণত করিয়াছে এক আত্মপ্রত্যয়শীল সাধকে। বৈষ্ণবীয় সাধনার দৃঢ়ভূমি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবন সমক্ষে উন্মোচিত হইয়াছে শ্রীভগবানের অমৃতলোকের সিংহদ্বার।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আদিষ্ট কর্ম্মে ব্রতী হইতে শঙ্কর দেরী করেন নাই। সংসারী জীবনযাপন করিয়া সংসারকে নামধর্ম্মে উজ্জীবিত করিতে হইবে, কৃষ্ণের সংসারে পরিণত করিতে হইবে। তাই দ্বিতীয়বার তিনি দার পরিগ্রহ করিলেন। আলিপুখুরির বসবাস উঠাইয়া দিয়া, নিকটেই বরদোয়া গ্রামে স্থাপন করিলেন নূতন ভবন ও প্রচার কেন্দ্র। শুরু করিলেন ব্যাপকভাবে নামদীক্ষা দান। নবদীক্ষিত শিষ্যদের সহায়তায় বরদোয়াতে একটি সত্র বা মঠ নির্ম্মিত হইল এবং প্রবর্ত্তিত হইল একটি নাম-ঘর। এই নামঘরে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গ্রাম সন্নিহিত সাধারণ মানুষেরা সমবেত হইত, নাম-কীর্ত্তনে ও নাম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণে দিনের পর দিন হইত নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

আচার্য্য জীবনের এই প্রথম পর্য্যায় হইতেই শঙ্কর পরিচিত হইয়া উঠেন শঙ্করদেব নামে, তাঁহার প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম অভিহিত হয় 'একশরণ ধর্ম্ম' নামে।

তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্মের মূল কথা,—এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ হইতেছেন বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই অদ্বিতীয় পরম পুরুষের চরণেই নিতে হইবে একান্ত শরণ, উৎসর্গ করিতে হইবে মানবজীবন। শঙ্করের একশরণ ধর্ম্মে অপর উপাস্য বা ইষ্টের স্থান নাই। নিজের শুদ্ধাভক্তি ও শরণাগতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য, এককেন্দ্রিক রাখার জন্য একশরণীয়া ভক্তেরা কখনো অপর ইষ্ট বিগ্রহ বা দেবীর উপাসনা করিবে না, অপর দেবমন্দিরে যাতায়াত করাও চলিবে না। অন্যথায় ভক্তিসাধনা তাহাদের হইবে বিভ্রান্ত, পথচ্যুত।

"একশরণ ধর্ম্মে ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের মধ্যে কোন চাওয়া-পাওয়ার স্থান নাই, সুখ-সুবিধা আদায়ের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। ভক্ত ত্যাগতিতিক্ষা বরণ করিবেন আর ভগবান্ তাহার জন্য পুরস্কার বিধান করিবেন, এমন কথাও সেখানে উঠে না। এই ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য—ভক্ত সাধক ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা নিয়া দৃঢ়পদে, ধীরে ধীরে, অধ্যাত্ম-উজ্জীবনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবেন, নূতনতর অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবেন এবং নিজের দেহ মন প্রাণ সঁাপিয়া দিবেন পরম প্রভুর শ্রীচরণে[২]।"

নামকীর্ত্তন ও প্রচারের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, বরদোয়ার সত্র ও নামঘরে ভক্ত নরনারীর ভীড়ের অন্ত নাই। চারিদিকে তখন শঙ্করদেবের নূতন ভক্তিধর্ম্ম নিয়া চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু শঙ্করদেবের মনে উৎকণ্ঠার অবধি নাই। যে মহান্ ঐশ্বরীয় কর্ম্ম তিনি উদ্‌যাপিত করিতেছেন, যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে, তাহাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। নব উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভাবালুতা কিছুদিন পরে স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হইয়া আসিবে।

১ শঙ্করদেব : বৈষ্ণব সেইন্ট্ অব্ আসাম—বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

২ শঙ্করদেব (চৈতন্ত টু বিবেকানন্দ : অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ)—বাণীকান্ত কাকতি

তাছাড়া, তাঁহার নূতন ধর্ম্মের বিরোধী শক্তিগুলিও কম সক্রিয় নয়। শঙ্কর জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে তাঁহার ভক্তি আন্দোলনে টানিয়া আনিতেছেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পাণ্ডাদের প্রাধান্য খর্ব্ব করিতেছেন। ইহার ফলে অচিরে শুরু হইবে বিদ্বেষ ও সংঘাত। এ সম্পর্কে অবহিত না হইলে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে বিপদ অনিবার্য্য।

এজন্য দরকার তাঁহার এই নূতন ভক্তিধর্ম্মের একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই তাঁহার প্রচারিত উদার ও সর্ব্বজনীন ভক্তি আন্দোলন স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিবে। এজন্য ভাগবত পুরাণের সাহায্য তাঁহাকে নিতে হইবে। ভাগবতের আলোকে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা ও অমৃতময় বাণীর নূতন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া বিস্তারিত করিতে হইবে তাঁহার এই নবধর্ম্ম। কৃষ্ণভক্তিকে তিনি ছড়াইয়া দিবেন সমাজের সর্ব্বস্তরে, একশরণীয়া ভক্তিধর্ম্মকে জনমানসে করিবেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাছাড়া, এই মহান্ কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চাই একটা দৃঢ়মূল আভ্যন্তরীণ সংগঠন। স্থির করিলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গঠিত হইবে একটি করিয়া সত্র বা মঠ, এবং প্রতি শহরে জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে নামঘর - যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নির্ধন, শুদ্ধাচারী সাধক ও পাপাচারী পাষণ্ডীরা, সবাই মিলিতভাবে করিবে নামকীর্ত্তন, প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিবে পরম প্রভুর পুণ্যময় লীলাকথা।

প্রচার ও সংগঠনের কাজে শঙ্করদেবকে দিনের পর দিন বহুতর বিপদ ও বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু সব কিছুই তিনি অতিক্রম করেন আপন আত্মিক শক্তির বলে। ধর্ম্ম দেশ ও জাতির উজ্জীবন, নিপীড়িত মানবের কল্যাণ সাধন, হইয়া উঠে তাঁহার জীবনের ঐশী নির্দ্দিষ্ট ব্রত।

আসামের এই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চলিয়াছে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও অবক্ষয়ের যুগ। সমগ্র আসাম বহুতর স্বাধীন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। দূর পূর্ব্বাঞ্চল চুটিয়াদের শাসনাধীন, দক্ষিণ-পূর্ব্বে রহিয়াছে কচরীদের অধিকার। ইহাদের আশেপাশের স্থান ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ভুঁইয়াদের কর্তৃত্বাধীন। দূর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল কামতা রাজ্যের শাসন। সে-সময়ে উহা কুচবিহার নামে পরিচিত। কোচ রাজারা সেখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অবশিষ্ট অংশ রহিয়াছে অহোমরাজের অধিকারে। আসামের জনজীবন এইরূপ বহু প্রতিযোগী রাজশক্তির দ্বারা বহু-বিচ্ছিন্ন।

এসময়কার ধর্ম্মীয় জীবনে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব—তান্ত্রিক ধর্ম্মের। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রধানতঃ সীমিত রহিয়াছে রাজা, রাজপুরুষ, পুরোহিত ও সমাজের উচ্চতর বর্ণের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ এই ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। খণ্ডজাতীয় লোকেরা হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানে না, বরং ভূত প্রেত ও বৃক্ষপূজায়ই তাহারা বেশী বিশ্বাসী।

সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে তন্ত্রধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের প্রচলন রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই তন্ত্রধর্ম্ম এবং সাধনার মধ্যেও এসময়ে দেখা দিয়াছে নানা অনাচার। তন্ত্রের উচ্চতর নিগূঢ় সাধন সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যবোধ অনেকেরই নাই, বহু সাধক ও পুরোহিত ধর্ম্মের নামে লিপ্ত আছেন পাপকর্ম্ম, ভোগলিপ্সা ও ব্যভিচারে।

এই প্রসঙ্গে আসামের তন্ত্রপীঠ ও তন্ত্রসাধনার পটভূমিকাটি একটু দেখিয়া নেওয়া দরকার। পৌরাণিক যুগে আসামের নাম ছিল কামরূপ রাজ্য, রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে—বর্ত্তমানে যাহা গৌহাটি নামে পরিচিত। প্রাচীনকাল হইতেই এখানে তন্ত্রধর্ম্মের প্রচলন ছিল। রাজারা ও উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন তন্ত্রমতেরই ধারক বাহক। নীলাচল বা কামগিরিতে স্থাপিত ছিল দেবী কামাখ্যার পীঠস্থান। এই শক্তিপীঠের তান্ত্রিক সাধনা ও আচার অনুষ্ঠানই উদ্বুদ্ধ করিত তৎকালীন রাজরাজড়া, অমাত্য ও আচার্য্যদের। মহা-ভারত এবং অন্যান্য কয়েকটি পুরাণশাস্ত্রে, বিশেষত কালিকা পুরাণে, কামরূপের তান্ত্রিকতার নানা কাহিনী পাওয়া যায়।[১]

এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ এথিক্স্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন (২-১৩৩,

প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউএনথ্ সিয়াং সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা সমকালীন আসামের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কিছুটা তথ্য পাই। কুমার ভাস্করবর্ম্মণ তখন কামরূপের রাজা। রাজা ও উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম্মের অনুগামী, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ রহিয়া গিয়াছে ধর্ম্মীয় গণ্ডীর বাহিরে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে আসামের ইতিহাসে দেখা দেয় দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তনের সূচনা। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে রণকুশল অহোমরা বিজয়ী রূপে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে; কামরূপের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় ছেদ পড়িয়া যায়।

অহোমদের নাম হইতেই হয় আসাম নামের উৎপত্তি। ইহারা জাতিতে শান্, উত্তর বর্ম্মা হইতে পাতকই গিরিপথ দিয়া ইহারা অগ্রসর হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়াইয়া পড়ে। শান্ জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তর্ঁ্যা দ্য লাকুপ্রি বলেন, এই জাতি মঙ্গোল, নেগ্রিটো ও চীনেদের এক সংমিশ্রণ। যুদ্ধকুশল, দৃঢ়চেতা ও পরিশ্রমী বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। কিন্তু সুজলা সুফলা উপত্যকায় বাস করার পর কয়েক শতকের মধ্যে ইহারা শক্তিহীন ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠে। অহোম রাজারা এবং সাধারণ অহোমরা প্রাচীন কামরূপীয় জাতিগুলির সহিত বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং কালক্রমে তাহাদের জাতি পার্থক্য অনেকাংশে লোপ পায়।

অহোম রাজারা খুব ইতিহাস-সচেতন, তাঁহাদের সময়কার লেখা বুরুন্জী-তে রাজশক্তির উত্থান ও পতনের ক্রমিক ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে। অহোম রাজাদের প্রায় সবাই তান্ত্রিক বিগ্রহ দেবী কামাখ্যার উৎসাহী ভক্ত ছিলেন। আসামের তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে ইহাদের অবদান যথেষ্ট।

ষোড়শ শতকে, বৈষ্ণব আচার্য্য শঙ্করদেবের অভ্যুদয় কালে পশ্চিম আসামে রাজত্ব করিতেছিলেন কোচ রাজা নরনারায়ণ (১৫২৮–১৫৮৪), আর পূর্ব্বাঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছিল অহোম রাজা চুহমুঙ-এর (হিন্দু নাম—স্বর্গনারায়ণ) অধিকারে।

নরনারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি চিলা রায়ের অসামান্য শৌর্য্য ও দক্ষতায় রাজ্যের প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়, আর নরনারায়ণ নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তন্ত্রধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে। মুসলমান আক্রমণকারীরা কামাখ্যা মন্দির বিধ্বস্ত করিলে রাজা নরনারায়ণ এটি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন এবং সাড়ম্বরে এই ইষ্টদেবী বিগ্রহের করেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আসামের তান্ত্রিকদের আচার আচরণে এসময়ে নানা দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করে, শক্তি সাধনা ও শক্তি আরাধনার মধ্যে দেখা দেয় পাপের পঙ্কিলতা। সমকালীন এই অবক্ষয়ের চিত্রটি ঐতিহাসিক গেইট-এর লেখায় পরিস্ফুট : "এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অন্যতম প্রথা ছিল জীবহত্যার রক্তাক্ত বিভীষিকা ; ইহাতে মানুষ-বলিও বাদ দেওয়া হইত না। কালিকা পুরাণে বলা হইয়াছে, সেই মানুষকেই বলিরূপে উৎসর্গ করা যায়, যার দেহে কোন খুঁত নাই। এ ছাড়া ঐ বলিযোগ্য মানুষটিকে কিভাবে কাঠগড়ায় রাখিয়া শিরশ্ছেদ করা হইবে, কিভাবে রুধির রাখিতে হইবে, এসব অনেক কিছু খুঁটিনাটি তথ্যও ঐ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

"কামাখ্যা দেবীর নূতন মন্দিরের যেদিন উদ্বোধন করা হয়, সেই উৎসব দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মানুষ বলিদান। এ উৎসবে অন্যূন একশত চল্লিশটি মানুষের মস্তক খড়্গাঘাতে ছেদন করা হয় এবং এই রক্তাপ্লুত মস্তকগুলি তাম্রপত্রে সজ্জিত করিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হয় দেবীর চরণে। হাফ্‌ৎ ইক্‌লিম-এর বর্ণনা অনুসারে, এই সময়ে কামরূপে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যাহারা স্বেচ্ছায় দেবীর বলিরূপে নিজেদের নিবেদন করিত—ইহারা অভিহিত হইত 'ভোগী' নামে। যেদিন তাহারা ঘোষণা করিত, দেবী তাঁহাদের আহ্বান জানাইয়াছেন এবং বলিরূপে উৎসর্গীত হইবার জন্য তাহারা প্রস্তুত, সেই দিন হইতে তাহাদের স্বেচ্ছাচারে কোন বাধা দেওয়া হইত না। সে অঞ্চলের যে কোন রূপসী নারীর দেহ তাহারা নির্ব্বিবাদে সম্ভোগ করিতে পারিত। তারপর বাৎসরিক উৎসবের দিনে কাঠগড়ায়

ফেলিয়া করা হইত তাহাদের মুণ্ডচ্ছেদ এই সময়কার একদল তান্ত্রিকের কাছে নানারূপ ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এমন কথাও আছে যে, কোন কোন ভবিষ্যৎবক্তা ও তান্ত্রিক অভিচারকারী পূর্ণ গর্ভবতী নারীর দেহ ছেদন করিয়া ভ্রূণ বাহির করিতেন এবং রহস্যজনক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিত। এইসব তান্ত্রিকেরা চক্রে বসিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো যেসব জঘন্য কুক্রিয়া করিত তাহা প্রকাশযোগ্য নয়।[১]

অধঃপতিত ও তান্ত্রিকদের মণ্ডলীগুলি পর পর বহু অসমীয়া রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয়। এ কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে এই সব রাজবংশ সে সময়ে হৃতগৌরব ও পতনশীল, এবং এই রাজবংশগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য সমাজ হইতে। ইহাদের ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকেরা সমকালীন আসামের জনজীবনে সৃষ্টি করিয়াছিল রহস্যময় বিভীষিকা ও নৈরাশ্যের।[২]

শঙ্করদেবের প্রচারিত উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং সুস্থ নীতিধর্ম্মভিত্তিক সামাজিক জীবন গঠনেব আহ্বান এসময়ে আগত হয় দেবতার আশীর্ব্বাদ রূপে। নিপীড়িত, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, মানুষের সম্মুখে একশরণ ধর্ম্ম উচ্চারণ করে নবজাগরণের মহামন্ত্র।

ভাগবত পুরাণকে একশরণ ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে স্থাপন করিতে হইবে, জনমানসে ব্যাপকভাবে ইহার তত্ত্ব বিস্তারিত করিতে হইবে, এজন্য চাই ভাগবত পুরাণের একটি সহজবোধ্য ও সুললিত অসমীয়া অনুবাদ। শঙ্করদেব নিজে প্রতিভাধর সাহিত্যিক, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিধর্ম্মের আকর এবং প্রকরণ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড ইতিপূর্ব্বে তিনি পাঠ করিয়াছেন। তাই তাঁহার পক্ষে একটি অসমীয়া ভাগবত রচনা করা খুব কঠিন কাজ নয়।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? পাঁচশত

---

১ হিস্টরী অব আসাম: স্যর এডওয়ার্ড গেইট।

২ ই-আর ই: আসাম—অ্যাণ্ডারসন।

বৎসর পূর্ব্বে, বিশেষত তন্ত্রধৃত আসাম রাজ্যে, ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড সংগ্রহ করা বড় সহজ ছিল না। শঙ্করদেব বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন দৈব কৃপায় তাঁহার সকল কিছু সমস্যার চমৎকার সমাধান হইয়া গেল।

বরদোয়ার সত্রে সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া শঙ্করদেব বসিয়া আছেন। এমন সময়ে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পুরীধাম হইতে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া শঙ্করদেবের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ যুক্তকরে সবিনয়ে কহিলেন, "আমার নাম জগদীশ মিশ্র, নিবাস মিথিলার ত্রিহুতে। আপনার দর্শনের জন্যই আমি এতটা দূরের পথ এসেছি।"

শঙ্করদেব সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। মধুর কণ্ঠে কহেন, "আপনার আগমনে আমরা সবাই পরম আনন্দিত। আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি। কিন্তু কি কারণে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছেন, দয়া ক'রে তা প্রকাশ করুন।"

"তবে শুনুন। অন্তরে আমার সঙ্কল্প ছিল, মহাধাম নীলাচলে গিয়ে, প্রভু জগন্নাথদেবের সম্মুখে ব'সে গোটা ভাগবত আমি পাঠ ক'রে শোনাবো। সে পবিত্র কাজ শুরুও করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রভুর কাছ থেকে পেলাম প্রত্যাদেশ—'ওহে মিশ্র, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। কিন্তু আরো বেশী প্রসন্ন হবো একটি কাজ করলে। অচিরে তুমি আসামের বরদোয়াতে যাও, সেখানে আমার পরম ভক্ত শঙ্করদেবের সম্মুখে বসে পূর্ণাঙ্গ ভাগবত পুরাণ পাঠ করো।' এই আদেশ পাবার পর আর আমি দেরী করি নি। গ্রন্থের পেটিকাটি সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

একি অদ্ভুত কৃপালীলা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের! অন্তর্য্যামী শঙ্করদেবের অন্তরের কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করিতেও বিলম্ব করেন নাই।

অশ্রু ছলছল চক্ষে শঙ্করদেব ভক্ত মিশ্রজীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। পরদিন হইতে শুরু হইল প্রভুর আদিষ্ট ভাগবত পাঠ।

কথিত আছে, ভাগবতের সবগুলি খণ্ড পাঠ করার পর জগদীশ মিশ্র বৎসর খানেকের বেশী জীবিত থাকেন নাই। মনে হয় যেন প্রধানত জগন্নাথদেবের এই আদেশ পালন করাই ছিল এই পরম ভক্তের জীবনের প্রধান ও পবিত্রতম কাজ। সে কাজ সমাপ্ত হইবার অল্পকাল পরেই মরলীলায় ছেদ পড়িয়া গেল।[১]

সাধক শঙ্করদেব এবার দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। ভাগবত পুরাণের সবগুলি খণ্ড এবার তিনি ভাষ্যসহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলেন। তারপর শুরু করিলেন অসমীয়া ভাষায় এবং সুললিত কাব্যছন্দে তাঁহার মহান্ গ্রন্থের রচনা। তাঁহার এই অসমীয়া ভাগবত একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ অসমীয়া ভক্তের প্রাণে কৃষ্ণরস সিঞ্চন করিয়াছে, তাহাদের জীবনে ভক্তিধর্ম্মের নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে, তেমনি ইহা গণ্য হইয়াছে অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উৎসরূপে। রাজ্যের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইহার অবদান হইয়াছে সুদূরপ্রসারী।

অসমীয়া বৈষ্ণব শঙ্করদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট প্রতিবেশী, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রায় সমকালীনও বটে। উত্তর-জীবনে শঙ্করদেব একবার তাঁহার বহু ভক্তশিষ্যসহ তীর্থ দর্শনের কালে প্রভু চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গৌড়ীয় মতবাদ দ্বারা তেমন বেশী প্রভাবিত হয় নাই।

নিজের ধর্ম্মমত প্রচারে এবং অসমীয়া ভাগবত রচনায় শঙ্করদেব নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শুদ্ধাভক্তি ও একান্ত শরণাগতির উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী; দাস্য-ভক্তিভাবের দিকেই তাঁহার প্রধান প্রবণতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত তিনি মাধুর্য্যরসের তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেন নাই।

ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত আছে— রসিকশেখর কৃষ্ণ কেলি করিতে করিতে হঠাৎ কোন এক গোপীকে নিয়া অন্তর্দ্ধান হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই গোপীকে চিহ্নিত করিয়াছেন রাধা বলিয়া।

১ শঙ্করদেব: বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া

শঙ্করদেব কিন্তু ইঁহাকে রাধা বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণের আরাধিকা কোন গোপীর কথাই তিনি বলিয়াছেন।

কৃষ্ণকে গোপীরা বনাঞ্চলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সেস্থলে কিন্তু তাঁহাদের মুখ দিয়া শঙ্করদেব মধুর রসের কথা বাহির করেন নাই, বরং চমৎকার রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শুদ্ধাভক্তি ও দাস্য ভাব। গোপীরা বলিতেছেন:

আকে পাইলে পাতকিয়ো সংসার নিস্তার।
শুদ্ধ হঞু বুলি ব্রহ্মা হরো শিরে ধরে॥
আইস ঘসো এহি ধূলি আমিয়ো মাথাত।
হুয়া শুদ্ধ মাধবক দেখিবো সাক্ষাত।
জগত দুর্লভ কৃষ্ণ পদরেণু মাখি।
হেনোবা পবিত্র হুয়া কৃষ্ণমুখ দেখি॥

—এসো আমরা কৃষ্ণের সেই পদধূলি মাথায় মাখি, যার মহিমায় সংসারের পাতকীরা সংসার থেকে পায় নিস্তার, যা মাথায় দিয়ে শুদ্ধ হন ব্রহ্মা আর হর, এ ধূলি মাথায় নিলে আমরা হবো পরিশুদ্ধ, সাক্ষাৎ মাধবের পাবো দর্শন।

দেখা যাইতেছে, শঙ্করদেবের তুলিকায় গোপীরা চিহ্নিত হইয়াছেন দাস্যভক্তির সংবাহিকা রূপে, মধুর রসের দ্যোতনা তাঁহাদের মধ্যে নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিবাদের আরো পার্থক্য আছে। গৌড়ীয়েরা জপ ও কীর্ত্তন করেন 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম। আর সেস্থলে অসমীয়া বৈষ্ণবেরা স্মরণ ও মনন করেন চারি নাম।

"সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায় ভগবানের রূপ বিষয়ে। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মে রূপের ও রসের উপাসনা। ইহাতে নিরাকার ব্রহ্মের স্থান নাই। কিন্তু শঙ্করদেব তাঁহার ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমে বন্দনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

প্রণত তারণ নারায়ণ নিরাকার
কৃষ্ণের চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

রাসলীলা শ্রবণের ফল বলিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ কথামৃত কর্ণ ভরিয়া পান করিলে পাপ দূর হইবে ও মোক্ষলাভ হইবে—

"মোক্ষজেবে পাইবা পাপ করিয়া নির্ম্মাল
কৃষ্ণকথামৃত কর কর্ণভরি পান[১]।"

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই মতবাদ সদাই অতিশয় সতর্কভাবে পরিহার করিয়া চলেন।

শুদ্ধাভক্তির ব্যাখ্যাতা শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবতের স্থানে স্থানে কিন্তু গোপীদের প্রেম-মধুর ভাবটিও অতি মনোরম ভাষায় এবং ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য-সুষমা ও প্রেমরসের অপূর্ব্ব সমাহার ঘটিয়াছে সেখানে। শঙ্করদেবের ভাষায় বিরহিণী গোপীদের সঙ্গীত অতি মনোরম :

পরম মোহন বংশী যাও চুম্বি তোলৈ নাদ
বঢ়াবয় সম্যকে সুরতি।
মহা মহা সার্ব্বভৌম রাজারো সুখক লাগি
যাক দেখি না যাই আউর মতি ॥
লোকর সমস্ত শোক দুঃখ-ভয় বিনাশয়
দরশন মাত্র কতে যাক।
জগতের মনোনিত হেনয় অধরামৃত
দিয়া আমি জীয়ায়ো আমাক ॥

(ভাগবত—১১৯-২৮)

শঙ্করদেব ভক্তির কথা, সাধনার কথা বলিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই। ভক্তিধর্ম্মের যে নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-সাহিত্য ও উপদেশের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নাই।

১ অসমীয়া ভাগবত ও শঙ্করদেব, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৩;—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।

"জীব ঈশ্বরাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভেদ—ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কেননা, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। তাই স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর অভেদ; কিন্তু জীবাংশে মায়া বর্ত্তমান এবং ঈশ্বর মায়াতীত। এই নিমিত্ত ভেদজ্ঞানও বর্ত্তমান। এ বিষয়ে তিনি ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিতেন বলিয়া শ্রীশঙ্করদেবের মতকে 'ভেদাভেদ'-বাদও বলা যায়। ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করদেবের আদর্শ স্পষ্টতর গীতোক্ত 'পুরুষোত্তম'। ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে স্বতন্ত্র নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত পুরুষোত্তমই অনন্ত নামরূপী ভগবান্। নাম-ধর্ম্মের ইহাই এক বিশেষত্ব[১]।"

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে শঙ্করদেব বরদোয়ার বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রতিবেশী কচরী-রাজ ও তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ প্রজারা বার বার এ অঞ্চলে হামলা করিতে থাকে। এই উপদ্রব ও অশান্তি এড়ানোর জন্য শঙ্করদেব প্রথমে গংমৌ নামক স্থানে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত করেন। তারপর স্থায়ীভাবে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বসবাস করিতে থাকেন ধুয়াহাটাতে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মজুলি দ্বীপের এই স্থানটি যেমনি শান্তিপূর্ণ ও মনোরম, তেমনি শস্য-শ্যামল। এই স্থানে বসিয়া আপন উদার ভক্তিধর্ম্ম তিনি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন।

ভাগবত পুরাণ শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাভরে তিনি বলিয়াছেন

পুরাণ সূর্য্য মহা ভাগবত
বেদান্তরো ইতো পরমতত্ত্ব'

এই পরমতত্ত্বকে অধিগত করিতে হইবে শরণাগতি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সহায়ে। বৈষ্ণব সাধকজনের কাছে শঙ্করদেব পরম প্রাপ্তির সহায়ক এই শ্রদ্ধাভক্তির গুণ-কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

১ শ্রীশঙ্করদেব ও নামধর্ম্ম; উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ;—সত্যেন্দ্র শর্ম্মা রায়।

প্রভু মাধবের নাম নিয়ে যে ভজন করে
ডুবে থাকে স্মরণ মনন ধ্যানে,
একবারে মিটে যায় তার তিনটি মুখ্য প্রয়োজন।
প্রথমে উপজে তার প্রেমলক্ষণাভক্তি,
দেহাত্মক বুদ্ধি হয়ে যায় বিলুপ্ত,
হৃদয়ে তাঁর স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে
প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের মাধুর্য্য-মূর্ত্তি।
ত্রয়ী পরম সম্পদ লাভ হয় তার জীবনে,
ক্ষুধার্ত্ত অভাগার কাছে
এক-এক মুষ্টি অন্ন, হয়ে উঠে পরমান্ন।
প্রতি গ্রাসে আনে জীবন রস আর পুষ্টি
হে রাজন্, প্রেম-ভক্তির পেলে শুধু একটি কণা,
জীবনের পরম ক্ষুধার হয় চিরনিবৃত্তি।

(নিমি নব সিদ্ধ সম্বাদ)

শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত পুরাণ অতি শীঘ্র জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাহিনীর বিন্যাস, তত্ত্বের ব্যাখ্যান, কবিত্ব ও পদ-মাধুর্য্যের লালিত্যে ইহা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। বহু প্রতিভাধর অসমীয়া পণ্ডিত ও ছাত্র ভাগবত পুরাণে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

শঙ্করের জীবনীকার ভূষণ দ্বিজ এ সম্পর্কে একটি সমকালীন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কণ্ঠভূষণ নামে এক অসমীয়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কিছুদিনের জন্য বারাণসীতে গিয়াছেন। আশ্রয় নিয়াছেন তিনি ব্রহ্মানন্দ নামক এক বিখ্যাত বেদান্তীর চতুষ্পাঠীতে। একদিন শাস্ত্রতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী শ্রীমদ্‌ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উদাহরণ টানিয়া আনিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, ছাত্রদের অনেকেই ভাগবতের এই শ্লোকটির মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিতেছে না, চুপ করিয়া তাহারা বসিয়া আছে। এমন সময়ে অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কণ্ঠভূষণ, উঠিয়া দাঁড়ান, শ্লোক কয়টির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন।

ব্রহ্মানন্দজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, ভাগবত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছো তা প্রশংসনীয়। বলতো, কোথায় তুমি এসব শিখলে?"

কণ্ঠভূষণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু বৈষ্ণব আচার্য্য শঙ্করদেবের রচিত অসমীয়া ভাগবত আমরা পাঠ করতে অভ্যস্ত। তাই এই শ্লোক কয়টির তত্ত্ব আমার অজানা নয়।"

ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্র হইতে তত্ত্ব আখ্যান ও উপকথা নিয়া শঙ্করদেব অসমীয়া ভক্তদের জন্য ছোট বড় বহুতর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আসামের ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এগুলি পরম সম্পদরূপে গণ্য।

শঙ্করদেবের কীর্ত্তন তাঁহার ভক্তি-সিদ্ধির স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমনি পরিচয় দেয় অসামান্য কাব্য প্রতিভার। এই সুললিত কীর্ত্তনে প্রেমভক্তি লীলার নানা অনুভূতি—মিলন বিরহ, আনন্দ দুঃখ, রোষ ও ক্ষমা প্রভৃতির অপরূপ মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, শঙ্করদেবের কীর্ত্তন সকল বয়সের শ্রোতাদেরই আনন্দ দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। শিশুরা কীর্ত্তনে বর্ণিত রসাল কাহিনী ও উপকথায় আকৃষ্ট হয়, যুবজনেরা মুগ্ধ হয় কবিত্বের মধুর রসে, আর প্রবীণেরা তৃপ্তি লাভ করেন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যানে।

একটি মনোরম কাব্যকাহিনীর বর্ণনায় বৈষয়িক সম্পদের তুচ্ছতা ও আনন্দের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব বলিতেছেন—

তিন লোকে রয়েছে কত ধন সম্পদ,
রয়েছে দিব্য রূপলাবণ্যবতী কত নারী—
রাজ অট্টালিকা আর রাজকোষের রত্ন,
কিন্তু এত কিছু প্রাপ্তির পরেও কি
নিবৃত্ত হয় শুধু একটি মানুষের ক্ষুধা?
গয় আর পৃথুর মত রাজার ধনতৃষা
হয় কি কখনো বিদূরিত?

সপ্তদ্বীপ পদানত করেছেন অবলীলায়,
কিন্তু বাসনা জয়ে তাঁরা হয়েছেন ব্যর্থ।
ইন্দ্রিয়কে যে করে বশীভূত
হৃদয়ে যার নেই তৃষ্ণা আর আর্ত্তি,
দিব্য আনন্দের সেই যে শুধু অধিকারী।
লোভ আর আসক্তি যদি না হয় সংযত
তিন ভুবনের সম্পদেও আসবেনা তো সন্তুষ্টি।

(বালী ছলন—শঙ্করদেব)

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ শঙ্করদেবের বরগীত বা ভজন-সঙ্গীত। এই বরগীতগুলিতে ছড়ানো রহিয়াছে আত্মিক অনুভূতি, পরমার্থ তত্ত্ব ও ভক্তহৃদয়ের আর্ত্তি।

প্রথম জীবনের একটি বরগীত-এ শঙ্করদেবের শরণাগতির মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আমরা পাই। এই ভজনগীতটি তিনি রচনা করেন হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে বসিয়া। তিনি গাহিয়াছেন—

মন মোর আশ্রয় নাও শ্রীরাম-চরণে,
দেখছো না কি—অন্ত আসছে এগিয়ে ?
আয়ু মোর দিন দিন হচ্ছে ক্ষীণ
জীবনদীপ অচিরে হবে নির্ব্বাণ,
কাল-ভুজঙ্গ এগিয়ে আসে ঐ প্রতিদিন,
—মৃত্যু নিয়ে আসে সর্ব্ব বিনষ্টি।
এই ভঙ্গুর দেহের পতন যে সুনিশ্চিত,
তাই মন মোর ভেদ করে মায়াজাল,
শরণ নাও শ্রীরাম-চরণে।
হে দুর্ভাগা মন, তুমি যে অন্ধ,
বিষয়-ধাঁধায় মরছো তুমি ঘুরে ঘুরে।
জেগে ওঠো তামসিক সুপ্তি থেকে,
জেগে ওঠো, ভজ এবার শ্রীগোবিন্দ।
হে মন, শঙ্কর বলছে দৃঢ়স্বরে,
রাম চরণ বিনা নাই কো তোমার গতি

আর একটি বরগীত-এ পরমপ্রভুর কাছে ভক্ত শঙ্করদেব জানাইতেছেন তাঁহার হৃদয়ের আকুতি, মাগিতেছেন পরমাশ্রয় :

হে প্রভু নারায়ণ,
চরণে তোমার এই প্রার্থনা আজ মোর,
বিষয়-বিলাস-পাশ থেকে দাও মুক্তি।
নাসিকা মোর সুগন্ধের জন্য লুব্ধ,
শ্রবণ মাগে সুমধুর নারীকণ্ঠ,
নয়নদ্বয় হয়েছে অধীর
দেহের রূপ আর স্পর্শসুখের লাগি,
তবে কি ক'বে ক'রবো তোমার ভজন ?
কাম, ক্রোধ, মোহ, অভিমান—
এই সব মহাশত্রু করেছে আমায় বেষ্টন।
শঙ্কর কহে আকুল স্বরে,
হে প্রভু, হে আমার গোপাল,
তোমার এই দীন দাসকে
কে বাঁচাবে এই শত্রুদলের হাত থেকে ?

অংকিয় নাট এবং ভাওনা আসামের ধর্ম্ম সংস্কৃতিময় জীবনে শঙ্করদেবের আর দুইটি বড় অবদান। সঙ্গীতময় নাট্য অভিনয়, ধর্ম্মীয় কাহিনীর রূপায়ণ ও সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় এই অভিনয় জনচিত্ত জয় করিয়াছে এবং শত শত বৎসর যাবৎ সাধারণ মানুষের জীবনে প্রবাহিত করিয়াছে ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মহলে, দূর-দূরান্তের জনপদে ও শহরে, এই অংকিয় নাট আর ভাওনা কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণকাহিনীর অমৃত স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে,—শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মকে করিয়াছে সর্ব্বজন-বোধ্য, সর্ব্বজনপ্রিয়।

শঙ্করদেবের প্রধান ভক্ত মাধবদেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "ইতিপূর্ব্বে প্রেমের তটিনী প্রবাহিত হতো শুধু স্বর্গের সীমানার ভেতর দিয়ে, প্রভু শঙ্করদেব আপন শক্তিবলে ভেঙে দিলেন

সেই তটিনীর তটভূমি, তাইতো তার অমিয়-ধারা আজ মর্ত্তের দিকে দিকে হচ্ছে বিস্তারিত।"

ধূয়াহাটাতে শঙ্করদেব তখন অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, অসমীয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে উভয়ের এই সাক্ষাৎ স্মরণীয় হইয়া আছে।

লখিমপুর জেলার লেতেপুখুরি গ্রামে মাধবদেবের বাস। তরুণ বয়সেই শাক্ত শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন, তান্ত্রিক আচার্য্যদের আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রিয়া অনুষ্ঠানেও অর্জ্জন করেন দক্ষতা।

মাধবদেবের জননী একসময়ে খুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন, চিকিৎসা নানা রূপই করা হয়, কিন্তু রোগিনীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না। মাধবদেব অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হন। মানৎ করেন, জননী সুস্থ হইয়া উঠিলে, দেবী-বিগ্রহের প্রীত্যর্থে একটি ছাগশিশু বলিরূপে প্রদান করিবেন।

জননী কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিলেন। এবার প্রতিশ্রুত বলিদান সম্পন্ন করিতে হইবে। মাধবদেবের ভগ্নিপতির নাম গয়াপানি, তিনি শঙ্করদেবের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। পারিবারিক অনেক কিছু ব্যাপারে মাধবদেব ভগ্নিপতির উপর নির্ভর করিতেন। তাঁহাকে কহিলেন, "ভাই, তুমি খোঁজখবর করে, বলিদানের উপযোগী নিখুঁত একটি ছাগশিশু আমায় এনে দাও। দেবীর কাছে যে মানৎ করেছি তাড়াতাড়ি তা আমায় রক্ষা করতে হবে।"

গয়াপানি শ্লেষের সুরে মন্তব্য করেন, "তুমি দেখছি, মহাশক্তি জগজ্জননীকে ছাগশিশুর কচি মুণ্ডু খাইয়েই সন্তুষ্ট করতে চাও। পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে, এসব কি করছো, বলতো ?"

মাধবদেব তো মহা ক্রুদ্ধ। কহিলেন, "শাক্তধর্ম্ম আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। এর মর্ম্ম তুমি বুঝবে কি ? তোমার গুরু শঙ্করদেবই যে তোমার মাথাটি গুলিয়ে দিয়েছে। ত্যাখো, আমাদের দেবী যেমন জাগ্রত, তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানও তেমনি সদ্য ফলপ্রদ। তোমাদের

বৈষ্ণবেরা যত লাফালাফি করুক আর যত নেচে গেয়েই বেড়াক, দেবতার আসন তাতে টলে না।”

গয়াপানি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। ধর্ম্মের প্রাণবস্তু কি তা জানলে না, ভগবান্ জীবের প্রেম চান—না ছাগলের রক্ত চান, তা বুঝতে চাইলে না। অনেকবার তো বলেছি, চলো আমাদের গুরু শঙ্করদেবের কাছে, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি তা জানতে পারবে।”

অনেকদিনই মাধবদেব ভগ্নিপতির মুখে একথা শুনিয়াছেন। আজ তাঁহার জেদ চাপিয়া গেল। কহিলেম, “বেশ, চলো তোমার গুরুর কাছে। শাক্তধর্ম্ম বড় না বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়, তার বিচার আজ হবে। শঙ্করদেব সম্পর্কে অনেক কথাই এতকাল শুনে এসেছি। আজ আমি তাঁকে যাচাই ক'রে দেখবো, আহ্বান করবো তর্কবিচারে।”

অতঃপর উভয়ে উপনীত হন শঙ্করদেবের ভবনে। আত্মপ্রত্যয়ের সুরে মাধবদেব কহেন, “আচার্য্য, আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, আমি শুনেছি। নূতন ভক্তিধর্ম্ম আপনি আসামে প্রচার করেছেন এবং জাতিভেদ ও অধিকারীভেদ না মেনে নির্ব্বিচারে দিয়ে চলেছেন নামমন্ত্র। কিন্তু এতো শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ শূদ্র ও পার্ব্বত্য জাতি, সবাইকে এক ক'রে দিলে তো এই সুপ্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচানো যাবে না। সারা দেশ তলিয়ে যাবে রসাতলে। আপনি আমার সঙ্গে বিচারসভায় বসুন। যদি আমি পরাস্ত হই, শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো। আর আপনি পরাস্ত হলে আপনাকে চিরতরে এ অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে।”

“ধর্ম্ম রসাতলে যাচ্ছে, আর মানুষের মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হচ্ছে বলেই তো আমার এই উদার সর্ব্বজনীন ভক্তিধর্ম্মের প্রচার আমি প্রাণপণ প্রয়াসে করছি।” সহাস্যে উত্তর দেন শঙ্করদেব।

“যাই হোক, স্থানীয় বিদ্বান্মণ্ডলীকে ডাকুন। তাঁদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হোক আমাদের আজকের তর্কযুদ্ধ। দেখা যাক, কার মতবাদ জয়ী হয়।”

শঙ্করদেব এই দ্বন্দ্বের আহ্বান মানিয়া নিলেন। পরের দিন সমাগত শাস্ত্রবিদ্ ও সুধীজনের সম্মুখে শুরু হইল তত্ত্ব বিচার।

শঙ্করদেব সর্ব্ব দর্শন আয়ত্ত করিয়াছেন। তাছাড়া, নূতন ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া আসামের শাক্ত ও তান্ত্রিকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইবে, এজন্য শাক্ত শাস্ত্র তিনি অভিনিবেশ সহকারে আগে হইতেই পড়িয়া নিয়াছেন। সর্ব্বোপরি ভারতের ভক্তি-আন্দোলনগুলির নিহিত তত্ত্ব তাঁহার অধিগত।

বিচার সভায় প্রথমে তিনি শাক্ত পণ্ডিত মাধবদেবের যুক্তি-তর্কগুলি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার নব ভক্তিবাদ। হিন্দু শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতে ভক্তিবাদের সমর্থক অজস্র শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

সুগৌর কান্তি, সমুন্নত বপু, পরম প্রশান্ত, ভক্তি-আন্দোলনের এই বর্ষীয়ান্ নেতার ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গীতে কি ইন্দ্রজাল আছে তাহা কে জানে! বিচার বিতর্কে দক্ষ এবং আপন পাণ্ডিত্যে চির-আস্থাবান্ মাধবদেব সব কিছুর খেই হারাইয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে শঙ্করদেব দিব্য আবেশে উদ্দীপিত হইয়া আবৃত্তি করিলেন, ভাগবতের সেই মহান্ ভক্তি-রসাত্মক শ্লোকটি, যাহার মর্ম্মকথা :—

তরুর মূলে সিঞ্চন ক'রো স্নিগ্ধ সলিল,
তবেই পুষ্ট হবে, লাভ করবে প্রাণশক্তি
তরুর যত শাখা আর পত্র পল্লব।
জঠরে প্রদান কর ভোজ্য বস্তু—
সারা শরীর ও ইন্দ্রিয় তোমার হবে প্রাণবন্ত।
তেমনি প্রভু অচ্যুতের চরণে ঢালো ভক্তিরস,
সর্ব্ব দেবদেবী হবেন তাতে প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট।

আবেগকম্পিত স্বরে, করজোড়ে মাধবদেব কহিলেন, "আচার্য্য আপনার মাহাত্ম্য আপনার ভক্তিধর্ম্মের মাহাত্ম্য আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে অভিভূত হয়েছি আপনার সাধনোজ্জ্বল

তত্ত্ব ব্যাখ্যানে! আজ থেকে আপনার চরণে আমি শরণ নিলাম। এখন থেকে সারা আসাম রাজ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করা হবে আমার জীবনের প্রধান ব্রত।"

প্রেমভরে শঙ্করদেব মাধবদেবকে আলিঙ্গন করিলেন, এই নবীন প্রতিভাধর পণ্ডিতকে সাদরে গ্রহণ করিলেন তাঁহার 'একশরণ' মণ্ডলীতে।

শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাতের আগে মাধবদেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কন্যার সঙ্গে। গুরুর আশ্রয় লাভের পর মাধবদেব সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, গার্হস্থ্য আশ্রমে তিনি আর প্রবেশ করিবেন না, বৈষ্ণবীয় সাধনায় এ জীবন উৎসর্গ করিবেন, একান্তভাবে গুরুর ভক্তি-আন্দোলনে করিবেন আত্মনিয়োগ।

নবীন শিষ্য মাধবদেবকে গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করানোর জন্য শঙ্করদেব ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মাধবদেবকে রাজী করানো যায় নাই। ত্যাগ-তিতিক্ষাময় বৈরাগীর জীবনই তিনি নিজের জন্য চিরতরে বাছিয়া নেন।

উত্তরকালে বহু বৈষ্ণব সাধক মাধবদেবের এই বৈরাগ্যপূত, ব্রহ্মচারী জীবন অনুসরণ করেন। এই বৈরাগী সাধকেরা সত্রসমূহের পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কেওয়ালিয়া (চিরকুমার) বৈষ্ণব সাধক রূপে ইঁহারা পরিচিত হইয়া উঠেন।

মাধবদেবের আগমনে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেক বেশী শক্তিশালী হয় এবং মাধব গণ্য হন তাঁহার প্রধান শিষ্যরূপে। উত্তর-কালে অসমীয়া বৈষ্ণবদের এক প্রখ্যাত নেতা বলিয়া মাধবদেব কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন। শঙ্করদেবের তিরোধানের পরেও মাধবদেব তাঁহার অসামান্য সংগঠন শক্তি নিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জীবন সাধন করেন, নিজস্ব সাধন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া ভক্তি-আন্দোলনের স্রোতকে আরও বেগবতী করিয়া তোলেন।

অতঃপর আর একটি বিচার-সংঘর্ষেও শঙ্করদেবকে লিপ্ত হইতে

হয়। অহোমরাজ চুহুমুঙ-এর সভায় হঠাৎ একদিন শঙ্করদেবের ডাক পড়িল। সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইলেন।

রাজা কহিলেন, "শঙ্করদেব, আপনি আমার রাজ্যে বসবাস করছেন, ভালো কথা। কিন্তু আপনি নাকি নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের অছিলায় নানা অনাচার করে চলেছেন। হিন্দু ধর্ম্মবিরোধী ও বেদ-বিরোধী পাপ কার্য্যে আপনি লিপ্ত আছেন। রাজসভার পণ্ডিতেরা আর তান্ত্রিক মোহান্তেরা এই অভিযোগ এনেছেন আপনার বিরুদ্ধে।"

শঙ্করদেব প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আমি হিন্দুধর্ম্মের ক্ষতিসাধন করছি, এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। বরং হিন্দু-ধর্ম্মকে বাঁচানোর জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ধর্ম্মের দীপ জ্বালানোর জন্যই আমি উৎসর্গ করেছি আমার এই জীবন।"

"বেশ তো, তা হলে আপনি সভায় উপস্থিত অভিযোক্তাদের সঙ্গে বিচারে বসুন। শাস্ত্রীয় যুক্তি তথ্য দিয়ে আপনার নূতন ভাগ ধর্ম্মের যৌক্তি কথা ও কল্যাণকারিতা প্রমাণ করুন।"

অহোম রাজ সনাতন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সব সময়ে পরিবৃত থাকেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক রূপে নিজেকে তিনি জাহির করিতে চান। তাছাড়া, রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এসময়ে কেবলি তাহাকে উস্কানি দিতেছেন শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে, কারণ শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য মানিয়া চলে না। শূদ্র ও অন্ত্যজদের দেয় সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অধিকার।

শঙ্করদেব বুঝিলেন, রাজার রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে না। তবুও ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া তিনি আপন ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাড়ম্বরে শুরু হইল ধর্ম্ম-বিচার সভা।

সর্ব্ব দর্শন ও সর্ব্ব ধর্ম্মের তত্ত্ব সম্পর্কে শঙ্করদেব দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। সারা ভারতের পণ্ডিত এবং সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার অজানা নয়। তাছাড়া, নিজের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের এক আদিষ্ট কর্ম্মরূপে, সারা আসামের জনজীবনে আত্মিক উজ্জীবন আনয়ন

করিতেও তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। সাধনার উৎকৃষ্ট, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া শঙ্করদেব অনন্যসাধারণ। তাই তাঁহার সহিত কুপমণ্ডুক ও রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কেন? অল্পকাল মধ্যেই শঙ্করদেব তাঁহার প্রতিপক্ষকে সেদিন পরাস্ত করিলেন।

শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কুচক্রী ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন হইল না। অহোমরাজও তাঁহার উপর পূর্ব্ববৎ রহিলেন বিদ্বিষ্ট।

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করদেবের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া যায়। অহোমরাজ তখন ধুয়াহাটা অঞ্চলে হাতী ধরার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী হাতীর খেদা বা অবরোধ-বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত গ্রামের লোকদেরও সহযোগিতা করিতে হয়। গ্রামবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড দিয়া খেদার অংশবিশেষ গড়িয়া তোলে। হাতীর দল যখন উগ্রমূর্ত্তি হইয়া খেদার বেষ্টনী ভেদ করিতে চায়, তখন প্রত্যেক গ্রামীণ দলকে তাহার প্রতিরোধ করিতে হয়। যাহাদের দোষে হাতী পলায়ন করে রাজ সরকার তাহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন।

সেবারকার খেদা অভিযানে শঙ্করদেবও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আসিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার লোকজনদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দিয়াই বুনো হাতীর দল কঠোর বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পলাইয়া যায়। শঙ্করদেবের বিরোধী দুষ্টচক্র এবার সক্রিয় হইয়া উঠে এবং চরম দণ্ড বিধানের জন্য রাজাকে প্ররোচিত করিতে থাকে।

অহোমরাজ এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও পুরোহিতেরা এ যাবৎ নানা উপদ্রবই শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুগামী বৈষ্ণবদের উপর করিয়াছেন। শঙ্করদেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন। কিন্তু এবারকার পরিস্থিতি তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, রাজার এই বিরোধিতার মুখে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। বরং রাজার অত্যাচারের ফলে তাঁহার এই নূতন গড়িয়া উঠা ভক্তি-আন্দোলন হইবে সমূলে বিনষ্ট।

ভক্তদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, অবিলম্বে সদলবলে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিবেন, আশ্রয় নিবেন কামরূপ জেলায়। ঐ অঞ্চল তখন কোচরাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা চিলা রায়ের শাসনাধীন। আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা সেখানে উন্নততর, এখানকার মত দুষ্ট পুরোহিত চক্র সেখানে ততটা সক্রিয় নয়।

একদল অনুগামীসহ শঙ্করদেব গোপনে ধূয়াহাটা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য মাধবদেব এবং জামাতা শ্রীমান্ হরি। উভয়ে রাজরক্ষীদের হাতে বন্দী হইলেন। মাধবদেব সন্ন্যাসী বলিয়া অহোমরাজ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু হরিকে দেওয়া হইল মৃত্যুদণ্ড। এই ঘটনায় বৈষ্ণবদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং অনেকে অহোম রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

কামরূপ জেলায়, বরপেটার নিকটে পটবৌসি গ্রামে শঙ্করদেব এবার তাঁহার নূতন নিবাস স্থাপন করেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের জন্য একটি সত্র এবং নামঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন হইতে এই স্থানটি হয় শঙ্করদেবের প্রধান সাধনপীঠ ও প্রচার কেন্দ্র।

কিছুদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের খ্যাতি কামরূপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহার চিহ্নিত অনুগামী সাধকগণ। দামোদরদেব, হরিদেব এবং অনন্ত কণ্ডলী ইঁহাদের অন্যতম। এই তিনজন ভক্ত সাধকই জাতিতে ব্রাহ্মণ। শঙ্করদেবের সাধন ঐশ্বর্য্য, ব্যক্তিত্ব ও উদার ধর্ম্ম ইঁহাদের উদ্বুদ্ধ করে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণে। উত্তরকালে ইঁহারা অসমীয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক একটি স্তম্ভ রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন।

বরপেটা অঞ্চলে থাকাকালে, প্রবীণ আচার্য্য শঙ্করদেব আর একবার ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত হন। এবার সঙ্গে থাকেন শতাধিক ভক্ত শিষ্য। এই সময়কার ভ্রমণকালে শঙ্করদেব পুরীধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১] ভারতের অন্যান্য তীর্থ

১ শঙ্করদেবের জীবনীকারদের মতে, শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎ ঘটে স্বল্পকালের জন্য, এ সময়ে আলাপ-আলোচনা বা মতবিরোধের কোন সুযোগ তিনি পান নাই।

ও সাধনপীঠে গিয়াও সমকালীন বহু সিদ্ধ সাধক ও মহাত্মাদের সহিত তিনি মিলিত হন। ইহার ফলে, একদিক দিয়া অসমীয়া বৈষ্ণবধৰ্ম্ম যেমন নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সহিত, মানসলোকের সহিত, আসামের নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের যোগসূত্র রচিত হয়, নূতন ঐক্যবন্ধন গড়িয়া উঠে।

আসামে ফিরিয়া আসার পর শঙ্করদেব তাঁহাব ভক্তি-আন্দোলনে সঞ্চারিত করেন নূতন উৎসাহ নূতন প্রেরণা। সৰ্ব্ব জাতি ও বর্ণের মধ্যে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে থাকে। নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মের এই জনপ্রিয়তা ও এই প্রসার কামরূপের শাক্ত আচার্য্য ও পুরোহিতদের চঞ্চল করিয়া তোলে। কোচরাজ নবনারায়ণের কাছে সবাই মিলিয়া উপস্থিত হন।

করজোড়ে তাঁহারা কহেন, "মহারাজ, আপনি এদেশের অধিপতি, ধৰ্ম্ম ও সমাজের রক্ষক। কিন্তু আপনি বর্ত্তমান থাকতে এসব কি হচ্ছে, বলুন তো। দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ধৰ্ম্ম যাচ্ছে রসাতলে।"

"কি ব্যাপার, আপনারা সব খুলে বলুন।"

"মহারাজ, শঙ্করদেবের অনাচার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কায়স্থ হয়েও সে আচার্য্য হয়ে বসেছে। জাতিবর্ণের পার্থক্য সে মানে না, প্রাচীন ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানকে করে উপহাস। ম্লেচ্ছের মত তার আচার-আচরণ। উদার বৈষ্ণবধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তন করার অছিলায় বেদ-বহির্ভূত এক নূতন ধৰ্ম্ম সে প্রচার করছে। নিম্ন বর্ণের মানুষ, অর্দ্ধসভ্য পাহাড়ী, এরা সবাই দলে দলে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এর প্রতিবিধান আপনাকে করতেই হবে।"

নরনারায়ণ ধৰ্ম্মপরায়ণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি। কহিলেন, "বেশ, আমি শঙ্করদেবকে রাজসভায় ডেকে আনছি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যও আমি শুনবো। আপনারা সভায় উপস্থিত থেকে যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে তাঁর মতবাদ করবেন খণ্ডন।"

শঙ্করদেব তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়া রাজা নরনারায়ণের সভায় উপনীত হন। শাক্ত আচার্য্যেরাও সবাই সদলবলে উপস্থিত।

অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্করদেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিলেন, "মহারাজ, আমার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করে বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। বেদে বিষ্ণু উপাসনার কথা রয়েছে। স্মৃতি ও পুরাণে আছে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য। তাছাড়া, বিশেষ ক'রে ভাগবত পুরাণের ভিত্তিতে আমার বৈষ্ণবীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, শুদ্ধাভক্তি, কৃষ্ণদাস্য আর সদাচার হচ্ছে এই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা। একে বেদ বহির্ভূত বলা হচ্ছে সত্যের অপলাপ।"

শাক্ত আচার্য্যদের মধ্যেও প্রতিভাধর পণ্ডিতেরা রহিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্র সাধনার তত্ত্ব তাঁহারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন।

শঙ্করদেব তখন ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ অজস্র ধারায় নির্গত হইতেছে তাঁহার কণ্ঠ হইতে, ভক্তিপ্রেমের দিব্য ভাবময়তায় প্রদীপ্ত হইয়াছে তাঁহার বদনমণ্ডল। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের দিকে সভাজনেরা বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া নির্নিমেষে তাকাইয়া আছে।

শাক্ত পণ্ডিতেরা এবার নিস্তেজ হইয়া পড়েন। নিঃশব্দে নত শিরে গ্রহণ করেন নিজ নিজ আসন।

রাজা নরনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন, শঙ্করদেব একজন অসামান্য মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের আদিষ্ট কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপন করিতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি কৃপা ক'রে আসন পরিগ্রহ করুন। আমরা বুঝতে পেরেছি, আপনার নব বৈষ্ণবধর্ম্ম তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছে বেদেরই উৎস থেকে। আপনার এই ধর্ম্ম আসামের জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করুক। নূতনতর ধর্ম্মীয় উজ্জীবন এদেশে দেখা দিক্—তা-ই আমি কাম্য বলে মনে করি।"

রাজা নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি চিলা রায় শঙ্করদেবের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উভয়ে তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু শঙ্করদেব তাহাতে রাজী হন নাই। রাজাকে বুঝাইয়া বলেন, "মহারাজ, আপনার ধৃতি হচ্ছে রাজসিকতা। দিনচর্য্যা অনুরূপ। যে ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আপনি করছেন, তা-ই

আপনি আপাততঃ অনুসরণ করুন। আমার প্রচারিত ধর্ম্মে নিবৃত্তি মার্গই বড় কথা, সে মানসিকতা, ত্যাগ তিতিক্ষা আর নীতিনিষ্ঠা আমি আপনার ওপর চাপাতে চাইনে। তবে, একথা জানবেন, আপনার ও আপনার ভ্রাতার আত্মিক জীবনের যে কোন সমস্যায় আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবো।”

শঙ্করদেব বরপেটায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্ববৎ রত রহিলেন ভক্তি-উপাসনা ও নামধর্ম্মের প্রচারে।

রাজা নরনারায়ণ ও চিলা রায় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ গ্রহণের জন্য রাজধানী কুচবিহারে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেন।

ভক্তিমান্ চিলা রায় কুচবিহার নগরের অনতিদূরে ভেলাডাঙায় শঙ্করদেবের জন্য একটি সত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার আশা ছিল, এই সত্রকে উপলক্ষ করিয়া কোচ রাজপরিবারের সহিত শঙ্করদেবের যোগাযোগ আরো নিবিড় হইয়া উঠিবে, মহাপুরুষের সান্নিধ্য ও কৃপালাভে তাঁহারা ধন্য হইবেন—এ আশা তাঁহার অনেকাংশে সফল হইয়াছিল।

শঙ্করদেবের ভক্তি-আন্দোলনের পুণ্যধারা ক্রমে বিস্তারিত হয় সারা আসামের দিক্‌বিদিকে। মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যেরা একদিকে যেমন ছিলেন ভক্তিসিদ্ধ, অপরদিকে তেমনি ছিলেন সংগঠন-নিপুণ ও প্রচারকুশল। আসামের জনজীবনে ইহাদের নেতৃত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের সর্ব্বত্র সত্র আর নাম-ঘরের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শঙ্করদেবের অসমীয়া ভাগবত হইয়াছে সহস্র সহস্র মানুষের নিত্যপাঠ্য মহাপবিত্র গ্রন্থ। অগণিত ভক্ত নরনারী তাঁহার কীর্ত্তন, বরগীত, অংকিয়-নাট আর ভাওয়ানা'র রসমাধুর্য্যে হইতেছে অভিসিঞ্চিত। উচ্চ ও মধ্যবর্ণের মানুষই শুধু নয়, অন্ত্যজ শূদ্র ও অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য নরনারীও শঙ্করদেবের প্রসাদে মত্ত হইয়াছে কৃষ্ণনাম রসে। নামধর্ম্মের জয়গানে আজ তাহারা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ঐশ্বরীয় ব্রত উদ্‌যাপনের পালা এবার সমাপ্তির পথে। শঙ্করদেব কিছুদিনের জন্য ভেলাডাঙার সত্রে বাস করিতেছেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের এক চিহ্নিত দিনে চিরবিদায়ের লগ্নটি সমাগত হয়। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমক্ষে আপন প্রিয়তম শিষ্য, চির-ব্রহ্মচারী মহাবৈষ্ণব মাধবদেবকে সেদিন প্রদান করেন তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতৃত্বের আসন[১]। তারপর কৃষ্ণরসে রসায়িত সিদ্ধ মহাপুরুষ মরদেহ ত্যাগ করিয়া প্রবিষ্ট হন নিত্যধামে।

১ শঙ্করদেবের পুত্র ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধক এবং সম্প্রদায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা, তাই মণ্ডলীর নেতার আসন অনেকে তাঁহাকেই দিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু শঙ্করদেব এ দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মনোনীত করেন ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবদেবকে।

গোস্বামী রঘুনাথ দাস

নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পরিকর ও লীলাসঙ্গী ছিলেন রঘুনাথদাস। দৈন্যময় বৈষ্ণবীয় ভজন আর ব্রজরসের নিগূঢ় সাধনার অপূর্ব্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার জীবনে। মহাপ্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে বিরাট ভক্তিসাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন, রঘুনাথ ছিলেন তাহার অন্যতম ধারক ও বাহক।

সংসার-জীবনে তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারীর একমাত্র পুত্র। পিতা ও পিতৃব্যের অফুরন্ত স্নেহ, প্রাসাদের রাজসিক বিত্ত বিভব ও ভোগৈশ্বর্য্য, রূপসী তরুণী ভার্য্যার প্রেম, কোন কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উন্মাদের মত তিনি বাহির হইয়াছেন সর্ব্বময়ের সন্ধানে। পরম সৌভাগ্যের ফলে প্রেমঘন বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়া হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ।

শ্রীচৈতন্যের কৃপা আর তাঁহার 'দ্বিতীয় স্বরূপ' স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় রঘুনাথের সাধনজীবন অচিরে ধন্য হইয়া উঠে ও ব্রজরসের পরমতত্ত্বের সন্ধান তিনি অবগত হন। উত্তরকালে তাঁহারই মাধ্যমে বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ সাধক মহলে মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার তত্ত্ব ও ব্রজরসের মহিমা প্রচারিত হয়। রঘুনাথের পরমভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের ভিতর দিয়া এই রসের মাহাত্ম্যই বিস্তারিত করিয়াছিলেন গৌড়ীয় ভক্ত-সমাজে।

কবিরাজ গোস্বামীর ছন্দোবদ্ধ পদে এ তথ্যটি পরিস্ফুট :

চৈতন্যের লীলা রত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল ইহা ভেটে॥

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সবে মোর করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥

(চৈ, চ, মধ্য ২)

অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হন রঘুনাথদাস। তিনি শুধু সপ্তগ্রামের পৈতৃক জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীই ছিলেন না, এই জমিদারী পরিচালনার ভারও পিতা ও পিতৃব্য শেষের দিকে তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু রঘুনাথের জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কার রাজসিক কর্ম্ম ও বৈষয়িক পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, জীবনে তাঁহার ঘটায় বিস্ময়কর রূপান্তর।

আনুমানিক ১৫০১ খৃষ্টাব্দে মহাবৈষ্ণব রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবর্দ্ধনদাস মজুমদার। জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যদাসের কোন সন্তান ছিল না, রঘুনাথকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে অপার স্নেহে তিনি পালন করিতে থাকেন। সপ্তগ্রামের নিকটে চন্দনপুর বা চাঁদপুরে ছিল মজুমদারের পৈতৃক নিবাস।

সপ্তগ্রামের এই সুবিখ্যাত জমিদারবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থাগম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে রাঢ়ভূমিতে সপ্তগ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। যেখানে সুরধুনী গঙ্গা তাঁহার ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামক ত্রিধারায় পুনর্বিমুক্ত হইয়া স্নেহসিক্ত বঙ্গভূমিকে পুণ্যবতী করিয়াছে, সেই "মুক্ত" ত্রিবেণীর সন্নিকটে এই সপ্তগ্রাম অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সপ্তপুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে সাধনাসন পাতিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই তপঃক্ষেত্রগুলি একত্রযোগে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত হয়। হিন্দুরাজত্ব কালে এইস্থানে সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র ছিল। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত বলিয়া ইহা ক্রমে একটি বাণিজ্যবহুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। কবি কঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে আছে—

সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥

"মুসলমান আমলেও সপ্তগ্রামের সে সমৃদ্ধি ছিল। উহা তখন পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লইয়া একটি মুলুক বা খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়। পাঠানেরা যুদ্ধ জয় করিলেও সমগ্র বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে তাঁহাদের অন্ততঃ দুই শতাব্দ লাগিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যেও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হয় নাই। সপ্তগ্রাম মুলুকের বিলিব্যবস্থা লইয়া সর্ব্বদা এত বিবাদ বিসম্বাদ হইত যে উহাকে লোকে "বুলবাদ-খানা" বা বিদ্রোহস্থান বলিত। পাঠান সুলতানগণ স্বাধিকারভুক্ত দেশকে কতকগুলি মুলুক বা মহলে বিভক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বার্ষিক মোক্তা রাজস্ব আদায়ের অঙ্গীকারে সঙ্গতিপন্ন লোককে ইজারা দিতেন। যাহারা এই সকল মুলুকের ইজারাদার হইতেন, তাহাদিগকে সাধারণত মজুমদার বা দেশাধ্যক্ষ বলা হইত। মোগল আমলে এই সকল মুলুক লইয়া এক একটি সরকার গঠিত হয়, মজুমদারেরা জমিদার হন। এখন একটা পরগণার আংশিক অধিকারীকেও জমিদার বলে, তখন একটা মহলের মধ্যে এক বা ততোধিক পরগণা অন্তর্ভুক্ত থাকিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সপ্তগ্রাম একটি বিস্তীর্ণ মুলুক এবং বার্ষিক বারলক্ষ টাকা মোক্তা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে উহার ইজারা লইয়াছিলেন দুই জন মৌলিক কায়স্থ—দুই ভ্রাতা, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস। পাঠান আমলে বঙ্গের বহুস্থানে মৌলিক কায়স্থগণ অভিযান-পরায়ণ ঔপনিবেশিক, স্বজাতিরক্ষক সাহসী বীর এবং প্রবল পরাক্রান্ত শাসকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহারাই গুরু পুরোহিত রূপে এবং আত্মীয়-কুটুম্বরূপে বহু কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনও সেই জাতীয় কায়স্থ বীর; তাঁহাদের পিতৃপুরুষের কোন বিশেষ পরিচয় আমরা পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের কোন বিশেষ গুণ, সম্মান বা প্রতিপত্তি না থাকিলে অসংখ্য রাজানু-

পাঠান আমীরের কবল হইতে তাঁহারা কোন মুলুকের বন্দোবস্ত লইতে পারিতেন না। বন্দোবস্ত লইলেও তাঁহাদের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল। এই ভ্রাতৃদ্বয় "বারলক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ" অর্থাৎ তাঁহাদের হস্তবুদ আদায় হইত বিশ লক্ষ টাকা, তন্মধ্য হইতে বারলক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া আট লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। ইহা ত শুধু ভূমিকারের আয়, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যাদি নানাজাতীয় শুল্ক হইতে তাহাদের আয় আরও ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় হইত। সুতরাং তাহাদের মোট বার্ষিক আয় ১০।১২ লক্ষ টাকার কম নহে, উহা দেখিয়া কত জনের নেত্র পীড়া জন্মিত। বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম হইতে এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদতুল্য বসতি বাটী ছিল।

"ধনৈশ্বর্য্য ও রাজপ্রতাপের সঙ্গে দান-ধ্যান ও সৎকার্য্যের গৌরবও তাঁহাদের কম ছিল না। "গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা" বলিয়া প্রবাদ-বাক্য এই যশ কীর্ত্তন করিত। কবিরাজ গোস্বামী প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের গুণের পরিচয় দিয়াছেন।—

"মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
(চৈ, চৈ, মধ্য, ১৬শ)

নদীয়া অঞ্চলের বহু ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি অথবা সাময়িক বৃত্তি পাইয়া জীবনধারণ করিতেন। বিপুল তাঁহাদের বিভব, ধর্ম্মে তাঁহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দেশভরা তাঁহাদের যশ, রাম-লক্ষ্মণের মত তাঁহারা অভিন্ন হৃদয়—অভাব তাঁহাদের কিছুরই ছিল না। কেবলমাত্র বহুকাল পর্য্যন্ত উভয়ে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিরণ্যদাস অপুত্রক, আর কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ছিল একটি

মাত্র সন্তান—রঘুনাথ[১]।" এই রঘুনাথই ছিলেন বংশের প্রদীপ দুই ভ্রাতার নয়নের মণি।

অতুল ঐশ্বর্য্য আর স্নেহমমতার পরিবেশে রঘুনাথ লালিত হন। পিতা ও পিতৃব্যের অভিলাষ, রঘুনাথ হইবেন আদর্শ ধনী পরিবারের উপযুক্ত পুত্র। বংশের রাজসিক ধারা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ভূম্যধিকারের পরিচালনায় যেমন দক্ষ হইবেন, তেমনি সুনাম অর্জ্জন করিবেন দানশীলতা ও পুণ্যকর্ম্মে। কিন্তু এ অভিলাষ তাঁহাদের পূর্ণ হয় নাই। জন্মগত সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়া রঘুনাথ জন্মিয়াছিলেন, তাই ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটিই উত্তরকালে আত্ম-প্রকাশ করিতে দেখা যায় তাঁহার জীবনে।

তখনকার দিনের বাংলায় সংস্কৃত পঠন-পাঠনের বড় আদর ছিল। নবদ্বীপ ছিল সেকালের অক্সফোর্ড, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পড়ুয়ারা এখানে পড়িতে আসিত, নব্যন্যায় ও অন্যান্য দর্শন আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিত। সপ্তগ্রাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রেও বর্ত্তমান ছিল শাস্ত্রপাঠের আদর্শ পীঠ।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন। তাই দুই ভ্রাতাই রঘুনাথের শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। গৃহে বসিয়া বালককে পড়াইবেন, এমন কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ করা তাঁহাদের মত ধনীর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হিরণ্যদাস তাহা করেন নাই। চিরাচরিত ভারতীয় প্রথামত ছাত্রেরা অধ্যাপকের আবাসে থাকিয়াই পাঠ সমাপন করে, তাঁহার সাহচর্য্য ও তত্ত্বাবধানে জীবন গড়িয়া তোলে। এই প্রথাই তিনি অনুসরণ করিলেন ; বালক রঘুনাথকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল কুলপুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে। এখানে থাকিয়াই রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্রের মতই সাধারণ আহার বিহার ও পরিচ্ছদে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলরাম আচার্য্য শুধু শাস্ত্রবিদ্ই

---

১ সপ্ত গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

ছিলেন না, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। গ্রামে কোন সাধুসন্ত উপস্থিত হইলে তাঁহার গৃহেই হইত সেবার ব্যবস্থা। এই পরিবেশে থাকিয়া বালক রঘুনাথ সাধুসেবা ও সদাচারের দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

বলরাম আচার্য যেমন শাস্ত্রপারঙ্গম, বালক বিদ্যার্থী রঘুনাথও তেমনি অসাধারণ মেধা প্রতিভার অধিকারী। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে রঘুনাথ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

উত্তরকালে ভক্ত রঘুনাথ যে রসমধুর স্তবমালা রচনা করেন, তাহার মূলে রহিয়াছে বালককালের শিক্ষার এই উৎকর্ষ এবং সাফল্য।

নামমূর্ত্তি হরিদাস ঠাকুর সে-বার বেনাপোল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। বলরাম আচার্য্য সাদরে তাঁহাকে জানান অভ্যর্থনা। নিভৃত একটি স্থানে পর্ণকুটির তৈরী করা হয় এই ভক্ত অতিথির জন্য। সেই কুটিরে বাস করিয়া হরিদাস তাঁহার নিত্যকার জপ ও নামকীর্ত্তন সমাধা করিতেন আর বলরাম আচার্য্যের গৃহে গিয়া করিতেন ভিক্ষা নির্ব্বাহ।

বালক রঘুনাথের কৌতূহলের অন্ত নাই। সুযোগ ও অবসর পাইলেই তিনি ঘুর্‌ঘুর্ করেন হরিদাসের পর্ণকুটিরের আশেপাশে। হরিদাস বলরাম ভবনে আসিলে যুক্তকরে তিনি সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান, ধন্য হন তাঁহার আশীর্বাদ ও স্নেহস্পর্শে। দিনের পর দিন এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের ভজননিষ্ঠা ও দৈন্যময় সাধনা দেখিয়া রঘুনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হন, দিব্য ভাবাবেশের ছবিটি কোমল হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়।

শুধু বলরাম আচার্য্যই নন, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও ছিলেন ভক্তি-সিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের অতি অনুগত। ফলে বালক রঘুনাথও এই মহাপুরুষের দ্বারা এসময়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হইয়া পড়েন।

হরিদাস ঠাকুরের কৃপাকর সম্পাতেই যে রঘুনাথের জীবনে ভক্তি-সাধনার দুয়ার উন্মোচিত এ তথ্যটি রঘুনাথের শিষ্য কৃষ্ণদাস

কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। রঘুনাথের শ্রীমুখ হইতেই তাঁহার বালক কালের এই মানস বিবর্ত্তনের ইতিহাস কৃষ্ণদাস শ্রবণ করেন এবং চরিতামৃতে তাহা লিখিয়া যান :

হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে॥

অতঃপর হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে অন্যত্র চলিয়া যান, এবং ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্যক্রমে রঘুনাথ লাভ করেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন।

প্রভু কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়াছেন, শুরু হইয়াছে তাঁহার দিব্য জীবনের নবতম অধ্যায়। সপ্তগ্রামের বহু লোকই তাঁহার এই অভ্যুদয়ের সংবাদ রাখেন। বিশেষ করিয়া জমিদার এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিরণ্যদাস ও তাঁহার ভ্রাতা গোবর্দ্ধনদাস প্রভুর নবদ্বীপ লীলা ও সন্ন্যাস গ্রহণের সকল সংবাদ অবগত আছেন।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এই মজুমদারদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহাদের সভা ছিল রাজসভার মত, এবং এই সভায় নদীয়ার জ্ঞানী-গুণীরা অনেকে আসিতেন।

হিরণ্যদাসদের সহিত বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর। এই সুবাদে প্রভু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসকে 'আজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাজেই প্রভুর ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার ও সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনাবলী বিশেষ আগ্রহ নিয়াই তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

প্রভু কাটোয়া হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিলেন। ভক্তি-প্রেমের রসঘন বিগ্রহ, দেবদুর্লভ মূর্ত্তি, এই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য শান্তিপুরে ভীড় জমিয়া যায়, নানাদিক হইতে ভক্ত নরনারী সেখানে ছুটিয়া আসিতে থাকে। সপ্তগ্রাম হইতেও বহু লোক শান্তিপুরের দিকে রওনা হয়। এ সময়ে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়া রঘুনাথও তাহাদের সঙ্গী হন।

অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে রঘুনাথ প্রভুর দর্শন পাইলেন।[১] প্রেমঘন, দিব্যমধুর মূর্ত্তি। একবার দর্শন করিলে নয়ন ফিরাইয়া নেওয়া যায় না। কখনো দিব্য ভাবাবেশে প্রভু টলমল করিতেছেন। কখনো হইতেছেন সংজ্ঞাহীন। সারা দেহে তাঁহার ফুটিয়া উঠিতেছে অশ্রুকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার।

প্রভুকে ঘিরিয়া প্রহরের পর প্রহর চলিতেছে ভক্তদের নৃত্য ও কীর্ত্তন। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত। মর্ত্তালোকে যেন এক দিব্য আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসের সহিত অদ্বৈত আচার্য্যের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। তাই বালক রঘুনাথের প্রতি স্নেহ-সমাদরের ত্রুটি হইল না। অদ্বৈত তাহাকে প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণধূলি ও পবিত্র প্রসাদ দিয়াও তৃপ্ত করিলেন।

রঘুনাথ শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন প্রভু শ্রীচৈতন্যকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রভুর অলোক-সামান্য রূপ, প্রেমার্ত্তি, দিব্য ভাবাবেশ, আর ভক্তদের আনন্দোচ্ছ্বাস, সবকিছু মিলাইয়া যে অপরূপ ভাবমূর্ত্তিটি তাঁহার মানসপটে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে তাহার রং দিনের পর দিন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে। প্রভুর চরণে বালক রঘুনাথের হৃদয় বাঁধা পড়িয়া যায় এক অজ্ঞাত প্রেমের বন্ধনে।

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; রঘুনাথ পদার্পণ করিয়াছেন সতের বৎসরে। এই তরুণ বয়সে লোকে সাধারণতঃ আনন্দ উল্লাসের দিকেই ছুটে, পার্থিব ভোগ সুখের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রঘুনাথের বেলায় দেখা যায় তাহার বিপরীত। হৃদয়ে তাঁহার সদাই বহিতেছে বৈরাগ্যের হাওয়া—সংসারে মন একদণ্ডও টিকিয়া থাকিতে চায় না।

১ বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব নেতাদের মধ্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথমে প্রভু শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রাপ্ত হন।

লোকমুখে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের কথা তিনি শুনিয়াছেন। নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠী নিয়া যে লীলা তিনি করিতেছেন, প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের যে প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়াছেন, সে সংবাদও রঘুনাথ পাইতেছেন। এসব শুনিয়া মন বড় উচাটন হইয়াছে, নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণে আশ্রয় নিবার অভিলাষ হইয়াছে, দুর্নিবার। এ সময়ে বার বারই চেষ্টা করেন গৃহত্যাগ করার জন্য, কিন্তু বার বারই তাঁহার অভিসন্ধি ফাঁস হইয়া যায়, ধরা পড়িয়া যান।

রঘুনাথের মায়ের আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তোমরা ওর ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করো, কোন ফাঁকে যেন না পালায়।"

এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেরী হইল না; কয়েকজন সঙ্গী ও পাইক নিযুক্ত হইল এই কাজে। তাহাদের উপর নির্দ্দেশ রহিল, রঘুনাথ সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কোথাও না যান, সেদিকে তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

পিতা ও পিতৃব্য ক্রমে বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ সাত্ত্বিক প্রকৃতির যুবক, ত্যাগ বৈরাগ্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা। এবার ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

এখন বড় প্রশ্ন, কোন্ উপায়ে তাঁহাকে সংসারে ধরিয়া রাখা যায়? পিতা ভাবিলেন, কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা নিয়া সাধন ভজন শুরু করিলে, পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যে রত হইলে, হয়তো গৃহত্যাগের ঝোঁক কমিয়া যাইবে। ধীরে ধীরে সংসার জীবনে সে আকৃষ্ট হইবে।

যদুনন্দন আচার্য্য গোবর্দ্ধনদাসদের কুলগুরু। ইনি অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, সুপণ্ডিত ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া সুনামও যথেষ্ট। তাঁহাকে আনাইয়া রঘুনাথকে মন্ত্র-দীক্ষা দেওয়া হইল।

গুরুর নির্দ্দেশমত বেশ কিছুদিন রঘুনাথ সাধন ভজন করিয়া চলিলেন, কিন্তু মন তাঁহার শান্ত হইতে চায় না, বৈরাগ্যের তীব্রতা দিন দিন কেবলই বাড়িতে থাকে

অভিভাবকেরা এবার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া যাক্। রূপসী তরুণী পত্নীর আকর্ষণে যদি বা সংসারের দিকে মন কিছুটা ফিরিয়া আসে।

সুলক্ষণা পরমা সুন্দরী পাত্রী মিলিতে দেরী হয় নাই। এক শুভলগ্নে জাঁকজমক সহকারে রঘুনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কিন্তু বিবাহিত জীবনেও রঘুনাথের মনোভাবের তেমন কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, বৈরাগ্য দিন দিনই চলিল বৃদ্ধির পথে।

এই সময়ে প্রভু শ্রীচৈতন্যের বিস্তারিত সংবাদ পৌঁছে সপ্তগ্রামে। প্রভু নীলাচল হইতে সম্প্রতি গৌড়-রামকেলীতে আসিয়া রাজমন্ত্রী সনাতন ও রূপকে কৃপা করেন। তারপর বৃন্দাবনে গমনের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সনাতনের পরামর্শে এ যাত্রায় তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। এক সপ্তাহের জন্য তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিবেন। হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী তাই সমবেত হইয়াছে সেখানে, দিনরাত বহিতেছে কীর্ত্তন-নর্ত্তনের আনন্দ স্রোত।

রঘুনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, পিতৃব্য ও পিতাকে খুলিয়া বলিলেন তাঁহার মনের কথা। প্রভুর চরণ দর্শন না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এবার বহু সলাপরামর্শ হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। এবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় কয়েকদিন কাটাইয়া আসিয়া যদি সে কিছুটা শান্ত হয়, মন্দ কি? সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও দেহরক্ষী যাইবে, সবাই মিলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবে সপ্তগ্রামে।

অভিভাবকদের অনুমতি নিয়া, প্রচুর ভেট-দ্রব্যসহ রঘুনাথ সদলবলে উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে।

কিন্তু এই দর্শন ও সান্নিধ্য তো ভক্ত রঘুনাথকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। প্রভুর দিব্যমূর্ত্তি, আর তাঁহার মহাভাবের তরঙ্গ, এই

নবীন সাধককে আরো যেন উত্তাল করিয়া তুলিয়াছে। চরণতলে লুটাইয়া সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ কহিলেন, "প্রভু, মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছি, আপনি ছাড়া এ জগতে আর আমার কোন আশ্রয় নেই। বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে পশুর জীবন আমি যাপন করছি। কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।"

অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন কিছুই অজানা নয়। রঘুনাথ যে তাঁহার চিহ্নিত পরিকর, তাঁহার দিব্যলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। কিন্তু সব কিছুরই একটা ক্রম আছে, নির্দ্ধারিত লগ্ন আছে। রঘুনাথকে এখনো যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে নিজের প্রস্তুতি।

তাঁহাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া প্রভু প্রশান্ত স্বরে কহিলেন :

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

(চৈ, চ, মধ্য, ১৬৭)

নিভৃতে বসিয়া প্রভু আরো কহিলেন, "বৎস রঘুনাথ, তুমি মনে দুঃখ ক'রো না। বৃন্দাবনধাম দর্শন ক'রে আমি আবার নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের কাছে ফিরে আসবো। তখন তুমি কোন ছলে আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে। কোন্ ছলে, কি ক'রে যাবে, যথাসময়ে কৃষ্ণ তোমায় তা বলে দেবেন। কৃষ্ণ কৃপা রয়েছে যার ওপর তাকে কে ঠেকাবে ?"

রঘুনাথ শুদ্ধসত্ব আধার, প্রেমভক্তির আলোকে হৃদয় কন্দর তাঁহার আলোকিত। তাই প্রভুর এই ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরী হইল না। প্রভু কহিয়াছেন, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিতে হইবে, বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা করিতে হইবে। আর এই সঙ্গে অটুট

রাখিতে হইবে প্রেমভক্তির নিষ্ঠা। তবেই জীবনে তাঁহার নামিয়া আসিবে কৃষ্ণ-কৃপার অমৃতধারা। প্রভুর শ্রীমুখের কথা কি করিয়া রঘুনাথ লঙ্ঘন করেন ?

অন্তরের আর্ত্তি এবার অনেকটা প্রশমিত হইল। স্থির করিলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবার হইতে সংসারের কাজে রত থাকিবেন, আর অপেক্ষা করিবেন সেই পরম লগ্নের জন্য যখন প্রভু তাঁহাকে করিবেন বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার, ঠাঁই দিবেন তাঁহার চরণকমলে।

শান্তিপুর অদ্বৈত ভবন হইতে ফিরিয়া আসার পর দেখা গেল, প্রভুর সস্নেহ আশ্বাস-বাক্যে রঘুনাথের মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন এই সুযোগে তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম পরিচালনায় নিয়োজিত করিলেন। সুবিস্তৃত মুলুকের রাজস্ব সংগ্রহ, সুলতানের প্রাপ্য অর্থ জমা দেওয়া, অবাধ্য প্রজার শাসন প্রভৃতি অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ মজুমদারদের দপ্তরে করার আছে। রঘুনাথ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক ; শিক্ষা দীক্ষা, মেধা প্রতিভা তাঁহার যথেষ্ট। এবার বিষয়কর্ম্মে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া সাংসারিক দায়িত্ব সে বুঝিয়া নিক্, ইহাই পিতা ও পিতৃব্যের পরম কাম্য।

রঘুনাথের এই কার্য্যভার গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল এক কঠিন সঙ্কট। এই সঙ্কটকালে রঘুনাথ উপস্থিত না থাকিলে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের রাজস্ব ইজারার কাজ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইত, সমূলে তাঁহারা ধ্বংস হইতেন।

গৌড়-অধিপতি হুসেন শাহের অধীনে একজন মুসলমান আমীর সপ্তগ্রামের মোক্তাদার হন, সরকার হইতে এটি বন্দোবস্ত করিয়া নেন। তাঁহার লোভ ছিল অত্যধিক, নিষ্পেষণের চাপে প্রজাদের অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং রাজস্ব আদায় পুরাপুরিভাবে হইত না। আমীর নিজের খাতে টাকা টানিয়া নিয়া সুলতানের খাতে রাজস্ব আদায় কম দেখাইতেন, এবং মুসলমান বলিয়া বৎসরের পর বৎসর এই ধরণের প্রশ্রয় নিতে তিনি সাহসী হইতেন। শেষটায়

সুলতান বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করেন, হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনকে নিযুক্ত করেন তাঁহার স্থানে।

হিরণ্যদাস বেশ দক্ষতার সহিতই রাজস্ব আদায়ের কাজ করিতেন। তাঁহার আমলে প্রজাদের অসন্তোষ কম ছিল, আদায় তাই রীতিমত হইত। সুলতানকে তাঁহার পাওনা বারো লক্ষ টাকা মিটাইয়া দিয়াও আটলক্ষ টাকা মজুমদারেরা নিজের ঘরে তুলিতে পারিতেন। পূর্ব্বতন মোক্তাদার, আমীর, ইহা লক্ষ্য করিলেন, ঈর্ষার আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। সুলতানের নিকট অভিযোগ করিলেন, হিরণ্যদাস কয়েক লক্ষ টাকা বেশী আদায় করিতেছে, কিন্তু অন্যায়ভাবে সরকারী কোষাগারকে করিতেছে বঞ্চিত। এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র জালও বিস্তারিত হইল।

সুলতান হুসেন শাহ তখন রাজস্বের আদায় বৃদ্ধি করিয়া রাজ-সিংহাসনকে সুদৃঢ় করিতে ব্যগ্র। আমীরের উস্কানীতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, সেনাদল সহ এক উজীরকে পাঠাইলেন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে গ্রেপ্তার করিয়া গৌড়ে নিবার জন্য।

হিরণ্য রাজধানীর সকল খবরই রাখেন। সেনাদল আসিতেছে খবর পাইয়া ভ্রাতাসহ তিনি সপ্তগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিয়া থাকা যাক্, তারপর সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত হইলে আত্মপ্রকাশ করা যাইবে।

এদিকে মজুমদার ভ্রাতাদের দেখা না পাইয়া উজীর তাঁহাদের প্রতিনিধি রঘুনাথকেই গ্রেপ্তার করিয়া বসিলেন। তারপর তাঁহাকে গৌড়ে নিয়া গিয়া নিক্ষেপ করা হইল কারাগারে।

কারাগার হইতে রোজই সুলতান হুসেন শাহের দরবারে রঘুনাথকে হাজির করা হয়। আর ভর্ৎসনা ও ভীতি প্রদর্শন চলিতে থাকে দিনের পর দিন।

রঘুনাথকে সুলতান চরম দণ্ড দিতেছেন না দুটি কারণে। প্রথমত, মজুমদারেরা দক্ষ লোক। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বারা রাজস্ব বাড়ানো যাইবে, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারা জাতিতে কায়স্থ, চাতুর্য্য ও চক্রান্তে কুশল, প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া বা অপর কোন

কূট চাল চালিয়া রাজস্বের আদায় ব্যবস্থা ইহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। তাই রঘুনাথকে কারাগারে রাখিয়া ও ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে।

রঘুনাথ বুঝিলেন, কৌশল অবলম্বন না করিলে এই নির্য্যাতনের হাত এড়ানো যাইবে না। স্থির করিলেন, মিষ্টি কথায় সুলতানের হৃদয় গলাইবেন, চেষ্টা করিবেন একটা আপোষ মীমাংসার জন্য।

করজোড়ে, সবিনয়ে সেদিন সুলতানকে নিবেদন করিলেন, "আমার বাবা ও জ্যেঠা আপনার ভাই। আর আমি হচ্ছি আপনার পুত্রের মত। আমাদের ভেতর বিরোধ বা মনোমালিন্য থাক্‌বে কেন? তাছাড়া, আপনি হচ্ছেন দেশের রাজা, সবার প্রতিপালক। জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব সব কিছু আপনার আয়ত্তে। আপনার মত মহান্ ব্যক্তি যদি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তবে কার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াবো?"

এই বিনয়নম্র বচন, আর রঘুনাথের প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি, হুসেন শাহের মন গলাইয়া দিল। মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ছাখো বেটা, তোমার জ্যাঠা খুব কৃতী লোক, সন্দেহ নেই। আট লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর রাজস্ব থেকে একলা সে ভোগ করে। তা থেকে আমায় কিছু দেওয়া কি তার উচিত নয়? তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তাকে একথা বুঝিয়ে বলো। আমি তোমাদের সবাইকে মার্জ্জনা করলাম।"

রঘুনাথ সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দেন, পিতৃব্যকে এ প্রস্তাবে তিনি রাজী করাইবেন। মুক্তি পাইয়া সপ্তগ্রামে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় এবং সুলতানের মনান্তর অতঃপর অতি সহজে মিটিয়া যায়।

এবার বুঝা গেল, প্রভু শ্রীচৈতন্য কেন রঘুনাথকে আরো কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকিতে বলিয়াছিলেন। এতদিন বৈষয়িক কাজ-কর্ম্ম রঘুনাথ অনাসক্ত হইয়া করিয়াছেন। আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছে এই অনাসক্তির মধ্য দিয়া। শুধু তাহাই নয়, জমিদারী পরিচালনার ভার এ সময়ে রঘুনাথের হাতে না থাকিলে

সুলতানের সহিত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইত না। ফলে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারকে হইতে হইত সর্ব্বস্বান্ত।

কিছুদিনের মধ্যে রঘুনাথ এক আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী নির্ধন সবাইকে নির্ব্বিচারে বিলাইতেছেন প্রেমধন। তাঁহার উদ্দণ্ড কীর্ত্তন-নর্ত্তনে আর আনন্দ-রঙ্গে ভক্ত নরনারীর হৃদয় উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। রাঘব পণ্ডিতের ভবন হইয়াছে তাঁহার প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র।

পানিহাটি সপ্তগ্রাম মুলুকেরই অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, খুব বেশী দূরেও নয়। রঘুনাথ স্থির করিলেন, একবার নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আসিবেন।

"কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে হরিনাম দিয়া ভাবাবেশে আকুল করিতে হয়, 'অক্রোধ পরমানন্দ' নিত্যানন্দ তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার মূর্ত্তিতে কি দিব্য ভাব ছিল, মুখের কথায় কি মধু ছিল, কীর্ত্তনে কি মদিরা ছিল, হাস্যরসে কি চটুলতা ছিল যে, যখনই কেহ তাঁহাকে দেখিত বা নামটি কর্ণে শুনিত, তখনই সে কেমন ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইত। তিনি যেখানে যাইতেন দেশের লোক নাচিয়া উঠিত, সব ফেলিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ছুটিত, আর দেশময় লোকারণ্য হইত, মৃদঙ্গ-করতালে ঘনান্দোলিত হইয়া সে অঞ্চলে বিজয়ী সেনাপতির মত এই অপরূপ অবধূতের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিত। চৈতন্য-ভাগবতে পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত লীলা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সে লীলার বৈদ্যুতিক শক্তিতে তিনমাস কাল সে স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্মৃতের মত ছিলেন।"[১]

নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেশেতে॥

---

১ সপ্তগোস্বামী, বাতুল রঘুনাথ

তিনমাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহারো না স্ফুরে॥
(চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫ম)

রঘুনাথ পানিহাটিতে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে কীর্ত্তন-নর্ত্তনের শেষে প্রভু নিত্যানন্দ স্বগণ পরিবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ। আয়ত নয়ন দুটি দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। সদানন্দময় এই মুক্ত পুরুষের দিকে ভক্তেরা নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। এসময়ে রঘুনাথ নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তেরা রঘুনাথকে চিনিতেন। তাহারা তাঁহার পরিচয় জানাইয়া দিলেন, "প্রভু, ইনি হচ্ছেন রঘুনাথদাস মজুমদার, সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র।"

নিত্যানন্দ পুরীধামে থাকিতে শ্রীচৈতন্যের কাছে রঘুনাথের কথা, তাঁহার প্রেমার্ত্তির কথা শুনিয়াছেন। পরম সমাদরে তাঁহাকে কাছে টানিয়া নেন, নিজের চরণ দুটি স্থাপন করেন তাঁহার মস্তকে। কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলেন, "ওহে চোরা, তবে দেখছি এতদিন পরে তোমার দেখা পেলাম। ভালই হল, এবার তুমি আমার ভক্তদের দধি চিড়া খাইয়ে তৃপ্ত করো।"

কৌতুকী নিত্যানন্দের 'চোরা' কথার নিহিতার্থ, রঘুনাথ তাঁর প্রকৃত স্বরূপটি চমৎকাররূপে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তি-প্রেমের সাধনা ও আর্ত্তির ফলে অন্তর তাঁহার রহিয়াছে কৃষ্ণময়, কিন্তু বাহ্যজীবনে বিষয়ীর মতই তিনি চলাফেরা করিতেছেন।

এই প্রচ্ছন্ন সাধককে সদানন্দময় নিত্যানন্দ সেদিন সবার সমক্ষে জানাইলেন তাঁহার সোৎসাহ সাধুবাদ। শুধু তাহাই নয়, সহস্র সহস্র ভক্ত বৈষ্ণবকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করার বিরল সুযোগও এসময়ে তাঁহাকে তিনি দান করিলেন।

অর্থের এমনতর সদ্ব্যবহারই যে রঘুনাথ চাহেন। তাই পরম উৎসাহে তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন দধি চিড়ার এই মহোৎসবে। লোকজন ও অর্থের তাঁহার অভাব নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সকল

কিছু ব্যবস্থা হইয়া গেল। পর্ব্বত প্রমাণ চিড়ার স্তূপ আর শত শত ভাণ্ডের দধি, ক্ষীর, গুড় যেমন দেখা গেল, তেমনি আসিয়া জুটিল সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী। নিত্যানন্দের প্রেরণায় ও রঘুনাথের ব্যবস্থাপনায় যে বিরাট মহোৎসব সেদিন পানিহাটিতে সম্পন্ন হয়, তাহার আনন্দ-তরঙ্গ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে সারা গৌড়দেশের দিকে দিকে।

কথিত আছে, সেদিনকার মহোৎসবে, নিত্যানন্দের আকর্ষণে ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্য সূক্ষ্মদেহে পুলিন-ভোজনে আবির্ভূত হন, পঙ্‌ক্তির মধ্যে বসিয়া ভক্তপ্রদত্ত চিড়া দধি সানন্দে গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবেরা অনেকেই বলিতে থাকেন, রঘুনাথ মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, তাঁহাকে কৃতার্থ করার জন্যই ঘটিয়াছে কৃপালু প্রভুর আবির্ভাব।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহেও সেদিন রাত্রিতে বৈষ্ণব সেবার সময়ে ঘটে এমনি এক অলৌকিক কাণ্ড। নিত্যানন্দের পাশে রাখা হইয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভোজন-আসন। এই আসনে সশরীরে প্রভু আবির্ভূত হন, নিত্যানন্দ ও রাঘব পণ্ডিত উভয়ে এই লীলাদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

রাঘব দুই প্রভুর ভোজনাবশেষ ভক্ত-রঘুনাথকে সযত্নে আনিয়া দিলেন। স্নেহভরে আশিস্ জানাইয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। প্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এসে ভোজন ক'রে গেলেন আজ এখানে। এই নাও তাঁর পবিত্র প্রসাদ, জীবন তোমার ধন্য হোক্, সর্ব্ববন্ধন থেকে মুক্ত হও তুমি।"

পরের দিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া নিত্যানন্দ ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এ সময়ে রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সজল নয়নে, যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু আমি বিষয়ী—জীবাধম। বামন হয়ে চাঁদ ধরার অভিলাষ জেগেছে মনে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কিন্তু ভব-বন্ধন আমার যে এখনো টুটছে না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অভীষ্ট যেন পূর্ণ হয়।"

নিত্যানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ, আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি। শ্রীচৈতন্যের চরণকমলে তুমি আশ্রয় পাবে। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে সেবার অধিকার তুমি লাভ করবে।"

শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্ষদের এই আশীর্ব্বাণী রঘুনাথের সাধন-জীবনে উত্তরকালে সফল হইয়া উঠিয়াছিল।

পানিহাটিতে নিত্যানন্দের দর্শন ও মহোৎসবে ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গ লাভের পর রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বিষয় বিতৃষ্ণা চরমে উঠে। প্রভু চৈতন্যের সন্নিধানে কবে যাইবেন, কি করিয়া যাইবেন, ইহাই হয় তাঁহার ধ্যান জ্ঞান।

সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করিলেন না। বহির্ব্বাটিতে, দুর্গামণ্ডপের এক কোণে, অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কান্না, পত্নীর আর্ত্তি, আর অভিভাবকদের তিরস্কার কোন কিছুতেই ফল হইল না।

পিতা ও পিতৃব্য এবার তাঁহার পাহারার ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করিলেন। যখন যেখানে তিনি যান, একদল সঙ্গী পরামর্শদাতা বা প্রচ্ছন্ন রক্ষী সতর্কভাবে ঘিরিয়া থাকে। এই ব্যূহ ভেদ করিয়া নীলাচলের দিকে ধাবিত হওয়া বড় কঠিন।

প্রভু চৈতন্যের আশ্বাস বাণী রঘুনাথের স্মরণে আসিল,—কৃষ্ণ তাঁহার অবরোধ মোচনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অচিরে সুযোগ একটা উপস্থিত হইবেই। খিন্ন হৃদয়ে এই আশা নিয়াই তিনি দিন গুণিতে থাকেন।

এসময়ে একদিন অযাচিতভাবে আসিয়া যায় তাঁহার পলায়নের সুযোগ। কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্য হঠাৎ শেষ রাত্রে রঘুনাথের কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "বাবা রঘুনাথ, আমি এক মহা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।"

"আমি আপনার সেবক। কি আমার করতে হবে, আদেশ দিন। আমি যথাসাধ্য তা করবো।" ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন রঘুনাথ।

"আমার গৃহে শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন, তা জানো। যে ব্রাহ্মণ ছেলেটি এই বিগ্রহের পূজো ক'রে সে আজ ক'দিন হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমি নিজে অশক্ত। কি ক'রে ঠাকুরের সেবা পূজা নির্ব্বাহ হবে ভেবে পাচ্ছিনে। পূজারী ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে তুমি যদি নিজে বলে দাও, তাহলে তোমার কথা ঠেলতে সে সাহস করবে না। তুমি এখনই একবার চল, আমায় মুক্ত করো এ বিপদ থেকে।"

রঘুনাথ তখনই রওনা হইলেন তাঁহার সঙ্গে। কুলগুরুর সঙ্গে যাইতেছেন তাঁহারই জরুরী কাজে। তাই রক্ষীরা কেউ আর তাঁহাকে বাধা দিল না।

প্রাসাদের বাহিরে কিছুটা রাস্তা গিয়া রঘুনাথ আচার্য্যকে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আর অনর্থক কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে যাবেন কেন? আপনি সোজা আপনার বাড়ীতে চলে যান। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার ওখানে যাচ্ছি।"

আচার্য্য ভাবিলেন, এ অতি উত্তম কথা। রঘুনাথের জন্য তিনি নিজ গৃহেই অপেক্ষা করিবেন।

পলায়নের এই পরম সুযোগ রঘুনাথ ছাড়িলেন না। পূজারী ব্রাহ্মণকে যদুনন্দন আচার্য্যের কাছে পাঠাইয়া দিয়া ধাবিত হইলেন নীলাচলের দিকে। রাজপথ পরিহার করিলেন, কারণ রক্ষীরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হয়তো ধরিয়া ফেলিবে। দ্রুতপদে চলা শুরু করিলেন বনপথ দিয়া।

উষার আলোক তখনো ফুটিয়া উঠে নাই। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া রঘুনাথ পথ চলিতেছেন, কাঁটা ও কাঁকরের আঘাতে পদতল হইতেছে ক্ষত-বিক্ষত। কোনদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, উন্মাদের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটিয়া চলিয়াছেন। মুখে নিরন্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ-পঙ্কজে।

পদব্রজে নীলাচল যাত্রা তখনকার দিনে ছিল অতি দুরূহ। পথে সাপ বাঘের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল নরঘাতক দস্যুদের উপদ্রব। এসব কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

এভাবে আঠারো দিনের পথ তিনি অতিক্রম করিলেন বারো দিনে। এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন সামান্য কিছু আহার জুটিয়াছে, আর বাকী নয়দিন কাটিয়াছে অনাহারে। এই অবস্থায়, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া তিনি পৌঁছিলেন। তারপর সরাসরি পতিত হইলেন প্রভুর চরণতলে।

প্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। চরণে পতিত, অস্থিচর্ম্মসার, অচেতন-প্রায় নবাগত ভক্তকে চিনিতে পারিয়া প্রভুর পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত চমকিয়া উঠিলেন। এ কি! এ-যে সপ্তগ্রামের ক্রোড়পতি জমিদারের তনয় রঘুনাথ—বিষয়-বিরাগী ভক্ত রঘুনাথ!

প্রভু তখন ভাবাবেশে রহিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত ভূতলে শায়িত রঘুনাথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, ব্যস্তভাবে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের অধরে ফুটিয়া উঠে, প্রসন্ন মধুর হাসি। মুমুক্ষু রঘুনাথকে সস্নেহে তুলিয়া নিয়া তিনি আলিঙ্গন দেন। রঘুনাথ বিভোর হন স্বর্গীয় আনন্দে, পথশ্রম আর অনাহার অনিদ্রার সব কিছু কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যান, প্রভুর চরণে বার বার জানান প্রাণের আকুতি, মাগেন পরমাশ্রয়।

আশ্বাস ও অভয় দিয়া প্রভু রঘুনাথকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। সকলকে নির্দ্দেশ দেন এই নবাগত ভক্তকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য।

প্রেমপূর্ণ স্বরে প্রভু এবার কহেন, "রঘুনাথ, দ্যাখো, কৃষ্ণের কি অপার কৃপা। এবার তিনি তোমায় টেনে আনলেন বিষয়-কূপ থেকে। প্রেমভক্তির আনন্দলোকে এবার তোমার যাত্রা শুরু হ'লো।"

সজল নয়নে, বাষ্পাকুল কণ্ঠে রঘুনাথ উত্তর দেন, "প্রভু, আমি কৃষ্ণ জানিনে, কৃষ্ণকৃপা কি তা জানিনে। কিন্তু এটা নিশ্চিতরূপে জেনেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, তোমার কৃপাই আমায় আজ উদ্ধার করলো।"

কৃপাময় প্রভু তখনই স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া কহিলেন,

"এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥

"স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ; যেমন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, তেমনই, গুরুগম্ভীর ভাবময় রসজ্ঞ ভক্ত। প্রভু নিজেই বলিতেন, নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব ও ব্রজের লীলারস রহস্য তাঁহার অপেক্ষাও স্বরূপ দামোদর অধিক জানিতেন। রঘুনাথের প্রেমের একাগ্রতা এবং সাধনের দৃঢ়তার বিষয় তিনি বুঝিয়াছিলেন। ঐরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সাধকই গূঢ়তত্ত্ব অনুশীলনের অধিকারী, সুতরাং রঘুর উপযুক্ত গুরু স্বরূপ দামোদর। এজন্য প্রভু তাঁহার এই প্রিয় পদার্থটিকে আদর করিয়া সেই মর্ম্মী ভক্তের করে সমর্পণ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, প্রিয় ভক্তটিকে যথোচিত আদর যত্ন বা শিক্ষাদান করিবার সময় বা সুযোগ তাঁহার নাই; এজন্য রঘুনাথের একান্ত মঙ্গল বিধানের জন্য, তাঁহাকে পুত্রবৎ ভৃত্যবৎ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, দরিদ্রের নিজপুত্রকে ধনীর গৃহে পোষ্যপুত্র করিয়া দিবার মত রঘুনাথকে হাতে হাতে ধরিয়া স্বরূপকে দেওয়া হইল। সেইদিন হইতে যত কাল রঘুনাথ নীলাচলে ছিলেন, তিনি 'স্বরূপের রঘুনাথ' নামে সকলের নিকট পরিচিত হইলেন[১]।"

গৌড় হইতে আসিবার সময় রঘুনাথ চরম কষ্ট পাইয়াছেন। পথশ্রম, অর্দ্ধাশন ও অনিদ্রায় শরীর প্রায় বিধ্বস্ত। তদুপরি কয়েক দিন তাঁহাকে জ্বরে ভুগিতে হইয়াছে এবং এজন্য লঙ্ঘন দিতে হইয়াছে।

লঙ্ঘনের পর রোগীদের রসাল বস্তু ভোজনের জন্য স্বাভাবিক একটা ইচ্ছা জন্মে। রঘুনাথের বেলায়ও তাহা দেখা দিল। সুস্বাদু ভোজ্য বস্তুর জন্য তিনি উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

প্রভু তাহার সেবক গোবিন্দকে বলিয়া দিয়াছেন, কয়েকদিন

১ রঘুনাথদাস গোস্বামী: সতীশচন্দ্র মিত্র

রঘুনাথকে যেন তাঁহার পাতের প্রসাদই দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, সে প্রসাদ বৈরাগী সন্ন্যাসীদেরই উপযোগী। অথচ সদ্য রোগমুক্ত রঘুনাথের জিহ্বার লালসা যাইতেছে না। অগত্যা সেদিন তিনি মনে মনে প্রভুর উদ্দেশে নানা রুচিকর চর্ব্যচোষ্য ভোগ দেন, তারপর মনে মনেই তাহা গ্রহণ করিয়া হন পরিতৃপ্ত।

এই মানস ভোজের পরদিনই প্রভাতে উঠিয়া প্রভু স্বরূপকে কহিলেন, "স্বরূপ, আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই, অজীর্ণ হয়েছে। রঘুনাথ আমায় কাল অতিরিক্ত ভোজন করিয়েছে[১]।"

দীনাতিদীন পথের ভিখারী রূপে রঘুনাথদাস নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রভুকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করানোর সামর্থ্য তাঁহার কই? সময়ই বা কই? প্রভুর এ ভোজন তো কাহারো চক্ষে পড়ে নাই? স্বরূপ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বুঝিলেন, ইহা প্রভুর মানস ভোজন, আর ইহা সম্ভব হইয়াছে ভক্ত রঘুনাথের মানস-নিবেদনের ফলেই।

রঘুনাথও উপলব্ধি করিলেন, অন্তর্য্যামী প্রভুর দৃষ্টিতে ভক্তদের ভাবনা চিন্তার ক্ষীণতম বুদ্‌বুদ্‌টিও ধরা পড়িয়া যায়। তাই তাঁহার বৈরাগ্য সাধনা সম্পূর্ণ করিতে হইবে পরম নিষ্ঠাভরে, আর সারা দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে হইবে এই সাধনায়।

কয়েকদিন বিশ্রাম ও আহার বিহারের পর রঘুনাথের শরীর কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিল। এবার তিনি ব্যাকুল হইলেন প্রভুর কাছে সাধন নির্দ্দেশ নিবার জন্য। তাঁহার সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে স্বরূপ দামোদরের উপর। তাই স্বরূপকে সেদিন একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েকটি দিন গত হ'লো। কই, প্রভু তো আমায় সাধন ভজন সম্বন্ধে, সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজে কিছু বলছেন না? আমার হয়ে আপনি তাঁকে একটু বলুন।"

স্বরূপ প্রভুর কাছে রঘুনাথের ব্যাকুলতার কথা উঠাইলেন। তখনি সর্ব্ব সাক্ষাতে প্রভু দিলেন তাঁহার নির্দ্দেশ:

১ ভক্তমাল গ্রন্থে অন্তর্য্যামী প্রভুর এই মনোরম আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইঁহ তাহা জানে॥
গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ॥[১]

(চৈ, চৈ, অন্ত্য-৬)

সাধারণভাবে প্রভু নবীন ভক্তদের উপযোগী কয়েকটি উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিগূঢ় ব্রজরস তত্ত্ব। শিক্ষা দেওয়ার ভার রহিল স্বরূপ দামোদরের উপর। সেইজন্যই তো তিনি স্বরূপের হাতে রঘুনাথকে একান্তভাবে সঁপিয়া দিয়াছেন।

এদিকে রঘুনাথের পলায়নের পর সপ্তগ্রামের মজুমদার প্রাসাদে নামিয়া আসিয়াছে বিষাদের অন্ধকার। রঘুনাথের তরুণী পত্নী অবিরত ক্রন্দন ও বিলাপের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন। জননী হইয়াছেন উন্মাদিনীর মত, তাঁহার বুক ফাটা হাহাকার শুনিয়া অশ্রুজল রোধ করা যায় না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন একমাত্র পুত্রের অদর্শনে হতাশ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুঝিয়া নিয়াছেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই নীলাচলে গিয়া আশ্রয় নিয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণে। আর তাঁহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম হইতে ফিরাইয়া আনা যাইবে না।

কিন্তু রঘুনাথের মাতাকে শান্ত করা যায় কই? কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন, "যেমন ক'রে হোক্ তোমরা আমার নয়নের মণি রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনো। দরকার হলে তাকে ঘরে বেঁধে রাখো। এই প্রাসাদে এত লোকজন, এত রক্ষী, আছে কী করতে?"

গোবর্দ্ধন মজুমদার স্ত্রীকে নানা ভাবে বুঝান, এতকাল চেষ্টা করেও রঘুনাথকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। এই হচ্ছে বিধিলিপি। আরো কহিলেন :

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ীর বাঁধনে তারে রাখিব কি মতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥

(চৈ, চৈ, অন্ত্য-৬)

শিবানন্দ সেন ছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রতি বৎসর গৌড় হইতে যাহারা নীলাচলে প্রভুর দর্শনে যাইতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন এই শিবানন্দ। যাত্রীদলের পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁহার উপর।

গোবর্দ্ধন মজুমদার রঘুনাথ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন শিবানন্দের কাছে। জানিলেন, নীলাচলে থাকিয়া কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন সে যাপন করিতেছে। সে বৈরাগ্য সে দৈন্যদশা দেখিলে অশ্রুরোধ করা কঠিন হয়।

গোবর্দ্ধনের অন্তর বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের মত বিলাস বৈভবে যে এযাবৎ কাটাইয়াছে, এই কঠোরতা কি করিয়া সে সহ্য করিবে। অবিলম্বে রঘুনাথের জন্য একটি পাচক ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য তিনি নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন, এই সঙ্গে দিলেন চারিশত মুদ্রা ও বহুতর সুস্বাদু খাদ্য।

পাচক ও ভৃত্য নীলাচলে পৌঁছানোর পরই রঘুনাথ তাহাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু মুদ্রাগুলি কি করিবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এগুলি সঞ্চিত রাখিবেন নিজের কাছে। এই অর্থ দিয়া প্রভুকে মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো যাইবে।

ভক্তাধীন প্রভু রঘুনাথের অনুরোধ এড়াইতে পারেন না। প্রতি মাসে দুই তিন দিন করিয়া রঘুনাথের কুটিরে তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নানা সুস্বাদু ভোজ্য তৈরী হয়, প্রভু ও তাঁহার সঙ্গী

বৈষ্ণবেরা তৃপ্তি সহকারে এসব গ্রহণ করেন। ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রঘুনাথও হন কৃতকৃতার্থ।

প্রায় দুই বৎসর এভাবে অতিবাহিত হইল। তারপর হঠাৎ রঘুনাথের মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। প্রভু তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন আর এই উপলক্ষে রঘুনাথ পাইতেছেন কত আনন্দ, কত তৃপ্তি। কিন্তু এই সঙ্গে কি তাঁহার অহমিকা কিছুটা মিশ্রিত নাই? 'প্রভু আমার কুটিরে ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, ভক্তদের মধ্যে আমি বিশেষ একটা মর্য্যাদা এর ভেতর দিয়ে পাচ্ছি' এই ধরণের প্রচ্ছন্ন অভিমান হয়তো রহিয়াছে। তাছাড়া, প্রভু কি সত্যই এই ভোজনে তৃপ্ত হইতেছেন?

ভাবিলেন, 'প্রভু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈন্যের আদর্শই তিনি তাঁহার অনুগামীদের সম্মুখে সদাই তুলে ধরছেন। চরম বৈরাগ্যের আধার না হলে কোন সাধকই পরম প্রেমরস বা ব্রজরস সহজে ধারণ করতে পারে না। অনুগামী বৈরাগী সন্ন্যাসীদের প্রতি এটাই প্রভুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। সেই বৈরাগ্যমূর্ত্তি প্রভুকে আমি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে রোজ খাওয়াচ্ছি বিষয়ীর অন্ন। আমার পিতা ও পিতৃব্য বিষয়ী, ধনী জমিদার। তাঁদের প্রেরিত অর্থে যে আহার্য্য প্রস্তুত হয়, তা ভোজনে প্রভুর তো সত্যকার আনন্দ হবার কথা নয়। তাই তো। ভ্রান্তবুদ্ধি হয়ে আমি এ কি করছি?'

অতঃপর রঘুনাথ প্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিলেন। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর হঠাৎ একদিন প্রভু প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা স্বরূপ, রঘুনাথের কুটিরে আর তো আমায় ভিক্ষা গ্রহণের জন্য ডাক্‌ছে না। ব্যাপার কি?"

স্বরূপ নিবেদন করেন, "প্রভু, রঘুনাথ ভেবে দেখেছে, বিষয়ীর অন্ন আপনাকে নিবেদন করাটা ঠিক নয়। আপনি ভক্তাধীন, ভক্তের ইচ্ছে মেনে নিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন, তা ঠিক। কিন্তু রঘুনাথের মন আজকাল তাতে সায় দিতে চাচ্ছে না।"

একথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত। কহিলেন, "রঘুনাথ ঠিকই

বুঝেছে। বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর কৃষ্ণ স্মরণে বাধা পড়ে। রঘুনাথের স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যকার পথ চিনে নিতে ভুল করেনি।”

আহার বিহারে সংযম, ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র সাধন, এইদিকে রঘুনাথের সতর্ক দৃষ্টি পতিত হইল। কারণ, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে নিজে এই পন্থার অনুরাগী। তাছাড়া, রঘুনাথ আরও ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তিনি ধনবানের পুত্র, বিলাস-বহুল জীবনে বহুতর অবাঞ্ছিত সংস্কার গজাইয়া উঠিয়াছে—ভোগেচ্ছার সূক্ষ্ম অঙ্কুর হয়তো এখনো রহিয়াছে উদগ্র। এ অঙ্কুরকে নির্ম্মমভাবে বিনাস না করিলে শুদ্ধ আধাররূপে তিনি তো গড়িয়া উঠিবেন না। তাই দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, কায়মনোবাক্যে সত্যকার বৈরাগ্যকে তিনি বরণ করিয়া নিবেন, ভোগলিপ্সা ও আত্ম-অভিমানের কাঁটাকে সমূলে করিবেন উৎপাটিত।

শ্রীচৈতন্যের একান্ত সেবক গোবিন্দের উপর নির্দ্দেশ ছিল, ভক্ত রঘুনাথ তাঁহার ভজনপূজন ও সমুদ্র স্নান সমাপন করিয়া প্রভুর দর্শনে আসিলে প্রভুর প্রসাদান্ন তাঁহাকে দেওয়া হইবে। কিছুদিন ইহা ভোজন করিয়াই রঘুনাথের দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ শুরু হইল তাঁহার আত্মসমীক্ষণ, ‘তাই তো, বৈরাগ্যময় তপস্যার পথে আমি পা বাড়িয়েছি। কিন্তু আর পাঁচজন বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর মত যত্রতত্র ভিক্ষা ক’রে তো উদরপূর্ত্তি করছিনে? বরং প্রভুর প্রসাদ নিশ্চিন্ত আরামে প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছি। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, আহার ঠিকমত জুটছে, নিরুদ্বেগে দিন বেশ কেটে যাচ্ছে। এ তো ঠিক নয়। বৈরাগী জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে বরণ ক’রে নিতে হবে।’

দশদণ্ড রাত্রি অতীত হইলে রঘুনাথ জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেন। তারপর আসিয়া দাঁড়াইতেন মন্দির প্রাঙ্গণে, সিংহদ্বারের কাছে। কাঙাল বৈষ্ণব বলিয়া দর্শনার্থীরা দয়া করিয়া কেহ যদি কোন খাদ্য ভিক্ষাস্বরূপ দিত, তাহা দিয়া কোনমতে করিতেন ক্ষুন্নিবৃত্তি।

এই অযাচক-বৃত্তিই তো নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সাধুর আচরণীয় ধর্ম্ম। এখন হইতে এভাবেই শরীর ধারণের উপযোগী আহার্য্য গভীর রাত্রে

রঘুনাথ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিতেন। তারপর সারারাত কাটাইতেন জপ ধ্যান ও ভজনে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভিক্ষান্ন গ্রহণের এই ব্যবস্থাও রঘুনাথের মনঃপূত হইল না। প্রকাশ্যে এমনভাবে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। বাহিরে অযাচক বৃত্তির ভান আছে বটে, কিন্তু ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে যে রহিয়াছে ভিক্ষা সংগ্রহের সূক্ষ্ম ইচ্ছা। মুখে কিছু না বলিলেও অযাচক সাধু মনে মনে আগন্তুক দাতা সম্পর্কে কত কিছুই না ভাবিতে থাকে! কখনো ভাবে—এই যে আমার পরিচিত ভিক্ষাদাতা এগিয়ে আসছেন, কাল ইনি আমায় দিয়েছেন, আজো হয়তো দিয়ে যাবেন। কখনো বা কাহারো সম্পর্কে হয় বিপরীত মনোভাব—এই দাতাটি তেমন সুবিধের লোক নন, বোধহয় এর কাছে আজো কিছু পাওয়া যাবে না। রঘুনাথ কহিলেন, 'না—এই কপট অযাচক বৃত্তি আর নয়। বরং সত্রে গিয়ে কাঙালীদের মত মেগে খাবো।'

প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রায়ই মত্ত থাকেন মহাভাবে। কখনো ইষ্টগোষ্ঠী করেন, কখনো বা ভক্তদের ভীড়ের মধ্যে থাকেন ব্যতিব্যস্ত। কয়েক দিন রঘুনাথের সংবাদ রাখেন নাই। সেদিন ভক্তদের প্রশ্ন করিলেন, "রঘুনাথ কেমন আছে? আর কি করেই বা আজকাল তার ভিক্ষা নির্ব্বাহ হচ্ছে, বলতো?"

জানানো হইল, রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অযাচকভাবে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। এখন তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। সত্রে গিয়া কাঙালীদের সাথে বসিয়া ভোজন করেন।

প্রভু সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "তা বেশ করেছে। সত্রে মেগে খাওয়াই তো ভালো। মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, এতো বেশ্যাবৃত্তিরই মত। দাতার চোখে পড়ার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রহরের পর প্রহর দাঁড়িয়ে থাকা—এ বড় জঘন্য।"

ভাববিলাসী বৈষ্ণবেরা প্রভুর কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরতা সম্পর্কে এমন ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুরও তিনি হইতে পারেন?

গৌড়ের শ্রেষ্ঠ ক্রোড়পতির পুত্র, প্রতাপশালী মুলুকপতির পুত্র রঘুনাথ—তাঁহাকে শেষটায় তিনি কাঙালীদের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজনে টানিয়া নামাইলেন!

অতঃপর সর্ব্বত্যাগী বৈষ্ণব-সাধক রঘুনাথ আসিয়া দাঁড়ান কৃচ্ছ্র-সাধনের শেষ ধাপে। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা কীর্ত্তন করার কালে প্রভু কতদিন বলিয়াছেন—

জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

সত্রে কাঙালীর সারিতে বসিয়া খাইতে হয় বটে, কিন্তু ভোজন মিলে প্রচুর এবং নিশ্চিতভাবে। উদরপূর্ত্তি করার পর সারাদিন রঘুনাথ ভজনানন্দে কাটাইয়া দেন। কিন্তু সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যে পথে বাহির হইয়াছে, চরম বৈরাগ্য ও দৈন্যের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে, একমাত্র কৃষ্ণকৃপার উপরই সে নির্ভর করিয়া আছে। তাহার পক্ষে সত্রের নিশ্চিত ভোজন ব্যবস্থা তো সমীচীন নয়। সত্রে গিয়া চাহিয়া খাওয়া—আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আহার সম্পর্কে আরো বেশী কঠোরতা এবার তিনি অবলম্বন করিবেন। এমন বস্তু সংগ্রহ করিবেন যাহা কাহারো কাছে চাহিতে হয় না; যাহার জন্য কাহারো কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় না। শুধু তাহাই নয়, যে বস্তু খাইলে অপর কোন জীবকে বঞ্চিত করা হয় না, তাহাই তিনি এবার হইতে সংগ্রহ করিবেন।

রঘুনাথের এই বৈরাগ্যসাধনের ইতিবৃত্ত ভক্তকবি কবিরাজ গোস্বামীর অমর লেখনীতে বিধৃত রহিয়াছে চিরকালের ত্যাগতিতিক্ষা-ব্রতী মুমুক্ষুদের জন্য:

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥

ভিতরেতে দড় ভাত মাজি যেই পায়।
লূন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়।
(চৈ, চৈ, অন্ত্য ৬)

এ যেন বৈরাগ্যের এক অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নির দহনে তপস্বী রঘুনাথ নিজেকে নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে চান, কৃষ্ণকৃপার মহারস ধারণের সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে চান।

মন্দিরের কাছে পসারীরা মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় করে। প্রতিদিন সবটা বিক্রীত হয় না। ঐ বাসি প্রসাদে দুর্গন্ধ হইলে সিংহদ্বারের পাশে দাঁড়ানো গাভীদের সম্মুখে তাহা ঢালিয়া দেওয়া হয়। গাভীরা কতকটা খায়, কতকটা দুর্গন্ধের জন্য ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। রঘুনাথ এই বাসি পচা অন্নকণা কুড়াইয়া আনেন। বার বার জলে ধৌত করার ফলে কোন কোন অন্নের দানা হইতে দৃঢ় অংশ বাহির হয়। এগুলি সংগ্রহ করিয়া নুন সহযোগে রঘুনাথ তাহা ভোজন করেন।

যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষাবান্ সাধক রঘুনাথ, তেমনি কৃপালু ও কল্যাণকামী তাঁহার সাধন পথের দিক্‌দিশারী স্বরূপ দামোদর। স্বরূপ রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনার এই শেষ পর্য্যায়টি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। একদিন রঘুনাথের কুটিরে গিয়া হাতেনাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, “রঘুনাথ, এমন অমৃতময় প্রসাদান্ন রোজ তুমি ভক্ষণ করো, আর আমাদের দাও না। একি অদ্ভুত প্রকৃতি তোমার!” তারপর ঐ বাসি ভাতের প্রসাদান্ন পরম আনন্দে পুরিলেন নিজের মুখে। রঘুনাথের কৃচ্ছ্রব্রতের সাফল্যে জানাইলেন অন্তরের অজস্র সাধুবাদ।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্য দৃষ্টির কাছে রঘুনাথের তপশ্চর্য্যার কোন কিছুই অজানা নাই। তবুও ত্যাগী ভক্তের মহিমা বাড়ানোর জন্য ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে কহিলেন, “স্বরূপ, তোমার রঘুনাথের সমাচার বল। দিনচর্য্যা তার কিভাবে চলছে?”

স্বরূপ করজোড়ে রঘুনাথের কৃচ্ছ্রের কথা সবিস্তার বিবৃত করেন। প্রভুর আয়ত নয়ন দুটি তখন পুলকাশ্রুতে ছলছল। স্বরূপকে নিয়া সোল্লাসে ছুটিয়া যান রঘুনাথের কুটিরে।

রঘুনাথ তখন ভোজনে বসিবেন। বাসি প্রসাদান্ন জলে মাজিয়া নিয়া, নুন মাখাইয়া পাতার উপর রাখিয়াছেন। প্রভু আনন্দ কলরব করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ, এ তোমার কি রকমের স্বার্থবুদ্ধি? এমন মহাপ্রসাদ নিত্য তুমি গ্রহণ কর্‌ছো, আর আমাদের ডাক্‌ছো না!"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি অন্নদানা প্রভু মুখে পুরিয়া দিলেন। আবার হাত বাড়াইয়া নিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তাঁহার হাতটি খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সজল নয়নে কহিলেন, "না -না প্রভু, এ কখনো তোমার যোগ্য নয়। আমার পাপের মাত্রা আর তুমি বাড়ায়ো না প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও।"

ভক্তেরা তখন চারিদিক হইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সবাই পরমানন্দে দেখিতেছেন প্রভুর লীলারঙ্গ।

ভক্ত রঘুনাথের মান বাড়াইতে গিয়া বার বার প্রভু তাঁহার এই দৈন্যময় সাধনার প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে সেদিন স্বরূপের রঘুনাথ, স্বরূপের মহাপ্রভুর রঘুনাথ, সেদিন প্রতিভাত হইলেন অসামান্য ত্যাগবৈরাগ্য ও বৈষ্ণবীয় সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে।

রঘুনাথের কঠোর তপস্যা দেখিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্যের আনন্দের সীমা নাই। সেদিন রঘুনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রভু তাঁহার দুইটি পরম প্রিয় বস্তু দান করিলেন।

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক ভক্ত সন্ন্যাসী বৃন্দাবনে গিয়া একটি গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্যকে এই দুইটি পবিত্র বস্তু তিনি উপহার দেন এবং এখন হইতে এই দুইটি প্রভুর প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠে। গোবর্দ্ধন শিলাটির দিকে দৃষ্টি পড়িলেই প্রভুর মানসপটে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন লীলা স্ফুরিত হইয়া উঠিত। আর পরম প্রেমভরে গুঞ্জামালা গলায় পরিয়া শিলাখণ্ডটিকে সেবা করিতেন কৃষ্ণকলেবর জ্ঞানে। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অনেক সময় এই শিলাখণ্ড করিতেন মস্তকে ধারণ।

এই পবিত্র বস্তুদু'টি রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রঘুনাথ,

এই শিলা কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ। সাত্ত্বিকভাবে, নিষ্ঠাভরে, তুমি জল ও তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এঁর সেবা পূজা করো, অচিরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবে তুমি।”

তরুণ সাধক রঘুনাথের প্রতি প্রভুর এই কৃপা দেখিয়া নীলাচলের ভক্তেরা বিস্মিত হইয়া যান, ভজননিষ্ঠ রঘুনাথকে সবাই জানাইতে থাকেন সাধুবাদ।

পবিত্র শিলা বিগ্রহ তো পাওয়া গেল, কিন্তু ইহার পূজার জন্য সামান্য কিছু উপচার উপকরণ যে চাই। আসন, বস্ত্রখণ্ড ও দু'এক পয়সার খাজা সন্দেশও তো যোগাড় করিতে হইবে। কিন্তু কাঙাল রঘুনাথের কাছে তো একটি কানাকড়িও নাই। তবে উপায়?

এসময়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন স্বরূপ দামোদর। প্রভুর সেবক গোবিন্দকে বলিয়া এই উপচারগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তারপর প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, “রঘুনাথ, গোবর্দ্ধন-শিলা আর গুঞ্জামালা দান ক'রে প্রভু তোমায় কোন্ বিশেষ ইঙ্গিত দিলেন তা কি বুঝতে পেরেছো?”

রঘুনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিক্ষাগুরুর দিকে চাহিয়া আছেন। স্বরূপ দামোদর উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, “প্রভুর ইঙ্গিত হচ্ছে, কৃষ্ণ ভজন সফল করার জন্য তোমায় যেতে হবে গোবর্দ্ধন-শৈলে। আর গুঞ্জামালা অর্পণের মূল কথা হ'লো, এখন হতে তোমার স্থান হ'লো রাধারাণীর চরণে।”

রঘুনাথের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেন, “প্রভু কেন আমার ওপর এত নির্দ্দয়? কেন আমায় বৃন্দাবনে গিরি গোবর্দ্ধনে পাঠাচ্ছেন? আমি যে বালক বয়স থেকে প্রভুকেই করেছি আমার ধ্যানের ধন, জীবনের ধ্রুবতারা। বৃন্দাবনের ঘনীভূত রূপ যে আমি প্রভুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ প্রভুর মধ্যেই যে আমি দেখেছি, আর তাঁর এই তত্ত্বই যে এতদিন অনুধ্যান ক'রে আসছি।”

“না—রঘুনাথ, তোমার ভয় নেই। এখনি প্রভু তোমায় বৃন্দাবনে যেতে বলছেন না। যাবে তুমি পরবর্ত্তীকালে, তোমার তপস্যার

শেষ পর্য্যায়ে। এখন পরমানন্দে প্রভুর সাহচর্য্য তুমি করো, ব্রজরস সাধনার যে সব অত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রভুকে কেন্দ্র ক'রে দিনের পর দিন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ করো, তোমার ভজনময় জীবনকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোল।"

বিস্ময়কর ত্যাগ তিতিক্ষা যেমন ছিল রঘুনাথের, তেমনি ছিল অসামান্য ভজননিষ্ঠা। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি অতিবাহিত করিতেন ভজন পূজন, রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা, আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষীভূত লীলা দর্শনে। প্রেমভক্তির মহাসমুদ্র প্রভু শ্রীচৈতন্য। সেই মহাসমুদ্রের বক্ষে দিনের পর দিন নৃত্য করিতেছে অগণিত ভাবতরঙ্গ, এই তরঙ্গভঙ্গ প্রভুকে উত্তাল করিয়া তুলিতেছে। কখনো মিলনের আনন্দে হাসিতেছেন, গাহিতেছেন, নাচিতেছেন। কখনো বা বিরহের শোকে হইতেছেন মুহ্যমান। এই ভাবতরঙ্গের মোহন লীলা যেমন অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ প্রভৃতির হৃদয়কে নাচাইতেছে,—তেমনি উদ্বুদ্ধ করিতেছে রঘুনাথ প্রভৃতি ভজননিষ্ঠ নবীন ভক্তদের।

প্রভুর এসময়কার অলৌকিক প্রেমলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা রঘুনাথ। স্বরূপ ছিলেন প্রভুর সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী ও তাঁহার মহাভাবের সূত্রকার, আর এই পরম নিগূঢ় সূত্রের বৃত্তিকার হইলেন রঘুনাথ।

দিনের বেলায় প্রভুর সান্নিধ্যে থাকিয়া রঘুনাথ তাঁহার অপার অনন্ত ভাবশাবল্য প্রত্যক্ষ করিতেন। গভীর রাত্রিতে প্রভু গম্ভীরা-গর্ভে বসিয়া মহাভাবের যে লীলানাট্য উদ্‌ঘাটিত করিতেন, তাহাতে প্রবেশাধিকার ছিল না বটে, কিন্তু এই লীলানাট্যের মর্ম্মকথা রঘুনাথ দিনের পর দিন শুনিতেন তাঁহার শিক্ষাগুরু স্বরূপ দামোদরের মুখে। ভজননিষ্ঠা আর ইষ্টকৃপার ফলে ভক্ত রঘুনাথের অন্তর্জ্জীবন প্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা-মাধুর্য্যের রসে রসায়িত হইয়া উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের পরমোদয় দেখা দেয় তাঁহার সাধন-সত্তায়।

ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ নীলাচলে প্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেন,

প্রভুর কৃপা আর স্বরূপ দামোদরের শিক্ষায় এসময়ে তাঁহার জীবন-তপস্যা সফল হইয়া উঠে। ইহার পর আসে শোকাবহ বিচ্ছেদের পালা। নীলাচলের লীলানাট্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া প্রভু হন অন্তর্দ্ধান। প্রভু-সর্ব্বস্ব স্বরূপ দামোদর এই বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, অল্পদিনের মধ্যেই ত্যাগ করেন এই মর্ত্ত্যধাম।

পর পর দুইটি নিদারুণ শোকের আঘাতে ভক্তপ্রবর রঘুনাথ উন্মত্তের মত হইয়া উঠেন। কয়েকদিনের মধ্যে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালাটি ঝুলিতে পুরিয়া রওনা হন তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে। মনে মনে স্থির করেন, সেখানে গিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ দুই প্রবীণ পার্ষদ সনাতন ও রূপের চরণে দণ্ডবৎ করিবেন, তারপর এই মরদেহ ত্যাগ করিবেন ভৃগুপাত করিয়া। পুণ্যগিরি গোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ঝাঁপ দিয়া পাড়িয়া এবার তিনি ছেদ টানিয়া দিবেন বিরহখিন্ন অকিঞ্চিৎকর জীবনে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় অন্ত্যলীলা দর্শন ও অন্তরঙ্গ সেবনের পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাই সেখানকার গোস্বামীরা ও ভক্তেরা অধীর হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

সনাতন ও রূপ তাঁহাকে বহুতর প্রবোধ দিলেন, কহিলেন, "রঘুনাথ, আমরা দুই ভাই প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পড়ে আছি। তুমি হচ্ছো আমাদের আর এক ভাই। এসো তিন ভাইয়ে মিলে বৃন্দাবনে প্রভুর আদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করি। তাছাড়া, তুমি ভৃগুপাত ক'রে দেহত্যাগ করলে প্রভুর শ্রেষ্ঠলীলা গম্ভীরালীলার কথা আমরা কার মুখ থেকে শুনবো? প্রভুর অন্ত্যলীলায় মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই পরম লীলাতত্ত্ব স্বরূপ দামোদর তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ ক'রে স্বরূপ তোমায় নিজের কাছে রেখে বিশেষভাবে প্রভুর লীলাতত্ত্ব বুঝিয়েছেন। তুমি নিজেও সেই লীলা দর্শন করেছো, তার মাধুর্য্যে অবগাহন করেছো। সেই পুণ্যকথা ও পুণ্যতত্ত্বই তো তোমার মুখে আমরা শুনতে চাই।"

সনাতন ও রূপের স্নেহের বন্ধনে রঘুনাথ বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে থাকিয়া ব্রজরস-সাধন করিতে হইবে এই ইঙ্গিত প্রভু শ্রীচৈতন্য বহু পূর্ব্বে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ তাই এবার কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া শুরু করেন প্রভু-নির্দ্দিষ্ট সাধনা, এই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হইতে থাকে তাঁহার চিরাচরিত বৈরাগ্যময় তপস্যা।

নীলাচলে থাকিতে রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসিয়া প্রভুর নিগূঢ় প্রেমলীলার কথা আলোচনা করিতেন, তাঁহার মুখে এই লীলার মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব শ্রবণ করিতেন। এবার বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি লাভ করিলেন মহাপ্রেমিক সাধক রূপগোস্বামীর স্নেহময় সান্নিধ্য। প্রভুর মাধুর্য্যরস উদ্‌ঘাটনে রূপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি' মাধুর্য্যময় সাধনা ও নিগূঢ় প্রেমরহস্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সমুজ্জ্বল। শ্রীরূপ যেমন তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিতেন, রঘুনাথও তেমনি বর্ণনা করিতেন মহাভাবময় জীবনের বহু রোমাঞ্চকর দৃশ্য। তাই উভয়ের মধ্যে এসময়ে গড়িয়া উঠে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্বন্ধ। প্রেমভক্তিসিদ্ধ রূপ গোস্বামী মধুর রসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনে পারদর্শী। এখন হইতে রঘুনাথের সাধন জীবনে তিনি গ্রহণ করেন স্বরূপের স্থান।

শ্রীচৈতন্যের লীলা কাহিনী শোনার জন্য, স্বরূপ ও রামানন্দের প্রেমতত্ত্ব শোনার জন্য, বৃন্দাবনের প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর ভক্তেরাই রঘুনাথের কুটিরে আসিতেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন রঘুনাথের একান্ত অনুগত। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধনমার্গের উচ্চতর অনুভূতি। শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও তাঁহার মর্য্যাদা ছিল অপরিসীম। ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, মাধুর্য্য রসের সাধনায় ব্রতী হন। কৃষ্ণদাস প্রায় সময়েই রঘুনাথের সান্নিধ্যে থাকিতেন, সুযোগ পাইলেই তাঁহার সেবা যত্নে নিজেকে করিতেন নিয়োজিত। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ উত্তরকালে রঘুনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

---

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রকৃত দীক্ষাগুরু কে, এ সম্পর্কে নিঃসংশয়িত প্রমাণ নাই। কেহ বলেন তাঁহার গুরু ভট্ট গোস্বামী, কেহ বলেন রূপ গোস্বামী।

রঘুনাথের সঙ্কল্প, গোবর্দ্ধনে গিয়া কঠোর তপস্যায় তিনি ব্রতী হইবেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে কাটাইয়া দিবেন অবশিষ্ট জীবন। রূপ গোস্বামী এবার আর তাঁহাকে বাধা দিলেন না। শুধু কহিলেন, "গোবর্দ্ধনে যাচ্ছো, যাও। কিন্তু, সদাই তুমি থাকো ভাবোন্মত্ত, বাহ্য-জ্ঞান প্রায়ই হয় তিরোহিত। এ অবস্থায় তো দেহ থাকবে না। কৃষ্ণদাস তোমার সঙ্গে থাকবে, তোমার সেবা করবে।"

রূপ গোস্বামীর কথা অমান্য করার উপায় নাই। কৃষ্ণদাসকে তাই সঙ্গে নিতে হইল। অতঃপর পদব্রজে কয়েক দিনের মধ্যে উভয়ে উপনীত হইলেন গোবর্দ্ধনে। এই গোবর্দ্ধনেই রঘুনাথের সেবক ও নিত্যসঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতের মহামূল্যবান তথ্যসমূহ প্রাপ্ত হন, আপন কবিত্ব ও প্রেমানুভূতির বলে রচনা করেন অমর গ্রন্থ—চৈতন্যচরিতামৃত।

গোবর্দ্ধনের পাদদেশে রহিয়াছে গৌড়ীয় ভক্তদের পরম শ্রদ্ধার উপবেশন ঘাট। এই ঘাটে বসিয়াই একদিন ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীচৈতন্য শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রভুর উপবেশন ঘাটে বার বার দণ্ডবৎ জানাইয়া রঘুনাথ আশ্রয় নেন এক বৃক্ষতলে। এখানেই শুরু তাঁহার নূতনতর তপস্যা।

সনাতন গোস্বামী তখন নিকটেই বৈঠান নামক স্থানে সাধন ভজন করিতেছেন। তিনি তখন অতিশয় বৃদ্ধ, খুব প্রয়োজন না থাকিলে চলাফেরা বড় একটা করেন না। পরম স্নেহভাজন রঘুনাথের আগমনের কথা শুনিয়া সনাতন ছুটিয়া আসিলেন। দুই ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল।

তবে কৃষ্ণদাসের লেখা অনুযায়ী এবং ভক্তিরত্নাকরের মতে, রঘুনাথই তাঁহার গুরু : শ্রীমৎ দাসগোস্বামী—রসিকমোহন।

দীক্ষাগুরু না হইলেও তাহার প্রধান শিক্ষাগুরু বা "সারগুরু যে রঘুনাথ তাহাতে বিতর্কের অবকাশ নাই : চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা—রাধাগোবিন্দ নাথ।

সনাতন উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "রঘুনাথ এস্থানে তপস্যা করবে বলে এসেছো, তা ভালই। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে, তোমায় এভাবে বৃক্ষতলে বাস করতে দেব না। তোমার জীবন মহাপ্রভুর আশিসপূত, তোমার কণ্ঠে রয়েছে তাঁরই মাধুর্য্য লীলার স্তবগান, লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের কল্যাণের জন্য তোমায় আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে।"

"আমি কাঙাল বৈষ্ণব, আমার জন্য বৃক্ষতলের আশ্রয়ই তো যথেষ্ট, প্রভু।" করজোড়ে নিবেদন করেন রঘুনাথ।

"না রঘুনাথ তা হয় না। এখানে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তুমি ভজনময় জীবন যাপন করো। এখানকার চারদিকের অরণ্যে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অভাব নেই। বৃক্ষতলে রাত্রিকালে বাস করা সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, তোমার এখন বয়স হয়েছে, কুটিরের আশ্রয় নেওয়াই দরকার।"

সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া সনাতনের সে অঞ্চলে খ্যাতি আছে। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া ভক্ত গ্রামবাসীরা দলে দলে সেখানে সমবেত হইতে থাকে। সনাতনের আদেশে তখনি সবাই মিলিয়া পর্ণকুটির বাঁধিয়া ফেলে, রঘুনাথ ও তাঁহার সেবক কৃষ্ণদাস যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সনাতনের কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা নবাগত সাধক রঘুনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে থাকে।

যেস্থানে ভজন কুটিরটি তৈরী করা হয় তাহার নাম অরিট গ্রাম। জনশ্রুতি আছে, অরিস্ট নামে এক অসুর বৃষের রূপ ধরিয়া ব্রজমণ্ডলে দৌরাত্ম্য শুরু করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এই স্থানটিতে তাহাকে বধ করেন। অসুর বধের পর্ব্ব তো শেষ হইল, কিন্তু এসময়ে শ্রীমতী রাধারাণী এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকে তিনি কহিলেন, "বৃষরূপী অসুর তুমি বধ করেছো, এর ফলে হয়েছো মহাপাপের ভাগী। সর্ব্বতীর্থের জলে স্নান না করলে তো তোমার এ পাপ মোচন হবে না।"

চাতুর্য্য ও পরাক্রমে কৃষ্ণ অদ্বিতীয়। তখনি সহাস্যে তিনি পদাঘাত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত করিলেন সর্ব্বতীর্থের পুণ্যময়

সলিল ধারা। তাহার ফলেই সৃষ্ট হয় এই অঞ্চলে পবিত্র শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড।

গিরি গোবর্দ্ধনের পাদদেশেই রহিয়াছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। প্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহার গোবর্দ্ধন পরিক্রমার কালে, ভাবাবেশে মত্ত থাকা অবস্থায়, এই কুণ্ড দুইটি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন কুণ্ড এ সময়ে মজিয়া গিয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছে নীচু ধানের ক্ষেত রূপে। প্রভুর আবিষ্কৃত পুণ্যময় কুণ্ডের সঠিক অবস্থান রঘুনাথ তাঁহার ধ্যানবলে নির্ণয় করিলেন। কিন্তু কুণ্ডের অবস্থান জানিলেই তো কাজ হইবে না, গভীর করিয়া এ দুটিকে খনন করা দরকার। সারা ভারতের ভক্ত জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করা দরকার।

রঘুনাথ নিজে কাঙাল বৈষ্ণব, সরোবর খননের অর্থ কোথায় পাইবেন? তাই খেদের তাঁহার পরিসীমা রহিল না।

নিত্যকার ধ্যান ভজন শেষে, ইষ্টদেবের কাছে, সজল নয়নে রঘুনাথ নিবেদন করেন অন্তরের আকুতি, "হে প্রভু, করুণাসিন্ধু, পরম পবিত্র কুণ্ড দুটির আবির্ভাব তুমি সম্ভব ক'রে তোল। লক্ষ লক্ষ ভক্তের উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের এই আর্ত্তি বিফলে যায় নাই। ভক্তবৎসল প্রভু অচিরে ইহার ব্যবস্থা করিলেন।

সেদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমণের শেষে রঘুনাথ উপবেশন ঘাটে বিশ্রাম করিতেছেন, অন্তরে বার বার উঠিতেছে চিন্তার তরঙ্গ— 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন ব্যবস্থা আজো সম্ভব হয়ে উঠেনি। এ যে তাঁর বড় সাধের কাজ!'

এমন সময়ে এক পশ্চিমদেশীয় ধনী বৈষ্ণবভক্ত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানায়। করজোড়ে নিবেদন করে, "বাবাজী, আপনিই কি গোস্বামী রঘুনাথদাস?"

"হ্যাঁ বৎস, আমিই গোস্বামীদের দাস—রঘুনাথ। কোথা থেকে তুমি আসছো। কি প্রয়োজন আমার কাছে, বল। সাধ্যমত আমি তা করতে চেষ্টা করবো।" শান্ত স্বরে উত্তর দেন রঘুনাথ।

"প্রভু, আপনার কাছে একটা জরুরী কাজে আমি এসেছি। এখন সোজা আসছি বদরিনারায়ণ থেকে। প্রভু নারায়ণজীর কাছে পূজার মানৎ ছিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে, সাড়ম্বরে তাঁর পূজো দেবো ব'লে বদরিনাথে পৌঁছালাম। সেই রাত্রেই প্রভুজী স্বপ্নে দিলেন প্রত্যাদেশ—এখানকার পূজোয় বেশী অর্থ ব্যয় করার তোমার প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পূজো সম্পন্ন করো, তারপর সোজা চলে যাও ব্রজমণ্ডলের অরিট গ্রামে। সেখানে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথদাস চিন্তিত হয়ে পড়েছে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের খনন কাজের জন্য। ব্যয়সাপেক্ষ এ কাজটি তুমি ক'রে দাও। রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করো। এই জন্যেই আপনার কাছে আমি এসেছি।"

রঘুনাথের নয়ন দুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার অন্তরের আকুতি শুনিয়াছেন। নিজেই সব কিছুর ব্যবস্থা তাই করিয়াছেন।

অচিরে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, এবং তলদেশ উত্তমরূপে খনন করিয়া পরিণত করা হয় স্নিগ্ধ সরোবরে। এই জলপূর্ণ পবিত্র কুণ্ডদ্বয়ের মহিমার কথা এসময়ে ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। হাজার হাজার ভক্ত নরনারী এখানে আসিয়া পুণ্যস্নান সম্পন্ন করিতে থাকে। এখন হইতে রঘুনাথ অভিহিত হইতে থাকেন রাধাকুণ্ডের দাস গোস্বামী নামে।

রঘুনাথের পর্ণকুটিরটি ছিল রাধাকুণ্ডের অতি নিকটে। অতঃপর তাঁহার তপঃপ্রভাবে এই কুটিরকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে নির্ম্মিত হয় বহুতর বিগ্রহ-মন্দির, ঘাট ও ভজন কুটির। গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি এই অঞ্চলে বসিয়া ভজন সাধন করিতেন। বিশেষ করিয়া রঘুনাথের সাধন-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া আরো বহু বৈষ্ণব সাধক এখানে ভজন কুটির স্থাপন করেন এবং রাধাকুণ্ড ক্রমে পরিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনে।

নীলাচলের মত রাধাকুণ্ডে থাকিতেও রঘুনাথ তাঁহার কৃচ্ছ্রব্রত

ও ভজননিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসিতে দেন নাই। পাষাণের রেখার মত স্থির অবিচল ছিল তাঁহার এই দৈন্য-বৈরাগ্যময় সাধনার ক্রম। কখনো কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় হওয়ার উপায় ছিল না। সদাসঙ্গী ও ভক্তশিষ্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার এই দিনচর্য্যার বর্ণনা দিয়াছেন :

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥
রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে॥

(চৈ, চৈ, আদি, ১০ম)

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ও যুগল লীলার মানস পূজা ছিল রঘুনাথের প্রেম সাধনার মূল উপজীব্য। রসরাজ কৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি, মহাভাবময়ী শ্রীরাধা, সতত প্রোজ্জ্বল থাকিতেন তাঁহার সাধন সত্তায়। রাধাকৃষ্ণের এই মিলিত মাধুর্য্যমূর্ত্তি তিনি দর্শন করিতেন ইষ্টদেব প্রভু-শ্রীচৈতন্যের মধ্যে।

'অন্তরঙ্গ সেবা' বা সখী বা মঞ্জরী রূপে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবায় রঘুনাথ ছিলেন সিদ্ধকাম। এই সাধনার বিভিন্ন স্তরে যে দুরবগাহ ভাবময়তা ও প্রেমোন্মাদনা তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিত, ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে তাহা ছিল পরম বিস্ময়কর।

"রঘুনাথ ছিলেন বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তি, অর্থাৎ শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ বা বিরহদশায় তাঁহার সখীগণ যেভাবে তাঁহার প্রতি সমদুঃখিনী হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন, রঘুনাথ ও অন্তর্দ্দশায় সেইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। সে সময়ে কেহ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে, তাঁহার আত্মবিস্মৃত ভাবের উত্তর হইতে উহা বুঝা যাইত। এই অবস্থার কথাই ভক্তমালে আছে—

আহার নিদ্রা নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥

"রূপগোস্বামী ললিত মাধব নাটক রচনা করিয়া রঘুনাথকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এই নাটকে বিপ্রলম্ভ লীলা অতি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রঘুনাথ সে পুস্তক পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়া গেলেন। এই জন্য তাঁহার সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ ব্যগ্রতা সহকারে "দানকেলি-কৌমুদী" নামক ভাণিকা প্রণয়ন করিয়া তাঁহার করে অর্পণ করেন। প্রতিষেধক ঔষধের মত উহাতে পূর্ব্ব উপদ্রবের নাশ হইল, পুস্তক পাইয়া রঘুনাথ সুস্থ ও সুখী হইলেন। শ্রীরূপ গ্রন্থারম্ভ ও উপসংহারের আশীর্ব্বচনে এই কথার সুন্দর আভাষ দিয়াছেন।

"একজন কেহ শ্রীভগবানের উদ্দেশে কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলে, তাঁহার তপঃপ্রভাবে চারিদিকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যে যেখানে থাকেন, মনে প্রাণে সেই সাধকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ না হইলে তাঁহারা যেন স্থির হইতে পারেন না। একজনের জন্য সমগ্র দেশ উন্নত হয়, ধন্য হয়, পুণ্যময় হয়। সেইরূপ রঘুনাথের সাধনার ফলে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে সকলের প্রাণে এক নূতন ভাব-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। রূপ সনাতন যত দিন ধরা-ধামে ছিলেন, দৈহিক অশক্ততা ভুলিয়া সময়ে সময়ে ছুটিয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন; গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব ও ভূগর্ভ গোস্বামী তাঁহার নিকটেই ভজন-কুটিরে থাকিতেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তেরা যে যখন শ্রীধামে আসিতেন, রঘুনাথের দর্শন ও সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন।[১]"

রঘুনাথের অকৃত্রিম ভজননিষ্ঠা ও প্রেমসাধনার সিদ্ধি তাঁহাকে সারা ব্রজমণ্ডলে বরণীয় করিয়া তোলে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ লীলার এক মরমী ব্যাখ্যাতা রূপেও তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে সাধক রঘুনাথের অন্যতম অবদান তাঁহার রসমধুর

১ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী : সতীশচন্দ্র মিত্র

স্তবাবলীর উল্লেখ করিতে হয়[১]। অন্তরঙ্গ সেবনের মধ্য দিয়া যখন তাঁহার প্রাণে প্রেমের আকুতি জাগিয়া উঠিত, অন্তর-পুরুষ তখন দুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেন। সুললিত এবং ভাবময় স্তবরাশি নির্গত হইত এই ভজনসিদ্ধ মহাপুরুষের কণ্ঠে হইতে। এই স্তবাবলী প্রমাণিত করে যে তিনি দিব্যলীলা দর্শনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলেন এক প্রতিভাধর কবি ও শাস্ত্রবিদ্ সাধক। আজো ইহা অগণিত ভক্তের সাধনপথের পরম পাথেয় হইয়া আছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থ রঘুনাথ রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহা বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র সমাদৃত।[২]

ভজন সিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধি রঘুনাথ লাভ করিয়াছেন, অন্তরঙ্গ সেবার কালে ব্রজের মাধুর্য্য-লীলা দর্শনে হইতেছেন আপ্তকাম। কিন্তু তবুও দৈন্যময় সাধনার পথে তাঁহার সতর্কতার বিরাম নাই। অশনে বসনে, আচার ব্যবহারে বৈরাগ্য সাধনার সেই পাষাণের রেখা ঠিক তেমনি রহিয়াছে অবিচল।

নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। রঘুনাথের কল্যাণ কামনা নিয়া এই মাতৃস্বরূপা সাধিকা কিছুদিন রাধাকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। এসময়ে তাঁহার কাছে নৈষ্ঠিক বৈরাগী রঘুনাথ নিজের সম্পর্কে যে আর্ত্তি প্রকাশ করেন তাহার তুলনা বিরল। বহু বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়, পরম শ্রদ্ধেয়, এই সিদ্ধ বৈষ্ণব সজল নয়নে বলিতেছেন :

বিষয়ীর ঘরে জন্ম বাঁসো লাজ ভয়।
কি গুণে চৈতন্য পদ দিবেন অভয়॥

১ শ্রীমৎ দাস গোস্বামী : রসিকমোহন। এই গ্রন্থে রঘুনাথের সংস্কৃত স্তবের সুললিত অনুবাদ দেওয়া আছে।

২ অপর গ্রন্থগুলির নাম—শ্রীনাম চরিত, মুক্তাচরিত এবং দানকেলি-চিন্তামণি। স্বরূপ ও দামোদরের প্রখ্যাত কড়চার বৃত্তিকার রূপেও রঘুনাথ ভক্তসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাছাড়া, পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত তিনটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

একদিন না করিনু চরণ সেবন।
তথাপি চরণ মাঁগো হেন দীনজন॥
জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥

(প্রে, বি, ১৬শ বিলাস)

এই আর্ত্তি ও দৈন্য এখনো কেন রহিয়াছে ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথের ? ব্রজরস সাধনার উত্তম অধিকারী মাত্রেই তাঁহার ঐ উক্তি হইতে বুঝিয়া নিবেন, বৈরাগ্যের নিষ্পেষণে মহাসাধক রঘুনাথ নিজের অহমিকাকে দিনের পরদিন অবলুপ্ত করিয়া দিতেছেন, আর কৃষ্ণ-অনুরাগের ভাণ্ডটিকে করিতেছেন প্রশস্ততর।

নীলাচলে থাকিতেই রঘুনাথের কৃচ্ছ্র চরমে উঠে। সাধন জীবন তাঁহার অব্যাহত রাখিতে হইবে, শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া নামমাত্র আহার্য্য সারাদিনের পর গ্রহণ করিতেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রকট হইবার পর অন্ন তিনি একেবারে ত্যাগ করেন, সামান্য ফল ও দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে থাকেন।

বৃন্দাবনে আগমনের পর আহার আরও হ্রাস পায়। দুই একটি ব্রজফল এসময়ে খাইতেন, আর দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতেন অল্প পরিমাণ ঘোল।

রাধাকুণ্ডের তপস্যাময় জীবনে তো আহার্য্য সম্বন্ধে কোন হুঁসই তাঁহার থাকিত না। সারা দিন ও রাতের বেশী সময়ই থাকিতেন ভজনে ও ভাবাবেশে। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্ণদাস এবং অপর একটি ব্রজবাসী ভক্ত সুযোগ মত পাতার দোনা করিয়া তাঁহার মুখে কিছুটা ঘোল ঢালিয়া দিতেন। এই ধরণের কৃচ্ছ্র চলিতে থাকে প্রায় বিশ বৎসর ব্যাপিয়া।

অতঃপর বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামীদের মধ্যমণি সনাতন তনু ত্যাগ করেন। অগ্রজ প্রতিম এই মহাবৈষ্ণবের তিরোধানে রঘুনাথ শোকে হন মুহ্যমান। তারপর আসে আর এক দুর্দ্দৈব। রূপ গোস্বামীও ভক্ত বৈষ্ণবদের মায়া কাটাইয়া মরধাম হইতে অন্তর্হিত হন। গুরু-স্থানীয় এই সিদ্ধপুরুষের প্রয়াণের কথা শুনিয়া রঘুনাথ বেশ কিছুদিনের

জন্য অন্নজল ত্যাগ করেন। এসময়ে তাঁহার দেহটি বাঁচাইয়া রাখা হয় কৃষ্ণদাস প্রভৃতি ভক্তদের এক বড় সমস্যা।

বিস্ময়ের কথা এই শোকজর্জ্জর অবস্থায়, অনশনরত, ক্ষীণতনু, মহাসাধকের নিয়মিত ভজন পূজন ও অন্তরঙ্গ সেবায় কিছুমাত্র ব্যত্যয় দেখা যায় নাই।

অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥
যদ্যপিও শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাপয়॥
নিয়ম-নির্ব্বাহ যৈছে যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে॥

(ভ, র, ষষ্ঠ ও ১১শ তরঙ্গ)

প্রেমঘন মূর্ত্তি রঘুনাথ গোস্বামীর চরণতলে এসময়ে অনেক সাধকই আসিয়া উপবেশন করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে রঘুনাথগত-প্রাণ ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তিনি সিদ্ধ মহাত্মা রঘুনাথের সাহচর্য্য করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে দিনের পর দিন শুনিয়াছেন গম্ভীরালীলার মহাভাবের কথা, রাধায়িত মহাপ্রভুর প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা।

আজিও কল্পনা করা যায়: ভজন কুটিরের এক প্রান্তে ঘৃতের প্রদীপটি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সেই সঙ্গে মিটিমিটি জ্বলিতেছে সিদ্ধ মহাবৈষ্ণব রঘুনাথের যুগলভজনময় জীবনের স্নিগ্ধমধুর দীপশিখা— যে শিখা শত শত বৎসর ব্যাপিয়া অগণিত ভক্ত নরনারীর হৃদয়ে বিছাইয়া দিয়াছে মধুর রসের, উজ্জ্বল রসের স্নিগ্ধ প্রলেপ—মানুষকে ঊর্দ্ধায়িত করিয়াছে বৈকুণ্ঠের দিকে, অপ্রাকৃত ব্রজধামের দিকে। আর সেই দীপ শিখারই মৃদু আলোকে, সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিতেছেন ব্রজরস সাধনার এক নূতন কাহিনী-কথা। তাঁহার প্রাণ-প্রিয় মহান্ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন তিনি গোস্বামী রঘুনাথের দিব্য প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত হইয়া।

আরও কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়। গোস্বামী রঘুনাথ এবার আসিয়া দাঁড়ান তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। বয়স তখন তাঁহার প্রায় চুরানব্বই বৎসর। আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশীর পরম লগ্নটি সেদিন আসিয়া যায়। ১৫১৪ শকের[১] চিহ্নিত ক্ষণটিতে আপ্তকাম মহাসাধক রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলায়।

রাধাকুণ্ডের ভজনকুটিরের কম্পমান দীপশিখাটি সেদিন নিভিয়া যায়; আবার বুঝি নূতন করিয়া দিব্যরূপে জ্বলিয়া উঠে রাধামাধবের অপ্রাকৃত মহাধামে।

১ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবনচরিত—অচ্যুতচরণ চৌধুরী। দ্রঃ রঘুনাথ গোস্বামীর মৃত্যু সাল সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলার উপায় নাই। চৌধুরী মহাশয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই সালের কথা লিখিয়াছেন।

সাধু নাগমহাশয়

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই পার্ষদ, বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়, সম্বন্ধে কবিবর গিরিশ ঘোষ দুইটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এ উপমার মধ্য দিয়া এই দুই মহাপুরুষের সাধনসত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে। গিরিশ বলিয়াছেন, "নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যতই তিনি কষে বাঁধেন, ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়িতে কুলোয় না। শেষটায় নরেন এত বড় হ'লো যে মায়া তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো। নাগমশাইকেও মহামায়া বাঁধতে গেলেন। কিন্তু যতই তিনি বাঁধেন, নাগমশাই ততই সরু হয়ে যান। ক্রমে এমন সরু হন যে মহামায়ার জাল গলিয়ে অবলীলায় বেরিয়ে পড়েন।"

অধ্যাত্মক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা, রামকৃষ্ণ-প্রতিভূ স্বামীজী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত। তাঁহার জীবন তথ্য অনেকেরই অবিদিত নয়। কিন্তু ভক্তপ্রবর দুর্গাচরণ নাগ আজীবন ছিলেন আত্মগোপন প্রয়াসী, তাই তাঁহার পুণ্যজীবনের কথা জানিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় নাই। মহামায়ার মায়ার জাল এড়াইবার সাথে সাথে নাগমশাই আশে-পাশের মানুষের দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। দৈন্যময় ভক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ। অপূর্ব্ব ভক্তিবলে নিজেকে যেমন করিয়া তোলেন রামকৃষ্ণময়, তেমনি সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিতে থাকেন রামকৃষ্ণসত্তার পুণ্যময় প্রকাশ। বিবাহিত জীবনের ত্যাগে ও সংযমে, গার্হস্থ্য জীবনের পুণ্যময়তায় তাঁহার জীবন হইয়া ওঠে দিব্য মহিমায় ভরপুর। স্বামী বিবেকানন্দকে তাই একদিন ভাবগদ্গদ কণ্ঠে বলিতে শুনা গিয়াছিল, "পৃথিবীর এত দেশ দেখে এলাম, কিন্তু নাগমশাইর মত মহাপুরুষ একজনও চোখে পড়লো না।"

পূর্ব্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছেই দেওভোগ গ্রাম। এই গ্রামে,

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট দুর্গাচরণ ভূমিষ্ঠ হন। পিতা দীনদয়ালের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। কলিকাতায় কুমারটুলীর পালচৌধুরীদের গদিতে থাকিয়া সামান্য কাজ করেন। পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেশে বাস করিয়া পুত্র দুর্গাচরণ ও কন্যা সারদাকে কোনমতে মানুষ করিতে থাকেন।

দুর্গাচরণের বয়স তখন আট বৎসর। রোগজীর্ণ দেহ নিয়া জননী হঠাৎ একদিন লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। বালক পুত্র ও কন্যার লালন পালনের সমস্ত কিছু ভার পড়ে পিসীমা ভগবতী দেবীর উপর। পিসীমারই স্নেহ যত্নকে অবলম্বন করিয়া দুর্গাচরণের প্রথম জীবন গড়িয়া উঠে।

পিতা দীনদয়াল ছিলেন বড় ধর্ম্মভীরু ও নির্লোভ। সামান্য কর্ম্মচারী হইলেও পালচৌধুরীরা তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন, ঘরের লোকের মত ভাবিয়া বিশ্বাসও কম করিতেন না।

দীনদয়ালের ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোভহীনতার নানা কাহিনী রহিয়াছে। সে-বার পালচৌধুরীদের এক নৌকা-ভর্ত্তি নূনের চালান নারায়ণগঞ্জে যাইতেছে। দূর নৌকাপথে বিপদ যথেষ্ট, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী না হইলে চলে না। তাই দীনদয়ালকেই এ কাজের ভার দেওয়া হইল।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়া নৌকা চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া উঠে। কাছে দুই চারিটি বসতি দেখিয়া নৌকা এক জায়গায় নোঙর করা হয় এবং দীনদয়াল সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে থাকেন। অতি প্রত্যূষে নীচে নামিয়া তিনি শৌচে গিয়াছেন, মাটি হাতড়াইতে গিয়া হঠাৎ কি একটা শক্ত ভারি বস্তু আঙুলে ঠেকিল। খুঁড়িয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা ঘড়া, সোনার মোহরে উহা পূর্ণ।

দীনদয়াল ত্রস্তেব্যস্তে নৌকায় ছুটিয়া আসিলেন। মাঝিদের কহিলেন, "ওরে, শিগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দে, এখানে যেন বিপদের আভাষ পাচ্ছি।" তৎক্ষণাৎ নৌকা ভাসানো হইল, আর মোহরের ঘড়া হইতে দূরে আসিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পরে এ কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, "কবে কোন ব্রাহ্মণ এ ঘড়ায় মোহর পুঁতে রেখেছে কি না কে জানে? শেষটায় কি ব্রহ্মস্ব

অপহরণের পাপ মাথায় নেবো? পাছে নিজেরই অজ্ঞাতে মনে লোভ আসে, এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয়, তাই ছুটে পালিয়ে এলাম।"

এমনি সততা ও ধর্ম্মপরায়ণতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন নাগমশায়ের পিতা।

নারায়ণগঞ্জের বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর বেশী পড়ানো হয় না। এ পড়া বালক দুর্গাচরণের শেষ হইল। এবার সমস্যা—কোথায় তিনি পড়িবেন? কাছাকাছি স্কুল কোথাও নাই। বালক পিতাকে ধরিয়া বসিল, কলিকাতায় সে পড়িতে যাইবে। কিন্তু দীনদয়াল রাজী হন না। তাঁহার যে আয় তাহাতে নিজের খরচ চালাইয়া পুত্রকে পড়ানো সম্ভব নয়।

দুর্গাচরণ কিন্তু হটিবার পাত্র নন, লেখাপড়ার ঝোঁক তখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। স্থির করিলেন, দশ মাইল দূরে ঢাকায় গিয়া পড়িবেন। কাজটি বালকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়। যাতায়াতে দুইবেলা প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পিসীমার নয়নাশ্রু, সঙ্গীসাথীদের বারণ, কোন কিছুই সেদিন তাহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি পড়াশুনা শুরু করিয়া দিলেন।

শীতাতপ, ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যায়, দৃঢ়চিত্ত বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই, হাঁটিয়া একাকী নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যোগ দিতে থাকে। এই অধ্যয়নস্পৃহা ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া একটি শিক্ষকের বড় দয়া হয়। দুর্গাচরণকে ডাকিয়া বলেন, "বাছা, কষ্ট ক'রে দূর পথে যাতায়াত না ক'রে তুমি আমার বাসায়ই এসে থাকো। যা হয় কষ্ট ক'রে আমার চলে যাবে।"

এ প্রস্তাবে বালক কিন্তু রাজী হয় নাই। নিত্যকার পথশ্রান্তিকে গুরুত্ব না দিয়া অবলীলায় কহিল, "রোজ এই কয় মাইল হাঁটতে আমার তেমন কষ্ট হয় না। আপনি সেজন্য ভাব্‌বেন না।"

দুর্গাচরণ ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। পিসীমা তাহার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাতৃহীন দুর্গাচরণের লালন পালনের ভার তাঁহারই উপর। এবার তাহাকে সংসার

জীবনে ব্রতী করিতে পারিলে তবে তাঁহার স্বস্তি। উদ্যোগী হইয়া তিনি তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এগারো বৎসর বয়স্কা কন্যা প্রসন্নকুমারীকে বধূ রূপে ঘরে আনা হইল।

বিবাহের কয়েকমাস পরের কথা। নাগমশাই কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন। এখানে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিনি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা ঘটনার আবর্তে পড়িয়া এই ডাক্তারী পড়া তাঁহাকে ছাড়িতে হয়।

অতঃপর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর অধীনে থাকিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিতে থাকেন।

বিবাহের পর নাগমশাইকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। ইহার পর দুই তিনবার তিনি বাড়ী গিয়াছেন, কিন্তু এযাবৎ স্ত্রীর সাথে আলাপ পরিচয় কিছু হয় নাই। সংসার জীবনের উপর, দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর, এক সহজাত বীতরাগ নিয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছেন। নববধূর সান্নিধ্যে আসিলেই নাগমশাই বড় ভীত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ রাত্রি ঘনাইয়া আসিলেই তাঁহাব মনে আসে এক আতঙ্ক। স্ত্রীর সহিত কি করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন, ইহাই হইয়া উঠে বড় সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গে এক ফন্দী বাহির করিয়া বাড়ীর সংলগ্ন এক উঁচু গাছে তর্ তর্ করিয়া তিনি চড়িয়া বসেন। জানাইয়া দেন, এখানেই রাত কাটাইবেন।

পিসীমাকে এবার আগাইয়া আসিতে হয়। চীৎকার ও অনুনয় বিনয়ের পর অবশেষে তাঁহাকে বলিতে হয়, "আচ্ছা, তোকে বৌর কাছে থাকতে হবে না, আমার ঘরেই তুই শুয়ে থাক্‌বি, এবার নেমে আয়।"

নিজের মনকে পিসীমা প্রবোধ দেন, 'দুর্গাচরণের এ ছেলেমানুষী বেশীদিন আর থাকবে না, কিছুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হবেই।'

নাগমশাইর এ সমস্যা কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে হঠাৎ সরল হইয়া যায়। কলিকাতায় একদিন সংবাদ আসে, নববধূ আর ইহজগতে নাই, আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া সে পরলোক গমন করিয়াছে।

নাগমশাই হাঁফ ছাড়িলেন। যাক্ সংসার বন্ধন হইতে এবার তবে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

হাতে ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। তরুণ ডাক্তার নাগমশাই পরম উৎসাহে গরীব দুঃখীদের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান। ভিজিটের কথা দূরে থাকুক, প্রায়ই নিজব্যয়ে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন। দরিদ্রের সেবা ও পরোপকারের নেশা তখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

ডাক্তারিতে এ সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম হইতেছে না। দুঃস্থ ও অসহায় পাড়াপড়শীর দল একান্তভাবে তাঁহারই আশ্রয় নিতে থাকে। ডাক্তারের উপর বিশ্বাস তাহাদের অপরিসীম। নূতন হইলে কি হয়, ধীর মস্তিষ্কে বিবেচনার সহিত যে ঔষধ তিনি দেন অচিরে কার্য্যকরী হইয়া উঠে। ডাঃ ভাদুড়ীকেও এ সময়ে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র নাগমশাইর ঔষধ নির্ব্বাচন ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের অজস্র প্রশংসা করিতে শুনা যাইত।

নাগমশাইর ব্যবহারিক জীবনে এ সময়ে চলিতে থাকে চিকিৎসার মাধ্যমে এই সেবাধর্ম্ম, আর তাঁহার অন্তর্জ্জীবনে শুরু হয় অধ্যাত্ম-সাধনার তীব্র ব্যাকুলতা।

হাটখোলার দত্ত বংশের সুরেশ তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু। বাসার অতি নিকটেই সে থাকে। জীবনাদর্শের দিক দিয়া সুরেশ তখন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। অথচ নাগমশাই রক্ষণশীল, হিন্দু দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁহার অচল অটল। দুই বন্ধুতে যখনি দেখা হয়, তখনি শুরু হয় নানা বিচার বিতর্ক। সুরেশের নিন্দা সমালোচনার উত্তরে এক একদিন নাগমশাই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠেন, "ছাখো, তুমি যতই যা বল, আমাদের বেদপুরাণ তন্ত্রমন্ত্র এসব মিথ্যে নয়। তোমার ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলে, আসলে তা হচ্ছে সাধনার চরম কথা—কিন্তু সাধন ভজনের ভেতর দিয়ে না গেলে মহামায়ার কৃপা না পেলে, সে জ্ঞান কি ক'রে হবে? ব্রহ্মজ্ঞান কি মুখের কথা? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে?"

নাগমশাইর অন্তরে এ সময়ে আসিয়াছে এক তীব্র ব্যাকুলতা। ঈশ্বরীয় কথা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কথায় এখন প্রায়ই তিনি মত্ত হইয়া উঠেন। শাস্ত্র পাঠের উৎসাহও এ সঙ্গে তাঁহাকে পাইয়া বসে। শাস্ত্র গ্রন্থ-সমূহের বঙ্গানুবাদ আনাইয়া পরম উৎসাহে তিনি সেগুলি আয়ত্ত করিতে থাকেন।

কিন্তু প্রাণের আর্ত্তি যায় কই? শাস্ত্রপাঠে ও ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা শ্রবণে তো প্রকৃত শান্তি মিলে নাই। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলেই নাগমশাই রোজ কাশীমিত্রের শ্মশান ঘটে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করেন। চিতার আগুনে শবদেহ জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মিলাইয়া যায়—নাগমশাই উদাসনেত্রে সেদিকে চাহিয়া থাকেন, নশ্বর জীবনের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া বেদনায় হন মুহ্যমান। এ অনিত্য সংসারে নিত্য ও শাশ্বত বস্তুর সন্ধান তিনি কোথায় পাইবেন? কে তাঁহাকে কৃপা করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে গণ্ড বাহিয়া কেবলি ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

কাশীমিত্রের ঘাটে সেদিন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সাথে নাগমশাইর পরিচয় ঘটে। এই সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশে অমাবস্যার নিশীথে তিনি শ্মশানে বসিয়া জপ-ধ্যান শুরু করিয়া দেন।

পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া দীনদয়াল বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন স্থির করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহাকে সংসার বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, নতুবা সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে ঘোরার বাতিক বন্ধ হইবে না। দেশে পত্র লিখিয়া কন্যা ও জামাতার সাহায্যে দুর্গাচরণের বিবাহের কথাও তিনি পাকা করিয়া ফেলিলেন।

পুত্র কিন্তু একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। কিছুতেই তিনি আর বিবাহ করিবেন না। মিনতি করিয়া কহিলেন, বিবাহিত জীবনের উপর তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই, ধর্ম্মপথের তাহা এক বড় অন্তরায়। তাছাড়া, নূতন বধূ আসিয়া পিতার যে পরিচর্য্যা করিবে, দুর্গাচরণ তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সেবা-যত্নে তাঁহাকে রাখিবেন।

দীনদয়াল বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। কন্যাপক্ষকে তিনি কথা দিয়াছেন, শেষকালে তাহাকে এভাবে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে? তাছাড়া,

দুর্গাচরণ যে তাঁহার একমাত্র পুত্র। সে বিবাহ না করিলে বংশ রক্ষাও যে হইবে না।

প্রচণ্ড বাদানুবাদের পরও দুর্গাচরণের মত পরিবর্ত্তিত হইল না। পিতা এবার মনোদুঃখে ঘরে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এ করুণ দৃশ্যটি দুর্গাচরণের চোখে সেদিন পড়িল. অন্তরে উঠিল প্রবল আলোড়ন। এ সংসারে পিতার মত আপনার জন তাঁহার আর কেউ নাই। অপার স্নেহ মমতায় পুত্রকে তিনি এতকাল ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। এই পিতার সন্তোষ বিধানই যে তাঁহার সব চাইতে বড় ধর্ম্ম।

মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্গাচবণ সিদ্ধান্ত স্থিব করিয়া ফেলিলেন, পিতাকে কহিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন।

পাত্রী তাঁহাব গ্রামেরই। শুভদিনে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল।

রোগীর চিকিৎসা, জপতপ ও ভগবৎ প্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়া কলিকাতায় নাগমশাইর দিন কাটিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল, দেশে তাঁহাব পিসীমা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এই পিসীমা তাঁহার মাতৃস্থানীয়, মাতার মৃত্যুর পর হইতে ইহারই আদর যত্নে তিনি মানুষ হইয়াছেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাত্র ব্যগ্রভাবে দেওভোগে ছুটিয়া গেলেন।

পিসীমার মৃত্যু এবারে দুর্গাচরণের জীবনে আনিয়া দেয় এক চরম নির্ব্বেদের অবস্থা। দিনের পর দিন তিনি ভাবিতে থাকেন, এ নশ্বর জীবনের মূল্য কি? এই স্নেহ মায়া-মমতাই বা কতক্ষণ স্থায়ী? ভঙ্গুর জীবনের উপর এবার আসিয়া গেল তাঁহার এক প্রবল বিতৃষ্ণা। মৃত্যুর ওপারে যে আলোক, যে অমৃত চির-বর্ত্তমান, তাহারই জন্য অন্তরে জাগিয়া উঠিল পরম আকাঙ্ক্ষা।

পিতার সেবার জন্য, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, নাগমশাইকে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যেভাবে চলিলে পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি কই? ডাক্তারের

বেশভূষায় কোন আড়ম্বর নাই, রোগীদের জন্য বসিবার একটি ঘরও নাই। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি তাঁহার আজকাল হইয়াছে, দূর-দূরান্ত হইতে তাই রোগীবাড়ীর আহ্বান আসে। নিতান্ত সাধারণ বেশে ঔষধের ব্যাগটি হাতে নিয়া পদব্রজেই নাগমশাই রোগী দেখিতে বাহির হইয়া পড়েন।

দীনদয়ালের ইচ্ছা, ডাক্তার পুত্রের বেশভূষাটা ভাল হোক, ইহার ফলে উপার্জ্জন বাড়িবে। একদিন নিজেই তাঁহার জন্য দামী জামা-কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া আনিলেন। পুত্রকে কিন্তু এগুলি পরানো গেল না। তিনি বরং বলিয়া দিলেন, "পোষাক পরিচ্ছদের জন্য অপব্যয় না করে এ টাকা গরীব দুঃখীর সেবায় লাগালে সত্যিকার ভালো কাজ হোত।"

আসলে জনসেবা হিসাবে যে ডাক্তারী ব্যবসায় শুরু করিয়াছে, আর্থিক উন্নতি তাহার কাছে আশা করা বৃথা। রোগী দেখিবার সময় নাগমশাই লক্ষ্য করেন, রোগীর গায়ে আবশ্যকীয় গরম জামাকাপড় কিছু নাই, শীতে সে কাঁপিতেছে। অমনি নিজের ভাগলপুরী খেসটি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তিনি বাড়ী ফিরেন।

তিনি যে জানেন, শুধু ঔষধে রোগ সারে না, উপযুক্ত পথ্যাদি দরকার। তাই গরীব রোগীর পথ্যের ব্যবস্থাও সেবাব্রতী ডাক্তারকে মাঝে মাঝে করিতে হয়।

সে-বার এক সঙ্কটাপন্ন রোগীকে দেখানোর জন্য দুর্গাচরণকে কল্ দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, রোগীকে ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। অমনি মনে পড়িয়া যায়, তাঁহার নিজের গৃহে তক্তাপোষ রহিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া রোগীর বাড়ীতে ঐ তক্তাপোষ স্থানান্তরিত করেন, তারপর শুরু হয় তাঁহার চিকিৎসা। ডাক্তারকে ইতিমধ্যে সবাই চিনিয়া নিয়াছে। চতুর লোকেরা চিনিয়াছে আরো বেশী, অনেক সময়ই তাহারা চিকিৎসা করানোর পর পারিশ্রমিক দেয় না। দুর্গাচরণেরও অভ্যাস নয় ভিজিটের জন্য পীড়াপীড়ি করা। ফলে আর্থিক দিক দিয়া তাঁহাকে হইতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। চিকিৎসক হিসাবে যেখানে তাঁহার আয়

হওয়া উচিত তিন চারিশত টাকা সেখানে ঘরে আসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা।

একদল চতুর লোক ডাক্তার দুর্গাচরণ নাগের সহৃদয়তা এবং পরোপকার বৃত্তির খোঁজ রাখে। রোগীর কল হইতে ফিরিবার সময় ইহারা তাঁহার বাড়ীতে অপেক্ষা করে; দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিয়া, নানা কাঁদুনি গাহিয়া নাগমশাইর নিকট হইতে ইহারা টাকাকড়ি ধার নেয়। বলা বাহুল্য, এ টাকা তাহাদের পরিশোধ আর কখনো করিতে দেখা যায় না।

পুত্রের চিকিৎসা ব্যবসায়ের এ ধরণ দেখিয়া দীনদয়াল বড় হতাশ হন। বুঝিয়া নেন, সাংসারিক উন্নতি তাঁহার কোনদিনই হইবে না, আর পিতার বৈষয়িক কাজেও সে কখনো আসিবে না।

চিকিৎসক হিসাবে নাগমশাইর আজকাল নামডাক হইয়াছে। তাই পালবাবুরা তাঁহাকেই নিজেদের গৃহ চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। সে-বার তাঁহাদের গৃহের একটি সঙ্কটাপন্ন কলেরা রোগীর চিকিৎসায় নাগমশাইর ডাক পড়ে। ধীরতা, সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত তিনি এ রোগীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। পালবাবুরা ভীত হইয়া প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ভাদুড়ীকেও কল্ দেন। রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন নির্ভুল বলিয়া ডাঃ ভাদুড়ী মত প্রকাশ করেন, আর দুর্গাচরণের উপরই এ চিকিৎসার ভার দিয়া তিনি চলিয়া যান।

এই রোগী সারিয়া উঠিল। পালবাবুরা দুর্গাচরণের এই চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। এবার ডাক্তারকে ভিজিট ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করা দরকার। একটি রূপার কৌটায় প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভিজিট বাবদ রাখিয়া নাগমশাইয়ের সম্মুখে ধরা হইল। কিন্তু এ অর্থ তিনি কোনমতেই নিতে রাজী নন। সরলভাবে কহিলেন, "ওষুধের দাম ও আমার ভিজিট বিশ টাকার বেশী কখনো হতে পারে না, আপনারা এত টাকা আমায় কেন দিচ্ছেন?"

অগত্যা ঐ বিশ টাকাই তাঁহাকে দেওয়া হইল। বাকীটা কর্ম্মচারী দীনদয়ালের নামে পূজার সাহায্যবাবদ তাঁহারা খরচ লিখিয়া রাখিলেন।

ঘটনাটি শুনিয়া দীনদয়াল তো ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুই নির্ব্বোধ, তাই নিজের প্রাপ্য টাকাটাও বুঝে নিতে পারিসনে। ও টাকা কেন এমন ক'রে ফেরত দিলি ?"

নাগমশাই দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনি চিরকাল আমায় শিখিয়েছেন ধর্ম্মপথে থাকতে। এখন আবার উল্টো বলছেন কেন ? আমার ন্যায্য পাওনা থেকে বেশী নিয়ে কি অধর্ম্ম ক'রবো ? যাক, আপনি যেন বাকী টাকাটা স্পর্শ করবেন না।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু এভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় তোর আর কতদিন চলবে শুনি ?"

"না চলে, নাই চলবে। তাই বলে মিথ্যাচার আমি করতে পারবো না। ভগবান্ হচ্ছেন সত্যস্বরূপ। এ মিথ্যাচারে তাঁকে হারাতে হবে। প্রাণ থাকতে তা পারবো না।"

বৈরাগী পুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দীনদয়াল হতবাক্ হইয়া যান।

ইহার পর শ্বশুর ও পতির সেবা-যত্নের জন্য দুর্গাচরণের পত্নী কলিকাতায় আসেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবার মধ্য দিয়া শ্বশুরকে তিনি সুখী করিলেন, কিন্তু স্বামীর মন কোনমতেই আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। চিকিৎসা, পরোপকার ও নিজের ধ্যানজপের শেষে যেটুকু সময় দুর্গাচরণ পান, সেটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভগবৎ প্রসঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন। আর নববধূর সহিত তাঁহার ব্যবধানটি থাকে আগেরই মত। দাম্পত্য জীবনে কোন চাঞ্চল্য কোন তরঙ্গভিঘাতই দৃষ্টিগোচর হয় না।

নাগমশাইর জীবনে এবার দুর্ব্বার বেগে আসিতে থাকে ত্যাগ বৈরাগ্য আর মুমুক্ষার আকাঙ্ক্ষা। কেবলই ভাবিতে থাকেন, 'পরোপকার ও সেবাব্রত তো কতই করিলেন। কিন্তু কই, জীবনে পরম শান্তি তো মিলিল না ? ঈশ্বর দর্শন তো আজ অবধি হইল না ? এই ক্ষণস্থায়ী সংসার জীবনে ও দাম্পত্য সুখে তাহার কি প্রয়োজন ? মুক্তির পথ কোথায় ? কোথায়ই বা মুক্তিদাতা দীক্ষা-গুরু ?'

দীক্ষা গ্রহণের জন্য নাগমশাইর হৃদয়ে আসিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা

ও আর্ত্তি। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে রোজ তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া থাকেন। ঘাটে ঘাটে সদাই দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসী ও মহাত্মাদের আনাগোনা। নাগমশাইর মনে আশা জাগে—হয়তো কোন এক শুভলগ্নে ইঁহাদের কাহারো কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িবে, প্রার্থিত দীক্ষা পাইয়া তিনি ধন্য হইবেন।

কুমারটুলি ঘাটে সেদিন তিনি বিষাদখিন্ন হৃদয়ে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, একটি নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহাদের কুলগুরু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি নিয়া নাগমশাই তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর হইল, "বাবা, তোমার কাছেই যে ছুটে এলাম। মহামায়ার প্রত্যাদেশ পেয়েছি, তোমায় দীক্ষা দিতে হবে। তাইতো কোন সংবাদ না দিয়েই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম।"

নাগমশাইর দুই চোখ তখন পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার আকুতি জগজ্জননীর কানে পৌঁছিয়াছে। তাই তিনি কৌল সাধক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সানন্দে তিনি এই কুলগুরুর কাছে সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মন্ত্র প্রাপ্তির পর একান্ত নিষ্ঠায় তিনি শুরু করেন সাধন ভজন। এক একদিন জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। একবার গঙ্গাতীরে ধ্যানতন্ময় অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জোয়ারের জল তাঁহাকে ভাসাইয়া নিয়া যায়, সম্বিৎ পাইবার পর অতি কষ্টে সাঁতরাইয়া তিনি তীরে উপনীত হন।

স্ত্রীকে নাগমশাই প্রায়ই বুঝান, "ওগো, একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখবে, কায়িক সম্বন্ধ বা মায়ার সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। ভগবান্‌কে ভালোবাসার ভেতরেই রয়েছে নরজন্মের সার্থকতা, এতেই পাওয়া যায় প্রকৃত মুক্তি। আমার এ হাড়মাসের খাঁচাটার আকর্ষণে নিজেকে জড়িও না। মা জগজ্জননীকে ডাকো, তাঁর শরণাপন্ন হও, ইহকাল পরকাল দুইয়েরই কল্যাণ হবে।"

পিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই নাগমশাই তাঁহাকে অবসর নেওয়াইয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সেবার জন্ত পত্নীকেও সঙ্গে যাইতে হইল। দীনদয়ালের কুতের কাজ দেখাশুনার ভার নাগমশাই নিজেই গ্রহণ করিলেন।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখন কলিকাতায় ছড়াইতেছে; নাগমশাই একদিন বন্ধু সুরেশের সহিত ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন।

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। চারিদিকে সেদিন যেন অগ্নিবর্ষণ শুরু হইয়াছে। বেলা তুইটায় উভয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে এক শ্মশ্রুধারী সাধক তখন দণ্ডায়মান। নাগমশাই সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন, এখানে একটি সাধু থাকেন শুনেছি। তিনি কোথায়?"

উত্তর হইল, "তিনি তো এখানে নেই। আজ চন্দননগরে চলে গিয়েছেন। তোমরা বরং আর একদিন এসো।"

পথশ্রমে অবসন্নপ্রায় তুই বন্ধুর মুখে তখন কথা সরিতেছে না। হতাশ হইয়া উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দ্বারের আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া কে একজন গোপনে তাঁহাদের ডাকিতেছেন। নাগমশাইর দৃঢ় ধারণা হইল, ইনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যগ্রভাবে তিনি ও সুরেশ কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

পরে উভয়ে জানিলেন, যে শ্মশ্রুধারী সাধকটি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার নাম প্রতাপ হাজরা। দীর্ঘদিন ঠাকুরের কক্ষের পাশে বাস করিয়াও তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নয়, সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের তরুণ দর্শনার্থীদের তিনি বিভ্রান্ত করিতেন, তাহাদের মনে ধোঁকা লাগাইয়া দিতেন।

সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু সেদিন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত নাগমশাইকে চিনিতে একটুও ভুল করে নাই। তাঁহার গোপন হাতছানিটি এক অযাচিত কৃপার মতই নাগমশাইর জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ঠাকুরের দর্শন পাইয়া নাগমশাইর আনন্দের অবধি রহিল না। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কক্ষের একপাশে গিয়া বসিলেন।

ঠাকুর সস্নেহে নাগমশাই ও সুরেশের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "সংসারে থাকবে ঠিক যেন পাঁকাল মাছের মত।"

বিদায়ের সময় স্নেহভরে নাগমশাইকে কহিলেন, "আর একদিন এসো।"

যাইতে যাইতে নাগমশাই ভাবিতে থাকেন, কই, ঠাকুর তো কৃপা করিয়া একবারও চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না! অথচ এই চরণের জন্য যে তাঁহার লোভের অন্ত নাই।

পরের দিন নাগমশাই আসা মাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো তুমি না ডাক্তার? একবার দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে।"

নাগমশাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া উত্তর দিলেন, "কই, পায়ে তো কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।"

"ওগো, আরো একটু ভাল ক'রে দেখনা কি হয়েছে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে নাগমশাইর অন্তরে চিন্তার রশ্মি খেলিয়া গেল। এতো অন্তর্য্যামী ঠাকুরের ছল ছাড়া আর কিছু নয়। ভক্তের মনের ক্ষোভটি এক মুহূর্ত্তে তিনি জানিয়া নিয়াছেন। তাই কৃপা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। চরণ স্পর্শের অধিকার এভাবে দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন।

ঠাকুরের করুণার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নাগমশাই বলিতেন, "তাঁর কাছে কোন কিছু চাইবার দরকার হোত না। মনের ভাব বুঝে তৎক্ষণাৎ তিনি তা পূরণ করতেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন কল্পতরু। যে যা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে, তাই সে তখনি লাভ করেছে।"

কিছুদিন পরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন নিজের দেহটির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া নাগমশাইকে কহিলেন, "হ্যাগা, তোমার একে কি বোধ হয়?"

পরম ভক্ত যুক্তকরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি—আপনিই সেই।"

কথা কয়টি শোনামাত্র দিব্য ভাবে ঠাকুর উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, ভাবাবিষ্ট হইয়া নাগমশাইর বক্ষে তিনি চরণ স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অনুভূতি। নাগমশাই দেখেন, সমস্ত বিশ্বচরাচর হইয়া উঠিয়াছে চিন্ময়, স্বর্গীয় জ্যোতি সেখানে ওতপ্রোত।[১]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে নাগমশাই একদিন বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ (উত্তর কালের স্বামী বিবেকানন্দ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তিনি অদ্বৈতভাবে ভাবিত ও উদ্দীপিত। অস্ফুট স্বরে কেবলি বলিতেছেন, "চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমশাইর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে কহিলেন, "এই ছাখো, এরই রয়েছে ঠিক ঠিক দীনতা, এতটুকুও ভান এতে নেই।"

ঠাকুরের কথা মানিয়া নিয়া নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "তা আপনি যখন বলছেন, তা হবে।"

নাগমশাই ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে আলাপ শুরু হইল। নাগমশাই শুদ্ধাভক্তি পথের পথিক, কহিলেন, "সকলি তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে, আমরা নিমিত্ত মাত্র ছাড়া আর কি বলুন।"

নরেন্দ্রনাথ তাহা মানিবেন না। উত্তরে কহিলেন, "মশাই, তিনি, তাঁর এসব বুঝিনে। সবই আমি—আমিই পরমাত্মা—আনন্দময় জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিমান্। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই ভেতরে ডুব্ছে ভাস্ছে।"

"মশাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো দূরের কথা, আপনার কি সাধ্য যে একটা চুলও সোজা করেন? তাঁর ইচ্ছে না হলে গাছের পাতাটাও নড়ে চড়ে না।"

---

১ সাধু নাগমশাই: শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নরেন্দ্রনাথ সেই অদ্বৈত ভাবেরই অনুসরণে বলিয়া চলিয়াছেন, "আমি ইচ্ছে করলে চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হয়—আমারই ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছে।"

তক্তাপোষটির উপরে বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন। এবার সস্নেহ হাসি হাসিয়া নাগমশাইকে বলিলেন, "কি জানো, নরেন হচ্ছে খাপ্‌খোলা তরোয়াল—ওর ওকথা শোভা পায় বটে। তা নরেন এমন বলতে পারে।"

নাগমশাইর কাছে ঠাকুরের কথা চরম কথা। ইহার পর আর আলোচনা, তর্ক বা বিচার আর চলে না। নরেন্দ্রনাথের চরণে শির ঠেকাইয়া তিনি নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান লীলা-পার্ষদ, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার বা তর্ক করার অবকাশ নাই।

একবার জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, সত্যকার কোন মুক্তপুরুষ নাগমশাই দেখিয়াছেন কিনা? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দেন, "হ্যাঁ। সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছি, আর দর্শন করেছি তাঁর সর্ব্বপ্রধান পার্ষদ—শিবাবতার স্বামীজীকে!"

নাগমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসিবার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছে। সেদিন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন—ঈশ্বরীয় কথায় তিনি রত। এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন, "ছাখো, ডাক্তার উকীল মোক্তার দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্ম্মলাভ হওয়া বড় কঠিন।"

প্রসঙ্গক্রমে আরো কহিলেন, "এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, তা'হলে কি ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?"

কথাকয়টি নাগমশাইর প্রাণে বড় বাজিল। সত্যই তো! তিনি নিজের অভিজ্ঞতায়ও আজকাল দেখিতেছেন, ধ্যান-ধারণার সময় রোগীদের মূর্ত্তি আসিয়া মনের কোণে ভীড় জমায়, সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন, যে বৃত্তি বা ব্যবহারিক কর্ম্ম ঈশ্বর

লাভের বিঘ্নস্বরূপ তাহা দিয়া তাঁহার কাজ নাই। আজ হইতেই এসব ত্যাগ করিবেন।

গৃহে ফিরিবার পর সেইদিনই ডাক্তারির বই, যন্ত্রপাতি ও ঔষধ ইত্যাদি সব কিছু গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন।

কাজকর্ম্মের দিক হইতে মুক্ত হইয়া এবার আরো দৃঢ় এক নিষ্ঠা নিয়া তিনি সাধন ভজন করিয়া যাইতে থাকেন। বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বড় তীব্র হইয়া উঠে। মনে মনে স্থির করেন, এ সংসারে আর থাকা নয়, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন।

ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি সংসার ত্যাগের অনুমতি নিতেই গিয়াছেন। কক্ষমধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "তা সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন থাকলেই হয়। গৃহস্থাশ্রম কেমন জানো? এ যেন কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করা।"

এবার নাগমশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওগো, তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাক্‌বে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম্ম শিখবে।"

ঠাকুরের এ আদেশ মুহূর্ত্তমধ্যে নাগমশাইর মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইল।

বৈরাগ্যের আগুন সেদিন তাঁহার সর্ব্ব সত্তায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অন্তর্জ্বালায় তিনি সদা অস্থির, কিন্তু উপায় তো কিছু নাই। ঠাকুরের এ আদেশ যে অলঙ্ঘনীয়!

ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা এখন হইতে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়, নাগমশাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। সংসার জীবনের কোন কাজকর্ম্ম আর তাঁহার দ্বারা হইবার নয়।

এই সময়ে নাগমশাইকে কিছুদিনের জন্য একবার স্বগ্রাম দেওভোগে আসিতে হয়। পত্নী স্বামীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন, ঈশ্বরের জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, সংসারের কোন বন্ধনই আর তাঁহাকে বাঁধিতে সক্ষম নয়। নাগমশাই নিজেও স্পষ্টভাবে

বলিয়া দিলেন, রামকৃষ্ণ-চরণে যে মন-প্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছেন, সংসারের কোন কাজেই আর তাহা আসিবে না।

সেদিন তিনি চুপচাপ বারান্দায় বসিয়া আছেন। গৃহের পাশের জমিটাতে জন্মিয়াছে একটি সতেজ লাউগাছ। প্রতিবেশীদের একটি গরু এই গাছটার দিকে বার বার ঝুঁকিতেছে, কিন্তু দড়িটা খাটো করিয়া বাঁধা, তাই উহার নাগাল পাইতেছে না। এই দৃশ্যটি দেখিয়া নাগমশাইর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি গরুর খুঁটাটি উপড়াইয়া দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "খাও মা, খাও, এগিয়ে গিয়ে খাও।"

বৃদ্ধ পিতা দীনদয়াল নিকটেই ছিলেন। পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "নিজে তো কিছু উপার্জ্জন করিসনে, তার ওপর আবার রয়েছে এসব অনিষ্ট করার ঝোঁক্। ডাক্তারিটা তো ছেড়ে দিয়ে বস্‌লি, এবার খাবি কি ক'রে, বল্‌তো ?

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, "ভগবান্ যা হোক একভাবে চালিয়ে নেবেনই। আপনি এসব এ বয়সে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে যেন মাথা ঘামাবেন না।'

"ওরে, চলবে যে কিভাবে, তাতো বুঝতেই পারছি। এবার ন্যাংটো থাক্‌বি আর ব্যাঙ্ ধরে খাবি।"

অতঃপর দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। নাগমশাই পিতার কথার কোন জবাব দিলেন না, মুহূর্ত্তমধ্যে নিজের পরিহিত বস্ত্রটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইলেন। গৃহের অঙ্গনের এক কোণে একটি ব্যাঙ পড়িয়া ছিল। এটিকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পিতাকে কহিলেন, "আপনার যাতে সত্য রক্ষা হয়, এজন্য দুটো আজ্ঞাই আমি পালন করলাম। এবার মিনতি করে বলছি, আপনি সংসারের চিন্তা আর করবেন না। বয়স হয়েছে, এবার থেকে বসে বসে কেবল ভগবানের নাম করুন।"

পুত্রের এই অদ্ভুত আচরণে দীনদয়াল বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া তিনি বুঝিয়া নেন, 'ভগবান্ ভগবান্' করিয়া পুত্র এবার একেবারে পাগল হইয়াই গিয়াছে। শঙ্কিত কণ্ঠে

পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহেন, "ছাখো, তোমরা ওর সঙ্গে এখন থেকে বুঝে-সুঝে চ'লো। ওর বিরুদ্ধাচরণ কখনো ক'রো না।"

কলিকাতায় ফিরিবার পর নাগমশাই সেদিন ব্যস্তসমস্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপান্তে বসিয়া সখেদে কহিলেন, "তাঁর ওপর নির্ভর হ'লো কই? এখনো তো নিজের চেষ্টা রয়েই গিয়েছে?"

ঠাকুর নিজের দেহটি দেখাইয়া কহিলেন, "ভয় নেই, এখানকার টান থাকলে সব ঠিক্ ঠিক্ হয়ে যাবে।"

আরেক দিন ঠাকুর তাঁহার এই বৈরাগ্যবান্ ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ছাখো, তুমি গৃহেই থেকো। যেনতেন ক'রে মোটা ভাত কাপড়ে চলে যাবে।"

ঘরসংসারের উপর, বিষয় আশয়ের উপর, নাগমশাইর রহিয়াছে সহজাত বিতৃষ্ণা। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু, গৃহে থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়ই বা কি ক'রে?"

"ওগো, আমি বল্‌ছি, সত্য সত্যই বল্‌ছি, ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে আবাক্ হবে।"

"কি ক'রে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে।"

"তোমায় কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হতে হবে না। কেবল সাধুসঙ্গ করবে।"

"ঠাকুর, আমি যে হাঁদা লোক, সত্যিকারের সাধু চিনবো কি ক'রে?"

"তোমায় সাধু খুঁজতে হবে না। যথার্থ সাধুরা নিজে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এজন্য ভেবো না।"

পিতা দীনদয়ালের রোজগার ছিল মহাজন পালচৌধুরীদের কুঠের কাজে। তিনি অবসর নিয়া গ্রামে যাইবার পর নাগমশাই কিছুদিন একাজ দেখাশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, একাজ চালানোর মত মনোবৃত্তি

মোটেই নাই। ভাগ্যক্রমে রণজিৎ নামে একটি তরুণ কর্ম্মী পাওয়া যায়। নাগমশাইর কাজ সুষ্ঠুভাবে সে-ই চালাইয়া নিতে থাকে।

এবার মনে মনে ঠিক করিলেন, ঐ কাজ রণজিৎকেই ছাড়িয়া দিবেন। যদি সে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু দেয় ভাল, নতুবা ইহা নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন না।

মনিব পালচৌধুরীর মধ্যস্থতায় স্থির হইল, কুতের কাজ হইতে যে আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেকটা নাগমশাই পাইবেন। ইহার ফলে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের কোন অসুবিধা হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এ নূতন বন্দোবস্তের কথা উঠিল। নাগমশাইর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।"

আহার বিহারের দিক দিয়া নাগমশাই ছিলেন, কৃচ্ছ্রব্রতী। সারা দিনের শেষে দুই গ্রাস আহায্য মুখে পুরিয়া তিনি উঠিয়া পড়িতেন। কেহ এ সম্পর্কে অনুযোগ দিলে কহিতেন, "যতদিন দেহ আছে কিছু টেক্স দিতেই হবে, তাই দিচ্ছি। বেশী খেলে বা ভালো কিছু খেলে জিহ্বার যে সুখেচ্ছা হবে।"

এই সদা সতর্ক সাধক নিজের ক্রটি বিচ্যুতিকে কোনদিন এতটুকুও ক্ষমা করেন নাই। কোনক্রমে কাহারো উপরে হয়তো নাগমশাই রুষ্ট হইয়াছেন, মুখ দিয়া হঠাৎ অশ্রদ্ধাসূচক কথা বাহির হইযাছে। আর রক্ষা নাই। নিজ দেহকে তিনি নিষ্ঠুর ভাবে শাসন না করিয়া ছাড়িবেন না। সে-বার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দাত্মক ভাষা অতর্কিতে তিনি ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ইহার শাস্তি স্বরূপ তখনি একখণ্ড পাথর তুলিয়া নিয়া নিজ মস্তকে প্রহার করিতে থাকেন। ফলে মস্তক ফাটিয়া গিয়া এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে নাগমশাই নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দিলেন, "বেশ হয়েছে, যে যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি তো তার দরকার।"

নাগমশাইর আর এক অভ্যাস, দেহ-মনকে বশ রাখার জন্য মাঝে

মাঝে তিনি নিরম্বু উপবাস করিতেন। সে-বার কয়েকদিন উপবাসের পর তিনি সবেমাত্র রান্নার যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধু সুরেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কোন কারণে এই বন্ধুটির প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। তখনি অস্ফুটস্বরে নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হায়, এখনো আমার মনের ময়লা কাটলো না, অন্যায় মনোবৃত্তি দূর হ'লো না।" প্রায়শ্চিত্ত সাধনে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় নাই। ভাতের হাঁড়িটি অবলীলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেদিনও তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল।

গিরিশ ঘোষকে তাই নাগমশাই সম্পর্কে বলিতে শুনা যাইত, "অহং শালাকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে নাগমশাই তার মাথা ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছেন, তার আর মাথা তোল্‌বার যো আছে কোথায় ?"

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মরদেহের লীলা এবার আসিয়াছে শেষ পর্য্যায়ে। কাশীপুরে গোপালবাবুর বাগানবাড়ীতে দুশ্চিকিৎস্য ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যা-শায়ী হইয়া আছেন। ভক্তপ্রবর নাগমশাই বুঝিয়াছেন, ঠাকুরের লীলাসম্বরণের দিনটি আসন্ন। কিন্তু তাঁহার মন যে এ দুর্দ্দৈবকে স্বীকার করিয়া নিতে চায় না। একান্ত নিষ্ঠায় নিজের সব কিছু তিনি ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। সেই প্রাণপ্রভু ঠাকুর এবার যদি অপ্রকট হন, তবে ভক্ত নাগমশাইর জীবন ধারণে কি লাভ? তাছাড়া, এই রোগযন্ত্রণা ভোগের দৃশ্যও যে তাঁহার পক্ষে দুঃসহ।

নাগমশাই বলিয়াছেন, "ঠাকুরের রোগের যাতনা দেখা দূরের কথা, স্মরণ করতেও হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যেত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ শরীরে এ রোগ রেখে দিলেন, আমরাও কোনমতে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব করতে পারলাম না। তাই তাঁর কাছে না গিয়ে নীরবে ঘরের ভেতরই বসে রইলাম। শুধু মাঝে মাঝে তাঁকে গিয়ে দর্শন ক'রে আস্‌তাম।"

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ সেদিন নাগমশাই ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে

উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরের ক্যান্সারের ঘায়ে তখন তীব্র বেদনা। ভক্ত নাগমশাইকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁগো, তুমি এসেছো? এসো, আরো এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে বসো। তোমার শান্ত শীতল দেহ স্পর্শ করলে আমার জ্বালা যন্ত্রণা কম্‌বে।"

কথা কয়টি বলিয়াই ঠাকুর এই পরম ভক্তকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, ভাবাবেশে বহুক্ষণ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন।

আর একদিনের কথা। রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর নাগমশাইকে সংবাদ দিয়া নিকটে ডাকাইয়া আনিয়াছেন। নাগমশাই কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তুমি এসেছো? এই ছাখোনা, ডাক্তার কবিরাজেরা তো সব হার মেনে গিয়েছে। তুমি কি কিছু ঝাড় ফুঁক জানো? জানো তো ছাখো দিকি যদি কিছু উপকার করতে পারো।"

মুহূর্ত্তমধ্যে মহাভক্ত নাগমশাইর চোখ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরের এ তীব্র যন্ত্রণা, এ দুঃসাধ্য ক্যান্সার দূরীভূত করা তো তাঁহার পক্ষে অসাধ্য নয়। ঠাকুরেরই জীবন-জ্যোতির আলো যে প্রতিফলিত তাঁহার সাধনসত্তায়, তাঁহারই শক্তিতে তিনি শক্তিমান্!

ভাবাবিষ্ট নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, জানি, আপনার কৃপায় সব আমি জানি। এখনি আমি এ রোগ সারিয়ে দিচ্ছি।"

উপস্থিত ভক্ত শিষ্যেরা সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন। নাগমশাই শয্যার পাশে আগাইয়া আসিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, যে সঙ্কল্প ভক্ত হৃদয়কে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে তাহা অমোঘ! তাই তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া একাজ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওগো, জানি, তা তুমি পারো, এ রোগ তুমি সারাতে পারো।"

লীলা সম্বরণের কয়েক দিন আগের কথা। অন্যান্য ভক্তের সহিত নাগমশাইও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর নিম্নস্বরে কহিতেছেন, "এ সময় কি আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। আমলকী চিবুতে পারলে ভালো হতো।"

এসময়ে আমলকী জন্মে না। ভক্তরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। একজন বলিয়া বসিলেন, 'এ সময়ে এ ফল আর কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে?"

ভক্ত নাগমশাইর মনে চিন্তা খেলিয়া গেল—ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া আমলকীর কথা যখন বাহির হইয়াছে, এ বস্তু অবশ্য কোথাও না কোথাও মিলিবে।

নিঃশব্দে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল গ্রামে গ্রামে বনে বাদাড়ে আমলকীর জন্য অবিরাম অন্বেষণ। আহার নিদ্রা ভুলিয়া এই কাজেই তিনি দিনরাত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

তিন দিনের দিন পরিশ্রম তাঁহার সফল হইল, আমলকী সংগ্রহ করিয়া তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর বালকের মত আনন্দমুখর হইয়া উঠিলেন, "আহা, এ অসময়ে এমন চমৎকার আমলকী! তুমি কোথা থেকে যোগাড় করলে গো!"

এই তিনটি দিন নাগমশাইর খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নাই। তাড়াতাড়ি নীচতলায় নিয়া গিয়া তাঁহাকে ভোজনে বসানো হইল। সেদিন ছিল একাদশীর উপবাস, নাগমশাই তাই আহার্য্য স্পর্শ করিতে রাজী নন। অবশেষে ঠাকুর ঐ অন্নব্যঞ্জন মুখে ঠেকাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলে, তবে নাগমশাই উহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিলেন। বিষাদখিন্ন নাগমশাই এবার কলিকাতার বাস উঠাইয়া চলিয়া গেলেন স্বগ্রাম দেওভোগে। অন্য কোথাও বাস করার প্রস্তাব কেহ দিলে, দৃঢ়স্বরে কহিতেন, "ঠাকুর, আমায় গৃহে থাকতে বলে গিয়েছেন। তাঁর বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার কই?"

এই গৃহাশ্রমে অবস্থান করিলেও মাঝে মাঝে তাঁহার গুরুধাম কলিকাতায়ও তিনি আসিতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সহিত পরমানন্দে কিছুদিন কাটাইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন স্বস্থানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হইবার পর নাগমশাই ভাবিলেন, দেওভোগের প্রান্তে একটা কুটীর বাঁধিয়া তিনি নিভৃতে বাস করিবেন। কিন্তু ইহার প্রয়োজন হইল না। পত্নী কোনদিনই তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অন্তরায় হন নাই। স্বামীর মনোভাব টের পাইয়া আগে হইতেই তিনি আশ্বাস দিলেন, "ছাখো, নিজের দেহ-সুখের জন্য কোন দিনই আমি তোমায় বিরক্ত করিনি, ভবিষ্যতেও কখনো করবো না। তবে এ পৃথক বাসের দরকার কি ?"

সাধ্বী জীবনসঙ্গিনীর এ কথায় তিনি আশ্বস্ত হন, গৃহে থাকিয়া গৃহস্থ-সন্ন্যাসীরূপেই দীর্ঘ দিন করেন অতিবাহিত।

নাগমশাইর স্ত্রী স্বামীর পুণ্যময় জীবন ও তাঁহার দেহ-সংযম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তাঁর শরীরে কি মনে কোন রকম মানবীয় বিকার বা পরিবর্ত্তন কখনো দেখা যায়নি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে জৈবভাবের মাথায় লাথি মেরে তিনি চলে গিয়েছেন। আগুনের ভেতর তিনি বাস করেছেন বটে, কিন্তু এক দিনের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয়নি।"

পিতা দীনদয়াল পুত্রের এই তীব্র বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিতৃষ্ণা কোনদিনই পছন্দ করিতেন না। একবার খুব তিরস্কার করার পর নাগমশাই উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন, "আমার আবার খাওয়া পরার জন্য চিন্তা কি ? গাছে পাতা রয়েছে প্রচুর. তাই খেয়ে দিন কাটাবো ; আর আমি জীবনে কোনদিন স্ত্রীসঙ্গ করিনি, মাতৃগর্ভ থেকে যেমন পড়েছিলাম, এখনো তেমনি আছি—কাপড়-চোপড় পরবার আমার দরকার নেই।"

কামিনী ও কাঞ্চন উভয় বস্তুতেই এই রামকৃষ্ণময় ভক্তের ছিল সমান বিতৃষ্ণা।

সে-বার নারায়ণগঞ্জে পালবাবুদের এক আত্মীয় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়, ক্রমে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। ইঁহারা নাগমশাইর চিকিৎসানৈপুণ্যের কথা জানিতেন। তাঁহাকে ডাকা হইল এবং তাঁহার ঔষধে রোগী বাঁচিয়া উঠিল। পালদের কর্ত্তাবাবুর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। স্বয়ং দেওভোগে আসিয়া নাগমশাইকে বহু

সাধুবাদ করিলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ তিনশত টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য চিকিৎসককে এ টাকা গ্রহণে সম্মত করায়? অবশেষে বেশী পীড়াপীড়ি করা হইতে থাকিলে নাগমশাই ক্রন্দন শুরু করিলেন। কহিলেন, "হায় ঠাকুর! কেন তুমি আমায় চিকিৎসকের এ হীন বৃত্তি শিখিয়েছিলে, তাতেই তো অর্থের প্রলোভন নিয়ে এরা বার বার চেপে ধরছে, আর আমার এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।

তাঁহার এ অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়া বৃদ্ধ পালমহাশয় সেদিন বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কখনো মানুষ নও!"

কলিকাতার চিকিৎসক জীবনেও নাগমশাই সে-বার এক কাণ্ড করিয়া বসেন। পালচৌধুরীদের এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ফরিদপুরের ভোজেশ্বরে যাইতে হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। গদির বাবুরা এসময়ে তাঁহাকে একটি নূতন কম্বল ও পাথেয় বাবদ আটটি টাকা দিয়া দেন।

ষ্টীমার তীরে ভিড়িতেছে। নাগমশাই টিকিট কিনিতে যাইবেন, এমন সময় এক ভিখারিণী কয়েকটি শিশু সন্তান সহ সম্মুখে উপস্থিত। দুঃখিনীর কান্না ও কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, হাতের সব কয়টি টাকা ও কম্বলটি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "মা, এই নিয়ে তুমি শিশু সন্তানগুলোকে বাঁচাও, নিজের প্রাণ রক্ষা করো।"

প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া ভিখারিণী চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ ষ্টেশনে বিশ্রাম করার পর নাগমশাই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখান হইতে হাঁটিয়াই কলিকাতায় যাইবেন। পথ দীর্ঘ—হাতে রহিয়াছে মাত্র সাত আনা পয়সা। তা হোক্, তবুও তো ভিখারিণী আর তার ছেলেমেয়ের কয়েকদিন বাঁচার ব্যবস্থা করা গেল!

এই পদযাত্রার কাহিনী বড় বিচিত্র। পথে যেদিন দেবস্থান পড়ে

ও প্রসাদ মিলে, সেদিন খাওয়া হয়। বড় নদী নালা সম্মুখে পড়িলে খেয়ানৌকা যোগে তিনি পার হন, আর সেগুলি অপরিসর হইলে সাঁতরাইয়াই পার হন। এমনি কষ্টের মধ্য দিয়া উনত্রিশ দিন পরে নাগমশাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রোগীদর্শনের পর এমন পদযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়তো খুব কম চিকিৎসকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে।

সদ্‌গুরুর আদেশে নাগমশাই সারা জীবন গৃহেই অতিবাহিত করিয়া যান, আর আপন ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধনার বলে এই গৃহপরিবেশকে তিনি করিয়া তোলেন পরম পুণ্যময়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এক মহনীয় রূপ ফুটিয়া উঠে এই শক্তিধর গৃহী মহাপুরুষের জীবনে।

নাগমশাইর সাধন নিষ্ঠার খ্যাতি এ সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে মাঝে মাঝে তাঁহার গৃহে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিয়া জুটিত। এই সব অতিথিদের সেবা পরিচর্য্যার সুযোগ পাইলে সাধু নাগমশাইর উৎসাহের সীমা থাকিত না। তাঁহার দৃষ্টিতে এই অভ্যাগতেরা ছিলেন নারায়ণ স্বরূপ।

ইহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কহিতেন, "জানবে, এ সকলই ঠাকুরের লীলা। ঠাকুর লীলা-শরীরে এক ছিলেন, এবার তিনিই আবার নানা মূর্ত্তিতে আমায় কৃপা করতে আসছেন অতিথি রূপে।"

নাগমশাই এক পুরাতন শূলব্যথাতে ভুগিতেন। সেদিন বড় তীব্র ব্যথা শুরু হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়াও পড়িতেছেন। এসময়ে হঠাৎ সাত-আটজন ভক্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অথচ ঘরে একমুষ্টি চা'ল নাই, এতগুলি লোকের খাবার কি করিয়া যোগাড় হইবে? অগত্যা এই অসুস্থ শরীর নিয়াই নাগমশাইকে বাজারে যাইতে হইল। তিনি নিজে না গেলে দোকান হইতে চাল-ডাল ধারে পাইবার কোন উপায় নাই।

জিনিষপত্র ক্রয়ের পর নাগমশাই বোঝাটি মাথায় তুলিয়া নিলেন। অপরকে দিয়া কখনো তিনি নিজের মোট বহনের কাজ

করেন না, ইহা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু গৃহে অতিথি নারায়ণ উপস্থিত। সেবায় বড় বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। তাই অসুস্থ শরীরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি মোট বহন করিয়া চলিলেন।

শূল বেদনায় শরীর বড় দুর্ব্বল। বার বার মাথার বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অভ্যাগতদের কাছে যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, "হায়, হায়! আপনাদের চরণে অপরাধী হলাম। সেবার কাজে দেরী হয়ে গেল।"

শুধু নাগমশাইর নয়, এ ধরণের সেবানিষ্ঠা তাঁহার স্ত্রীর মধ্যেও দেখা যাইত। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ হয়তো অতিথিদের আগমন হইয়াছে! অমনি এই সেবাব্রতী মহিলা একটি ডালা হাতে করিয়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আতপ চা'ল ধার করিতে ছুটিলেন। কেহ ইহাতে আপত্তি উঠাইলে নাগমশাই প্রবোধ দিতেন, "ছাখো, এ সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া। এর ভেতর দিয়ে আমাদের দুজনেরই পরীক্ষা হচ্ছে।"

তখন ঘোর বর্ষাকাল। সারা দিন রাত ব্যাপিয়া অঝোরে বৃষ্টি ঝরিতেছে। রাত্রিতে নাগমশাইর গৃহে দুইটি অতিথি দর্শন দিলেন। খাওয়া-দাওয়া তো একপ্রকার মিটিয়া গেল, এবার গোল বাধিল শয়নের ব্যবস্থা নিয়া। চারখানি ঘরের তিনখানিই অব্যবহার্য্য, চাল দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতেছে। শুধু একটি মাত্র ঘর বাসোপযোগী, বর্ত্তমানে সেইটিই নাগমশাইর শয়নগৃহ।

ভক্তপ্রবর পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ছাখো, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য! এই দুর্য্যোগের রাতেও অতিথি সেবার সুযোগ আমরা পেয়ে গিয়েছি। অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না? এসো, আজ আমরা ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

পতি পত্নী এই ভাবেই সারা রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ভৃত্য বা ঘরামী নিযুক্ত করা নাগমশাই কোন দিনই পছন্দ করিতেন না। কেহ তাঁহার দৈনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট করিবে, ইহা ছিল তাঁহার কাছে অসহ্য। সেবার একটি ঘরের চাল একেবারে

নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সংস্কার না করিলে আর চলে না। নাগমশাই সেদিন কোথাও বাহিরে গিয়াছেন, পত্নী এ সুযোগে এক ঘরামীকে ডাকিয়া আনিলেন। চালের সংস্কার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় নাগমশাই গৃহে ফিরিলেন। ঘরামীকে চালের উপরে কর্ম্মরত দেখিয়াই তো তাঁহার চক্ষুস্থির! সকাতরে কহিতে থাকেন, চাল থেকে নেমে এসো বাবা। দয়া ক'রে নেমে এসো।

পারিশ্রমিকের আশায় ঘরামী কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা সে ত্যাগ করিবে কেন?

অবশেষে নাগমশাইর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায় ঠাকুর, কেন তুমি আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বলে গিয়েছো? আমার দুঃখের জন্য একজন মানুষ খাটবে, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? ধিক্ আমার এই সংসারে!"

ভাবাচ্যাকা খাইয়া ঘরামীকে এবার নামিতে হইল। নাগমশাই ব্যস্তভাবে তাহার সেবা পরিচর্য্যায় রত হইলেন। সযতনে তাহাকে তামাকু সেবন করানো হইল, নিজহাতে পাখার হাওয়া দিয়া তাহার শ্রম অপনোদন করিলেন। অতঃপর মজুরির টাকাটি নিয়া তবে সে বেচারা সেদিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে!

সেবাব্রতী, নিরীহ পরম শান্ত ভক্ত বলিয়া সবাই নাগমশাইকে জানে। আবার এই নাগমশাইরই ব্যক্তিসত্তায় এক একদিন ফুটিয়া উঠিত অকুতোভয় তেজোদৃপ্ত যোদ্ধার রূপ। আদর্শ ও ইষ্ট সম্পর্কে যেখানে ঘটে মতের সংঘাত, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁহার অনমনীয় দৃঢ়তা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত একমুহূর্ত্তে তিনি জ্বলিয়া উঠেন।

সেদিন কি এক কাজে নাগমশাই তাঁহার শ্বশুর গৃহে গিয়াছেন। তখন সেখানে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। ভদ্রলোকটি কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুরু করিয়া দিলেন। গুরুনিন্দা শুনিবামাত্র নাগমশাইর ক্রোধের সীমা রহিল না। উত্তেজিত কণ্ঠে

কহিলেন, "এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দে চলবে না মশাই, আপনি এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।"

ভদ্রলোকটি বড় দাম্ভিক। এ কথা কানে না তুলিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গালাগালি শুরু করিয়া দিলেন।

এবার নাগমশাইর আর ধৈর্য্য রহিল না। হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বেরোও শালা এখান থেকে!" সঙ্গে সঙ্গে চলিল ভদ্রলোকটির পৃষ্ঠে জুতা-প্রহার।

নিন্দুকটি এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। অনেকের সম্মুখে এভাবে অপমানিত হইয়া ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। শাসাইয়া গেলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু, আর কি ক'রেই বা তুমি এ গ্রামে থাকো।"

বাড়ী ফিরিয়া আসার পর নাগমশাই দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হায়, ঠাকুর! কেন তুমি এসব লোককে আমার সামনে নিয়ে আসো, আর বসে বসে তোমার নিন্দে আমায় শুনতে হয়। তোমার আজ্ঞায় সংসার-আশ্রমে থাকতে গিয়ে একি দুর্দ্দৈব আমায় ভুগতে হচ্ছে।"

ভক্তের এ আর্ত্তি ব্যর্থ হয় নাই। কয়েকদিন পরে সেই নিন্দুক ব্যক্তিটি নতশিরে নাগমশাইয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অনুশোচনায় হৃদয় তাঁহার দগ্ধ হইতেছে, সজল নয়নে বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটির কথা গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কানে গিয়াছিল। নাগমশাই সে-বার কলিকাতায় আসিলে গিরিশবাবু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো জুতো কোনদিন পরেন না, তা হ'লে লোকটিকে মারবার সময় জুতো পেলেন কোথায়?"

নাগমশাই সহজ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কেন? তার জুতো দিয়েই যে সেদ্দিন তাকে মারলাম!"

দেওভোগের আশেপাশে জলাভূমিতে বুনো হাঁস ও নানা জাতীয়

পাখী বাস করে। নারায়ণগঞ্জের পাটকলের সাহেবেরা মাঝে মাঝে এগুলি শিকার করিতে আসে।

সেবার দুটি সাহেব এজন্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অহিংসাব্রতী নাগমশাইর অন্তর বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল। শিকারীদের সম্মুখে তিনি ছুটিয়া গেলেন, করজোড়ে মিনতি জানাইলেন, "আপনারা নিরস্ত হোন। শুধু শুধু এ নিরীহ প্রাণীগুলোকে হত্যা করবেন না।"

রুক্ষ আকৃতি ও মলিন বেশভূষা দেখিয়া নাগমশাইকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ মনে করা কঠিন। তাছাড়া, তাঁহার কথার অর্থও বিদেশীরা বুঝিতে পারিতেছে না। অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আবার তাহারা বন্দুকে গুলি ভরিল।

এবার নাগমশাইর পক্ষে আর ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব নয়। তর্জ্জনী তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "না, এরকম অধর্ম্ম এখানে আপনারা করতে পারবেন না।"

সাহেবরা তাঁহাকে আমল দিতে চাহে না, একটা পাগলের কথায় এ আমোদ তাহারা ছাড়িয়া যাইবে কেন? শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবার তাহারা বন্দুক তুলিল। নাগমশাই মুহূর্ত্ত মধ্যে সিংহবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বভাবতঃই তিনি ধীর স্থির, ক্ষীণ কলেবর। কিন্তু এ সময়ে তাঁহার দেহে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইল প্রচণ্ড শক্তি। অবলীলায় সাহেব দুইটিকে পরাস্ত করিয়া বন্দুক ছিনাইয়া নিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

শিকারী ইংরেজ দুইটির পক্ষে এ ধরণের অপমান হজম করা শক্ত। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা স্থির করিল নাগমশাইকে চিরদিনের মত শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়িবে, অবিলম্বে তাহার নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিবে।

ইতিমধ্যে ঐ পাটকলেরই এক কর্ম্মচারীর হাত দিয়া নাগমশাই বন্দুক দুইটি পাঠাইয়া দেন। নাগমশাই একজন অসামান্য সাধু— অহিংসাকে তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, এসব কথা শোনার পর সাহেবরা নরম হইয়া পড়ে, তাঁহার প্রতি কি জানি কেন তাহাদের

বড় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। বলা বাহুল্য, অতঃপর এ ব্যাপার আর বেশীদূর গড়ায় নাই।

সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে নাগমশাই তাঁহার পরম প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিতেন। প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যাইত চারিদিকে হাত জোড় করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। একবার এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "প্রায় সময় আপনি এমন হাত জোড় ক'রে থাকেন কেন, বলুন তো?"

ভক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, "কি করবো বলুন, ভূতে ভূতে যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।"

নাগমশাইর পত্নী বড় পতিপ্রাণা। এই পতিই ছিলেন তাঁহার ধ্যেয়, ইষ্ট, এবং তাঁহার ছবিটির পূজা প্রতিদিন সম্পন্ন না করিয়া এই ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা জল গ্রহণ করিতেন না। একবার মহাষ্টমী পূজার দিন তাঁহার ইচ্ছা হয়, নাগমশাইর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন।

নাগমশাই ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় পত্নী স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিয়া প্রণাম করিলেন।

নাগমশাই শান্ত স্বরে শুধু বলিয়া উঠিলেন, "যাকে আমি পূজা করি, তার সেবা পূজা নেওয়া কি ঠিক?"

অর্থাৎ, জগন্মাতার প্রকাশ রূপেই যে তিনি স্ত্রীকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাঁহার পূজা তাই কি করিয়া নিবেন?

একবার একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, নাগমশাইর পত্নী গৃহকর্ম্মে রত, স্বামীর এবং গৃহের অভ্যাগতদের সেবা ও যত্নের জন্য তিনি সদা তৎপর। নবাগত ভক্তটির অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। ভাবিলেন, এ আবার কেমন সাধু? সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া যে চলিতেছে, তাঁহার আবার ভার্য্যা নিয়া বাস করা কেন?

এই চিন্তার তরঙ্গ অন্তর্য্যামী নাগমশাইর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তখনি

তিনি উত্তরে কহিলেন, "কেন, কেন ? এতে দোষ কোথায় ? মা অন্নপূর্ণা যে স্বয়ং এ গৃহে বাস ক'রে আমাদের অন্নের যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন।"

ভদ্রলোক তো অবাক্! নাগমশাইর পত্নী সম্বন্ধে প্রশ্নটি আলোড়িত হইয়াছে তাঁহার মনে, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলেন নাই। অথচ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ তাঁহার অন্তস্তলের চিন্তাকে টানিয়া বাহির করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার উত্তর দিয়া দিলেন। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তিনি নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রাণী মাত্রেরই উপর নাগমশাইর ঈশ্বর ভাব, আর নারী মাত্রকেই তিনি দেখেন জগজ্জননীর প্রতীকরূপে। পত্নীকে তিনি চিরকাল যে এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত!

সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন—ইহা তাঁহার জীবনে ছিল এক উপলব্ধ পরম সত্য। তাই দেখা যাইত, মশা মাছি গায়ে বসিলে তিনি সেগুলি তাড়াইতে পারিতেন না। গৃহ-অঙ্গনস্থিত কোন গাছের পাতা কেহ ছিঁড়িলে তাঁহার বুকে বাজিত সুতীব্র ব্যথা। সকাতরে বলিয়া উঠিতেন, "আহা, আহা, এমন ক'রে ছিঁড়ো না। জানো, এদেরও ব্যথা বেদনা বোধ রয়েছে আমাদেরই মত।"

সেবার এক ভক্তের চোখে পড়িল—নাগমশাইর পূজামণ্ডপের বেড়াটিতে অজস্র উইপোকা বাসা বাঁধিতেছে। শেষে কি সারা ঘর নষ্ট হইবে ? তখনি তিনি একটা বাঁশ দিয়া এই বেড়াটির উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। উই-এর বাসা ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু উই পোকাও এ সময়ে নিরাশ্রয় হইয়া ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য নাগমশাইর কাছে দুঃসহ। অশ্রুসজল চোখে বিলাপ করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এ কি অনর্থ আপনি করলেন ? এতকাল এরা এই বেড়ার ভেতরে ঘর-দোর তৈরী ক'রে বসবাস করছিলো, এবার সে আশ্রয়টুকুও রইলো না। বড় অন্যায় করেছেন, বড় অধর্ম্ম করেছেন।"

ভক্তটি নির্ব্বাক ও অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এবার উই পোকাগুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাগমশাই করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "আপনারা আবার বাসা তৈরী করুন, আর কোন ভয় নেই।"

মানুষের ভাষা বুঝুক আর না বুঝুক ভক্তের হৃদয়-আকুতি বুঁঝিতে বল্মীকদের ভুল হয় নাই। ক্ষণপরেই আবার সদলবলে আসিয়া তাহারা মণ্ডপের এই বেড়াটি অধিকার করে। বলা বাহুল্য, অচিরে উই-এর আক্রমণে ঘরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

নাগমশাইর বাড়ীর পাশেই রহিয়াছে এক পুষ্করিণী। সেদিন একটি জেলে সেখান হইতে এক চুপাড় মাছ ধরিয়া নিয়া নাগমশাইর বাড়ীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। সদ্য ধরা হইয়াছে তাই অধিকাংশই তখনো জ্যান্ত।

এগুলির দিকে তাকাইতেই নাগমশাইর হৃদয় গলিয়া গেল। তখনি ঐ এক চুপড়ি মাছ তিনি কিনিয়া ফেলিলেন। তারপর যে পুকুর হইতে এগুলি ধরা হইয়াছিল তাহারই গর্ভে দিলেন বিসর্জ্জন।

ধীবর তো নাগমশাইর কাণ্ড দেখিয়া অবাক! মৎস্য বিক্রয়ের জন্য অতঃপর এবাড়ীতে আর কোনদিন সে আসে নাই।

সে-বার কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ শুরু হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা কেবলি চলিয়াছে বৃদ্ধির দিকে। আতঙ্কে বহু লোক শহর ছাড়িয়া এ সময়ে পলাইতে থাকে। পালবাবুরাও কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ী দেখাশুনার ভার রাখিয়া গেলেন নাগমশাইর উপর।

কয়েক দিনের মধ্যেই গদির একটি মুহুরি প্লেগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা সেবাপরিচর্য্যার। সহজে রোগীকে কেহ স্পর্শ করিতে চায় না। নাগমশাই নিজেই প্রাণপণে লোকটির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই বড় খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এবার সে নাগমশাইকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে অবিলম্বে যেন গঙ্গাতীরে নিয়া যাওয়া হয়, সেখানেই সে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চায়।

কিন্তু গঙ্গাতীরে তাঁহাকে অপসারণ করা সহজ নয়, প্লেগ রোগীর ঘরের কাছেও কেহ যে ঘেঁষিতে চাহে না। এ অবস্থায় তাঁহার দেহ বহন করিবে কে?

কোন লোক পাওয়া যাইতেছে না, অগত্যা নাগমশাইকে একলাই এই প্লেগ রোগীকে বহন করিয়া নিতে হইল। গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নাগমশাইর কোলে শুইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বহু কষ্টে লোক যোগাড় করিয়া, মৃত ব্যক্তির সৎকার শেষে, নাগমশাই ঘরে ফিরিয়া আসেন।

নাগমশাইর সঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের বড় সম্প্রীতি ছিল। রামকৃষ্ণ-নিষ্ঠ এই দুই ভক্তবীরের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিত।

সেদিন সাধু নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পরম সমাদরে তখনি তাঁহাকে দোতালার বৈঠকখানায় নিয়া যাওয়া হইল। আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশের মজলিশে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

নাগমশাই শয্যা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে শয়ন করা দূরের কথা উপবেশনও করেন না। ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের দিকে আর গেলেন না, নিতান্ত দীনভাবে মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

তিনি যে এক উচ্চ স্তরের সাধুপুরুষ ইহা অনেকেরই জানা আছে। সবাই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ফরাসে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, পীড়াপীড়িও শুরু হইল।

গিরিশ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে এই সমাদরের বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। কহিলেন, "থাক্ থাক্, ওঁকে আপনারা আর বিরক্ত ক'রবেন না। উনি যেখানে যে ভাবে বসে সুখী হন, সেই ভাবেই বসুন।"

গিরিশ এবার অনুরোধ জানাইলেন, "নাগমশাই, আজ বড় সৌভাগ্য, আপনার মত লোক দয়া ক'রে এসেছেন। এবার ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, সে অমৃত বাণী পান ক'রে আমরা কৃতার্থ হই।"

নাগমশাই দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি। করজোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, "আমি মূর্খ দুরাচার, তাঁকে চিনতে পারলাম কই? আপনারা কৃপা করুন যাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে সত্যকার ভক্তি জন্মে, জীবন সফল হয়।"

উপস্থিত সবাই এই পরম ভক্তের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। দৈন্য ও আত্মবিলুপ্তির এই মূর্ত্ত বিগ্রহের সান্নিধ্যে বসিয়া নিজেদের অহংবোধও যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ সৃষ্টি এই ভক্তবীরের সম্মুখে বসিয়া গিরিশের দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন, "তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? যাঁর কৃপাগুণে মানুষের এমন অবস্থা হয়, তাকে কি ভগবান্ না ব'লে থাকা যায়!"

আর একদিনের কথা। নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। এ সময়ে নিরঞ্জনানন্দ নাগমশাইকে কহিলেন, "মশাই, ঠাকুর বলতেন, 'নিজেকে দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়'—আপনি দিনরাত অমন ক'রে আপনাকে দীনহীন মনে ক'রেন কেন?"

নাগমশাই হাত জোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "সে কি কথা! নিজের চোখে নিরন্তর দেখ্‌ছি, আমি অতি হীন, অতি অধম, কি ক'রে আমি নিজেকে শিব মনে ক'রবো। আপনি ও কথা বল্‌তে পারেন। আপনারা ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু আমার ও রকম ভক্তি হ'লো কই? আপনাদের কৃপা হ'লে, ঠাকুরের কৃপা হ'লে আমি যে নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবো।"

কি অপূর্ব্ব আর্ত্তি ও দৈন্য এই মহাভক্তের বাক্যে আর বচন ভঙ্গীতে! নিরভিমানতার কি অপরূপ প্রকাশ তাঁহার ব্যক্তিসত্তায়! উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে বেশ কিছুকাল বসিয়া রহিলেন, বাদ-বিতর্কের ভাষা কাহারও মুখে যোগাইল না।

এই দিনকার ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে কহিতেন, "ঠিক ঠিক দীনতা হ'লে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হ'লে, মানুষের নাগমশাইর মত অবস্থা হয়। এ সব মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয়।"

সে-বার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মা সারদামণিকে তিনি দর্শন করিতে যান। পরম ভক্তের এই মাতৃ-মিলনের মধুর দৃশ্যটি নাগমশাইর চরিতাকার শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

—"কুমারটুলির বাসায় গিয়া দেখিলাম, নাগমশায় মায়ের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুন পেড়ে কাপড় কিনিয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় মা মা করিতেছেন। কুমারটুলি হইতে আহিরীটোলায় আমরা একখানি চল্‌তি নৌকায় উঠিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌঁছিলাম। ঘাটে পৌঁছিয়াই নাগমশাই বাতাহত কদলী পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। জয় মা, জয় মা—বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমশাইকে দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে উঠিবামাত্র তিনি নাগমশায়কে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন।

"প্রায় আধঘণ্টা পরে তাহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসেন। তখনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল!' স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'আহা! আজ নাগমশায়ের উপর মা কি কৃপাই করিয়াছেন!' নাগ-মহাশয়ের সন্দেশ মা নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর পান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা বিদায় লইলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় আলোড়ন তুলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভক্ত শরৎচন্দ্র নাগমশাইর কাছে যাতায়াত করেন শুনিয়া স্বামীজী তাহাকে ডাকাইলেন, কহিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হৃতা, মধুকর ত্বং খলু কৃতী।" অর্থাৎ আমরা তত্ত্ব অন্বেষণের পেছনে ঘুরে মরছি, কিন্তু মধুকর তুমিই হচ্ছো প্রকৃত

কৃতী—তুমিই পান করেছ মধুরস। স্বামীজীর এই মধুকর হইতেছেন রামকৃষ্ণরসে রসায়িত প্রাণ ভক্তপ্রবর নাগমশাই।

সে-বার নাগমশাই বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম! কোন মতেই তাঁহাকে ঠেকানো সম্ভব হইল না।

স্বামীজীর শরীর তখন বড় অসুস্থ। নাগমশাই তাই তাঁহার জন্য বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রেমভরে কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন, আপনি হচ্ছেন মোহরের বাক্স। ঠাকুরের কথা তো মিথ্যে হতে পারে না। সত্যিই তো মোহরের বাক্স। একবার দেহের দিকে দৃষ্টি দিন, আপনার এ দেহের রক্ষায় দেশের কল্যাণ হবে, জগতের কল্যাণ হবে।"

নব-প্রবর্ত্তিত মঠ মিশন প্রভৃতি সংগঠনকর্ম্ম শুরু করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, প্রবীণ ভক্তের কাছে স্বামীজী তাহা যাচাই করিয়া নিতে চান। নাগমশাইকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন।

উত্তর হইল, "ঠাকুরের ইচ্ছায় এসব কাজ হচ্ছে। এতে মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা, নাগমশাই বেলুড় মঠে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার পূত চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকিয়া মঠের সন্ন্যাসীরা প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাইবে।

নাগমশাই জানাইলেন, "কি করি, কেমন ক'রে ঠাকুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? তিনি যে আমায় গৃহেই থাকতে বলে গিয়েছেন!"

স্বামীজী সমবেত সন্ন্যাসীদের কহিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে বুঝতে পারা যায়। কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয় সংযমে, ইনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

স্বামীজীকে একথাও একবার বলিতে শুনা গিয়াছিল, "পৃথিবীর এত দেশ ঘুরে এলাম, কোথাও নাগমশাইর মত মহাপুরুষ চোখে পড়লো না।"

পূর্ব্ববঙ্গে সফরে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ নাগমশাইর

এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ও দেশে গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই। যে দেশ নাগমশাইর চন্দ্রালোকে আলোকিত, সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলবো।"

ভক্তটি বলিয়া উঠেন, "কিন্তু স্বামীজী, তিনি তো অতি গুপ্তভাবে ছিলেন, সাধারণের কাছে তেমন কিছু বলেন নি!"

"ওরে, মুখে নাই বা কিছু বললেন। নাগমশাইর মত মহাপুরুষদের চিন্তা তরঙ্গে দেশের চিন্তাস্রোতের গতি ফিরে যায়।"

ত্যাগ বৈরাগ্য আর শুচিতায় ভরা ছিল সাধু নাগমশাইর জীবন। নিঃশব্দে নিভৃতে তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। আত্মগোপনপ্রয়াসী এই গৃহীসন্ন্যাসী তাই কোনদিনই নিজের চতুষ্পার্শে ভক্ত ও শিষ্যের ভীড় রাখিতে চান নাই।

কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে—মধুলোভী ভ্রমরকে ঠেকানো যায় কই? তাই সাধু নাগমশাইর পদপ্রান্তে ধীরে ধীরে সমবেত হইতে থাকে একদল পুণ্যলোভী, মুক্তিকামী ভক্ত। সংখ্যা তাঁহাদের বেশী নয়, কিন্তু আন্তরিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দিক দিয়া তাঁহাদের তুলনা বিরল। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "নাগমশাই তাঁর সাধক ভক্তদের ওপর স্নেহময়ী জননীর মত সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।"

সাধু নাগমশাইর ভক্ত-প্রীতির নানা কাহিনী ছড়ানো রহিয়াছে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতার 'মাষ্টার অ্যাজ আই স' হিম্ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে :

সেবার ঢাকাস্থিত একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। তখন বর্ষাকাল। বিশেষ করিয়া সেদিন দেখা দেয় ঘোর দুর্য্যোগ।

সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জে পৌছিয়া দেখেন, ঘাটে একটি নৌকাও নাই। সারাদিন অশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাত্যা বিক্ষোভও কম নাই। মাঝিরা ভয়ে নৌকা নিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে। ভক্তটি বড় বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার দুর্য্যোগময় রাত্রিতে

নৌকা ছাড়া দেওভোগ গ্রামে কি করিয়া যাইবেন ? চারিদিক জলে জলাময় হইয়া গিয়াছে। তবে উপায় ?

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে দেরী হইল না। সাধু নাগমশাইকে স্মরণ করিয়া এই ভক্তটি জলে ঝাঁপ দিলেন। সাঁতরাইয়া সারা পথ অতিক্রম করিয়া যখন নাগমশাইয়ের গৃহে পৌঁছিলেন তাঁহার দেহ তখন ক্লান্তিতে অসাড়। এত রাত্রে এ ভাবে ভক্তটিকে আসিতে দেখিয়া নাগমশাই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। বিচলিত হইয়া কহিলেন, "এই অন্ধকারে, বর্ষার এই দুর্যোগে কি এমন ক'রে আসতে আছে ? তাছাড়া, এই বন্যার সময় কত সাপ বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কেন একাজ আপনি করেছেন ?"

ভক্তটি সজলনয়নে উত্তর দেন, "আপনাকে আজ একটিবার দর্শন করার বড় তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল। তাই এ কাজ না ক'রে আমার উপায় ছিল না।"

রাত্রি যথেষ্ট হইয়াছে। এবার ভক্ত অতিথির জন্য কিছু রন্ধন করা প্রয়োজন। গৃহকর্ত্রী জানাইলেন, ঘরে একটুক্‌রো শুক্‌নো কাঠও নেই, কি ক'রে ভাত রাঁধবো ?"

এ দুর্যোগময় রাতে কোথায় যাইবেন ? কেই-বা জ্বালানি কাঠ দিবার জন্য দুয়ার খুলিবে ? অগত্যা নাগমশাই কুঠার দিয়া একটি ঘরের খুঁটি কাটিতে শুরু করিলেন।

ভক্তটি ছুটিয়া গিয়া নাগমশাইকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। নাগমশাইর পত্নী তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে উত্তর হইল, "যারা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে সাপের মুখে সাঁতার কেটে আমায় দেখতে আসেন, তাদের জন্য আমি কি সামান্য একটা ঘরের মায়া ছাড়তে পারিনে! প্রাণ দিয়েও যদি আমি এদের উপকার করতে পারি, তবে আমার এ দেহ সার্থক হয়।"

বলা বাহুল্য, কাঠের এই খুঁটি কাটিয়া সেদিনকার অতিথি সেবার কাজে লাগানো হয়, ঘরটিও অল্পকাল মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়ে।

প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্য নাগমশাইকে মাঝে মাঝে অলৌকিক শক্তিও প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে।

এক নতুন ভক্ত কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। নাগমশাইর সঙ্গে সবে পরিচয় হইয়াছে। আর এ পরিচয় তাঁহার হৃদয়ে জ্বালিয়া দিয়াছে মুমুক্ষার আগুন। দিনরাত কেবলি সে ভাবিতে থাকে কবে আবার নাগমশাইর দর্শন পাইবে, মহাপুরুষের শ্রীমুখের অমৃতবাণী শুনিয়া প্রাণ তৃপ্ত করিবে।

অবশেষে একদিন আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। এমন মহাপুরুষকে পাইয়াও সে তাঁহার চরণতলে চিরতরে আশ্রয় নিতে পারে নাই—বরং পাইয়া তাঁহাকে হারাইয়াছে। তবে এ ছার প্রাণ রাখিয়া আর লাভ কি? ভক্তটি স্থির করিল, ছাদ হইতে পড়িয়া সে আত্মহত্যা করিবে।

ছাদের আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া যেই সে ঝাঁপ দিতে যাইবে, অমনি শুনিল, কে যেন স্পষ্ট স্বরে তাহাকে বলিতেছে, "অযথা ভেবো না, শান্ত হও। আগামী কালই নাগমশাইর সাথে তোমার দেখা হবে।"

এ কাহার দৈববাণী? যুবক ভক্তের সর্ব্বদেহে জাগিয়া উঠিল এক অপূর্ব্ব শিহরণ। মনের বিক্ষোভ ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া গেল।

পরদিন ভোরবেলায় নাগমশাইর দর্শন ঠিকই পাওয়া গেল। ছাত্রাবাসের দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া ভক্তটিকে তিনি ডাকিতেছিলেন। হাতে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী, সবেমাত্র দেশ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

শান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ কহিলেন, "আপনি কি সব করতে যাচ্ছেন ভেবে ভেবে মন বড় খারাপ হ'লো। তাই তো হঠাৎ ক'লকাতায় চলে আসতে হয়েছে। ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের রাজ্যে এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই। জেনে রাখবেন আত্মনাশ এক মহাপাপ"

ভক্তটির মুখ দিয়া একটি কথাও সরিতেছে না, এই অন্তর্য্যামী সাধকের সম্মুখে তিনি চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছেন।

নাগমশাই আবার তাঁহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "এতদিন ছিলেন খালে বিলে, এবার এসে পড়লেন সমুদ্রে।" অর্থাৎ,

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা-সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে, অমৃত সাগরে ভাসিয়া বেড়ানোর সৌভাগ্য তাহার। তবে আবার কিসের ভয়?

আশ্রয়ার্থী বহু ভক্তের জীবন নাগমশাইর পবিত্র স্পর্শে দিনের পর দিন রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কৃপাঘন দিব্য দৃষ্টি বহু আর্ত্তের আধি-ব্যাধি দূর করিয়াছে! কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আত্ম-গোপনপ্রয়াসী মহাপুরুষ তাঁহার অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া ঘটাইয়াছেন নীরবে, প্রচ্ছন্নভাবে।

সিদ্ধপুরুষ নাগমশাইর অলৌকিক লীলার প্রকাশ একবার কিন্তু প্রকটরূপেই দেখা গিয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল দেওভোগ গ্রামে। পিতৃসেবার তীব্র আবেগ সেদিন মহাপুরুষের মনের ইচ্ছাটিকে উদগ্র করিয়া তোলে, এক বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দৃশ্য বহুজন সমক্ষে সেদিন উন্মোচিত হয়।

নাগমশাই তখন বাস করেন কলিকাতায়, আর বৃদ্ধ পিতা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে দেওভোগে। সে-বার আসিয়াছে পুণ্যময় অর্দ্ধোদয় যোগ। লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। এই পবিত্র যোগের কয়েকদিন আগে নাগমশাই স্বগ্রামে গিয়া উপস্থিত। শুনিয়াছেন পিতার শরীর বড় অসুস্থ।

বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু এসময়ে পুত্রকে গ্রামে আসিতে দেখিয়া বড় রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "দ্যাখ্, এই অর্দ্ধোদয় যোগে কত লোকে টাকা-কড়ি ব্যয় ক'রে আর সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ক'লকাতায় যাচ্ছে গঙ্গা-স্নান করতে। আর তুই এ সময়ে গঙ্গাতীর ত্যাগ ক'রে এলি? তোর ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্ম আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনো তো তিন-চার দিন বাকী আছে। আমায় একবার ক'লকাতার গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবি? শেষ কালের পুণ্য করতে দিবি?"

পুত্র ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যদি কারো সত্যিকার ভক্তি থাকে, ভাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন—তাকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না।"

গঙ্গাস্নানের দিন দেওভোগে এক অপূর্ব্ব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল।

নাগমশাইর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠিক অর্দ্ধোদয় যোগের সময় অঙ্গনের অগ্নিকোণে দেখা গেল এক উচ্ছলিত জল-প্রবাহ। ভূগর্ভ ভেদ করিয়া কলকল শব্দে উহা উপরে উঠিতেছে, সারা প্রাঙ্গণ ভাসাইয়া ফেলিতেছে। কৌতূহলী জনতার মধ্যে তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল।

নাগমশাই গৃহ মধ্যে কি এক কাজে ব্যাপৃত, কলরব শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। ভক্ত হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল তীব্র ভাবোন্মাদনা, "মা! পতিত পাবনী মা-ভাগীরথী!" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া সাষ্টাঙ্গে এ জলধারার সম্মুখে তিনি প্রণত হইলেন। পুণ্যতোয়া গঙ্গার জয়-ধ্বনিতে সেদিন নাগমশাইর অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠে। দলে দলে পুণ্যার্থী নরনারীরা এই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হয়। এই পবিত্র জলস্পর্শে কাহারো কাহারো দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এ সময়ে নিরাময় হয়। শত শত লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত এই উৎসধারা ঘণ্টাখানেক পরে থামিয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অলৌকিক ঘটনাটির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সে আর এমন কি কথা? অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় সব কিছু সম্ভব হয়। এঁদের ইচ্ছা অমোঘ, এ ইচ্ছাশক্তিতে জীব উদ্ধার পেয়ে যায়।"

অপ্রাকৃত দর্শন, অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন, ইত্যাদির দিকে ভক্তেরা যাহাতে বেশী না ঝুঁকে ইহাই নাগমশাই চাহিতেন। এজন্য তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধনার মূল তত্ত্বটির দিকেই প্রধানতঃ ভক্তদের চিন্তাধারাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিতেন। বলিতেন, "গাছের তলায় জেগে বসে থাকার মত, সাধনার দ্বারা আপনাকে সদাই জাগ্রত রাখতে হয়। কিন্তু ফল রয়েছে তাঁর হাতে। তিনি নিজে কৃপা ক'রে ফল দিলে তবে জীব তার অধিকারী হয়, নতুবা নয়। দেখা যায়—কেউ বা ঘুমিয়ে আছে, ভগবান্ দয়া ক'রে হয়তো তার মুখে ফল ফেলে দিলেন, তাকে আর কোন কিছু সাধন ভজন করতে হয় না। এসব সাধক কৃপাসিদ্ধ হন। ভগবান্ যতদিন না কৃপা করেন, ততদিন কেউ তাঁর স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হয় না। তিনি

কল্পতরু—যে যা চায়, নিশ্চয় তাকে তা দান করেন। কিন্তু যাতে জীবকে বার বার জন্ম মৃত্যুর পথে যেতে হয় এমন বাসনা কখনো করা জীবের উচিত নয়।

"ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তবেই জীব সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবৎ কৃপায় মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসনা ত্যাগ করা যায়, তা থেকে জীবের কল্যাণ সাধনা আসবেই। কিন্তু যিনি ভগবান, ভক্ত ও ভগবৎ প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন তাঁর ত্রিতাপ জ্বালা অন্তে দূর হয়ে যায়।"

সাধু নাগমশাইর এ সব কথার পশ্চাতে ছিল তাঁহার জীবনের সূক্ষ্মতর দিব্য অনুভূতি, আর তাঁহার উপলব্ধ সত্য। মা জগজ্জননীর অসীম কৃপা ছিল এই মহাসাধকের উপর, মাতৃসাধনার সিদ্ধি তাঁহার হইয়াছিল করতলগত।

এক ভক্ত সে-বার নাগমশাইর পত্নীর কাছে বসিয়া মহাপুরুষের সাধন জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে নাগমশাইর পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ওঁর সাধন ভজনের কথা কি ব'লছো! উনি ইচ্ছে ক'রে যে দেবদেবীকে ডাকেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ ওঁকে দর্শন দেন। উনি নিজেই যে একথা কতদিন আমায় বলেছেন।"

নাগমশাই দেবদেবীর উপর বড় ভক্তিমান্। হৃদয়ে একবার ভাবাবেগ উপস্থিত হইলেই মা-মা বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন। দেব-দেবীর সাথে ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় অস্ফুট স্বরে কথাবার্ত্তাও তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়। ভক্ত শরৎচন্দ্র তাই একদিন মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন, তবে কি নাগমশাই শুধু দেবতাসিদ্ধ! তিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন! এই ভাবনার পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা তিনি দিয়াছেন —"আমি এরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তাঁহার পূর্ণ ভাবাবেশ —বলিলেন, 'মা কি আমার এই খড়ে মাটিতে আবদ্ধ! তিনি যে

অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী। মা যে আমার মহাবিদ্যা স্বরূপিণী!' বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতা ঠাকুরাণীকে আমি একথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি তো তাঁর এ অবস্থা আজ নূতন দেখ্‌লে। এক এক দিন দুই তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না। এক এক দিন আমার মনে হয়, তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝিবা চলিয়া গেলেন।"

সাধনা ও সিদ্ধির পথ বাহিয়া মহাসাধকের মরজীবন এবার ধীরে ধীরে শেষ অঙ্কের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

১৩০৬ সালের শীত ঋতু। মহাসাধক নাগমশাই তাহার শেষ শয্যায় শায়িত। জীর্ণ দেহের প্রাকার টুটিবার এবার আর বেশী দেরী নাই। নিকটে উপবিষ্ট ভক্তটিকে একদিন ডাকিয়া কহিলেন, একবার পঞ্জিকাটা দেখুন দেখি। সামনে যাত্রার ভাল দিন কবে!

পঞ্জিকা দেখিয়া বলা হইল, "আজ্ঞে ১৩ই পৌষ ১০টার পর যাত্রার বেশ দিন রয়েছে।"

"আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে ঐ দিনই মহাযাত্রা করবো।"

সেবক ভক্তটি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নাগমশাইর সাধ্বী পত্নী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আর কেন কাঁদ্‌ছো বাবা! উনি কিছুতেই এ শরীর আর রাখবেন না। ওঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দেহত্যাগ করুন। দেখে আমরা আনন্দিত হবো।"

নির্দ্দিষ্ট দিন ও লগ্নটি আসিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বীরভক্ত চিরতরে মরদেহ ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় একবার কিছুটা নড়িয়া উঠে। অস্ফুট স্বরে শেষ বাণীটি উচ্চারিত হয় 'কৃপা, কৃপা—নিজগুণে কৃপা!'

পরমহংস দয়ালদাস-বাবা

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কথা। এই সময়ে শুধু পাঞ্জাবেই নয়, সারা উত্তর ভারতে প্রচারিত ছিল ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। পাতিয়ালা জেলার বসেরা গ্রামের আশ্রমটি ছিল তাঁহার নিভৃত সাধনকেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিতে অল্প সংখ্যক অন্তরঙ্গ মুমুক্ষু শিষ্য নিয়া তিনি বাস করিতেন, সাধন-পথের দিতেন দিক্‌দর্শন। আবার মাঝে মাঝে মণ্ডলীসহ বাহির হইতেন তীর্থ পরিক্রমায়। যে গ্রামে, যে শহরে এই সদানন্দময় মুক্ত পুরুষ আবির্ভূত হইতেন, দেখা দিত বিরাট জনসংঘট্ট, সাধু-সন্ত ও ভক্ত গৃহস্থেরা দলে দলে ভীড় করিত তাঁহার চরণতলে। পুণ্যলোভী দাতা ও শেঠেরা সোৎসাহে ভাণ্ডারা লাগাইত তাঁহার ছাউনিতে। তীর্থ পরিক্রমার শেষে আবার নিজ গ্রামের আশ্রমটিতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরদাস-বাবা রত হইতেন নিভৃত সাধনায়।

বসেরার মঠ প্রাঙ্গণে সেদিন তিনি শিষ্য পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্ত জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসজী নানা তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে চলিতেছে মৃদু মধুর হাস্য পরিহাস।

এমন সময়ে একটি বালক সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বয়স তাহার প্রায় বারো বৎসর। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত, তীক্ষ্ণ নাসা, বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ দুটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পরনে রহিয়াছে গৈরিক বহির্ব্বাস। নগ্নপদ দুইটিতে জমিয়াছে প্রচুর পথের ধূলা। দেখিলেই মনে হয়, বহু দূরের পথ অতিক্রম করিয়া সে আসিয়াছে।

আগন্তুক বালক প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঠাকুরদাস-বাবার নয়ন দুটি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। স্মিত হাস্যে বলিয়া

উঠেন, "আরে, এ দেখ্‌ছি আমাদের ছোটেলালজী! তারপর, কি মনে ক'রে? তোমার বাড়ীর সবাইর কুশল তো?"

মঠের ভক্ত ও সেবকেরা এতক্ষণে বুঝিয়া নিয়াছেন, এই বালক পরমহংস-বাবার পূর্ব্ব পরিচিত। কিন্তু এত অল্প বয়সে গৈরিক নিয়া সে সাধু হইয়াছে? সবাই বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন।

বালক করজোড়ে উত্তর দেয়, "বাবা, আমি এসেছি আপনারই কাছে। আপনার কাছে আশ্রয় নিতে। আমি সাধু হবো। সাধু হয়ে ভগবান্ লাভ ক'রবো, এজন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

"তা ছোটেলালজী, তুমি তো দেখ্‌ছি আগে থেকেই গৈরিক প'রে ফেলেছো, সাধু তো তুমি ব'নেই গেছো।"

বালক বড় সপ্রতিভ। শান্তস্বরে, স্পষ্ট ভাষায় সে উত্তর দেয়, "না, মহারাজ। এটা আমার লোক দেখানো বেশ। আমার মাতাজী বললেন,—'আমাদের কপিয়াল গাঁও থেকে বসেরা যে অনেক দূর, ক'দিনের পথ পায়ে হেঁটে যাবি, তো ক'দিন তোকে খেতে দেবে কে? তবে কি অনাহারে মরবি?'

"আমি বল্‌লাম, তোমার কোন ভয় নেই, একটা গৈরিক কাপড় জড়িয়ে আমি চলে যাবো, ভালো গৃহস্থেরা দু টুক্‌রো শুক্‌নো রুটি আমায় দেবেই। তাই আমার এ বেশ।"

"হো-হো-হো"—অট্টহাসতে ফাটিয়া পড়েন ঠাকুরদাস-বাবা। বলেন, "তুমি চতুর ছেলে, মাথায় ভাল ফন্দী এঁটেছিলে। কিন্তু ছোটেলালজী ভগবান্ লাভ করবে বলে তো পথে বেরিয়েছো। ভগবান্ কিন্তু বড় চতুর; ধরতে গেলেই পালিয়ে যান, হাতের মুঠো যত শক্তই ক'রো, ফস্‌কে যান। তাঁর সাথে এঁটে উঠতে পারবে কি?"—কৌতুকের সুর ফুটিয়া উঠে ঠাকুরদাস-বাবার কথা কয়টিতে।

"মহারাজ, সবার কাছে শুনি, আপনার মতো মহাত্মারা সেই ভগবান্‌কে বশে রাখার কৌশলটি জানেন। আমি সে কৌশল আপনার কাছেই শিখে নেবো। প্রাণপাত ক'রে তা শিখ্‌বো।

এবার গম্ভীর হইয়া উঠেন ঠাকুরদাস-বাবা। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন

করেন, "উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা, ছোটেলালজী। কিন্তু তোমার বাবা মায়ের সম্মতি এতে আছে তো? সব আমায় খুলে বলো।"

"মহারাজ, মাপ ক'রবেন, এতক্ষণ কথায় কথায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার বাবা আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছেন। এই যে সেটি।"

পরমহংসজীর নির্দ্দেশে একজন সেবক চিঠিটি সেখানে পাঠ করিলেন। মর্ম্ম এইরূপ:

বাবা মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। অতঃপর সমাচার এই, অনেকদিন যাবৎ আপনার দর্শন না পাইয়া আমরা মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটেলালকে আপনি জানেন। বয়সে সে বালক, কিন্তু আর সে এখন গৃহে থাকিতে চায় না, সাধু হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রামে বহু সাধু-সন্তের সমাগম হয়। ছোটেলাল তাঁহাদের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাঁহাদের ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে, চাপাটি তৈরী করিয়া দেয়, নানাভাবে তাঁহাদের সেবা করে। আপনার সেবার সুযোগ পাইয়াও সেবার সে অনুগৃহীত হইয়াছে। সাধু-সঙ্গ ও সাধু সেবার ফলে ভগবান্ প্রাপ্তির অভিলাষ তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। স্থির করিয়াছে, সংসার সে ত্যাগ করিবে, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবে।

আমাদের আরো কয়েকটি জোয়ান ছেলে আছে। তাহারা আমার ক্ষেতের কাজ করে, বিষয়-কর্ম্মে সাহায্য করে। আমি এবং ছোটেলালের মা তাই পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, একটি পুত্রকে প্রভু শিবজীর সেবায় নিয়োগ করিব, সন্ন্যাসী হইতে দিব। ছোটেলাল এই অল্প বয়সে ভগবানের জন্য পাগল। দিনরাত সাধুর পিছনে ঘোরে আর গ্রামের শিব মন্দিরে গিয়া ধ্যান-ভজন করে। আমার ছেলেদের মধ্যে সেই-ই সাধু হওয়ার যোগ্য। তাই আমরা তাহাকে এজন্য অনুমতি দিতেছি। তাছাড়া, সাধু যদি হইতেই হয় সে আপনার মত কৃপালু মহাত্মার মঠে থাকিয়াই সাধুর জীবনযাপন করুক। তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব।

আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, একটি ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া মুক্তি লাভ করিলে তাহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হয়, পৃথিবী পুণ্যবতী হয়। আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—শ্রীচরণাশ্রিত...

ঠাকুরদাস-বাবা প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "তথাস্তু। যাও বেটা, আর বিলম্ব না ক'রে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো, আর এ বেশ ত্যাগ ক'রে মঠের গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করো আমার হাত থেকে।"

তারপর প্রবীণ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া আদেশ দিলেন, "আজ অতি শুভ দিন। পুণ্যলগ্নও সমাগত। তোমরা ছোটেলালের জন্য বিরজাহোমের সব ব্যবস্থা করো। আজই আমি তাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেবো।"

জনৈক সেবক আর কালবিলম্ব না করিয়া ছোটেলালকে নিয়া মঠের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

প্রবীণ শিষ্যদের মধ্যে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন, তাইতো, এত তাড়াহুড়া করিয়া গুরু মহারাজ তো কখনো কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই! তাছাড়া, এত অল্প বয়স্ক বালকের সরাসরি সন্ন্যাস-দীক্ষা? গুরুজী তো ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তুতির উপর সদাই গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু কই, এ ক্ষেত্রে তো তাহার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলিতেছেন না?

অন্তর্য্যামী পরমহংসজী প্রবীণ শিষ্যদের মনোভাব মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "ছোটেলাল, আজ এই মঠে আত্মসমর্পণ করতে আসবে—এ আমি জানতাম। তাই প্রাঙ্গণে বসে তার প্রতীক্ষা করছিলাম। দু'বছর আগে আমি একটা সাধু জমায়েৎ নিয়ে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। ছোটেলাল আমার সেবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। তখনি দেখলাম, ওর মস্তকের চারদিকে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতির বেষ্টনী। বুঝলাম, শিগ্‌গীরই মুমুক্ষার আগুন জ্বলে উঠবে ওর জীবনে, চিরতরে গৃহ ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করবে সন্ন্যাস জীবন।"

জনৈক শিষ্য মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন, "কিন্তু গুরু মহারাজ, সাধারণ

ভাবে আমরা দেখে আস্‌ছি, আগে সাধকের ব্রহ্মচর্য্যের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়া হয়। এর বেলায় দেখছি ভিন্নরূপ ব্যবস্থা।”

পরমহংসজী উত্তর দিলেন, “বেটা, সমর্থ গুরু শিষ্যের জন্য ব্যবস্থা-পত্র দেয় তার বিগত তিন জন্মের সুকৃতি বিচার ক'রে। তাছাড়া, এ জন্মের তীব্র বৈরাগ্য, তীব্র মুমুক্ষার কথাও তো বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। জান তো, শ্রুতি বলেছেন, যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রব্রজেৎ, অর্থাৎ যেদিনই সাধকের সত্যকার তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হবে, সেইদিনই গুরু তাঁকে দেবেন সন্ন্যাস। এতে তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষের প্রশ্ন ওঠে না। তবে সর্ব্বদা মনে রাখবে, এই মুমুক্ষার তীব্রতা যাচাই করার অধিকারী হচ্ছেন সমর্থ গুরু।”

সেইদিনই বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া ছোটেলাল সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার কাছে। নব নামকরণ হয় —দয়ালদাস। উত্তরকালে দয়ালদাস পরিণত হন এক সার্থকনামা সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। তাঁহার যোগবিভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞানের খ্যাতি বিস্তারিত হয় দিগ্‌বিদিকে। সমকালীন ভারতের বহু উচ্চকোটির সাধক, মনীষী শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম্ম প্রচারক তাঁহার পরমাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন।

দয়ালদাসের আশ্রম জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত হয় কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতেই তাহাকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত, নিয়মিত ধ্যান-জপের পর শুরু হইত বৃদ্ধ গুরু মহারাজের শাস্ত্র অধ্যাপনা ও বেদান্তের ব্যাখ্যান। ইহার শেষে দয়ালদাসকে লাগিতে হইত আশ্রমের কাজে। দূরের কূপ হইতে বৃহৎ ভাণ্ডে জল টানিয়া আনা, গরু-মহিষের সেবা আর পরিচর্য্যা করা ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। আশ্রমবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য যাহারা রসুই করিত ও বাসন মাজিত তাহাদের কাজেও দয়ালদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিতে

হইত। দিনে রাতে অবসর বা বিশ্রামের সুযোগ খুব কমই ছিল। এত দৌড়-ঝাঁপ ও খাটুনীর পর আহার মিলিত কয়েক টুক্‌রা শুষ্ক রুটি আর এক হাতা সিদ্ধ সব্‌জি।

রাত্রে নিদ্রার সময়ও গুরুজীর শ্যেন দৃষ্টির কবল হইতে নিস্তার ছিল না। দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রার পরই একটি মোটা লাঠি হাতে নিয়া তিনি চীৎকার শুরু করিতেন, "ওরে তোদের ভোজন ও নিদ্রায় যদি এতই অনুরাগ, তবে শুধু শুধু ঘরের আরাম ছেড়ে এখানে কেন এসেছিস্। উঠে পড়্ তামস নিদ্রা ছেড়ে।"

শিষ্যেরা উঠিয়া জপ-ধ্যানে বসিয়া গেলে, তবেই ঠাকুরদাস-বাবা শান্ত হইতেন। নিজের কুঠরীতে গিয়া হইতেন ধ্যানস্থ। প্রাতঃকালে বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যান শুরু হইত আশ্রমের প্রাঙ্গণে। এই শাস্ত্রচর্চার মজলীতে, বয়সে ছোট হইলেও দয়ালদাস ছিলেন অনন্য সাধারণ। বিধিদত্ত প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, তাই যে কোন জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। গুরুমহারাজ তাই দিনের পর দিন তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন অধ্যাত্মশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার জন্য।

তরুণ জীবনের এই কঠোর দিনচর্য্যা সম্বন্ধে উত্তরকালে দয়ালদাস বাবা কহিতেন, "আমার গুরু সত্যই কৃপালু ছিলেন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ আমায় করাতেন বটে, কিন্তু দেখতাম আড়ালে গিয়েই গোপনে মুছে ফেলতেন নিজের চোখের জল। বুঝতাম, কঠোর হয়ে তিনি শাসন করতেন আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, কিন্তু হৃদয় তাঁর ব্যথাতুর হয়ে উঠ্‌তো। আমরা যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলাম তাঁর। ঐ জওয়ান বয়সে গুরুজী যদি কৃচ্ছ্র সাধনে অভ্যাস না করাতেন, তবে কি দেহবুদ্ধি যেতো? ত্যাগ বৈরাগ্য কোনদিনই আসতো? চিত্তের মল কি দূরীভূত হতো? অভীষ্ট কি আর সিদ্ধ হতো? ভাগ্যগুণে এমন দয়াল গুরুর দাস হয়েছিলাম বলেই তো আজ আমি তোমাদের দয়ালদাস-বাবা।"

তরুণ শিষ্য এই কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হইবার পর গুরু মহারাজ কহিলেন, "দয়ালদাস, এবার তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি

আয়ত্ত করতে হবে। বেটা, ব্রহ্মসাধন একটা মস্ত বড় লড়াই— এজন্য চাই মজবুত দেহ, আর সুসংযত ও কেন্দ্রীভূত মন। পর পর্য্যায়ে রাজযোগ সাধনার ভেতর দিয়ে তোমায় যেতে হবে। বেটা, যা পারো তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই শরীর আজকাল জীর্ণ হয়ে এসেছে। এটাকে আর বেশী দিন আমি ধরে রাখবো না।”

একাদিক্রমে পনের বৎসর এ আশ্রমে দয়ালদাস বাস করেন। সিদ্ধ গুরুজীর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া গোপনে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন তাঁহার যোগসাধনা। এই সময়ে উচ্চতর যোগবিভূতির নানা প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার সাধনজীবনে।

কিন্তু গুরু ঠাকুরদাস-বাবা তাঁহার সতর্ক প্রহরা দিয়া শিষ্যকে সদাই ঘিরিয়া রাখিতেন, তাঁহার যোগশক্তিকে করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। উচ্চতর অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিলেই শিষ্যকে গুরু কহিতেন, “দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় তোমার নানা দর্শনাদি ঘট্‌ছে, কিন্তু এ নিয়ে কখনো মত্ত হয়ে উঠো না, প্রতিষ্ঠার দিকে কখনো পা বাড়িয়ো না। সদাই স্মরণ রাখবে, প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা। বৎস, একমনে দৃঢ় পদক্ষেপে আত্মজ্ঞানের সাধনায় এগিয়ে যাও। পরাজ্ঞান যেদিন তোমার সাধনসত্তায় ফুটে উঠবে, এই মানবজীবন হয়ে উঠবে সার্থক।”

বৃদ্ধ গুরু মহারাজ ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়েন মরজীবনের প্রান্তসীমায়। বিদায় ক্ষণের প্রাক্কালে শোকাকুল শিষ্য ও সেবকেরা সবাই তাঁহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়ান। স্থিতধী মহাপুরুষ একে একে সবাইকে জানান তাঁহার অন্তরের আশীর্ব্বাদ আর বিদায় সম্ভাষণ।

প্রিয় শিষ্য দয়ালদাসের দিকে তাকাইয়া গুরু কহিলেন, “বেটা দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় অভীষ্ট তোমার অচিরেই পূর্ণ হবে। আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হবে তোমার সাধনসত্তায়। তোমার প্রথম দর্শনের দিনেই আমি জেনেছিলাম, তুমি লোকগুরু হবে। লোক মঙ্গলের জন্য

জীবন ধারণ করবে। তাই তোমার তপস্যাময় জীবনকে এত সতর্কতা দিয়ে আমি ঘিরে রেখেছিলাম।"

শোকার্ত্ত দয়ালদাস ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবা আশ্বাস জানাইয়া কহিলেন, "বৎস, শেষ বিদায়ের আগে জানাই তোমায় আমার আশীর্ব্বাদ। ঋদ্ধি সিদ্ধি চিরদিন থাকুক তোমার করায়ত্ত। অন্নহীনে অন্নদান আর মুমুক্ষুকে মুক্তিদান, হোক্ তোমার জীবন ব্রত।"

একটু থামিয়া গুরু মহারাজ আবার বলিলেন, "কলিকালে মানুষ অন্নগত প্রাণ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। ধীর স্থির হয়ে বসে যোগাভ্যাস করার সময় তাদের নেই। তাদের মধ্যে বেদান্তের পরমতত্ত্ব তুমি প্রচার করো, নিত্যানিত্য বস্তু-বিচারের কথা নূতন ক'রে জাগিয়ে তোল।

গুরু মহারাজের মহাপ্রয়াণ শেলের মত দয়ালদাসের বুকে বাজিল। শেষ কৃত্যের পর কয়েকটা দিন চলিয়া গেল শোকার্ত্ত অবস্থায়। তার পর দয়ালদাস আহ্বান করিলেন আশ্রমের শিষ্য সেবক এবং বাহিরের ভক্ত গৃহস্থদের। কহিলেন, "গুরু মহারাজের দেহান্তের পর একটা বড় কাজ বাকী রয়ে গিয়েছে। তাঁর স্মৃতিপূজার জন্য এবার আমাদের একটা বৃহৎ ভাণ্ডারা অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। তাতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এ অঞ্চলের গরীব দুঃখী মানুষ আর সাধু সন্তদের।"

প্রবীণ শিষ্যেরা চমকিয়া উঠেন। কহেন, "দয়ালদাস, তোমার প্রস্তাব অবশ্যই অতিশয় সাধু। কিন্তু ভাই, বড় রকমের ভাণ্ডারা দেবার সাধ্য আমাদের কই? তুমি তো জানোই, আশ্রমে সঞ্চিত কোন অর্থ নেই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আশেপাশের গৃহস্থ লোকেরা কেউ তেমন ধনবান্ নয় যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে। দূর-দূরান্তের ভক্তেরা কে কি সাহায্য দেবে বুঝতে পারছিনে। এ অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী কাজ করাই কি ভালো নয়? ছোটখাটো একটা ভাণ্ডারা দিয়েই কাজ শেষ করা যাক্, কি বলো?"

দয়ালদাস উত্তরে প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলেন, "গুরুজী তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা মোটেই হারাইনি, কোনদিন

হারাবোও না। তাঁর ভাণ্ডারা বিরাটভাবেই করতে হবে, অর্থ ও দ্রব্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আপনারা এই পবিত্র কাজে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হোন।”

বয়সে নবীন হইলেও দয়ালদাসের প্রতি সতীর্থেরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। অবশেষে তাঁহার সিদ্ধান্তই সবাই মানিয়া নেন। সোৎসাহে এবার কাজকর্ম্ম শুরু হইয়া যায়।

বিভিন্ন মঠ মণ্ডলী আখড়ায় এবং হাটে বাজারে ঘোষিত হয় পরমহংস ঠাকুরদাস বাবার ভাণ্ডারার কথা। কোথা দিয়া কি ঘটিয়া যায়, দূর দূরান্ত হইতে উপস্থিত হইতে থাকেন শেঠ, সওদাগর ও ধনী গৃহস্থ ভক্তেরা। অকাতরে সবাই বাবার কাজে অর্থ দান করেন। সংগৃহীত হয় বিপুল পরিমাণ ঘৃত, চিনি, আটা, সুজি ইত্যাদি। অল্প সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র বসেরা গ্রামের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক রাজকীয় ভাণ্ডারা, দশ বারো হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও সাধুসন্ন্যাসী সেদিন সেখানে ভোজন গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন। পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

সঙ্কল্প-করা কাজ শেষ হইয়াছে। দয়ালদাস এবার সতীর্থ ও আশ্রম-ভক্তদের জানাইয়া দেন, আশ্রমে আর তিনি অবস্থান করিবেন না, শেষ পর্য্যায়ের তপস্যার জন্য আত্মগোপন করিবেন হিমালয়ে।

তরুণ সাধক দয়ালদাসজীর জনপ্রিয়তা অসাধারণ, সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন, বার বার অনুরোধ জানাইতে থাকেন বসেরায় থাকার জন্য। কেহ কেহ বলিয়া উঠেন, “গুরুজী গত হয়েছেন, এখন তাঁর আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তাঁর পুণ্যস্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা—এটাই তো আপনার প্রধান কর্ত্তব্য।”

উত্তরে দয়ালদাস বলেন, “আমার গুরু মহারাজ বিষয়ী মোহান্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী শিবকল্প মহাত্মা। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর শিষ্যদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো নিভৃত তপস্যার পথে আমি বেরিয়ে পড়ছি। আপনারা প্রার্থনা করুন, গুরুর যে আশীর্ব্বাদ আমি পেয়েছি তা যেন সফল হয়ে ওঠে আমার জীবনে।”

সাতাশ বৎসর বয়সে এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দয়ালদাস বহির্গত হন, আসন গ্রহণ করেন হিমালয়ের এক সিদ্ধপীঠে। এখানে প্রায় দশ বৎসর তাঁহার অতিবাহিত হয় চরম কৃচ্ছ্রব্রত আর আত্মিক সাধনায়। তারপর গুরুকৃপায় হন তিনি সিদ্ধকাম। আত্মজ্ঞানী মহাসাধকরূপে, ঋদ্ধি-সিদ্ধির অধিকারী শক্তিধর মহাপুরুষরূপে, অচিরে সন্ন্যাসী সমাজে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাসের অন্তরে চিরজাগরূক রহিয়াছে তাঁহার কৃপালু গুরু-মহারাজের আদেশ। তিনি বলিয়াছেন, বুভুক্ষুকে অন্ন দাও, আর মুমুক্ষুকে দাও মুক্তির আলো। এই আদেশই চিরদিন করিবেন তিনি শিরোধার্য্য। আর এই আদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিতে হইলে, কোন মঠ-মন্দির বা স্থায়ী সাধনকেন্দ্রে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন হইতে ত্যাগব্রতী সাধুদের মণ্ডলী নিয়া তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন করিবেন, জনতার মাঝে থাকিয়াই সাধন করিবেন গুরু-উপদিষ্ট পরম কল্যাণ।

অতঃপর অল্পকাল মধ্যে সন্ন্যাসী দয়ালদাসের ঋদ্ধি-সিদ্ধির খ্যাতি সাধু সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের বিশিষ্ট মোহান্ত ও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে পরমহংস ও সিদ্ধান্ত আখ্যায় ভূষিত করেন।

কি কুম্ভমেলায়, কি হিমালয়ের গহন তীর্থে, কি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-নর্ম্মদা-কাবেরীর পবিত্র কূলে, যেখানেই তিনি সাধু জমায়েৎ নিয়া উপস্থিত হন, দলে দলে ভক্ত নরনারী, রাজা উজীর শেঠ, লুটায় তাঁহার চরণতলে। তাঁহার বৈরাগ্যময় মূর্ত্তি, জ্ঞান প্রোজ্জ্বল নয়নদ্বয় একবার যে দর্শন করে, অমৃতময় স্নেহবচন একবার যে শ্রবণ করে, মোহিত হইয়া যায়,—এক অমোঘ, অনির্দ্দেশ্য আকর্ষণের বশে করে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। যেখানেই দয়ালদাস-বাবার অধিষ্ঠান হয়, বহিয়া যায় ভাণ্ডারার স্রোত আর ধর্ম্ম উপদেশ। শাস্ত্রালাপ ও ভজন কীর্ত্তনে চারিদিক মুখর হইয়া উঠে, জনজীবনে জাগিয়া উঠে বিপুল আধ্যাত্মিক উজ্জীবন।

গঙ্গা-যমুনা নর্ম্মদার তীরে তীরে, সারা ভারতের তীর্থে তীর্থে

যেখানেই পরমহংস দয়ালদাস-বাবা উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে দেখা যায় এক বিরাট সাধু জমায়েৎ, গৃহস্থ ভক্তেরাও সমবেত হয় দলে দলে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে ঘিরিয়া ভগবৎ আনন্দের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

গুরু ঠাকুরদাসজীর আশীর্ব্বাদ এ সময় হইতে পরিপূর্ণরূপে দয়ালদাস-বাবার আচার্য্য জীবনে রূপায়িত হইয়া ওঠে। ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এক মহিমময় বিগ্রহরূপে দেশের দিকে দিকে তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাস-বাবার অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপজী লিখিয়াছেন,[১]—তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কার্য্যেও তিনি তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকট কোন দীন দুঃখী গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন না করাইয়া যাইতে দিতেন না। কৌপীন কমণ্ডলু মাত্র সম্বল লইয়া অবধূত দয়ালদাস আগন্তুক অভুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকল তাঁহার বৈরাগ্য ও বদান্যতায় বিমুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র সেবার জন্য আটা, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল। তিনিও দুইহাতে দান করিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান সেইখানেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। দলে দলে সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পরিচিত অপরিচিত বোধ নাই, সাধু অসাধু, গৃহস্থ সন্ন্যাসী বিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র দেখা নাই, স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্য নাই, যে অভুক্ত সে-ই ভোজন করিবে, যেখানে স্বামী দয়ালদাস সেইখানেই মা অন্নপূর্ণার এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান।

"স্বামী দয়ালদাস এক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতেছেন। শত শত সহস্র সহস্র সাধু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হইত। স্বামীজীর সঙ্গে বৈরাগী, বৈষ্ণব, রামাইৎ, উদাসী, সন্ন্যাসী, পরমহংস, অবধূত সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধু ও যতিগণ

[১] সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী: স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপ

প্রেমের তারে একত্রিত হইয়া একসূত্রে মণি, মুক্তা, প্রবাল আদি গ্রথিত মালার ন্যায় সুশোভিত থাকিতেন। তিনি সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এইজন্য কেহই তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না।

"তিনি সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর নেতা হইয়াও কখন আপনাকে প্রধান মনে করিতেন না। মোহান্তদিগের মত তাঁহার স্বতন্ত্র গদি বা আসন থাকিত না। তিনি তৃণাসন ও বালুকাসন বড় ভালবাসিতেন। কেহ তাঁহার স্তুতিবাদ করিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন ও ভক্তিসহ ভগবানের স্তুতি করিতে বলিতেন। রাজা, উজীর, শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, স্ত্রী-পুরুষ যে তাঁহার একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই তাঁহার সেবা না করিয়া, তাঁহার অশেষ প্রশংসা না করিয়া, থাকিতে পারে নাই।"

সে-বার দয়ালদাস-বাবা একটি বিরাট জমায়েতের প্রধান রূপে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাইতেছেন। বিহারের পথে আসিবার সময় তিনি মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে শহরের বহু নরনারী জড়ো হইল তাঁহার মণ্ডলীর সম্মুখে। শেঠ ও মহাজনেরাও ভক্তিভরে আগাইয়া আসিলেন সাধুদের সেবার জন্য।

পৌষ মাস তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। বিহারের প্রচণ্ড শীতে দয়ালদাসজী ও তাঁহার সাধু শিষ্যেরা নদীর চড়ায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে পরমানন্দে ধুনি জ্বালাইয়াছেন, আসন পাতিয়া বসিয়াছেন।

একজন গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, এই দুঃসহ শীতের রাত্রে ঘরের ভেতরে থেকেই আমরা কাঁপতে থাকি। প্রচণ্ড হিমের মধ্যে আপনাদের নিদ্রা হয় কি ক'রে?"

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, "নিদ্রা না হলেই বা অসুবিধা কি? সাধুদের একমাত্র কাজ ভগবৎ ভজন। শীতের দাপটে রাত্রে যেদিন নিদ্রা না হয়, আমরা ধ্যান জপ ও ভজন শুরু ক'রে দিই। এ নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।" অতঃপর তিনি সোৎসাহে বেদান্তের তত্ত্ব আলোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন।

সেদিন শীতের রাত্রে হঠাৎ খব ঝড বষ্টি হইয়া যায়। দলেব

কয়েকটি সাধু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে থাকেন, "তাই তো! ধুনির কাঠ সংগ্রহের কি উপায় হবে? শুকনো কাঠ পাওয়া তো অসম্ভব!"

দয়ালদাস-বাবা হাসিয়া কহিলেন, "ছাখো, সাধুদের বোঝা বইবেন ভগবান্। তোমরা এজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমাদের ভোজনের জন্য, পুরী মালপোয়া তৈরীর জন্য, ধনী শেঠেরা এগিয়ে এসেছেন। কত আটা, ঘি, চিনি জড়ো করেছেন। তেমনি ভগবদ্ ভক্ত দরিদ্র লোকেরাও তোমাদের সেবার জন্য রয়েছে উৎকণ্ঠিত। একটু সবুর করো, একজন কাঠুরে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। যত খুসী ধুনি জ্বালাও, আর সারা রাত ধ্যানজপ করো।"

সত্যিই তাই। ঝড় বাদল কিছুক্ষণ হয় থামিয়া গিয়াছে। এই অবসরে এক ব্যক্তি মাথায় একটি বৃহৎ কাঠের বোঝা নিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বোঝা নামাইয়া যুক্তকরে সে নিবেদন করে, "বাবা, আমি অতি দরিদ্র, ছা-পোষা লোক। বন থেকে কাঠ কেটে আনি, তা বিক্রি ক'রে কোনমতে দিন গুজরান হয়। ঘরে কিছু শুকনো কাঠ ছিল, আপনাদের সেবার জন্য নিয়ে এলাম।"

বাবার নির্দ্দেশে এই কাঠওলাকে পরিতোষ সহকারে পুরী মালপোয়া ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

আর একদিনের কথা। গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবার ধুনির সম্মুখে শহরের একদল ভক্ত দর্শনার্থী যুক্তকরে বসিয়া আছে। বাবার মুখে বেদান্তের বৈরাগ্য অভ্যাস ও নিত্যানিত্য বিচার সম্পর্কে উপদেশ শুনিতেছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক হিন্দুস্থানী ভক্ত এই কয়দিনেই বাবার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লোকটি শুদ্ধসত্ত্ব ও ধর্ম্মপ্রাণ, সাধনার এক উত্তম আধার। তাই তাহার উপর পড়িয়াছে দয়ালদাসজীর বিশেষ কৃপা। কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ায় এই ভক্তটি হঠাৎ বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিদায় গ্রহণের জন্য বাবার অনুমতি সে প্রার্থনা করে।

বাবা তন্ময় হইয়া এসময়ে একটি তত্ত্ব উপদেশ দিতেছিলেন। ভক্তটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আরে, তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রসুই করার জন্য ব্যস্ত হয়েছো। ভগবৎ কথা শুনছো এখানে, তাই

ভগবান্‌ই তোমার সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। ঘরে ফিরেই দেখবে, ভোজনের সব তৈরী।"

ভক্তটির ঘরে দ্বিতীয় কেহ নাই, নিজের আহার্য্য রোজ নিজ হাতেই তাহাকে প্রস্তুত করিতে হয়। যাই হোক বাবার এই কথায় সে নিরস্ত হয়। ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্ববৎ শ্রবণ করিতে থাকে।

মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ভক্তটি দেখে, হঠাৎ একজন আত্মীয় তাহার গৃহে অতিথি হইয়াছে, এবং গৃহস্বামীর দেরী দেখিয়া নিজেই রুটি সব্‌জি তৈরী করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

অল্প কয়েকদিন যাবৎ দয়ালদাস-বাবা মুঙ্গেরে এই নদীর ঘাটে অবস্থান করিতেছেন। ইহারই মধ্যে এই অঞ্চলের চারিদিকে তাঁহার যোগবিভূতির খ্যাতি, কৃপালীলার নানা কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাধু জমায়েতের তিনিই হইতেছেন মধ্যমণি, তাই সাধু সন্ন্যাসী ও মুমুক্ষু গৃহস্থেরা সবাই জড়ো হইয়েছে তাঁহার ছাউনিতে। সংসারের তাপে ক্লিষ্ট, আর্ত্ত ভক্তেরাও আসিতেছে তাহাদের নানা সমস্যা নিয়া।

শহরের এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেদিন বাবার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এক পরমাত্মীয় দূরদেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত; চিঠি আসিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। ভদ্রলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর স্বরে কহেন, "বাবা, এ সঙ্কটে ডাক্তার কব্‌রেজদের কিছু করবার নেই। আপনার মত যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাত্মারাই শুধু এমন মৃতকল্প রোগীকে বাঁচাতে পারেন। আপনার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি। যা হয় আপনি করুন।"

দয়ালদাসজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, তুমি শান্ত হও—কেঁদো না। কেঁদে কোন ফল হবে না। তোমার আত্মীয়টি আর বেঁচে নেই, ঘণ্টাখানেক আগে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে।"

ভদ্রলোকটি এই শোক সংবাদের আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। পরমহংস দয়ালদাসজী স্নেহপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, "বেটা, দুঃখের আঘাত, মৃত্যুর আঘাত, সব মানুষের জীবনে আসবেই আসবে। তোমার এই দেহ, তোমার প্রিয়তম নিকট আত্মীয়দের দেহ—এ সবই অনিত্য, প্রপঞ্চ। যা অনিত্য তার ধ্বংস তো

এক সময়ে হবেই, এজন্য আমাদের আগে থেকেই তৈরী থাকা উচিত এ সংসারে সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। কেবল ভগবান্ই নিত্য। তাই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে সে সম্বন্ধে কখনো ছেদ পড়ে না। বৈরাগ্য অবলম্বন করো, চিত্তের মল অপসারণ করো। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে, সৎ-চিৎ আনন্দময় পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তা হলে আর বিচ্ছেদের দুঃখ শোক ভোগ করতে হবে না।" এইভাবে শোকমগ্ন ভক্তটিকে প্রবোধিত করিয়া বাবা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে অবস্থান করার কালেই দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভ করেন তরুণ সাধনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উত্তরকালে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে সমগ্র ভারতে তিনি প্রখ্যাত হন, এ দেশের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তারূপে লাভ করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁহাব 'ধর্ম্ম-প্রচারক' পত্রিকা, ব্যাপক ধর্ম্মান্দোলন, অসামান্য বাগ্মিতা, অগণিত হরিসভার স্থাপনা এবং কাশীর ধর্ম্মকেন্দ্র যোগেশ্বরী মঠ সারা দেশে যোগায় বিপুল আত্মিক প্রেরণা। কাশীর স্বামী আনন্দপ্রকাশ, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পরমহংস বালানন্দ স্বামী, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির সহযোগিতায় সনাতন ধর্ম্মের উজ্জীবনের জন্য কৃষ্ণানন্দ যে অবদান রাখিয়া যান, আজো তাহার স্মৃতি দেশের জনমনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

গঙ্গার ঘাটে ধুনি জ্বালাইয়া দয়ালদাস-বাবা সেদিন ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কিছু সংখ্যক ভক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন বাবার ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে সাধু জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণপ্রসন্নের বয়স তখন মাত্র বিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই ভগবৎ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এযাবৎ কত সাধু মণ্ডলীতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কত মহাত্মার শরণ নিতে গিয়াছেন প্রাণের উৎকণ্ঠা নিয়া, কিন্তু বহুবাঞ্ছিত গুরুর সন্ধান আজো তাঁহার মিলে নাই। দীর্ঘ বপু, নিমীলিত নয়ন, ধ্যাননিবিষ্ট দয়ালদাস-বাবার দিকে চোখ পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অন্তরাত্মা

হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'ওরে, এই মহাত্মাই যে তোর পরমাশ্রয়, ইঁহারই চরণে কর্ আত্মসমর্পণ।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বিহ্বলভাবে নীরবে ধুনির পাশে বসিয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই দয়ালদাস-বাবা চক্ষু উন্মীলন করিলেন। গৌরকান্তি উজ্জ্বল নয়ন তরুণ দর্শনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্নের দিকে করিলেন প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার আয়ত নয়ন দুইটিতে, ভক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন চিরতরে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গের আলোচনা চলিল, তারপর দর্শনার্থীরা উঠিয়া গেলে কৃষ্ণপ্রসন্ন মহাত্মার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর্ত্ত স্বরে কহিলেন, "বাবা, ঈশ্বর প্রাপ্তির সঙ্কল্প নিয়ে পাগলের মত আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমায় আশ্রয় দিন, সন্ন্যাসের দীক্ষা দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য।"

অন্তর্য্যামী দয়ালদাস-বাবা জানিতেন, মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন এই গঙ্গার ঘাটেই করিবেন তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। এই নবীন সাধকের প্রতীক্ষায়ই যে এ কয়টি দিন তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছেন।

বাবার সম্মতি পাওয়া গেল। কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার কৃপায় গ্রহণ করিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস, নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

ইহার অব্যবহিত পরেই, দয়ালদাস-বাবা ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া, তাঁহার সাধুমণ্ডলী নিয়া, রওনা দিলেন মহাতীর্থ গঙ্গাসাগরের দিকে।

গঙ্গাসাগর দর্শনের পর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের নানা তীর্থ ও পীঠস্থানে দয়ালদাসজী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সব সময়েই তাঁহার মণ্ডলীর সঙ্গে আসিয়া জুটে নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী, গড়িয়া উঠে এক বৃহৎ জমায়েৎ। এই জমায়েৎ নিয়াই পরমানন্দে তিনি সর্ব্বত্র গতায়াত করেন। যেখানেই যান গৃহস্থ জনসাধারণকে দান করেন বেদান্তের উপদেশ—দান ধ্যান, ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

একবার জমায়েৎ নিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দয়ালদাসজী উপস্থিত হন কপিয়াল গ্রামে, তাঁহার জন্মভূমিতে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর সন্ন্যাসীদের একবার পূর্ব্বাশ্রমের জন্মভূমি ও পিতামাতাকে দর্শন করিয়া আসিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই কপিয়াল গ্রামে সেদিন তাঁহার আগমন। এ সময়ে সঙ্গে রহিয়াছে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী। এই সাধু জমায়েতের আগমনে সারা গ্রামে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। ধনী বণিক এবং সাধারণ গৃহস্থেরা সবাই মিলিয়া এই সাধুদের সেবায় তৎপর হইয়া উঠেন।

নিজের পূর্ব্বাশ্রমের গৃহে উপনীত হইলেন দয়ালদাস। বৃদ্ধ পিতা ইতিপূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননীও এখন বৃদ্ধা, চলৎ-শক্তি রহিত। দয়ালদাস ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম নিবেদন করেন, প্রকাশ করেন আত্মপরিচয়।

এতদিনের পরে পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধা জননীর তাই আনন্দের অবধি নাই। "মেরে ছোটেলাল, মেরে ছোটেলাল" বলিয়া পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে ছোট বালক জ্ঞানে তিনি কত আদর করিতেছেন, কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

জননীর গৃহের প্রাঙ্গণে সেদিন এক বড় সভার আয়োজন হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, শীর্ষস্থানীয় সমাজ নেতারা, সবাই আন্তরিক অভিনন্দন জানান তাঁহাদের গ্রামের পরম গৌরব পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে।

সমাজের মুখপাত্রেরা এই সভায় দয়ালদাস মহারাজকে বলেন, "আমাদের শাস্ত্র মহাপুরুষদের উদ্দেশ ক'রে বলেছেন :

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরেব্রহ্মণি যস্যচেতঃ।

"আপনার সিদ্ধি সমুজ্জ্বল জীবনও তাই আপনার বংশকে পবিত্র করেছে, আমার জননীকে কৃতার্থা করেছে, আর বসুন্ধরাকে করেছে

পুণ্যবতী। আমরাও আপনার স্বজন ও বান্ধব হিসেবে হয়েছি এই পুণ্যের ভাগী।”

দয়ালদাস-বাবাও এই উপলক্ষে সমবেত জনতার কাছে নিবেদন করেন, “আপনারা আজ আমার সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করলেন, তার মূলে রয়েছেন আমার জনক ও জননী। এঁদের পুণ্যফলেই বহুবাঞ্ছিত সন্ন্যাস জীবন আমি লাভ করতে পেরেছি, আর পেয়েছি সমর্থ গুরুর আশ্রয়। জীবন আমার কৃতার্থ হয়েছে। আজ যাঁরা আমায় স্নেহ ভালবাসা জানাতে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য—আপনারা সংসারে রয়েছেন। এখানে মাত্র দুটো লেন-দেনের দিকে সতত দৃষ্টি রাখুন। সদাই নিতে হবে ভগবানের নাম, আর অন্নহীনকে করতে হবে অন্নদান। সতত স্মরণ রাখুন, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই পাওয়া যায় সত্যকার ভোগসুখ, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই আসে ভগবানে অনুরাগ। সংসারের সব বস্তুই অসার, অনিত্য। তা হারিয়ে গেলেই আমরা দুঃখ শোকে অধীর হয়ে উঠি। একমাত্র সারবস্তু ও নিত্যবস্তু, যা কখনো হারায় না, তা হচ্ছেন ভগবান। এই ভগবানে অনুরাগ এলে তা কখনো নষ্ট হয় না। আর এই ভগবান্‌কে লাভ করলে সেই সম্ভোগ হয়ে থাকে অক্ষয়, অব্যয়। ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেম বলেই তো আজ আমি চরম ও পরম সম্ভোগ খুঁজে পেয়েছি। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, এই বোধ নিয়ে জীবন হয়েছে মধুময়। আপনারা তাই নিত্যকার জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের বোধকেই জাগ্রত ক'রে তুলুন।”

মাতৃভূমি ও মাতার দর্শন সমাপনান্তে দয়ালদাস-বাবা জমায়েৎ সহ আবার বাহির হইয়া পড়েন তাঁহার চিরাচরিত পরিব্রাজনে।

১২৮৬ সালের কথা। হরিদ্বারে সে-বার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলী মেলা প্রাঙ্গণে এক বিরাট সত্র খুলিয়া বসিয়াছে। সাধু মহাত্মা, ভক্ত দর্শনার্থী ও অন্ন-প্রার্থী দীন দুঃখীর ভীড়ে সারা অঞ্চলটি গমগম করিতেছে।

শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীও এসময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য, মেলায় সমাগত সাধু মহাত্মাদের পবিত্র সান্নিধ্য লাভ।

গুরু মহারাজের ছাউনিতে আসিয়া, রাজসূয়ের মত দান যজ্ঞের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তো কৃষ্ণানন্দের চক্ষু স্থির। প্রায় এক সহস্র সন্ন্যাসী অবধূত ও পরমহংস সেখানে অবস্থান করিতেছেন। একদিকে অবিরাম চলিয়াছে শাস্ত্রালাপ ও ধ্যান ভজন, আর একদিকে সাধু সন্ন্যাসী ও কাঙালীদের ভোজন পর্ব্ব—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে চারিদিক সরগরম।

কৃষ্ণানন্দ বিস্মিত হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, এই রাজসূয় যজ্ঞের ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি ভাবে? গুরুদেব দয়ালদাস-বাবা তো একটি মুদ্রাও স্পর্শ করেন না, যাচ্‌ঞা করেন না কোন কিছুই। অযাচক ও অনিকেত সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি। তবে কাহারা বহন করিতেছে এই বিপুল ব্যয়ভার? অবশ্য, একথা ঠিক, কল্পতরুর মূলে যিনি সদাই বাস করেন, তাঁহার আর কোন কিছুর অভাব কি? তবে এই অভাব কিভাবে কোন্ অলৌকিক পন্থায় মোচন হইতেছে, সেই প্রশ্নটিই বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে তাঁহার মনে।

করজোড়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। এই বিরাট যজ্ঞের ব্যবস্থা কিভাবে চলছে, কে করছে, বলুন তো?"

দয়ালদাসজী সহাস্যে উত্তর দেন, "দেখো বেটা,—ভজন কর্না মেরা কাম, ভোজন দেনা মালিক্‌কা কাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তার সৃষ্ট জীবকে, আশ্রিতকে ভুলে থাকতে পারেন? এমনকি যে নাস্তিক, যে ভগবান্ বিরোধী, তার আহারও যোগাচ্ছেন ভগবান্। কাজেই এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু তো নেই।"

গুরু মহারাজ মুখে যাহাই বলুন না কেন, কৃষ্ণানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিয়াছেন—এসবই তাঁহার নিজেরই ঋদ্ধি-সিদ্ধির ফলশ্রুতি।

দয়ালদাসজী সেদিন কহিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ, যদি পরমাত্মার

কৃপা চাও, অরূপের রূপ দর্শন করতে চাও, সর্ব্বদা মনকে অন্তর্বৃত্তিশীল করো, ডুবে যাও ধ্যান সমাধির গভীরে।”

আর একদিন কৃষ্ণানন্দকে গুরুজী নিকটে ডাকিলেন, স্নেহভরে নানা সাধন-উপদেশ দানের পর কহিলেন, “বেটা, গঙ্গার ওপারে, পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছেন এক প্রাচীন আত্মজ্ঞানী মহাত্মা। তোমার সঙ্গে আমার এক চেলাকে দিচ্ছি, সে তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। এই মহাত্মার আশীর্ব্বাদ অমোঘ। তুমি আজই তাঁকে প্রণাম নিবেদন ক'রে এসো।”

শিবকল্প মহাপুরুষ নিভৃত গুহায় স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি জানাইলেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ। কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, “দেখো বাচ্চা, মানুষেরা ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলেই বস্তু দেখা যায়। আমি বলবো--এটা তাদের ভ্রম। আসল কথাটা কি জানো? যখন আমরা মাতৃগর্ভে থাকি, তখন দুই চোখ মুদিত থাকে, আসল বস্তুর দর্শন তখনই মিলে। জন্ম হবার পর যখন আমরা চোখ মেলে চাই, তখন দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ায় যত অবস্তু, অর্থাৎ, মায়াময় অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চ। মাতৃগর্ভে যে বস্তুকে, যে অরূপকে, যে পরম সত্যকে দেখছিলাম, তা তখন হয় অন্তর্হিত। ভাগ্যগুণে সদ্‌গুরু তোমার মিলেছে, তাঁর কাছ থেকে মায়াবন্ধন কাটবার কৌশল শিখেছো, এবার তাই প্রয়োগ করো তোমার জীবনে। চক্ষু মুদিত করো আর অন্তরের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হও। সেখানেই মিলবে পরম ধন, হবে আত্মসাক্ষাৎকার।”

মহাত্মা নয়ন নিমীলিত করিলেন, মগ্ন হইলেন গভীর ধ্যানে। নীরবে এই শিব স্বরূপ মহাসাধকের চরণে প্রণাম জানাইয়া কৃষ্ণানন্দ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দেহ মন প্রাণ তাঁহার দিব্য অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, অন্তরে জাগিয়াছে পরম প্রশান্তি। মেলার ছাউনিতে ফিরিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুজীর কাছে বিবৃত করেন মহাত্মার উপদেশ বাণীর কথা এবং তাঁহার নিজের আত্মিক উপলব্ধির কথা।

কুম্ভমেলায় ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সাধু-সন্তেরা যেমন আসিয়া জুটিয়াছেন, তেমনি ভীড় জমাইয়াছে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ নরনারী। সবাই পুণ্যস্নান সমাপন করে, আর দলে দলে উপস্থিত হয় উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মাদের তাঁবু ও ছাউনিতে। সেদিন একদল ভক্ত গৃহস্থ দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে আসিয়া হাজির। বাবার শ্রীমুখের দুই চারিটি কথা না শুনিয়া তাহারা সেখান হইতে উঠিবে না।

বৈরাগ্য ও নিত্যানিত্য বস্তু বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান সোপান—এ কথাটি নানাভাবে নানা সময়ে দয়ালদাসজী তাঁহার ভক্ত দর্শনার্থীদের এ যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ঐসব উপদেশ ও বাণী সঙ্কলন করিয়া শিষ্যেরা 'বিচার-সাগর' নামক একটি হিন্দি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে উল্লেখিত দুই চারিটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, "আজকাল একটা কথা শুনা যায়,— জনকের মত যোগ ভোগ দুই-ই করো। এসব শূন্য গর্ভ বচনে কোন ফলোদয় হয় না। জনক হওয়া মানে দেহাত্মবোধ শূন্য হওয়া। সে যে কঠোর-সাধন সাপেক্ষ। একটি কথা তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, দেহ সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের জন্ম. মরণ, ভোগ, রোগ প্রভৃতি দুঃখের কারণ। দেহ সংযোগ থেকেই বার বার উৎপত্তি হচ্ছে তার বাসনা এবং এই দেহ সম্বন্ধ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি মমত্ব বুদ্ধি। ফলে চারদিকের মায়ার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে। এই দেহের প্রতি অনাস্থাভাব জাগিয়ে তোল, তা হলে দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পদার্থের উপরই স্বাভাবিকভাবে বিরাগ এসে পড়বে, বন্ধন খসে পড়তে থাকবে। বিচারশীল হও, আর ধ্যান মননের অভ্যাস দ্বারা মনকে ক'রে তোল অন্তর্ম্মুখীন। তার ফলে, এই দেহটি সম্বন্ধে মনে হবে—এটি ইহজীবনের এক অস্থায়ী আবাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই চিন্তা জাগলে দেহের প্রতি মমত্ব হ্রাস পায়, সঙ্গে সঙ্গে এই দেহ সংশ্লিষ্ট বিত্তবিভব, স্ত্রী ও বিলাস উপকরণের বাসনাও শিথিল হয়ে পড়ে।

"আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা।

ব্রহ্মচারী জীবনে বিষয় সংস্রব থেকে মানুষ দূরে থাকতো, সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হতো। তারপর গার্হস্থ্য জীবনের জন্য ছিল দান, যজ্ঞ ও দম বা ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যবস্থা। এ সবের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ভোগাসক্তি কমে আসতো, হতো বৈরাগ্যের উদয়। তারপর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি হলে সংসার ছেড়ে দিয়ে আরণ্যক জীবন তারা যাপন করতো, তারপর কেউ কেউ গ্রহণ করতো সন্ন্যাস। আজকাল মানুষের জীবনে এই চতুরাশ্রমের প্রস্তুতি দেখা যায় না। যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য অবধি সবাই ভোগসুখে মত্ত থাকে। তার ফলে ভোগ সামর্থ্য চলে গেলেও ভোগাসক্তি দূর হয় না।

"যুগের হাওয়া যত উল্টেই যাক, ঋষি ঋণ, দেব ঋণ আর পিতৃ ঋণ শোধ না ক'রে কিন্তু কারুর মুক্তির সম্ভাবনা নেই। গুরু সেবা, শাস্ত্রাভ্যাস, আত্মসংযম ও বীর্য্যধারণ ক'রে ঋষিদের সন্তুষ্ট করতে হবে। দেবতাদের প্রসন্ন করতে হবে দান, ব্রত ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা। আর ভোগাসক্তি বর্জ্জন ক'রে, ধর্ম্মধৃত জীবন যাপন ক'রে, সুপুত্র উৎপাদন ক'রে শোধ দিতে হবে পিতৃপুরুষের ঋণ।"

অতঃপর দয়ালদাসজী সমবেত সাধু-সন্ত এবং গৃহস্থ ভক্ত সবাইকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সৎ-চিৎ আনন্দময় আত্মা থেকে আমরা সবাই জন্মেছি, আত্মাতে বিধৃত রয়েছে আমাদের এই জীবন। আবার সেই আত্মাতেই আমরা সবাই ফিরে যাবো, লীন হয়ে যাবো। এই আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু। শ্রুতির কথা সদাই করবে স্মরণ মনন অনুধ্যান—'তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরম্ যদয়মাত্মা।'—আত্মা পুত্র থেকে প্রিয়, ধন থেকেও প্রিয়, অপর সমস্ত প্রিয় বস্তু থেকেও প্রিয়তর এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এই আত্মার সাক্ষাৎকারই তোমাদের জীবনের পরম কাম্য হয়ে উঠুক, এই আশীর্ব্বাদ আমি সবাইকে করছি।"

সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীরা মহাত্মার এই স্নেহপূর্ণ ভাষণে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বার বার উঠিতে থাকে জয়ধ্বনি—'জয় বাবা দয়ালদাস মহারাজ কি জয়!'

হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় আসিয়া শিষ্যপ্রবর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী পরমানন্দে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন সাধনপথের বহুতর নিগূঢ় নির্দ্দেশ। মুঙ্গের হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন দুইটি সাধু এবং অন্নদা নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। শহরের একটি ভিন্ন আস্তানায় তাঁহারা তিনজন অবস্থান করিতেছেন। সেদিন মেলা-ক্ষেত্রে সাধুদের ছাউনিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অন্নদাবাবু ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে কোথায় তিনি তলাইয়া গেলেন। দুই দিন ঘোর দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আশ্রয় ও আহার জুটিতেছে কিনা, তাছাড়া তিনি বাঁচিয়াই আছেন কিনা, তাহাই বা কে বলিবে? অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণানন্দ ভাবিলেন, গুরু মহারাজ অন্তর্য্যামী, তাঁহার কাছেই এ বিপদের কথা বলিবেন, বন্ধুটির সন্ধান জানিয়া নিবেন।

কিন্তু দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভের পর কৃষ্ণানন্দ এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বহুতর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সেখানে চলিতেছে। তিনি ভাবিলেন,—'আমার কি ভ্রান্ত বুদ্ধি, গুরু মহারাজের কাছে এসে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো, জীবন সমস্যার সমাধান জেনে নেব, তা নয়, কে কোথায় হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছি।' এবার তাই শান্ত মনে ধর্ম্মালাপে নিবিষ্ট হইলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ কৃষ্ণানন্দের মনে পড়িল অতীতের একটি ঘটনা। সে-বার গুরুদেব মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, তাঁহার একমাত্র পুত্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন না। গুরুদেবের প্রাণ গলিয়া গেল, আর্ত্ত ভদ্রলোকটিকে হারানো পুত্রের সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই পিতা পুত্রের মিলন ঘটিল।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের মনে চিন্তার ঝলক খেলিয়া যায়, 'অচেনা এক

দর্শনার্থীকে কৃপালু গুরুজী তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। আর আমি তাঁর প্রিয় শিষ্য—আমার অন্তরের দুঃখ কি তিনি বুঝবেন না? গুরুজী অন্তর্যামী এবং মহা শক্তিধর মহাত্মা। অন্নদাবাবুর জন্য আমি যে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছি, তা নিশ্চয়ই তিনি উপলব্ধি করছেন। একটা কিছু তিনি করবেনই।'

এমন সময়ে দয়ালদাস-বাবা হঠাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "বেটা, তুমি কোন্ পথ দিয়ে আমার ছাউনিতে এসেছো? এবার ফিরবেই বা কোন্ পথে?"

"বাবা, কনখলের পথ ঘুরে সাধুদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমি এসেছি। সেই পথেই বাসায় ফিরবো বলে ভাবছি।"—নিবেদন করেন কৃষ্ণানন্দ।

"না বেটা, তুমি ও পথ দিয়ে যেয়ো না। সামনের নৌসেতু পার হয়ে ভীমগড়া দিয়ে চলে যাও।"

"বাবা, ও পথটা আমি চিনিনে। তাই ভাবছি—"

"না-না, বেটা ঐ পথেই তুমি অবশ্য যাবে। পথ না চিনলে কি আসে যায়? একটু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নিও।"

গুরু মহারাজের এই আদেশ কৃষ্ণানন্দ শিরোধার্য্য করিলেন, ভীমগড়ার পথ ঘুরিয়া চলিলেন নিজ বাসস্থানের দিকে। কিছুটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, বন্ধু অন্নদা উদ্‌ভ্রান্তের মত পথের পাশে বসিয়া আছেন। শরীর তাঁহার অসুস্থ ছিল, তারপর লোকের ভীড়ের চাপে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। এই দুইদিন অবর্ণনীয় কষ্টে তাঁহার কাটিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে দেখা মাত্র ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরেন, সন্তর্পণে তাঁহাকে বাসায় নিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এবার বুঝিলেন, বিপন্ন অন্নদাকে উদ্ধার করার জন্যই অন্তর্যামী গুরুদেব ভীমগড়ার পথ সম্পর্কে এত জেদ করিতেছিলেন।

দয়ালদাস-বাবার আশ্রয় নিবার পর হইতে অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেও কৃষ্ণানন্দ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। বাবাও এই নবীন তপস্বীকে সদ্‌গুরু মহিমা উপলব্ধি করানোর জন্য মাঝে মাঝে প্রয়োগ করিতেন নিজের অলৌকিক শক্তি।

কুম্ভমেলা তখন ভাঙিয়া গিয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীরা সবাই দলে দলে হরিদ্বার ত্যাগ করিতেছেন। তখনকার দিনে হরিদ্বার অবধি ট্রেন হয় নাই। গরু ঘোড়া বা উটের গাড়ী নিয়া সাহারাণপুরে গিয়া যাত্রীরা ট্রেন ধরিত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সহযাত্রীরা যান-বাহন কেন্দ্রে আসিয়া দেখিলেন, সব গাড়ীই ভাড়া হইয়া গিয়াছে। একখানিও অবশিষ্ট নাই। অথচ সেইদিনই রওনা না হইলে কোন কোন সহযাত্রীকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। এ সময়ে পদব্রজে সাহারাণপুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। সঙ্গীরা সবাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন।

অনন্যোপায হইয়া কৃষ্ণানন্দ স্মরণ করিলেন গুরু মহারাজকে। ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, জীবনের যেকোন সমস্যার জন্যই যে শ্রীগুরুর কৃপার উপর তিনি নির্ভর করিয়া আছেন। অচিরে দয়ালদাস-বাবার প্রেমঘন মূর্ত্তিটি তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল, দুশ্চিন্তার মেঘ এক নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল। সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়া তিনি কহিলেন, "আপনারা সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর ভাববেন না। অচিরে এ বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো।"

সহযাত্রীরা তাঁহার কথা শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে এক অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণানন্দকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায়ই বা যাবেন, বলুন তো?"

উত্তর হইল "মুঙ্গের থেকে এসেছি, যেতে চাই সাহারাণপুরে। কিন্তু কোন গাড়ী আমরা যোগাড় করতে পারিনি।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। বিকেল চারটায় আমি গাড়ী নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য।"

যথা সময়ে ভদ্রলোকটি একটি ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করিয়া সেখানে উপস্থিত হন, কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের অতি যত্ন সহকারে তাহাতে তুলিয়া দিয়া রওনা করেন সাহারাণপুরের পথে।

কোথা হইতে কেন এই অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আবির্ভূত

হইলেন, কেনই বা গ্রীষ্মের গরমে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহা রহস্যময়।

কৃষ্ণানন্দ কিন্তু উপলব্ধি করিলেন, কৃপালু গুরু মহারাজের অদৃশ্য হস্তটি সঞ্চালিত হইয়াছে এই আগন্তুকের মধ্য দিয়া, নির্ভরশীল শিষ্যকে তিনিই আজিকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া সে-বার কৃষ্ণানন্দ বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতেছেন। বাড় নামক স্টেশনে তাঁহাকে গাড়ী বদলাইতে হইবে। এ কয়দিন দীর্ঘ রেলপথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীর বড় ক্লান্ত। ইতিমধ্যে কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলেন, ট্রেনটি ধীরে ধীরে একটি স্টেশন ত্যাগ করিতেছে। সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এটি বাড় স্টেশন এবং ত্রিহুত অঞ্চলে যাইতে হইলে এখানেই গাড়ী বদল করিতে হয়।

কৃষ্ণানন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বরে নির্গত হইল, "হায় গুরুদেব, একি বিপদে আমি পড়লাম। বদল না করতে পারলে অনেক ঘুরে আবার এ পথে আমায় ফিরতে হবে, অনেক কিছু জরুরী কাজ হয়ে যাবে বানচাল।"

কি আশ্চর্য্য। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল এঞ্জিনের একটা ভয়ঙ্কর শব্দ, এবং গাড়ীটিও ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। তখন অবধি কিন্তু উহা প্ল্যাটফরমের সীমানা ত্যাগ করে নাই। এই সুযোগে কৃষ্ণানন্দ মালপত্র নিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গার্ড ও ড্রাইভারদের মধ্যে ততক্ষণে ছুটাছুটি শুরু হইয়া গিয়াছে। কয়েক মিনিট পরে এঞ্জিন ঠিক করিয়া নিয়া গাড়ীটি আবার ধাবিত হয় গন্তব্য পথে। কৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, গাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে তাঁহার গুরু মহারাজেরই করুণা লীলা। শিষ্যের ক্লেশ নিবারণের জন্যই যোগবিভূতি আজ এই সময়ে তিনি প্রকটিত করিলেন। তাছাড়া, এই ঘটনার মধ্য দিয়া শিষ্যের হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দিলেন তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্যের স্বরূপটি।

কয়েক বৎসর পরের কথা। পরমহংস দয়ালদাস-বাবা সে-বার তাঁহার মণ্ডলী নিয়া পদব্রজে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ তিরুপতিতে চলিয়াছেন বালাজী বিগ্রহ দর্শনের জন্য। তাঁহার ঋদ্ধি সিদ্ধির প্রসিদ্ধি ইতিমধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাই অপর সম্প্রদায়ের বহু সাধুও তাঁহার সঙ্গ নিয়াছেন। ফলে পরমহংসজী একটি বড় জমায়েৎ নিয়াই পথ চলিতেছেন।

সেদিন কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা দিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। লোকালয় এদিকে খুব বেশী নাই। দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীদের ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার গ্রামের লোকেরা সজ্জন, সাধুদের জন্য তাঁহারা ভাণ্ডারা দিয়াছে। তোমরা সবাই আজ ভাল ক'রে ভোজন সেরে নাও। আগামী কাল অন্ন মিলবে না।"

ঠিক তাহাই ঘটিল। পরদিন গহন অরণ্য পথে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ মিলিল না। সারা দিনের পথ চলার পর সাধুরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও সবাই কাতর। তাঁহাদের মলিন মুখ দেখিয়া দয়ালদাসজী তাঁহার ধ্যানাসনে গিয়া বসিলেন। ব্রহ্মলীন গুরুদেব ঠাকুরদাস মহারাজকে মনে মনে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "বাবা, এতবড় একটা সাধু জমায়েৎ আমার সঙ্গে আজ চলছে, অথচ আহার্য্য সংগ্রহের কোন সম্ভাবনা নেই। এরা সবাই যে আমার উপরই নির্ভর ক'রে আছে। তুমি কৃপা ক'রে এর একটা বিহিত করো।"

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাসজীর মানসপটে ভাসিয়া উঠিল একটি বিরাট বৃক্ষ, উহার শাখায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে সুস্বাদু ফল।

আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি সেবক শিষ্যদের বলিলেন, "তোমরা আশেপাশে শিগ্‌গীর একটু তল্লাসী চালাও তো। আজ বৃক্ষই হবেন আমাদের ভোজন দাতা। দ্যাখো কোথাও কোন বৃক্ষে সুপক্ব ফল রয়েছে কিনা।"

খোঁজাখুঁজি তখনই শুরু হইয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ দূরে সন্ধান মিলিল একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষের, সত্যই অজস্র সংখ্যক পাকা ফল উহাতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীরা ঐসব আম্র ভোজন করিয়াই সেদিন ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিলেন।

সাধুরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, এই আম্র ফলিয়াছে নিতান্ত অসময়ে। তাছাড়া, এই বিরাট বনে একটি ছাড়া আর কোন আম্রবৃক্ষ বর্ত্তমান নাই। সকলেই বুঝিয়া নিলেন, ইহা পরমহংস দয়ালদাসজীর যোগবিভূতিরই এক নিদর্শন।

পরমহংস দয়ালদাস-বাবা তাঁহার জমায়েৎ নিয়া কয়েকটি তীর্থ ঘুরিয়াছেন। এবার রওনা হইয়াছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে। পদব্রজে সবাই চলিয়াছেন। একটি দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করার পর সূর্য্য অস্তমিত হইল। নিকটে কোথাও গৃহস্থদের গ্রাম নাই যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাইবে। পথে কেবলি পড়িতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আর কণ্টক ও প্রস্তরময় দুর্গম পথ। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময় রাত্রি, তদুপরে আকাশ ব্যাপিয়া শুরু হইয়াছে মেঘের ঘনঘটা। জমায়েতের সাধুরা অতি কষ্টে দুর্গম পথ দিয়া চলিয়াছেন, কাঁটা ও প্রস্তরের ঘায়ে অনেকেরই পা হইয়াছে ক্ষত বিক্ষত। অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় পথের নিশানা বার বার ভুল হইতেছে ; সাধুরা মাঝে মাঝে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরও বিপদে পড়িতেছেন। এই ঘোর বিপদে সবাই দয়ালদাস-বাবার কাছে মিনতি জানাইতে থাকেন, "বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকেও একি সঙ্কটে আজ আমরা পড়েছি! একেই দেহ পথ-শ্রমে অবসন্ন। তার ওপর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে শোনা যাচ্ছে মেঘের গর্জ্জন। আপনি আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন।"

"তোমরা সাধু, সব কিছু ভার পরমাত্মায় ন্যস্ত করেছো। তোমরা বিপদের মুখে এমন অধীর হবে কেন? পরমাত্মাকে ডাকো, কৃপা তিনি অবশ্যই করবেন।"—নির্ব্বিকার চিত্তে প্রশান্ত কণ্ঠে দয়ালদাসজী কথা কয়টি বলিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল বিপদভঞ্জন পরম প্রভুর কৃপা-সঙ্কেত।

"অকস্মাৎ সাধুগণ দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল, এবং প্রায় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল, যেন একজন স্থূল কলেবর উলঙ্গ পুরুষ হস্তে প্রদীপ্ত মশাল লইয়া নাচিতে নাচিতে মণ্ডলীর অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, আর একজন কৃষ্ণবর্ণা

বিবসনা নারী তাঁহারই তালে তালে নাচিতে নাচিতে তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। সাধুগণ আলো দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন; ঐ আলোকের ছটায় পথ দেখিয়া মশালধারীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ এই আলোকের ছটায় সাধুগণ অক্লেশে গমন করিলেন। তাহার পর অকস্মাৎ আলোটি নিবিয়া গেল। যিনি কৃপা করিয়া আলো দেখাইতেছিলেন, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। দিগম্বরী নারীও কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

"সাধুগণ দেখিলেন, তাঁহারা একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তথায় থাকিবার আশ্রয় পাইলেন, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

"নির্ব্বিঘ্নে সাধুগণ গ্রামে পৌঁছিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ,—আলো ধরিয়া আসিল কে?

"স্বামীজী বলিলেন, 'তোমরা কি চিনিতে পার নাই? সাধুগণ কাতর হইয়া ডাকিলে যিনি অভয় দান করিয়া থাকেন, ভক্ত ডাকিলে যিনি ভক্তের দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না, এ যে সেই হরপার্ব্বতী। সাধুদিগের হৃদয় ভক্তের সখার অতুল কৃপার পরিচয় পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইল[১]।"

পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল পরমহংস দয়ালদাসজীর গুরু-স্থল এবং জন্মস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবে বহু পাঞ্জাবী সাধক তাঁহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মণ্ডলীতে আসিয়া আশ্রয় নিত, সন্ন্যাস দীক্ষা নিত তাঁহার নিকট হইতে।

মণ্ডলী সঙ্গে নিয়া দয়ালদাস মহারাজ সেবার কিছুদিনের জন্য লাহোরে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তর চলিতেছে। নবাগত সন্ন্যাসী কহিলেন, "বাবা, আমরা শুনেছি, আপনি অপনার গুরুর কাছে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, আবার বেদান্তের আত্মতত্ত্বও হয়েছে পরিজ্ঞাত। আজকাল তো আপনি বেদান্ততত্ত্বের শিক্ষাই বেশী দিয়ে থাকেন। সাধন পথের

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী: শ্রীমৎ আনন্দ স্বরূপ

আমরা নূতন পথিক। কৃপা ক'রে আমাদের বলুন, কোন্ পথ আমরা অনুসরণ করবো।"

বাবা উত্তরে কহিলেন, "আমার ওপর আমার গুরুর কৃপা ছিল অপরিমেয়। তিনি সর্ব্ব সাধনায় পারঙ্গম ছিলেন, সর্ব্ব দর্শনে ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। বালক কালে যোগসাধনা ও যোগসিদ্ধির উপর আমার প্রবণতা দেখে, সেই পথেই আমায় করেছিলেন তিনি সিদ্ধকাম। তারপর বেদান্তের আত্মজ্ঞানের পরম পথটি আমায় তিনি প্রদর্শন করেন, তাঁর কৃপায় জীবন আমার ধন্য হয়। আমি নিজে সাধনার সব পথ অনুসরণ করেছি, অনেক কৃচ্ছ্র, অনেক তপস্যা করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, আজকের দিনের মানুষের পক্ষে যোগ সাধনার পথ বড় কঠিন। বরং সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে থেকে তারা চিত্তের মল অপসারণ করুক নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার করে আত্মাকে উপলব্ধি করুক। তাই হবে তাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল সাধনা। এই জন্যই সর্ব্ব সাধারণের কাছে বেদান্তের উপদেশই আমি দিই।"

নবীন সন্ন্যাসীদের অনুরোধে বাবা বেদান্তের কয়েকটি মূলতত্ত্ব এ সময়ে বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু বেটা, তোমরা গৃহস্থ নও, সন্ন্যাসী। মোক্ষের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছো। একটা কথা মনে রেখো। শুধু বেদান্ত শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার ত্বরান্বিত হবে না। এজন্য চাই নিত্য অভ্যাস, নিত্য নিদিধ্যাসন। জানতো, বিবেক চূড়ামণি বলেছেন,

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্॥

—বেদান্ত শ্রবণ অপেক্ষা মনে মনে বেদান্তসিদ্ধান্তের চিন্তন করার ফল শতগুণ বেশী, তা অপেক্ষা লক্ষগুণ ফলপ্রদ হচ্ছে আত্মায় নিদিধ্যাসন অভ্যাস করা, পরমাত্মায় প্রলীন হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাওয়ার ফল হচ্ছে অনন্তগুণ।

"অপোরোক্ষানুভূতি-তেও রয়েছে সেই একই কথা।—প্রতিনিয়ত নিদিধ্যাসনের অভ্যাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না।

অতএব মুমুক্ষু পুরুষকে আত্মকল্যাণের জন্য সদাই রত থাকতে হবে ব্রহ্মধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনে।"

তত্ত্ব প্রসঙ্গ শেষ হইলে জনৈক সেবক জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, আপনি কাল বলেছিলেন, এখানকার ডেরা ডাণ্ডা এবার ওঠাতে হবে—এসম্বন্ধে আর তো কিছু নির্দ্দেশ দিচ্ছেন না।"

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, "হাঁ বেটা, এবার আমরা চলার পথে। কিন্তু দুটি লোকের জন্য যে আমায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তাই তো, তারা যে এখনো এসে পৌঁছুলো না।"

"কাদের আস্‌বার কথা মহারাজ? কোন পুরোনো ভক্ত?" সেবকটি স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নিয়া প্রশ্ন করে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখীন হইয়া যান দয়ালদাস-বাবা। আপন মনে নিম্নস্বরে কহিতে থাকেন, "আহা, বেটা কতদূর থেকে ছুটে আসছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পা দুটো হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। হ্যাঁ, প্রাণে যখন বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে, মানুষ তখন এমনি ব্যাকুলতা নিয়েই এগিয়ে আসে।"

উপস্থিত শিষ্য ও সেবকেরা বাবাকে চাপিয়া ধরিলে আসল কথাটি এবার ভাঙিয়া বলিলেন, "লাহোর থেকে অনেক দূরের পথ, সতানা গ্রাম থেকে আসছে মুন্না সাহুকার। এ শরীরের দর্শন আগে সে কখনো পায়নি, মন তার উতলা হয়ে উঠেছে বেশ কিছুদিন ধরে। স্বপ্নে দেখেছে, এখান থেকেই পাবে সে তার সন্ন্যাস দীক্ষা। তাই জীবন পণ ক'রে সে ধাবিত হয়েছে। এমন বৈরাগ্যের উদয় যার হয়েছে, তাকে ঠেকানো কঠিন। তাই তো এখানে অপেক্ষা করছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দয়ালদাস-বাবার তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় সেই বৈরাগ্যবান্ মানুষটি, কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়ে তাঁহার চরণ-তলে। বার বার নিবেদন করে নিজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

সেই দিনই এক শুভ লগ্নে দয়ালদাসজী এই নবাগত মুমুক্ষুকে দান করেন সন্ন্যাস দীক্ষা। নব নামকরণ করেন—দয়ানন্দ স্বামী। গুরুর নির্দ্দেশে বৈরাগ্যময় তপস্যা শুরু করিয়া দয়ানন্দজী উত্তরকালে পরিণত হন এক সার্থকনামা সাধকে। কাশীতে দীর্ঘদিন তিনি

অবস্থান করেন, তারপর দয়ালদাস-বাবার প্রিয় শিষ্য ও মণ্ডলী-নেতা স্বামী আনন্দপ্রকাশজীর সঙ্গে থাকিয়া উত্তরভারতের নানা তীর্থে গুরুর ইপ্সিত কর্ম্ম অন্নদানব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

অন্তর্যামী মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবা অপর যে লোকটির জন্য লাহোরে সেদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবার সেও আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকটি জাতিতে জাঠ, বাড়ী লাহোরের অনতিদূরে গোছীগাঁও-এ। দেশে তাহার চাষবাসের ভাল খামার আছে, বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। কিন্তু একমাত্র কন্যাটিকে নিয়া এই জাঠ জোতদার বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাটি উন্মাদ রোগগ্রস্তা, ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়া দীর্ঘদিন তাহার চিকিৎসা করানো হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। গোছীগাঁও-এর বহু লোক সম্প্রতি পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। তাহাদের মুখে বাবার যোগবিভূতির খ্যাতি শুনিয়াছে এই জাঠ। তাই উন্মাদ কন্যার রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

দয়ালদাসজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত ভক্তটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "বাবা, এই কন্যাটি ছাড়া সংসারে আর আমার আপন বলতে কেউ নেই। আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে কয়েক বৎসর যাবৎ। শুধ্ এই কন্যাটিকে অবলম্বন ক'রে আমি দিন গুজরান করছি। আজ ক' বৎসর হ'লো সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এখন সব চিকিৎসার বাইরে। আপনি কৃপা ক'রে তাকে রোগমুক্ত করুন সেই সঙ্গে আমার প্রাণও রক্ষা করুন।"

দয়ালদাসজীর চোখ দুটিও অশ্রু ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহ পূর্ণস্বরে কহিলেন, "বেটা, তোমার জন্যই যে আমি আজ এখানে অপেক্ষা করছি। আমার তো এর আগেই লাহোর ছেড়ে যাবার কথা ছিল। ওঠো, এবার শান্ত হয়ে বসো, আর কেঁদো না। তোমার কন্যা আমার অপরিচিতা নয়। তাঁর পূর্ব্ব জন্মের খবর আমি রাখি। আসলে উন্মাদ রোগে সে ভুগছে না। তোমার ডাক্তার কব্‌রেজরা ভুল করেছে, অসুস্থতার কারণ ধরতে পারেনি।"

"সে কি মহারাজ! তাহলে—"

"হাঁ, বেটা, তোমার কন্যা হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, পূর্ব্ব জন্মে সে ছিল যোগভ্রষ্টা সাধিকা। এ জন্মের গোড়াতেই তার পূর্ব্ব স্মৃতির কিছুটা উদয় হয়েছে, পূর্ব্বের যোগসিদ্ধির অনুভূতিও স্ফুরিত হবার অবকাশ খুঁজছে। তোমার কন্যা উন্মাদ নয়, সে ভুগছে যোগজ ব্যাধিতে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আজ থেকে সে ভাল হয়ে উঠবে, খুঁজে পাবে সে নিজ সাধনার ভিত্তিভূমি।"

আর্ত্ত জাঠ ভক্তটির হৃদয় হইতে পাষাণ ভার নামিয়া যায়। করজোড়ে সে নিবেদন করে, "মহারাজ, আপনার অসীম কৃপার কথা এতদিন লোক মুখে শুনে এসেছি, এবার তা নিজে অনুভব ক'রে ধন্য হলাম। মহারাজ আর একটু কৃপা এ অধমকে করুন। আপনার চরণামৃত আমায় দিন, গোছীগাঁও-এ ফিরে গিয়ে আমার কন্যাকে তা পান করাবো।"

"বেটা, তার কোন আবশ্যক নেই। তবে একটা কাজ তুমি করবে। তোমার গৃহে একটি ছোট শিবমন্দির তৈরী ক'রে দাও, তোমার কন্যা শিব বিগ্রহের পূজো ও জপধ্যান নিয়ে থাকুক। আমি আবার আশীর্ব্বাদ করছি। তাঁর পূর্ব্ব জন্মের সাধনা এবার সার্থক হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে এগিয়ে যাক্।"

ভক্ত জাঠটি আনন্দে বাবার এই নির্দ্দেশ মানিয়া নেয়। তারপর বহু কাকুতি মিনতির পরে দয়ালদাস মহারাজের চরণামৃত সে সংগ্রহ করে, রওনা হয় স্বগ্রামের দিকে।

"অন্নদানে বাবা দয়ালদাসের ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে তিনি শুধু একবার সেই সমস্ত স্বয়ং দর্শন করিতেন ও সদ্‌গুরুর কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক সাধুদিগকে পরিবেশন করিবার অনুমতি দিতেন। জানা নাই শুনা নাই, অনাহূত, রবাহূত কত লোকই যে ভোজন করিতে বসিত তাহার সীমা নাই। কিন্তু কখনও কোন দিনও স্বামী দয়ালদাসের ভাণ্ডারে অন্নের ন্যূনতা হয় নাই। একবার হৃষীকেশে সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অন্ন প্রস্তুত ছিল, তদতিরিক্ত অন্যূন আট শত সাধু উপস্থিত হইলেও সেই অন্নেই সকলের পরিপূর্ত্তি হইয়াছিল, বরং কিছু অন্ন উদ্বৃত্তও ছিল।

"তিনি যে তীর্থে বা যেখানে যাইতেন, তাঁহার নাম শুনিলেই দোকানদারগণ তাঁহার মণ্ডলীর জন্য যত দ্রব্য আবশ্যক হইত সমস্তই সরবরাহ করিত। মূল্য কে দিবে, দোকানদার তাহা কখনও জিজ্ঞাসা করিত না। কোন চিঠা নাই, পত্র নাই, স্বামী দয়ালদাসের নাম শুনিলেই দোকানদার দ্রব্য দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিন হাজার, চার হাজার টাকার সামগ্রী দিল, তবু দোকানদার টাকার তাগিদ করিত না। তাহারা জানিত, স্বামীজী সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কেহ না কেহ সেই টাকা পরিশোধ করিবেই করিবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিত। তজ্জন্য স্বামীজীকে বা দোকানদারকে কোন চিন্তাই করিতে হইত না।

"১২৯৭ সালের হরিদ্বার কুম্ভমেলার শেষে যখন স্বামীজীর মণ্ডলীর স্থানান্তরে যাওয়া স্থির হইল, তখন মণ্ডলীর একজন সাধু আসিয়া বলিলেন যে, দোকানদার প্রায় সাত-আট হাজার টাকার সামগ্রী যোগাইয়াছে, ভক্তগণ প্রায়ই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও আটশত টাকা তাহার বাকী আছে।

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন,—তজ্জন্য তুমি উদ্বেগ করিও না, এ ঋণ পরিশোধ করিয়া তুমি দুইশত উদ্বৃত্ত দেখিতে পাইবে। সাধু নীরব রহিলেন।

অন্তর্য্যামী সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? তাহার পরিদিন কোথা হইতে একজন ধনাঢ্য ভক্ত আসিয়া স্বামীজীর চরণে এক হাজার টাকা ভেট দিয়া প্রণাম করিলেন, সকল লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। দোকানদারের আটশত টাকা পরিশোধ হইয়া সাধুদের জন্য দুইশত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল।[১]"

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রথা নাই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। সেবকেরা জানাইলেন, "বাবা, এই উদ্বৃত্ত দুইশত টাকা নিয়ে কি করা হবে, আপনি নির্দ্দেশ দিন।"

ভিন্ন মণ্ডলীর কয়েকটি প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী দূর দেশ হইতে মেলায় আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে।

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ।

দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কাছে ডাকাইলেন, শিষ্যদের আদেশ দিলেন, "উদ্বৃত্ত টাকা সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই সাধুদের ট্রেনভাড়া ও-থেকে দিয়ে দাও। তারপরে যে কটি টাকা বাঁচবে, তা দিয়ে ওদের দু'একটি শাস্ত্রগ্রন্থ আর বহির্ব্বাস কিনে দাও সব ল্যাঠা চুকে যাক্।"

রাজপুতানা আলোয়ারের প্রসিদ্ধ মোহান্ত বাবা ভগবান্‌দাসজী এক সময়ে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সে-বার কুরুক্ষেত্রে এক এক বিরাট ধর্ম্মমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। দয়ালদাসজীও সেখানে তাঁহার মণ্ডলী ও আশ্রিত সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত।

সাধু, দর্শনার্থী ভক্ত ও কাঙালীদের ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। রোজ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অন্নদান করা হইতেছে। এই সময়ে ভাণ্ডারার সব ভার ছিল বাবা ভগবান্‌দাসজীর উপর। মেলা শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল, ধনী শেঠ ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে এবং দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা সবটা তখনও শোধ করা যায় নাই। দুই হাজার টাকার উপর দেনা রহিয়া গিয়াছে। অথচ দুই একদিনের মধ্যে তাঁবু ভাঙিয়া দেওয়া হইবে।

ভগবান্‌দাসজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাই দয়ালদাসজীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "মহারাজ, আমাদের সবাইকে তো এবার এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দোকান বাকীর টাকার তো কোন ব্যবস্থা নেই। কি উপায় হবে?"

"টাকাটা এখানে ব্যয় করা হয়েছে কেন? সাধুদের জন্যই তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমি তো আমার বেটা বেটীর বিয়ের জৌলুষে খরচ করিনি? তুমি এতো দুশ্চিন্তায় পড়েছো কেন? সদ্‌গুরু সব সময়েই এ সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, প্রতিদিন তা প্রত্যক্ষও ক'রছো। তবে এই চিত্তচাঞ্চল্য কেন?"

দুই দিন পরেই দেখা গেল, এক সিন্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। দয়ালদাস-বাবা এখনো মেলা-ক্ষেত্রে রহিয়াছেন শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই শেঠ দুই হাজার টাকার একটা পুঁটুলী বাবা মহারাজের চরণতলে রাখিয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ দয়ালদাস-বাবা ভাণ্ডারার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ভগবান্‌দাস-জীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "এই নাও বেটা, সদ্‌গুরু কৃপা ক'রে এই টাকা আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা এখনি পরিশোধ ক'রে দাও। তারপর আমিও মণ্ডলী নিয়ে অন্যত্র রওনা হই।"

এই কুম্ভমেলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ সাধক, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় লিখেন :

"এই মহামেলায় রাজা রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্ন্যাসী সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়া বোধ হইল। আখড়াধারী মোহান্তগণের সাজসজ্জা প্রধান প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক জাঁকজমকের। হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী, ভেরী প্রভৃতির তুমুল ব্যাপার, এবং প্রত্যেক আখড়ার সহস্র সহস্র সাধু, গৃহস্থ অভ্যাগতের অবিরত অন্নদান দর্শনে আমাদের হৃদয় উৎসাহ ও উল্লাসযুক্ত হইল। নাগা, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, ঊর্দ্ধবাহু, নখী, ঠারেশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, শরশয্যী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, অস্তঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভুখড় কুখড়, উখড়, ঘরবড়া, স্বর্ভঙ্গী, দশনামীসন্ন্যাসী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, অবধূত, ব্রহ্মচারী হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধারী, কাণফাটা যোগী আদি কত শ্রেণীর কত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী যে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল। চক্ষু সফল ও মানবজন্ম পবিত্র হইল।

"এই মহা মহর্ষি মেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তির ফোয়ারা ছুটিতেছে দেখিতে পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলাখেলা আর

ভাল লাগে না, জীবের বৃথা মান অভিমান যেন কোথায় পলায়ন করে।

"এবারে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া আর একটি অলভ্য লাভ হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের সুযোগ্য দীক্ষাগুরু শ্রীমদবধূত দয়ালদাস স্বামীজী মহারাজের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি সমস্ত জনতার প্রান্তবর্ত্তী নির্ম্মল সৈকতভূমিতে, তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে আসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শত শত পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটিরে আসন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং গম্ভীর প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। বহুদিনের পর তিনি তাঁহার দিগ্দেশ বিখ্যাত সুযোগ্য শিষ্য কুমার পরিব্রাজককে (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং বহু শাস্ত্রবেত্তা অন্যান্য সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন।

"স্বামীজীর মণ্ডলীতে আমরা কয়েকদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম। যখনই যাই, তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, ত্যাগী, সংযোগী, স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার সদয় ভাব দর্শন করিয়া শত শত শির তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইতেছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে যিনি কাহারও বাটিতে গমন করেন না, তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহ অন্যূন চারি সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী, দুঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তুক, অভ্যাগত, পুরী মালপোয়া মোহনভোগ অন্নব্যাঞ্জনাদি তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেছে। দুই বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত। কিছু বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতেছে। তাঁহাব জ্ঞানগম্ভীর ও প্রেমপূর্ণ বাণী যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ মন খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ধন্য তাঁহার তপঃশক্তি, ধন্য তাঁহার ভগবদ্ভক্তি।

যখনই যাই তখনই দেখি তাঁহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, না হয় ভগবদ্‌ভজন, সংকীর্ত্তন না হয় সদ্বার্ত্তালাপ হইতেছে। মুহূর্ত্তমাত্র তথায় সময় অপব্যয়িত হয় না।”

১৩০০ সালের ভাদ্র মাস। দয়ালদাস মহারাজ এই সময়ে কয়েকদিনের জন্য বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছে প্রায় তিনশত সাধুর এক বিরাট দল। অসি ঘাটের নিকটে এক আম্রকুঞ্জে তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের জন্য ভীড় করিয়াছে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী। কেহ তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া অর্থ দিতেছে, কেহ দিতেছে বস্ত্র, ফলমূল ও মিষ্ট দ্রব্যাদি। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ এই সব ভেটদ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীনদুঃখীদের মধ্যে।

এই সঙ্গে সমাগত সাধু সজ্জন ও গৃহস্থদের দিতেছেন তিনি শাস্ত্রের উপদেশ। বার বার কহিতেছেন, “দুঃখের চিরনিবৃত্তি যদি চাও, সত্যকার আনন্দ যদি লাভ করতে চাও, তবে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করো, ভোগসুখকে দাও দূরে সরিয়ে। সদাই স্মরণে রাখো ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’—এই পরম তত্ত্ব। তুমি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নও। বাসনা আর মায়া মমতার ফলে চিত্তে তোমার মল জমে গিয়েছে। ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধনা ক’রে, নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার ক’রে এই মলকে দূরীভূত করো, পরম চৈতন্যময় আত্মসূর্য্য ভাস্বর হয়ে উঠবেন তোমার সাধনসত্তায়।”

ভক্ত দর্শনার্থীরা বিস্মিত হইয়া দেখে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে শুধু তাঁহার অনুগামী শিষ্যেরাই নয়, অপর সম্প্রদায়ের সাধুরাও পরম আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের এই সব সাধু সন্ন্যাসীরা দয়ালদাসজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার দিব্য সঙ্গ লাভের জন্য তাঁহারা এত ব্যাকুল। দয়ালদাসজীও এই সাধুদের ভালবাসেন নিজের মণ্ডলীর শিষ্য ভক্তদের মত।

দয়ালদাস-বাবার স্বনামধন্য বাঙালী শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্থায়ী বাসস্থান বারাণসীতেই। আরাধ্য গুরুদেবের আগমনে তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। প্রতিদিনই অসিঘাটের বাগানে গিয়া তিনি গুরুদেবের চরণ দর্শন করেন, তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের তত্ত্বালোচনা শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী মন্দিরের তখন খুব সুনাম। বহু ভক্ত ও সাধনার্থী সেখানে যাতায়াত করে, সাধক ও ধর্ম্মবক্তা কৃষ্ণানন্দের উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্ম-জীবন গঠন করিতে প্রয়াসী হয়। নিজের মণ্ডলীসহ দয়ালদাসজী একদিন যোগেশ্বরী মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, কৃষ্ণানন্দের অনুরোধে সমাগত ভক্ত নরনারীকে দান করেন সাধন-উপদেশ।

সেদিন বারাণসীর কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত দয়ালদাস-বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাদের একজন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ আপনি কোন্ স্বামী ?"

প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য—দয়ালদাসজী দশনামী সন্ন্যাসী স্বামীদের কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তাহা জানিয়া নেওয়া।

দয়ালদাস-বাবা সহাস্যে উত্তর দেন, "আমি শুধু স্বামী নই, আমি —দাস স্বামী।

"এ কি কথা আপনি বলছেন, মহারাজ ? সন্ন্যাসী তো কখনো 'দাস হন না। সবাই তাঁহাদের জানে 'স্বামী' ব'লে।"

"পণ্ডিতজী, তবে শুনে রাখুন, সন্ন্যাসী মাত্রেই যেমন স্বামী, তেমনি তাঁরা দাসও বটেন।"

"এ বড় অদ্ভুত কথা। এর তাৎপর্য্য তো আমরা বুঝতে পারছিনে, মহারাজ।"

"অদ্ভুত নয় পণ্ডিতজী, এটা যে পরম সত্য কথা।"

"একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন কি ?"

"তবে শুনুন। নিজ নিজ শিষ্যের কাছে প্রত্যেক সন্ন্যাসী হচ্ছেন—স্বামী, আর নিজ নিজ গুরুর কাছে তাঁরা—দাস।"

"তাই তো, এ দিকটা তো আমরা তেমন ভেবে দেখিনি।"

"তাছাড়া, পণ্ডিতজী, ভেবে দেখেছেন কি, শুধু সন্ন্যাসীদেরই

কেন স্বামী আখ্যা দেওয়া হবে? আরো অনেকেরই তো স্বামীত্ব রয়েছে; যেমন ধরুন—ভূস্বামী, গৃহস্বামী। আসল কথাটা কি জানেন, সন্ন্যাসীদের লোকে স্বামী বলে ডাকে বটে, কিন্তু যাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁরা জানেন যে তাঁরা—দাস, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যিনি মানব-জীবনে সম্ভব ক'রে তোলেন সেই গুরুদেবের তিনি একান্ত দাস।"

দয়ালদাস-বাবার এই মন্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যাগত পণ্ডিতজী কিছুটা ভড়্কাইয়া গিয়াছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনার কথায় সব ধারণা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, দয়া ক'রে বলুন তো আপনি কোন্ মঠের সন্ন্যাসী?"

উত্তর হইল, "গগন মঠের।"

"গগন মঠ? এর নাম তো কখনো শুনি নি?" পণ্ডিতজীর চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

"বেশ তো, আপনি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনেছেন, বলুন তো।"

"বড় বড় খ্যাতনামা মঠের নাম কে না জানে? এই ধরুন—শৃঙ্গেরি মঠ, জ্যোতিঃমঠ, সারদা মঠ, গোবর্দ্ধন মঠ।"

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার স্বর এবার গম্ভীর হইয়া উঠে—"বলতে পারেন, এসব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে? না—নূতন কোন সাধকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত?"

"মহারাজ, এসব মঠ তো প্রতিষ্ঠা করেছেন আচার্য্য শঙ্কর।"

"উত্তম কথা কথা, পণ্ডিতজী। কিন্তু, বলুন তো আচার্য্য শঙ্কর আর তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন?"

প্রশ্নকারী পণ্ডিত এবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইলেন। আর তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছে না।

দয়ালদাস মহারাজ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "নিত্য ও শাশ্বত পরম বস্তু পাবার জন্য যাঁরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবেন, পিতা মাতার পরিচয় নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন, তাঁদের কি আবার সন্ন্যাস-আশ্রমের পরিচয় বহন ক'রে বেড়াতে হবে? নূতনতর কৌলীন্য

ঘোষণা করতে হবে? স্মরণ রাখবেন, যেখানেই সম্প্রদায়ের পরিচয় সম্প্রদায়ের গণ্ডী, বড় হয়ে ওঠে, সেখানেই জেগে ওঠে অভিমান। আর সে অভিমান হয় অখণ্ড পরমবোধের পরিপন্থী।”

নীরবে নতমস্তকে বসিয়া পণ্ডিতজী এতক্ষণ দয়ালদাস-বাবার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন। এবার মৃদুস্বরে কহিলেন, “কিন্তু মহারাজ, আচার্য্য শঙ্করের মঠমালাকেই যে আজকের দিনের সাধু সন্ন্যাসীরা গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন—”

“তাঁরা ভালোই করেছেন, তাতে মঠমণ্ডলীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মোহান্ত ও সাধু সন্ন্যাসীর দল। এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অভিমানও কম বেড়ে ওঠে নি। একথাটি সদাই স্মরণ রাখবেন, আচার্য্য শঙ্কর বা তাঁর গুরুপরম্পরার কেউ ই কোন মঠের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। সেই জন্যেই আমি বলেছি-- আমি গগন মঠের সন্ন্যাসী। অনাদি অনন্ত যে মহাকাশে ব্রহ্মলীলা আর সৃষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, সেই মহাকাশই আমার মঠ—আমার পরমাশ্রয়।”

পণ্ডিতজী এবার তাঁহার আসন ত্যাগ করেন, ভাবাবেশে লুটাইয়া পড়েন পরমহংস দয়ালদাসজীর চরণ তলে। আর্ত্তকণ্ঠে কহেন, “মহারাজ, আপনার বিচার পদ্ধতি, আর আপনার উদার সার্ব্বভৌম বাণী, আজ আমার ভেতর জাগিয়ে তুলেছে নূতনতর চেতনা। সন্ন্যাস জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য আজ বুঝতে পেরেছি। আমি অবোধ, অজ্ঞান, আপনি আমায় কৃপা করুন, চরণাশ্রয় আমায় দিন।”

পরিব্রাজনের পথে দয়ালদাসজী সে-বার সদলে গয়া হইতে রাজগীর অভিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রার প্রাক্কালে গয়ার ভক্তেরা কহিলেন, “মহারাজ, রাজগীরের পথ বড় জনবিরল, পথে সমৃদ্ধ কোন গ্রাম নেই। আপনি তিনশত লোকের জমায়েৎ নিয়ে চলেছেন, ভোজনের দ্রব্য তো পথে মিলবে না। বরং আমরা এখান থেকেই প্রচুর আটা, ঘিউ, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।”

দয়ালদাস-বাবা গম্ভীর স্বরে বলিয়া দিলেন, "না। কোন খাদ্যবস্তু এই জমায়েতের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই।"

মণ্ডলীর দুইজন প্রবীণ সাধু কহিলেন, "বাবা, তিনশত মূর্ত্তি আপনার জমায়েতে রয়েছে। জনহীন রাস্তায় এত লোককে আমরা কি ভোজন ক'রতে দেবো? সবার কত কষ্ট হবে। এরা যখন দিতেই চাচ্ছেন, কিছুটা খাদ্য সঙ্গে নিয়ে নেওয়া মন্দ কি?"

দয়ালদাস মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যদি গৃহস্থদের মত সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বহন ক'রেই আমরা পথ চলি, তা হলে গৃহ ছেড়েছি কেন বলতে পারো?"

"বাবা, অনাহারে এতগুলো লোকের কষ্ট হবে, এ ভেবেই আমরা কথাটি বলেছিলুম।"

"তোমাদের ভয় ভাবনার কোন্ কারণ নেই। সদ্‌গুরু সব সময়েই তাঁর কৃপাদৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন এই জমায়েতের ওপর। একথাটি কখনো ভুলো না।"

শিষ্য ও সেবকেরা দয়ালদাস-বাবার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রওনা হইলেন পদযাত্রায়।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড পথচারীদের উপর অগ্নি বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সাধুরা সবাই পথশ্রমে কাতর। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। এমন সময়ে পথিপার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বটবৃক্ষতলে জমায়েৎ আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাস-বাবার সম্মুখে উপস্থিত হন এক ভক্ত শেঠ। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া শেঠজী কহেন, "বাবা, আজ দুদিন হয়, তাঁবু খাটিয়ে, লোকজন নিয়ে আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি। স্বপ্নে প্রত্যাদেশে পেয়েছি, আপনি এক বিরাট সাধু জমায়েৎ নিয়ে এই পথে যাচ্ছেন, আপনার সেবার জন্য আমি যেন তৈরী থাকি।"

মহাত্মা দয়ালদাস-বাবার দুই চোখে তখন দুষ্টুমির হাসি। শিষ্য সন্ন্যাসীদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "ছাখো, গৃহস্থের মত ভূতের বোঝা বয়ে আনো নি বলেই, এই সজ্জন গৃহস্থ তোমাদের সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।"

জমায়েতের এক প্রবীণ সাধু দয়ালদাসজীর দিকে তাকাইয়া সহাস্যে মন্তব্য করিলেন, "মহারাজ ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলে গিয়েছেন,- তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। আপনার বেলায় সব সময়েই এটা প্রভু প্রয়োগ করছেন,' আর চাইছেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে।"

শেঠজীর লোকরা ভোজ্য বস্তু সব তৈরী করিয়াই রাখিয়াছে। সাধুরা বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলেই, তাঁহাদের সম্মুখে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জড়ো করা হইল গরম লুচি, হালুয়া ও মালপোয়া। সবাইকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ শেঠজী বিদায় গ্রহণ করেন, পরমহংস দয়ালদাসজীর জমায়েৎ আবার চলিতে থাকে রাজগীরের পথে।

১৩৩০ সালের প্রয়াগ কুম্ভমেলা। প্রতিবারের মত এবারও এই ধর্ম্মমহামেলায় দেখা যায় দয়ালদাস মহারাজের বিপুল প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা। শুধু তাঁহার নিজস্ব মণ্ডলীর সাধু ও গৃহস্থেরাই তাঁহার সত্রে ভীড় করে নাই, অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও আশ্রয় নিয়াছেন এই উদার, সদানন্দময়, আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে। দয়ালদাসজীর পরম আনন্দ অন্নদানে আর বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যানে। তাই তাঁহার তাঁবুটিকে কেন্দ্র করিয়া মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুরা গড়িয়া তুলিয়াছে এক বিরাট জমায়েৎ। ভক্ত দর্শনার্থী ও কৌতূহলী তীর্থযাত্রীরাও বাবার দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য আসিতেছে দলে দলে।

ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় এ সময়কার আনন্দময় পরিবেশটির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন স্বামী রামানন্দ ভারতী। পূর্ব্বাশ্রমে ইনি পরিচিত ছিলেন রামকুমার বিদ্যারত্ন নামে; ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক রূপে ইনি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন। ভারতী মহারাজ লিখিয়াছেন :

"আমরা কোন মণ্ডলীর অন্তর্গত না হইলেও পরমহংস পরিব্রাজক বাবা দয়ালদাস স্বামীর মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিতাম। বাবা

দয়ালদাসের অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাবা দয়ালদাসের উদারতা, প্রেম, দীনের প্রতি দয়া, শিষ্য বাৎসল্য উপমার যোগ্য। বাবা দয়ালদাস একজন যাযাবর সন্ন্যাসী। তাঁহার মঠ নাই, মন্দির নাই, বাসস্থানের কিছুই ঠিক নাই, তিনি যেখানে যান, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভক্ত শিষ্য আছেন। এই কুম্ভমেলা বসিবার অন্যূন একমাস পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন,—তোমরা মেলায় যাইয়া সত্র খুলিয়া দাও, যে সব সাধুরা পূর্ব্বে যাইবেন, তাঁহাদের ভিক্ষার যেন কোন কষ্ট না হয়।

"তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাত্মা দয়ালদাস স্বামীর শিষ্যেরা আসিয়া মেলাক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকের রেতীর পরপারে অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। সাধুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটির সকল নির্ম্মিত হইল এবং সদাব্রত কার্য্য আরম্ভ হইল। বাবা দয়ালদাস যেখানে ছাউনি করিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সিন্ধের নানকসাহী সাতবেলা মঠের ও স্বামী কেশবানন্দের ছাউনি হইয়াছিল। স্বামী দয়ালদাসের মণ্ডলীতে একটি পট্টাবাস ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বাস করিতেন না। সেই পট্টাবাসে অপরাপর সাধু বাস করিতেন, এবং ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষিত হইত ; তিনি সামান্য কুটিরে অপরাপর সাধুর ন্যায় বাস করিতেন, সমস্ত দিন প্রায় বালুর মধ্যেই বসিয়া থাকিতেন ও অপরাপর সাধুদিগের ও ভিক্ষার্থী কাঙ্গালিদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। কখন কখন দেখিয়াছি পাঁচ সাত শত সাধু, এবং পাঁচ সাত শত কাঙ্গালি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মহাত্মা দয়ালদাস তাঁহাদের এক পার্শ্বে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। কখনো তিনি বালুর মধ্যে বসিয়া আছেন, ধনী মানী গণ্যমান্য শত শত লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কি সুন্দর দৃশ্য!

"বাবা দয়ালদাসের ভাণ্ডার অফুরন্ত—চারিদিক হইতে আহারীয় দ্রব্য আসিয়া তাঁহার ভাণ্ডারে পুঁজি হইতেছে, আর সাধু দরিদ্র-দিগকে বিতরিত হইতেছে। কোন বিচার নাই—যে চাহিতেছে, সেই পাইতেছে। পাতা লইয়া বসিলেই হইল। অবারিত দ্বার।

"কোন এক সময়ে বাবা দয়ালদাসকে একজন সাধু বলিয়াছিলেন,

'আপনি আপামর সাধারণকে অন্ন বিতরণ করেন কেন? সাধু ভোজনে বিশেষ ফল আছে, সাধুদিগকেই অন্ন বিতরণ করুন।'

"উত্তরে বাবা বলিলেন, 'সকলেরই একটা মর্য্যাদা আছে, রাজা আসিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ; পণ্ডিত আসিলে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। আহারটা ক্ষুধার মর্য্যাদা দান মাত্র। সাধু ভোজনে কেবল সাধু ভোজনের ফল হয়, কাঙ্গালি ভোজন করাইলে শিব ভোজনের ফল ; কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রহীন।' বাবার এই উত্তর শুনিয়া সাধুটি অবাক হইয়া গেলেন।"

কুম্ভস্থানের মিছিল চলা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন মণ্ডলী ও আখড়ার মোহান্তেরা, কেহ হাতীর উপরে কিংখাবে মোড়ানো হাওদায় কৌপীনবস্ত হইয়া সমাসীন। কেহ বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ঘোড়ায় চাপিয়া চলিয়াছেন। আর আগে পিছে চলিয়াছেন রূপার আশাশোটা হস্তে শত শত অনুগামী সন্ন্যাসী। পতাকা ধ্বজা, ত্রিশূল ও সন্ন্যাস দণ্ডের ছড়াছড়ি চতুর্দ্দিকে। গঙ্গার তটভূমি আর আকাশ বাতাস লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত গৃহস্থের আনন্দোল্লাস এবং জয়ধ্বনিতে তখন ভরপুর।

জমায়েতের এক তরুণ সন্ন্যাসী দয়ালদাসজীকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, স্নানের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে, ঐ দেখুন, গজবাজী সহ সাড়ম্বরে মোহান্তেরা সবাই এগিয়ে আসছেন। আপনার মণ্ডলী চল্‌বে কখন?"

পরমহংস দয়ালদাসজী ভারতখ্যাত এক প্রকাণ্ড সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অধিপতি। কিন্তু চাল চলনে ব্যবহারে কোন আড়ম্বর তাঁহার নাই, নিরভিমানতার মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। সন্ন্যাসীটির প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে কহিলেন, "বেটা, আমি হচ্ছি সাধুদের দাস। অতি গরীব আমি, নিজের বলতে একটা কানাকড়িও নেই। আমার আবার ধুমধাম কি? মিছিলে যোগ দেবার সামর্থ্যই বা কই? মূলবান জিনিষপত্র, গজবাজী, রূপোর হাওদা আমার কিছুই নেই। কি ঐশ্বর্য্য দেখাবো আমি সবাইকে, বলতো?"

"সে কি মহারাজ! যাঁর জমায়েতে হাজার হাজার লোক রোজ

অন্ন পাচ্ছে, তাঁকে গরীব বলবো কি ক'রে।" বিস্মিত হইয়া উত্তর দেন যুবক সন্ন্যাসী।

সহাস্যে দয়ালদাস বলেন, "বেটা, সব সময়ে মনে রাখবে, লোকে অন্ন পাচ্ছে অন্নপূর্ণা মায়ীর দরবারে, আমার দরবারে নয়।"

দর্শনার্থী শেঠ ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা বাবার চরণে ভেট দেয় তোড়া তোড়া টাকা, গাঁট গাঁট লুই, শাল, কম্বল, বস্ত্র, টুপী প্রভৃতি। আর সেই মুহূর্ত্তেই দয়ালদাসজী ঐসব ভেটের দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীন দরিদ্রদের মধ্যে।

জনৈক সরল হৃদয় গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, দেশের নানা অঞ্চল থেকে ভারে ভারে এত সব দ্রব্য কেন আসছে, কেন এখানে অপনার চরণতলে স্তূপীকৃত হচ্ছে, এর কারণ কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এ কি আপনার ইন্দ্রজাল না যোগবিভূতির খেলা?"

দয়ালদাসজী উত্তরে হাসিয়া বলেন, "বেটা, এ রহস্য তুমি ভেদ করতে পারছো না? আচ্ছা আমি তোমায় গোপন কথাটি ভেঙে বল্‌ছি। এ সব বস্তু আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কৃপাময়ী অন্নপূর্ণাজী। জানতো বেটা—

দেৎ কো দেৎ হ্যায় জাঁহা তাঁহা সে আন্।
অন্ দেৎ মাঁঙৎ ফিরে সাহেব ন স্যুনে কান্॥

—যে মানুষ নিজে কোন বস্তু ভোগ না ক'রে অপরকে দান করেন, ভগবান্ যে কোন স্থান থেকে এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দেন সে সব বস্তু। আর যে মানুষ কখনো দান করে না, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়ালেও তার আবেদন কখনো পৌঁছে না ভগবানের কানে।

শুধু এদেশের বিভিন্ন কুম্ভমেলা ক্ষেত্রেই দয়ালদাস-বাবার মহিমা প্রচারিত ছিল না, ভারতের সর্ব্ব অঞ্চলে, সর্ব্ব তীর্থ ও সাধনপীঠে ছিল এই সিদ্ধ মহাত্মার জয় জয়কার। তাছাড়া, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত প্রতিভাধর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি দিক্‌পাল। সাধন-ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা ও সংগঠন-

শক্তিতেও অনেকে ছিলেন অতুলনীয়। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ষড়দর্শনবেত্তা স্বামী আনন্দ প্রকাশ, মণ্ডলীশ্বর জগদীশানন্দ স্বামী, অবধূত সুন্দরদাসজী, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দিগম্বরাবধূত মুক্তানন্দ, পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ, সাধু চৈতন্যদেবজী, শ্রীমৎ ব্রহ্ম-প্রকাশজী, পরমহংস রামেশ্বরানন্দ স্বামী, মৌনী মহারাজ, শঙ্করানন্দ স্বামী, মোহান্ত রামস্বরূপজী, স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দ, স্বামী বালানন্দ (কাশী), স্বামী সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি।[১]

দয়ালদাস-বাবার গৃহস্থ শিষ্য ভক্তদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। ভারতের সর্ব্ব তীর্থে, শহরে ও জনপদে কয়েক শত সাধুর জমায়েৎ নিয়া তিনি পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আর এই সময়ে শক্তিধর মহাপুরুষ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এবং ধনী দরিদ্রের কোন তারতম্য না করিয়া আর্ত্ত ও মুমুক্ষু গৃহস্থদের করিতেন কৃপা বিতরণ। নাভার বৃদ্ধ মহারাজ ধর্ম্মপ্রাণ হীরাসিংজী দয়ালদাসজীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা-পূজা করিতেন। পাতিয়ালার তৎকালীন মহারাজা দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন। পরমহংস দয়ালদাসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মহারাজা তাঁহার কৃপাভাজন হন, লাভ করেন একটি পুত্ররত্ন। পাতিয়ালার প্রভাবশালী মন্ত্রী সর্দ্দার গুরুমুখ সিংজীও দয়ালদাসজীর অন্যতম অনুগৃহীত ভক্ত। বাবার বৃহৎ জমায়েতের সেবায় সর্দ্দারজী চিরদিন অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে চাতুর্ম্মাস্য কালে কয়েক শত সন্ন্যাসীসহ তিনি দয়ালদাসজীকে আহ্বান করিতেন, তাঁহার মণ্ডলীর সেবা-পরিচর্য্যা করিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

দয়ালদাসজীর সত্রে ও জমায়েতে রাজা, রাজমন্ত্রী, শেঠ বণিকেরা যেমন অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেন, তেমনি হাজার হাজার দরিদ্র ভক্তও প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিত তাঁহার ভাণ্ডারা ও দীন দুঃখীর সেবা-কর্ম্মে। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল ভক্তই এই উদার মহাপুরুষের মণ্ডলীসূত্রে বিধৃত থাকিত নানা রঙের নানা ঔজ্জ্বল্যের রত্নখণ্ডের মত।

১ দ বেঙ্গলী, ক্যালকাটা—১৩. ৪. ০৯

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সার্থকনামা শিষ্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সে-বার প্রয়াগ কুম্ভমেলায় দয়ালদাস-বাবার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্য তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাত্মা দয়ালদাস পঞ্জাব সাধু সম্প্রদায়ের এক প্রধান ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ বক্তা, কৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় দয়ালদাসেরই মন্ত্রশিষ্য। এই আশ্রমে আমরা স্নানাহার করিলাম। দয়ালদাসের আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহা অতি অদ্ভুত। আজানুলম্বিত হস্ত, সুদীর্ঘ কায়, গৈরিকধারী দয়ালদাস-বাবাকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা দয়ালদাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায়, যে কয়দিন কুম্ভমেলায় থাকিব, আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু কিছু উপদেশ শুনিলাম। সদ্‌গুরু বাণীতে সে সমস্ত উপদেশ আছে, সে সমস্ত অতিশয় দুর্লভ। সেই সমস্তের যদি বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়, তবে তাহা দেশের একটি বিশেষ সম্পত্তি হইবে[১]।

"দয়ালদাস মহারাজের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘমাসের আরম্ভ হইতেই কিছুই আহার করেন নাই, যেদিন তাঁহাকে দেখিলাম সেদিন ২৪শে মাঘ। তিনি অতি বিনম্রভাবে আমাদিগকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথা দয়ালদাসের সদাব্রত। দয়ালদাসের সদাব্রত কুম্ভমেলার একটি বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে দুঃখী দরিদ্রের অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে রাখে? দয়ালদাসের আশ্রমদ্বার একমাসকাল তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্ত্তৃপক্ষের সাধু-সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল-ভোজন। কিন্তু দয়ালদাসের সাধু কাঙ্গাল সকলই সমান। একদিন একজন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু-ভোজন অপেক্ষাও কাঙ্গাল-ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার কারণ কি?

১ দয়ালদাস-বাবার উপদেশ সংগ্রহ হিন্দি ভাষায় বিচার প্রকাশ নামে সঙ্কলিত হয়। এই পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ কাশী যোগাশ্রম হইতে শ্রীকামাখ্যা নাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

"দয়ালদাস উত্তর করিলেন, 'সকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধু বিচার কি ? যদি পরিচ্ছদের মানমর্য্যাদা ধর তবে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদিগকে ভোজনের ফল হয়, তবে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত কাঙ্গালিদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়।' মহাত্মা দয়ালদাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক।

"দয়ালদাসের কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বার মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যখন যেখানে থাকেন, সেইখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাঁহার অতিথি। কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর তাঁহার নির্ভর নাই। শিলাবৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে টাকা ছুটিয়া আসে, একজন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিলেন, এক শিষ্য কুড়াইয়া নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া ফেলিলেন। অর্থাপাদরজোপমা—এ কথা ইঁহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থব্যয় করে। ইঁহাদের ব্যবহার দেখিলে ঘোর সংসারাসক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন হইয়া যায়।

"মহাত্মা দয়ালদাস বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদের কীর্ত্তন তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের কাছে সেকথা তিনি বলিয়াছিলেন। দয়ালদাস দয়ার সাগর, ভক্ত প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কর্ম্মী বা কর্ম্মহীন সন্ন্যাসী নহেন।"

এই কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের সমাগম যেমন হয়, তেমনি মঠমণ্ডলী আখড়ার মোহান্ত ও শেঠেরাও সদাব্রতের জন্য ব্যয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীর মাধ্যমেও কম টাকা এসময়ে ব্যয়িত হয় নাই।

এক কৌতূহলী দর্শনার্থী সেদিন দয়ালদাসজীর তাঁবুতে আসিয়া

তাঁহার এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই মেলার সদাব্রত ও দানসত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল, তার স্থায়ী ফল বা গঠনমূলক কাজ কি হ'লো? দেশের কি কল্যাণ সাধিত হ'লো?"

শিষ্যটি উত্তর দিলেন, "দেখুন, সমাজতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই। তবে, এতে যে দেশের কল্যাণ হচ্ছে, তা বিশ্বাস করি। কল্যাণ শব্দটির এক মোটামুটি অর্থ আমরা বুঝি—যাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, তাকেই বলি সত্যকার কল্যাণ। সে কল্যাণ কিছুটা সাধিত হয় অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা, গঠনমূলক কাজ দ্বারা। আবার অর্থকে ধূলি মুষ্টির মত জলে ফেলে দিয়েও এ কল্যাণ সাধন করা যায়।"

"সেটা কি রকম?"—প্রশ্ন করেন দর্শনার্থী।

"এই ধরুন, সেদিনকার মেলাক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা। আমাদের শত শত লোকের চোখের সামনে এটি ঘটলো। এক ধনী শেঠ দয়ালদাস-বাবাকে প্রণাম ক'রে এক বস্তা টাকা তাঁর সামনে রেখে দিলো। মিনতি ক'রে বললো, 'বাবা, এ টাকাটা আপনি সাধু বা দীন দুঃখীর ভাণ্ডারায় লাগিয়ে দিন, আমায় কৃতার্থ করুন।' বাবা উত্তর দিলেন, 'তা কি ক'রে হয়, বেটা? এখানে তো আজ আর টাকা নেওয়া যাবে না। আগে যারা দিয়ে গিয়েছে, তাদের টাকা সবটা খরচ না হলে তোমার টাকা খরচ করি কি ক'রে? তুমি বরং অন্য কোথাও যাও।' লোকটি কত কাকুতি মিনতি করলেন। কিন্তু বাবা পূর্ব্ববৎ তাঁহার সিদ্ধান্তে রইলেন অটল। ভেবে দেখুন, এ ঘটনাদি যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন, টাকাকড়ি সম্পর্কে অনাসক্তি তাদের কত বেড়ে গেল, প্রাণে জেগে উঠ্‌লো ত্যাগ বৈরাগ্যের হাওয়া। একে কি সত্যকার কল্যাণ বলে না?"

প্রশ্নকারী ভক্ত দর্শনার্থীর অন্তরে কথা কয়টি আলোড়ন তুলিয়া দিল। নীরবে সেস্থান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার শেষে মণ্ডলীর তিনশত সাধু সমভিব্যাহারে দয়ালদাসজী কানপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। এবার এখানকার ভক্তদের

সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিবেন।

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার আহ্বানে বাবার শিষ্য, ধর্ম্মবক্তা কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও তখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাঁবুতে আসিয়া ভক্তি-ভরে দয়ালদাস-বাবাকে তিনি প্রণাম জানাইলেন। প্রিয় শিষ্যকে আশিস্ জানাইয়া বাবা কহিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ, ভালই হয়েছে তুমি ঠিক এসময়ে কানপুরে উপস্থিত হয়েছ। এর পর এ অঞ্চলে আমার আর আসা হবে না, এ মরদেহে থাকাও হবে না। এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।"

"সে কি বাবা, এসব কি অলক্ষুণে কথা আপনি আমায় বলছেন?" কৃষ্ণানন্দের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

দয়ালদাস-বাবা এবার মৃদু স্বরে বলেন, "হাঁ বেটা, এবার শরীর আমি ছেড়ে দেবো। অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এটা।"

কৃষ্ণানন্দ আর্ত্ত স্বরে কহেন, "বাবা, আপনাকে পেয়ে অবধি সংসারের সব কিছু ভুলে আছি, আর দিন কাটাচ্ছি দিব্য আনন্দে। আপনি দেহ ছাড়লে যে আমরা সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বো।"

স্মিতহাস্যে দয়ালদাসজী বলেন, "বেটা, নিরাশ্রয় কেন হবে? আমার এ শরীরের সান্নিধ্য তো বড় কথা নয়। আমার আত্মা, আমার শাশ্বত পরম সত্তাই হচ্ছে আসল বস্তু। তাঁর সঙ্গে তোমাদের অনেকের যোগ সাধিত হয়েছে। সেই নিত্য, অখণ্ড পরম বোধটিকে মনের ভেতর ধরে রাখো, বৈরাগ্যময় তপস্যা চালিয়ে যাও। আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সিদ্ধকাম হবে।"

কয়েক মাস পরে চাতুর্ম্মাস্য আসিয়া পড়ে। পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী সর্দ্দার গুরুমুখ সিং দয়ালদাসজীর পরম ভক্ত। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা চাতুর্ম্মাস্যের কয়েকটি মাস বাবা মহারাজ তাঁহার কাছে অবস্থান করুন, সেবার সুযোগ দিয়া তাঁহাকে ধন্য করুন।

এ সাদর আমন্ত্রণ দয়ালদাসজী গ্রহণ করেন, প্রায় এক শত সঙ্গী

সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত হন পাতিয়ালায়। সর্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্যান বাটিকায় নির্দ্দিষ্ট হয় তাঁহার মণ্ডলীর বাসস্থান।

এ সময়ে হঠাৎ এক মারাত্মক পীড়ায় দয়ালদাস-বাবা আক্রান্ত হন। সেবক গুরুমুখ সিংজী এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। পাতিয়ালার মহারাজের নির্দ্দেশে চিকিৎসার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হয়। শিষ্য ও সেবকেরা প্রাণপণে করিতে থাকেন বাবার সেবা শুশ্রূষা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা যত্নই বিফল হয়। রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

একদিন সেবকদের ডাকিয়া বাবা কহিলেন, "মাধোলাল এসেছে ? আহা, বেটা, বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তাঁকে ডেকে আনো।"

সেবকেরা এ উহার মুখের দিকে চায়। কাহার কথা বলিতেছেন দয়ালদাসজী ? তাঁহারা প্রশ্ন করে, "কে এই মাধোলাল, বাবা ?"

বাবা উত্তর দেন, রোহতক জেলায় গুরুদ্বার গাঁও-এ তার বাড়ী। আমার পুরোনো শিষ্য। আমার সঙ্গে যে তার বড় জরুরী দরকার। সে এসেছে কি ?"

"না—বাবা, এমন কোন লোক তো আসেনি।"

"তা হলে আমিই যাবো তার কাছে। হ্যাঁ আজই যাবো, বড় জরুরী।"

সেবকেরা ভাবিলেন বাবা রোগের প্রকোপে ভুল বকিতেছেন। একথা নিয়া আর তাঁহারা আলোচনা করিলেন না।

দেহ ত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীয় সাধু সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের নিকট ডাকিলেন। আদেশ মত উদ্যানের মধ্যস্থলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া যাওয়া হইল।

প্রসন্নমধুর দৃষ্টি বুলাইয়া মহাপুরুষ সবাইকে জানাইলেন অন্তরের আশীর্ব্বাদ। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন "আমার শরীর এবার চলে যাচ্ছে। তাতে তোমরা শোক ক'রো না। আমার ভেতর যে নিত্য বস্তু, শাশ্বত বস্তু রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে চলো, তবেই এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি।"

একটু থামিয়া আবার ভক্তদের কহিলেন, "আত্মার কথাই

চিরজীবন বলে আস্‌ছি, এই দেহ পড়ে যাবার সময়েও সেই কথাই বল্‌বো। আত্মা ব্যাপক, অনাদি ও অনন্ত। জন্ম মৃত্যু বলে কিছু তো নেই, অনিত্য ও সসীম বস্তুতেই এই জন্ম মৃত্যুর কথা প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রের জল আর তার তরঙ্গে কোন ভেদ নেই, সব রয়েছে অখণ্ড অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত। সারা জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মময়, জগৎ অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে এই ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণ।

"আসলে দ্বৈতভাবের ফলেই মরণকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি, ভয় পাই। কিন্তু তোমাতে দ্বৈত নেই। তুমি—অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রুতি ও গুরুবাক্য স্মরণে রেখে অদ্বৈত ব্রহ্মের চৈতন্যময় প্রকাশ অনুভব ক'রো, অজ্ঞানজনিত জগৎ প্রপঞ্চ স্বতঃই বিলীন হয়ে যাবে। এই দেহের জন্য কেউ শোক ক'রো না। আর এই দেহভস্মের ওপর কোন স্মৃতিসৌধও কেউ যেন তৈরী ক'রো না।"

কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, লীলাবৈচিত্র্যময় সিদ্ধজীবনের উপর নামিয়া আসিল চিরবিরতির যবনিকা। ১৩০১ সনের ১৭ই ভাদ্র, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি এই দিনটি তাঁহার সহস্র সহস্র ভক্তের স্মৃতিতে চিরচিহ্নিত হইয়া রহল।

পাতিয়ালার প্রধান প্রধান সর্দ্দার, অগণিত সাধু সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ বাবা মহারাজের শবদেহের অনুগমন করেন। বাদ্য ভাণ্ড সহ, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও ধ্বজ পতাকাদি সহ, চলিতে থাকে সমারোহপূর্ণ এক বিরাট মিছিল। সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধার্ঘ্য সমর্পণের পর দয়ালদাস মহারাজের মরদেহ সমাহিত হয় নদীগর্ভে।

ঠিক এই সময়েই পরমহংস দয়ালদাস-বাবার এক অলৌকিক লীলা অনুষ্ঠিত হয় রোহতক জেলার ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রাম গুরুদ্বার-এ। মাধোলাল বেদী দয়ালদাসজীর এক পুরাতন শিষ্য, এই গ্রামেই তাঁহার বাস। দয়ালদাসজীর কাছে বহুদিন আগে দীক্ষা নিয়া এ যাবৎ নিভৃতে তিনি আপন সাধনা চালাইয়া যাইতেছেন। এবার সাধনার এমন এক স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যে গুরু মহারাজের সাক্ষাৎ

দর্শন ও সাধন-উপদেশ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য কয়েকদিন যাবৎ কাতরভাবে গুরুজীকে তিনি স্মরণ করিতেছেন। লোকমুখে শুনিয়াছেন, চাতুর্ম্মাস্যের জন্য দয়ালদাস-বাবা পাতিয়ালায় অবস্থান করিতেছেন। আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, দুই এক দিনের জন্য পাতিয়ালায় যাইবেন, গুরুমহারাজের দর্শনের পর মাগিয়া নিবেন তাঁহার প্রার্থিত সাধন বস্তু। কিন্তু সংসারের নানা জটিল জালে জড়াইয়া থাকায় গ্রাম ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

হঠাৎ মাধোলাল দেখিলেন, গুরুজী দয়ালদাস-বাবা গ্রামের বড় রাস্তাটি ধরিয়া তাঁহারই বাড়ীর দিক দ্রুত পদে আসিতেছেন। একি কাণ্ড! হঠাৎ গুরুমহারাজ এখানে? তাছাড়া, একলাই আসিয়াছেন, সাঙ্গোপাঙ্গ নাই। এ বড় বিস্ময়ের কথা।

গুরুজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাধোলাল দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেন। প্রশ্ন করেন, "একি মহারাজ, আপনি একলা এত-দূরের পথ হেঁটে আস্ছেন। আপনার মণ্ডলী কোথায়? দু'একশ' সাধু সন্ন্যাসী সঙ্গে না নিয়ে তো আপনি পথ চলেন না?"

গুরুজী হাসিয়া বলেন, "বেটা মাধোলাল, তোমার ব্যাপারটা যে জরুরী। এ ক'দিন কাতর হয়ে আমায় কত ডেকেছো। তাই আমি একলাটিই তোমার কাছে এলাম। মণ্ডলী? হাঁ, তা পরে আসছে।"

অতঃপর কৃপালু দয়ালদাসজী শিষ্য মাধোলালের ভজনকুটিরে গিয়া বসিলেন, নিভৃতে তাঁহাকে দান করিলেন সেই নিগূঢ় সাধনক্রিয়া যাহার জন্য প্রিয় শিষ্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

এবার প্রসন্নমধুর হাসি হাসিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, "বেটা আমার জরুরী কাজ শেষ হয়েছে, তোমার সন্তোষ বিধানও করতে পেরেছি। এবার আমি পাতিয়ালায় ফিরে যাই। সবাই যে শোকার্ত্ত হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছে। হাঁ, বেটা, তুমি এখানকার কাজের ঝামেলা মিটিয়ে দুই দিন পরে পাতিয়ালায় চলে এসো।"

গুরুর আদেশ মাধোলাল শিরোধার্য্য করিয়া নেন। কাজকর্ম্ম গুছাইয়া রাখিয়া দুই দিন পরে গুরুমহারাজের দর্শনের জন্য তিনি পাতিয়ালায় আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু একি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড।

শিষ্য সেবকেরা সবাই সর্দ্দার গুরুমুখ সিং-এর উত্থানে শোকার্ত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, বাবা দুই দিন পূর্ব্বে ছেদ টানিয়া দিয়াছেন তাঁহার মরলীলায়। ঠিক যে সময়ে গুরুদ্বার গাঁও-এ মাধোলালের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন, সেই সময়েই বাদ্যভাণ্ড ও মিছিল নিয়া পাতিয়ালায় লক্ষাধিক লোক অনুগমন করিতেছিল তাঁহার শবদেহের।

"এ কি দৈবী মায়া! এ কি অলৌকিক রহস্য! বাবা, মহারাজের এ কি অত্যাশ্চর্য্য কৃপা লীলা!"—কথা কয়টি বার বার মাধোলাল বলিতেছে, আর কপোল বহিয়া ঝরিতেছে শোকের অশ্রুধারা।

স্বামী শিবানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন হয় মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গুরুর বিরহে ও শোকে ভক্ত শিষ্যেরা রহিয়াছেন মুহ্যমান। এমনি সময়ে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসু একদিন তাঁহার গৃহে বরানগর মঠের তরুণ গুরুভাইদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা, সবাই মিলিয়া ঠাকুরের পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবেন।

বলরামের গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর স্মৃতিবিজড়িত। ভক্তদের নিয়া কত আনন্দই না তিনি এখানে করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তন-নর্ত্তন, ভাবাবেশ ও সমাধি দর্শন করিয়া সবাই হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। তাই বরানগর হইতে নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সোৎসাহে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভজন কীর্ত্তন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের শেষে ঠাকুরের স্মৃতিচারণ চলিতেছে। এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে নরেন কহিলেন, "আমাদের ঠাকুরই ছিলেন একমাত্র কামজিৎ পুরুষ। বিবাহিত জীবনে এমন কামজিৎ জগতে আর কেউ হয়েছেন বলে শোনা যায় নি।"

একথায় কিন্তু মৃদু একটু প্রতিবাদ উঠিল। তরুণ সাধক তারক সবিনয়ে কহিলেন, "তা কেন? ঠাকুর কৃপাবলে আরও কামজিৎ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই ধরুন, আমার ভেতরেই তিনি এমন শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন যার বলে বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রেও আমি কাম জয় ক'রতে পেরেছি।"

"তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ!" বিস্ময় ও সম্ভ্রম জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন নরেন্দ্রনাথ—উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত এই 'মহাপুরুষ' আখ্যাই তারককে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে চিরচিহ্নিত করিয়া দেয়, মহাপুরুষ মহারাজ নামে তিনি মণ্ডলীতে পরিচিত হইয়া উঠেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নব নামকরণ হয় শিবানন্দ স্বামী।

সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর দিক্‌দিশারী ছিলেন স্বামী শিবানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নূতনতর ধর্ম্ম-আন্দোলনে এবং মঠ মিশনের সংগঠন ও পরিচালনায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভ্রাতা, বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মহাধর্ম্ম বা মহাসঙ্ঘের গঠন প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব-বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক—তিনেরই অঙ্গাঙ্গী প্রয়োজন আছে। তিনটির মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধর্ম্মের বা মহাসঙ্ঘের কোন কার্য্য চলিতেই পারে না; একের অবর্ত্তমানে অপরের সার্থকতাও থাকে না—ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল।"

ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যে নব তরঙ্গ উৎসারিত করিয়া যান, মহাপুরুষ শিবানন্দ সেই তরঙ্গে সঞ্চারিত করেন তাঁহার সাধন শক্তি—কীর্ত্তিত হন তাঁহাদেরই এক উত্তরসাধকরূপে।

গুরুভাই তারক যে একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ ধারণাটি পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছিল। এ সম্পর্কিত এক অলৌকিক ঘটনারও তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে, মারাত্মক ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যাশায়ী। গুরুর সেবা পরিচর্য্যায় তরুণ ভক্ত শিষ্যেরা সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, আর অলক্ষ্যে গুরু-কৃপায় তাঁহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যময় সান্নিধ্য ও স্পর্শে হৃদয়ে তাঁহাদের জ্বলিতেছে মুমুক্ষার আগুন। এই আগুন এক সময়ে আরো তীব্র হইয়া উঠে।

নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করেন বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের তপস্যাপূত ভূমিতে গিয়া কয়েকটা দিন ধ্যানাবিষ্ট থাকিবেন, প্রতীক্ষা করিবেন মুক্তির আলোক সঙ্কেতের।

এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক ও কালিপ্রসাদও উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তিন গুরুভ্রাতা এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হন, শুরু করেন তাঁহাদের তপস্যা।

এ সময়কার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখতে পান, একটি শক্তি তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারকনাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।"

নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ এ সময়ে বলেন, "ওরে কোথাও কিছু নেই, এবার সব এখানে। আর যেখানেই যাওনা কেন, কিছুই পাবে না। এখানকার সব দুয়ার খোলা।"

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত এই মহা-ইঙ্গিতটি তারক তাঁহার দীর্ঘ তপস্যাময় জীবনে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই। এই দিব্যোজ্জ্বল ইঙ্গিতটিতে সযতনে তিনি রাখিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়সম্পুটে, ইহা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার সাধনপথের পরম পাথেয়। জীবন তাঁহার হইয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণময়, লাভ করিয়াছিলেন তিনি বহুবাঞ্ছিত অধ্যাত্মসম্পদ।

তারকের পিতা রামকানাই ঘোষাল ছিলেন এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক আচার্য্যের শিষ্য। নিজেও তিনি বহুতর তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন।

বারাসতের এক বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন রামকানাই। আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি যেমন ছিল, তেমনি সদ্ব্যয়ও ছিল প্রচুর।

ধনজনে পরিপূর্ণ সংসার। কিন্তু রামকানাই ও তাঁহার পত্নী বামাসুন্দরীর অন্তরে সুখ নাই। এ যাবৎ তাঁহাদের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। এজন্য পূজা ব্রত অনেক কিছুই করা হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই।

অবশেষে উভয়ে বাবা তারকেশ্বরের পূজা দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বামাসুন্দরী অতিশয় সাধ্বী, শ্রদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী। বাবা তারকেশ্বর এ সময়ে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন। প্রত্যাদেশ হয়—'ওগো, মনে খেদ ক'রো না। এ বৎসরের মধ্যেই এক পুত্ররত্ন তুমি লাভ করবে।"

প্রত্যাদেশের ফল ফলিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণা একাদশীর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইল এক নয়নাভিরাম পুত্র।

সুন্দর সুঠামতনু শিশুকে পাইয়া ঘোষাল দম্পতির আনন্দের অবধি নাই। ধন জনে পূর্ণ প্রাচুর্য্যের সংসার এবার আরো আনন্দময় হইয়া উঠে।

কিন্তু মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘদিন এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুত্রের নবম বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। বালক তারকের জীবনে জননীর এই বিয়োগ ব্যথা এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। দিন দিন সে উদাসীন হইয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যাইত, সহপাঠী ও সঙ্গীদের সহিত থাকিয়াও সে যেন তাহার জীবনের চতুর্দ্দিকে এক গণ্ডী রচনা করিয়া চলিয়াছে। আপন উদাস মনোবৃত্তি নিয়া সে যেন সবার মধ্যে থাকিয়াও নিঃসঙ্গ। মাতার মৃত্যুর পর এক ভগিনীর মৃত্যু ঘটে। তারপর আসে আর এক শোচনীয় দুর্দ্দৈব। অপর এক ভগিনী বিধবা হন। এ সময়ে পিতার আর্থিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে থাকে।

তারকনাথ যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন তখন তাঁহার হৃদয় নানাভাবে বিপর্য্যস্ত। অবশেষে তিনি পিতৃগৃহের পরিবেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ থাকিবার পর পর গ্রহণ করেন রেলওয়ের চাকুরী। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে

উপার্জ্জন করিবেন, আর তীর্থদর্শন ও ভগবৎ-চিন্তায় কাল কাটাইবেন, ইহাই তখন তাঁহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা।

এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলিতেন, "সেই সময় সমাধি জিনিষটা যে কি তা নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হত। সমগ্র জগৎ সংসার ভুলে কি ক'রে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকা যায়— এই আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রাণে সর্ব্বক্ষণ জ্বলত। শিবের ধ্যানমূর্ত্তি, বুদ্ধের ধ্যানমূর্ত্তি—এসব খুব ভাল লাগত। মোট কথা সমাধিলাভ করবার জন্য প্রাণ খুব ছট্‌ফট্ করত এবং যাতে সমাধি লাভ করতে পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। মাসের পর মাস গিয়েছে, রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্ব্বক্ষণ ঐ এক চিন্তা—কি করলে সমাধি লাভ হয়।"

তারকনাথের পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পুত্র একেবারে সংসার বিমুখ। অবশেষে তারককে পড়িতে হইল এক কঠিন পরীক্ষায়। পিতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছে। কিন্তু পাত্র পক্ষের সর্ত্ত অনুযায়ী তারককে বিবাহ করিতে হইবে বরের ভগিনীকে। মাতৃহীনা কনিষ্ঠা ভগিনীর কল্যাণে তারকনাথ কি এ প্রস্তাবে রাজী হইবেন না?"

তারকের ইচ্ছা ছিল বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না। তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর রত হইবেন সাধন ভজনে।

অসহায়া ভগিনীর দিকে তাকাইয়া এই ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। বাধ্য হইয়া বিবাহে তিনি মত দিলেন।

বারাসতের নিকটে মহেশ্বরপুর গ্রাম। এই গ্রামের পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, নিত্যকালী দেবী, তারকের বধূরূপে ঘোষাল গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তারকনাথ একটি নূতন কর্ম্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

তখনকার দিনে আদর্শবাদী তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্রের খুব প্রতিপত্তি। তারকনাথ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় মাঝে যোগদান করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের অদম্য পিপাসা

সেখানে মিটিতেছে কই? সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তখন তাঁহার জীবন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক একদিন গভীর রাতে উঠিয়া কাঁদিতেন, আর প্রার্থনা করিতেন, "হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দাও, আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও। কি করলে এই জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, কৃপা ক'রে তাই শিখিয়ে আমায় দাও।"

১৮৮০ সালের মধ্যভাগ। একদিন কয়েকটি ভক্ত নিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ঘরে বাহিরে দর্শনার্থী জনতার ভীড়। এইদিন তারকনাথও সকলের সাথে ঠাকুরকে দর্শন করিলেন।

আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে পরমহংসদেব হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া কি যেন তিনি বলিতে চান। কখনো অস্ফুট কখনো বা আধ-আধ কথা। খানিক বাদে মন নিম্নভূমিতে অবতরণ করিল। তখনও সেই পরম অনুভূতির রেশ টানিয়া সমাধির প্রসঙ্গে ঠাকুর নানা তত্ত্বকথা কহিতেছেন।

একি দেবদুর্লভ ভাবাবেশ! একি আনন্দঘন রূপ! তারকনাথের হৃদয়ে এ দিনের স্মৃতি চিরতরে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

এই সঙ্গে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন, এই সমাধিবান্ মহাপুরুষই তাঁহার সংত্রাতা, ইঁহার কৃপালাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু।

সেদিনকার এই দর্শন তারকের জীবনে আনিয়া দেয় ঈশ্বরপ্রাপ্তির তীব্র ব্যাকুলতা। আবার কবে এই দিব্য পুরুষের সন্নিধানে যাইবেন, তাহাই হয় তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান।

ইহার পর এক বন্ধুর সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। তারকের মনে কি ভাব জাগিল কে জানে? বালকের মত ঠাকুরের কোলে মাথা ঠেকাইয়া বার বার তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। ঠাকুর যেন এক করুণাঘন পরমাশ্রয়। মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ ও মাধুর্য্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে তাঁহার দিব্য মূর্ত্তি হইতে।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। ভবতারিণীর মন্দিরে কাঁসর শঙ্খ অবিরত বাজিয়া চলিয়াছে। আর ঠাকুর বসিয়া আছেন

অবস্থায়।· আরতি থামিলে তারককে প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি সাকার মান—না নিরাকার?"

"আমার ভাল লাগে নিরাকার।" নিজের প্রবণতা ও ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তাধারাকে মিলাইয়াই একথাটি তিনি বলিলেন।

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা গেল, "শক্তি মানতে হয়।"

ইহার পর পরমহংসদেব ভাবোন্মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজে ও কেশবচন্দ্রের সভায় ঘোরাফেরা করিয়া তারক নিরাকার ঈশ্বরের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তাই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ভাবিলেন, কালী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিবেন কিনা।

কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় এই দ্বিধা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। বুঝিলেন যিনি বিভু, ভূমা—প্রস্তর মূর্ত্তিতে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবা কেন? সাকার নিরাকার, খণ্ড ও অখণ্ড, দুই-ই যে তিনি।

মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন, "আবার এসো।"

দিব্যভাবে সদা আবিষ্ট এই মহাপুরুষের প্রেম-মধুর মূর্ত্তির আকর্ষণ যে অমোঘ! পরদিনই সন্ধ্যায় তারক আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ করিলেন। সযত্নে তাঁহাকে দেবীর প্রসাদ খাওয়াইয়া বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়া দিলেন।

কোন ভক্তই দক্ষিণেশ্বরে সেদিন উপস্থিত নাই। ঠাকুরের নিবিড় সান্নিধ্য ও দিব্য স্পর্শ লাভের পর তারকনাথের হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ বহিতেছে। শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিতেছে না। মধ্যরাত্রিতে দেখিলেন, ভাবোন্মত্ত ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া পায়চারী করিতেছেন, আর উচ্চারণ করিতেছেন কি সব দুর্ব্বোধ্য বাণী।

ইহার পর বারান্দায় আসিয়া তারককে ডাকিতে লাগিলেন, "ওগো ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটু রামনাম শোনাও তো!"

শশব্যস্তে উঠিয়া তারক ঠাকুরকে বহুক্ষণ রামনাম শুনাইয়া শান্ত করিলেন। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-আবেগের মধ্য দিয়া তারকের সেই রাতটি অতিবাহিত হইল।

বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর কহিলেন, "আবার এসো—একলা।"

একলাই তারকনাথ আবার একদিন ছুটিয়া আসিলেন। এই দিনকার অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন—"তিনি হঠাৎ তাঁহার পা আমার বুকে দিলেন। সে দিব্য স্পর্শে আমায় বাহ্যিক সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা জানিনে, কিন্তু পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন, 'মা, নেমে এস, নেমে এস।' ঐরকম অবস্থায় অপরের বেলায়ও তাঁকে এরকম করতে দেখেছি।"

তারক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু এতদিন ঠাকুর তাঁহার কোন পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেন কতদিনের পরমাত্মীয়কে আবার কাছে পাইয়াছেন, এই রকম ভাব। এইবার হঠাৎ তারকের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর শুনিয়া তিনি মহাখুসী। বলিলেন, "বটে। তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ীর খবর নেবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাবাকে যে খুব জানি। তিনি রাণী রাসমণির বাড়ীর মোক্তার। ভারি সাধক লোক। এখানে এসে গঙ্গাস্নান ক'রে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে আসতেন। তখন মনে হত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ—বুকটা যেন সর্ব্বদা লাল হয়েই থাকত। মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত; সে পেছনে বসে নানা দেহতত্ত্ব ও শ্যামা বিষয়ক গান গাইত, আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন—অবিরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ লাল হয়ে যেত—তাঁর সামনে আসতে লোকের ভয় হত।

"আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ—অসহ্য জ্বালা সর্ব্বাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বল্লাম, 'হ্যাগো, তুমি তো মাকে ডাক, আমিও মাকে ডাকি—একটু ধ্যানও হয়। কিন্তু আমার যে এত গা জ্বালা করে, এর মানে কি বলতে পার? ছাখো, আমার এমনি গাত্রদাহ যে

লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনও কখনও বড় অসহ্য হয়।' তখন তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য। এই কবচ ধারণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাঁকে একবার আসতে বলিস্ তো ?" [১]

তারকের পিতা লোকের কাছে শুনিলেন, পুত্র দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, এ সংবাদে তিনি বেশ আনন্দিতই হইলেন।

তারক ক্রমে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে মনের গোপন কথা, দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথা খুলিয়া বলেন। সেদিন কহিলেন, "দেখুন, বিয়ে ক'রে ফেলেছি বাধ্য হয়ে। ঘরে স্ত্রী রয়েছে। মনে ভয় হয়, আমার সংযমের বাঁধ যদি ভেঙে যায়, ঈশ্বর দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, যা নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি, তা ব্যর্থ না হয়ে যায়।"

আশ্রিত শিষ্যকে ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি রে ? আমি আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশুনা করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য্য ধর্। মা সব ঠিক ক'রে দেবেন।"

এ সম্পর্কে উত্তরকালে স্বামী শিবানন্দ কথা প্রসঙ্গে মঠের ভক্তদের বলিয়াছেন, "ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়াত করতুম তখন আবার মাঝে মাঝে বাড়ীও দেখতে হত। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল কিনা আগে। আমার কিন্তু আদৌ ভাল লাগত না; কোনরকমে নাক কান বুজে ভগবানের নাম ক'রে রাতটা কাটিয়ে দিতুম। স্ত্রী অনেক কান্নাকাটি করত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে, আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালুম। ঠাকুর সব শুনে, আমায় একটা ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন—'ভয় কি ? আমি তো রয়েছি। আমায় খুব স্মরণ করবি, আর এই ক্রিয়া করবি, তোর কিছুই হবে না। যা, স্ত্রীর সঙ্গে এক

ঘরে থাকলেও তোর কোন ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর বৈরাগ্য এতে আরও তীব্র হবে।" ১

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্ব্বাদ ফলপ্রসূ হয় সাধক তারকনাথের জীবনে। স্ত্রী তাঁহার পরমা ভক্তিমতী। সাত্ত্বিক ও শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। স্বামী তারকনাথের কাছে তাঁহার সাধনা ও সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনিয়া, তাঁহার মন আরো পরিবর্ত্তিত হয়। স্বামীর সাধন জীবনের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা তিনি করিতে থাকেন।

তারকনাথের সাধ্বী পত্নী বেশীদিন বাঁচিয়া থাকেন নাই। অল্প-কালের ব্যবধানে, রোগে ভুগিয়া, ইহধাম তিনি ত্যাগ করেন। তারকের সংসার বন্ধন এবার ছিন্ন হইয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিয়া, একনিষ্ঠভাবে নিজের সঙ্কল্প সাধনে তিনি ব্রতী হইয়া পড়েন।

ধনী সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবক তারক। ঠাকুর প্রথমেই তাহার অভি-মানের কাঁটা উৎপাটন করিতে শুরু করেন। সাধনায় ব্রতী হইতে হইলে অনেক কিছু ভাঙচুর আগে করিয়া নিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আগেই এদিকে মনোযোগ দিলেন, মাঝে মাঝে তারককে পাঠাইতে লাগিলেন ভিক্ষা সংগ্রহে। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে ভিক্ষা নিয়া তারক যখন ফিরিতেন, ঠাকুরের আনন্দের অবধি থাকিত না। দিন ও রাত্রির সর্ব্ব কর্ম্মে, শয়নে ভোজনে ঠাকুরের সতর্ক প্রহরা তরুণ সাধককে রক্ষা কবচের মত ঘিরিয়া থাকিত।

গুরু শিষ্যের এ সময়কার মধুর সম্বন্ধটির স্বরূপ স্বামী শিবানন্দের মুখে উত্তরকালে শোনা যাইত—"আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব ছিল তাতে ঐশ্বর্য্যের ভাব একটুও ছিল না। আমরা আমাদের কথা বলছি—ঠাকুরকে সেভাবে দেখিনি। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন। কেউ অবতার, কেউ ভগবান, এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন। ওতে আপন বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়।...কি ভাগ্যবান্ আমরা—পান

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

সেজে তামাক সেজে খাইয়েছি, তাঁর সেবা করেছি—আদর ভালবাসা কত পেয়েছি।”

এমনি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া সুদক্ষ কাণ্ডারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আশ্রিতদের অধ্যাত্ম-জীবনের পরপারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তখন ভক্ত তারকনাথের অন্তর-সত্তায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইয়া দিতেছে। মুমুক্ষু জীবনের চারিপাশের আকর্ষণ ও বন্ধন যেন কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে অপসৃয়মান। ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শনের একি পরম বিস্ময়কর ফলশ্রুতি! তারকের অন্তর্জীবনের তুষারাবরণ যেন অধ্যাত্ম-সূর্য্যের কিরণ সম্পাতে আজ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

ঠাকুরের সহজ ভালবাসা ও কল্যাণেচ্ছার প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই ভালবাসার শক্তি কাজ করিত প্রচ্ছন্নভাবে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে শিবানন্দ স্বামী বলিয়াছেন :

“ঠাকুরের কাছে হয়তো দু এক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব দিন তেমন কথাবার্ত্তাও হত না, কিন্তু ফল বহুদিন পর্য্যন্ত থাকতো। কেমন যেন একটা নেশার মত হয়ে যেত—সর্ব্বক্ষণই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম……তাঁর কৃপা-কটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। তিনি স্পর্শমাত্রেই ভগবৎ-দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন।”

সুদক্ষ অধ্যাত্ম-শিল্পী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; নিজ ভক্তদের রূপান্তর তিনি সাধন করিয়াছেন অসামান্য ধৈর্য্য ও সতর্কতা নিয়া। দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া এই সাধকদের জীবন অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়াছে। তারপর ঠাকুর তাঁহার দিব্য করস্পর্শে থরে থরে ইহাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কুসুমরাজি।

তারকের মনে পড়ে, দুই তিনবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি তাঁহাকে মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে নিয়া যান, তারকের জিহ্বায় নিজের আঙুল দিয়া কি যেন এক মন্ত্র লিখিয়া দেন। অদ্ভুত

তাহার প্রতিক্রিয়া। তারকনাথের চেতনার কেন্দ্রটি যেন এক মুহূর্ত্তে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। পার্থিব জগতের অস্তিত্ব তখন তাঁহার চৈতন্য হইতে বিলুপ্ত। জড় সমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ইহার পরও তিনি আরও দুইবার চৈতন্য-বিলুপ্তির এই অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর প্রিয় শিষ্যের প্রস্তুতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন। তারপর উপযুক্ত সময়ে ঢালিয়া দিতেন কৃপাবারি।

তরুণ সাধক তারকের মন কয়েকদিন যাবৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনের পিপাসা হইয়াছে দুর্নিবার। একদিন তিনি নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বকুল তলায় বসিয়া খুব কাঁদিতেছেন। এদিকে ঠাকুর নিজের কক্ষে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথায় ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি তারকের জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। "তারক কই গো, তারক কই গো?" বলিয়া সবার কাছে খোঁজ নিতেছেন। তারকনাথ উপস্থিত হইলে পরম কারুণিক ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বোস্ বোস্, ছাখ্ ভগবানের কাছে খুব কাঁদবি, প্রাণভরে কাঁদবি। কাঁদলে তার ভারী দয়া হয়।" ভক্ত জীবনে তখন তীব্র আকুতি, ক্রন্দন ও পরিশুদ্ধির পালা চলিতেছে—অন্তর্য্যামী ঠাকুর এ সংবাদটি জানিতেন।

আর একদিনের কথা। নিভৃতে পঞ্চবটিতে বসিয়া তারকনাথ ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান খুব গাঢ় হইয়াছে, সদ্‌গুরুর অন্তর্লোকেও পৌঁছিয়াছে তাঁহার আকর্ষণ। পরমহংসদেব ত্বরিৎ-পদে এ সময়ে ধ্যানাবিষ্ট তারকনাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হুহু ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভেতর গুর্ গুর্ ক'রে উঠল, আর এমন কাঁপুনি যে, থামে না। ঠাকুর আর একজনকে ডেকে বললেন, 'ওরে এ কান্না কি অমনি হয়? ওর একটা ভাব এসেছে, ওকে নিয়ে আয়।' আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া ঠাকুর অতঃপর তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরম ত্যাগী সাধক, অপাপবিদ্ধ মহান্ পুরুষ। তাঁহারই জীবনাদর্শে তারকনাথ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া

নিতেছিলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া, জীবনের পশ্চাৎপটখানি একেবারে মুছিয়া দিয়া, ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়া বসিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

কিছুদিন রোগভোগের পর পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এবার তারকের সংসার জীবনের এক বড় বন্ধন খসিয়া গেল। স্থির করিলেন, গৃহে গিয়া পিতার নিকট গ্রহণ করিবেন শেষ বিদায়। তারপর সদ্‌গুরুর চরণতলে বসিয়া শুরু করিবেন ঈশ্বর লাভের কঠোর তপস্যা।

শক্তি-সাধক রামকানাই ঘোষাল সেদিন পুত্রের সমক্ষে শক্তিমানের মতই আচরণ করিলেন। তারককে আশীর্ব্বাদ করিয়া সজল চক্ষে বলিলেন, "আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি। সংসার এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। বাবা, প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভগবান্ লাভ হোক।" সংসার ত্যাগের প্রাক্কালে পিতার নিকট হইতে এমন আশীর্ব্বাদ কোন্ সন্তানের ভাগ্যে মিলে?

দক্ষিণেশ্বরে ও রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়াতে থাকিয়া তারকনাথ কিছুদিন একান্তে সাধন ভজন করেন। অতঃপর কাঁকুড়গাছির বাগানের নির্জ্জন পরিবেশে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন। এই অঞ্চল তখন জঙ্গলে পূর্ণ—সাপ, ব্যাঙ ও মশার রাজত্ব সেখানে। শিবানন্দ তখনকার জীবনসম্বন্ধে বলিতেন, "বেশ থাকতাম খুব নিরিবিলিতে। ...একটি আমগাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে সেইখানেই পড়ে থাকতাম। ধ্যান, জপ, বিশ্রাম সবই ওখানে। সাপগুলি ধুনির আগুন দেখে আস্‌তে আস্‌তে আবার চলে যেত। আমি এক একবার শুধু দেখতাম—তা আমার দিকে আসতো না। দিনে একবার ভিক্ষায় বের হতাম, যা জুটতো তাই খাওয়া যেত—বেশ লাগত।"

কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছ্রব্রতের ফলে তারকের দেহ তখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন দুটি সদা অন্তর্ম্মুখীন, অন্তরের অন্তস্তলে কোন্ পরশমণি যেন তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সারে ভুগিতেছেন। এই সময়ে রোগশয্যায়

থাকাকালীনই তিনি শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার কৃপার ধারা শেষবারের মত ঢালিয়া দিয়া যান। ত্যাগব্রতী রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূচনা দেখা দেয়, আর শেষ শয্যায় শায়িত গুরুকে কেন্দ্র করিয়া গুরুভাইদের মধ্যে রচিত হয় এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র।

চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরে আনয়ন করিলে ভক্ত 'তারক ও তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিনরাত পালা করিয়া গুরুর সেবা, আর অবসর সময়ে তীব্র সাধন-ভজন, ইহাই ছিল তখন তরুণ সাধকদের নিত্যকার কাজ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসময়ে একটা সহজ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ত্যাগী শিষ্যদের দান করেন প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাস। বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি ?—এখানেই সব রয়েছে। এই ছোক্‌রাদের খাওয়ালেই সব হবে।"

তাঁহার ইঙ্গিতে গেরুয়া বস্ত্র ও মালাচন্দন তখনি আনা হইল এবং তাঁহার প্রিয় একাদশটি ত্যাগী ভক্তকে নিজ হস্তে তিনি এসব দান করিলেন।

ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রদত্ত মালাচন্দন ও গেরুয়া বসন তারকের সন্ন্যাসকামী জীবনের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরে অমৃতময় জীবনের এক নূতনতর ইঙ্গিত।

কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে, ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে শোক আর নৈরাশ্যের ছায়া। এসময়ে তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আগাইয়া আসেন তাঁহার অসামান্য নেতৃত্ব শক্তি নিয়া। বরানগর মঠে তাঁহারই উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে ত্যাগী ভক্তেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ঠাকুরের আদর্শ ও বাণী প্রচারে তাহারা উদ্বুদ্ধ হয়। ঠাকুরের প্রদত্ত পরোক্ষ সন্ন্যাসব্রতকে নরেন্দ্রনাথ এইবার দিলেন আনুষ্ঠানিক রূপ। নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি ঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস নিলেন। তারকের নব নামকরণ হইল স্বামী শিবানন্দ।

বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম-প্রস্তুতি এবার গড়িয়া উঠিতে থাকে। চরম দারিদ্র্য, সামাজিক লাঞ্ছনা ও মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তরুণ সাধকেরা নিজেদের আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন।

সঙ্গীদের সাথে তারকও এ সময়ে ধ্যানানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। অন্তরে তাঁহার সদাই জাগিতেছে নির্গুণ রূপাতীতের ধ্যানাকাঙ্ক্ষা। এইবার বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরালে থাকিয়া শিবানন্দেব অধ্যাত্ম-স্রোতকে বদলাইয়া দিলেন। ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। সারতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া কহিলেন, "ওরে, গুরুই সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।"

নির্গুণ ধ্যানের পরিবর্ত্তে শিবানন্দ মত্ত হইলেন শ্রীগুরুর ধ্যানে, গুরুকে গ্রহণ করিলেন ইষ্টদেব রূপে।

পরবর্তী কালে তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার পরতে পরতে স্ফুরিত হয় এই সদ্‌গুরু-ভাবনা, জীবন তাঁহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে।

বরানগরের মঠ-জীবনে শিবানন্দের কঠোর তপস্যা ছিল গুরু-ভ্রাতাদের শ্রদ্ধার বস্তু। রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন। তাঁহার ত্যাগসর্ব্বস্ব জীবন উত্তরকালে উদ্বুদ্ধ করে হাজার হাজার ভক্ত নরনারীকে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও মঠ-জীবনের উজ্জীবনেও তাহা বিস্তার করে পর্য্যাপ্ত প্রভাব।

বরানগরের তরুণ সাধকদের মধ্যে তখন তপস্যার বান ডাকিয়াছে। ঈশ্বর দর্শনের আকুলতা হইয়া উঠিয়াছে তুর্নিবার। জপ ধ্যানেই বেশী সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়।

একদিন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পণ করিয়া বসিয়াছেন, জপ-সাধন ভঙ্গ করিয়া কোনমতেই তিনি আহারে বসিবেন না। এদিকে গুরু ভ্রাতারাও তাঁহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতে রাজী নন। অবশেষে ত্রিগুণাতীতানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "তারকদা যদি আমায় স্পর্শ ক'রে থাকেন, তা'হলে তা জপের সমান কাজ করবে। সেই অবসরে আমি তুটি খেয়ে নেব।"

তারকনাথকে তখন বাধ্য হইয়া এ কাজ করিতে হয়। এ ঘটনাটি

হইতে বুঝা যায়, ধ্যানী তারকনাথ গুরুভাইদের দৃষ্টিতে এ সময়ে কতটা আস্থা ও সম্ভ্রমের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারকের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিটি গড়িয়া দিয়াছিলেন সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে এই ভিত্তিকে তাঁরক দৃঢ় করিয়া তোলেন নিজের একনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় তপস্যা দ্বারা।

বিশেষ করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে তপস্যার ধুনি তারক ও তাঁহার ত্যাগী গুরুভাইরা প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহা আনিয়া দেয় পরমা সিদ্ধি। এ সম্পর্কে মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

"যদিও তারকনাথ এবং অপর সকলে পরমহংস মশায়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে। তাঁহাদের প্রকৃত সাধক জীবন কাশীপুর বাগান হইতেই শুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে কয়েকটি অন্তরঙ্গ যুবকবৃন্দ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কঠোর তপস্যা পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান্ হইয়াছিল। ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া জপ ধ্যান, কখনও বা কীর্ত্তন করা, কখনও বা সৎচর্চ্চা, সৎপ্রসঙ্গ করা, কখনও বা হলঘরটিতে বসিয়া জপ করা, ধ্যান করা ইত্যাদি। দিবারাত্রি তাঁহারা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, কঠোর দুরূহ তপস্যা অর্থাৎ প্রাণস্পর্শী তপস্যা এই সময় হইতেই চলিতে লাগিল।"

ইহার পর শুরু হয় বরানগর মঠে এই ত্যাগব্রতী তরুণ তাপসদের সাধনা। একদিকে চরম দারিদ্র্য এবং কৃচ্ছ্রব্রত, আর একদিকে ভগবৎ-দর্শনের জন্য প্রাণপাত তপস্যা—এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তারক প্রভৃতি সাধকদের অন্তর্লোক ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় চেতনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে।

এ সময়ে কয়েকমাস এমন আকাশবৃত্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন, যাহার তুলনা সচরাচর মিলে না। পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শেষে আসিয়া ঠেকিয়াছে একটিতে। কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিয়া

সবাই মঠে বাস করিতেন এবং ধ্যানভজন করিতেন। কাহারো বাহিরে যাইবার দরকার হইলে, একটি বস্ত্রই ছিল সম্বল।

সকলেই তাঁহারা মোটামুটি সচ্ছল ঘরের ছেলে। কিন্তু বৈরাগ্যময় জীবন অবলম্বন করার ফলে আহার্য্য জুটিত শুধু নুনভাত। একদিন কিছুই জুটিল না, অগত্যা সবাই কীর্ত্তন-আনন্দে কাটাইয়া দিলেন।

"বরানগর মঠ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের দিন ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ কাহারও কোন বস্তু গ্রহণ করিত না। সাধনা আর তপস্যা, একমাত্র মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্যার বিঘ্ন হয়, এইজন্য সাধ্যমত কেহ কাহারও কোন দান গ্রহণ করিত না। একদিকে আহারের কষ্ট, অপর দিকে কঠোর তপস্যা, এইরূপ কঠোর তপস্যা করায় হৃদয়ে সিংহবিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদক্ষেপে বোধ হইত যেন মেদিনীকে কম্পিত করিয়া এই কয়টি যুবক জগতে বিচরণ করিবে। তাহারা জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্তু বা জগতের আকর্ষণী শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল। কি করিলে ব্রহ্মলাভ হয়, জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি বিকাশ করা যায়—এইটাই তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা যাইল যে, এই কয়টি যুবক গম্ভীর নিস্তব্ধ পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎকে বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল। বরানগর মঠে ইহাদের জীবনের প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জাগ্রত ছিল, প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে পরে তাহা দেখাইয়াছেন।"

স্বামী শিবানন্দের পুণ্যস্মৃতি অনুধ্যান করিতে গিয়া মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :

তারকদা সকালে রামতনু বোসের গলির বাড়ীতে আসিলেন। গায়ে ধূলো কাদাতে মোটা সরের মতন একটা নেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উড়ি খুড়ি চুল, আর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি।

আমি বল্লুম, 'তারকদা, চল তোমায় নাইয়ে দি।' সেই সময় দিল্লী থেকে একজন গা মাজবার গোঁজ বা বগলী, যাকে খিস্‌সে বলে—সেইটে এনেছিল। আমি তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে

নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদার গা ঘস্‌তে লাগলুম। গা ঘসতে ঘসতে কাদাটে কাদাটে জল বেরুতে লাগল। এইরূপ অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা, মুখ ঘসার পর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো।

আমি বললুম 'তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন?' তারকদা বললেন, 'সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটা ডুব দিয়ে আসি। গাও ঘসিনি, গাও পুঁছিনি। যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। সেইজন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে।'

তারপর তিনি বললেন, 'ওহে একটু গুল দাও দিকিনি? দাঁতটা মাজি। অনেকদিন দাঁত মাজতে ভুলে গেছি।'

আমি তখন একটু গুল গুঁড়িয়ে এনে দিলুম। তখন তারকদার জোয়ান বয়স, রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গা ঘসে দেবার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে হল, কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছ্‌ল। তারপর কাপড়-চোপড় রোদে শুকুতে দিলুম।

তারকদা ঘরের ভিতর গিয়ে একটু শুলেন। দেখি না, পায়ের গোড়ালীগুলো একেবারে ফেটে গেছে। আমি নারকেল তেল এনে সেই ফাটাগুলোর ভিতর দিতে লাগলুম। তারকদা একটু হেসে বললেন, 'ওহে, তুমি একদিন দিয়ে আর কি করবে? আমায় সর্ব্বদাই এ রকম অবস্থায় থাকতে হয়। পা-টা ফেটে গেছে এতে আর কি ক্ষতি হয়েছে? যাহা হোক, তারকদা আহারাদি ক'রে চলে গেলেন। এই সময়ে তিনি সাধন-ভজনে বিভোর থাক্‌তেন, দেহের দিকে কিছুই মন ছিল না।

বরানগর মঠবাড়ীটা আসলে ছিল একটা জঙ্গলাকীর্ণ, অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাগান বাড়ী। তারক প্রভৃতি তরুণ রামকৃষ্ণ-ভক্তেরা এখানে বাস করার সময় যে সব কাণ্ড করিতেন, মহেন্দ্রনাথ তাহার চিত্র দিয়াছেন:

"মঠবাড়ীর আশে পাশে অনেক পোড়ো জমি ছিল। কেলোমালী একটা উড়ে মালী। সে কিছু ক্ষেত করেছিল। সেই ক্ষেতে বড় বড় পাঁড় শসা হ'ত। মধুর বালকস্বভাব তারকদা এক একদিন চটে উঠতেন—'হুরতেরি ছাই। এমন তুখ্‌ চেটে খাওয়া আর খাওয়া

যায় না।' এই বলে তিনি হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কেলো মালীর ক্ষেতে যেতেন এবং দু-চারটা পাঁড় শসা তুলে আনতেন।

কেলো মালী সেই সময় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকত, সুমুখে আসত না। তার পরদিন, কেলোমালী এসে ন্যাকামি করে কান্না সুরু করত। সে বলত, আমি গরীব মানুষ, আমার শসা নিলেন? আমি এখন কি করব।' সেটা কিন্তু মৌখিক ছিল। তারকদা কখনও কখনও দু-চারখানি রুটি দিতেন। কখনও বা কোন ভক্ত এলে তাঁকে বলে কেলো মালীকে একটা টাকা বা একখানা কাপড় দেওয়াতেন। এই শসা তুলবার সময় কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন। সে একটা হাসি তামাসা আমোদের জিনিস ছিল।

দু'চারটা শসা এনে তারকদার কি আহ্লাদ। কি হাসি। যেন কত দিগ্বিজয় হ'ল। তিনি ঘাড় নেড়ে নেড়ে মুখ নেড়ে নেড়ে, ডান হাতের তর্জ্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাসি তামাসা করতেন, তাতে সকলেই বড় আনন্দিত হ'তেন। সে চিত্র এখনও আমার সুমুখে রয়েছে। যা হোক সেই কেলো মালীর শসা একটু নুন ঝাল দিয়ে তরকারী হত।"

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহব্যথা এক একদিন শিষ্যদের মুহ্যমান করিয়া ফেলে। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলের মধ্য দিয়া করেন তাঁহারা স্মৃতি তর্পণ। বিরহের মধ্য দিয়াই ভাবময় রামকৃষ্ণ-সত্তায় চলে তাঁহাদের আত্মিক অবগাহন। প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ তারকনাথের এমনি এক বিরহখিন্ন দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়ঃ "আমি বরানগর মঠে গেলুম। মেঘলা করেছে। ঝিম ঝিম বৃষ্টি হচ্ছিল। বড় ম্যালেরিয়া হওয়ায় সকলেই বাইরে পালিয়েছে। শশী মহারাজ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-আরতির উদ্যোগ করিতেছেন। বড় ঘরটাতে তারকদা ও শরৎ মহারাজ আছেন। তারকদা দক্ষিণদিকের দেওয়ালেতে পিছন করে বাঁ দিকের হাতে মাথা রেখে বেঁকে শুয়ে আছেন। শরৎ মহারাজ একটু দূরে আধশোয়া হয়ে, হাতে মাথা রেখে, শুয়ে রয়েছেন। আমি কাছে গিয়ে বসলুম।

বৃষ্টির জল পড়ায় বাগানের আম পাতা থেকে টোপ টোপ জল

গড়াচ্ছে, বাড়ী নিস্তব্ধ। দু'জনের মুখ ভাবে বিভোর ও বিষাদে পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। খানিকক্ষণ পরে তারকদা বললেন, 'শরৎ, বাঁয়াটা পাড়ো তো, ঠেকা দাও তো।' তারকদা উঠে বসে গাইতে লাগলেন—

হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথ পড়ল, সহি! মালতী মালা;
নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস,
সুখ গেল প্রিয় সাথে, দুঃখ মোহি পাশ।"

তারকদা প্রাণের আবেগে এ বিরহগীত এমন সুন্দর গাইতে লাগলেন যে আমার পর্য্যন্ত মন দ্রব হয়ে গেল। আর তারকদার ও শরৎ মহারাজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল—'নয়ন জলে বয়ান ভাসে।'

হৃদয় বিদারক বিরহ যে কি জিনিস এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যে অতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহা যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সঙ্গীত প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে নাদ ব্রহ্ম—যা হৃদয় হতে উদ্ভূত হয়ে কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ হয়েছিল। সেই গাওয়া ও শুনায় আমরা তিনজনেই স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অন্তরে যেন বিরহভাবের তরঙ্গ চলতে লাগল। পক্ষান্তরে ইহা তারকদা ও শরৎ মহারাজের সাধক জীবনের অন্যতম রূপ; কারণ তাঁহাদের প্রাণও তখন ভগবান্ লাভের জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। এইজন্য নিজেদের হৃদ্‌গতভাবে তাঁরা নিজেরাই সুর করে ভজন গাইছিলেন।

শেষ সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বললাম, 'বরাহনগর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে আছে?'

শরৎ মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন সেটা খুব মনে আছে, প্রাণে বড্ড ধাক্কা লেগেছিল।'

কয়েক মাসের মধ্যেই বরানগরের চরম দারিদ্র্য বরণের পালা

শেষ হইল। গৃহী ভক্তেরা এই ত্যাগী সাধকদের মঠে কিছু কিছু সাহায্য দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের পূজা ভোগ ও সন্ন্যাসী আশ্রমিক-দের অশন বসনের কিছুটা সুরাহা হইল।

তারকনাথ ছিলেন স্বভাবতঃই ধ্যানী, গুরুর দেওয়া সাধন নির্দ্দেশের মধ্য দিয়া নিজের তপস্যা তিনি চালাইয়া যাইতে থাকেন পরম নিষ্ঠাভরে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "প্রথম হইতেই একটা ভাব তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হইত। একদিকে যেমন তিনি নির্লিপ্ত ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, কোন বস্তুতে যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা ছিল না, অপরদিকে তাঁহার অতিশয় উদার ভাব ছিল অর্থাৎ কোন গণ্ডী বা সীমাব ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না। এই সময় তাঁর মুখে প্রায় এই কথাটা থাকিত—'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'। এত বিধি নিয়ম পূজা—এসব তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁর ধাতস্থ এসব নয়। 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ভাবটাই তাঁর খুব প্রবল ছিল। অপর যা' কিছু তিনি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁর প্রাণের জিনিস নয়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা আরও প্রবলভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল,—যদিও তিনি কোন বিশেষ ভাবের বিরোধী বা পক্ষপাতী ছিলেন না। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবটি-ভবিষ্যতে তাঁর ভিতর ভালবাসা উদ্ভূত করিয়াছিল। এই ভালবাসা হইতেছে আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ নিজের আত্মাকে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে দর্শন করা।"

অতঃপর স্বামী শিবানন্দের জীবনে শুরু হয় পরিব্রাজনের পালা। ভারতের বহু তীর্থ তিনি পরিভ্রমণ করেন, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে তপস্যা করার জন্য মঠ হইতে কয়েকবার নিষ্ক্রান্ত হন।

এসময়কার তিতিক্ষাময় জীবনের নানা কাহিনী তিনি উত্তরকালে ভক্তদের কাছে বর্ণনা করিতেন :

"এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাক্‌তো না। সেই এক কাপড়ই অর্দ্ধেক পরে আর অর্দ্ধেক গাঁতি মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়তো কোন

কুয়োতে স্নান ক'রে, কৌপীন প'রে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে নিতাম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র বৈরাগ্য। শারীরিক আরামের কথা মনেই হোত না। কঠোরতাতেই আনন্দ।"

নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক জীবনের নানা দুঃখ ও দুর্দ্দশায় সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁহার ভরসা স্থল, অন্তরালে থাকিয়া তিনিই তাঁহাকে সতত দিয়েছেন আশা আশ্বাস ও আশ্রয়। শিবানন্দ মহারাজ কহিতেন, "এসময়ে ঠাকুরই সর্ব্বদা সঙ্গে থেকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কখনও অভুক্তও রাখেননি। অবশ্য এমন দিন গিয়েছে যে খুব সামান্যই আহার জুটেছে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। বিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। দুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি। তখনও খাওয়া হয়নি। নিকটে কোন লোকালয় ছিল না। এমন সময় পাশের বেলগাছ থেকে একটা পাকা বেল ধুপ্‌ ক'রে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল। তখন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে সেদিন কাটিয়ে দিলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিলেন। রামকৃষ্ণ শিষ্য-মণ্ডলীতে আনন্দের বান ডাকিল, এবং সারা ভারতেও অপূর্ব্ব প্রাণ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ মঠ তখন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই দৃষ্টিতে এক পরম গৌরবের বস্তু। এই মঠের উৎস-মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অন্যান্য গুরু ভাইদের মত শিবানন্দও এ সময়ে বিবেকানন্দের এই কর্ম্মযজ্ঞের পাশে আসিয়া দাঁড়ান।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ধ্যানী শিবানন্দ মহারাজ এবার আবির্ভূত হন কর্ম্মযোগীরূপে। বেদান্ত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারকল্পে শিবানন্দ এই সময়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। এই সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রতিভাত হইতেন বেদান্তেরই এক জীবন্ত ভাষ্যরূপে। শিবানন্দের বেদান্ত প্রচার সে সময়ে মাদ্রাজ ও কলম্বোতে চাঞ্চল্যের

সৃষ্টি করে। তাঁহার কলম্বো কেন্দ্রের ছাত্রী হরিপ্রিয়া (মিসেস্ পিকেট) তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইয়া পরবর্ত্তীকালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজী-ল্যাণ্ডে বেদান্তের প্রচারে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বারাণসীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন শিবানন্দের অন্যতম অবদান। তিরোধানের কিছু পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের জন্য ভীঙ্গার রাজার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হন। এই টাকা দিয়া বারাণসীতে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তিনি করেন এবং শিবানন্দকেই দেন ইহার দায়িত্বভার।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। শিবানন্দ মহারাজ উপলব্ধি করিলেন, শুধু মৌখিক ভাষণ-দানে তো বেদান্তের তত্ত্ব মানুষের জীবনে প্রতি-ফলিত হইবে না, ভজন-সাধন ও পূর্ণ বেদান্তের অনুকূল জীবনের আদর্শ দেখাইতে হইবে। তবেই সম্ভব হইবে বেদান্তের প্রকৃত বিস্তার সাধন।

অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার বলে একাজ তিনি সম্ভব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিজের ও সহকর্ম্মীদের এই সময়কার তপস্যা ও বৈরাগ্যের আদর্শ কাশীধামে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোড়ার দিকে চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে শিবানন্দকে কাটাইতে হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিটি সদা বিরাজিত থাকিত অটল মহিমায়। নিত্যকার ধূলি ঝঞ্ঝার উর্দ্ধে, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায়, সর্ব্ব সময়ে তিনি অবস্থান করিতেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন:

"কাশীতে যখন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, তখন কাশীবাসী অনেকেই আপত্তি তুললেন—'অদ্বৈত আশ্রম বল্‌ছেন আবার এখানে পূজা হোম ইত্যাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত মতের বিরোধী ভাব।' এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার আপত্তি তুলতে লাগলেন। আমি এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। শেষে জিজ্ঞাসুদের বুঝিয়ে দিলুম যে, নীরস অদ্বৈতবাদ—সেভাব এখানে নয়। এখানে হচ্ছে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত অদ্বৈতভাব। এখানে রসে বশে সারেমাতে বস্তু থাকবে। অধিকারী হিসাবে অদ্বৈতজ্ঞানও থাকবে, ভক্তি পূজা পাঠ ইত্যাদিও থাক্‌বে। একঘেয়ে অদ্বৈতবাদ হ'লে প্রাণটা বড় শুষ্ক হয়ে যায়। ভক্তি প্রাণকে সরস রাখ্‌বার একটা উপায়। আর কর্ম্মও নিতান্ত আবশ্যক—এও এক বড় সাধনা।"

সহজ ভাষায়, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে এমন করিয়া তিনি এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিলেন যে, কাহারো মনে কোন প্রশ্ন রহিল না, বিরূপ ভাব রহিল না। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের বহুকথিত মূল তাত্ত্বিক সূত্রটি—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—সকলের মনে গ্রথিত হইয়া গেল।

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব অর্থাভাব। বাড়ী ভাড়াও অনেক বাকী পড়িয়া গিয়াছে। শিবানন্দ মহারাজ বহু কষ্টে একদিন একশত টাকা যোগাড় করিয়াছেন এবং বাড়ীওয়ালাকে দিবার জন্য তাহা রাখিয়া দিয়াছেন একটি ভাঙ্গা ক্যাসবাক্সে।

আশ্রমের একটি নবাগত যুবক কর্ম্মীর উপর এই সময়ে বাজারের ভার ছিল। লোভে পড়িয়া সে ঐ টাকাটা আত্মসাৎ করিয়া বসে এবং আশ্রম হইতে পলায়ন করে। সব টাকা নিয়া গিয়াও সে কিন্তু ক্যাসবাক্সে একটি পয়সা রাখিয়া যায়। কোনমতে তাহা দিয়াই সেদিন বাতাসা কিনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্ভব হইল।

বহু কষ্টে যোগাড় করা টাকাগুলি তো উধাও হইয়া গেল। এখন বাড়ীভাড়ার টাকা আসিবে কোথা হইতে। এত টাকা আবার কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে বাড়ীওয়ালাটি অতি দুর্দ্দান্ত লোক, বাগে পাইলে সহজে কাহাকেও সে ছাড়ে না। আশ্রমিকেরা প্রমাদ গণিলেন।

বাড়ীওয়ালা শিবানন্দ মহারাজকে ডাকাইয়া নেয় এবং টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাকে নিজের গদীতে আটকাইয়া রাখে। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আপাততঃ মিটমাট হইল, এবং মহাপুরুষজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

বিস্ময়ের বিষয়, যে যুবকটির জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহার উপর

শিবানন্দ স্বামীর এতটুকু রুষ্টভাব নাই। প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলিলেন, "ছেলেটির অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার ধর্ম্মবুদ্ধি কিছুটা ছিল—তাই তো একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল। আর তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া গেল। কাজ তো আটকায় নি!"

শিবানন্দ মহারাজের সেদিনকার এই ক্ষমাসুন্দর রূপ সেদিন মঠের কর্ম্মী ও ভক্তদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক মহিমা ও অপূর্ব্ব মহাপ্রাণতা ছিল বলিয়াই, শুধু বারাণসীর যুবক মহলেই নয়, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহলেও তাঁহার আত্মিক প্রভাব সে সময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিবিড় ধ্যান-তন্ময়তার মধ্য দিয়া তখন মহাপুরুষজীর দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত হইত। যে অতীন্দ্রিয় আনন্দ-আস্বাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনে সম্ভব করিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই নিবিড়ভাবে, নিরন্তর ধারায়, তিনি উপলব্ধি করিতে চাহেন। তাই কোনদিন ইষ্টদর্শন না হইলে, দিব্য অনুভূতির রসে অন্তর অভিষিক্ত না হইলে, দুঃখের তাঁহার সীমা থাকিত না। বালকের মত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া খেদোক্তি করিতেন, "চন্দ্র, দিনটা আজ বৃথায় গেল। আজ তাঁর দর্শন পেলাম না—তাঁর জন্য একটু চোখের জলও বেরুল না।"

ধ্যানী সাধকের অন্তরাত্মায় মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে সর্ব্বপ্লাবী ঈশ্বরীয় চেতনা। কঠোরতপা, ধ্যান-গম্ভীর সাধক উদ্বেল হৃদয়ে বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়ান, আর ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলেন—

তুমি পূর্ণ পরাৎপর ;
তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ! কার সাধ্য
ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই কত
তুমি বাক্য মনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত
তোমারে দেখিতে চায়॥

শিবানন্দের কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, নয়ন দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত। রামকৃষ্ণময় সাধকপ্রবরের এই রসাপ্লুত, প্রেমমধুর মূর্ত্তি যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে চিরতরে।

বারাণসীর আশ্রমে শিবানন্দ মহারাজ সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা-পূত জীবনের এটি এক সুবর্ণময় যুগ। দিনের পর দিন তখন অদ্বৈত আশ্রমে চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ চলিয়াছে। কোন দিন ব্রহ্মচারীদের হয়তো আহার জোটে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় পাশের বাড়ীর বাগান হইতে তাহারা দুই চারিটা পেয়ারা পাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে। এই ত্যাগ তিতিক্ষাময় দিনগুলিতে কিন্তু শিবানন্দ মহারাজের কঠোর তপস্যা বহিয়া চলিয়াছে অবিরাম ধারায়। সংঘাতময় বাস্তব জীবনের বহু উর্দ্ধে, এক অবিচল ধ্যানতন্ময়তায় তিনি আবিষ্ট হইয়া আছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া হাসিয়া বলিতেন, "তারকদা, তোমার ধ্যান কি টাকার যোগাড় করতে পারবে? আশ্রমের জন্য শিগ্‌গীর টাকা সংগ্রহে লেগে পড়ো।" কিন্তু একথা শুনিবার মত মানুষটি তখন যেন হারাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর ক্রমাগত কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের ফলে শিবানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। অতঃপর তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্ব অপর একজনের উপর ন্যস্ত করিয়া বেলুড়ে চলিয়া আসেন।

সে বার ডায়মণ্ড-হারবারের একটি বাগ্দী ছেলে দীক্ষা নিবার জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে ঐ ছেলেটিও পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া গেল। ভোজন শেষে এক রক্ষণশীল ভক্ত জাত বিচারের কথা উঠাইয়া মঠ সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে থাকেন।

জাত বিচারের এই কথা শিবানন্দ মহারাজের কানে গেল। শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ছাখো, এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান্

লাভ, সাধন-ভজন—এই হল এখনকার মূল উদ্দেশ্য। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা ও সাধন ভজন করা, এইটাই হচ্ছে দেখবার জিনিস। বামুন কি কায়েত, কি বাগ্দী, একথার কোন আবশ্যক নেই; কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোন কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন-ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। যে ঠাকুরকে মানবে, সাধন-ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে। জাতাজাতির কথাটা এখানে যেন না হয়।"

সে-বার শীতকালে বড়দিনের সময় বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিশেষ ভোগ দেওয়া হইতেছে। বহু ভক্ত ও অভ্যাগত প্রসাদ পাইবার জন্য আসিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত শিবানন্দের এ সময়কার একটি আচরণ সম্পর্কে লিখিতেছেন:

"দুপুরবেলায় উঠানে সকলে খাইতে বসিয়াছেন, দালান আর উঠানের মাঝখানে যে জমিটা সেখানে সকলে জুতা ছাড়িয়া রাখিয়াছেন। তখনও প্রায় শতাবধি লোক দাঁড়াইয়া আছেন, বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, ঐ জায়গাটার জুতাগুলি সরাইলে ভক্তেরা বসিতে পারেন। সকলেই এই কথা বেশ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন; কেহই উঠিয়া নিজের নিজের জুতা সরাইলেন না—মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন। তারকদা স্বভাব সুলভ বালকভাবে কহিতে লাগিলেন 'ঠিক তো, ঠিক। জুতাগুলি সরালে এদেরও জায়গা হয়।' এই কথা বলিয়া, কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া সেই জুতাগুলি দুইবাহু ও বক্ষের মাঝে ধরিয়া, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। জুতা উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'কি করেন মহাপুরুষ, কি করেন? আমার জুতায় হাত দিবেন না, তিনি বলিলেন, 'ওহে! বস, বস—খাও। এই সামান্যর জন্য এত চঞ্চল হবার দরকার নেই, এটা এখনি ক'রে নিচ্ছি।' এইরূপ তিন চারিবার করিতেই জায়গাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। পরে নিজে একটা ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁট দিলেন। তারপর সকলকে নিজ নিজ আসন আনিয়া বসিতে বলিলেন।

যাঁহারা আহারের জন্য উঠানের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, 'হাঁ, সত্যকার মহাপুরুষ বটে! কোন মান, অভিমান নাই।' এই উপাখ্যানটিতে তাঁহার একটি বিশেষ মনোভাবের চিত্র পাওয়া যায়। যিনি উপস্থিত সকলের গুরু বা গুরুস্থানীয়, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সকলের জুতা দুই বাহু ও বুকের মাঝে রাখিয়া সরাইলেন—কোনই সঙ্কোচ করিলেন না। তিনি আদেশ করিলে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি জুতা সরাইত। কিন্তু তিনি এত বিনয়ী ও অভিমানশূন্য লোক ছিলেন যে এসব বিষয়ে কোন প্রাধান্য বা ইতর বিশেষ ভাব তাঁর একেবারেই মনে আসিত না।[১]

কয়েক বৎসর পরের কথা। শিবানন্দজী আবার বারাণসীতে আসিয়াছেন। এসময়ে প্রায়ই থাকেন তিনি ধ্যানমগ্ন, বাস করেন অপার্থিব আনন্দ রাজ্যে। অদ্বৈত আশ্রমের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার একটি ফটো তুলিবেন। বহু অনুরোধের পর তাঁহাকে সম্মত করানো গেল। আসনে উপবেশন করার পর যুক্তকরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন, সম্মুখে রাখা হইল একটি কমণ্ডলু। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাপুরুষজী ধ্যানতন্ময় হইয়া পড়িলেন। দৃষ্টি ভ্রূনিবদ্ধ, একেবারে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। ছবি তোলার ব্যাপারটি মহাপুরুষের কাছে তখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ এই সঙ্কটের অবসান করিলেন। ধ্যানাবিষ্ট শিবানন্দজীর গায়ে ধাক্কা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "মহাপুরুষজী, প্রকৃতিস্থ হয়ে বসুন, আপনার ফটো তুলবে যে!"

বার বার ডাকাডাকির পর মহাপুরুষজীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিদ্রোত্থিতের মত বলিতে লাগিলেন, "অ্যাঁ...অ্যাঁ কি বলছো?" কোনক্রমে তাড়াতাড়ি করিয়া সেদিনকার ফটো তোলা পর্ব্ব শেষ করা হইল।

শিবানন্দ মহারাজের এই সময়কার জীবন আত্মসমর্পণের সাফল্যে

১ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান: মহেন্দ্রনাথ দত্ত

মহিমোজ্জ্বল—গুরুকৃপার দিব্য রসধারায় তাহা অমৃতময়। তাঁহার সমকালীন এক চিঠিতে ইহার আভাষ মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন, …'তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ। আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার কৃপালাভ। সেও তাঁহারই নিজগুণে! আমার এমন কোন গুণ ছিল না, যদ্দ্বরা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন-- এই মাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

অন্যত্র আবার লিখিতেছেন—"আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস এই মাত্র জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তাঁকে স্মরণ করান তখন স্মরণ করি। যখন পাঠ করান তখন পুস্তকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহারও সহিত ধর্ম্মকথা আলাপ করি—এই আমার কাজ। ভরসা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে আমার কিছুই নাই এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও নাই তাঁহার কৃপায়। আমি এখন প্রভু যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব। নিজের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই ; প্রভু যেরূপ করাইবেন, তাহাই করিব।"

দীর্ঘ অধ্যাত্ম প্রস্তুতির পর শিবানন্দকে সদ্‌গুরু কর্ম্মবৃত্তের মধ্যে টানিয়া আনেন। জীবনের চল্লিশ বৎসর কাটিয়াছে কঠোর প্রব্রজ্যা ও তপশ্চর্য্যায়। এবার তিনি মঠের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই মঠ যে ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই তৈরী! আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রাণকেন্দ্ররূপে এ যে তাঁহারই সুমহান্ সৃষ্টি! প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া ঠাকুর স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছেন, এই মঠ ও মিশনকে স্থাপন করিয়াছেন নূতন অধ্যাত্ম ভাবধারার উৎস রূপে। এই ধৃতিটি শিবানন্দের হৃদয়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

বড়লাট-পত্নী লেডি মিণ্টো সেবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া উঠেন, "স্বামী বিবেকানন্দই তো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। তাই না?" শিবানন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, "না—তা কেন? প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই সঙ্ঘ আমরা

কেউ সৃষ্টি করিনি! ঠাকুরের অসুখের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর সকলকে শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি করে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালনা করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। সেই হল মঠের গোড়াপত্তন।” •

জীবন-প্রভুর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এইবার তিনি নিষ্ঠা সহকারে আঁকড়িয়া ধরিলেন। জপ ধ্যান ও প্রব্রজ্যার শেষে তাঁহার জীবনে শুরু হইল কর্ম্মযোগের নবতম অধ্যায়।

পূর্ব্বের পরিব্রাজক জীবন ও তপস্যার কথা কেহ উল্লেখ করিলে তিনি কহিতেন, “এক সময় এ সব খুব করা গেছে। এখন তো ঠাকুর আমাদের কর্ম্মবৃত্তে টেনে এনেছেন। তাঁর যুগধর্ম্ম প্রচারের জন্য এইরূপই প্রয়োজন হয়েছে। তাই এখন এই বুড়ো বয়সে আমাদের দ্বারাও ঠাকুর তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম যে, তপস্যা ক'রেই জীবন কাটিয়ে দেব…করেছিলামও তাই। কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায়?”

ভক্তজনের জন্য বাবুরাম মহারাজের ছিল প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা—মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হৃদয়যোগ তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর দেখা গেল, বহিরাগত ভক্তের দল ক্রমে ক্রমে মঠের সহিত যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। বাবুরাম মহারাজ নাই, আর কে তাহাদের দরদভরা দৃষ্টি নিয়া দেখিবে? কে আদর-যত্ন করিবে? সাধন-নির্দ্দেশই বা এত উৎসাহ করিয়া কে দিবে? অনেকে মঠে আসা বন্ধও করিয়াছিলেন।

এক রাত্রিতে কিছুসংখ্যক যুবক ভক্ত বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। আরতির পর তাঁহারা নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শিবানন্দজী আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা তোমরা আজকাল আর আগের মত মঠে আসছো না কেন? আগে যেমন মঠে আসতে এখনও তেমনি এসো। জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি।”

এই ধ্যান-গম্ভীর মহাপুরুষের অন্তর্লোকে এমনতর প্রেমের ফল্গু

বহিতেছে একথা জানিয়া যুবক ভক্তদল বিস্মিত হইলেন। ইহার পর হইতে বহু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধক শিবানন্দের স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইতে থাকে। বহুতর প্রাণ-শিখা তাঁহার অধ্যাত্ম-জ্যোতিতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, রামকৃষ্ণ মণ্ডলী ও বেলুড মঠ তাঁহার প্রভু রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় সৃষ্ট। মনে প্রাণে সদাই তিনি আশা করিতেন, এই মণ্ডলী ও মঠ হইবে অধ্যাত্ম-শক্তির এক বিরাট উৎস। তাই নিষ্ঠাভরে নিজের আত্মিক সাধনা ও কর্ম্মসাধনাকে এই মঠের সহিত একান্তভাবে তিনি যুক্ত করিয়া দিলেন। নিজে যেমন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় সদা বিভোর থাকিতেন তেমনি মঠের কর্ম্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিস্তারিত করিতেন সেই চিন্তা ও সাধনার ধারা।

অধ্যাত্ম-আলোচনা প্রসঙ্গে যে কোন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ও ভক্তের চেতনাকে তিনি অবলীলায় উর্দ্ধতর স্তরে নিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও সাধন তত্ত্বের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কোন গৃহস্থ ভক্ত একবার বলিতেছিলেন, "মহারাজ, জীবনে কত পাপ করেছি। আপনি মহাপুরুষ। আমায় কৃপা করুন।"

শিবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা? তুমি কি ঠাকুরের কথা শোননি? ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, পাপ—তুলোর পাহাড়। পাহাড় প্রমাণ তুলো যেমন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই অচিরে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ভগবানের কৃপাকণা লাভে পাহাড়-প্রমাণ পাপও ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কোন ভয় নেই। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম করো। আর কিছু করতে হবে না!"

রাঁচীর ভক্তগণ একবার শিবানন্দ মহারাজকে তাঁহাদের উৎসবে নিয়া গিয়েছেন। এটি ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মতিথি উৎসব। শিবানন্দজী ইষ্টদেবের পূজায় উপবিষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া ঠাকুরের চরণে পুষ্পবিল্বদল দিয়া তখন পূজাকক্ষের বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার দেহ ভাবাবেশ ও দিব্য অনুভূতিতে থর থর

করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন দুটি রক্তবর্ণ। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়েন।

শিবানন্দজী প্রশ্ন করিলেন, "কি চাই?" মহিলা ভক্তটি করজোড়ে কহিলেন, "মুক্তি।"

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "আচ্ছা তা হবে। আমি ঠাকুরকে বলব।" প্রত্যয় ও করুণার দীপ্তিতে তাঁহার আনন-খানি তখন সমুজ্জ্বল।

এই সময়ে এক উপদেশ-প্রার্থী ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিতেছিলেন, "ঠাকুরের নামই তো শুনছি, তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য তো আমাদেব হল না, মহারাজ!"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "সে কি কথা? যাঁরা ভগবানের পুত্রকে দেখেছে, তারা যে ভগবান্‌কেও দেখেছে! আমি আর আমার পিতা যে একই।" এই তেজোদৃপ্ত বাণী শুনিয়া সকলে নির্নিমেষে সম্ভ্রমভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বহুদিন আগের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, রাখাল, তারক প্রভৃতিকে বলিতেছিলেন, "ত্যাখ্, কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।"

তারক বলিয়া উঠিলেন, "আমি কিন্তু ওসব পারবো না।"

ঠাকুর তখন উত্তর দিয়াছিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে। তুই এখন অত ভাবিস্ কেন?"

সেই ঐশী ইচ্ছা এইবার বুঝি রূপায়িত হইতে থাকে। এতদিন শিবানন্দ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। মুমুক্ষু ভক্তেরা কত কাঁদাকাটি করিয়াছে, প্রবীণ গুরুভ্রাতারা বার বার অনুরোধ উপরোধ করিয়াছেন, তিনি সে সব কানে তোলেন নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা পরিভ্রমণের কালে, দীক্ষাদান সম্পর্কে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়, সম্মত হন মুমুক্ষুদের সাহায্য দানে।

ঢাকা শহর ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক ভক্ত স্বামী শিবানন্দের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান দীক্ষার জন্য। শিবানন্দজীর মন এবার নরম হয় এবং কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান

তাঁহার নির্দ্দেশের জন্য। এ নির্দ্দেশ তিনি লাভ করেন, এবং মঠ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আদেশপ্রার্থী হইয়া তিনি এক পত্র লিখেন।

ব্রহ্মানন্দজী উল্লসিত হইয়া উত্তর দেন, "খুব দিন, প্রাণ খুলে দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাঁদের জীবন তো ধন্য হয়ে যাবে।"

শিবানন্দ মহারাজ এই সময়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ঢাকাতে আমি প্রায় দেড়মাস ছিলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার নাম পাইয়াছে। সে সময় ঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভিতরে একটি ভাব আসিয়াছিল।"

মঠের নবীন ব্রহ্মচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া শিবানন্দজী উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন,[১] "খুব ডেকে যাও, খুব তার নাম ক'রে যাও। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পড়ে থাক —যখন যা দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। পবিত্র হৃদয়ে ভগবান্ শীঘ্র প্রকটিত হন, কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার চেষ্টা করো। এখন তো তোমাদের ছাত্র জীবন। ছাত্র জীবন বড়ই পবিত্র। ঠাকুর পবিত্রহৃদয় ও বিষয়-বাসনাহীন ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। যার মনে বিষয়ের দাগ লাগেনি তার শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য হবে। আর দরকার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেমন বললাম, সরল প্রাণে সব বিশ্বাস ক'রে নিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে সাধনায় লেগে যাও। দেখবে তাঁর দয়া হবে - খুব আনন্দ পাবে। আসল কথা কাজ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন—'খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো নেশা হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে—পরিশ্রম ক'রে ঘুঁটতে হবে, সিদ্ধি খেতে হবে—তবেই নেশা হবে।' তেমনি ভগবানের নাম করো, তাঁর ধ্যান করো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো—আন্তরিক ভাবে, তবেই আনন্দ পাবে।"

সে-বার একটি মহিলা ভক্ত মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করেন,

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

বাবা, আমাদের কি ক'রে উদ্ধার হবে? কি ক'রে এ মায়া থেকে মুক্ত হব? আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।"

তিনি এ কথার উত্তরে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ছাখো, আসল কথাটা কি জানো, এ সংসার যে অনিত্য, এ বোধ তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ছাড়া এ-মায়া-জাল কাটাবার অন্য কোন উপায় তো নেই মা! শ্রীভগবান্ নিজেই গীতাতে বলেছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত ক'রে রেখেছে, তা বাস্তবিকই দুস্তরা, এ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু যারা অনন্য মনে আমায় ভজনা করে, তারা এই দৈবী মায়া অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।'

"অনন্য মনে তাঁকে ডাকা ছাড়া আর তো জীবনে কোন উপায় নেই। তোমরা সংসারে রয়েছ, নানা কাজকর্ম্ম আছে। তোমাদের তো সাধনভজন করবার মত সময় নেই। তোমরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক আর কাঁদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা করো, 'প্রভু দয়া করো, দয়া করো।' কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। তখন তিনি সহস্র সূর্য্যপ্রভায় প্রতিভাত হবেন। তখন দেখবে যে তিনি অন্তরেই রয়েছেন। খুব কাঁদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার করবে। একমাত্র ভগবান্ই সত্য, আর সংসার, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ সবই অনিত্য। এইরকম বিচার আর প্রার্থনা করতে করতে তবে তাঁর দয়া হবে; সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের দিকে যাবে।"

সাধারণভাবে মঠের ভক্ত সাধকেরা শিবানন্দ স্বামীর ধ্যান-পরায়ণ, গম্ভীর রূপটির সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবীন ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে গিয়া হাসি-তামাশাও তিনি কম করিতেন না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন:

"হাসি-তামাশার ভিতরেও একটা বিশেষত্ব দেখতুম, যদিও তিনি নানা রকম রঙ্গভঙ্গী ক'রে নিজে হাস্‌চেন বা অপরকে হাসাচ্ছেন, কিন্তু তা হলেও তাঁর মনটা আর একদিকে রয়েছে। মুখে তিনি এক বলছেন—মন কিন্তু আর এক দিকে। উনি সেটা এমনভাবে বলছেন যে তাতেও আর একটা বড় উচ্চভাব রয়েছে। আবার এই রঙ্গভঙ্গী কববার মুহূর্ত্তেক পরেই তিনি গম্ভীর ধ্যানমগ্ন পুরুষ হইয়া যাইতেন; তখন আর পূর্ব্বের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাউনি নাই, মুখের আব সে ভাবও নাই! সহসা এক গম্ভীর ধ্যাননিমগ্ন ব্যক্তির বিকাশ পাইল এবং যাহারা পূর্ব্বে তারকদার চাপল্যের কথা শুনিয়া হাস্য-কৌতুক করিতেছিল তাহারাও তারকদার এই আশ্চর্য্য ভাব পবিবর্ত্তনে স্তম্ভিত ও সংযত হইয়া যাইল।

"আজীবন কাল আমি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগৎ হইতে সব সময় যেন পৃথক বা বিচ্যুত রহিয়াছেন। এইটিই তাঁহার স্বাভাবিক ভাব ছিল। এই জন্যই বোধহয় জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাঁহাকে যতটা উচিত ততটা শ্রদ্ধা করে নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে যখন এই ভাবটি ঘনীভূত হইয়া বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল তখন তাঁহাকে সকলেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল। যাহা হউক তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কোন ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানী ভাবটি তাঁহার প্রিয় ছিল—এই মাত্র। এইজন্য তিনি তাণ্ডবনৃত্যে বা অন্য প্রকার ভাবেতে ততটা মিশিতেন না, দূর হইতে সমস্ত দেখিতেন। তিনি ধ্যানী ছিলেন—কীর্ত্তনী ছিলেন না।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিতেছে কত ভক্ত, কত মুমুক্ষু। ইহাদের দেখিয়া শিবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই। এক সুশিক্ষিত মুসলমান ভক্ত ঠাকুরের নাম নিয়া সাধনা করেন, কৃপাও কিছু পাইয়াছেন। সপরিবারে শিবানন্দ মহারাজের

কাছে আসিয়া, সেদিন তিনি উপস্থিত। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিবানন্দ হর্ষভরে একদিন বলিয়াছিলেন :

'ভক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন, আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে এসেছেন। তাঁর কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম ক'রে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল ভাবে ভজনা করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপর ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা, তাঁর ইষ্টদেবই রামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি। বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম ক'রে বললেন—আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল 'ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা!' তোমায় কে বুঝবে বল? সেই শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের কথা মনে হল—

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥

'—হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাতো আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপই হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।' বাস্তবিক ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ কথাই বলতে হয়। তাঁকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরও অনেক মুসলমান ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাড্‌ডাপায়। খুব মানী লোক, গভর্নমেণ্ট খান খানবাহাদুর খেতাব দিয়েছে। ওঁরা সুফী সম্প্রদায়ের, কিন্তু ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি। ওখানে ঠাকুরের একটি ছোট আশ্রম আছে। ঐ খান বাহাদুর এবং স্থানীয় কালেক্টর—তিনিও মুসলমান—প্রভৃতি পাঁচজনে চেষ্টা ক'রে এ আশ্রমটি করেছিলেন।

আমরা তিন চারদিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে কি বিকেলে, সেই খান বাহাদুর ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে বসে আছেন খুব দীনহীন ভাবে, আর একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ধারণা যে, তাঁদের পয়গম্বর মহম্মদই এবার রামকৃষ্ণ-রূপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন। এমনি ক'রে কত ভাবে যে ঠাকুর কত লোককে কৃপা করেছেন, তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত সাধন-ভজন ও জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিবানন্দ মহারাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "ঠাকুরের কথাতেই তো আছে সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড়মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু সারাটি মন পড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ীর দিকে। তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই সেবাযত্ন করবে; কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানবে যে, তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান্। তিনি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। তা বলে স্ত্রীপুত্রদের অবহেলা করবে না। তাদের ভগবানের প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাশক্তি সেবা করবে। তাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ করবে।

"সংসারে থাকবে; কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে। আর ঠাকুর বলতেন—'বিচার করা খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাতে ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।' খুব বেশী সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান পেতে দিও না। সাধারণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো ক'রে নিয়েছ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে—কামকাঞ্চন ও মানযশের দিকে। সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লীন করতে হবে। জীবনে মানুষের সব

চাইতে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ভগবান্ লাভ। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মনে সর্বক্ষণ ধরে রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌঁছতে পারো তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।”

তরুণ সাধকদের পক্ষে মনকে শান্ত করিয়া গুটাইয়া আনা, ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া একটা বড় সমস্যা। এ সম্পর্কে তাঁহাদের উৎসাহ দিয়া বলিতেন, “এজন্য মোটেই ভেবো না। অশান্ত মনকেও ক্রমে শান্ত করে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করা যেতে পারে। ধ্যান জপ করতে আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান শুরু করো না। প্রথমটায় ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে। ঠাকুর হলেন জীবন্ত সমাধিস্বরূপ, তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ক’রে তাঁকে চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে। বলবে—‘প্রভু, আমার মন স্থির ক’রে দাও।’ এই ভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা ক’রে ঠাকুরের সমাধির কথা ভাব্‌বে। তাঁর যে ছবি দেখছো, এ ছবি খুব উচ্চ সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও। মন হল তোমার, তুমি মন হতে স্বতন্ত্র আত্মস্বরূপ। ধীরভাবে দ্রষ্টার মত বসে মনের গতিবিধি লক্ষ্য ক’রে যাবে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন আপনা হতেই শান্ত হয়ে পড়বে। তখন মনকে ধরে এনে ধ্যানে লাগাবে। যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধরে নিয়ে আসবে। এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে। কিছু দিন ঠিক যেমন ক’রে বল্লুম তেমনি ক’রে যাও দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে। তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য নিয়মিতভাবে এটি ক’রে যেতে হবে।”

“ভগবান্ লাভের ব্যাকুলতা একদিনে আসে না এবং তাঁর কৃপা ছাড়াও হয় না। সেজন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়—আর কেঁদে কেঁদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়—‘প্রভু, দয়া করো, আমি সাধারণ মানুষ। তুমি দয়া ক’রে দর্শন না দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার

দর্শন পাই! কৃপা করো প্রভু। এই দুর্বলকে কৃপা করো'—এভাবে নিত্য প্রার্থনা করবে। যত তাঁর জন্য কাঁদবে তত মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। তোমরা সাধু হয়েছ, তার নাম ক'রে ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ—তাঁর উপর তো তোমাদের দাবা আছে। ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে তাঁর উপর জোর করবে। দয়া করবেন বলেই তো তিনি তোমাদের মা বাপের কোল থেকে টেনে এনেছেন এবং তাঁর আশ্রয়ে তাঁর সঙ্ঘে স্থান দিয়েছেন।

"পড়ে থাক, বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাকো তাঁর দুয়ারে। পওহারী বাবা যেমন স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'গুরুকে দুয়ারমে কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো।' স্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার বলেছিলেন। কুকুর যেমন কখনও প্রভুর বাড়ী ত্যাগ করে না, তাকে খেতে দাও আর নাই দাও, মারো আর যাই করো, সে যেমন কখনও প্রভুর বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না, তেমনি আমাদেরও প্রভুর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে, তাঁর শরণাগত হয়ে, পড়ে থাকতে হবে। ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে হোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তেতো খেয়ে হোক, যো-সো ক'রে যে শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে তার হয়ে যাবে।

"তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে রয়েছ, তাঁর সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ, তোমাদের আর ভাবনা কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বাপ যে ছেলের হাত ধরেছেন, সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না।' তেমনি যতদিন এ সঙ্ঘে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে—ততদিন কোন ভয় নেই, তিনি ঠিক তোমাদের উদ্ধার করবেন—নিশ্চয় জেনো।"

ভগবৎ-দর্শন ও পরম শান্তি লাভ সম্বন্ধে এক তরুণ মুমুক্ষু প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উত্তরে শিবানন্দজী প্রশান্ত স্বরে বলিলেন:

"ছাখো বাবা, শান্তি লাভ করা অত সোজা কথা নয়। এ রাস্তা খুবই কঠিন—খুব কণ্টকাকীর্ণ—

'ক্ষুরস্য-ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥'

—ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ্ণ ও দুরতিক্রমণীয়, তত্ত্বদর্শীরা সেই আত্মসাক্ষাৎকারের পথকে সেইরূপ দুর্গম ব'লে থাকেন। এসব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কথা। এ বড় দুর্গম পথ। বাইরে থেকে যত সোজা বলে মনে হয়, ততটা সোজা নয়--অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে যদি তাঁকে চাওয়া যায়—তবে তাঁর কৃপা হয়, এও সত্যি। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো, তাঁকেই কত কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল। তবে তো মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সবই লোকশিক্ষার জন্য করেছেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। "ভগবানের উপর অনুরাগ না এলে কিছুই হবে না। আন্তরিক টান চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান্ লাভ হয়—সতীর পতির উপব টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর টান। এই তিনটান এক হলে যতটা ব্যাকুলতা জন্মায়, সেই পরিমাণ ব্যাকুলতা যদি কারু প্রাণে আসে তবেই তার ভগবান্ ও শান্তি লাভ হয়।"

এক ব্রহ্মচারী সেদিন তাঁহার কাছে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর তো বলেছেন, সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পর্যান্ত দেখতে নেই, কিন্তু আমাদের তো নানা কাজকর্মে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলতে হয়। এসব অবস্থার ভেতর আমাদের কিভাবে থাকতে হবে?"

মহাপুরুষ কিছুটা মৌন থাকিয়া বলেন, "ছাখো. বাবা, বাড়ীতে যখন ছিলে তখন মা বোন ছিল তো? মা, বোনদের সঙ্গে যেমন সরল প্রাণে মেলামেশা করতে, ঠিক সেই রকম মন নিয়ে এখানে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজন মত কথাবার্ত্তা বলবে। মনে মনে ভাববে যে তারা তোমার মা, বোন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি ভক্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা না বলাই ভাল—বিশেষ ক'রে আলাদাভাবে। পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। তোমরা সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে। নারী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশ ব'লে জ্ঞান করবে। এই হল সাধনা।"

"কিন্তু তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো কি ক'রব মহারাজ ?"

মহাপুরুষজী তদুত্তরে একটু দৃঢ়স্বরে বল্লেন,—"যেখানে সেখানে মেয়েমানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তারা সাধু হবার তো উপযুক্ত নয়ই এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত হয়নি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে স্ত্রীলোকের কোন সংস্রব নেই এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোরভাবে জীবন যাপন ক'রে মনের ঐ সকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস ক'রে তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে।"

জপের কার্য্যকারিতার উপর শিবানন্দ মহারাজ সব সময়েই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "প্রীতির সঙ্গে বার বার নাম করাই জপ। তাই করবে, করতে করতে আনন্দ পাবে। জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই—সব সময় চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলতে পারে। আসল জিনিস হল—প্রেম। যত প্রেমভরে তাঁর নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে। তিনি যে অন্তর্য্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে—সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রত্যক্ষ করবে। বালক যেমন মা-বাপের কাছে আব্দার ক'রে কাঁদে, ঠিক তেমনি ক'রে তাঁর কাছে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয় পাবে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, পতিত পাবন, কলিকল্মষহারী, পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল ও প্রেমময়। খুব তাঁর নাম ক'রে যাও। সব সময় তো যতটা পার জপ করবেই ; কিন্তু বিশেষ ক'রে সকালে সন্ধ্যায় নিয়ম ক'রে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, একই স্থানে বসে জপধ্যান করা খুব দরকার। তাই করো।"

এ সম্পর্কে আর একদিন আরো বিশদ করিয়া কহিলেন, "জপ তিন রকমে করা যেতে পারে। মালাতে হাতের করে বা মনে মনে। মনে মনে জপ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন, 'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, মন জপে তো বলিহারি যাই।' মনে মনে জপ করার অভ্যাস করলে চলতে ফিরতে, খেতে শুতে সব সময়ই জপ

করা যেতে পারে। কিছুকাল ঐভাবে মানস জপের অভ্যাস করলে তখন এমনি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে একটা আনন্দের ধারা বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্যা রেখে জপ করা ভাল; এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত দুবার ক'রে আসনে বসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ করবে, আর এক একবারে হাজারের যেন কম না হয়—তার বেশী যত পারা যায় ততই ভাল। সংখ্যা করেও রাখা চলে বা মালায়ও রাখা যায়।

"ঠাকুর বলতেন, 'নাম নামী অভেদ' ইষ্টমন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্ত্তিও চিন্তা করবেন। এই ভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে পারে। ভগবান্ অন্তর্য্যামী— তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ঠিক ঠিক আন্তরিকভাবে একবারও যদি ভগবানের নাম নেওয়া যায়, তাতে উড়ো-উড়ো মন নিয়ে লক্ষ জপের চাইতেও বেশী ফল হবে। চাই ইষ্ট চিন্তার তীব্রতা, চাই ব্যাকুলতা আর চাই আন্তরিকতা। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে শীঘ্রই হয়ে যাবে। এসব একদিনে হয় না—রোক ক'রে লেগে পড়ে থাকতে হয়, ক্রমে সব হয়।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় সতের বৎসর স্বামী শিবানন্দ বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও মিশনের দায়িত্ব-পূর্ণ পরিচালনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিপূর্ব্বে বার বার তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—তপস্যায় নিমগ্ন না থাকিয়া তিনি যেন মঠ ও মিশনের কল্যাণকর্ম্মে আগাইয়া আসেন। কিন্তু ধ্যানী সাধক শিবানন্দকে তখন এ বিষয়ে তেমন উৎসাহী হইতে দেখা যায় নাই। কাশী অদ্বৈত আশ্রমের সংগঠনে, মিশনের বিভিন্ন ত্রাণ কর্ম্মে, রামকৃষ্ণ বাণীর প্রচারে মাঝে মাঝে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, ঠিকই, কিন্তু একটানা ভাবে মঠ ও মিশনের পরিচালনাকে কিছুটা এড়াইয়া গিয়াছেন। এবার তাঁহার পূর্ব্বতন মানসিকতায় পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ মহারাজের জীবনীকার স্বামী অপূর্ব্বানন্দ লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষজীর জীবনের যেন একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল ; যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল অনেক সময়েই প্রব্রজ্যা ও নির্জনবাসে কাটাইয়াছিলেন—কোন প্রকার গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, এইবার তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশে ঠাকুরের কাজে ষোল-আনা আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন হইতে দীর্ঘ সতের বৎসর কাল তিনি তীর্থভ্রমণ বা নির্জনবাস ভুলিয়া গিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর দ্বারে বেলুড় মঠে পড়িয়া রহিলেন, ঠাকুরের কার্য্য উপলক্ষ ছাড়া তিনি আর কোথাও যান নাই। অনেক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজী শিবানন্দকে একদিন সপ্রেমে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—'তারকদা, আপনাকে তপস্যায় যেতে দেব না।' কিন্তু শিবানন্দের মনের অবস্থা এমনই ছিল যে, তিনি স্বামীজীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।" এবার মহাপুরুষের অভ্যুদয় ঘটিল কর্ম্মযোগের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাস। রামকৃষ্ণমণ্ডলীর মুকুটমণি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। প্রিয় গুরুভ্রাতার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় শিবানন্দ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। ধ্যানাসনে বসিয়া মুমূর্ষু ব্রহ্মানন্দের রোগমুক্তির জন্য ঠাকুরের নিকট এই সময়ে তিনি প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। রাত্রিতে তিনি তিনবার বিদেহী রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। আর প্রতিবারই প্রার্থনার উত্তরে দেখা যায় ঠাকুরের মৌন ও গম্ভীর মুখ, প্রতিবারই তিনি প্রার্থনায় কোন সাড়া না দিয়া অন্তর্দ্ধান হন। বুঝা গেল, ব্রহ্মানন্দ আর নরদেহে থাকিবেন না। প্রভাতে উঠিয়া শিবানন্দ সেবক-ব্রহ্মচারীকে এ কথাটি হতাশ প্রাণে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ইহার পরই নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।[১]

স্বামী শিবানন্দ এইবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন। -অভিমানশূন্য মহাপুরুষ মঠ ও মিশনের ভার নিতে

---

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী : অপূর্ব্বানন্দ

গিয়া ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তো তাঁর (ব্রহ্মানন্দ মহারাজের) চাকর। তাঁর পাদুকা মাথায় ক'রে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করেছিলেন, আমিও তেমনই মহারাজের পাদুকা মাথায় ক'রে তাঁর কাজ চালাচ্ছি—তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি।"

এই সেবক-বুদ্ধি নিয়াই রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতা, মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শিবানন্দ স্বামী তাঁহার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ বার বৎসর কাল বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

শিবানন্দজীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল সঙ্ঘের ভাবী কর্ম্মীদের সাধনপথের মূল্যবান পাথেয়।

'মিশনের কর্ম্ম বড়—না ধ্যানজপ বড়', এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, "ধ্যান জপের প্রাধান্য অতীতে ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজের কথা বলছো? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর সত্যকার আদর্শ অনুযায়ী কাজ তো কখনও করা যেতে পারে না। ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ওয়ারসিপ—কর্ম্ম ও উপাসনা, এক সঙ্গে চালাতে হবে।"

তাছাড়া, বার বার তরুণ কর্ম্মীদের মর্ম্মে এই কথাটিও তিনি প্রবেশ করাইয়া দিতেন, "সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আনুগত্য।"

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্ম-পরিধি এ সময়ে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে বহু নূতন নূতন স্থানে বিস্তারিত হইতেছে মঠ ও কর্ম্মকেন্দ্র। তাই এই অধ্যাত্মগোষ্ঠীর সংহতির উপর শিবানন্দ এত গুরুত্ব দিতেন।

ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দের এই সময়কার মূর্ত্তিটি ছিল পরম প্রেমময়, পরম কারুণিক। আশ্রিতের সামান্য একটু প্রার্থনায়, আর্ত্তের দৈন্য-ময় সংবেদনে হৃদয় তাঁহার ভাবাবেগে আকুল হইয়া উঠিত, গলিয়া ঝরিয়া পড়িত। কেহ কেহ ভাবিতেন, এই কোমলকান্ত মহাপুরুষ কি মঠ ও মিশন পরিচালনার ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করিতে পারিবেন? দৃঢ়

তে হাল ধরিতে পারিবেন? মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মনেও এই চিন্তাটি দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন: “সেই সময় তাঁর কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন স্নেহপূর্ণ, এমন নম্র, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সকলের কাছেই নম্র, সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই ঋজু। কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো।

“মহাপুরুষ শিবানন্দের এইরূপ ঋজু ভাব দেখিয়া প্রথমটা আমি একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে হইল, তিনি এইরূপ হইয়া যাইলে মিশনের সমস্ত কাজকর্ম্ম কি করিয়া করিবেন। কারণ, সাধারণের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি তেজী ও দাপট করিতে পারে, সেই বড় কর্ম্মী হয়। এইজন্য, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং এইজন্যই আমি মহাপুরুষ শিবানন্দের এই অতীব ঋজু ভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। দু' তিনদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুরুষ শিবানন্দ একটা নূতন পথ বাহির করিলেন—নম্রভাব, ঋজুভাব, এবং ভালবাসা দিয়াও প্রভূত কার্য্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ভাব একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ যেন এক নূতন ভাবের মানুষ হইলেন।

“পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর তিনি যে অসীম ভালবাসা ও শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। ইহাকেই বলে অহৈতুকী ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—প্রতিদানের কোনই প্রত্যাশা নাই। মোট কথা, এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় হইতে একটা ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণের উৎস উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহা অযাচিতভাবে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।”

কিছুদিন পরে শিবানন্দ স্বামী এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জের মঠে গিয়া অবস্থান করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও তখন এখানে উপস্থিত। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লিখিয়াছেন:

"মুঠিগঞ্জের মঠে দেখিলাম—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মানী, কি সামান্য লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে সকলেই সমান ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এমন একটা লোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এইসব পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসার পাত্র। কোনও প্রকার সামাজিক ব্যবধান বোধ বা অন্য কোন প্রকার পার্থক্যের ভাবও সেই সময়টা কাহারও মনে ছিল না, কোনও প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উঁচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল না; কিন্তু সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে যাঁহার পরিধি ও উন্নতত্বের কিছুই পরিমাণ করা যায় না। অথচ তিনি পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতন। 'অনো-রণীয়ান মহতো মহীয়ান্"—অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও তিনি বড়। আমি দিনের পর দিন তাঁহাকে দেখিতাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতাম, 'এখন হইতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত শক্তি বিকাশ করিবেন এবং ঋজুতা ও মিষ্ট ভাষা দিয়া তাহা জগৎকে বিতরণ করিয়া যাইবেন।' এই সময়টাকেই তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তির বহির্বিকাশের কাল বলা যাইতে পারে।

"...দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের ভিতর হইতে এক প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা উঠিতেছে—তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চর্ম্ম দগ্ধ করে না। সেই অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ স্নিগ্ধ, স্থির ও মাধুর্য্যপূর্ণ। ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণ জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল।"

মহাপুরুষ শিবানন্দের কৃপাভাণ্ডার এবার যেন সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রকৃত সাত্ত্বিক আধার নিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের ভাব নিয়া, যাহারা আসেন, ধন্য হন তাঁহার দীক্ষার দাক্ষিণ্যে। সে-বার সুদূর সিন্ধুপ্রদেশ হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে

স্বপ্নে তিনি এক মন্ত্র লাভ করেন। ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া শিবানন্দ স্বামীর নিকট পত্র লিখেন, তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া প্রার্থনা করেন দীক্ষা ও সাধন নির্দ্দেশ।

কিছুদিন পরে মহাপুরুষের সম্মতি পাইয়া ভক্তটি বেলুড়ে চলিয়া আসেন। এবার মনোবাসনা তাঁহার পূর্ণ হয়, ধন্য হন স্বামী শিবানন্দের কৃপা লাভে।

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুরুষজীর নির্দ্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন। ভক্তটি ঠাকুরঘর হতে এসে খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে, তাঁর চরণতলে উপবেশন করে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন—"আপনার দয়ায় আমি শান্তিলাভ করেছি। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আপনার মুখ থেকে সেই স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রই পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখে-ছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমায় যিনি কৃপা করেছিলেন তিনি আপনিই।"

এই সিন্ধী ভক্তটির দীক্ষাদানের পর এক অপূর্ব্ব দিব্য ভাবে শিবানন্দ মহারাজ আবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ব্রহ্মচারী এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন, "আহা, লোকটি খুবই ভক্তিমান্! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে; তা না হলে অত ভক্তি হয় না। কার কেমন আধার, দীক্ষা দেবার সময় বেশ বুঝতে পারা যায়। যাদের আধাব খুব ভালো তারা মন্ত্র পাওয়া মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে—অশ্রু, পুলক, কম্পন এইসব হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোনা মাত্রই সর্ব্বাঙ্গে কম্পন ও একটু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। আর কী প্রেমাশ্রু! দু চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন

দিয়ে খুবই আনন্দ হয়—মন্ত্র দেওয়া সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্‌পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়া মাত্র উহা যেন সযত্নে আঁকড়ে ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথা। আহা! তিনি কতভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। দেশ-বিদেশের কত লোক যে তাঁর কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধন্য প্রভু!"

সেবক ভক্তটি সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো এতটা উদ্দীপনা হয় না। যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি কোন কল্যাণ হবে না?"

"তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। সিদ্ধগুরুর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্যের মনকে তৈরী ক'রে নিতে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ; বিশেষ ক'রে সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞগুরুর ভেতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। ঠাকুর বলতেন—সদ্‌গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। আর গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, শিষ্য মুক্ত হয় না।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এক ভক্ত সেদিন মঠে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আধার প্রস্তুত হলেই তুমি দীক্ষা পাবে।" কিন্তু তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় আর ইহা সম্ভব হয় নাই। সকাতরে ভক্তটি আরও কহিলেন, "ঠাকুরের কাছে আমি খুবই কাতর প্রার্থনা করছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজ তিনদিন হল স্বপ্নে মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্রও দিয়েছিলেন; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর স্মরণ করতে পারিনি। খুব চেষ্টা করেছি—কিন্তু কিছুতেই হল না। সেই থেকে মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভক্ত মাত্রেই স্বামী শিবানন্দের অতি আপন জন। তাহাদের জন্য শিবানন্দের কৃপার দুয়ার সদা উন্মুক্ত। এই ব্যাকুল ভক্তটিকে নানা কথায় তিনি শান্ত করিতে লাগিলেন।

"ভক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাস বাণীতে শান্ত না হয়ে মন্ত্র দেবার জন্য তাঁরই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। অগত্যা কতকটা যেন রাজী হয়ে, ভক্তটিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে, তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। (তখনও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির নির্ম্মিত হয়নি। মহারাজ মঠে যে ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ছিল এবং নিত্য পূজা হত।) প্রায় আধঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তটিকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। খানিক পরে মহাপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে রইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন—'আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। স্বপ্নে মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই আমায় বলে দিলেন। এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে। তিনি আপনার ভিতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেয়েছি। এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ জীবনে ইষ্ট দর্শন হয়।'

"মহাপুরুষজী কহিলেন, যে মন্ত্র পেয়েছেন নিয়মিতভাবে জপ করে যান। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন—প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মে মন যাতে লীন হয়, তাই ক'রে দাও।' তিনি তাই করবেন—নিশ্চয় জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা এবং জীবের সর্ব্বস্ব। সংসারে যাদের আমার আমার বলে লোক কাঁদছে তারা সব দু'দিনের, চিরস্থায়ী একমাত্র তিনিই। আপনি একমনে খুব নাম-জপ ক'রে যান ; দেখবেন ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে

করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ স্থায়ী হলে তাও একরকমের ধ্যান। ধ্যানের বহুপ্রকার আছে। খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন ; আর ভাববেন যে, তাঁর শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে আপনার হৃদয় কন্দর আলোকিত হয়ে গেছে। এইরকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব্ব আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে। ক্রমে ক্রমে মূর্ত্তিও লয় হয়ে যাবে এবং কেবল চৈতন্যময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে। এও এক-প্রকারের ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে—পরে পরে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন।

আসল কথা হল আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকা। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে। আপনার কখন কি প্রয়োজন, কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাঁকে কিভাবে ডাকতে হবে, সেসব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন, ঠাকুরের কথায় পড়েছেন তো? তিনি বলতেন—'কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে সাধন-ভজন করা। তিনি সদাই কৃপা করবার জন্য বসে আছেন—যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকেন, তেমনি। একটু ক'রে দেখুন—তবেই তাঁর কত কৃপা তা অনুভব করতে পারবেন[১]।"

কথা প্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে সেদিন পাশ্চাত্য দেশের ধন-ঐশ্বর্য্য, জীবনযাত্রার উচ্চমান ও ঐহিক সুখের কথা উঠিল। শিবানন্দ মহারাজ কহিলেন,—"ওসব সুখ তো ক্ষণিক সুখ। ওতে আছে কি? ওরা ভগবৎ-আনন্দের আস্বাদ কখনও পায়নি বলে ঐ ক্ষণিক আনন্দে মত্ত হয়ে আছে। বাবা, সে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই। তা স্বর্গেই থাক, আর যেখানেই থাক—বিদ্বান্ই হও, আর যাই হও;

১ শিবানন্দ বাণী: উদ্বোধন।

কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই। এ ভগবানের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদও বলেছে—

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি…'

"আসল সুখ রয়েছে সেই ভূমা বস্তুতে। তাই জানতে হবে। বিজ্ঞান সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারেনি। বিজ্ঞান নাড়াচাড়া করছে জড় বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে করতে ভোগস্পৃহা দিন দিনই বাড়তে থাকে। তাতে তৃপ্তি কোথায়? তাতে শান্তি কোথায়? ভোগের ভেতরই তো অশান্তির বীজ।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥'

"পরে জীবনে শান্তিলাভ প্রসঙ্গে বললেন—"অনাত্ম বস্তুতে শান্তি নেই। আত্মজ্ঞান লাভেই প্রকৃত শান্তি। আর সেই শান্তির সন্ধানও করতে হবে ভিতরে। শান্তি ভেতরেই আছে, বাইরে নেই। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম সব ভেতরে। সাধন-ভজন করো, ভগবান্‌কে ডাক। বাবা, শান্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয়।"

সে-বার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু এক ভক্ত শিবানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুর কি নিজে দীক্ষা দিতেন?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, দিতেন—তবে খুব কম। তা-ছাড়া, তাঁর দীক্ষা তো সাধারণ দীক্ষার মত কান-ফোঁকা দীক্ষা নয়। তিনি কাউকে স্পর্শ করে চৈতন্য করে দিতেন, বা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা কারো মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন। তিনি হলেন জগদ্‌গুরু। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। 'জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে, আর মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে।' তিনি ভক্তদের অন্তরে ঐশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত ক'রে দিতেন, আর অধিকারভেদে সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন করাতেন। একঘেয়েমি তাঁর ছিল না। যে যে মার্গেই সাধনা করুন না কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন।"

মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্পর্কে, আর্তের রোগ-

মুক্তি ঘটানো সম্পর্কে এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিবানন্দ স্বামী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "শারীরিক ব্যাধি দূর করা স্পর্শমাত্র—এ আর কি বেশী অলৌকিক ? এসব তো সহজ ব্যাপার। ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন—স্পর্শমাত্র মানুষকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন! জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি একমুহূর্ত্তে ক্ষীণ ক'রে দিয়ে মানুষের সমগ্র মনের গতি ভগবৎ-মুখী ক'রে দেওয়া—এ হল সব চেয়ে বড় সিদ্ধাই।……উঃ। কি কাণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি! সে সব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন, মনের আড়বাঁক সব ইচ্ছামাত্র সোজা ক'রে দিতেন। তাঁর স্পর্শমাত্র মনের সব ব্যাধি আরাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর! বাহির থেকে দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত, কিন্তু তাঁর দেহ আশ্রয় ক'রে লীলা করতেন সর্ব-শক্তিমান্ ভগবান্।"

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠিলেই মহাপুরুষের সর্ব্ব সত্তায় দিব্য আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিত, ঠাকুরের লীলাকথায়, মাহাত্ম্য প্রচারে, এই সদা অন্তর্লীন সাধক মুখর হইয়া উঠিতেন। কহিতেন, "যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে তার মুক্তি অনিবার্য্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প তোমরা শোননি ? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা ক'রে বলেছিল—'বাবা, আমায় কৃপা করলে না ? আমার গতি কি হবে ?' তখন ঠাকুর বলেছিলেন 'ভয় নেই, তোর হবে ; মৃত্যু সময় আমায় দেখতে পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলে উঠল—'এই যে বাবা এসেছ—বাবা এসেছ—!' এই বলতে বলতে মারা গেল।

"ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের।

বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য্য রকমের। তার তো খুবই কঠিন অসুখ; সকলেই মহা চিন্তিত। দেহত্যাগের দু'তিন দিন আগে থেকেই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আসতে দিতেন না। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদেব কেবল দেখতে চাইতেন। আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ করার একদিন আগেই ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরামবাবুর স্ত্রী শোকে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবুর স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে। পরে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাতে একখানি দিব্য রথ। ক্রমে ঐ রথ বলরাম মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর ঐ রথ থেকে নেমে এসে বলরামবাবু যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ঢুকলেন। খানিক পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন। তখন সেই রথ উর্দ্ধে উঠে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বলরামবাবুর প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল। এমন সব কত অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে; ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে যাচ্ছে। ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে নিশ্চয়।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণতলে ভেট স্বরূপ কিছু টাকা রাখিয়া ছিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, "টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তো কোন দরকার নেই—আমরা বাবা সাধু মানুষ; টাকা দিয়ে কি করবো? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া করে 'দো রোটি' দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন—

'প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটি এক লঙ্গেটী তেরে পাস মৈ পায়া।

ভকতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাওয়া ॥
প্রভু মৈ গোলাম তেরা ॥'

—তা তিনি দয়া ক'রে দো রোটি তো দিচ্ছেনই, আর কি হবে টাকা-কড়িতে? নিয়ে যাও বাবা ঐ টাকা। তোমরা গৃহস্থ; তোমাদেরই টাকার দরকার।"

ভক্তটি কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বার বার পীড়া-পীড়ি করাতে শিবানন্দজী সেবককে নির্দ্দেশ দিলেন, ঐ টাকা যেন ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়া দেওয়া হয়।

মঠের নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা একে একে শিবানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিতেছেন। প্রাণে তাঁহার অপার আনন্দ, নয়ন দু'টি দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল। প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ছাখো বাবা, নামরূপ এ সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য—দুদিনের; এসব কিছুই নয়। নাম রূপের পারে যেতে হবে; সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে। আত্মবস্তু লাভ করতে হবে। সন্ন্যাসের অর্থ তো তাই। বিরজা-হোম করে শিখাসূত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পরা ও সন্ন্যাসী হওয়া তো সহজ। সে তো প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করো। যাও বাবা, এখন খুব ধ্যান লাগাও। আত্মবস্তু অনুভব করো। তবেই ঠাকুরের সঙ্ঘে আসা, সন্ন্যাস নেওয়া, এ সব সার্থক হবে। আমার কথা শুনতে চাও তো এই।"

সাধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি, একথার উত্তরে একদিন তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "সাধু উঠবে খুব সকালে। রাত তিন চারটার পর আর ঘুমুবে না। সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার পর আর কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল সকাল স্নান করবে। স্নান ক'রে ধ্যান ধারণাদি করবে। স্নান ক'রেই খাবে না। স্নান ক'রে ধ্যানভজন না ক'রে খাওয়া, সে তো অন্যান্য লোকেরা করে, সাধু তা করবে না। সাধুর চেহারা কথাবার্ত্তা সবই অনুরূপ হবে, সরল সুন্দর দেবোপম। সাধুর টাকা কেন থাক্‌বে?

সাধু একদম নির্ভরশীল হবে—ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। ত্যাগের পথে যারা থাকবে তাদের পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয়। সাধু রাত্রে বেশী খাবে না। ঠাকুর বলতেন—রাত্রের খাওয়া হবে জলখাবার মত। সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচর্চ্চা করবে। সাধুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সাধু মিষ্টভাষী, ধীরস্থির হবে, ভদ্র ব্যবহার করবে। সাধু সর্ব্বদাই কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাৎ থাকবে। কামিনীকাঞ্চনের কোন সংসর্গ রাখবে না।"

এক নবীন সন্ন্যাসী শিবানন্দজীকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেন,[১] "মহারাজ, সন্ন্যাসজীবনে কি কি নিয়ম পালন ক'রে চলতে হবে? পরমহংস উপনিষদে এবং নারায়ণ উপনিষদে সন্ন্যাসীর পক্ষে যে সব নিয়মের বিধি আছে সে সব তো আমাদের এই কাজকর্ম্মের ভিতর অনেক সময় মেনে চলা সম্ভবপর নয়।" উত্তরে শিবানন্দ মহারাজ বলেন, "হ্যাঁ, সন্ন্যাসীর পক্ষে অনেক সব নিয়ম আছে, কিন্তু সে সব নিয়ম তোমাদের মানতে হবে না। ও তোমাদের জন্য নয়। তোমরা হলে কর্মযোগী সন্ন্যাসী। তোমাদের জন্য স্বামীজী নূতন আদেশ রেখে গেছেন। তোমাদের সাধনভজন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে অনাসক্ত হয়ে সাধনভজনের অনুকূল কর্ম্ম। কাজেই তোমাদের পক্ষে ঐ সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা সম্ভবপর নয়। সেসব নিয়ম হল কেবল জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীদের জন্য—যাঁরা কোন কাজকর্ম্ম করেন না, কেবল জ্ঞান বিচার করেন, তাঁদের জন্য। তবে কি জানো বাবা, মূল জিনিস ক'টা ঠিক রাখতে পারলে ক্রমে সব ঠিক হয়ে যায়।

"মূল জিনিসটি কি, মহারাজ?"

"মূল জিনিস হ'ল খালি বাহ্যিক ত্যাগ নয়, কামকাঞ্চনাসক্তিও ত্যাগ করতে হবে। ঐ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি, ঐ সমস্ত এষণার মূলেই হল কাম ও কাঞ্চন এই দুটো

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

জিনিস। কামকাঞ্চন ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে—এই হ'ল সন্ন্যাসীর একমাত্র বিশেষ ক'রে মানবার জিনিস। ঠিক ঠিক শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হবে তাঁর কাছে। তিনি তো ভগবান্, তিনিই কৃপা ক'রে সব জানিয়ে দেবেন, সব বুঝিয়ে দেবেন।

"কিন্তু মহারাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহরক্ষার জন্যে কিছু কিছু এষণা তো রাখতেই হবে?"

"হ্যাঁ, সে ঠিক। তা শাস্ত্রেও তেমন বিধি রয়েছে—। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই রয়েছে, 'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি'—'ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হয়ে পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হয়ে, অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন ক'রে থাকেন।' শরীর ধারণমাত্রের জন্য যতটা দরকার ততটুকু মাত্র এষণা রাখতে হবে। ভিক্ষাদিও প্রয়োজন মত অতি সামান্য করবে। কিন্তু চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় খেতে হবে বা আরামে থাকতে হবে, তেমন কথা কোথাও নেই। আর শরীর ধারণের উদ্দেশ্যও হবে তাঁকে প্রাণভরে ডাকা এবং তাঁর সেবাদি কাজ করা, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়।"

মঠের সাধনরত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা আন্তরিকভাবে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত; তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইতে গিয়া ভাবাবেগে তিনিও উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন। কহিতেন:

"তোমরা সর্ব্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবন-সর্ব্বস্ব করেছ; তোমাদের উপর আশীর্বাদ থাকবে না তো কার উপর থাকবে? কিন্তু তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপাবাতাস তো বইছেই; তুই পাল তুলে দে না।' ঐ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা। ঐকান্তিক অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই—বিশেষ ক'রে সৎ কাজের জন্য, সাধন ভজনের জন্য। আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে হবে। উদ্যম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া, কিছুই হবার জো নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি

আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা সাধু হয়েছ, বাপ মা, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছে কেন? না, ভগবান্ লাভ করবে বলে। আর পূর্ব্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ; বিশেষ ক'রে আমাদের কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকার সুযোগও ঠাকুর ক'রে দিয়েছেন। এত সব সুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মনে খুব জোর আনবে। তাঁর পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভব সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ; একটু জোরে ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এসব তো মহামায়ার বিভীষিকা। এ সব দেখিয়ে তিনি সাধকদের পরীক্ষা করেন, ওসবে এখন সাধকের মন বিচলিত না হয়; সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন মহামায়া প্রসন্না হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড়নি? স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া মারের রূপে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন।"

মঠের এক দক্ষিণ-দেশীয় সন্ন্যাসী তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া শিবানন্দজীকে বলেন, "মহারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছে, শ্রীভগবান্‌কে আমি সর্ব্বভূতে দর্শন করবো। কিন্তু কবে এ আকাঙ্ক্ষা আমার পূর্ণ হবে, কৃপা ক'রে তা বলুন।"

ভাবের ঘরে কোন ফাঁকী মহাপুরুষ সহ্য করিতে পারিতেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কহিলেন, "বাবা, আগে ভগবান্‌কে নিজ হৃদয়ে দর্শন করতে হবে। অন্তরে তাঁর দর্শন না হলে বাইরে সর্ব্বভূতে তাঁকে দেখা কি ক'রে সম্ভব? আত্মানুভূতিতে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র তাঁর দর্শন হয়; তাই সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই অবস্থা লাভ হয়।"

সন্ন্যাসীটি করজোড়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ। সত্যকথা,

সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেম, নির্বিকার চিত্তে সব দুঃখ সহ্য করা, এসব নৈতিক গুণের পূর্ণতা নিয়ে সে অবস্থায় কি পৌছানো যায় না?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়। একথা ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করলেই যে ভগবদ্দর্শন হবে না। নিরন্তর তাঁর ধ্যান করতে করতে তিনি কৃপা ক'রে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন। চাই তাঁর ধ্যান—সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যো সো ক'রে একবার ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদা ক'রে নৈতিক চরিত্র গঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্‌বৃত্তি তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার ভয় নেই। আসল কথা কি জান বাবা? কৃপা, কৃপা। তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেই মানুষ তাঁর দর্শন পেতে পারে। ভজনসাধন এসব মনকে ভগবন্মুখী করার উপায় মাত্র।"

অতঃপর কিছুক্ষণ ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন যে, কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা? এই পাল তুলে দেওয়াই হল পুরুষকার—সাধনভজন। ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করার মত ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রতে হবে—ভজনসাধন দ্বারা। বাকী তাঁর কৃপা। নিরন্তর তাঁর স্মরণ মনন তাঁর ধ্যান করতে করতে মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়; আর ঐ শুদ্ধ মনে স্বতই ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়, ভগবৎকৃপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, সাধু হয়েছ, সব ছেড়ে ছুড়ে তাঁর আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান্ লাভ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের তো তাঁকে নিয়েই সব সময় থাকতে হবে। ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে জাগরণে, সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্‌কে নিয়েই বিলাস করবে। তাঁর বিষয় স্মরণ, তাঁর বিষয় পাঠ,

আলোচনা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাবে, আর তাঁর আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে। ভগবান্ অন্তর্য্যামী। যেখানে আন্তরিক ব্যাকুলতা, সেখানে তাঁর কৃপাও হয়। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই।"

সন্ন্যাসীর জীবন ত্যাগ তিতিক্ষাময়, দেহবুদ্ধি বিনষ্ট করাই তাঁহার সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই তত্ত্বটি শিবানন্দ মঠের উপদেশ প্রার্থী সন্ন্যাসীদের মনে গ্রথিত করিয়া দিতেন। একদিন পরম স্নেহভরে কহিতেছিলেন, "বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর। আর তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। তোরা তাঁরই আশায় এসেছিস তা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিস, সেও মহা সৌভাগ্যের কথা। তোদের উপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে তা ভেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর ক'দিন। এর পরে তোদের দেখেই লোকে শিখবে। ত্যাগই হল সন্ন্যাস জীবনের ভূষণ। যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয়।

"খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন; তাছাড়া, খালি বিরজাহোম করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস ত্যাগ করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে পারবিনি। সঞ্চয় করতে নেই; এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে নেই। ঠিক সাঁকোর জলের মত একধার দিয়ে আসবে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর আসবে না, তখন ময়লা জমতে শুরু করবে। আর কখনও কোন জিনিস চাইতে নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক। যখন যা দরকার মা সব দেবেন। এই দেখ না, এখন এত জিনিসপত্র খাবারদাবার কাপড়চোপড় সব আসছে যে সামলানো দায়। একদিন গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখানা কাপড়ই সকলে মিলে পরতাম। আর এখন নিত্য নূতন গরদ পরলেও ফুরোয় না। তবে কি জানিস, তাঁর দয়ায় মনটা তখনও যা ছিল এখনও তাই। পরনের কাপড় ছিল না ব'লে মনে কোন দুঃখ ছিল না; কোন

অভাব বোধ হ'ত না। তিনি কৃপা ক'রে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন। এই দেখ্ না, তোরা তো এখন আমায় দু হাত গদির উপর শুইয়ে রেখেছিস্, কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা—যখন শীতকালে কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম। তাতে যা আনন্দ তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

"দেখ্, আমার সেবা করছিস এ খুবই ভাল। ঠাকুরের মহা কৃপা তোর উপর যে, তাঁর একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও করা চাই। নিয়মিত জপধ্যান, ভজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের উপর মানুষবুদ্ধি এলেই মারা যাবি—বেশ মনে রাখবি। ভগবদ্‌বুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র সাধনা। ভগবানের নাম, তাঁর ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে সেই শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমরা তো ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি; তবু তিনি আমাদের কত উগ্র সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান্, তিনি যে এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম? ক্রমে সাধনভজনের দ্বারা সে জ্ঞান পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয়নি। তবে কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কৃপা করেনও।"

শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রক্তের চাপ মাঝে মাঝে খুব বৃদ্ধি পায়। অথচ দীক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু ভক্ত নরনারীর আনাগোনা লাগিয়াই আছে। সেদিন শরীরটা খুবই অবসন্ন। ডাক্তারেরা কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। একজন দর্শনার্থী আসিলে সেবকটি সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবানন্দজী বলিলেন— "আমি রামকৃষ্ণের চেলা। তাঁর অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও যখনই কেউ এসেছে, তার জন্য কত ভাবনা, কত আলাপ। আর আমি চুপ ক'রে বসে থাকব? শরীর খারাপ তা কি হবে? তোমরা

এসে শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাও—তোমরাই বা কি ভাববে? ভাববে—'রামকৃষ্ণের চেলা এই রকম।'

রামকৃষ্ণ-চেতনা ছিল মহাপুরুষ শিবানন্দজীর সাধন জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য, এই চেতনার পূর্ণতাকেই তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন আপন অভীষ্টরূপে। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে। তাহা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন ও তাঁহার কৃপা।...যিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ রামকৃষ্ণ-ধৃত এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"এই একটিমাত্র ঘটনা দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এক গৌরবময় স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ সেই যুগটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে উহার স্মৃতি চিরদেদীপ্যমান্ থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মসঙ্ঘের গুরুপারম্পর্য্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধিযুগ বলাও বোধ করি অন্যায় নয়। প্রাচীন অল্পপরিধিযুক্ত কিন্তু অগাধ-স্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবর্ত্তী—বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তার লাভ করিতেছে। মহাপুরুষজী যেন প্রাচীনকে তাঁহার ভিতর বহুভাবে দেখিবার সুযোগ দিয়া গেলেন আর আগামীকেও ভগবদ্‌বিধানে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন।"

গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজী শিবানন্দ মহারাজের এ সময়কার কৃপা-লীলা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, "শেষ বয়সে শারীরিক নানা অসুস্থতা হেতু তাঁহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যেরূপ অবিচলিতভাবে সে সকল সহ্য করিতেন, তাহাতে মনে হইত যেন তাঁহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না। সেই অবস্থাতেও বহুদূর দূর স্থানের অনেক লোক তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য আসিত।

তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপা করিতেন। পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, অফুরন্ত কৃপা ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেন। মানুষে এতটা সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই যেন তাঁহার ভিতর রাখিয়া বহু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছে। তাঁহার উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ।”

এই কৃপার শক্তি মহাপুরুষ শিবানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার কৃপালু সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে। ঠাকুর তাঁহার সকল শক্তির উৎস,—এই পরম সত্যটি নিজের দীর্ঘ জীবনে এক মুহূর্ত্তের তরেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই দেখি মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যাকে তিনি লিখিতেছেন,—

“ঠাকুরের কৃপায় আমাদের আধারানুযায়ী উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর স্পর্শে, তাঁর ইচ্ছায় আমার নিজেরই—তাঁর জীবৎকালে তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল—তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও আমি বেঁচে আছি।”

শিবানন্দস্বামী সে-বার দেওঘরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন তাঁহাকে বৈদ্যনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে নেওয়া হয়। মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডারা তাঁহাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়া গেলেন। তারপর তাঁহাদের ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তবে একথাও জানানো হইল, দর্শন ও পূজার জন্য শিবানন্দ মহারাজকে সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। এদিকে মন্দিরে ঢুকিয়া লিঙ্গ বিগ্রহকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। নির্দ্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তবুও তাঁহার কোন হুঁস নাই। অবশেষে নানা চেষ্টার পর তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং

সবাই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহার পর তিনি আনন্দ সহকারে বার বার বলিয়াছিলেন, "বাবার কৃপায় আজ খুব দর্শন হল।"

এই সময়ে একদিন রাত্রিতে শিবানন্দ মহারাজ প্রবল হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হন। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম। এই সঙ্কট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হন এবং দেহবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সারা রাত্রি কাটাইয়া দেন।

পরের দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা! অল্পক্ষণ পরেই মনটা একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে চলে গেল। তখন দেখি কোন যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই—স্থির প্রশান্তি। বাইরের ঝড়ঝাপটা সেখানে স্পর্শ করতে পারছে না।"

এক সেবক এই সময়ে প্রশ্ন করেন, "ওটা কি ব্যাপার, মহারাজ!" মহাপুরুষ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওই তো আত্মা?"

শিবানন্দজীর শরীর একে অসুস্থ, তদুপরি নিদ্রা নাই। সেবক ব্রহ্মচারীটি বলেন, "মহারাজ একটু ঘুমুবেন না?"

ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ উত্তর দেন, "আমার আবার ঘুম কি রে?" সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিতে থাকেন—'ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগ যাগে জেগে আছি। এবার যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি। এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, ভাল ভাবার কাছে ভাব শিখেছি। যে দেশে রজনী নেই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।'

নিদ্রার প্রসঙ্গে আর একদিন বলিলেন, "চণ্ডীতে আছে যে, মা-ই সেই নিদ্রারূপিণী—'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপে পণ সংস্থিতা।' তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আধারভূতা জগতস্তমেকা।' সেই মা-ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। আমার হৃদয় কন্দর আলোকিত ক'রে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাঁকে দর্শন করলেই যে সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, ঘুমের আর দরকারই বোধ হয় না। যখনি একটু

শ্রান্তি বোধ করি, তখনি মাকে দেখে নিই। ব্যস্, আনন্দম্। সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।"

মহানিশায় জপ ধ্যান করা স্বামী শিবানন্দ খুব পছন্দ করিতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়া সেবক ব্রহ্মচারিটিকে কহিতে লাগিলেন, "ছাখ্, জপ করবি গভীর রাতে। মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। এত আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছা হবে না। এই তো আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ করবি—বুঝলি ? সময় বৃথা যেতে দিস্‌নি বাবা। তাঁর নামে ডুবে যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না। যতটুকু করবি তন্ময় হয়ে করবি ; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো ঠাকুর গাইতেন-- 'ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' যে কোন কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন--প্রাণ, আন্তরিকতা ; তিনি সময় দেবেন না। আর ধ্যান জপ নিত্য নিয়মিত-ভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে যায়। নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা চাই। গীতাতে ভগবান্ বলেছেন -- 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে নিত্য ডেকে যা ; দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্তা খুলে দেবেন। সেই ব্রহ্মময়ী মা প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' সেই তিনিই প্রসন্না হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য ; কিন্তু নিচ্ছে কে ? তাঁর কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন—ভক্তি মুক্তি সব।

"বাড়ীঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান্ লাভ করবি বলে। ঐ তো জীবনের উদ্দেশ্য। আসলে যেন ভুল না হয়ে যায়। খুব খেটে জপ ধ্যান স্মরণ-মনন ক'রে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নে ; তখন খালি আনন্দম্—খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। আমাদের শরীরই বা আর কদিন ? এই তো বৃদ্ধ শরীর। এখন চলে

গেলেই হল— তখন সব অন্ধকার দেখবি। কিন্তু জপ ধ্যান ক'রে যদি ইষ্ট দর্শন ক'রে নিতে পারিস্ তো তখন দেখবি যে, গুরু ইষ্ট একই এবং গুরু তোর হৃদয় মন্দিরেই চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থূল দেহনাশে গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাই তো আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

স্বামী শিবানন্দের শেষ জীবনের ভাবময় প্রেমঘন মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ-দর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখনীতে অপরূপ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিতে দেখি:

—এই সময় তিনি একটি ভালবাসার মূর্ত্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সকলের জন্যই তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং তাঁহাদের কল্যাণের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিতেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ' তাঁর অতি আপনার জন—তাঁর নিজস্ব।

-কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক দুঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন করিতেন, যেন একটি ছোট-খাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইতেন। তিনি প্রকাশ্য কর্ম্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্ম্মী। সাধারণতঃ, কর্ম্মী বলিতে বুঝায় যিনি বহুপ্রকার চাঞ্চল্যকর কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হইয়া তাঁর ভালবাসা ও হৃদ্‌গত শক্তি দিয়া অপরের নিজস্ব ভাবটি—অপরের নিজস্ব কর্ম্মের ভাবটি, জাগ্রত করিয়া দিতেন। তিনি স্থির হইয়াও চঞ্চল ছিলেন; একস্থানে থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন; বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াও চিন্তা করিতেন।

—ভালবাসা ছাড়া তাঁহার আর একটি শক্তি—যাহার বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে - উদ্ভূত হইয়াছিল গুণাতীত জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। তর্ক, যুক্তি, বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা মানুষ যতটা উঁচুতে উঠিতে পারে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বহু উর্দ্ধে উঠিতেন। তাঁহার সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই সত্য হইত যে সেখানে বিচারবুদ্ধি চলে না। তিনি জগৎকে ও সৃষ্টিকে অন্য এক স্তর হইতে,

অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগৎকে কারণ অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপ দেখিতেন না। তিনি কারণ অতীত হইতে জগৎকে দেখিতেন।

—মহাপুরুষ শিবানন্দ আনন্দময় লোকে তাঁহার মনকে সর্ব্বদাই তুলিয়া রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে যাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকিবেন যে তিনি অধিকাংশ সময় এই 'আনন্দময় লোকেই' বিচরণ করিতেন বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা হইল জীবন্মুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ। মহাপুরুষ শিবানন্দ এই আনন্দময় লোকে অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগৎকে আনন্দময় দেখিতেন। এইজন্য জীর্ণ দেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও তিনি সর্ব্বত্র 'আনন্দ' বা 'ব্রহ্ম' দেখিতেন।

—যে আনন্দ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বা ব্যক্ত করি সে আনন্দ দেহজ; কিন্তু মহাপুরুষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দের। সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের অংশটুকু প্রকাশ করা হয়। চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনের বৃত্তি, চঞ্চল ভাব স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদূর্দ্ধে উঠিলে সৎ বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। সৎ অব্যক্ত ও স্বয়ং। এই দুই অবস্থার বিষয় কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না—কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অল্পবিস্তর প্রকাশ করিতে পারেন। এইজন্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ জগৎকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন; কিন্তু স্বয়ং তদূর্দ্ধ অবস্থায় চলিয়া যাইতেন। সে অবস্থা প্রকাশ করিবার নয়। 'সৎ, চিৎ, আনন্দের' এক অংশ তিনি জনসমাজের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর দুই অংশ তিনি নিজেই হইয়া যাইতেন; কারণ সেই অবস্থা বাক্য মনের অতীত—অবাঙ্ মনসোগোচরম্।"

মঠের এক ব্রহ্মচারী অনবধানতা বশতঃ সেদিন শিবানন্দজীর একটি নির্দ্দেশ পালন করে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া বার বার সে ক্ষমা চাহিতে থাকে।

মহাপুরুষ ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বুঝেছ। এখানকার কথা শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয়ই হবে। এখান থেকে এখন যে সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে। এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।" মনের দুয়ার তখন আল্‌গা ছিল, তাই তাদাত্ম্য বোধের স্বীকৃতি হঠাৎ এদিন শোনা গেল সিদ্ধকাম মহাপুরুষের মুখে।

স্বল্পবাক্, গম্ভীর পুরুষ, শিবানন্দজীর মধ্যে এই সময়ে এক এক দিন যেন মধুর স্বভাব বালকের মুখরতা আসিয়া হাজির হইত। স্বীয় আনন্দময় অনুভূতির কথা আর যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সে-বার তিনি কাশীধামে আসিয়াছেন। সকালবেলায় আশ্রমের সন্ন্যাসীরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। এমন সময় একজনকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, "ছাখ্, কাল রাতে একটা ভারী মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাজূটধারী ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে! আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি—কী সকরুণ চাউনি! তাঁকে দেখবামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় ক'রে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম···আর খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মূর্ত্তিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, আর তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্য বদন, আমার হাত ধরে ইসারা করে বল্লেন, 'তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।' ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নীচের দিকে আসতে লাগলো এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগলো। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।"

এই দর্শনের পর হইতেই শিবানন্দ স্বামীর মন সর্ব্বক্ষণ এক অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-ভূমিতে অবস্থিত থাকিত। আহার নিদ্রায় দেখা যাইত বিস্ময়কর নির্লিপ্তি। ডাক্তারেরা এটিকে বায়ুরোগ বলিয়া ধরিয়া নেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাও করিতে থাকেন।

মঠের এক সন্ন্যাসীর মনে কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি গোপনে মহাপুরুষকে বলেন, "মহারাজ, ডাক্তারেরা বলছেন, এটা বায়ুরোগ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বোধহয় এটা যোগজ। কাশীতে আপনার কি কোন দর্শনাদি হয়েছিল? কাশী হতে আসার পর থেকেই এর সূত্রপাত দেখছি।"

শিবানন্দ স্বীকার করিলেন, "হ্যাঁ, কাশীতে এক শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময় যোগীমূর্ত্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে।"

ভক্ত ও দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা এ সময়ে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিন মঠের এক সন্ন্যাসীকে শিবানন্দ বলিতে থাকেন, "ছাখ্, স্বয়ং ঠাকুরই প্রেরণা দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এই শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমায় দেখে এত লোক আসবে কেন? আমি তাঁর নাম স্মরণ মনন করি, অন্য কিছু জানিনে। যারা এখানে আসে আমি সকলকে তাঁরই পায়ে সঁপে দিই। বলি, 'এই নাও ঠাকুর, তোমার জিনিষ তুমি নাও।' লোকে যেমন নানা ফুল দিয়ে তাঁর চরণ পূজা করে, আমিও তেমনই নানা রকম মানুষ অঞ্জলি ক'রে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। তা সকলকে তিনি গ্রহণ করছেন, স্পষ্টই দেখতে পাই।"

এক একদিন দিব্য উদ্দীপনা ভাব। আশীর্ব্বাদ প্রার্থীদের বলিতেন, "ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, আশীর্ব্বাদ তো সর্ব্বদাই বয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে। এমনি বলছি যে তা নয়—ঠিক্।"

আবার এক একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিতেন, "যে আসবে, কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।"

কোন কোন দিন মহাপুরুষের সর্ব্ব সত্তায় মহাভাবের মাতামাতি আরম্ভ হইয়া যাইত। আনন্দে তিনি তখন গর্গর মাতোয়ারা। ভাবের উপশম ঘটিলে ভক্তসেবকদের ডাকিয়া বলিতেন, "শরীরে যেন একটা ডাকাত ঢুকেছিল। কালী কীর্ত্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে বাপ, শরীরটা যেন তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে। এ রকম ভাব ঠাকুরের হত। আমি তো তাঁরই সন্তান। কুছ নহী তো থোড়া থোড়া তো আছে?"

শরীরে হাঁপানী ও রক্তচাপের যন্ত্রণা খুব চাপিয়া বসিয়াছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। মাঝে মাঝে সিদ্ধ সাধক দ্রষ্টা স্বরূপে বলিতে থাকেন, "আজকাল একটা ভারী মজা দেখছি। এটাকে অবলম্বন ক'রে দুটো ব্যাপার চলছে—একটা শরীরের আর একটা আত্মার। শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আত্মার দিক থেকে নির্ম্মল আনন্দ—বেশ আনন্দ হয় দেখে, আর ভেবে।"

কিছুদিন যাবৎ শিবানন্দজীর অধ্যাত্মজীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রে পরম অনুভূতির একটা বিশেষ অবস্থা। দর্শনার্থী ভক্ত, মঠের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী যে কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহাকেই ভক্তিভরে করজোড়ে তিনি প্রণাম নিবেদন করেন। কেহ বিস্মিত হন, কেহ বা ভয়ে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন।

একদিন গভীর রাতে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীটিকে করজোড়ে প্রণাম জানাইলেন। এই সেবকটি তাঁহারই দীক্ষিত শিষ্য। ভীত স্বরে তিনি বলিয়া উঠেন, "মহারাজ, এভাবে প্রণাম ক'রে আমায় আর পাপের ভাগী করবেন না।"

শিবানন্দ মহারাজ শান্ত স্বরে কহেন, "আসল ব্যাপারটা কি জানিস্, যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখতে পাই ; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম করি। কোন লোক সামনে এলেই প্রথমটা তার ভেতরকার যা সত্তা সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবির্ভূত হন। লোকজন তখন ছায়ার মত অস্পষ্ট, আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও জীবন্ত দেখায়। তাই তো প্রণাম করি। প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় রূপ অন্তর্দ্ধান হয়। তখন লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও পারি।"

উচ্চতর দিব্য অনুভূতিসমূহ তখন তরঙ্গায়িত হইতেছে শিবানন্দের সাধনসত্তায়। একদিন আপন মনে সেবকদের কহিতে লাগিলেন, "কৃপা—কৃপা—কৃপা। তিনি কৃপা ক'রে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে

কি ক'রে তাঁকে বুঝবে? দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত—খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি করছেন। কিন্তু তারই ভেতরে যে এত কাণ্ড তা কি ক'রে লোকে বুঝবে বল, তাঁর বিশাল শক্তির খেলা যত দিন যাবে ততই লোক দেখতে পাবে। ধর্ম্মজগতে একটা মহা ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুর কৃপা ক'রে কত যে দেখিয়ে দিচ্ছেন তা আর কাকে বলব? কাকেই বা বলি, আর কেই বা ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন! তার বিষয়ে কত কথা যে প্রাণের ভিতর (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) গজ্‌গজ্‌ করছে, কাউকে তো তা বলবার জো নেই। কেউ ওসব বুঝতে পারবে না। তোমাদেরও বলতে পারিনে। এমনকি তোমরাও ওসব বুঝতে পারবে না। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যতদিন ছিলেন, তাঁর কাছে প্রাণ খুলে ওসব কথা বলতুম, বলে প্রাণটা খোলসা হ'ত। তিনিও আনন্দ পেতেন, আমারও আনন্দ হ'ত। সে-সব অতি গুহ্য কথা। তাঁর সঙ্গে নিরিবিলিতে কত সব কথা হয়েছে! তিনিও অনেক সময় নিজের অনেক কথা বলতেন। এখন তো আর তা হবার জো নেই। এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথা প্রাণের ভেতরই রয়ে যাচ্ছে, বলবার লোকই পাইনে। সবই যে তাঁর ইচ্ছা। তবে আন্তরিক প্রার্থনা করছি, জগতের কল্যাণ হোক্, তোমাদের কল্যাণ হোক্, তোমরা সব শান্তিতে থাক।"

স্বামী শিবানন্দের শরীর এখন প্রায় পতনোন্মুখ, অন্তর্লোকে নিরন্তর চলিয়াছে মা-ব্রহ্মময়ীর কৃপা আস্বাদন। সেদিন নিজের সম্বন্ধে সেবক শিষ্যদের বলিতে থাকেন, 'কামনা-বাসনা থাকলে চির শান্তিলাভ করা অসম্ভব; আর সেই কামনা-বাসনা ভগবৎকৃপা ছাড়া সমূলে বিনষ্ট হওয়াও সম্ভবপর নয়। ঠাকুর কৃপা ক'রে আমার সব কামনা-বাসনা একেবারে মুছে দিয়েছেন; কোন বাসনা নেই। এই শরীরটা কেবল তাঁর ইচ্ছায়, তাঁরই কাজের জন্য রয়েছে; আমি হচ্ছি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিন্তু কোন বাসনা নেই, বুঝলি

আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ।'—এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। তখন তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে; তিনি যেন এক নূতন লোক। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন মনেই বলতে লাগলেন—'মা আমায় কৃপা ক'রে সব দিয়েছেন। তাঁর ভাণ্ডার খালি ক'রে আমায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তাঁর কৃপায় সব লাভ হয়েছে—যং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ। তবু যে তিনি এ শরীরটা কেন রেখেছেন তিনিই জানেন।

"...গভীর রাত। মহাপুরুষজী তাঁর নিজের খাটে বসে আছেন—ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে আপন ভাবে এক একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বেড়াল ঘরের মেঝের উপর মিউ মিউ ক'রে ডেকে উঠলো। তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বেড়ালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তিনি যে বেড়ালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নি। সেজন্য সে একটু সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বল্লেন—"ছাখ্, ঠাকুর আমায় এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি 'চিন্ময়', ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সর্বপ্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা—কেবল নামের ভেদমাত্র; কিন্তু মূলে সব একই। বেশ পরিষ্কার দেখছি, চেষ্টা ক'রেও সে ভাবটা সামলাতে পারছি না। সবই চৈতন্যময়। এই বেড়ালের ভেতরও সেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বলজ্বল করছে। এইভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপুর ক'রে রেখেছেন। লোকজন আসে যায়; কথাবার্ত্তা বলতে হয় বলি; সাধারণ কাজকর্ম্ম আহারাদি করতে হয় করি। যেন অভ্যাসবশতঃ ক'রে যাই। কিন্তু এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্ব্বত্রই সেই চৈতন্যের খেলা। নামরূপ এসব তো অতি নিম্ন স্তরের ব্যাপার। নাম-রূপের ওপরে মন গেলেই, বাস্। তখন সবই চৈতন্যময়, আনন্দময়। এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই জানে।' আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঐটুকু বলেই

হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধ প্রাণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল[১]।"

শিবানন্দজী রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়া সেবকগণ অতিশয় বিব্রত, দিবারাত্র তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। নিজ দেহের নশ্বরতার কথা মহাপুরুষ যেমন বলিতেন আবার তেমনি উদ্দীপনা ভরে বলতেন, "এই শরীরের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি! এতটা করি কেন, জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়! এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান্-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবান্‌কে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁর সেবা করেছে। এই শরীরটাকে তিনি যুগধর্ম্ম প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন—তাই এত।"

তাঁহার শরীর খারাপ বলিয়া ভক্ত শিষ্যদের ঠেকানোর উপায় নাই। কারণ, ডাক্তারেরা নিষেধ করিলেও তিনি মানিতে চাহেন না। বিদায় লগ্নে সিদ্ধকাম শিবানন্দ যেন সদাব্রত খুলিয়া বসিয়াছেন।

এ সময়ে সর্ব্ব অস্তিত্বে তিনি ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ পাইতেছেন। মাঝে মাঝে তাই বলিয়া উঠেন, "ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন, সর্ব্বদা শ্বাসে শ্বাসেই তাঁর দর্শন পাচ্ছি।"

কোন ভক্ত বা আগন্তুক মঠে আসিয়া প্রসাদ না পাইয়া চলিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীদের আর রক্ষা নাই। ভাণ্ডারীকে ভয়ে ভয়ে সদা সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার গঙ্গায় তাহার ছোট ডিঙ্গিতে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাহার সব কিছুই ডবল দামে বেলুড়-মঠকে কিনিয়া রাখিতে হইবে—বড় দুঃস্থ সে, তাঁহার দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া একদিন সে শিবানন্দজীকে জানাইয়া দিয়াছে।

উৎসবের কুলী মজুর, পাড়ার বাগ্দী, সাঁওতাল ভৃত্য, দারোয়ান সকলেরই 'বাবার' কাছেই দরকার। বারান্দায় দাঁড়াইয়া 'বাবা' তাঁহাদের খোঁজখবর নেন, প্রয়োজন বোধে নোট-টাকা ছুঁড়িয়া ফেলেন, দরাজ মনে আদেশ দেন, 'ভাণ্ডারসে লে যাও।'

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

ঠাকুর শব্দ উচ্চারণেই হয় দিব্যভাবের উদ্দীপন। পূজারীকে দেখিলেই ঠাকুরের কালের আনন্দস্মৃতি উদ্বেল হইয়া উঠে। মা ভবতারিণীর মূর্ত্তিটি দেখিলেই হন আনন্দে মাতোয়ারা!

গায়ক হয়তো তাঁহার সম্মুখে মায়ের নাম গাহিতেছেন, আর শিবানন্দ মহারাজ মুহূর্ত্তে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন। আনন্দবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গায়ককে বলিতেছেন, "যা যা—পালা পালা! এঃ হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে! এ যেন শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'একটুতেই দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে'—তাই হয়েছে।"

এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাঁহার সাধন-সত্তায় লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে ভাব-জলধির বিচিত্র তরঙ্গমালা। কখনো মায়ের কথা, কখনো ঠাকুরের কথা নিয়া নানাভাবে চলিতেছে মধুর আস্বাদন।

দিব্য অনুভূতির শিখরদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া স্বামী শিবানন্দ এবার বিরাজিত 'ভাবমুখে'। মা ব্রহ্মময়ীর অঙ্কে বসিয়া আছেন—মায়ের বালকটি। সেদিন এক স্নেহভাজন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তুই কি পড়ছিস্ আজকাল?"

"আজ্ঞে, মাণ্ডুক্যকারিকা পড়ছি," সবিনয়ে উত্তর দেন নবীন সাধক।

"দূর শালা! ওতে কি আমার মায়ের নাম আছে?" পরমানন্দে বলিয়া বসেন শিবানন্দ মহারাজ।

সর্ব্ব বন্ধনহীন, শুদ্ধম অপাপ বিদ্ধম এই কুসুমপেলব বৃদ্ধ শিশুর আননে সদা স্ফুরিত রহিয়াছে দিব্য জ্যোতির আভা। জগৎপ্রপঞ্চে ওতপ্রোত পরম সত্তার মধ্যে নিজেকে যেন নিরন্তর তিনি বিস্তারিত করিয়া দিতেছেন।

অপূর্ব্ব তাঁহার এসময়কার শিশু-লীলা। বিছানায় বসিয়া মহাপুরুষ কখনো শালিক ময়নাকে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছেন। কখনো খেল্‌নার ডমরু শব্দে দিতেছেন দূরে তাড়াইয়া।

হঠাৎ একদিন আব্‌দার ধরিলেন, রিস্ট্‌ওয়াচ একটি এখনি তাঁহার

চাই। তখনি তাহা আসিয়া গেল। তুই একবার হাতে বাঁধিবার পর আর উহার কোন প্রয়োজন রহিল না।

১৯৩২ সালের কথা। কোন কোন দিন দেখা যাইত এই সিদ্ধ মহাপুরুষ বালকবৎ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। "বিছানার উপর কথামৃত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটি খঞ্জনী, লাঠি, ছবির বই—ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন—যেন পাঁচ বছরের একটি বালক। আর ইচ্ছানুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া করছেন। হয়তো একটু খঞ্জনী বাজালেন, ঠাকুরমার ঝুলি একটু পড়লেন, আবার কখনো বা হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ আচরণ করতেন তার একটু আভাস পাওয়া যায়—তাঁর একদিনকার কথা থেকে। জনৈক সেবককে কথায় কথায় বলেছিলেন—'ছাখ্, মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে ছুটে যেতে চায়; তাই এসব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করি। মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।"

মঠের প্রবীণ সাধকেরা বুঝিলেন, নির্গুণ পথের অভিযাত্রী, নির্ব্বানোন্মুখ এই মহা সাধককে আর বেশীদিন ধরিয়া রাখার উপায় নাই।

শেষটি বিদায়ের দিন আসিয়া পড়িতেছে। আজকাল শিবানন্দ মহারাজ মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেহী গুরুভ্রাতাদের দর্শন লাভ করেন একদিন ভক্তদের বলিলেন, "কাল খুব ধ্যান হয়েছিল। এইসব রা[illegible] ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল উর্দ্ধলোকে। স্বামী[illegible] দেখলাম। একটা জ্যোতির সুতোর মত ঝুলছে, সেটি[illegible] দিয়ে স্বামীজী নীচে এসেছিলেন। মহারাজকেও দেখেছি, তিনিও রয়েছেন বেশ আনন্দে ছিলাম।"

আর একদিন জানাইলেন, "এই মাত্র স্বামীজী ও মহারাজ এসেছিলেন। আর বললেন, 'চল তারকদা'। তোরা কেউ পেলিনে? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।"

মারাত্মক সন্ন্যাস রোগে শিবানন্দ স্বামী আক্রান্ত হইয়াছেন। মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা, গৃহস্থ ভক্তেরা, সেবার কোন ত্রুটি হইতে দিতেছেন না। স্যর নীলরতন প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা প্রাণপণ চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। স্যর নীলরতন সেদিন পরম শ্রদ্ধাভরে মন্তব্য করিলেন, "যে ক'রেই হোক এঁকে আপনারা আট্‌কে রাখুন। বলুন তো এমন মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?"

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন এলাহাবাদ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন স্বামী শিবানন্দকে দর্শনের জন্য। তিন দিন পরে, বিদায় নিতে গিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দজী নীরবে বাম হাতটি তাঁহার মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে উত্তরকালে বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, "যেদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্য্যন্ত আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌বে, সে পর্য্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাবো।"

১৯৩৪ সালের ২০শে এপ্রিল রোগের সঙ্কট ঘনাইয়া আসে, ডাক্তারেরা বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। মঠবাড়ী ও মঠপ্রাঙ্গণে শোকাকুল নরনারী ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। সাধুরা স্বামী শিবানন্দের শয্যা ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, নিরন্তর শুনাইতেছেন সদ্‌গুরুর পবিত্র নাম। মহাপুরুষের সারা দেহে তখন দেখা দিতেছে পুলক রোমাঞ্চ। দিব্য আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাঁহার মুখে চোখে।

"শেষ মুহূর্ত্ত যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন তাঁহার অঙ্গে পুলক আরো ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ স্মিত প্রশান্ত। অপরাহ্ণ ৫টা ৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুরুষজীর বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব আনন্দ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সঙ্গে সাঙ্গ মাথার চুল এবং সর্ব্ব শরীরে লোম কদম্বফুলের মতন খাড়া হইয়া উঠিল এবং

একটু পরেই মুখ দিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল। সেই পুলকিত অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল[১]।"

বেলুড় গঙ্গাতীরে শত শত শোকাকুল নরনারীর সম্মুখে সেদিন ভস্মীভূত হয় মহাসাধক শিবানন্দ স্বামীর মরদেহ, আর এই সঙ্গে নির্ব্বাপিত হয় রামকৃষ্ণ দেউলের একটি সুপবিত্র আলোকবিস্তারী দীপশিখা।